সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

সপ্তদশ বর্ষ।

১৩১৩।

কলিকাতা;
২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
...কচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

সপ্তদশ বর্ষ।

১৩১৩।

কলিকাতা;
২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
কচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মধুচ্ছন্দার আবির্ভাবকাল।

সাহিত্যের পাঠকবৃন্দের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, অতঃপর মধুচ্ছন্দার অগ্নি কি পদার্থ, তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটি কথার যথাসম্ভব মীমাংসা আবশ্যক। মধুচ্ছন্দা কোন সময়ে জীবিত ছিলেন?

ইয়ুরোপীয়েরা মনে করেন, যাহা অতি প্রাচীন কাল, তাহা অতি অসভ্য কাল।—এ দেশীয় ভট্টাচার্য্যদের বিবেচনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা মনে করেন, যাহা অতি প্রাচীন কাল, তাহাই অতি সুসভ্য কাল।

ইহার মধ্যে কোন্ মত সমীচীন, তাহার বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, ইয়ুরোপ কিছুকাল হইতে উন্নতির পথে, আর ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে অবনতির পথে, অগ্রসর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের স্মৃতিতে প্রাচীন কাল, স্বাধীনতা, সভ্যতা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত সংসৃষ্ট; আর ইয়ুরোপীয়দের স্মৃতিতে প্রাচীন কাল অসভ্যতা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের অভাবের সহিত সংসৃষ্ট। তাই আমাদের দেশের প[illegible]তেরা অতি প্রাচীন কালকে স[illegible]গ বলিয়া স্মরণ [illegible]রেন, এবং ইয়ুরো[illegible] পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন কালকে কলিযুগ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ত[illegible] বলিয়াই স্মরণ করেন। ইয়ুরোপের ইতিহাস, উন্নতির ইতিহাস—আম[illegible] ইতিহাস, অবনতির ইতিহাস।

মধুচ্ছন্দা সভ্য না অসভ্য ব্যক্তি ছিলেন?—এবং মধুচ্ছন্দা কোন্ [illegible] জীবিত ছিলেন?—এই দুই প্রশ্নের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, ভিন্ন [illegible] পাঠক অবশ্যই তাহার ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা করিবেন। যাঁহাদের বিবেচনা[illegible] প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যেরা অসভ্য ছিলেন বলিয়া পরিগণিত[illegible] মধুচ্ছন্দাকে অতি প্রাচীন বলিয়া স্থির হইলে অসভ্য বলিয়াই গ্রহ[illegible] আর যাঁহাদের বিবেচনায় অতি প্রাচীন কালে ঋষিরা দিব্যজ্ঞান[illegible] বলিয়া পরিগণিত—তাঁহারা তাহার ঠিক বিপরীত নিশ্চয় করি[illegible]

আমরা এ স্থলে প্রথমতঃ কালের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ [illegible] দূরে রাখিয়া মধুচ্ছন্দা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূ[illegible] চেষ্টা [illegible]

[illegible] "প্রাচী[illegible]

নামক গ্রন্থে, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকারের মতের উদাহরণ দিয়া, খ্রীষ্টের পূর্ব্ব ২০০০ বৎসর হইতে ১৪০০ বৎসরের মধ্যে সম্ভবতঃ ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল বলিয়া, একটি স্থূল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—আমরা এ প্রস্তাবে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতের প্রতিবাদে বা পোষকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। দেশীয় পণ্ডিতদের মতে বেদরচনার সময় কীদৃশ, আমরা এ স্থলে তাহারই আলোচনা করিব;—তবে ইয়ুরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহাদের মতানুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধ কি, তাহাই জানাইয়া দিবার জন্য উল্লিখিত মতের উল্লেখ করা হইল।

দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এক সম্প্রদায় পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা বেদকে "অনাদি" বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা একবারেই বলিয়া দিতেছি যে, এই মত, বিবেচক পাঠকের নিকট শ্রদ্ধেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; অবশ্যই কোনও না কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেদ রচিত হইয়াছিল। ঋষিদের মধ্যে অনেকের পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ যখন দেখা যায়—তখন পিতার বেদের পর যে পুত্রের বেদ রচিত হইবে—ইহাতে আর কথা কি ?

তবে এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, যাঁহারা বেদকে অনাদি বলেন, তাঁহারা বেদকে মনুষ্যের রচনা বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ঋষিরা রচনা করেন নাই; প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র।

যাঁহারা এই মতাবলম্বী, তাঁহাদের সহিত আমাদের বিবাদের প্রয়োজন [illegible]। যাহাকে তাঁহারা "প্রচার" বলেন, আমরা তাহাকেই রচনা বলিয়া [illegible]মি। যিনি কোনও নির্দ্দিষ্ট বেদাংশের আদিপ্রচারক—তাঁহাকেই তাহার [illegible] বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি।

[illegible]ণে প্রশ্ন এই—মধুচ্ছন্দার বেদ কোন্ সময়ে রচিত ?

দেশীয় পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র। আরও [illegible]বন যে, বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ সমকালীন ব্যক্তি। ইঁহারা দুই জনে [illegible]জত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং সুদাস দিগ্বিজয়ান্তে যে [illegible]ধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। [illegible]ষেকক্রিয়া বসিষ্ঠ সম্পন্ন করেন, ইহা ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রকাশ। [illegible] স্বীকার করেন যে, বসিষ্ঠের পুত্র শক্তি, [illegible] পরাশরের পুত্র বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপা[illegible]

যুদ্ধের সময়নির্ণয় করিবার উপায় থাকে, তাহা হইলে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবকাল ও সুদাসের রাজত্বকাল, মোটামুটি স্থির করিতে পারা যায়।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতদের বিবেচনায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল একটি অতিপ্রসিদ্ধ যুগচিহ্নস্বরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা। যাহা এত কাল ইতিহাস বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সেই মহাভারত এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়াই লিখিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্বল্পকাল পরেই পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ; তাহার সহিত কলিযুগের অর্থাৎ ভারতবর্ষের অবনতির সময়েরও সূত্রপাত বলিয়া বিবেচিত হয়। পরীক্ষিত ও তক্ষকের উপাখ্যানে অনেকে বিবেচনা করেন যে, নাগোপাসক বর্ব্বর জাতিবিশেষ এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করে। কুরুক্ষেত্রের গৃহবিচ্ছেদমূলক ঘোরতর যুদ্ধে ক্ষত্রিয়সমাজ এরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, পরীক্ষিত এই নাগোপাসকগণের হস্তে নিহত হয়েন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, আর্য্যজাতির আক্রমণকারী বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক পরাভবের এই সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন। অতএব ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে কলিকালের প্রারম্ভ বলিয়া যে পরিগণিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় নাগোপাসকগণকে পরাজিত করিয়া আর্য্য-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কথিত আছে, এই সময়েই মহাভারতের ইতিহাস প্রচারিত হয়।

যে ঘটনা এইরূপে যুগচিহ্ন বলিয়া পরিগণিত, দেশীয় পণ্ডিতেরা তাহার সময় অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে নানা কারণে তাঁহাদের অবধারিত সময়লিপি সন্দিগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন আরব্ধ হয়। অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতিষের সাহায্যে সময়নিরূপণের প্রথা এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। সূর্য্যমণ্ডল যে সময়ে একবার পৃথিবীর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই "অহোরাত্র" বা এক দিন বলিয়া গৃহীত হয়; চন্দ্রমণ্ডল যে সময়ে একবার ঐরূপ প্রদক্ষিণ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই মাস বলিয়া পরিগৃহীত হয়। এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক মাস। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদগণ কিছু কাল পরেই বুঝিতে পারেন যে বাস্তবিক এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পরিমিত সময়ে চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ ... সময়

চন্দ্রের পরিভ্রমণ, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার প্রদক্ষিণকাল ২৭ দিন ধরিয়া, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা নভোমণ্ডল বা নক্ষত্রচক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করেন। এবং এক এক ভাগকে "নক্ষত্র" এই সংজ্ঞা প্রদান করেন।

তাঁহারা মনে করিতেন, ভূমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয়। তাহার চারি দিকে নিশ্চল তারকাগণ যেন একটি মণ্ডলাকার চক্রে খচিত হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই চক্র যেন পৃথিবীর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহারই নাম নক্ষত্রচক্র বা ভচক্র, এবং ইহার সাতাইশ ভাগের এক ভাগের নাম "নক্ষত্র"। তারাগণ সর্ব্বদাই জ্যোতির্ম্ময়, তাহারা কখনও অন্ধকারের দ্বারা "গ্রহীত" বা গ্রস্ত হয় না; কিন্তু অন্য কতকগুলি জ্যোতিষ্ক মধ্যে মধ্যে অন্ধকারগ্রস্ত হয়—তাহার কারণ, তাহারা নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করে। তাই তাহাদের নাম "গ্রহ"।

প্রাচীনেরা সূর্য্য ও চন্দ্রকে এই "গ্রহ" নামক জ্যোতিষ্কশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতেন। সর্ব্বসমেত তাঁহারা সাতটি গ্রহের অস্তিত্বনিরাকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রচক্রের নিম্নস্থ ও বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—ঊর্দ্ধস্থ বলিয়া গণ্য হইত। সমুদায় গ্রহেরই নক্ষত্র-চক্রে এক এক বার ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট কাল আছে বলিয়া গণ্য হইত।

ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধদেশে একটি নিশ্চল তারা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনেরা তাহাকে "ধ্রুব" বা নিশ্চল তারা বলিয়া অভিহিত করেন। নক্ষত্রচক্রের ন্যায় ইহা পৃথিবীর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করে না, এবং গ্রহের ন্যায় ইহা নক্ষত্র-চক্রেও ভ্রমণ করে না। ইহাই তাহার বৈচিত্র্য।

এই ধ্রুবতারার নিম্নে ও গ্রহসমূহের ঊর্দ্ধে, সপ্তর্ষিমণ্ডল নামক সাতটি উজ্জ্বল তারকা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীনেরা এই তারকাপুঞ্জকে বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতেন! কি কারণে তাঁহারা এই তারকাপুঞ্জকে নক্ষত্রমণ্ডল হইতে পৃথক করেন, তাহা এক্ষণে বুঝা যায় না। কিন্তু জানা যায় যে, তাঁহারা ভাবিতেন যে, নক্ষত্রচক্রে এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক প্রকার অদ্ভুত গতি আছে। তাঁহারা অনুমান করিতেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল এক এক নক্ষত্রে মনুষ্যপরি-মাণের এক এক শত বৎসর কাল অবস্থান করেন।

পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে, এইরূপ সংস্কার ভ্রমাত্মক। আমরা জানি যে, অন্যান্য তারকার ন্যায় সপ্তর্ষিমণ্ডলও ... নাই।

অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া, তদ্দ্বারা সময়নিরূপণের একটি উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁহারা দেখিয়া রাখেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে। এবং তাহার পর এক এক নক্ষত্রে এক এক শতাব্দ গণনা করিয়া গিয়া, অবশেষে যে সময়ে নন্দ মগধরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, সেই সময়ে তৎকালের পঞ্জিকাকারেরা এইরূপ লিখিয়া যান যে, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে দুই তারাকে ইংরাজীতে Pointers বলে—অর্থাৎ ধ্রুবের সহিত যাহা সমসূত্রপাতে অবস্থিত,—ইহারা যে নক্ষত্রে অবস্থান করে,—সপ্তর্ষিমণ্ডল সেই নক্ষত্রেই আছেন, ধরা যায়। বাস্তবিক পাঠকবৃন্দ যদি এক্ষণেও নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিতে পাইবেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালেও সপ্তর্ষিমণ্ডল উপরিবর্ণিত নিয়মে, যেমন মঘা নক্ষত্রে * ছিল, আজিও তেমনি আছে, এবং অবশ্যই নন্দাভিষেকের সময়েও অবিকল তাই ছিল। ইহাতে প্রণিধানের যোগ্য কথা এই,—(১) গণনার প্রারম্ভে বাস্তবিকই সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘাতে আছে—ইহা দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও কলিকালের প্রারম্ভ নির্ণীত হইয়াছিল। এই সময় "দৃগগণিতৈক্য" (দর্শন ও গণনার ঐক্য) ছিল। (২) তাহার পর একটা বাঁধি নিয়মে ক্রমশঃ গণনা হইতে থাকে। বহুকাল এইরূপ নিয়মে গণনা হইতে হইতে, নন্দের সময় কেবল গণিতের দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে আসিয়াছেন বলিয়া পরিকল্পিত হয়। এই সময় ঘোর কলিকাল। নানা কারণে এই সময়ে বিদ্যার অবনতি ঘটিয়াছিল। এই সময়ে কেহ আর "দৃগগণিতৈক্য" করিয়া দেখেন নাই যে, বাস্তবিক সপ্তর্ষিমণ্ডল কোথায়। এমন কি ঐরূপ ঐক্য করিয়া দেখিতে যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, বোধ হয়, সে বিদ্যাই কাহারও ছিল না।

যাহা হউক, একটা বাঁধি নিয়মের অনুসরণ করিয়া নন্দাভিষেকের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় আছে বলিয়া পরিকল্পিত হয়। এখন দেখা যায়, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া উভয়কে ধরিয়া ১১ নক্ষত্র। তাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর কাল লব্ধ হয়।

বিষ্ণুপুরাণে, গদ্যে এই সময়ের বর্ণনকালে "অতেয়াচ্যতে" বলিয়া—অর্থাৎ গত কিংবদন্তী বলিয়া, গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, দেখা যায় ;——

* সিংহরাশির অন্তর্গত ইংরাজীতে Regulus নামক তারা মঘা নক্ষত্রের অন্তর্গত। যাঁহারা Regulus নক্ষত্রকে চিনেন, তাঁহারা সহজেই দেখিয়া লইবেন।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবৎ নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৪র্থ অংশ; ২৪, ৩২।

অর্থাৎ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বা পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল ঠিক ১০১৫ বৎসর।

ইহাই অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের সমীচীন মত। *

পাঠকবৃন্দ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, নন্দাভিষেকের সময় এইরূপ প্রসিদ্ধ কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছি যে, নন্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপের নিন্দাবাদ করিয়া সমাজে হুলস্থূল ঘটান। পূর্ব্বে যাহারা হীনজাতি বলিয়া সমাজে পরিগণিত ছিল, তাহাদের এই সময়ে বড়ই বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। নন্দ শূদ্রানীগর্ভসম্ভূত। তিনি "নিখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম ইবাপরঃ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় সম্প্রদায়ই এই সময়ে মহা দুর্দ্দশাপন্ন হয়েন। তাই এই সময় কলির মধ্যাহ্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে, তাই নন্দাভিষেক ঈদৃশ প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া পরিগণিত।

সে যাহা হউক, আমাদের জানা আছে যে, নন্দাভিষেকের একশত বৎসর পরে, চাণক্যের মন্ত্রণায়, চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। এই ঘটনার কাল

শকাব্দ পূর্ব্ব—————৪০৩
খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব—————৩২৫

তাহাতে নন্দাভিষেকের কাল—

শঃ পূঃ—————৫০৩
খৃঃ পূঃ—————৪২৫

এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল—

শঃ পূঃ—————১৫১৮
খৃঃ পূঃ—————১৪৪০

---

* অন্যান্য পুরাণের গণনার সময় কিছু বেশী। কিন্তু প্রামাণ্য হিসাবে বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। ভাগবতপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা আধুনিক। ঐ পুরাণে অন্যান্য পুরাণের গণনার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য [illegible] লিখিত শ্লোকটি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেখা যায়। তাহাতে "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং", এই পাঠের স্থলে "শতং পঞ্চদশোত্তরং" এই পাঠ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে কেহ কেহ ১[illegible] কেহ কেহ ১৫১০ বুঝেন। উপরে যেরূপ নক্ষত্রগণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিষ্ণুপুরাণের পাঠই ঠিক এবং তা

এখন যদি এই সময়ে দ্বৈপায়নকৃষ্ণের বয়স ৭৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে দ্বৈপায়নের জন্মকাল

শঃ পূঃ ————১৫৯৩
খৃঃ পূঃ ————১৫১৫

তখন পরাশর ঋষি ৩০ বৎসরের যুবা পুরুষ ধরিলে, তাঁহার জন্মকাল

শঃ পূঃ ————১৬২৩
খৃঃ পূঃ ————১৫৪৫

সেইরূপ ৩০।৩০ বৎসর ধরিয়া গেলে শক্তি ঋষির জন্মকাল

শঃ পূঃ ————১৬৫৩
খৃঃ পূঃ ————১৫৭৫

এবং বসিষ্ঠের জন্মকাল (আনুমানিক)

শঃ পূঃ ————১৬৮৩
খৃঃ পূঃ ————১৬০৫

সুদাসের মহাভিষেককালে শক্তি ঋষি তরুণবয়স্ক ছিলেন, এবং বিশ্বামিত্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, বৈদিক কিম্বদন্তী আছে। সুতরাং তৎকালে বসিষ্ঠের বয়স ৫০ বৎসর কল্পনা করিয়া, সুদাসের অশ্বমেধের কাল—

শঃ পূঃ ————১৬৩৩
খৃঃ পূঃ ————১৫৫৫

ইঁহারই কিছুকাল পরে মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত বেদে আপনাকে একজন "নবীন" ঋষি বলিয়া বর্ণনা করেন। বাস্তবিকই মধুচ্ছন্দা ঋগ্বেদরচনাকারী নবীন ঋষিদের মধ্যে একজন প্রধান ঋষি। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও অনেকটা সেই মতে সায় দিয়াছেন। কিন্তু "প্রথম মণ্ডল" বলিয়া উহা যে সময়ের হিসাবেও প্রথম, তাহা নহে। প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্ত—অর্থাৎ মধুচ্ছন্দার বেদ, খৃঃ পূঃ ন্যূনাধিক ১৫০০ বৎসরে বিরচিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মত অনুসরণ করিলেও, ইহা ঋগ্বেদরচনার সময়ের শেষভাগ।

যাহা হউক, উপরে যেরূপ দেখা গেল, তাহাতে দেশীয় পণ্ডিতদের মতানুসরণ করিলেও মধুচ্ছন্দা ঋষির আবির্ভাবকাল যেরূপ লব্ধ হয়, তাহাতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতের কোনও বিসম্বাদ নাই। ইহা দেশীয় পণ্ডিতদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কেন না, আজকাল যেখানে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের

সহিত তাঁহাদের মতের বৈষম্য ঘটে, সেখানে তাঁহার গলহস্ত পাইবার যো বলিয়াই বিবেচিত হয়েন।

এক্ষণে মধুচ্ছন্দার "অগ্নি" কি পদার্থ, তাহা বিবেচনা করিবার অগ্রে

খৃঃ পূঃ———————১৫০০ } অব্দে
শঃ পূঃ———————১৫৭৮

আর্য্যাবর্ত্তে ঋষিসমাজে বিজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে যথাসম্ভব বিবেচ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র-বটব্যাল।

রঙ্গমহল।

মোগল বাদসাহদিগের দিল্লী ও আগরার লোহিতপ্রস্তরময় দুর্গাভ্যন্তরে, কৌমুদীধবলমর্ম্মরমণ্ডিত রাজভবন, স্থপতির শিল্পকৌশলের অপূর্ব্ব নিদর্শন। দুর্গমধ্যে আমখাস, দেওয়ানখাস প্রভৃতি যেমন দেখিবার জিনিস, বাদসাহের "হারেম" বা অন্তঃপুরও সেইরূপ শিল্পকীর্ত্তির এক কমনীয় উদাহরণ। হারেমের অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ, যেথায় বাদসাহের রাজ্ঞী ও বেগমগণ এবং সাহাজাদীরা বাস করিতেন, তাহাই "রঙ্গমহল" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল।

"রঙ্গমহলের" নির্ম্মাণকৌশল অদ্ভুত,—ইহার কক্ষমধ্যস্থা সুন্দরী অধিবাসিনীরা অপূর্ব্ব—উপন্যাসের মনোহর ঘটনাবলীর ন্যায়, তাঁহাদের জীবনের দৈনিক কার্য্যগুলিও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। রঙ্গমহল মোগলের সৃষ্টি, মোগলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমহলেরও ধ্বংস হইয়াছে।

বর্ত্তমানে, দিল্লী ও আগরা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অন্তঃপুরের মর্ম্মরপ্রস্তরময় কক্ষগুলির স্থান ও অবস্থা যাঁহারা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে উল্লিখিত ঘটনাগুলি বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।

যাহা ছিল, তাহা আর নাই। রঙ্গমহলের মধ্যে যাহাতে মন ভুলাইত—তাহা এই দুই শত বৎসরের অতীত স্মৃতির মধ্যে লুকাইয়াছে। বিলাসবিভ্রমময়, ভূষণশিঞ্জনমুখরিত, কলকণ্ঠনিনাদিত, সেতারসারঙ্গস্বরলয়সমন্বিত, সেই প্রমোদময় কক্ষ, এখন কঠোরকায়, পরুষদৃষ্টি, অস্ত্রধারী, শ্বেতকায় সেনাগণের নিবাসে পরিণত হইয়াছে।

"আকবরনামা" হইতে জানিতে পারা যায়, আকবর সাহের সময়ে মোগল

হারেমে-পঞ্চসহস্র অন্তঃপুরিকা অবস্থান করিতেছিল। আবুল ফজল একস্থানে বলিয়াছেন—"সম্রাট যে স্থানে বিশ্রাম করিতেন, তাহার চতুঃপার্শ্বে কয়েকটি মহল অধিকার করিয়া রঙ্গমহলের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সমস্ত সৌধাবলিতে প্রায় পঞ্চসহস্র রমণী বাস করিতেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি বিভিন্ন গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই রমণীগণের মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ ছিল। ইঁহাদের সকলের জন্য এক একটা বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে যাঁহারা সুচরিত্রা ও নৈতিক-বলসম্পন্না, তাঁহারা মহলের মধ্যে কর্তৃত্ব করিবার ভার পাইতেন। মহলের ভিতর বাদসাহের হিন্দু পাটরাণী, সাহজাদীগণ ও তাঁহাদের সহচরী কামিনীগণ, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট মহলে অবস্থান করিতেন।

সদরমহলের কার্য্যাবলী নির্ব্বাহিত করিবার জন্য যেরূপ বিশেষ নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, রঙ্গমহলের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যও সেইরূপ কতকগুলি বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দৃঢ়কায়া, শ্রমশীলা, সমরখণ্ড ও তাতার দেশের রমণীগণ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রহরীর কাজ করিত। তাহাদের মধ্যে পদবিভাগ ছিল— এক জন উচ্চপদস্থ স্ত্রী-সেনাপতি তাহাদের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তাহারা সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি বিনাইয়া চূর্ণকুন্তলে পরিণত করিত; তীব্র-কঠোরকটাক্ষময়, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নে সুরমার রেখা দিত; সুবাসিত, সুগন্ধি তাম্বুলে রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিত। তাহারা রমণীহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতায় বঞ্চিত ছিল না; কিন্তু প্রয়োজন হইলে হাতিয়ারের আঘাতে সেই মর্ম্মরপ্রস্তরময় কক্ষতল শোণিতে রঞ্জিত করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না। অন্তঃ-পুরবাসিনী সুন্দরীদের জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে সাম্রাজ্ঞী ও বাদসাজাদীদের সখী ও দাসীর কার্য্য করিত। ইহাদের মধ্যে অনেক নর্ত্তকী ছিল। অনেকে মৃদঙ্গ, সেতার, বীণ, এসরার, সারঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রপ্রয়োগে নিপুণা ছিল। কেহ বা বাদসাজাদীদের চিত্রকার্য্য শিখাইত, কেহ বা তাঁহাদের বেশবিন্যাস করিয়া দিত, কেহ বা তাঁহাদিগকে নানাবিধ সুকুমার শিল্প শিক্ষা দিত, কেহ বা নৃত্যাদি শিখাইয়া অন্তঃপুরে জীবনযাপন করিত। আবার কোনও কোনও সম্প্রদায় অভিনয়াদি দ্বারা বাদসাহের মনোরঞ্জন করিত।

প্রথম শ্রেণীর রাজ্ঞীরা মাসে ১০২৮ টাকা হইতে [illegible] শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ১৬১০ পর্য্যন্ত পাইতেন। সখী ও দাসীরা ৫১ হইতে [illegible]

৪০ হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত, অবস্থা ও কার্য্য অনুসারে পাইত। দেওয়ানখাসের পরই অন্তঃপুর—যেখানে "দেওয়ানখাস" শেষ হইয়াছে, তাহার পার্শ্বের দালানেই, এক জন স্ত্রী-হিসাবরক্ষক থাকিতেন। হারেম ও তদভ্যন্তরস্থ রঙ্গমহলের মধ্যে যে সমস্ত খরচপত্র হইত, সমস্তই ইঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। এই স্ত্রী-দেওয়ান সমস্ত খরচপত্রের ও ভাণ্ডারের হিসাবাদি রাখিতেন।

দেওয়ান ব্যতীত, হারেমের সীমার মধ্যে কয়েক জন স্ত্রী-তহবিলদার থাকিতেন। অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে যাঁহার যখন কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন হইত, তাহা তাঁহার মাসিক মাসহারার অতিরিক্ত না হইলে, তহবিলদার খরচ লিখিয়া সরবরাহ করিতেন। অন্যথায়, সরকারের হুকুম আনাইতে হইত। সমস্ত বৎসরের আনুমানিক আয়ব্যয়ের তালিকা পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী-হিসাবরক্ষকের দ্বারা প্রস্তুত হইত। এই হিসাব সম্রাটের মন্ত্রীবর্গের সম্মুখে পেশ হইয়া অনুমোদিত হইলে, তাহাতে হারেমের ব্যবহার্য্য নির্দ্দিষ্ট শীল সংযোজিত করা হইত। পরিশেষে ইহা খাজাঞ্চীখানায় উপস্থিত হইলে, খাজাঞ্চী সমস্ত খরচপত্র সরবরাহ করিতেন।

বাদসাহ যে প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেন, তাহার চারি দিকে কালমুক-জাতীয় তাতারীগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাহারা দিত। ইহাদের পর, খোজা সম্প্রদায়। খোজাদিগের পরেই বাদসাহের নিজনিয়োজিত বিশ্বাসী রাজপুত রক্ষকগণ। তাহার পরে মুসলমান সেনানীগণ। এতদ্ব্যতীত অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ, মনসবদারী পদের গৌরবরক্ষার্থে, অতিরিক্ত প্রহরীর কার্য্য করিতেন। এত দূর সতর্কতা সত্ত্বেও, বাদসাহ নিজে অনেক সময় নিভৃত নিশীথে সামান্য ছদ্মবেশে মহলের চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন।

যখন কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা বা আমীর ওমরাহের স্ত্রী অন্তঃপুর-প্রবেশের অভিলাষ করিতেন, তখন সাম্রাজ্ঞী বা বাদসাহজাদীদের হুকুমনামা বা "পাঞ্জাপত্র" জোগাড় করিতে হইত। বিশেষতঃ, সচ্চরিত্রা না হইলে কেহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না।

সকল বাদসাহই হিন্দুরাজ্ঞীদের জন্য পৃথক মহল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজপুতকন্যাগণ যবন বাদসাহের পরিণীতা পত্নী হইলেও, বাদসাহেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদের জন্য হিন্দু পরিচারিকা ও ব্রাহ্মণকন্যাগণকে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। আকবরসাহ যোধপুর-রাজকুমারীর জন্য যে মহল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজও "যোধবাইমহল" বলিয়া, আগরার দুর্গমধ্যে

পরিচিত। এই মহলে, ভিত্তিগাত্রে, কার্ণিসের নীচে, নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। হিন্দুরাজকুমারীরা স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে হোমযজ্ঞাদি করিতেন। আকবরসাহ অগ্নি-উপাসক ছিলেন। অনেক সময় তিনি রাজপুতনীদিগের প্রস্তুত হোমের তিলক, হিন্দুধর্ম্মানুরাগের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার প্রশস্ত ললাটে ধারণ করিতেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সাধারণতঃ গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক হইয়া উঠে। এই গ্রীষ্ম প্রাখর্য্যের অপনোদন করিবার জন্য, কেবল যে যমুনার শীকরসম্পৃক্ত শীতল সমীরণ সহায়তা করিত, এরূপ নহে। অন্তঃপুরের অনেক প্রকোষ্ঠমধ্যে এবং প্রাঙ্গণে, মর্ম্মর ও লোহিত প্রস্তরের চৌবাচ্ছা ও প্রস্রবণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত জলাধার নানাবিধ সুগন্ধি জলে পরিপূর্ণ থাকিত। কখনও বা গোলাপের ফোয়ারা ধীরভাবে উৎসারিত হইয়া স্বর্গের সৌরভ আনিয়া দিত।

অন্তঃপুরিকাগণের পদমর্য্যাদা অনুসারে, বেশভূষারও পার্থক্য ছিল। উচ্চশ্রেণীর বেগমেরা বা মহারাজ্ঞীরা, সর্ব্বদাই মণিমুক্তাদিতে তাঁহাদের ভ্রমরকৃষ্ণ, আগুল্‌ফলম্বিত, কুঞ্চিত কেশদাম আবৃত করিতেন। কেহ কেহ বাদসাহের অনুমতি লইয়া, মস্তকে সাম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত মণিময় মুকুট ধারণ করিতেন। গ্রীষ্ম যখন অত্যন্ত প্রখর হইত, তখন বাদসাহপত্নীগণ সুকোমল সূক্ষ্ম রেশমী বাসে ও ওড়নায় দেহাবরণ করিতেন। প্রতিদিন রাত্রে ব্যবহারের পর প্রাতে সেই সূক্ষ্মকারুকার্য্যময় পোষাক পরিত্যক্ত হইত, এবং প্রতিদিনই এক একটি নূতন স্যুট ব্যবহৃত হইত। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহাদের বেশভূষার বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইত। কোনও বৈদেশিক ভ্রমণকারী বলিয়াছেন, "মোগল অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দ তাঁহাদের অঙ্গুলিতে এক খানি করিয়া ক্ষুদ্র দর্পণাঙ্গুরীয় ধারণ করিতেন। সময়ে সময়ে, সকল অবস্থায়, তাঁহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি, ইচ্ছামত ইহার মধ্যে নিরীক্ষণ করিতেন। চলা, ফেরা, বসা, দাঁড়ান, কথাবার্ত্তার সময়েও তাঁহারা অবসরমত অপাঙ্গদৃষ্টিতে সেই অঙ্গুলীস্থিত ক্ষুদ্র দর্পণে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইতেন।"

বাদসাহের অন্তঃপুরিকাগণ, যে সমস্ত মণিমুক্তা ও রত্নাদির ব্যবহার করিতেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা তাঁহাদের নিজের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সেই সমস্ত বহুমূল্য মণিমুক্তাদি বাহিরে লইয়া যাইতে পারিতেন না। এগুলি মোগলরাজভাণ্ডারের চিহ্নিত দ্রব্য, তাঁহারা কেবল ব্যবহারকারিণী মাত্র ছিলেন। অনেক বহুমূল্য পরিচ্ছদ বাহিরের

বাজারে মূল্যহীন করিবার জন্য, সচ্ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইত। এই ছিদ্র দ্বারা সেই মাণিক্যের সৌন্দর্য্যের অপচয় হইত না, কিন্তু বাজারে বিক্রয় করিতে গেলে কোনও রত্নবণিকই তাহা ক্রয় করিত না। আকবরসাহ স্বয়ং একবার গুজরাট যুদ্ধের সময় অর্থকষ্ট-নিবন্ধন এইরূপ কয়েকখানি বহুমূল্য রত্ন বাজারে রত্নবণিকদের নিকট বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও রত্নবণিক তাহা ক্রয় করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

মোগল অন্তঃপুরমধ্যে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রচুর প্রচলন ছিল। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই গন্ধাধারে নানাবিধ সুরভি দ্রব্য জ্বলিত। স্তম্ভে স্তম্ভে, হর্ম্ম্যপ্রাকারগাত্রে, কার্ণিসের মাথায়, নানা স্থানে, নানাবিধ নয়নরঞ্জন সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, নীরবে সুগন্ধ বিতরণ করিত।

পুষ্পের সুগন্ধ হইতে চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, চিত্তের প্রসন্নতা হইতে ঈশ্বরোপাসনার অনেক সাহায্য হয়; আবুলফজল বলেন, আকবরসাহ এই কারণে ফুলের বড় আদর করিতেন। তাঁহার সময়ে সেঁউতী, ভোগেশ্বরী, চাম্বেলি, রায়বেল, মোঙ্গরা, চাম্পা, কেতকী, জুঁই, নেউয়ারী, কেওরা, গুলাল, চালতা, (?) তসিব-ই-গুলাল, শৃঙ্গারহর, কর্ণ, কর্পূরবেল প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের ব্যবহার ছিল। আর কতকগুলি ফুল কেবল শোভার জন্য অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠনিবদ্ধ হইয়া থাকিত। ইহাদের মধ্যে রত্নমঞ্জরী (উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ), রত্নমালা (হরিদ্রাবর্ণ), কর্ণফুল (সোণালী লাল), কদম্বনাগকেশর, শ্রীখণ্ডী (দলের এক পার্শ্ব হরিদ্রাভ শ্বেত, অন্য পার্শ্ব লোহিতাভ), হীনা, দুপারিয়া, ভুইচম্পা, সুদর্শন (হরিদ্রাবর্ণ) প্রভৃতি পুষ্পই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। আকবরের সময়ে গোলাপের নামোল্লেখও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপীয় এবং মার্কিন শ্রমজীবী।

প্রথম প্রস্তাব।

শ্রমজীবী সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিতান্ত নিঃস্ব। আমাদের দেশের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, য়ুরোপ এবং আমেরিকাতেও ইহাদের বংশবৃদ্ধির সহিত ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যের প্রাবল্য অনুভব করিয়া অনেক অর্থনীতিবেত্তা ইহাদের মঙ্গলোপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে এই হত

ভাগ্য সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রায় কেহ কিছু চিন্তা করেন না; কিন্তু ভরসা আছে, যদি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এই আলোচ্য প্রশ্ন কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা হইলে আমরাও তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকৃত হইব।

কিন্তু শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের কোনও স্থায়ী উপকারের উপায় আবিষ্কার করিতে হইলে, কেবলমাত্র বক্তৃতায় কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমেরিকগণ বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমজীবীর উপার্জ্জন ও জীবিকার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যে সকল উন্নতিশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মার্কিন যুবক লি মেরিওয়েদার সাহেব অন্যতম; তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা, এই উভয় দেশেই শ্রমজীবীগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; এক বৎসরকাল তিনি শ্রমজীবীর জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক জিব্রাল্টর হইতে সুদূরবর্ত্তী কৃষ্ণসাগরের প্রান্তসীমা এবং ভূমধ্যসাগর হইতে তুষারমণ্ডিত বল্টিকের শ্বেত উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় রাজ্যের শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের মধ্যে পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও এই উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; তাঁহার সংগৃহীত তত্ত্ব বিলক্ষণ কৌতূহলজনক।

তিনি বলেন, য়ুরোপ অপেক্ষা আমেরিকায় জীবিকানির্ব্বাহ অধিক ব্যয়সাধ্য; ইহা ইংলণ্ড অপেক্ষা একচতুর্থাংশগুণ, ফরাসী দেশ অপেক্ষা দ্বিগুণ, এবং ইটালী অপেক্ষা তিনগুণ অধিক। কিন্তু য়ুরোপের শ্রমজীবীগণ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহাদের সকল অভাব বিদূরিত হওয়া কঠিন বলিয়া, তাহাদের জীবনধারণের উপায়কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে হইয়াছে। নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ভিন্ন তাহারা অন্য কিছু ক্রয় করিতে সক্ষম নহে।

ইটালীয় শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের অনেকে প্রত্যহ চতুর্দ্দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া চারি আনা মাত্র উপার্জ্জন করে; প্রত্যহ দেড় টাকা উপায় করিতে পারে, এরূপ কারিকর প্রায় দেখা যায় না। এমন কি, প্রত্যহ বারো আনা উপার্জ্জনক্ষম কারিকরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প; কিন্তু এই সামান্য আয়েই তাহারা যে জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ হয়, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য তাহার অন্যতম কারণ হইলেও, তাহাদের অসম্ভব পরিমিতব্যয়িতাই তাহার মুখ্য কারণ। নানা প্রকার অভাবের মধ্যে বাস করিয়া ইহারা যেরূপ সানন্দে সন্তোষের সহিত কালাতিপাত করে, আমেরিক ভিক্ষুকগণও সেরূপ অবস্থা ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে।

মার্কিণবাসীগণ ইটালীর শ্রমজীবী সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। অনেক সময়ই আমেরিকার পথপ্রান্তে ইটালীয় ফলবিক্রেতা-দিগকে তাহাদের দোকানে বসিয়া ঢুলিতে দেখা যায়, কখন কখন বা ইটালীয় ভিক্ষুকগণ আর্গিন বাজাইয়া এবং বানর নাচাইয়া মার্কিণ-গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যে সকল মার্কিণবাসী এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং যে সকল আমেরিক পর্য্যটক নেপল্‌স নগরের "আল্‌সে-থ'না কিম্বা রোমের পণ্যবীথিকা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইটালীয়গণের আলস্যপরতন্ত্রতার উল্লেখ করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু যে সকল অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সমাজের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া নিম্নতল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সকল অবস্থার লোকের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইটালীয় শ্রমজীবীগণ অতি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা এত যৎসামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে যে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ দেখা যায় না।

ইটালীর পাচকপাচিকাগণের নিকট রন্ধনোপযোগী কোনও দ্রব্যই নষ্ট হইতে পায় না—দরিদ্রের গৃহে দূরের কথা, ধনবানের অট্টালিকাতেও নহে। মার্কিণে যে গৃহস্থের আয় বার্ষিক পনের হাজার টাকা, তাহাদের ভাণ্ডারে রাশীকৃত ময়দা, চিনি, মাখম প্রভৃতি ক্রয় করিয়া রাখা হয়; এইরূপে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেই সকল দ্রব্য ব্যয়ের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকে না, সুতরাং এই সকল দ্রব্যের যথেষ্টপরিমাণে অপব্যয় হয়; কিন্তু এক জন অবস্থাপন্ন ইটালীবাসীর ভাণ্ডারগৃহ সম্পূর্ণ শূন্য থাকে, প্রয়োজন মত তাঁহারা কয়েক সের ময়দা, কিঞ্চিৎ চিনি এবং কিয়ৎপরিমাণ মাংস আনাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন, তাহার কোনও অংশের অপব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

যাহা হউক, ধনবানের রন্ধনশালায় যে সকল দ্রব্য উদ্বৃত্ত থাকে, পাচক পাচিকা তাহা সযত্নে রাখিয়া দেয়, এবং সুবিধা অনুসারে খাদ্যদ্রব্যবিক্রেতা-দিগের নিকট তাহা অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া আসে। বলা বাহুল্য, এই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তাহাদেরই উপরিলাভ। ইহারা ব্যবহৃত কাফিচূর্ণ শুষ্ক করিয়া বিক্রয় করে, মাছ ভাজিয়া ভাজা তৈল অবশিষ্ট থাকিলে তাহা পর্য্যন্ত বিক্রয় করে; এমন কি, বাতির সর্ব্বশেষ অংশটুকু জমাইয়া তাহাও বিক্রয় করে; এইরূপে তাহাদের অনেক টাকা উপায় হয়। ইটালীয় নগরের যে সকল স্থানে এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়, সেই সকল স্থানকে "পিয়েজা" (চতুষ্কোণ

মুক্ত প্রাঙ্গণ) ‍লে। একজন বিক্রেতার নিকটেই উচ্ছিষ্ট শশা কাঁকুড় হইতে আরম্ভ করিয়া মরিচা-ধরা তরবারি পর্য্যন্ত, সকল দ্রব্যই কিনিতে পাওয়া যায়। বিক্রেতা তাহার বাজারস্থ ক্ষুদ্র দোকানে সমস্ত পণ্যদ্রব্য থরে থরে সাজাইয়া রাখে। এই সকল দোকানে পুরাতন বস্ত্র, গজাল, ভুক্তাবশিষ্ট খানা, ব্যবহৃত তামাকের শুষ্ক গুঁড়া, বাতির পরিত্যক্ত অংশ, নানাবিধ অস্ত্র, ছুরী, কাঁটা, পুরাতন লৌহ-খাট এবং আরও নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইটালীয় শ্রমজীবীগণের গৃহিণীবর্গ, এই সকল দোকান হইতে অল্পমূল্যে আবশ্যকীয় খাদ্য-দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, ইটালীয় শ্রমজীবীদিগের গৃহের অবস্থা কিরূপ। ইহাদের গৃহে গৃহসামগ্রীর মধ্যে কয়েকখানি টুল, একখানি জীর্ণ টেবিল, এবং খুব বেশী হইলে একখানি লোহার খাট পর্য্যন্ত দেখা যায়। পরিবার বৃহৎ হইলে, ইহাদের তিন চারি খানি মাদুর থাকে, দিবাভাগে সেগুলি খাটের উপর জড়াইয়া রাখে, রাত্রে শুইবার সময় তাহা মেজের উপর বিছাইয়া লয়। দিবাভাগে ইহারা স্ব স্ব গৃহ কারখানায় পরিণত করে, তবে গৃহিণী সেই গৃহেরই এক প্রান্তে সাংসারিক কর্ম্ম করিতে থাকে।

ইটালীয় শ্রমজীবীগণ সাধারণতঃ যে প্রকার বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের বার্ষিক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। যাহারা প্রস্তর-খোদাইএর ব্যবসায় করে, তাহারা প্রায়ই গৃহমধ্যে কাজ করে না, কিঞ্চিৎ বেশী ভাড়া দিয়া কোনও গৃহের ত্রিতল বা চৌতলে কারখানা খোলে। কিন্তু এইরূপ শ্রমজীবীর সংখ্যা অতি অল্প। প্রায় সকলেই অল্প ভাড়ায় নিম্নতম তলের ঘর ঠিক করিয়া লয়। অবিবাহিত শ্রমজীবীগণের অধিকাংশই হোটেলে থাকে, শয্যার জন্য তাহাদিগকে প্রতি রাত্রে প্রায় দুই আনা ভাড়া দিতে হয়। যে সকল শ্রমজীবী অত্যন্ত দরিদ্র, তাহারা তিন আনা দিয়া একটু প্রশস্ততর শয্যা ভাড়া করে, এবং অন্য এক জন শয্যাসহচর যুটাইয়া, দুই জনে সেই এক শয্যায় শয়ন করে; ইহাতে তাহাদের উভয়েরই কিঞ্চিৎ ব্যয়লাঘব হয়। এমনও দেখা গিয়াছে যে, ত্রিশ জন লোক একটি ১৬ বর্গ ফিট পরিমিত কুঠুরী ভাড়া লইয়া, তক্তপোষের উপর তক্তপোষ সাজাইয়া, তাহার ভিন্ন ভিন্ন থাকে শয়ন করে।

রাজমিস্ত্রীরা প্রত্যূষে পাঁচটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়াই এক আনার রুটী ও অর্দ্ধ আনার তরকারী কিনিয়া লয়, এবং কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই

তদ্দ্বারা প্রাতর্ভোজন শেষ করে। সুবিধা হইলে, অনেকে এই সময়ে সুলভ মদিরাও কিঞ্চিৎ পান করিয়া থাকে।

বেলা বারটা বাজিলে, অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা পরিশ্রমের পর, ইহারা টিফিনের ছুটি পায়, তখন সকলেই নিকটস্থ হোটেলে প্রবেশ করে, এবং তিন চারি আনার মদ্য, মাংস রুটী ক্রয় করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করে। এই সময় ইহারা দ্রাক্ষাফলজাত মদ্য ভিন্ন অন্য মদ্য পান করে না। যে সকল শ্রমজীবী স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাস করে, তাহারা দুই তিন সের ময়দা আনিয়া তদ্দ্বারা রুটী প্রস্তুত করে। এই উপায়ে তাহাদের খরচ অনেক কম পড়ে। সন্ধ্যার সময় ইহাদের আহার অতি যৎসামান্য। অল্প রুটী, এবং তাহার উপযুক্ত তরকারী ও কিঞ্চিৎ কাফি, ইহাই তাহাদের নৈশভোজনের উপকরণ। হোটেলে এক পাইণ্ট কাফির মূল্য অর্দ্ধ আনা, কিন্তু শর্করাসংযোগে তাহাকে সুমিষ্ট করিতে হইলে এক আনা দেওয়া প্রয়োজন; দেড় আনা ব্যয় করিলে, সেই সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ পোয়া রুটীও পাওয়া যায়।

ইহাই অতিদরিদ্র শ্রমজীবীদিগের আহারপ্রণালী। দোকানদার ও সর্দ্দার কারিকরদিগের আহারের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক; ইহাদিগের পরিবারবর্গ সাধারণ রন্ধনশালায় আপনাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্য রন্ধন করিয়া লয়, ইহাতে খরচপত্রের অনেক সাশ্রয় হয়। এই দেশে কাঠ ও কয়লা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, কিন্তু দুই খানি কঞ্চি এবং মুষ্টিমেয় কয়লার জ্বালে ইটালীর রমণীগণ এত সামগ্রী রন্ধন করিতে পারে যে, মার্কিনবাসীর নিকট তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইটালীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বালক বালিকা এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ পথ-প্রান্তে পতিত কাষ্ঠখণ্ড কিম্বা শুষ্ক দ্রাক্ষালতা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহারা যাহা কিছু কুড়াইয়া পায়, তাহা দ্বারাই তাহাদের সামান্য খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে। এতদ্ভিন্ন শীতনিবারণের জন্যও ইহাদের অগ্নির প্রয়োজন হয়; অনেক সময় একটি পাত্রে অল্প অগ্নি রাখিয়া, ছয় সাত জন শ্রমজীবী তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া শরীর উত্তপ্ত করিয়া লয়। কখন কখন দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা মৃৎপাত্রে ছাই তুলিয়া তাহাদের বস্ত্রাদির নিম্নে রাখিয়া দেয়; বোধ হয় তাহারা মনে করে, ইহাতেই তাহাদের বস্ত্রাদি গরম হইবে।

সুইজারল্যাণ্ডের শ্রমজীবীগণ তাহাদের ইটালীয় ভ্রাতৃবর্গ অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু তাহাদের সাংসারিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এক জেনিভা নগরের অধিকাংশ শ্রমজীবীই ঘড়ি ও বাদ্যযন্ত্রের

কারবার করিয়া থাকে; এই সকল কারিকরেরা সাধারণতঃ তুইটি করিয়া ঘর ভাড়া লয়; তাহার একটি ঘরে বসবাস করে, এবং অন্যটিতে কারখানার কাজ চলে। ঘড়িনির্ম্মাতা ঘড়ির তার, চাকা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রনির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করে, তাহা এই ঘরে বসিয়াই প্রস্তুত করে। তাহার পরিবারবর্গও তাহার সহায়তা করিয়া থাকে; স্ত্রী চাকাগুলি পালিশ করে, তার পরিষ্কার করিয়া দেয়, পুত্র কোনও বাদ্যযন্ত্রের কারবারে চাকরী করে; এবং গৃহে অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে সে সুতা কাটিয়া বস্ত্রবয়ন করে। নিতান্ত শিশুসন্তান ভিন্ন সুইস্ শ্রমজীবীর পরিবারস্থ সকলেই কিছু-না-কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এইরূপে পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের সমবেত উপার্জ্জন এবং তাহার পরিমিত ব্যয়, এই পর্ব্বতাকীর্ণ জনবহুল দেশের শ্রমজীবীবর্গকে সুখ ও সন্তোষের সহিত জীবিকানির্ব্বাহে সহায়তা করে। জেনিভা, জুরিচ এবং বার্ণি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে এমন অনেক দোকান আছে, যেখানে দোকানিদারেরা মাংস ও নানাপ্রকার তরকারী রন্ধন করিয়া বিক্রয় করে। অনেক শ্রমজীবী এই সকল খাদ্য কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, সুতরাং খাদ্যপাকের জন্য অনেকের গৃহে উনন জ্বালাইবারই প্রয়োজন হয় না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ও পল্লীগ্রামে কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবীগণ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহাদের পৈতৃক বাসগৃহ না থাকিলে, তাহারা তুই তিনটি মনোরমকক্ষবিশিষ্ট 'চ্যালেট' (কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ) ও তৎসংলগ্ন অনতিবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভাড়া করে; এই গৃহ প্রাঙ্গণে তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে কেহ শাক সবজীর বীজ বপন করে, কেহ বা কোষ্টা, শন কিম্বা গাঁজার চারা রোপণ করে। ইহারা প্রায় সকলেই মেষপালন করে, এবং শীতকালে এই পর্ব্বতপরিপূর্ণ ক্ষুদ্র দেশটি তুষারাবৃত হইয়া পড়িলে, বাহিরের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, রমণীগণ নিজ নিজ গৃহে বসিয়া কেহ কোষ্টা কাটে, কেহ বা মেষের লোমে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, এবং এই উপায়ে যে অর্থাগম হয়, তাহা আবশ্যক খরচপত্রে ব্যয় করিয়াও কিয়দংশ উদ্বৃত্ত থাকে। রুটির জন্য গম ও যব, দধি, দুগ্ধ, গোল আলু প্রভৃতি প্রধান খাদ্যদ্রব্যও তাহাদের গৃহে উৎপন্ন হয়, এবং তাহারা স্বহস্তে বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া পরিধান করে।

সুইস্ শ্রমজীবীগণ য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা এক বিষয়ে সৌভাগ্যবান্, ইহাদিগের প্রত্যেককে বৎসরে তিন সপ্তাহ করিয়া সেনাবিভাগে

কাজ করিতে হয়, তাহাদের সদাকর্ম্মনিরত জীবনে এই পরিবর্ত্তন যথেষ্ট প্রীতিকর। কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। য়ুরোপের অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই, তদ্দেশীয় অধিবাসীবর্গকে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর এই কার্য্যে অতিবাহিত করিতে হয়। যৌবনকালে যথন সংসারক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করা যায়, এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য প্রাণপণে জীবনসংগ্রাম আরম্ভ করিতে হয়, জীবনের সেই মহার্ঘ সময়ে এইরূপ ক্ষতি অত্যন্ত গভীর। জর্ম্মনীর এবং অষ্ট্রিয়ার অধিবাসীবর্গ অবনতমস্তকে এই ক্ষতি স্বীকার করে।

জর্ম্মনী ও অষ্ট্রিয়ার শ্রমজীবীগণ উপরি-উক্ত কারণে ২৩।২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান, জর্ম্মণ শ্রমজীবীগণের অবস্থাগত অবনতির অন্যতম কারণ। এই পানদোষের হ্রাস হওয়া দূরের কথা, প্রতি বৎসর ইহার বিস্ময়কর বৃদ্ধিই লক্ষিত হইতেছে; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এক প্রুসিয়া দেশে এক লক্ষ ষাট হাজার দোকানে মদ্য বিক্রয় হইত। ইহার পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে শৌণ্ডিকালয়ের সংখ্যা দুই লক্ষে পরিণত হইয়াছিল, এই কয় বৎসরে ইহার আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে, এরূপ আশা করা যায়। এই দেশের পুরুষ, স্ত্রী এবং বালকবালিকাগণ প্রত্যহ গড়ে ৪ গ্লাস হিসাবে মদ্যপান করে; অধিক কি, প্রায় সকল শ্রমজীবীই কোনও না কোনও শৌণ্ডিকালয়ের "মেম্বর"। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহারা স্ব স্ব আড্ডায় উপস্থিত হইয়া, ধূম ও মদ্যপান দ্বারা দৈনিক কঠোর শ্রমের লাঘব করে। এই বিবরণ কাহারও কাহারও নিকট অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মেরিওয়েদার সাহেব বলেন যে, জর্ম্মণীর শ্রমজীবীগণ সম্বৎসরে যত টাকা বাড়ীভাড়া দেয়, পানাসক্তির জন্য তাহাদিগকে তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীদের অবস্থাও অনেকটা এই প্রকার, এবং পল্লীগ্রামের যেখানে সেখানে মদের দোকান হওয়াতে, ইহারা উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ শৌণ্ডিকালয়ে দিয়া প্রায় রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া যায়; কিন্তু তথাপি আমাদের দেশে এই শ্রেণীর মধ্যে আজ পর্য্যন্তও মদ্যপান অন্নবস্ত্রের ন্যায় অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে নাই। কিন্তু জর্ম্মণ শ্রমজীবীবর্গ মদ্যকে বিলাসোপকরণ বলিয়া মনে করে না. ইহা তাহাদের নিকট অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহারা বিয়ার মদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে, এবং তাহাকে 'তরল খাদ্য' বলিয়া উল্লেখ করে।

জর্ম্মাণীর অন্তর্গত দক্ষিণ উর্টেম্বর্গ নগরে প্রায় সাত শত শ্রমজীবী প্রত্যহ ৬ ড়াই হাজার গ্লাস বিয়ার পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ এবং বালক-বালিকাগণ প্রত্যহ গড়ে সাড়ে তিন পাইণ্ট মদ্যপান করে। এক এক পাইণ্ট বিয়ারের মূল্য এক আনারও অধিক, অতএব পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, সামান্যঅবস্থাপন্ন শ্রমজীবীগণ মদ্যপানে তাহাদের উপার্জ্জিত সামান্য অর্থের কত অধিক অংশ অপব্যয় করে। যাহা হউক, ইহাদের এক প্রধান সুবিধা এই যে, জর্ম্মণীতে অতি সামান্য খরচেই, এমন কি, ইটালী অপেক্ষাও অল্প খরচে, জীবিকানির্ব্বাহ হয়। যে সকল শ্রমজীবী কলে কাজ করে, তাহাদের আহার ও বাসস্থানের জন্য যে বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে প্রত্যেকের প্রত্যহ আট আনা হিসাবে খরচ পড়ে। ইহাদিগকে প্রাতঃকালে দুই খণ্ড রুটী ও এক পেয়ালা কাফি দেওয়া হয়; মধ্যাহ্নে মাংস, মাংসের ঝোল, কাফি বা আলুর তরকারীর ব্যবস্থা আছে; সান্ধ্যভোজনবিধিও প্রাতঃকালের আহারের অনুরূপ। এখানে ঘরভাড়াও অধিক নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগানের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ছোট দো-মহল বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে; প্রত্যেক তলায় চারিটি করিয়া কক্ষ, দুইটি কক্ষের ভাড়া সপ্তাহে এক টাকার কিছু অধিক, কিন্তু সমস্ত বাড়ী ভাড়া লইতে হইলে সপ্তাহে আড়াই টাকা দিলেই চলে। দুইটির অধিক কক্ষ ভাড়া করিতে পারে এরূপ শ্রমজীবীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প; তবে বৃহৎপরিবারবিশিষ্ট সুনিপুণ কারিকরেরা কখন কখন চারিটি কক্ষ ভাড়া লইয়া থাকে; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রমজীবীর কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এরূপ লোক একটিও নাই।

প্রত্যুষে পাঁচটার সময় জর্ম্মাণ কারখানার কারিকরেরা শয্যাত্যাগ করে। অনন্তর কিঞ্চিৎ রুটী এবং কাফি দ্বারা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া, ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মস্থলে সমাগত হয়, বেলা ১১টা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে জলযোগের জন্য ছুটি পায়; এবং অপরাহ্নে চারিটার পূর্ব্বে এক গ্লাশ বিয়ার খাইয়া পরিতৃপ্ত হইবার জন্য আর একবার দশ মিনিটের জন্য অবসর পাইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন বেলা ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত, এই এক ঘণ্টা আহারের জন্য ইহাদিগকে ছুটী দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর সাতটার সময় কারখানাবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছুটী পাইলে ইহারা গৃহে ফিরিয়া আসে। সকলকে প্রত্যহ তের ঘণ্টা কারখানায় থাকিতে হয়, এবং তন্মধ্যে ১১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ইহাদিগের পরিশ্রম করিবার নিয়ম।

কথাপ্রসঙ্গে মেরিওয়েদার সাহেব ওগিঞ্জেন নগরের এক পাদুকানির্ম্মাতার কার্য্যবিবরণীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যক্তি দুইটি কক্ষবিশিষ্ট গৃহে সপরিবারে বাস করে। তাহার পাঁচটি পুত্রকন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, এবং কনিষ্ঠের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সাহেব তাহাদের আতিথ্য-গ্রহণ করিলে, রাত্রে তাহারা সকলে একটি কক্ষে শয়ন করিয়া, অন্যটি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। এইটি সেই পরিবারের রন্ধনশালা। পাদুকানির্ম্মাতার স্ত্রীর একখানি ক্ষুদ্র গাড়ী ও একটি বৃহৎ কুক্কুর আছে, কুকুরটিকে এক দিকে যুড়িয়া সে গাড়ীর অন্য দিক স্বহস্তে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, এবং তাহাতে দুগ্ধ বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। তাহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত আর সকলেই স্কুলে পড়ে; জ্যেষ্ঠটি তাহার পিতার কার্য্যে সহায়তা করে। সাহেব অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের বার্ষিক আয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ বিয়ার-ক্রয়ে ব্যয়িত হয়, ঘরভাড়া তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প। প্রাতঃকালে চর্ম্মকারপুত্র রুটি এবং কাফি দ্বারা অতিথিসৎকার করিল; মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, রুটী, আলু ও কপির তরকারী, বিয়ার, মাংস এবং পায়স, (ব্যয়বাহুল্যবশতঃ, প্রায় কোনও শ্রমজীবীই নিয়মিতরূপে এই শেষোক্ত ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন করিতে পারে না)। অনন্তর অপরাহ্ণ ৪টার সময় রুটী ও বিয়ারের দ্বারা অল্প জলযোগের যোগাড় হইয়াছিল; রাত্রি ৭টার সময়ে সান্ধ্যভোজন, কিন্তু এ সময় রুটী ও কাফি ভিন্ন অন্য কিছু প্রদত্ত হয় নাই। এই পরিবারের আহারাদির বন্দোবস্ত এইরূপ। কার্য্যদক্ষ, অবস্থাপন্ন প্রায় সকল জর্ম্মাণ শ্রমজীবীই এই নিয়মে আহারাদি করিয়া থাকে, কিন্তু যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী লবণ কিম্বা কয়লার খনিতে কাজ করে, তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দীর্ঘ দ্বাদশ ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে অন্ধকারময়, জলসিক্ত ভূগর্ভে পরিশ্রম করিতে হয়, দিবসে একটিবারও তাহারা সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না; রাত্রিকালেও তাহাদিগকে নৈশ অন্ধকারে একই প্রকার আর্দ্র এবং আলোকহীন অতিযৎসামান্য কুটীরে কালাতিপাত করিতে হয়। অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত সালবুর্গের নিকটস্থ কোনও খনিতে যে সকল লোক কাজ করে, তাহারা প্রত্যহ প্রায় দেড় টাকা হিসাবে পায়, এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিবারবর্গ সুতা কাটিয়া এবং বস্ত্রবয়ন পূর্ব্বক কিছু কিছু উপায় করে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জল-শোষণ।

আতপতাপে ও চঞ্চল বায়ুতে আর্দ্র বস্ত্রাদি শীঘ্র শুষ্ক হইতে দেখিয়া, আর্দ্র বস্তুর নিকটস্থ বায়ুরাশির উষ্ণতা ও তাহার ঘন ঘন সঞ্চালন, শুষ্ক হইবার প্রধান কারণ বলিয়া সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; শুষ্ক হইবার পক্ষে বায়ুর যে একান্ত আবশ্যক, তাহাও অনেকে স্থির করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড বা স্পঞ্জ যেমন কৈশিকার্ষণবলে জল শোষণ করিয়া থাকে, এবং তাহা সম্পূর্ণ জলসিক্ত হইলে যেমন অপর একখানি স্পঞ্জ দ্বারা জলশোষণ করিতে হয়, অবিকল সেই প্রকারে আর্দ্র বস্তুর নিকটস্থ বায়ুরাশি জলশোষণ করে, এবং বায়ু সম্পূর্ণ সিক্ত হইলে স্পঞ্জের ন্যায় ইহারও আর জলশোষণ-ক্ষমতা থাকে না—সেই জন্য কোনও আর্দ্র বস্তু আশু শুষ্ক করিতে হইলে, ইহার নিকটস্থ সিক্ত বায়ুরাশি ঘন ঘন স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। শুষ্ককরণকার্য্যে তাপের আবশ্যকতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহাঁরা বলেন,—তাপ দ্বারা বায়ু শুষ্ক হয়, এবং এই শুষ্কতাবৃদ্ধির সহিত ইহার জলশোষণক্ষমতারও বৃদ্ধি হয়।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি অতি সহজবোধ্য দেখিয়া এবং স্থূলদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে ইহার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই দেখিয়া, জলশোষণব্যাপারের এই সকল ব্যাখ্যা অভ্রান্ত ও সন্তোষজনক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তের যুক্তিগুলির সহিত বাষ্পোৎপাদনক্রিয়ার প্রকৃত কারণ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তটিকে একবারে ভ্রমসংকুল না বলুন, কিন্তু ইহা যে উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসাবিষয়ে সন্তোষজনক ও যথেষ্ট কারণ নয়, তাহা সকলেই অসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন। দুঃখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তকাদিতে জলশোষণক্রিয়ার কারণ বুঝাইতে গিয়া বিজ্ঞ গ্রন্থকারগণ ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিষয়টির আংশিক আলোচনা করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন, এবং প্রকারান্তরে সেই পুরাতন কথাটারই অবতারণা করিয়া ও স্থূল স্থূল ঘটনা দ্বারা তাহারই সত্যতা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়া, পাঠকগণকে বিষয়টি তলাইয়া বুঝিবার ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ প্রদান করেন নাই। তাপপরিমাণ সমান রাখিয়া বায়ুশূন্য স্থানে আর্দ্র পদার্থ অতি অল্প কাল মাত্র রক্ষিত হইলে সম্পূর্ণ শুষ্ক হইতে দেখা যায়,—বায়ুনিষ্কা-

শনযন্ত্রের সাহায্যে বা অন্য কোনও উপায়ে, স্থান কিঞ্চিৎ বায়ুশূন্য করিয়া, ইহা বেশ পরীক্ষা করিতে পারা যায়, এবং উচ্চ পর্ব্বতশিখরে অতি শীঘ্র বস্ত্রাদি শুষ্ক হওয়ায়, ইহার আর একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এইগুলি মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশে জল ফুটাইতে ২১২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ প্রদান করিতে হয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ৪২০০ হস্ত পরিমিত উচ্চ স্থানে ২০০ ডিগ্রি তাপ দিলেই যথেষ্ট হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কাজেই, এই সকল পরীক্ষার ফল সত্য বলিয়া মানিলে, ঘনবায়ুবিশিষ্ট স্থান অপেক্ষা, তরলবায়ুযুক্ত স্থানে অল্প তাপ দ্বারাই যে জল ফুটাইতে, অর্থাৎ বাষ্পে পরিণত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং, আর্দ্রীকৃত বস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর পরিমাণ যতই অল্প হইতে থাকিবে, ইহার জলও ততই শীঘ্র শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষাসিদ্ধ ঘটনাবলী দ্বারা, বায়ুর সহিত জলশোষণক্রিয়ার প্রকৃত সম্বন্ধ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, এবং শুষ্ককরণব্যাপারে বায়ু যে কোনও সহায়তাই করে না, বরং আর্দ্রবস্তুর দ্রুত শুষ্ক হওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তাহাও ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কোনও পদার্থ শুষ্ক করিতে হইলে, আমরা সাধারণতঃ ইহার জলীয়াংশ কোনও উপায়ে বাষ্পীভূত করিয়া দিই, এবং প্রায়ই ইহাতে তাপসংযোগ করিয়া, পদার্থের মুক্তাংশস্থ জল বাষ্পে পরিবর্ত্তিত করিয়া শুষ্ক করিয়া তুলি;—বায়ুচাপ বা চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর অবস্থাবৈচিত্র্য দ্বারা এই বাষ্পোৎপাদনকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে কোনও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, ইহা কেবল সঞ্চিত বাষ্পের স্থানান্তরকার্য্যে —অবস্থাবিশেষে—কথনও বাধা দেয়, কখনও বা সহায়তা করে মাত্র।

জলশোষণকার্য্যে, আর্দ্রপদার্থস্থ জলীয়াংশ বাষ্পীভূত হওয়া এবং উদ্গত বাষ্প স্থানান্তরিত করা,—এই দুইটিই সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। ইহার মধ্যে বাষ্পোৎপাদনকার্য্য একমাত্র উত্তাপ দ্বারা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; তাপসংযোগে জল কি প্রকারে বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে, বাষ্পসম্বন্ধীয় আধুনিক সিদ্ধান্তটির (Kinetic theory of gases) দুই এক কথা জানা আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তের প্রচারকেরা স্থির করিয়াছেন, জগতের সকল পদার্থই কতকগুলি অণুর সমষ্টিমাত্র, এবং এই সকল অণু পদার্থ-শরীরে নিবদ্ধ থাকিয়া

অধিক পরিমাণে গতিশীল থাকিয়া, পদার্থের অভ্যন্তরে স্ব স্ব স্থান সদাই পরিবর্তন করিতেছে। ইহাঁদের মতে, এই আণবিক গতিই তাপের একমাত্র কারণ, এবং পদার্থ-সকল অবস্থাতেই এই উপায়ে তাপোৎপাদন করিয়া থাকে। উত্তপ্ত তরল বস্তুর অণুসকলও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সবেগে নানা অংশে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, এবং এই গতির ন্যূনাধিক্য অনুসারে, ইহার তাপেরও নূন্যাতিরেক হয়; অর্থাৎ, তাপের বৃদ্ধি হইলে ইহার আণবিক গতিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদার্থের সকল অবস্থাতেই এই নিয়মে আণবিক গতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু অবস্থাভেদে মূল গতির অনেক বৈষম্য হয়,—তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হইবা মাত্র, ইহার প্রত্যেক অণুর গতি, পূর্ব্ব গতির পরিমাণ অপেক্ষা শত শত গুণ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং, জল ২১২ ডিগ্রি উত্তাপে বাষ্পীভূত হইলে, বাষ্পাণুর গতিপরিমাণ, জলাণুর গতি অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া দাঁড়াইবে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলিয়া মানিলে, এখন বাষ্পোৎপাদনপ্রক্রিয়া বুঝা অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জল উত্তপ্ত করিলে, ইহার আণবিকগতির উষ্ণতার সহিত বৃদ্ধি পাইয়া, প্রত্যেক অণুই সবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে, এবং কখনও কখনও দুই এক জলকণা জলের আভ্যন্তরীণসকল বাধাই তাহাদের গতি দ্বারা সহজে অতিক্রম করিয়া, ও জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, অল্পবাধাযুক্ত মুক্তাকাশে-পরিভ্রমণ-ইচ্ছায়, জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করে; জলের তাপ অল্প হইলে তাহাদের সকল প্রয়াসই বিফল হইয়া যায়, এবং জলরাশিমধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, দ্রুত গতিতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তাপ অধিক প্রযুক্ত হইলে, আণবিক গতি ক্রমেই বাড়িতে থাকে, এবং কেবলমাত্র ইহারই সাহায্যে অণুসকল আভ্যন্তরীণ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর পৃথক হইয়া, জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। জলকণা সকল এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে সঞ্চিত হইলে, আমরা তাহাদিগকে বাষ্প বলিয়া থাকি। জল এই প্রকারে অবস্থান্তরিত হইবা মাত্র, ইহা এককালে বাষ্পের সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইয়া বাষ্পসংমিশ্রণের (Diffusion of gases) নিয়মানুসারে ইতঃস্তত সঞ্চারিত হইতে থাকে। সুতরাং, ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, উদ্গত বাষ্পের পরিমাণের, পদার্থের আণবিকগতি অর্থাৎ ইহার আভ্যন্তরীণ উষ্ণতার সহিতই বিশেষ সম্বন্ধ, পার্শ্বস্থ বায়ুর গাঢ়তা বা বায়ুতাপের পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার কোনও রূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না—কিন্তু পরোক্ষভাবে বায়ু

বা অন্যান্য বাষ্পীয় পদার্থ দ্বারা দ্রুত বাষ্পোৎপাদনকার্য্যের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইতে দেখা যায়। কারণ, বায়ুচাপ দ্বারা সদ্যোজাত বাষ্পের সম্যক সংমিশ্রণ হয় না, এবং আরও উদ্গত বাষ্প জলের নিকটস্থ বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া গিয়া, বাষ্পোৎপাদনের অবসর কমাইয়া ফেলে। আণবিক গতির আধিক্য প্রযুক্ত যে সকল অণু জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহার সকলগুলিই বাষ্পাকার ধারণ করে না, অনেক জলাণু জল পরিত্যাগ করিবামাত্র বহিস্থ বায়ুকণা বা অপর বাষ্পের সহিত সবেগে মিলিত হইয়া, পুনঃপুনঃ ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা বিরুদ্ধগতিবিশিষ্ট হইয়া, জলে প্রবিষ্ট ও পুনরায় তরল পদার্থে পরিণত হয়। যে সকল অণু এই প্রকার নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া জল হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে, এবং পুনরায় জলপ্রবেশের কোনও অবসর পায় না, তাহাদিগকেই আমরা প্রকৃত বাষ্পাকারে দেখি।

এখন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—পদার্থস্থ তাপের ন্যূনাধিক্যবশতঃই, কখনও বিলম্বে, কখনও বা শীঘ্র, বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাপপ্রয়োগের প্রকারভেদ বা অন্য কোনও কারণে বাষ্পের পরিমাণ অল্পাধিক হয় না; সৌরতাপ দ্বারা যেটুকু বাষ্প উদ্গত হইবে, অন্য কোনও কৃত্রিম উপায়ে ঠিক সেই পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, বাষ্পও অবিকল সেই পরিমাণ উৎপন্ন হইবে। আর্দ্র বস্ত্র শীঘ্র শুষ্ক করিতে হইলে ইহার জলীয়াংশে তাপপ্রয়োগ সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, সিক্তপদার্থ সংলগ্ন বায়ুর ঘনসঞ্চালন প্রভৃতি ব্যবস্থা কেবল আড়ম্বরমাত্র। সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে, আর্দ্রীকৃত বস্ত্রাদি আশু শুষ্ক করিতে হইলে, বায়ুর আদৌ [illegible]কতা নাই। বায়ু উপস্থিত থাকিলে ইহা জলশোষণকার্য্যের সহায়তা করা দূরে থাকুক, দ্রুতশুষ্ককরণের পক্ষে বিশেষ বাধা প্রদান করে। সচরাচর বস্ত্রাদি শুষ্ক করিতে হইলে, সহজে এককালে বায়ু স্থানান্তরিত করা অসাধ্য এজন্য অনেকে আর্দ্রবস্ত্রর নিকটস্থ বায়ু ঘন ঘন স্থানান্তরিত করিয়া, জলশোষণকার্য্যে বায়ুর অনিষ্টকারিতার আংশিক হ্রাস করিয়া, সুফল লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সমাজ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দম্পতি-প্রণয়।

সুখের স্বপ্নের মত তারিণী বাবুর ছুটি ফুরাইল, তিনি পুনরায় বর্দ্ধমানে কার্য্যে যোগ দিলেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া নববধূটিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আবার অনিচ্ছুক বলদের মত ফিরিয়া বর্দ্ধমানে যাইয়া আপিসের ঘানিগাছে বাঁধা হইয়া ঘুরিতেন।

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তারিণী বাবুর কায করা আর পোষায় না। বয়সে শরীর দুর্ব্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়। কাযে সর্ব্বদাই ভুল হইত, সাহেবেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিতেন, নাজীর বাবুর পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইয়াছে, পেনশন লউক। অন্যান্য আমলাগণ কাণাকাণি করিত, নাজীর মশায়ের মন নূতন বৌয়ের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কাঁয করিবেন কিরূপে?

চাকরীর মায়া শীঘ্র ছাড়া যায় না,—অনেক গঞ্জনা সহ্য করিয়াও আরও এক বৎসর কায করিলেন, শেষে অগত্যা পেন্‌শন লইয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন। তখন গোপবালার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, যৌবনের কান্তিতে শরীর ফেটে পড়িতেছে, রূপে ঘর আলো করিয়াছে, গা ভরিয়া গহনা পরিয়া রূপাভিমানিনী গৃহিণী গৃহ জমকাইয়া বসিয়াছে! বার্দ্ধক্যে রূপতৃষার্ত্ত তারিণী বাবু মনে করিলেন "চাকুরির মুখে আগুন, এবার নববধূকে লইয়া জীবন সার্থক করিব।" নববধূ মনে করিলেন, "এবার বুড়ো মিন্‌সেকে ঘরে পাইলাম, নাকে দড়ী দিয়া ঘুরাইব, কর্ত্তাটি আর যাবেন কোথা?"

উমার মা রোগক্লিষ্টা, সংসার দেখিতে পারেন না, দু বেলা দু পেট খান, আর প্রায়ই আপনার ঘরে শুইয়া থাকেন। বিন্দু সর্ব্বদাই জেঠাইমাকে দেখিতে যাইত, কিন্তু নববধূ তাহাতে মুখ ভার করিতেন। লোকের কাছে বলিতেন, ওদের জাত গিয়াছে, ওদের আচার ব্যবহার ভাল নয়, উহারা ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে আমাদের নিন্দা হয়। যে নম্রমুখী দরিদ্র-বালিকা নগ্নাবস্থায় বিন্দুর উঠানে সে দিন খেলা করিতে আসিত, আর একটি সন্দেশের জন্য লালায়িত হইত, সে এখন বড় ঘরের গৃহিণী, সম্পর্কে গুরু! তাহার এই কথা শুনিয়া বিন্দু গোপনে হাসিলেন, জেঠাইমার বাড়ী যাওয়া আসা কতকটা বন্ধ করিলেন।

উমার মার একটি পুরাতন দাসী ছিল, সে শুশ্রূষা করিত। বড় সতীনের প্রতি দাসীর এত মায়া দেখিয়া নববধূ সে দাসীর প্রতি বিরক্ত হইলেন,—অভিমানে সুন্দর চক্ষে জল আনিয়া লাল ঠোঁট ফুলাইয়া কর্ত্তার কাছে লাগাইলেন,—আমার ঘর সংসারের কায চলে না, আমি খাটিয়া খাটিয়া হাড় কালী করিতেছি, আর দিদি গিদ্দে ঠেসান দিয়া শুইয়া থাকেন, তাহার দাসী না হইলে চলে না। তা দিদিকে নিয়েই থাক, দিদি সংসার চালান, আমি বাপের বাড়ী চলিলাম। বলা বাহুল্য, পুরাতন দাসী সেই দিনই বিদায় হইল। উমার মার মুখে জল দেয়, এমন একজন লোক রহিল না।

পড়সীর লোক সর্ব্বদাই উমার মার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিত, ছোটমার মেজাজ ও ভাব গতিক দেখিয়া তাহারাও আসা প্রায় বন্ধ করিল। উমার মার কাপড় চোপড় ও পূজা আচ্ছার খরচের জন্য তারিণী বাবু আলাদা কিছু টাকা মাসে মাসে দিতেন, নববধূর চক্ষে জল দেখিয়া তাহাও বন্ধ করিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও তারিণী বাবু নববধূর মন পাইলেন না। সুন্দরী গোপবালা স্বামীর নিকট সর্ব্বদাই বিমর্ষ, সর্ব্বদাই অভিমানিনী। যুবতী নারীর অভিমান অস্ত্রের প্রভাব, গোপবালা জানিতেন, বুদ্ধিমতী সুযোগ পাইয়া এখন বৃদ্ধকে সেই অস্ত্র জুড়িলেন!

বৃদ্ধ দেখিলেন,—বর্ত্তমানে সাহেবদের চাকুরি করা অপেক্ষা তরুণী ভার্য্যার পরিচর্য্যা বিষম কষ্ট! সে কার্য্যে বৃদ্ধ হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, তবু ত তরুণীর মন উঠে না, মান ভাঙ্গে না। নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার, নানাপ্রকার উপাদেয় বস্তু দিয়া সে রাঙ্গা চরণের সেবা করিতেন, তবু ত সে রাঙ্গা চরণের প্রসাদ পান না। তালুক থেকে তোড়া তোড়া টাকা এনে দেন, তরুণী টাকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন। জিজ্ঞাসা করিলে তরুণী কথা কহেন না, অথবা ঘোর অভিমানে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন,—তবু যে জিগ্‌গেস কর্‌লে এই আমার ভাগ্য! আমার প্রতি ত তোমার মায়া নেই,—মায়া দিদির প্রতি! আমি গরিবের মেয়ে, আমাকে তাচ্ছল্য কর্‌বে না ত কি। (ক্রন্দন)

বুড়ো চক্ষের জল মুছাইয়া বলিতেন,—সে কি, সে কি, তোমাকে মাথায় করে রাখিব,—তুমি কি আমার অযত্নের ধন? কি করিলে তুষ্ট হইবে বল, আমি এখনই করিতেছি।

বিনাইয়া বিনাইয়া নবানা বলিলেন,—তা আমি মেয়ে মানুষ, কি করিলে ভাল হয়, আমি কি-রকমে জানিব? ঐ চাটুর্য্যেদের বাড়ীর কর্ত্তাটি বুড়ো

ধ্রুব
সপ্তর্ষিমণ্ডল
শনি
বৃহস্পতি
অঙ্গারক
শুক্র
বুধ
চন্দ্র
সূর্য্য
পৃথিবী
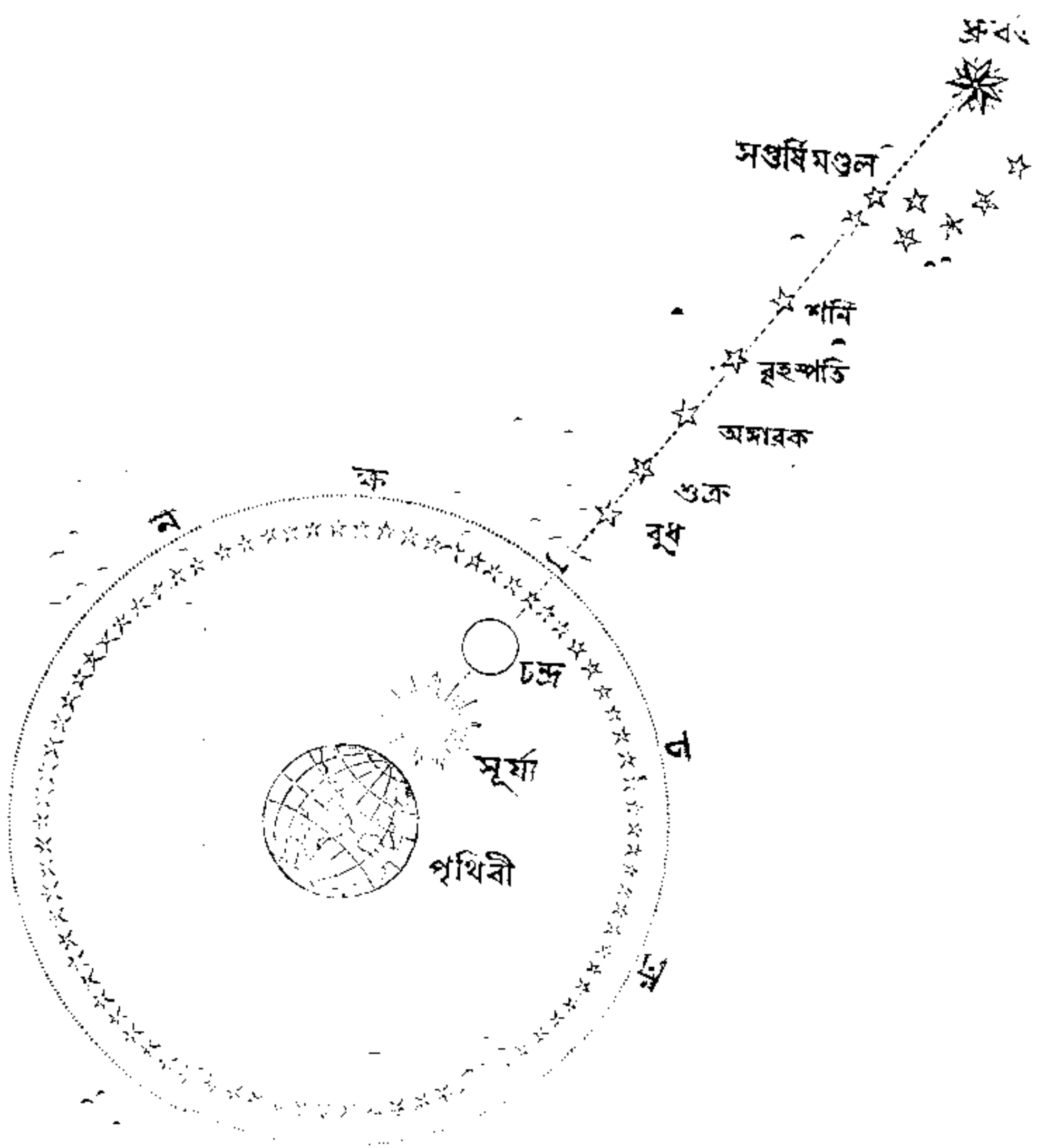
বয়সে আবার একটা বিয়ে করিয়াই কিছু দিন পর তাঁহার কাল হইল, ছোট মেয়েটাকে সতীনের হাতে ফেলে গেলেন। বড় সতীন তাকে উঠ্‌তে বস্‌তে গাল দেয়, দিবারাত্রি মজুরের মত খাটায়, দুবেলা খেতে দেয় না। ছোট বৌটি যেন মড়ার মত হয়ে গিয়েছে,—পথের কাঙ্গালীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াইতেছে। তা আমারও সেই দশা হবে। কেনই বা হবে না? কাঙ্গালীর ঘরে জন্ম, আমি পথে ভিক্ষা করিব না ত কে করিবে? (ক্রন্দন)

তারিণী বাবু। সে কি? উমার মার সাধ্য কি তোমাকে কিছু বলে?

গৃহিণী। হাঁ, উমার মার ত আমার প্রতি বড় মায়া! এখনই দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না,—এর পরে আমাকে কি আর আস্ত রাখ্‌বে? (ক্রন্দন)

এইরূপ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কাঁদাকাটী হইত, দিবারাত্রি অভিমান হইত, তারিণী বাবু আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। গৃহিণীর কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে, গৃহিণী ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংস্থান করিতে চাহে। এতটুকু মেয়ের পেটে এ বুদ্ধি কেমন করিয়া হইল, বুঝিতে পারিলেন না। তারিণী বাবু জানিতেন না যে, গৃহিণীর পরামর্শদাতা পরম বুদ্ধিমান্ গোকুলচন্দ্র ঘন ঘন বর্দ্ধমান হইতে আসা যাওয়া করিত, এবং গোপনে ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিত।

তরুণী ভার্য্যার তীব্র অভিমান ও অশ্রুজল দেখিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিতে পারে, এরূপ বীরপুরুষ সংসারে অল্প! তারিণী বাবুর মন ক্রমে টলিতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—আমার ভাল মন্দ হইলে কিছু বিষয় ছোট গৃহিণীর হাতে থাকে, এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া ভাল। উহাকে বিষয় দিব না ত কাহাকে দিব? সেই মাতাল জামাইটা শেষ কালে সমস্ত বিষয়টা কাড়িয়া লইবে? না, না, সে কথা নহে, আমার প্রাণের গোপবালাকে কিছু দিয়া যাইব। আর যদি ছোট গৃহিণী দ্বারা আমার পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে ত সেই পাইবে, মাকে দেওয়াও যা, ছেলেকে দেওয়াও তাই।

অনেক বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধ বর্দ্ধমানে গেলেন। তথায় উকিল মোক্তারদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রেজিষ্টরি আপিসে হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে একখানি দলীল লইয়া বাড়ী আসিলেন। এবং বাড়ীতে পঁহুছিয়াই নববধূর রাঙ্গা চরণে পূজা দিতে আসিলেন! হাস্যগদগদ স্বরে তরুণী ভার্য্যাকে সম্ভাষণ করিয়া দলীলখানা তাঁহার হস্তে দিলেন,—মনে করিলেন, এবার উড়া পাখী পিঞ্জরে পুরিলাম,—এ কুহকমন্ত্র এড়াইবার নহে, দেখিব মন গলে কি না গলে!

অভিমানিনী বধূ স্বামীর দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলও না!

তারিণী বাবু। বলি চুপ করে রৈলে যে?

বধূ। তবে কি করিব?

তারিণী বাবু। দলীল খানা কি জান?

বধূ। কেমন করে জানিব?

তারিণী বাবু। এখানা উইল।

বধূ। শুনিলাম।

তারিণী বাবু। বড় মূল্যবান্ দলীল।

বধূ। তোমার বাক্‌সে রাখিয়া দাও।

তারিণী বাবু। আমার ভাল মন্দ হইলে আমার বিজয়পুর তালুকখানি তোমারই হইবে।

বধূ। আমার চাই না।

তারিণী বাবু। সে কি? সে কি? এত অভিমান কিসের?

বধূ। অভিমান আবার কি? যে মানে রেখেছ, ঢের হয়েছে।

তারিণী বাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন! বধূ চক্ষু মুছিতে লাগিলেন!

তারিণী বাবু দলীল খানি জোর করিয়া বধূহস্তে দিলেন! বধূ দলীল খান খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রোধে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন!

রাত্রি হইয়াছে। ছোট গৃহিণী খান নাই, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছেন। তারিণী বাবুর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! বৃদ্ধ দ্বারদেশে কালীঘাটের কাঙ্গালির মত বসিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

এক ঘণ্টা মিনতির পর দরজা খুলিল,—

বধূ বলিলেন,—আবার হাড় জ্বালাইতে আসিয়াছ কেন?

তারিণী বাবু সেই রাঙ্গা চরণ দুইটি আপনার কলপ দেওয়া চুলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন,—কি অপরাধ করিয়াছি বল?

বধূ। অপরাধ আবার কি?

তারিণী বাবু। দলীল খানা ছিঁড়িলে কেন?

বধূ। কি দলিল?

তারিণী বাবু। আমার প্রধান তালুক খানি ত তোমাকে উইল করিয়া দিয়াছিলাম।

বধূ। আর সম্প্রতি যে জমিদারির অংশ কিনিয়াছ, সেটি বুঝি দিদিকে গোপনে দেওয়া হইবে? তা দিদি তোমার নয়নের তারা, দিদি তোমার মাথার

মণি,—দিদিকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যাও! আমি গরিবের মেয়ে, আমি তোমার চক্ষুর শূল হইয়াছি, আমাকে ভিখারীর মত তাড়াইয়া দাও, আমি গরিব মার কাছে চলিয়া যাই। লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া খাইব, তবু তোমার অন্ন আর খাইব না,—এ অপমান, এ লাঞ্ছনা, এ যাতনা আর সহ্য হয় না! (ক্রন্দন)

তারিণী বাবু বিস্মিত হইলেন! তিনি সম্প্রতি একটি জমিদারির অংশ নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা গৃহিণীদের বলেন নাই। সে কথা গোপবালাকে কে বলিল? নববধূ সেটিও চাহেন নাকি? সর্ব্বস্ব নববধূকে উইল করিয়া যাইলে উমার মার দশা কি হইবে? এইরূপ নানা চিন্তা তারিণী বাবুর হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল।

সেয়ানা মেয়ে গোপবালা স্বামীর মনের সন্দেহ বুঝিতে পারিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিল,—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পথের কাঙ্গালী হইব, পথে ভিক্ষা করিয়া খাইব। আমাতে তোমার বিশ্বাস নাই তখন আমি এ বাড়ীতে থাকিব না, গাছতলায় শুইয়া থাকিব। যাহার উপর বিশ্বাস আছে, সেই দিদির কাছে যাও,—আমাকে ছেড়ে দাও, আর দগ্ধ করিয়া মারিও না। রমণী আছাড় খাইয়া পড়িল,—বুঝি বা হিষ্টিরিয়া হয়,—বড়মানুষী ব্যারামটিও দরকারের সময় গোপবালার আসিত।

সে রাত্রির কথা অধিক বর্ণনায় আমরা অক্ষম। এক দিকে তারিণী বাবুর ভীষণ বিষয়কামনা, অন্য দিকে তরুণী ভার্য্যার ভয়ঙ্কর উপদ্রব,—আজি পথের ভিখারীও তারিণী বাবুর অবস্থা দেখিলে দুঃখিত হইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ঘন ঘন অশ্রুবাণ, অভিমানবাণ, ক্রন্দনবাণ, হিষ্টিরিয়াবাণ, আবার মিনতিবাণ, ভাল-বাসার বাণ দ্বারা বৃদ্ধের শরীর জর্জ্জরিত করিলেন। কখন তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন সাধ্যসাধনা, কখন বা মিনতি, কখন বা কত গল্প বলেন। কলিকাতার কত বড় মানুষ সমস্ত বিষয় স্ত্রীকে দিয়া গিয়াছেন, স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রী সুন্দররূপে সংসার চালাইতেছেন। নারী কি বিশ্বাসঘাতিনী? নারী কি স্বামীর সংসার, স্বামীর ঘর কখন অবহেলা করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? স্বামীর ঘর ভিন্ন নারীর কি অন্য ঘর এ জগতে আছে?

সমস্ত রাত্রি এইরূপ যুদ্ধ চলিল, প্রাতঃকালের প্রথম আলোকচ্ছটা পূর্ব্ব-দিকে দেখা দিল,—তখন বিষয়ী তারিণীবাবু পরাস্ত হইলেন। বলিলেন,—হৃদয়ের ধন! তোমাকে দিব না ত কাহাকে দিব,—আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে লিখিয়া দিব, তুমি বড় না আমার জমিদারি বড়?

সমরবিজয়িনী গোপবালা তখন নয়নের অশ্রু মুছিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া মাটী হইতে উঠাইয়া আপন পার্শ্বে স্থান দিলেন, এবং স্নেহগদ্গদ স্বরে বলিলেন,—"তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার জীবন! বিষয় কি তুচ্ছ,—তোমার স্নেহ পাইলে সবই পাইলাম।" তরুণীর চক্ষে জল, মনে মনে হাসি,—তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "মিত্রের ঘরের মেয়ে কেমন এতক্ষণে বুঝিলে? সে কি বুড়ো মিন্সের রূপ দেখে বিয়ে করেছিল? যার জন্য বিয়ে করেছিল, সে কায আজ উদ্ধার হইল।"

এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কায সমাধা হইয়া গেল। তারিণী বাবু আজীবন চাকুরী করিয়া ন্যায় ও অন্যায় মতে যে বিষয় করিয়াছিলেন,—পৈতৃক সম্পত্তি নিজে যাহা পাইয়াছিলেন,—বিন্দু ও সুধার বাপের কাছে যাহা ঠকাইয়া লইয়াছিলেন,—গ্রামের লোকের সঙ্গে মকদ্দমা মামলা করিয়া যাহা জিতিয়া লইয়াছিলেন,—বর্দ্ধমানে সময় সময় সরকারি নিলামে যাহা সস্তা পাইয়া কিনিয়াছিলেন, সে সমস্ত অদ্য তরুণী ভার্য্যাকে উইলপত্র দ্বারা লিখিয়া দিলেন! বৃদ্ধা শোকগ্রস্তা, চিরপীড়িতা উমার মাকে উদ্ধতা যুবতী সতীনের দয়ার উপর ভাসাইলেন,—ঘরের সন্তানের ন্যায় বিন্দুকে চির দারিদ্র্যে রাখিলেন!

উমার মা এ সংবাদ শুনিলেন, বুঝিলেন তিনি সপত্নীর ঘরে আশ্রিতা হইবেন, সপত্নীর অন্নে পালিতা থাকিবেন, সপত্নীর দাসী হইয়া পরিচর্য্যা করিবেন! মুমূর্ষু রোগীর এ মর্ম্মব্যথা অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না,—কয়েক দিনের মধ্যে রোগক্লিষ্টা, শোকবিদগ্ধা নারী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বিন্দু ও সুধা জেঠাইমার শেষ অবস্থায় অনেক সেবা করিলেন, মৃত জেঠাইমার গলা ধরিয়া উমাতারাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন!

তখন নববধূ মল্লিকবাড়ীতে জমকাইয়া বসিলেন। ক্রমে উইল-লিখিত সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই দখল করিতে লাগিলেন। তারিণী বাবুও তাহাতে আপত্তি করিলেন না, নববধূর কোনও কার্য্যে প্রতিরোধ করিতে তাঁহার সাহস হইয়া উঠিত না।

তারিণী বাবু পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন, লোকের সঙ্গে বিবাদ ঝগড়া করেন, গৃহস্থদের গালি দেন, পড়সীদের শাসন করেন,—আর বাড়ীতে আসিয়া ভিজে বেরালের মত আস্তে আস্তে লুকাইয়া থাকেন। সমস্ত বিষয় দিয়াও তরুণীর মন পাইলেন না, তরুণীর অভিমান ও দর্প ভাঙ্গিতে পারিলেন না।

বিষয়কার্য্য এখন গোপবালাই দেখেন,—তাঁহার মন্ত্রী গোকুলচন্দ্র! তারিণী

বাবু ছুই বেলা ছুই পেট খাইতে পান, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া থাকেন, অথবা উমার মা যে ঘরে মরিয়াছে, সেই ঘরে এক একবার যাইয়া ভাবেন। কেহ কেহ বলিত, উমার মার জন্য এত দিন পর শোক হইয়াছে। কেহ বলিত, ছুঃখিনী বিন্দুকে কিছু না দিয়া সমস্ত বিষয় গৃহিণীকে উইল করিয়া দিয়া বৃদ্ধের মনস্তাপ হইয়াছে। কেহ বলিত, তা নয়, তা নয়, বুড়োর ভীমরতি ধরিয়াছে!

তারিণী-বাবুর ভীমরতি ধরে নাই,—তিনি এখন সর্ব্বদাই পুরাতন কথা চিন্তা করিতেন,—এবং সেই চিন্তা করিতে করিতে মনে একটা মতলব স্থির করিতেছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তালপুখুরের ইতিহাস।

আমরা এতক্ষণ তারিণীবাবুর ইতিহাস লিখিতেছিলাম, কেন না, তারিণী বাবু তালপুখুরের মধ্যে বড়লোক, বড়লোকের কথা কি শীঘ্র শেষ হয়? তথাপি তালপুখুরে সামান্য অবস্থার লোকও বাস করিত, তাহাদের সম্বন্ধেও ছুই একটি কথা লেখা আবশ্যক।

বিন্দু চিরকালই দরিদ্র, কিন্তু এই দরিদ্র অবস্থাতেই সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত ও ছেলে ছুটিকে মানুষ করিত। মেয়ে সুশীলার বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর হয়েছে, দেখতে একটু কাহিল ও শ্যামবর্ণ, কিন্তু মেয়েটি সুশ্রী ও শান্ত, এবং মার মত চক্ষু ছুটি কাল, প্রশান্ত ও বড় সুন্দর। ছেলে সুবোধটির বয়স নয় বৎসর হইয়াছে, নিকটস্থ সনাতনবাটী গ্রামের ইংরাজিবিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যায়, এবং পিতার ন্যায় শান্ত। বিন্দুর আর সন্তান হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রায় গ্রামেই বাস করেন, জমীর চাস বাস দেখেন, আর বাড়ী বসিয়া ছুই একখানা বৈ পড়েন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বধর্ম্মে আস্থা ছিল, কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ে যে লেখাপড়া শিখি, তাহাতে আমাদের নিজের শাস্ত্রে কিছু শিক্ষা পাই না। হেমচন্দ্রের সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হইত।

এ বয়সে তিনি টোলে গিয়া শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যক্রমে শাস্ত্রশিক্ষার একটি সুযোগ ঘটিল। সনাতনবাটীতে সম্প্রতি রমাপ্রসাদ সরস্বতী নামে একজন বহুশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেক শিক্ষার্থী তাঁহার কাছে শাস্ত্র পাঠ করিতে যাইত, হেমচন্দ্রও পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর-বয়সে তাঁহার নিকট সংস্কৃতভাষায় কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিলেন, এবং সর্ব্বদা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্রের সহিত রমাপ্রসাদের বড়ই সৌহৃদ্য জন্মিল। রমাপ্রসাদের বয়স ৪৫ বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু বহুবৎসরাবধি কাশীধামে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করিয়াছেন, এবং পশ্চিমদেশের অনেক তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শরীর এখনও তেজঃপূর্ণ ও বলিষ্ঠ। তিনি মস্তকে জটাধারণ করিতেন, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়াছিলেন, হরিদ্র বসন পরিধান করিতেন, এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে শিক্ষাদান করিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার দেবীপ্রসাদ নামে পঞ্চদশ বৎসরের একটি সন্তান ছিল, সে পিতার সহিত পশ্চিমে অনেক ভ্রমণ করিয়াছে, পিতার ন্যায় তেজঃপূর্ণ ও উদারচেতা। সে এখন সনাতনবাটীর বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করে, এবং পিতার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। দেবীপ্রসাদ সুবোধকে বড় ভালবাসিত, সর্ব্বদা আপন গৃহে লইয়া যাইত, এবং তালপুখুরেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া সুবোধ ও সুশীলার সহিত খেলা করিত।

সুধা বিবাহের পর কয়েক বৎসর শরতের সঙ্গে কলিকাতায়ই বাস করিতেন, কখন কখন গ্রামে আসিতেন। শরচ্চন্দ্র একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন, পরে একটি উপযুক্ত চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিলেন। একবার ইচ্ছা হইল, বিলাতে যাইয়া বড় পরীক্ষা দিয়া ভাল চাকরী লইয়া আইসেন, কিন্তু শরতের সেরূপ আয় নাই যে, বিলাতে যাইয়া কয়েক বৎসর থাকেন। শুনিলেন, দেশেও ভাল পরীক্ষা দিতে পারিলে "ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সর্ভিস" প্রবেশ করিয়া উচ্চ কর্ম্ম পাওয়া যায়, সুতরাং সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান, উৎসাহী, কৃতবিদ্য লোক পরীক্ষায় ব্যর্থপ্রযত্ন হইলেন না। যে বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বৎসরই তালপুখুর গ্রামে সুধার একটি পুত্রসন্তান হইল। সুধা এটি সুলক্ষণ মনে করিয়া বড় স্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। খোকার মাসী বড় যত্নে খোকার শুশ্রূষা করিতেন এবং খোকার বাপ সহর্ষে পুত্রমুখ দেখিয়া চাকুরিস্থান পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি দুই বৎসর শরচ্চন্দ্র বিদেশে বিদেশেই রহিলেন, দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ী আসিতে পারেন নাই। স্বামীকে এত দিন ছাড়িয়া থাকা সুধার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল, গোপনে গোপনে কাঁদিতেন, দিদির কাছে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন, আবার পুত্রটিকে চুম্বন করিয়া অশ্রু মুছিতেন। এবার শরৎবাবু কার্য্যস্থানে সুধাকে লইয়া যাইবেন, এক্ষণে দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিতেছেন। আজ তাঁহার তালপুখুরে আসিবার কথা, সেই জন্য সুধা এত প্রফুল্লহৃদয়া হইয়াছেন,—সেই জন্য স্বামীসোহাগিনী সযত্নে বেশভূষা করিতেছেন!

বাদপ্রতিবাদ।

পৃচ্ছার আলোচনা।

বিগত চৈত্রমাসের সাহিত্যে "পৃচ্ছা" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধে "অনুসন্ধিৎসু" স্বাক্ষরকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ, বি-এ, এম্-বি, মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আর্য্যকন্যার বিবাহ কোন্ সময়ে অধিক প্রশস্ত, ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে, না তৎপরে?" আর্য্যশাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি পাওয়া যায়, তৎসমূহ একত্র সংগৃহীত হইলে, বিচার করিবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে বিবেচনায়, প্রশ্নকর্ত্তা গতবারে যথাসাধ্য শাস্ত্রমত সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরাও সেই উদ্দেশ্যে তৎসম্পর্কীয় আরও কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অনৃতুকা কন্যার বিবাহের স্বপক্ষে, অনুসন্ধিৎসু গতবারে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তা ছাড়া আরও কয়েকটি প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আবশ্যকবোধে এ স্থলে সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

ঋগ্বেদান্তর্গত আশ্বলায়নীয় গৃহ্যপরিশিষ্টে গর্ভাধানসংস্কারসম্পাদনার্থ প্রাজাপত্য হোমের বিধানকথনপ্রসঙ্গে,—

"অথর্ত্তুমত্যাঃ প্রাজাপত্যং, ঋতৌ প্রথমে অনুকূলেঽহনি সুস্নাতয়াম্বারব্ধঃ প্রাজাপত্যস্য স্থালীপাকস্য হুত্বা"—ইত্যাদি।

অনুবাদ,—"ঋতুমতী স্ত্রীর প্রাজাপত্যহোমের বিধান এই,—প্রথম ঋতুকালে [illegible] হইলে, অনুকূল দিবসে সুস্নাতা পত্নীর সহিত ভর্ত্তা প্রাজাপত্য চরুহোম করিয়া"—ইত্যাদি।

গর্ভাধানং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ঋতৌ প্রথম এবহি।—লঘু আশ্বলায়ন।

ঋতৌ তু প্রথমে কুর্য্যাৎ গর্ভাধানং দ্বিজোত্তম।—চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতি।

এখানে স্ত্রীর প্রথম ঋতুকালে পতিসহ প্রাজাপত্যহোমের ও গর্ভাধানের বিধান ব্যবস্থিত হওয়ায়, অপ্রাপ্তরজস্কার বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইতেছে। গোভিলগৃহ্যসূত্রেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। যথা,—

"যদর্ত্তুমতী ভবত্যুপরতশোণিতা তদা সম্ভবকালঃ।"

চন্দ্রমোহন বাবু এই বচনকে যৌবনবিবাহের সমর্থক মনে করেন। বস্তুতঃ উহা বাল্যবিবাহের স্বপক্ষেই সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কারণ, গোভিল ইহার দুই তিন সূত্র পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, শিষ্য গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক—

"—দারান্ কুর্ব্বীত।" ৩।৪।৩ "অসগোত্রান্।" ৩।৪।৪

"মাতুরসপিণ্ডান্।" ৩।৪।৫ "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা।" ৩।৪।৬

এখানে স্পষ্টতঃই অনৃতুমতী কন্যার বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু চন্দ্রমোহন বাবু এখানে "অনগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পাঠ বিশুদ্ধ নহে। ডাঃ ভাণ্ডারকর প্রভৃতি যাবতীয় কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ "নগ্নিকা" (১) পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকাতেও "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণও "নগ্নিকা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—

---

(১) যাবন্ন লজ্জাশালিনী কন্যা পুরুষসন্নিধৌ;

"যস্যা কন্যায়া ঋতুর্নাভবৎ অনৃতুকা, অথবা যাবৎ কুচহীনা নগ্না উলঙ্গাপি বিচরিতুং শক্নুয়াৎ সা নগ্নিকা "তু" এব "শ্রেষ্ঠা" প্রশস্যা দারকর্ম্মণি ইতিশেষঃ। প্রাপ্তায়াং অপ্রাপ্তযৌবনায়াং প্রাপ্তযৌবনা ন উদ্বাহেৎ ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ, "যে উলঙ্গভাবে বিচরণ করিতেও লজ্জা বোধ করে না, এরূপ অপয়োধরা ও অপ্রাপ্তযৌবনা অথবা অনৃতুকা কন্যা 'নগ্নিকা' পদবাচ্যা। এরূপ কন্যা বিবাহ করাই প্রশস্ত। এরূপ কন্যা পাওয়া গেলে প্রাপ্তযৌবনাকে বিবাহ করিবে না।" আমরা উক্ত বচনগুলি মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালা নানা পত্রিকায় ও পুস্তকে বাল্যবিবাহের স্বপক্ষ ও বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত দেখিয়াছি; সর্ব্বত্র "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" এই পাঠই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। চন্দ্র বাবু "অনগ্নিকা" পাঠ কোথায় পাইলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন কি? যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্যকেশি সূত্রে—

"অনুজ্ঞাতো ভার্য্যামুপযচ্ছেৎ সজাতানগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণীং।"

এখানে "সজাতাং নগ্নিকাং" এই ব্যাসবাক্য হইবে, অথবা "সজাতাং অনগ্নিকাং" এইরূপ হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। বৃত্তিকার মাতৃদত্ত "অনগ্নিকাং" পদ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু "অনগ্নিকা" অর্থে "আসন্নর্ত্তবা" করিয়াছেন।

যোন্যাদিনাবগূহেত তাবৎ ভবতি নগ্নিকা॥—বিব্রিওথিকা ইণ্ডিকা।

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, (পূর্ব্বে যৌবনবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও) সূত্র ও সূত্রপরিশিষ্টের রচনাকালে অনৃতুকাবিবাহ আর্য্যসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইতেছিল। গৌতম বলেন,—

"প্রদানং প্রাগৃতোরপ্রযচ্ছন্ দোষী (পিতা)। প্রাগ্বাসসঃ প্রতিপত্তিরিত্যেকে।"

"দদ্যাৎ গুণবতে কন্যাং নগ্নিকামেব শক্তিতঃ।"—যমঃ।

"অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।"—যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"পিতুর্গেহে তু যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং নাশৌচং কদাচিদপি শাম্যতি।"—শঙ্খঃ।

এখানে যে অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, নির্ণয়সিন্ধুকারের মতে সেটা অর্থবাদমাত্র।

"গৌরীং দদন্নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং রোহিণীং দদৎ।
কন্যাং দদৎ ব্রহ্মলোকং রৌরবন্তু রজস্বলাং।"—মরীচিঃ।

"কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।"

ইত্যাদি বচনে "অপি" শব্দের প্রয়োগ থাকায়, অনৃতুকার বিবাহই মনুর মতে সমধিক প্রশস্ত বোধ হইতেছে। কিন্তু আবার,—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যর্ত্তুমতী সতী।"

ইত্যাদি বচনও মনুতেই দৃষ্ট হয়। বসিষ্ঠ বলেন,—

"সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত। কুমারী ঋতুমতী ত্রীণি বর্ষাণ্যুপাসীত। ঊর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত তুল্যম্।

প্রযচ্ছন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥"

এই বিরোধের মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে, "অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ", এই যাজ্ঞবল্ক্যর উক্তি কি সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজ্য? আধুনিক সমাজ ইহার উত্তরে কি বলিবেন, জানি না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর বলেন,—

"এতদুক্তলক্ষণবরসম্ভবে বেদিতব্যম্। সতি গুণবদ্বরে তদ্দ্রষ্টব্যম্।"

অর্থাৎ, গুণবান্ বরপ্রাপ্তি সত্ত্বেও যদি পিতা (অধিক শুল্ক লোভে) কন্যা দান না করেন, তবে তিনি দোষী হইবেন। কিন্তু যদি পিতা চেষ্টা করিয়াও ঋতুকালের পূর্ব্বে উপযুক্ত বর যোগাড় করিয়া উঠিতে না পারেন, তবে তিনি ভ্রূণহত্যার ভাগী হইবেন না, এবং কন্যাও তিন বৎসর কাল পিতার অপেক্ষা করিয়া, পরে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে। এ কথাটি আমাদের দেশে সকলে বুঝেন না। কন্যা ঋতুমতী হইলেই পিতা দোষভাগী হইবেন বিবেচনায়, অনেকেই তাড়াতাড়ি করিয়া অপাত্রে কন্যা প্রদান পূর্ব্বক নানাপ্রকার সামাজিক অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মানবহিতচিকীর্ষু ঋষিগণের এরূপ অভিপ্রায় নহে। তাঁহারা বলেন,—

"ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতীং যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
স তুল্যং ভ্রূণহত্যায়ৈ দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্॥
ন যাচতে চেদেবং স্যাৎ যাচতে চেৎ পৃথক্ পৃথক্।
একৈকস্মিন্নৃতৌ দোষং পাতকং মনুরব্রবীৎ॥
ত্রীণিবর্ষাণ্যৃতুমতী কাংক্ষেত পিতৃশাসনম্।
ততশ্চতুর্থে বর্ষে তু বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥
অবিদ্যমানে সদৃশে গুণহীনমপি শ্রয়েৎ (২)॥"—বৌধায়নঃ।

"যাবচ্চ কন্যাং ঋতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যাঃ সকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥"—বশিষ্ঠঃ।

সুতরাং, পিতার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত বর না পাওয়া যায়, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও, তিন বৎসর পর্য্যন্ত অথবা তিন বৎসরের মধ্যে যতদিন বর না পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত, পিতা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে যখনই উপযুক্ত পাত্র পাইবেন, তখনই যদি কন্যা সম্প্রদান না করেন, তবে সেইদিন হইতে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন, সন্দেহ নাই। এতাবতা, শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি অনুসারে একবাক্যতা করিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, শাস্ত্রে যেখানে যেখানে "মাসি মাসি রজস্তস্যা পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং" ইত্যাদি অর্থবোধক বচনাবলী দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই এই অর্থে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, কন্যার সকামত্ব ও উপযুক্ত বরের সদ্ভাব সত্ত্বেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ দিতে বিলম্ব করেন, তবে তিনি দোষভাগী হইবেন। অত্রিকাশ্যপোক্ত "পিতুর্গেহেচ যা কন্যা" ইত্যাদি (সাহিত্য, চৈত্র, ৯৪০ ও ৯৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন) বচন ও পরাশরের "মাতা চৈব পিতা চৈব" ইত্যাদি বচনও এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। অন্ততঃ, মেধাতিথি, কল্লুক, মাধবাচার্য্য, বিজ্ঞানেশ্বর, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি মীমাংসকগণ এইরূপ মনে করেন।

এইরূপ একবাক্যতা দ্বারা শাস্ত্রসমূহের পরস্পর বিরোধ ও ব্যাঘাত দোষ নিরাকৃত হয়। ফল কথা, শাস্ত্রের এই সকল বাঁধাবাঁধি নিয়ম নগ্নিকাবিবাহের প্রশস্ততাপ্রমাণে যথেষ্ট কি না, সুধীবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

এখন কন্যার বিবাহকরণাধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রমত অনুসন্ধেয়। কেন না, বশিষ্ঠ, মনু ও বৌধায়ন, কন্যাকে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া, পরে স্বয়ং বিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম বলেন,—

"ত্রীনৃতূন্ কুমার্য্যতীত্য স্বয়ং যুজ্যেত।"

---

(২) এইরূপ স্বয়ংবিবাহিতা কন্যার যিনি পাণিগ্রহণ করেন, মনুর মতে তাঁহারও কোনও পাপ হয় না, কন্যারও কোনও পাপ হয় না (মনু ৯।৯১৯।

"ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরং।"—বিষ্ণুসংহিতা।

এই বিরোধমীমাংসার জন্য, পূর্ব্বোক্ত বসিষ্ঠ, বৌধায়ন ও বিজ্ঞানেশ্বরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, কন্যা বর কর্ত্তৃক যাচ্যমানা হইয়াও যদি যথাকালে সম্প্রদত্তা না হয়, তবে তিন ঋতু অপেক্ষা করিয়া সে স্বয়ংবরা হইতে পারিবে। কিন্তু যাচমান বরের অসদ্ভাবে, পিতার উপযুক্ত বরানুসন্ধানের প্রতীক্ষায় তিন বৎসর থাকিবে—পরে (চতুর্থ বর্ষে) স্বেচ্ছামত (সদৃশই হউক, অথবা হীনই হউক) বরে আত্মসমর্পণ করিবে। এই হইল শাস্ত্রানুসারে বিবাহকালের শেষ সীমা। এই সময়ের মধ্যে বিবাহ করিলে কোনও দোষ নাই। (১ চিহ্নিত পাদ টীকা দেখুন) কিন্তু যে কন্যা এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া ঋতুপ্রাপ্তির পর চতুর্থ বর্ষেও স্বয়ংবরা না হইবে, সে "বৃষলী" নামে অভিহিতা হইবে; এবং—

"যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোঽহ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥"

যে বিপ্র তাহার পাণিগ্রহণ করিবে, সে পতিত হইবে। ফলকথা, এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সীমার পূর্ব্বে বৃষলীত্বসিদ্ধি হয় না। এতৎপূর্ব্বে বৃষলীত্ব স্বীকার করিলে মনুর সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

এই নিমিত্ত মীমাংসকগণ সমস্ত স্মৃতির অর্থ মনুর অনুকূল করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত কালের পূর্ব্বে বৃষলীত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঋতুপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার স্বয়ংবরা হইবার অধিকার ত নাইই। ঋতুপ্রাপ্তির পরেও পিতার উপযুক্ত পাত্রানুসন্ধানের প্রতীক্ষায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় থাকা অধিকাংশ স্মৃতিকারের অভিপ্রেত। শাস্ত্রকারগণ বরানুসন্ধানের জন্য পিতাকে ঋতুর পরও তিন বৎসর সময় দিয়াছেন, এবং ঋতুর চতুর্থ বর্ষে কন্যাকে বিবাহবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ বরকন্যার কাহারও পক্ষেই মনুর মতে দোষাবহ বা পাতিত্যজনক নহে। বৌধায়নাদি কেহই ইহার দোষোল্লেখ করেন নাই।

সুতরাং ঋতুর পর বৎসরত্রয়ের মধ্যে বৃষলীত্ব সম্ভবে না। কাজেই বৃষলীসম্বন্ধীয় বচনগুলি অবস্থাবিশেষে ঋতুপ্রাপ্তির চতুর্থ বৎসরের পর প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যেখানে যাচ্যমান বরের অসদ্ভাবাদি কারণে শাস্ত্রানুসারে কন্যা ঋতুপ্রাপ্তির পর তিন বৎসর অবিবাহিতা থাকা দূষণীয় নহে, সেখানে ঋতুর চতুর্থ বৎসরে বা তাহার পর "বৃষলী"রূপে পরিগণিতা হইবে। আর যেখানে গুণবান্ বরের সদ্ভাবসত্ত্বেও যথাকালে কন্যা প্রদত্তা না হয়, সেখানে শাস্ত্রানুসারে তিন মাস অপেক্ষা করিয়া কন্যা যদি স্বয়ংবরা না হয়, তবে চতুর্থ মাস হইতে "বৃষলী" রূপে গণ্যা হইবে (৩)। এই সিদ্ধান্ত যেরূপ যুক্তিসঙ্গত, সেইরূপ সকল স্মৃতির সহিত অবিরোধী।

আর্য্যশাস্ত্রানুসারে বিবাহকালের শেষ সীমা কি, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন উহার প্রারম্ভ কোথায়, তাহা দেখিব। মহর্ষি সম্বর্ত্ত বলেন,—

"বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে।"

অর্থাৎ, আট বৎসরের কন্যারও বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু কন্যার অর্থাৎ দশমবর্ষাবধি রজো-

(৩) নতুবা পিতার দোষে অথবা যাচ্যমান বরের অসদ্ভাবে ঋতুকালের পূর্ব্বে বিবাহ না হইলে, পরাধীনা কন্যা (কেন না, শাস্ত্রানুসারে তখনও তাহার বিবাহ করিবার স্বাধীনতা নাই) "বৃষলী"রূপে পরিত্যক্তা হইবে কেন? তবে শাস্ত্রানুসারে কন্যা যখন বিবাহবিষয়ে স্বাধীন, তখন যদি সে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বিবাহ না করে, তবে অবশ্যই সে দোষভাগিনী, অর্থাৎ বৃষলী হইতে পারে।

দর্শনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত। (অষ্টমবর্ষায়াঃ বিবাহঃ (শক্যঃ) তু কন্যায়াঃ (বিবাহঃ) প্রশস্ততে। এইরূপ অন্বয় হইবে)।

মহর্ষি সম্বর্ত্ত ইহার এক শ্লোক পূর্ব্বে—

"দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রজস্বলা।"

(দশমবর্ষে কন্যকাবস্থাপ্রাপ্তি ও কন্যকাবস্থার পর রজস্বলা। অর্থাৎ, দশম বর্ষের পর ও রজোদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাপন্না বালিকা কন্যা নামে অভিহিতা)।

ইত্যাদি বচনের দ্বারা কন্যা শব্দের পারিভাষিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন ও মরীচি, আশ্বলায়ন প্রভৃতি তাহার সমর্থন ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, আমরা সম্বর্ত্ত-বচনের উক্তবিধ অন্বয় করিয়াছি। দশ বৎসরের পূর্ব্বে আর্য্যকন্যার বিবাহ প্রশস্ত নহে, এবং কালধর্ম্মবক্তা পরাশরের মতে, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনৃতুকা কন্যার বিবাহ অপ্রশস্ত নহে।

"সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।"

ইত্যাদি বচনটি কোন্ স্মৃতি হইতে গৃহীত, তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু, নির্ণয়সিন্ধুতেও এই বচনটি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়, এবং সেখানে গ্রন্থকার ইহাকে স্পষ্টতঃ মহাভারতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, স্মৃতিগ্রন্থের অনেক শ্লোক মহাভারতে ও মহাভারতের কোনও কোনও শ্লোক স্মৃতিগ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং, উক্ত বচনটি নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে কি না, (বিশেষতঃ সম্বর্ত্তসংহিতার সহিত যখন উহার ঐক্য আছে, তখন) তাহাও সুধীগণের বিচার্য্য।

মহাভারত হইতে রঘুনন্দন যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, ও তৎসম্বন্ধে চন্দ্রমোহন বাবু যাহা বলিয়াছেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, মহারাষ্ট্র দেশেও উক্ত বচনের—

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"

এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। সুতরাং, "নগ্নিকা" পাঠের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? "অনগ্নিকা" পাঠ গ্রহণ করিলে,—

"মহদ্দোষঃ স্পৃশেদেনমন্যথৈষ বিধিঃ সতাং।"

মহাভারতের এই উক্তিটি প্রায় সমস্ত স্মৃতি এবং আশ্বলায়ন ও গোভিল প্রভৃতি সূত্রকারগণের অভিপ্রায়ের বিরোধী হইয়া পড়ে।

লেখক ৯৪৪ পৃষ্ঠায় গোভিলীয় গৃহ্যপরিশিষ্টের "তাং প্রযচ্ছেদনগ্নিকাং" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিয়াছেন,—'সেই অনগ্নিকাই প্রদান করিবে।' লেখক "অনগ্নিকাকেই" কোথায় পাইলেন? টীকাকার (সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়) বলেন,—

"তাং কন্যামনগ্নিকামৃতুমতীমপি দদ্যাৎ।"

অর্থাৎ, সেই ঋতুমতী অনগ্নিকাকেও প্রদান করিবে। অনুসন্ধিৎসু যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে অনগ্নিকা বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ মূলে সেরূপ কোনও ভাব নাই। কিন্তু এখানে আরও একটু বক্তব্য আছে। বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকায় প্রকাশিত গোভিলসূত্রের ভাষ্যে, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার "তাং প্রযচ্ছেত্তু নগ্নিকাং" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদনুসারে নগ্নিকার বিবাহই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। এই পাঠ স্বীকার করিলে গোভিলের সহিত গোভিলপুত্রের আর কোনও বিরোধই থাকে না। তার পর লেখক—

অভুক্তাং চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকান্ন প্রশস্যতে।

এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ পাঠ আমরা কোথাও দেখি নাই। গোভিল বলেন,—

"নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা"। সুতরাং চন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত "কন্যকান্ন প্রশস্যতে" এই পাঠ গোভিলের বিরোধী হইতেছে। প্রচলিত পাঠ এই,—"কন্যকাং তু প্রশস্যতে।" বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকাতেও এই পাঠ আছে। এই পাঠ গোভিলোক্তির সহিত অবিরোধী। সুতরাং বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি দেখি না। চন্দ্রমোহন বাবু এই সব স্বমতপরিপোষক নূতন পাঠ কোথায় পাইলেন, আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি?

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

গ্রহণ।

গত মাসের সাহিত্যে "গ্রহণ" সম্বন্ধে যে বাদপ্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে অপূর্ব্ব বাবুর 'উত্তর' সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে।

১। তিনি প্রথমেই কয়েকটি যুক্তি দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা সম্ভবপর হয় না," কিন্তু দুঃখের কথা, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাহা প্রমাণিত হয় না। এই কয়টি কারণে গ্রহণসীমা সঙ্কীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, শুধু ইহার দ্বারা কিরূপে প্রমাণ হইল, বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ সম্ভব নয়, তাহা বুঝিলাম না। তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে, গ্রহণসীমার সঙ্কীর্ণতা গণনা করিলে, সূর্য্যচন্দ্র পৃথিবীর আমরা যে কোনও combination লই না কেন, তাহাতেই দুইটির অতিরিক্ত চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবার কালে গ্রহণসীমা অতিক্রান্ত হয়। মনে করুন, আমি যে অবস্থাটি লইয়াছিলাম, সূর্য্য প্রথম কক্ষপাতে আসিবার দুই দিবস পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণ ঘটিল, ইহাতে তাঁহার দেখান উচিত ছিল যে, প্রথম কক্ষপাত সূর্য্য পুনর্ব্বার অতিক্রম করিবার সময় যে চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে, সেটি ঘটা সম্ভব নয়। ইহা দেখান হইয়াছে যে, সূর্য্যের প্রথম কক্ষপাত দ্বিতীয়বার অতিক্রমণের ৬ দিবস পরে এই চন্দ্রগ্রহণটি হইবে। এখন দেখা যাউক, এই ৬ দিন পরে সূর্য্য এবং চন্দ্রের কক্ষপাত হইতে দূরতা কত। সূর্য্যের কক্ষপাত হইতে অপসরণ প্রতি দিনে ১°২′১৯″, অতএব ছয় দিনে কক্ষপাত হইতে তাহার দূরত্ব ৬°১৩′৫৪″। চন্দ্র ও সূর্য্য oppositionএ আছে, অতএব ক্রান্তিবৃত্ত দিয়া মাপিলে চন্দ্রেরও তন্নিকটস্থ কক্ষপাত হইতে দূরত্ব ৬°১৩′৫৪″, এবং ধরাকক্ষের সহিত চন্দ্রকক্ষের বক্রতা ৫°৯′ মনে রাখিয়া গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, চন্দ্রের নিকটস্থ পাত হইতে প্রকৃত দূরতা প্রায় ৬°১৬′। এখন অপূর্ব্ব বাবুর নিজের মতে, যে সীমার মধ্যে থাকিলে নিশ্চয়ই চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে, ইহা সেই সীমার মধ্যে পড়িয়াছে, সুতরাং এই অবস্থায় চন্দ্রগ্রহণ নিশ্চিত। অপর দুইবারে (প্রথম এবং দ্বিতীয় কক্ষপাতে সূর্য্য আসিলে) যে দুইটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে, অপূর্ব্ব বাবু স্বয়ং তাহা দেখাইয়াছেন। অতএব যদি চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীর এরূপ combination কখনও হয়, তাহা হইলে সেবার এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনের কমেই তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটিবে। এখন কথা এই যে, তিনটিকে একই অব্দের মধ্যে পূরিতে হইলে প্রথমটির জানুয়ারির প্রথমেই হওয়া চাই, এবং তাহা হইলে শেষেরটি ডিসেম্বরের শেষভাগে হইবে। এইখানেই গোলযোগ, এরূপ ঘটনা সচরাচর হয় না, কিন্তু মোটেই যে হইতে পারে না, এমন কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। সত্য, বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে আমার 'প্রতিজ্ঞা'র বড় ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য ছিল যে, এরূপ ঘটাটা একেবারে অসম্ভব নয়, অন্ততঃ সূর্য্যচন্দ্রের গতি এবং ক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিলে বলা যায় না, এরূপ ঘটা একেবারে অসম্ভব। যদি ইহার প্রতিপোষক একটি দৃষ্টান্তও না থাকিত,

একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটে না, ইহা একটা general rule হইতে পারে, কিন্তু gravityর মত ইহা একটা natural law নহে। পরিশেষে একটা কথা বলা উচিত, Godfrey এবং P. T. Mainএর Astronomy দুখানিতেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা সম্ভব," এবং অবশিষ্ট যে গ্রন্থগুলি আমি দেখিয়াছি, তাহাতে এমন কথা পাই নাই যে, বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ ঘটা অসম্ভব।

২। অপূর্ব্ব বাবু বলেন, "যে ঘটনা সচরাচর ঘটে, তাহার বর্ণনাতে কবিত্ব অনুভব করা আমাদের ন্যায় একান্ত গদ্যপরায়ণ লোকের পক্ষে অসম্ভব।" এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে চাহি না, ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, চন্দ্র প্রায় প্রত্যহই উঠে, পূর্ণিমাও সচরাচর ঘটে, নীল আকাশ চিরকালই মাথার উপর বিরাজ করিতেছে, গিরিতলে সন্ধ্যানিলবিধূত, ক্ষুদ্র-নদীটির মর্ম্মরধ্বনিরও বড় একটা অসদ্ভাব নাই, অথচ এ সকলই চিরকাল সমানভাবে কবি-রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছে, এবং বহুকাল হইতে মনুর সন্তানদিগকে (অস্বীকৃত হইলেও) বিশুদ্ধ আনন্দ দিয়াছে। আষাঢ়ের ঘনবর্ষা এবং মেঘের মন্দ্রস্নিগ্ধ স্তনিত বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভাব-প্রবাহ তুলিয়াছিল, আজিও প্রত্যেক নরনারী এবং বালকবালিকার হৃদয়ে তাহা অপেক্ষা কম অব্যক্ত আনন্দপূর্ণ ভাবরাশির উদ্রেক করে না।

৩। সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসাবস্থা আমি বলিয়াছিলাম, ৪′ কালস্থায়ী হয়। অপূর্ব্ব বাবু একটি উদাহরণ দিয়াছেন, পূর্ণগ্রাসাবস্থা ৪॥০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত ছিল। হইতে পারে, আমি ততটা নির্ভুল হইতে পারি নাই। কিন্তু ইহা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, এ সব গণনায় একে-বারে নির্ভুল হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, সূর্য্যের লম্বন (parallax) প্রভৃতির পরিমাণসম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া অসম্ভব।

৪। ইহার পরে অপূর্ব্ব বাবু একটা গোলযোগ করিয়াছেন। "চন্দ্রগ্রহণ প্রায় ১০ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইতে দেখা গিয়াছে," এখানে তিনি পূর্ণগ্রাস অথবা আংশিক গ্রাস, ইহাদের কোন্‌টির কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাহার পরেই বলিতেছেন, "এক গ্রীষ্মকালীয় রজনীতে এরূপ একটি গ্রহণ ঘটিলে সমস্ত রজনী অন্ধকারে কাটাইতে হইবে," ইহা হইতে মনে হয়, তিনি পূর্ণগ্রাসের কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা নয়, কারণ আংশিক গ্রাস ১০ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইলেও পূর্ণগ্রাসের স্থিতিকাল প্রায় ২ ঘণ্টা মাত্র। পৃথিবীর ছায়াসূচির সহিত চন্দ্র-কক্ষের যেখানে সম্পাত হইয়াছে, সেখানে এই বৃত্তসূচির একটা section লইলে তাহার ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের প্রায় তিনগুণ হইবে, এবং চন্দ্র তাহার ব্যাসপরিমিত স্থান প্রায় এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে, সুতরাং চন্দ্রের এই ছায়া অতিক্রম করিতে প্রায় ২ ঘণ্টা লাগিবে *। এইরূপ মোটামুটি গণনা হইতেও জানা যায়, চন্দ্রের পূর্ণগ্রাসাবস্থা প্রায় ২ ঘণ্টা মাত্র। অতএব অপূর্ব্ব বাবুর অনুমানটি ঠিক নয়।

৫। "মুরলী বাবুর টীকাটি একান্ত ভ্রমাত্মক হইয়াছে।" আমি ইহা স্বীকার করি, এবং অপূর্ব্ব বাবুর নিকট সে জন্য কৃতজ্ঞ রহিয়াছি, কারণ তিনি না দেখাইয়া দিলে হয় ত ভুলটি সহজে ধরা পড়িত না। যদিও অপ্রাসঙ্গিক, তবুও কে ; এ ভুলটি হইয়াছিল—বলিব, পাঠক ক্ষমা করিবেন। এই footnoteটি আমি Lardner কৃত Handbook of Astronomy নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলাম, তাহাতেই ঐ ভুলটি ছিল (বোধ হয় misprint), এবং নিজে পুনর্ব্বার গণনা না করিয়াই তুলিয়া দিয়াছিলাম, কাজেই ভুলটিও অজ্ঞাতে আমাতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। যাহা হউক, ভুলটি আমার প্রসঙ্গের মোটেই অন্তরায় হয় নাই। আমি বলিয়া-

* Vide Encyclopædia Britannica, Vol. IV art. astronomy, pp. 7 and 10.

ছিলাম, "সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস অতি অল্পপরিমিত স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে," ইহাই আমার বিষয় ছিল। এখন এই স্থানটির ব্যাস (অপূর্ব্ব বাবুর গণনানুসারে) যদি ১৬৭ মাইলই ধরা যায়, তাহা হইলেও ইহার ক্ষেত্রপরিমাণ অতি ক্ষুদ্র হইবে, বাঙ্গালার * তৃতীয়াংশের কিঞ্চিৎ বেশী হইবে মাত্র। ইহা হইতেই দেখা যাইবে, সমগ্র পৃথিবীর সহিত তুলনায় অথবা পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের সহিত তুলনায় (কারণ অর্দ্ধাংশ হইতেই সূর্য্য একেবারে দেখা যায়), যে স্থান হইতে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দেখা যায়, সে স্থানটি বড়ই ক্ষুদ্র। আরও বলা উচিত যে, এটা ঊর্দ্ধ সীমা।

৬। তাহার পরে তিনি যে উপছায়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কারণ আমার বিষয় ছিল, পূর্ণগ্রাসের কথা, সূর্য্যের আংশিক অথবা অঙ্গুরীয়াকার (annular) গ্রাসের আমি উল্লেখই করি নাই, এবং করিবার আবশ্যকও দেখি নাই।

৭। ইহার পরে অপূর্ব্ব বাবু এক ভুলে পড়িয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "এই সকল গণনাতে মধ্যাহ্নকালকে গ্রহণসময় বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নয়। এই সব গণনায় ধরা হইয়াছিল যে, গ্রহণকালে চন্দ্র পাতে অবস্থান করিতেছে, এবং সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী এক রেখায় আছে। ১৬৭ মাইল ব্যাসের বৃত্তটির সর্ব্বত্রই যে মধ্যাহ্ন কাল, অর্থাৎ সমুদায় বৃত্তটির ক্ষেত্র যে এক Meridianএ অবস্থিত, ইহা বোধ হয় অপূর্ব্ব বাবু স্বীকার করিবেন না।

৮। তৎপরে ধরাপৃষ্ঠ কর্ত্তৃক ছায়া-মঠের তির্য্যকচ্ছেদনের কথা। আমি যখন লিখিয়াছিলাম, কথাটা তখন আমার মনে ছিল, তবে ইহাতে ক্ষেত্রপরিসরের বৃদ্ধি হইলেও এত বৃদ্ধি হইবে না যে, আমার প্রসঙ্গের কিছু বাধা হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াই কথাটার উল্লেখ করি নাই।

৯। "সমসূত্রস্থের" কথা। অপূর্ব্ব বাবু যাহাই বুঝুন, আমরা কিন্তু তিনটি গোলক অথবা ball এক রেখায় অবস্থিত বলিলে সাধারণতঃ ইহাই বুঝি যে, তাহাদের কেন্দ্র তিনটি এক রেখায় আছে। কথাটার ইহাই সাধারণ অর্থ, এবং বোধ হয়, সেই জন্যই আমিও প্রথমে উহাই বুঝিয়াছিলাম। তবে এক্ষণে অপূর্ব্ব বাবু যখন ভিন্নরূপ বুঝাইতেছেন, তখন ইহা ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই।

উপসংহারে অপূর্ব্ব বাবুর নিকট নিবেদন, তিনি আমার প্রতি যেরূপ সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়, এবং সে জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। আমার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আমি মনে করি যে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সাধারণের জন্য লিখিত হইলেও নির্ভুল হওয়া উচিত, এবং সচরাচর popular articleএর যে একটা দুর্নাম আছে, তাহার সংশোধন হওয়া উচিত। অপূর্ব্ব বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য লোক যে সাধারণের শিক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, এবং ভরসা করি, তিনি তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধাবলী দ্বারা উত্তরোত্তর আমাদের জ্ঞানোন্নতি এবং আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীমুরলীধর রায়চৌধুরী।

---

* The total area for Bengal Proper (including the Presidency, Burdwan Rajshahi, Dacca and Chittagong divisions only) is given by Hunter in the Imperial Gazetter as 70430 sq. miles; and the area in question is about 2[illegible]00 sq. miles.

প্রত্যুত্তর।

মুরলী বাবুর প্রতিবাদের বিশেষ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইতেছে না; কেবল ইহা বলা যায় যে, General rule কখনও Natural law না হইতে পারে, কিন্তু তাহা Natural lawএর first approximation মাত্র। Godfrey এবং Mainকে আদর্শ করিয়া আমি কোনও কথা বলিতে সাহস পাই না, এবং সাধারণের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে হইলে যে সকল General rule প্রাকৃতিক বিধানের first approximation মাত্র, তাহাই আমি অগ্রে বুঝাইবার চেষ্টা করি। সেই জন্যই আমি ৩৬৫.২৪২২১৬ দিবসে বৎসর না বলিয়া প্রথমে ৩৬৫ ও তৎপর ৩৬৫¼ দিবসে বৎসর গণনা করিয়া থাকি; এবং সেই একই কারণে গ্রহদিগের কক্ষকে ক্ষেত্রজ্যামিতির একটি সম্পূর্ণ অনায়ত্ত ক্ষেত্র না বলিয়া, "বৃত্তাভাসাকার" (Elliptical) বলিয়া থাকি। এই সকল উক্তি মাধ্যাকর্ষণের বিধানবহির্ভূত এবং ভ্রমাত্মক হইলেও, প্রাকৃতিক বিধানের "সংক্ষেপ"। সাধারণ নিয়মে বৎসরে তিনটি চন্দ্রগ্রহণ দেখা সম্ভবপর নহে, ইহার প্রমাণ মুরলী বাবুর পক্ষে সহজবোধ্য হইলেও, সাধারণের পক্ষে তাহা হইবে না বোধে, আমি এ স্থলে তাহা দর্শাইতে অক্ষম। মুরলী বাবু ইচ্ছা করিলে ইহার বিচার জন্য Watson's Theoretical Astronomy পাঠ করিতে পারেন।

আরও একটি কথা,—সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের স্থায়িত্বকাল অক্ষাংশানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়; লণ্ডনের অক্ষাংশে (Latitude) ৪ মিনিট, কলিকাতার অক্ষাংশে ৭ মিনিট, এবং নিরক্ষ বৃত্তোপরি ৮৷৷০ মিনিট পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে; এই উক্তি সম্পূর্ণ "নির্ভুল" না হইলেও মুরলী বাবুর উক্তি হইতে অধিকতর নির্ভুল বলা যায়। অপর সকল কথার উত্তর এক্ষণে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

পাঁচ ফুলের সাজি।

দৃগ্‌ভ্রম।—মেঘহীন সন্ধ্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে, তারকাখচিত নীল আকাশমণ্ডল আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। বোধ হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, আকাশমণ্ডলের প্রান্তভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রতীতি জন্মে, আমাদের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত আকাশভাগ গোলার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, আকাশগোলকের অস্তিত্বই যে আমাদের কল্পনাসম্ভূত, সে সম্বন্ধে বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি এই একই গোলকের তলদেশে (surface) অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, তাহাদের পৃথিবী হইতে দূরত্ব অতিশয় বিভিন্ন। কোনওটা অপরটা হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থান করিতেছে। তার পর, দৃষ্টিমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী আকাশভাগ যে বেশী দূরে বলিয়া মনে হয়, সেও আমাদের একটা দৃগ্‌ভ্রম মাত্র। খুব সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই;—Horizonএর নিকটবর্ত্তী গ্রহতারাদি দেখিতে হইলে বায়ুমণ্ডলের অনেকটা বেশী অংশ ভেদ করিয়া দেখিতে হয়, তাহাতে বায়ু Horizon স্থিত পিণ্ডসমূহের

কিরণমালা শীর্ষস্থ গ্রহতারাদির অপেক্ষা অধিকপরিমাণে আত্মস্থ (absorb) করে, এবং সেই জন্য তাহারা কতকটা অস্পষ্ট ভাব পায়, আমাদের পরিচিত এবং সহজগম্য জিনিসের মধ্যে—আমরা জানি—দূরতাই অস্পষ্টতার কারণ, সেই জন্য আকাশের প্রান্তভাগকে আমরা সুদূরতর বলিয়া মনে করি।

***

আরও একটি বিস্ময়কর দৃগ্‌ভ্রমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিশাকালে খতল নিরীক্ষণ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, দুইটি নিকটস্থ নক্ষত্রের দূরত্ব, যতই তাহারা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, ততই কমিয়া যায় বলিয়া ভ্রম হয়। আবার সদ্য-উদিত পূর্ণচন্দ্রকে কত বড় দেখি, এবং তাহাই আবার ঊর্দ্ধে উঠিলে কত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করি। এ দুইটি একই ভ্রমের দুইটি উদাহরণ মাত্র। আমরা মনে করি, চন্দ্র যেন আমাদের বেষ্টনকারী খগোলে আবদ্ধ আছে, কখনও তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। এই জন্যই চন্দ্র যখন দৃঙ্‌মণ্ডলের নিকটে থাকে, তখন খগোলকের—আমাদের অনুমানে—দূরতর অংশেই থাকে, এবং ক্রমশঃ যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, ততই আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়। চন্দ্রের ব্যাসের দুই প্রান্তবিন্দু এবং আমাদের চক্ষু দিয়া যদি দুইটি সরল রেখা টানা যায়, তাহাদের মধ্যগত কোণকে চন্দ্রের "দৃশ্যমান ব্যাস" (apparent diameter) বলা যাইতে পারে। এখন যদি আমরা মনে রাখি যে, চন্দ্রের প্রকৃত আয়তনের কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই, তাহা হইলে আমরা স্বভাবতঃই আশা করিতে পারি যে, চন্দ্র যতই নিকটে আসিবে, ততই এই কোণটিও বড় হইবে। কিন্তু আশা করিলে কি হয়, এই কোণ প্রায়ই অপরিবর্ত্তিতই থাকে, সুতরাং পূর্ণচন্দ্র যখন আকাশের প্রান্তে থাকে, তখন তাহার আয়তন ঊর্দ্ধে স্থিতিকালের অপেক্ষা অনেক বড় থাকে—এ অনুমানের হাত হইতে আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। একটা বড় জিনিস দূরে থাকিয়া আমাদের চক্ষুতে যে কোণ করে, একটা ছোট জিনিস নিকটে থাকিলেও সেই একই কোণ করিতে পারে। * তারকাদ্বয়ের দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধিও এই একই কারণে ঘটে।

***

আরও দুই একটি ভ্রমের কথা বলিব। বায়ুর রিফ্র্যাক্‌শানের কতকগুলি সুন্দর ফল দেখা যায়। একটি এই—উদয়াস্তকালে চন্দ্রসূর্য্যকে অনেক সময়ে ডিম্বাকার (oval) দেখায়, যেন উপরে নীচে একটু চাপিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি ?

যখন নক্ষত্রাদির কিরণসমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়ে, তাহারা রিফ্র্যাক্‌শনের নিয়মানুসারে ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে বাঁকিয়া আসে, এবং এই জন্য নক্ষত্রাদি প্রকৃত উচ্চতা অতিক্রম করিয়া আরও ঊর্দ্ধে স্থিত বলিয়া মনে হয়। তাহাদের উচ্চতা (altitude) বাড়িয়া যায়, ইহাই রিফ্র্যাক্‌শনের মুখ্যফল। নক্ষত্রাদি দৃঙ্‌মণ্ডলের কাছে থাকিলেই উচ্চতার বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। কারণ, তখন রশ্মিসমূহ অতি বক্রভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। প্রকৃত এবং দৃষ্ট উচ্চতার প্রভেদকে astronomical refraction বলে। যাহা হউক, একটি রিফ্র্যাক্‌শানের তালিকা দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ৩০ ইঞ্চ বায়ুচাপে এবং ৫০° ফাঃ উত্তাপে—

---

* Godfrayর Astronomy দ্রষ্টব্য। উদয়াস্তকালে চন্দ্র সূর্য্য কেন বড় দেখায়, এই

১৫°	উচ্চতায় রিফ্র্যাক্শান্		০´৫৮″২
১০°	,,	,,	৫´১৯″২
৫°	,,	,,	৯´৫২″
২°	,,	,,	১৮´২৬″
০°	,,	,,	৩৬´২৯″

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, নক্ষত্রাদি দৃঙ্মণ্ডলের যতই নিকটে আসে, ততই উচ্চতার অল্প পরিবর্ত্তনেই রিফ্রাক্শানের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রভেদ হয়, এবং এই জন্যই চন্দ্রসূর্য্যের উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত ব্যাসটি সঙ্কুচিত হইয়া যায় ও উদয়ের কিঞ্চিৎ পরেই এবং অস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাহারা ডিম্বাকার ধারণ করে; নিম্নার্দ্ধ অপরার্দ্ধ অপেক্ষা একটু বেশী চাপা বলিয়া মনে হয়। একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে কর, সূর্য্যের নিম্নতম বিন্দুর প্রকৃত উচ্চতা ৫°, এবং সূর্য্যের দৃশ্যমান ব্যাস ৩২´, এখন

	নিম্নতম বিন্দুর	উচ্চতম বিন্দুর
প্রকৃত উচ্চতা	৫°০´,০″	৫°৩২´০″
রিফ্র্যাক্শান	৯´৫২″	৮´৫২″
দৃষ্ট উচ্চতা	৫°৯´৫২″	৫°৪০´৫২″

ইহাদের প্রভেদ ৩১´, অর্থাৎ সূর্য্যের উর্দ্ধাধঃস্থিত দৃষ্ট ব্যাস ৩১´; তাহা হইলেই এই (vertical) ব্যাসটি ১´ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। যখন দৃঙ্মণ্ডলের আরও নিকটে থাকে, তখন সঙ্কোচন কখনও কখনও ৫।৬ মিনিট্ পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

রিফ্র্যাক্শানের আর একটি ফল এই, ইহাতে জ্যোতিষ্কসমূহের উদয় একটু অগ্রে হয়, এবং অস্ত একটু বিলম্বে হয়। সূর্য্য প্রকৃতই আমাদের horizonএ আসিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই, এবং horizon ছাড়িয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্তও আমাদের দৃষ্টিগোচর থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, রিফ্র্যাক্শনে সূর্য্যের উচ্চতার বৃদ্ধি হয়।

বায়ুর রিফ্র্যাক্শনে আমাদের দৃষ্টিসীমা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহার কারণ, রিফ্র্যাক্শনে আলোক বাঁকিয়া আসে বলিয়া, প্রকৃত দৃঙ্মণ্ডলের নিম্নস্থ কতক অংশ এই বক্র আলোকরশ্মির সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে ভূতলের দৃষ্টাংশ প্রায় ১/১৩ অংশ বাড়িয়া যায়।

শ্রীমুরলীধর রায়চৌধুরী।

চন্দ্রভাগাতীরে।

শৈশবের চাঞ্চল্য এ বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে ত্যাগ করে নাই, এখনো দুদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার; হাতে কাজকর্ম্ম থাকিলে কথাই নাই, কিন্তু কাজকর্ম্ম না থাকিলে অকারণে ঘুরিয়া বেড়ান আমার স্বভাব, এ স্বভাব পরিবর্ত্তনের কোনও আশা নাই। ছোটভাইএরা এখন আমার অভিভাবক, সকল চেষ্টাতেও তাঁহারা তাঁহাদের এই নাবালক জ্যেষ্ঠ

টিকে সুপথে আনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ অথবা নীতি-পুস্তক, এই দুইয়ের কিসের অভাবে আমার স্বভাব সংশোধিত হইল না, তাহা আমি এবং তাঁহারা কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

হাতে কোনও কাজ নাই, এরূপ অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই মনের মধ্যে নানা গভীর চিন্তার উদয় হইয়া মনটিকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলে। সে ভাবনা কেবল ইহকালের প্রাচীরসীমায় আবদ্ধ নহে, পরকাল পর্য্যন্ত তাহার গতি বিস্তৃত, সময়ে সময়ে তাহাকে দার্শনিক চিন্তার নামান্তর বলা যাইতে পারিত, কিন্তু আমার মত গরীবের দার্শনিক চিন্তার দরকার কি? তাই আমি ছুটিয়া বাহির হই; লোকে অবসর পাইলেই বিশ্রাম করে, কিম্বা বন্ধুবান্ধবদিগের সহবাসসুখে বা নির্জ্জনে পুস্তকপাঠে সময়াতিপাত করে, কিন্তু আমি বিশ্রাম পাইলেই ঘুরিতে আরম্ভ করি। এরূপ অবস্থায় দুই দিনের ছুটী যে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কোথায় যাই, কিরূপে ছুটীর দিন কাটাই, এই ভাবনাতেই অস্থির। জীবনের দিনগুলি কোনও রকমে অতিবাহিত হইলেই আমার নিকট পরম শান্তি।

এই প্রকার যখন অবস্থা, সেই সময় সোমবারে এক দিন ছুটী পাওয়া গেল, রবি সোম দুই দিন বিশ্রাম—অতএব এই দুই দিন কাটাইবার জন্য কিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হইল।

সৌভাগ্যক্রমে আমার একটি সঙ্গী যুটিয়াছিলেন। ইনিও আমার মত স্কুলের মাষ্টার; আমরা দুজনে এক বাসাতেই থাকি, এবং ইনি আমার এক ঘরের সঙ্গী। জাতিতে বাঙ্গালী হইলেও বঙ্গদেশ বা বঙ্গভাষার সঙ্গে ইহাঁর অধিক সম্বন্ধ নাই; ইহাঁর পিতামহের সঙ্গে সে সম্বন্ধ ছিল বটে। তিন পুরুষ হইতেই ইহাঁরা "পশ্চিমে"। ইনি বেনারস কালেজের ছাত্র, বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর; বেশ বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে ইহাঁর পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী সকলেই বর্ত্তমান সত্বেও ইহাঁর মন নির্ব্বেদভাবাপন্ন, সংসারের প্রতি আসক্তিবর্জ্জিত; শরীরের লক্ষণেও তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইত, এবং মস্তকে দীর্ঘ চুল, মৎস্যমাংসত্যাগী, মিতাচারী এই ভদ্রলোকটিকে দেখিলে, যোগী ঋষির একটি নাগরিক সংস্করণ বলিয়া অনুমান হইত। তাঁহার ধর্ম্মমতও কিম্ভূতকিম্মাকার; ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ (উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়, এই সমাজভুক্ত লোকেরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা কিম্বা কোনও ক্রিয়াকাণ্ড

মানেন না, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই এই সম্প্রদায়ভুক্ত) এবং হিন্দুসমাজের অদ্ভুত মিশ্রণের উপর তত্ত্ববিস্তার (থিওসফি) আধিপত্য থাকিলে যেরূপ ধর্ম্মমত হয়, আমার এই বন্ধুটির ধর্ম্মও তদ্রূপ। এই বন্ধু আমার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন; ইনি বেশ ধর্ম্মনিষ্ঠ, এবং ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তাতে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায় বলিয়াই ইহাঁকে সঙ্গী করিলাম। কিন্তু গৃহজীবী এমন একটি অল্পবয়স্ক যুবককে সঙ্গে লইয়া বনজঙ্গলে বেড়ান আমি তত নিরাপদ মনে করি না, বিশেষ বৈরাগ্যের দিকে তাঁহার যেরূপ ঝোঁক, তাহাতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দুই চারি বার ঘুরিলেই হয় ত তিনি গৃহের বন্ধন ছিঁড়িতে পারেন; যাহা হউক, আমি অবসর পাইলেই একা ঘুরি, হ—বাবু (এই বন্ধুটির নাম) এ জন্য দুঃখিত, এবং আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মাযুক্ত; তাঁহার অনুযোগ, আমি কেন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরি না,—আমি যে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রেমাস্পদ ভ্রাতা ভগিনী এবং কিশোরী প্রণয়িনীর কথা ভাবিয়াই তাঁহার বহুদিনের উমেদারীর প্রতি শিথিলপ্রযত্ন, সে কথা তিনি বুঝিতে পারেন না।

এবার এই রবি ও সোম দুই দিনের ছুটীতে একাকী কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না; সঙ্গীহীনের প্রাণের মধ্যে একটি সঙ্গীর কামনা জাগিয়া উঠিল। এই অরণ্য ও পর্ব্বতে ভ্রমণোপযোগী সঙ্গী কোথায়? প্রকৃতির সুন্দর শোভন দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেকে সঙ্গী হইতে চাহেন, কেহ বা পুরাতত্ত্ব কিম্বা প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের আশায় দুর্গম গিরিপথে, কি শঙ্কটময় বহু প্রাচীন পার্ব্বত্য অট্টালিকায় গমন করিতে পারেন, কিন্তু কেবল উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইবার আশায় বোধ করি কেহই আমার সাহচর্য্য অবলম্বন করিতে সম্মত নহেন। অন্য কেহ সম্মত না হইলেও, এ বিষয়ে হ—বাবুর কিছুমাত্র আপত্তি দেখিলাম না, সুতরাং আমার সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিলাম; তিনি তখনই প্রস্তুত, আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরিবেন, এ উৎসাহ আর তাঁহার রাখিবার স্থান হইল না। তিনি একা কি ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাহির হইতেছেন দেখিয়া আমার বড়ই হাসি আসিল; আমাকে হাসিতে দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন। আমি বলিলাম, "কোথায় যাইতে হইবে, না জানিয়াই যানের বন্দোবস্ত?"—তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমরা যেখানে যাইব, সেখানে গাড়ী ঘোড়া যাইতে পারে, উত্তম হাট বাজার আছে, এবং সঙ্গে দুই একজন চাকর বাকরও চলিবে, কিন্তু আমি বুঝাইয়া দিলাম, আমার

যাইব, লোকজনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বন্ধুটি রাস্তার দূরত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন; প্রথমে তিনি প্রবল তর্কের দ্বারা স্থির করিলেন, আমার এই প্রকার কঠোরতাস্বীকার নিরর্থক, আমি যখন সাধু সন্ন্যাসী নই, তখন যতটুকু বিলাস ভোগ করা দূষণীয় নয়, ততটুকুর প্রশ্রয় দেওয়া আমার উচিত। আমি যে বিলাস ও প্রয়োজনীয়, এ উভয়ের পার্থক্য ভুলিয়া যাইতেছি, ইহা বন্ধুবর অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, বিলাস-সুলভ ও প্রয়োজনীয়, এই উভয় দ্রব্যের মধ্যে যে অন্তরাল আছে, তা অতি সামান্য, সেই জন্য অল্প কারণেই গোলযোগ ঘটে, আজ যে জিনিষ বিলাসোপ-করণ বলিয়া মনে হয়, দুই দিন পরেই তাহা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তখন তাহা না হইলে আর চলে না। তর্কে সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি প্রশ্ন ধরিলেন, আমি কতদূর যাইব? ততদূর হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব কি না, আজ রাত্রে ফিরিয়া আসা কি সহজ হইবে, সেখানে থাকিবার যায়গা আছে কি না, এবং সেখানে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা? এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া ফেলিলেন; আমিও তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নের নিরাশাব্যঞ্জক এক একটি উত্তর দিতে লাগিলাম; বলিলাম, রাস্তা কত দূরে তাহা জানি না, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পথ চলিতে হইবে, হাটবাজার নাই, থাকিবার স্থান আছে কি না জানি না, না থাকারই অধিক সম্ভাবনা, সেখানে কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্যও পাওয়া যায় না, পথ হইতে দুই এক পয়সার বুটভাজা সংগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে। ভায়া অবিলম্বে বুঝিলেন, এ এক নূতন রকমের পর্য্যটন; অতএব এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি নিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহার বিশ্বাস যেখানেই যাই, তাঁহার ন্যায় বন্ধু ব্যক্তিকে কখনই অনাহারে বাঘভালুকের মুখে সমর্পণ করিব না। আমাদের ভ্রমণেরও লক্ষ্য কি, জানিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইলেন, তাঁহার কৌতূহলনিবারণের জন্য বলিলাম, "চন্দ্রভাগা-তীরে।"

নাম শুনিয়াই তিনি হাসিয়া আকুল; বলিলেন, "এতখানি বাক্যকৌশলের কিছু আবশ্যক ছিল না, সরলভাবে পঞ্জাবভ্রমণে যাওয়া যাইবে বলিলেই সকল কথা বুঝা যাইত।" অবশেষে তিনি প্রমাণ করিতে বসিলেন, এই দুই দিনের ছুটীতে কিছুতেই পঞ্জাবভ্রমণে যাওয়া যায় না; পদব্রজে ত দূরের কথা; তবে খুব কষ্ট স্বীকার করিলে অম্বালা কি অমৃতসর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া নিয়মিত সময়ে

লাম, "তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি যোগবলে তোমায় লইয়া যাইব।"—ভায়া Theosophist মানুষ, আমার যোগবলের কথা বিশ্বাস করিলেন কি না জানি না, কিন্তু নিরস্ত হইলেন।

শনিবারের দিন আমাদের আয়োজন শেষ হইল। আয়োজনের মধ্যে মোটা একখানি গাত্রবস্ত্র, একখানি পরিধেয় বস্ত্র, এবং নগদ চারি আনার পয়সা। ভায়ার চক্ষুস্থির! এ কি রকম আয়োজন, এতেই চন্দ্রভাগা-দর্শন ঘটিবে? কোনও প্রকারে শনিবারের রাত্রি কাটিয়া গেল।

রবিবার অতি প্রত্যূষে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলাম। দেরাদুন হইতে সাহারণপুর আসিতে হইলে একটি পথ পাওয়া যায়, এই পথটি দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া ঠিক দক্ষিণ মুখে আসিয়াছে, এবং শিভালিক পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া সাহারণপুরে বিস্তৃত হইয়াছে; এই পথ যেখানে শিভালিক পর্ব্বত-শ্রেণী ভেদ করিয়াছে, সেখানে একটি নাতিক্ষুদ্র গিরিসঙ্কট আছে, এই গিরি-সঙ্কটের নাম "মোহনপাশ"। আমরা যে সময় "মোহনপাশ" অতিক্রম করি-লাম, তখন অল্প অল্প অন্ধকার ছিল, এবং তুষারশীতল বায়ুপ্রবাহ এক একবার আমাদের শরীরে লাগিয়া বুকের রক্ত জমাইয়া দিতেছিল, কিন্তু তথাপি এই পার্ব্বত্য 'পাশ' অতিক্রম করিতে কত আনন্দ!—সেই জনহীন, পর্ব্বতাকীর্ণ, সৌন্দর্য্যবহুল, উচ্চ পার্ব্বত্যপ্রদেশ দিয়া আমরা দুইটি প্রাণী নিঃশব্দে অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল, বিহঙ্গের সুমিষ্ট প্রভাতকাকলী স্তব্ধ বনস্থলী আচ্ছন্ন করিয়া নবীন সূর্য্যের আহ্বানগীতিরূপে যেন ঊর্দ্ধ গগনমণ্ডলে প্রেরিত হইল। চতুর্দ্দিকে অযত্নসম্ভূত তৃণলতায় সুগন্ধি পুষ্প মুক্তাফলের ন্যায় শিশিরভারে আনত। নবোদিত সূর্য্যের লোহিত কান্তি বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া ধূসর পর্ব্বত-অঙ্গে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, কেহ লোহিতচূর্ণে পর্ব্বত অঙ্গ রঞ্জিত করিয়াছে; আমরা কোনও লতামণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, কোনও উচ্চ বৃক্ষতল দিয়া আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম; এ যেন আমাদের শৈশবের জীবনপথে অগ্রসর হওয়া, তেমনি উদ্বেগহীন, আনন্দ-পূর্ণ, যতদূর দৃষ্টি পড়ে, সমস্ত প্রদেশের উপর এক অটল বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় অনুরাগ প্রকাশিত; সমস্ত পথই অজ্ঞাত, কিন্তু আশঙ্কাশূন্য,—যেন আপনার মাতার ন্যায় প্রকৃতিজননী অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদিগকে ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইবেন।

এইরূপ কবিত্বপূর্ণ পথ দিয়া প্রীতি-উচ্ছ্বসিত মনে ঘুরিতে ঘুরিতে দেরাদুন

হইতে দুই তিন মাইল দূরস্থ পর্ব্বত-অধিত্যকায় একটি নদী দেখিতে পাইলাম; এই নদীর নাম "বিন্ধ্যাল"। সমস্ত গিরিনদী যে প্রকৃতির, "বিন্ধ্যাল"ও সেই প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন। এ সকল নদীতে জল থাকে না, কিন্তু পর্ব্বতে যখন প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখন এই সকল নদী দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রবল বেগে জলপ্রবাহ প্রবাহিত হয়; কাহার সাধ্য, সেই প্রবল স্রোত রোধ করে, কিম্বা সেই সময় নদী পার হইয়া যায়? কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আর কিছু নাই, সম্পূর্ণ শুষ্ক, জলবিন্দুশূন্য। এই কারণে এ সকল নদীর উপর সেতুনির্ম্মাণের কোনও প্রয়োজন হয় না।

আমরা যখন নদী পার হইলাম, তখন তাহা শুষ্ক, সুতরাং পারের জন্য কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। এই তিন মাইল চলিয়াই আমার বন্ধুটি কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টারজি, এমনি পদব্রজে কি সাহারণপুরে যেতে হবে?"—আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া সোৎসাহে এবং সবেগে চলিতে লাগিলাম, নিরুপায় ভাবে তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এক একবার তিনি কাতরতা প্রকাশ করিয়া কোনও কথা বলিবার উপক্রম করিলেই, একটি সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি, আর তিনি সমস্ত ভুলিয়া যান, মহাআহ্লাদে এবং আশ্চর্য্যভাবে, মুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিয়া তাহার সমালোচনা আরম্ভ করেন, ও উপসংহারে বলেন, "এমন সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে জীবনের পূর্ণ উপভোগ হইতে পারে, এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জ্ঞানানুভূতি অপেক্ষা কত মহত্তর; এই সৌন্দর্য্যানুভূতি তখনই সার্থক হয়, যখন তাহা সেই পরম-সুন্দর পুরুষকে বা মহিমান্বিতা অনন্ত প্রকৃতির অখণ্ড মাধুরীকে ধারণা করিতে পারে, আমরা বৃথা জ্ঞানের উদ্বোধনে রত রহিয়াছি, ইহাতে না আছে তৃপ্তি, না আছে শান্তি, ইহাতে কেবল অহঙ্কারবৃদ্ধি করে, এবং সন্দেহের ভিতর হইতে আমরা গভীরতর সন্দেহে ডুবিয়া যাই।"—আমি বলিলাম, "জগতের অভিব্যক্তিই সৌন্দর্য্যমূলক; এমন কি, জ্ঞানের মধ্যেও যদি সৌন্দর্য্যের বিকাশ না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানের এত আদর থাকিত না। জ্ঞান অপেক্ষা বিধাতার সৌন্দর্য্যেই অধিক প্রীতি; এবং এই কথা য়ুনানীর অন্ধকবি মিল্টন অতি সুন্দর বুঝিয়াছিলেন, তাই আদমকে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে চিরসৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন

ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, "আর ত চলিতে পারি না; সকলই সুন্দর, কিন্তু এই গন্ধ অংশ পথ চলাটুকু যদি না থাকিত!"

একটু বিশ্রামের পর, আর অধিক চলিতে হইবে না এই আশা দিয়া, আবার চলিতে লাগিলাম। অল্পদূরে—রাস্তার ধারে একটি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রাম দেখিয়া বন্ধুটির দেহে প্রাণ আসিল; তাড়াতাড়ি আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, বেলা বোধ হয় তখন আটটা বাজিয়াছে। গ্রামের নামটি আমার মনে নাই, পশ্চিমে গ্রামগুলির নাম—তাহাদের পার্ব্বত্যপ্রকৃতির অনুরূপ, অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর; শত শত গ্রাম ঘুরিয়াছি, সকলগুলির নাম শ্রুতিধর ভিন্ন অন্য কাহারও মনে রাখা সম্ভব নহে। গ্রামে দুই তিনখানি ছোট দোকান, তাহাতে প্রধান প্রধান আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দেখিলাম, অদূরে লাল রঙ্গ-করা পাথরের অতি সুন্দর একটি অট্টালিকা, কিন্তু এই অট্টালিকা ও তাহার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ, অট্টালিকাটি কেমন সুন্দর, ছবির মত সুশোভন, তাহার ভিতর যদি কেহ প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি থরে থরে সজ্জিত রাখিত, তাহা হইলেই তাহার সদ্ব্যবহার হইত; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অপরিষ্কারের জীবন্তমূর্ত্তি কয়েকটি মানবক গা দুলাইয়া এবং ঘাড় নাড়িয়া সমস্বরে উর্দ্দু পড়িতেছে। তাহাদের সেই সমবেত স্বর আমাদের কানে নিতান্ত মন্দ লাগে নাই; দেখিলাম, এই গোষ্ঠের নেতা প্রকাণ্ড এক সাদাপাগ্‌ড়ীধারী, বেত্রহস্ত, বিশ বাইশ বৎসর বয়স্ক এক শ্মশ্রুবিরল গুরুমহাশয়। আমাদিগকে দেখিয়াই গুরুমহাশয় ত্বরিতপদে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, গুরুমহাশয়টি আমারই এক প্রকার ছাত্র। তাঁহার অনুরোধে আমরা বিদ্যালয়গৃহে প্রবেশ করিলাম। ছাত্রেরা মাটীতে কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া আছে, হঠাৎ প্রভাতকালে অপরিচিত দুইটি অতিথিকে দেখিয়া সেই বালকবৃন্দের হৃদয়ে যে অপর্য্যাপ্ত ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল, তাহাদের চঞ্চল চক্ষুর কোমল স্পন্দনেই আমি তাহা অতি সহজে অনুমান করিতে পারিলাম। বিশেষ যখন তাহাদের গুরুমহাশয় অতি ব্যগ্রভাবে আমাদের বসিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং চেয়ারখানিতে স্থান সংকুলান হইবে না দেখিয়া, অদূরস্থিত একটি কেরোসিনের বাক্স বহিয়া আমাদের নিকটে রাখিলেন—তখন ছাত্রেরা একবারে অবাক্ হইয়া গেল, যেন তাহাদের যমের যম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

গুরুমহাশয় সবিনয়ে তাঁহার ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ছাত্রেরা যে যে ভাষা শিক্ষা করিতেছে, সে সকল ভাষায় আমার অসীম দখল, বাস্তবিক উর্দ্দু ও পারসীতে আমার যেরূপ অভিজ্ঞতা, তাহাতে এই দুই ভাষায় অন্যের বিদ্যা পরীক্ষা চলে না। কিন্তু আজকাল ভাষাজ্ঞানের উপর পরীক্ষা নির্ভর করে না, প্রমাণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমরা, বিশেষতঃ এই গুরুমহাশয়শ্রেণী, বিশেষ ঋণী; কারণ আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্তই তাহার প্রাসাদাৎ; কিন্তু সত্য বলিতে কি, যদি ভাষাজ্ঞানের উপর পরীক্ষা নির্ভর করিত, তবে প্রবেশিকাপরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদের প্রশ্নপত্রের ভাষার চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিতাম, এবং স্থূলোদর সিভিলিয়ানপুঙ্গবেরা বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষাদানকালে The remarkable ladyর বঙ্গানুবাদে "ঐ মন্তব্যা স্ত্রীলোক" লিখিয়া অপূর্ব্ব ভাষাভিজ্ঞতা এবং অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন না।

যাহা হউক, দুই চারিটি কথায় পরীক্ষা শেষ করিয়া, গুরুমহাশয়কে চন্দ্রভাগার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। জানিতে পারিলাম, এই গ্রাম অতিক্রম করিয়া দক্ষিণের দিকে একটি জঙ্গল আছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। অধিক বিলম্ব না করিয়া, একটি দোকান হইতে কলাইভাজা ও গুড় কিনিয়া দুই জনে অগ্রসর হইলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা শিভালিকের একেবারে কোলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি; রাস্তার ধারে একজন কৃষক জমী চষিতেছিল, তাহাকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে দক্ষিণের একটি রাস্তা দেখাইয়া দিল। আমরা তাহার নির্দ্দেশমত চলিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কোনও পথই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল অরণ্যের মধ্যে রেখাবৎ একটি চিহ্ন; তাহাই অবলম্বন করিয়া লতাপাতা দুই হাতে সরাইতে সরাইতে চলিতে লাগিলাম। কোথাও পথ বেশ পরিষ্কার, আবার কোথাও গভীর জঙ্গল। স্থানে স্থানে ভয়ানক অন্ধকার—সূর্য্যকিরণের চিহ্নমাত্র দেখা অসম্ভব। খানিক দূরেই আবার সমস্ত পরিষ্কার—বেশ রৌদ্র এবং চারিদিক খোলা। প্রকৃতির এই প্রকার বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে দিয়া প্রায় দুই মাইল ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রভাগাতীরে উপস্থিত হইলাম।

এই চন্দ্রভাগা একটি সংকীর্ণকায়া ক্ষুদ্র গিরিনদী। সিন্ধুর অন্যতম শাখার

সে চন্দ্রভাগা মহাপ্রতাপশালী, দুর্দ্দমনীয় সিন্ধুর একটি প্রধান শাখা ; সে নিজেই বিখ্যাত, এবং তাহার চঞ্চল গতি বীরভূমি পঞ্চনদের বিস্তৃতবক্ষ সুশোভিত করিতেছে ; আর আমাদের পুরোবর্ত্তিনী এই চন্দ্রভাগা অরণ্যসঙ্কুল শিভালিকের কোনও এক অজ্ঞাত অংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে জন্মলাভ করিয়া, নির্ঝর এবং জলপ্রপাতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা সামান্য জল সংগ্রহ পূর্ব্বক মৃদুগতিতে অগ্রসর হইতেছে ; আমাদের দেশের ছোট খালেও ইহা অপেক্ষা অধিক জল থাকে।

নির্জ্জন নদীতীরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির, মন্দিরে মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজমান, মন্দিরের প্রস্তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এবং এই মধ্যাহ্নকালেও তাহার মধ্যভাগ হইতে অন্ধকার বিদূরিত হয় নাই। কত কাল হইতে এই মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত, হয় ত চতুর্দ্দিকে কত পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহারই ন্যায় মহাসমাধিনিমগ্ন, যেন বিশ্বের প্রলয়ের সহিত বিশ্বেশ্বরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

এই মন্দিরের সম্মুখে অতিজীর্ণ আর একটি সামান্য মন্দির দেখা গেল। প্রবাদ, ভগবান বুদ্ধ এই স্থানে বহু দিন যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। এ কথা কতদূর প্রামাণিক, তাহা স্থির করা কঠিন ; তাহার পর কতকাল অতীত হইয়াছে, বোধ হয়, কোনও লিখিত বিবরণও নাই। সুতরাং এই মন্দির বুদ্ধদেবের তপশ্চর্য্যাসম্বন্ধে কোনও সাক্ষ্য না দিলে, ইহার সত্যাসত্যের নির্ণয় হয় না। কিন্তু এমন সুন্দর স্থানে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়াছেন বলিলে অসম্ভব বোধ হয় না ; এই সকল স্থানে আসিলে বুঝিতে পারি, যোগী ঋষিগণ ভগবানের চিন্তায় দেহপাত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ স্থান কেন মনোনীত করেন ; আরণ্যপ্রকৃতির স্নিগ্ধগম্ভীর শোভা, প্রত্যেক বৃক্ষ লতা ও তুষারধৌত প্রস্তরখণ্ডের সুপবিত্র শান্তভাব, এবং উপলব্যথিতগতি ক্ষীণকায়া এই গিরিনদীর নির্ম্মল প্রবাহ, এ সমস্ত দেখিলে মনে আর কোনও কথার উদয় হয় না,—শুধু অনাদি অনন্ত মহাপুরুষের মধুর সত্বায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এখানে সকলই সহজ—সকলই সুন্দর, পার্ব্বত্য বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণের কি স্বাধীন আনন্দধ্বনি, নদীজলে মৎস্যকুলের কি নির্ভয় সন্তরণ! বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করুন আর না করুন, তাঁহার ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহা উক্তি

চন্দ্রভাগার গতি অতি ধীর; পার্ব্বত্য নদীর লম্ফঝম্ফগতি, সিংহনাদ, ফেনিল তরঙ্গের ঘূর্ণিত বেগ, এখানে সে সকল কিছুই নাই। সামান্য শব্দ করিতে করিতে চন্দ্রভাগা অগ্রসর হইয়াছে, কত বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য যে সেই অল্প জলে খেলা করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। জল সর্ব্বত্রই এক হাঁটু, দুই এক স্থানে একটু বেশী হইতে পারে। জীর্ণ মন্দিরটির এক দিকের 'দেওয়াল' ফাটিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই ভিতর হইতে একটি নির্ঝর বাহির হইয়া চন্দ্রভাগায় মিশিয়াছে। এই নির্ঝরের জল কেমন নির্ম্মল, যেন বীরের শরাঘাতে বিদীর্ণবক্ষ বসুন্ধরার মর্ম্মস্থান হইতে প্রসন্নসলিলা ভোগবতী সমুদ্ভূত হইয়া তৃষাতুরের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছেন। ভগ্নমন্দিরের সোপানে বসিয়া, এই ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণীর অনাবিল পুণ্যপ্রবাহের দিকে চাহিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম; এই শুভ্র দিবালোকে বায়ুহিল্লোলিত উন্নত বৃক্ষরাজির ঘনপল্লবের সঘন মর্ম্মরশব্দ, নদীর অস্ফুট কলধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া যুগান্তপ্রবাহিত রহস্যভাষের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল, বুঝি ইহা বিশ্বপিতার অনাদ্যন্ত যশোগীতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন এখানে একটি মেলা হয়; নিকটস্থ গ্রামসমূহের স্ত্রীপুরুষ এবং বালকবালিকা সকলে সে দিন একত্র হইয়া চন্দ্রভাগায় স্নান করে, এবং মন্দিরে শিবের মস্তকে দুগ্ধ ও বিল্বপত্র "চড়ায়,"—এদেশে শিবের মাথায় জলঢালার নাম 'জল-চড়ান'। আমি এই সময় একবারও চন্দ্রভাগায় আসিতে পারি নাই; কারণ, ঠিক এই দিনে হরিহরছত্রের মেলা আরম্ভ হয়, হরিহরছত্রের মেলা দেখিবার লোভ কোনও বারই সম্বরণ করিতে পারি নাই, এখানকার মেলাও এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই। তবে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিবার সুযোগ হইত, কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুযোগ ত্যাগ করিতাম; বর্ষাকালে আমার বন্ধুগণ দল বাঁধিয়া মৎস্যানুসন্ধানে এই নদীতীরে আসিতেন, কিন্তু এমন সুন্দর পবিত্র স্থানে,—যেখানে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচারক কিছুকাল যোগসাধনায় কালাতিপাত করিয়াছেন, সেখানে জীবহিংসার জন্য দল বাঁধিয়া যাওয়া, আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইত না।

মহাদেবের মন্দিরমধ্যে বস্ত্রাদি রাখিয়া, এই প্রবল রৌদ্রের মধ্যে শীতে কম্পমান দেহে দুই জনে স্নান করিতে নামিলাম। বাসায় গরম জলে স্নান করাই আমাদের নিয়ম, আমার সঙ্গী বন্ধু অনেক দিন পরে অবগাহনের সুবিধা পাইয়া হাঁটু জলেই সন্তরণ আরম্ভ করিলেন; এত শীত, কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

আমাদের সোৎসাহে দেহমর্দ্দন ও লম্ফঝম্ফে মৎস্যকুলের মধ্যে মহাত্রাসের সঞ্চার হইল ; অবশেষে, সেই অল্পপরিমাণ জল পঙ্কিল করিয়া আমরা তীরে উঠিলাম ; অনন্তর গুড় কড়াইভাজা ভক্ষণের পালা।

আমরা জলযোগ শেষ করিয়া, শিবমন্দিরে দুই জনে শয়ন ও উপবেশনে মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিলাম। এখান হইতে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না, গৃহের সৌন্দর্য্য বদ্ধ, যেন মায়াবিজড়িত ; সেখানে অল্প দুঃখশোকে হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়, সামান্য সুখেই বক্ষ ভরিয়া যায় ; এবং সেই স্তূপাকার সুবর্ণশৃঙ্খলের মোহন ভারের নিম্নে প্রাণবিসর্জ্জন করা, জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয় ; কিন্তু মুক্ত প্রকৃতির এই লীলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে বুঝিতে পারা যায়, চতুর্দ্দিকে যে সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, তাহা বাধাবন্ধহীন, মহিমাময়, বিচিত্রতাপূর্ণ ; গুটিপোকা যেমন তাহার রুদ্ধগৃহ ভেদ করিয়া বিচিত্রবর্ণ পাখা মেলিয়া গভীর আনন্দে নীল মুক্তাকাশে উড়িয়া যায়, তাহার গৃহের দিকে আর ফিরিয়া আসিতে প্রবৃত্তি হয় না, এখানে আসিলে সেইরূপ গৃহে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। জীবনমরীচিকার দীর্ঘপিপাসা বুঝি এই সকল স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রশমিত হয় না !

অনাহারে এখানে রাত্রিযাপনের সঙ্কল্প করা গেল। অপরাহ্নে মন্দিরের বাহিরে বসিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় একটি লোক আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল। নিকটেই কোনও গ্রামে তাহার বাসগৃহ, গৃহে তাহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা আছে, সে চাষ করে, বাড়ীতে বাগান আছে, বাগানে নানাপ্রকার তরকারী উৎপন্ন হয়, দেরাদুনের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া লবণ তৈল প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনে ; এতদ্ভিন্ন তাহার কয়েকটি গরু আছে, কিন্তু দুগ্ধ বিক্রয় করে না। আমরা এখানেই রাত্রিযাপন করিব শুনিয়া, সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এবং আমাদিগকে এই বিপদপূর্ণ অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল। কারণস্বরূপ একটি লোমহর্ষণ গল্পও বলিয়াছিল ; গল্পটি এই :—

এই মন্দির দিনের বেলা যেরূপ দেখা যায়, রাত্রে সেরূপ থাকে না, ইহার অতি ভয়ানক প্রহরী আছে ; সন্ধ্যা হইলেই দুইটি বৃহৎ অজগর সর্প জঙ্গল হইতে মন্দির-বারান্দায় উপস্থিত হয়, এবং উন্নত ফণায় সমস্ত রাত্রি মন্দির রক্ষা করে। তাহাদের ভয়ে রাত্রিকালে মন্দিরে বাস করা দূরের কথা, সন্ধ্যার পর এ পথে কেহই চলিতে ভরসা করে না। গভীর রাত্রে দেবতারা স্বর্গ হইতে এই

মন্দিরে পূজা করিতে আসেন, কৃষকেরা প্রভাতে ফুল ফল পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে দেখে, এবং এক এক দিন রাত্রে তাহাদের দূরস্থ গ্রাম হইতে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি পর্য্যন্ত শুনিতে পায়। একবার একজন সন্ন্যাসী কাহারও কথা না মানিয়া রাত্রি-যাপনের জন্য এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে আর সশরীরে ফিরিয়া যাইতে হয় নাই; প্রাতঃকালে মন্দিরপ্রাঙ্গণে তাহার মৃতদেহ পতিত ছিল, কে যেন তাহার শরীরের সমস্ত হাড় চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। যে কৃষকটি আমাদের কাছে গল্প বলিতেছিল, তাহার বিশ্বাস, এই মন্দিরপ্রহরী সর্প তাহাকে জড়াইয়া পিষিয়া মারিয়াছে; কৃষক আরও বলিল, এই মন্দিরটি শিবমন্দির হইলেও ইহা একটি সমাধিমন্দির। অনেক দিন পূর্ব্বে এখানে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতে আরম্ভ করেন; সকলের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী কোনও দেবতা, সন্ন্যাসী এখানে আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গের কাহাকেও এখানে রাত্রি-বাস করিতে দিতেন না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া লইত। সন্ন্যাসীর গাঁজা, আফিং বা ভাং খাওয়া অভ্যাস ছিল না, তিনি ফলমূলাহারী ছিলেন, নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসীবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত; সেই সকল গ্রামবাসীরা রাত্রিকালে সভয়ে দেখিত, সন্ন্যাসীর আশ্রম অনেকদূর লইয়া আলোকাকীর্ণ হইয়াছে, সামান্য অগ্নিতে সেরূপ আলোক উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে, অথচ সন্ন্যাসীর কুটীরে কখনও এত কাষ্ঠ থাকিত না, যাহা দ্বারা এরূপ প্রচুর আলোক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। শুনা গেল, এখনও মধ্যে মধ্যে আলোক দেখা যায়। একবার সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, পাঁচ ছয় মাস পরে একজন নবীন শিষ্য লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন; সেদিন অন্যান্য শিষ্যগণ রাত্রে তাঁহার নিকটে থাকিবার অনুমতি পাইল, রাত্রে তিনি ঘোষণা করিলেন, সেইদিনই তাঁহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। শিষ্য-মণ্ডলী এই সংবাদে আকুল হইয়া উঠিল; তিনি আদেশ করিলেন, নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিয়া তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন, এবং সেই মন্দিরে শিবপ্রতিষ্ঠা হইবে। রাত্রি দুই প্রহরের সময় সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবেশন করিলেন, চারিদিকে শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িল, প্রত্যূষে উঠিয়া দেখে, সন্ন্যাসীর প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার গুরুদেবের আদেশ অনুসারে এখানে এই মন্দির ও এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং তিনি চলিয়া

এইজন্য এ স্থান রাত্রিকালে জনমানবশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আমার সঙ্গী বন্ধুর ঘাড়ে "থিওজফির" ভূত চাপিয়া আছে, তিনি আগাগোড়া সমস্ত গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, আবার ঠিক এই সময়ে সেই ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর হইতে একটি প্রকাণ্ড সর্প বাহির হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল, আমাদের সংবাদদাতা কৃষক বলিল, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, তাই সাপ বাহির হইয়াছে, শীঘ্রই বনের মধ্যে হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

এই কথা শুনিয়া আমার সঙ্গী আর বিলম্ব না করিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে গাত্রবস্ত্রাদি লইয়া বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন, আমার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সেখানে থাকিবারও যে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, তাহা নহে; কারণ, দেখিয়া শুনিয়া এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস হয়, এখানে থাকিলে মারাত্মক কিছু না হউক, আমাদের কোনও বিপদ ঘটা আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং এখান হইতে উঠিলাম। আমাদিগকে উঠিতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত কৃষকটি বলিল, দেরাদূন এখান হইতে অনেক পথ, বেলাও আর অধিক নাই, পথে বিপদে পড়িতে পারি, অতএব যদি রাত্রে তাহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করি, তাহা হইলে সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে দেরায় ফিরিতে পারি। আমার সঙ্গী সহজেই সম্মত হইলেন, আমার অসম্মতিরও অবশ্য কোনও কারণ ছিল না, বিশেষ এদেশীয় কৃষকেরা অত্যন্ত আতিথ্যপরায়ণ।

আমরা দুজনে কৃষকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি অল্পপরিসর ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্যে কৃষকের বাসগৃহে উপস্থিত হইলাম, বাড়ীতে দুইখানি ঘর—একখানিতে রান্না হয়, এবং তিনটি গাই বাঁধা থাকে—অর্থাৎ একখানি পাকশালা এবং গোশালা একাধারে উভয়ই, অন্যখানি শয়নগৃহ। কৃষকের পরিবারের মধ্যে স্ত্রী এবং দুই কন্যা; আমরা গৃহস্বামীর শয়নগৃহের প্রশস্ত বারান্দায় আসিয়া বসিলাম—সে তাহার স্ত্রীকে আমাদের কথা বলিল; আমাদের বাঙ্গলাদেশের গৃহলক্ষ্মীগণের গৃহে আজকাল অতিথিসমাগমে তাঁহাদের প্রসন্নমুখে সহসা যে পরিমাণ বিরক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাতে স্বামী মহাশয়েরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে এই পার্ব্বত্য কৃষকপরিবারে সেরূপ কোনও ভাবের পরিচয় না পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, এই সঙ্গে বাঙ্গলার মহিলাকুলের সহিত পর্ব্বতবাসিনী রমণীগণের একটু তুলনাও করিয়া লইলাম, কিন্তু এই তুলনায় সমালোচনা আমাদের সহৃদয়া পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবে না, অতএব সে কথা এখানে না বলাই ভাল।

কৃষকরমণী সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল; দুইটি সুসভ্য বিদেশী অতিথিকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিবে, এই চিন্তাতেই তাহারা স্বামী স্ত্রী প্রথমে বিব্রত হইয়া পড়িল; কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষকপত্নী ঘরের বাহিরে আসিয়া "রি, রি, রি, রি, রো"—এইরূপ এক শব্দ করিল, উত্তরে দূর হইতে "কু" শব্দ শুনিতে পাইলাম, কে যেন ভাঙ্গাগলায় মিষ্টকণ্ঠে এই শব্দ উচ্চারণ করিল! গৃহস্বামিনী আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লজ্জাবোধ করিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা কহিবার মানুষের অধিকক্ষণ অভাব ছিল না;—অবিলম্বে কৃষকের হৃষ্টপুষ্ট, উন্নতদেহা, গৌরাঙ্গী দুইটি কন্যা তিনটি গাই লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। আমাদের দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল, তাহাদের পিতা সকল কথা ব্যক্ত করিল। বড় মেয়েটি মার সাহায্যের জন্য রান্নাঘরে গেল, ছোটটি গোবৎস ধরিল, তাহার পিতা গোদোহন করিল। গোদোহন শেষ হইলে আমরা গল্প আরম্ভ করিলাম; সে সকল কি গল্প? তাহাতে আমাদের শিক্ষা সভ্যতার কোনও কথা ছিল না, জীবনসংগ্রামের গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা যে প্রতিদিন অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি—আমাদের হৃদয়ের সেই ব্যাকুল ক্রন্দন এই সুখী ও শান্তিপূর্ণ কৃষকপরিবারে ব্যাপ্ত করি নাই; সংসারের অনেক কথা তাহারা বোঝে না, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং সমাজনীতির অনুশীলনে ইহাদের মস্তিষ্ক ব্যথিত না হইলেও, ইহাদের দিন বেশ নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইতেছে। ইহাদের সহিত কথা কহিয়া আমি বুঝিলাম না, কোনগুণে আমরা শ্রেষ্ঠ; ইহাদের নিষ্ঠা কেমন একাগ্র, ভক্তি কত গভীর, হৃদয় কত উদার ও মহৎভাবপূর্ণ, এবং বিশ্বাস কেমন অবিচল; আমাদের সংশয়, আমাদের সংকোচ, আমাদের মানঅভিমানজ্ঞান ইহাদের নাই, কিন্তু ভগবান যদি আমাদের হৃদয়ে এই মূর্খ, পার্ব্বত্য পরিবারের ন্যায় সন্তোষ ও শান্তি দান করিতেন, তাহা হইলে এ শিক্ষা ও সভ্যতার আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতাম।

তাহাদের গল্পে তাহাদেরই পুরাতন কাহিনী ধ্বনিত হইতেছিল, তাহাদের সেই সকল গল্পের সহিত তাহাদের গভীর বিশ্বাস বিজড়িত। সে সকল গল্প যুক্তিতর্কের অতীত, কিন্তু তথাপি তাহা কেমন সুন্দর! কৃষকের ছোট কন্যাটি তাহার পিতার নিকট বসিয়া তাহার পিতাকে গল্পে সাহায্য করিতেছিল, হাত মুখ নাড়িয়া সে যখন সালঙ্কারে তাহার পিতার গল্পের অনুবৃত্তি আরম্ভ করিল, তখন আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—তাহার বর্ণনভঙ্গী সুন্দর,—কি বর্ণনকৌশল সুন্দর? বাস্তবিক মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী। তাহার নিটোল

দেহে প্রথম যৌবনের উজ্জ্বলকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই চাঞ্চল্যের উপর সুন্দর সরলতা তাহার মধুর রূপকে অতি সুশোভিত করিয়াছিল। তাহার সরলতা, তাহার রূপ মাধুরী এবং গ্রাম্যভাব দেখিয়া, প্রসিদ্ধ স্কচ্ কবির একটি কবিতা মনে পড়িয়া গেল ঃ—

"She was a bonnie sweet Sonsie lassie."

কৃষকের ভাষায় সুন্দর পরিচয়; কৃষককবিই এ সৌন্দর্য্যবর্ণনার উপযুক্তপাত্র।

গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি হইল। ইতি মধ্যে মা ও বড় মেয়ে গরম লুচি, শাকের চাটনী, কাঁচা ভুট্টার একটা ঝাল তরকারী এবং গরম দুধ লইয়া, অতিথিসৎকারের বন্দোবস্ত করিল; আমরা আহারে বসিলাম, ছোট মেয়েটি "এটা খাও, ওটা খাও" বলিয়া জিদ করিতে লাগিল, তাহার কাছে আমরা অত্যন্ত পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আহারান্তে আমার সঙ্গী কম্বলের উপর নিজের কাপড়খানিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলেন, দশ পনের মিনিটের মধ্যে তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল; দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নিদ্রা এরূপ আজ্ঞাকারী নহে, (বন্ধুগণ কিন্তু একথা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না), আমি বসিয়া গৃহস্বামীর সহিত গল্প করিতে লাগিলাম।

বারান্দার এক পাশে জাঁতা ছিল, কাজকর্ম্ম শেষ হইলে মেয়ে দুটি সেই জাঁতা পিষিতে লাগিল, প্রথমে তাহারা অস্পষ্ট স্বরে কি বলাবলি করিতেছিল। একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, আমাদের কথাই আলোচনা করিতেছে। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে শয়ন করিলাম—কিন্তু তাহাদের বিশ্রাম নাই, আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া জাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহারা গান ধরিয়া দিল। জাঁতা পিষিতে পিষিতে গান করা এ দেশের নিয়ম। প্রথমে দুই ভগিনী অতি ধীরে, অতি সসঙ্কোচে গাহিতে লাগিল, যেন নৈশ বায়ুর স্পর্শমাত্রে সেই মৃদু-স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু ক্রমেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গ্রামের পর গ্রামে উঠিয়া, এই নীরব নিশীথে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সে স্বর কেমন সুমিষ্ট এবং প্রতি চরণের শেষে যে একটি কম্পন, তাহা অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন কর্ণে মধুবর্ষণ করে। এতকাল পরে এখনও মধ্যে মধ্যে সেই গীত-ধ্বনি কর্ণে বাজিয়া উঠে, সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য কুটীরে সেই নৈশগানের ধুয়া-এখনো ভুলি নাই; এখনও মনে পড়ে—

"ওরে ধন দৌলত—"

এবং নিজের অদ্ভুত কবিত্ববলে কত কথাই এই ধুয়ার সঙ্গে যোগ করিয়া নিজের ভাবুকতা প্রকাশ করি!

কখন ঘুমাইয়াছিলাম, মনে নাই। প্রত্যূষে সঙ্গীর ডাকে নিদ্রাভঙ্গ হইল, গৃহস্বামী ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া, দেরাদুনের দিকে অগ্রসর হইলাম; আমাদের বিদায় লইবার সময় কৃষকের ছোট মেয়েটি বলিয়াছিল, যদি আবার কখন এ পথে আসি, তবে যেন তাহাদের গৃহে অতিথি হই। পর্ব্বতপ্রান্তের এই অতিথিবৎসল কৃষকপরিবারের কথা আমার অনেক কাল মনে থাকিবে।

শ্রীজলধর সেন।

মাধুরী।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যত বেলা যাইতেছিল, ততই তারাসুন্দরী অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রভাত না হইতেই পুত্র অপর সকলকে লইয়া মুন্সীগঞ্জে গিয়াছিলেন—আজ মোকদ্দমা উঠিবার কথা—কি জানি কি হইল? ছেলে মানুষ—বোধ সোধও তেমন নাই—হয় ত বা সাক্ষীরাই বাঁকিয়া বসিল? হয় ত বা কোনও বিপরীত ঘটনাই ঘটিল? কিন্তু তাহা তো হইবার কথা নয়। তিনি তো আট ঘাট বাঁধিয়া সকল কাজ করিয়াছিলেন। অমূল্যের সঙ্গে ভূষণ আছে। সে যেটা বুঝিতে না পারে, ভূষণ তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। বাঙ্গাল রামমাণিক্যও খুব চতুর, তাহাকে কার্য্যসিদ্ধির পর আরও অধিক পুরস্কারের লোভও তিনি দেখাইয়াছেন—ভয়ের কারণ তো কিছু নাই। তবে এক ভয় ভজহরিকে। সে লোকটা নিরীহপ্রকৃতি, উদোমাদা, ভয়তরাসে। কিন্তু তাকেই বা আর কটা কথা বলিতে হইবে? এত করিয়া শিখাইয়া দিয়াছেন, তবু কি গোলমাল করিয়া ফেলিবে? আর ইন্‌স্পেক্টর? তাহাকেও তো টাকা দিতে তিনি কম করেন নাই।

অপরে জানে না বটে, কিন্তু তিনি তো বুঝিতেছেন এই কাজে ইহার মধ্যে তাঁহার কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। হাতে যাহা ছিল, তাহার আর এক কপর্দ্দকও নাই। গোপনে—অমূল্যকে লুকাইয়া—রামমাণিক্যের হাত দিয়া

যে তারাসুন্দরী বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে; তবে কি করিবেন, উপায়ান্তর নাই। যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, খরচ অভাবে তখন আর ফিরিতে পারেন না। তবে রামমাণিক্য পাছে তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্রতা বুঝিতে পারিয়া বশীভূত না থাকে, এ জন্য সে সকল অলঙ্কার যে তাঁহার মৃতা সপত্নীর, ইহা তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তারাসুন্দরী অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়া ছিলেন। অমূল্য অপেক্ষাও বুঝি গহনা অধিক ভাল বাসিতেন। বড় সাধ করিয়া পছন্দসই ভারি ভারি বিস্তর গহনা গড়াইয়াছিলেন। অত বড় বাক্সে তাহা ধরিত না। আজ তাহার অর্দ্ধেক প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। একএকখানি গহনা বেচিতে দিয়াছেন, আর বুকের এক এক খানি পাঁজরা যেন খসিয়া গিয়াছে। তবু জেদে পড়িয়া তাহার মায়া রাখেন নাই। সেই জেদ কি বজায় হইবে না? এত করিয়াও কি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না? উকীল অনেকটা টাকা লইয়াছে। লউক, এখন অমূল্য জয়ী হইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেই হইল।

জয় তো নিঃসন্দেহ—তারাসুন্দরী আবার ভাবিতে লাগিলেন—জয় এতক্ষণ নিশ্চয়ই হইয়াছে। এত করিয়া সাজাইয়াও যদি মোকদ্দমা না টিকে, তাহা হইলে সে হাকিমের ন্যায় নির্ব্বোধ আর নাই। তিনি শুনিয়াছেন, হার জিত নাকি সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। যে প্রমাণ যোগাড় হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? বেলা গিয়াছে, এতক্ষণ নিশ্চয়ই অমূল্য হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিতেছে। আর ভুবন?—সে এতক্ষণে জেলে গিয়াছে—নেংটী পরাইয়াছে, মাথা মুড়াইয়াছে, হাতকড়ি লাগাইয়াছে, কম্বলে শুইতে দিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য চোখের উপর ভুবনের সেই অবস্থা দেখিতে পাইলেন। বিকট আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সেই কল্পিত দৃশ্য যেন তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া দিল। "বাঃ বাঃ এই তো রাজার জামাইয়ের উপযুক্ত বেশ! এই তো সুখের বাসরশয্যা! তার পর রাজদণ্ড? কাল প্রাতে যখন পাথর ভাঙ্গিবার জন্য প্রকাণ্ড লৌহ হাতুড়ি হাতে দিবে, তখনই তাহার ঠিক শোভা হইবে। মরি মরি কি সুন্দর বেশ!"—

তারাসুন্দরী একেলা সে গৃহে ছিলেন, একেলাই উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"আমি তারাসুন্দরী, আমায় অপমান! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ... আর কি মেয়ে ছিল না? আমার পুত্র রাজার জামাই না হইয়া,

তাহা দেখিবার পূর্ব্বে বায়সে কেন আমার চক্ষু উৎপাটন করিল না? যে সতীনকাঁটা—আমার চক্ষুঃশূল—সে হইবে রাজরাজেশ্বর, আর আমার সোণার নিধি ভাসিয়া যাইবে। কর—এখন প্রাণ ভরিয়া রাজত্ব ভোগ কর।” ঘূর্ণিত-লোচনে বিকৃতস্বরে অট্ট হাসি হাসিয়া তারাসুন্দরী দন্তে দন্ত নিপীড়িত করিলেন। নির্জ্জন গৃহে ভীষণ কড় কড় শব্দের প্রতিধ্বনি হইল।

বেলা গিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন পর্য্যন্ত এক জনও প্রাণী ফিরিল না। তারাসুন্দরী উৎকণ্ঠিতা হইলেন। বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া কি চিন্তা করিলেন। আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিষ্ঠিতে পারিলেন না—ব্যস্ত হইয়া পুনরায় বাহিরে আসিলেন। তাই ত, এখনও কেন অমূল্য আসিল না? সেই আনন্দপ্লাবিত হৃদয়ে সহসা একটা আশঙ্কার ছায়া পড়িল। সহসা দক্ষিণ অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মাথার উপর গৃহগাত্র হইতে একটা টিক্‌টিকি রব করিল, বারাণ্ডায় ঝিল্‌মিলির উপর বসিয়া একটা কৃষ্ণকায় কাক বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া একটা পোকা চোখের ভিতর পড়িল, অকারণ নয়ন দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল। অশুভ আতঙ্কে তারাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, নীচে দাসীরা কি একটা কথা লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া গোল করিতেছে; সন্ধ্যা হইয়াছে, তবু কেহ গৃহে প্রদীপ দিয়া যাইতেছে না। ভগ্নপ্রায় হৃদয়ে জোর করিয়া বল বাঁধিয়া তারাসুন্দরী এক জন দাসীকে ডাকিলেন। ভীতপদে দাসী ধীরে ধীরে নিকটে আসিল। তারাসুন্দরী কি জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তখন তাঁহারি প্রাণের ভিতর বড়ই ধড় ফড় করিতেছিল। দাসীও কিছু বলিতে না পারিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এই সময়ে বামনদিদি হন্তথন্ত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে সেই-খানে আসিলেন। তিনি আপনা-আপনি বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন—“আ মর্ মর্, যত বড় মুখ তত বড় কথা! ঝাঁটা খেয়ে দূর হয়ে গেলেন, তবু আস্পর্দ্ধার সীমে নাই। কেন গ্যা? তোরি এত লাফানি কেন?”

বামনদিদি সেই অনুদ্দিষ্ট সম্বোধিতের প্রতি আরও কত অপরের অবোধ্য কথা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

তারাসুন্দরী জানিতেন, তাহার স্বভাবই এইরূপ, সেই জন্য অন্য সময়ে তাহাকে এইরূপ গজর গজর করিতে দেখিলে, হয় সেইখান হইতে চলিয়া

তাহার দিকে চাহিয়া নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন দেখিলেন, সে অর্থ-শূন্য মাথামুণ্ড বকুনির তিল মাত্র বিরাম নাই, তখন একবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি হইয়াছে? কে কি বলিয়াছে?"

বামনদিদি দেখিলেন, আজ স্বয়ং গৃহিণী মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতেছেন ও কার কথা হইতেছে আগ্রহ সহকারে তাহা প্রশ্ন করিতেছেন, আর তাঁহাকে কে পায়? একটা বামনদিদি একেবারে দশটা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ওগো সেই কালামুখী। ছোট লোক জাত স্বতন্তর। সেই যে একটা রূপকথার শেষে আছে, 'আঙার না যায় ধুলে, আর স্বভাব না যায় মলে'—তা মা, এও জান্‌বে তাই। ছি ছি, এক দিনও তো নুন খেয়েছিস্, পাড়ায় পাড়ায় তোর কি এই মিথ্যা কথাটা বলে বেড়ান উচিত? তা সেই যে—"

তারাসুন্দরীর আর বর্দ্দাস্ত হইল না। তিনি যথার্থই বড় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আসল কথাটা কি বলিতে হয় বল না হয় এখান হইতে চলিয়া যাও।"

বামনদিদি জড়সড় হইয়া বলিল, "তা মা, আমায় বকিলে কি করিব? আমরা তোমাদের খেয়ে পরে মানুষ, মিছামিছি তোমাদের একটা নিন্দা কি সহিতে পারি? তাই কি একটা যে সে কথা—ওমা বেদে নেই কোরাণে নেই এমন সর্ব্বনেশে কথা শুন্‌লে কি আর জ্ঞান থাকে?"

তারাসুন্দরী আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বামন ঠাক্‌রুণ তোমার পায়ে পড়ি, কথাটা কি তা ভেঙ্গে বল।"

বামনদিদি জিভ কাটিয়া বলিলেন, "সে কি কথা মা? সে কথা অতি বড় শত্রুতেও মুখে আনিতে পারে না, আমি কেমন করিয়া বলি? শুনে পর্য্যন্ত গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে।" বামনদিদি দেখিলেন, হারাণী ঝি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "তা হ্যাঁ হারাণ, তুইও তো শুনেছিস্, বল্ না।"

তারাসুন্দরীর প্রাণের ভিতর তখন বড়ই আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল। কে জানে কেন চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। বক্ষঃবেপন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "বল বল, আমার অমূল্যের কিছু হইয়াছে কি?"

যারপরনাই ব্যথিত হইয়া বামনদিদি বলিলেন, "কেন মা তুমি অমন কর। নিশ্চয়ই ক্ষেমা সর্ব্বনাশীর মিছা কথা। দাদা বাবু কি করিয়াছেন যে,

"জেল! অমূল্য আমার জেলে গিয়াছে!" হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই কয়টি কথা উচ্চারিত করিয়া শরাহতের ন্যায় তারাসুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। তখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল। দিনের কোলাহল নিবিয়া গিয়া চারি দিক শান্ত হইয়া আসিতেছিল। অন্ধকারে ছায়াপথ বাহিয়া, নীরবতা ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নামিতেছিল। রজনীর সেই অন্ধকারময় প্রথম যামে নীরব গৃহতলে নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া পরিচারিকাগণ দেখিল, তারাসুন্দরী আহতা মৃগীর ন্যায় বিষম যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।

প্রহর অতীত হইয়া গেল। তারাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভীষণ। নয়ন জলশূন্য, হৃদয় স্পন্দনরহিত, কেশপাশ আলুথালু, বদনমণ্ডল ঝটিকারম্ভকালীন ঘনগুরু আকাশের ন্যায় বিষাদগম্ভীর ও ভীতিবর্দ্ধন। দেখিলে ত্রাস জন্মে। ইতিপূর্ব্বে গৃহে আলো দিয়া গিয়াছিল। উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সেই আলোক বাহিরে আসিতেছিল, সেই আলোকে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া পরিচারিকাগণ শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদিনীর ন্যায় একবার উদাস নয়নে তীব্রদৃষ্টি করিয়া, তারাসুন্দরী কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্ত্রস্তপদে পরিচারিকাগণ ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

বাহিরের রাস্তার দিকের জানালার কপাট ধরিয়া, অনেকক্ষণ তারাসুন্দরী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—এত স্থির যে ঠিক্‌ যেন প্রস্তরমূর্ত্তি। নাসায় নিশ্বাস বহিতেছিল কি না, তাহাও সন্দেহ জন্মে। তখন অন্ধকার অনেক তরল হইয়া আসিয়াছিল, সেই অন্ধকারে যতদূর লক্ষ্য হয়, ততদূর দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নির্ব্বাকে স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ তারাসুন্দরী দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন। প্রকাণ্ড দর্পণ আলোকের চূর্ণরশ্মিসম্পাতে ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছিল। সেই দর্পণমধ্যে আপনার বিকৃতমূর্ত্তি দেখিয়া আপনিই শিহরিয়া উঠিলেন। একটা দম্‌কা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বটে, তাই বাছা আমার এদিনও মা বলিয়া ঘরে আসিল না! তাই আমি এত ধড়ফড় করিয়া মরিতেছিলাম। এত করিয়াও আমি কিছু করিতে পারিলাম না। শেষ আপনার ফাঁদেই আপনি জড়াইয়া পড়িলাম। বাছা আমার—যাদু আমার—কেন আমি মা হইয়া তাহার এই সর্ব্বনাশ করিলাম? কেন তাহাকে ইচ্ছা করিয়া শত্রুর হাতে তুলিয়া দিলাম? কেন আপনার পায়ে

বাছাকে খাইবার জন্য? হায় হায় আর কি সে চাঁদমুখ দেখিতে পাইব না? সেই কোমল প্রাণ এত কষ্টে কি বাঁচিবে? অমূল্য রে—বাপ আমার—"

ব্রণমুখ ফাটিয়া গেলে যেমন রুধিরস্রোত নির্গত হয়, তেমনি দর দর ধারায় অশ্রুস্রোত গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই নয়নজলে কপোল, চিবুক ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তারাসুন্দরী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিলেন।

সহসা কি মনে উদয় হইল, তারাসুন্দরী চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন, "না না—এ শোকের সময় নয়। বাছা আমার কারাগারে কাঁদিয়া মাটী ভিজাইতেছে, আর শত্রু গৃহে গিয়া হাসিমুখে আনন্দ করিতেছে—এ সময় শোকের নয়, কাঁদিবার অনেক সময় আছে, আগে শত্রুর চক্ষু দিয়া জল বাহির করি, আগে তার প্রাণে এমনি আঘাত করি, তার পর প্রাণ ভরিয়া যত পারি কাঁদিব। এখন কাঁদিব না। তাহা হইলে শত্রু আরও হাসিবে। এবার আর কাহারও উপর নির্ভর করিব না। আপন হাতে কাজ সারিব। সাক্ষী, হাকিম, বিচার—কিছুরই অপেক্ষা রাখিব না। শেষ অস্ত্র যখন আবশ্যক হইবে প্রয়োগ করিব বলিয়া যত্নে এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহা আজ প্রয়োগ করিব।" গ্রীবা উন্নত করিয়া, আলুলায়িত কেশ দুলাইয়া কঠোর দৃষ্টি করিয়া তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—"দেখি দেখি, কার সাধ্য তাহা ব্যর্থ করে? নরক সহায় হও; ডাকিনী যোগিনী ভৈরবী পিশাচী সকলের সর্ব্বনাশিনী শক্তি আসিয়া আশ্রয় দাও। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—আগে প্রতিহিংসা, তার পর অন্য কথা।"

কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, পলকহীন দৃষ্টি অনলকণা উদ্গীরণ করিতেছে, দন্তে দন্তে নিপীড়িত হইয়া কীটি কীটি ধ্বনি উঠিতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাসে বুকের সমস্ত পাঁজরা গুলা ফুলিয়া উঠিতেছে, কেশপাশ অযত্নবিক্ষিপ্ত হইয়া পৃষ্ঠভাগে দুলিয়া দুলিয়া লুটাপুটি খাইতেছে, অঙ্গের বস্ত্রও শিথিলতা প্রযুক্ত দেহ হইতে স্খলিত হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। শাবকহারা কুপিতা সিংহিনী যেমন আততায়ীর উদ্দেশে গর্জ্জন করিতে করিতে ভীষণা হইয়া দণ্ডায়মান হয়, সে মূর্ত্তি তেমনি ভীষণা হইয়াছে।

ধীরে ধীরে বাক্স মধ্য হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া যতনে তাহা বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। একবার গৃহগাত্র সংলগ্ন ঘটিকার প্রতি চাহিলেন। তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছিল। "আর না—আর না—সময় বহিয়া যায়।"

ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া খিড়কির দ্বার খুলিয়া তারাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন। কাঠের পুতুলের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া পরিচারিকাগণ দাঁড়াইয়া রহিল। একটিও কথা কাহারও মুখে আসিল না।

অন্ধকারে অন্ধকারে অলক্ষিতে এক জন লোক ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ক্রমশঃ।

সাংখ্যস্বরলিপি।

পরিচয়।

শঙ্করা—তাল পটতাল।

দেখে দেখে লোক বুঝেছি আলোক হই সাবধান ভাবী ভাবীভ্রম;
কি হেতু বিলাপ কি হেতু প্রলাপ বুঝেছি কিরূপ সরম বিভ্রম;
(এবে)—ছাড়ি অপলাপ করিছি আলাপ বুঝেছি কিরূপ এ মান সম্ভ্রম।

তালি। ১ঃ (স্থা, স্ত আরম্ভ)। ০।
মাত্রা। ৪ । ৪ ।

"২...............

বা স্‌রে সা । নি ধা

২.... ......

(স্থা) । ন্‌সা স্ম "নি ধা । পা মা"— ২পা ।
(স্থা) । দে খে দে খে । লো — ক্ ।

২

। পা নি ধা ধ্‌সা । ৪নি । পা পা গা২ । গ্‌পা৪ ।
। বু ঝে ছি আ । লোক্ । হ ই সাব্ । ধান্ ।

। গা — মা রে গা । রে২ — সা২ ২সা । সা মা
। ভা — বি ভা । বী — ভ্রম্ । হ ই

২

স্‌গা২ — নি২ । ২রে ২সা । গা মা পা প্‌সা ।
২
সা — । —ব্ ধান্ । ভা — বি ভা ।

২

নি — ধা — ধ্‌সা নি । পা২ — ধা২ — পা২ — মা২ — পা২ —
বী — — — । — — — — —

গা — রে । — গা — রে ২সা । (স্ত—প্র) । পা পা
— — । — — ভ্রম্ । (স্ত—প্র) । কি হে

২.................................. ২.........

নি নি । ৪সা । সা সা স্‌রে নি । ৪সা
তু মি । লাপ্ । কি হে তু প্র । লাপ্

....

স্‌রে২ রে সা । সা৪ । স্‌রে২ সা — নি । — ধা
বু ঝে — । ছি । । বু — — । —

— পা — মা — প্ম । — গা২ — গ্‌মা সা । সা৪ । সা২
— — — । — — ঝে । ছি । কি

২.....................

সৃমা — গা । — গৃপা — ৴মা — ৴মৃধা — পা । পৃসা সা সৃরেꣳ

রূ — । — — — — । স র ম

.... ২ ২

— রেꣳ — নিꣳ — সাꣳ । । নি — ধা — ধৃসা — নি

— — — । । বি — — —

। — পাꣳ — ধাꣳ — পাꣳ — ৴মাꣳ পাꣳ

গা রে । রূগা রে সা২ । (স্ত—দ্বি) । পা

— — । — — ভম্ । (স্ত—দ্বি) । ছা

২.. ২ ২

পা পৃসা সা । ৪সা । সা নি নৃসা নি । সা২

ড়ি অ প । লাপ্ । ক রি ছি আ । লাপ্

২.........................

পা পা । পাꣳ ৴মাꣳ ৴মৃধা পা পৃসা । ৪সা ।

এ বে । ছা — ড়ি অ প । লাপ্ ।

.... ২ ২..

সা নি নৃসা নি । ৪সা । সৃরে২ রেꣳ সাꣳ ।

ক রি ছি আ । লাপ্ । বু ঝে — ।

....

সা৪ । সৃগা২ — রে — সা । — নি — ধা — পাꣳ — ৴মাꣳ — পা ।

ছি । বু — — । — — — — — ।

— গা — গৃমা২ সা । । সা৪ । ২সা সৃমা — গা । — গৃপা —

— — ঝে । । ছি । কি রূ — । —

২.............. ২

৴মা — ৴মৃধা — পা । পৃসা২ সৃরেꣳ — নিꣳ — সা । — নি — ধা

— — — । এ মা — — । — —

২

— ধৃসা — নি । পাꣳ — ধাꣳ — পাꣳ — ৴মাꣳ — পা — গা — রে ।

— — । স — — — — — — ।

২

— গা — রে সা২ ॥ সৃসাঃ

— ম্ ভম্ ॥ দে

এইবার হইতে আমরা স্বরযোগের মুখ্যচিহ্নকে শুদ্ধ স্বরযোগের প্রকৃত—বিশেষ চিহ্নরূপে এবং তাহার গৌণচিহ্নদ্বয় কমা বা ছেদ এবং ব্যবধানকে বিয়োগচিহ্নরূপে দেখিব। ইহাদিগকে এইবার হইতে স্বরবিয়োগচিহ্নরূপে ধরা যাইবে। কিন্তু এই স্বরবিয়োগচিহ্ন সাধারণ স্বরযোগালঙ্কারের অধীনে থাকিবে। কারণ, যেমন সত ও অসতের মধ্যে সত প্রধান, সেইরূপ যোগ ও বিয়োগের মধ্যে যোগ প্রধান। যোগের আপেক্ষিক ভাবে বিয়োগ কার্য্য করে। মূলে যোগের প্রাধান্য থাকাতেই দেখা যায় যে, কোথাও বিয়োগ খাঁটি বিয়োগভাবাপন্ন নয়, কিন্তু যোগাত্মক বিয়োগভাবাপন্ন।

স্বরবিয়োগের চিহ্ন = — =, = ব্যবধান।

এখন হইতে স্বরবিয়োগ এবং থামাকে একপ্রাণ বলিয়া ধরিতে হইবে; তাহাদের মধ্যে স্থূলতঃ কোনও ভেদ নাই। অপর এক সময়ে ইহা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্মযোগী ভূদেব ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক এত দিন অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, আজি তাহা অস্তমিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য!

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশ মনীষিশূন্য হইয়াছে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী বঙ্গে পদক্ষেপ করিয়াই ভূদেব ও বিহারীলালকে হরণ করিল। যাহা গেল, তাহা বহুমূল্যবান; ক্ষতিপূরণের আশা অল্প।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার গ্রন্থিস্বরূপ, মিলনবিন্দুস্বরূপ, ভূদেব এ দেশে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ভক্তিযুক্ত হিন্দু, জ্ঞানে উদার সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, শাস্ত্রে প্রগাঢ় চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজে বহুদর্শী ধীর সংস্কারক, পরিবারে প্রীতিপরায়ণ কর্ত্তব্যশরণ কর্ম্মযোগী, স্বয়ং শত সহস্রের শিক্ষক অথচ আজীবন শিক্ষার্থী শিষ্য, ভূদেব, স্বীয় জীবিতকাল কর্ম্মযোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভূদেবের জীবিতকালে তাঁহাকে বিষয়ী সংসারী বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার দেহাত্যয়ের পর দেখা গেল, ভূদেবের শাস্ত্রচর্চ্চা নিষ্ফল নহে; গীতার উপদেশে তিনি নিজ জীবনযাত্রা, সংসারপ্রণালী নিয়মিত করিয়াছিলেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষক ও শিষ্য, নিষ্কাম ভাবে চিরজীবনসঞ্চিত প্রচুর অর্থ দান করিয়া বঙ্গে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

ভূদেব-চরিত্রের মূল সূত্র, তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, পাশ্চাত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে, তাঁহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এক দিকে বিলাতী শিক্ষার নয়নান্ধকারী উজ্জ্বল চাকচিক্য, অন্য দিকে স্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ব্বাণোন্মুখ বিকৃত বহিরালোক, ভূদেব উভয়ের একটিকেও নিজের লক্ষ্য করেন নাই। বিচারকুশল প্রাচীনকালের প্রবীণ আর্য্যের ন্যায়, নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তির সাহায্যে, উভয়ের অন্তর্নিহিত সার্ব্বভৌম উদার আলোকে উভয়কে বুঝিয়াছিলেন,—চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নিজের গন্তব্য পথের নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় এক দিকে প্রধাবিত বাঙ্গালী সমাজে এ দৃশ্য আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

ভূদেব না ভাবিয়া কিছু করিতেন না,—নিজের চিন্তা ও বিচারশক্তির সাহায্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিতেন। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি,—কেবল সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না, এই সকল গ্রন্থে, তিনি নিজের হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশে আন্তরিকতা বড় অল্প। কিন্তু ভূদেবে এই আন্তরিকতা বড় প্রবল ও প্রভাবপূর্ণ ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী সাহিত্যবিলাসের উদাহরণমাত্র নহে,—তাঁহার আন্তরিকতার ফল। তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, স্বদেশ ও সমাজকেও সেই কর্ত্তব্যপথে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কারকের আড়ম্বর ছিল না। পারিবারিক প্রবন্ধে যে হিন্দু পরিবারের চিত্র দেখিতে পাও, ভূদেব নিজের পরিবারটি তদনুরূপ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের আদর্শেই তিনি সমাজের সহিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আচার প্রবন্ধে তিনি যাহা সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিজে সেই আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। জীবন ও জীবনের কার্য্যে এমন ঐক্য, বাঙ্গালীজীবনে দুর্লভ।

ভূদেব বাবুর সকল মত সকলের অনুমোদিত বা স্বীকার্য্য হইবে, এমন মনে করা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, ভূদেব কেবল উপদেশ দিয়া বিরত হন নাই, নিজে আজীবন স্বকীয় অভিমতকে ভিত্তি করিয়া, আত্মপরিবার গঠন করিয়াছেন, সমাজের সহিত ব্যবহারে আসিয়াছেন, সদাচারপূত হইয়া শাস্ত্রানুশীলনে, ধর্ম্মচিন্তায় এবং স্বদেশের ও সমাজের মঙ্গলানুধ্যানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং সেই জীবন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তাহার পরিণাম, বাঙ্গালীর উত্তম আদর্শ;—তাঁহার চরিত্র, পরার্থপর অথচ আত্মস্থ,—সংসারলিপ্ত অথচ নিষ্কাম বীরের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁহার চরিত্র ও সামাজিক ব্যবহার হইতে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

ভূদেব নিঃস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিলাতী শিক্ষায় ও ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও, স্বদেশীয় শাস্ত্রে আস্থাবান ছিলেন। তিনি আজীবন অধ্যাপকশ্রেণীর ভক্ত ছিলেন,—মৃত্যুকালে সেই হৃদয়ের ভক্তি কার্য্যে পরিণত ও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ভূদেব যে অর্থরাশির উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,—এবং তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে"

জীবনে তাহার অনুশীলন করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন,—তাহার প্রায় সমুদায়—দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা, সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষার, হিন্দু শাস্ত্রের ও অধ্যাপকবর্গের উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। মনে করিয়া দেখ, গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান,—চিরজীবনের কঠোরপরিশ্রমলব্ধ অর্থ কিরূপে ব্যয়িত করিলেন। ভূদেব যদি আর কিছুও না করিতেন,—কেবল এই এক সাত্ত্বিক নিষ্কাম দানে তাঁহার নাম বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

বদান্য ভূদেবের দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকুক। ভূদেবের জীবন-তত্ত্বের অনুশীলনে ও অনুসরণে, বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবন প্রশস্ত ও পবিত্র হউক।

রত্নাবলী।

নিস্তব্ধ নিশীথ অতি, লতা-ফাঁস ল'য়ে করে,
রজত-জ্যোছনা-স্নাত বিজন বাগান পরে
নতজানু হ'য়ে বালা বসি বকুলের তলে,
মুখেতে চাঁদের আলো, তরুছায়া পড়ে কোলে!
লতাটির মত ক্ষীণ সুললিত তনু তার,
এলায়ে প'ড়েছে পিঠে দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার!
শুভ্র ফুল দলে যেন মধুর মু'খানি গড়া,
স্বর্গ পানে উন্মীলিত স্বপন-আবেশ-ভরা
দুখানি বিশাল আঁখি, মেঘের স্নিগ্ধতা মাখা
নিবিড় তিমির তারা পল্লবে আধেক ঢাকা!
পরিপূর্ণ অশ্রুবাষ্প টলমল, তারি পরে
থর থর চন্দ্রালোকে কাঁপিতেছে সকাতরে!
রক্তপুষ্পপুটতুল্য রুদ্ধ ওষ্ঠাধর দুটি
সৌরভ মধুর ভরে করে যেন ফুটি ফুটি!
নবনীনিন্দিত বুক আধ অনাবৃত করি
অঞ্চল পড়িছে খসি, হাত খানি তদুপরি
রাখিয়া, করুণকান্তি সুকুমারী কচি মেয়ে
বিষাদকোমল ভাবে আকাশের পানে চেয়ে
কহিছে কাতর কণ্ঠে,—"হে কন্দর্প, মায়াময়!
কেন প্রেমপুষ্পশরে বিঁধিয়াছ এ হৃদয়?
সসাগরা ধরণীর তিনি রাজরাজেশ্বর;
ধনে মানে ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজন পর;
লক্ষ্মীর প্রতিমা সম রূপবতী রাণী তাঁর,
নহি আমি পদপ্রান্তে দাসীযোগ্যা হইবার!
আমি ভালবাসি তাঁরে! শুনিলে হাসিবে ধরা,
তবে এ দুরন্ত সাধ কেন গো হৃদয়ভরা?
কত ঊর্দ্ধে ওই চাঁদ সোনার তারার দলে,
রজত রজনীগন্ধা ফুটে হেথা ধরাতলে;
ইহার সৌরভ কেন উচ্ছ্বসিছে ওর পানে?
নাগাল না পাবে কভু এ কি তাহা নাহি জানে?
প্রভাতে এ ঝরে ঝ'রে ফুরাবে সকল ব্যথা,
কেহ না জানিতে পাবে গোপন প্রাণের কথা!
তেমনি নিশীথে এই অনাথা দুঃখিনী বালা,
মৃত্যুর শীতল স্পর্শে নিবাবে প্রেমের জ্বালা।
এই শ্যাম শষ্পগুলি চরণপরশে তাঁর
হ'য়েছে পবিত্র অতি, শেষ শয্যা এ আমার!
প্রভাতভ্রমণে কাল এসে হেথা নরপতি,
থমকিয়া হেরিবেন হইয়া বিস্মিত অতি,
তরুমূলে বৃন্তচ্যুত বিশুষ্ক যূথিকা সম,
প'ড়ে' আছে প্রাণহীন এ তরুণ তনু মম!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।
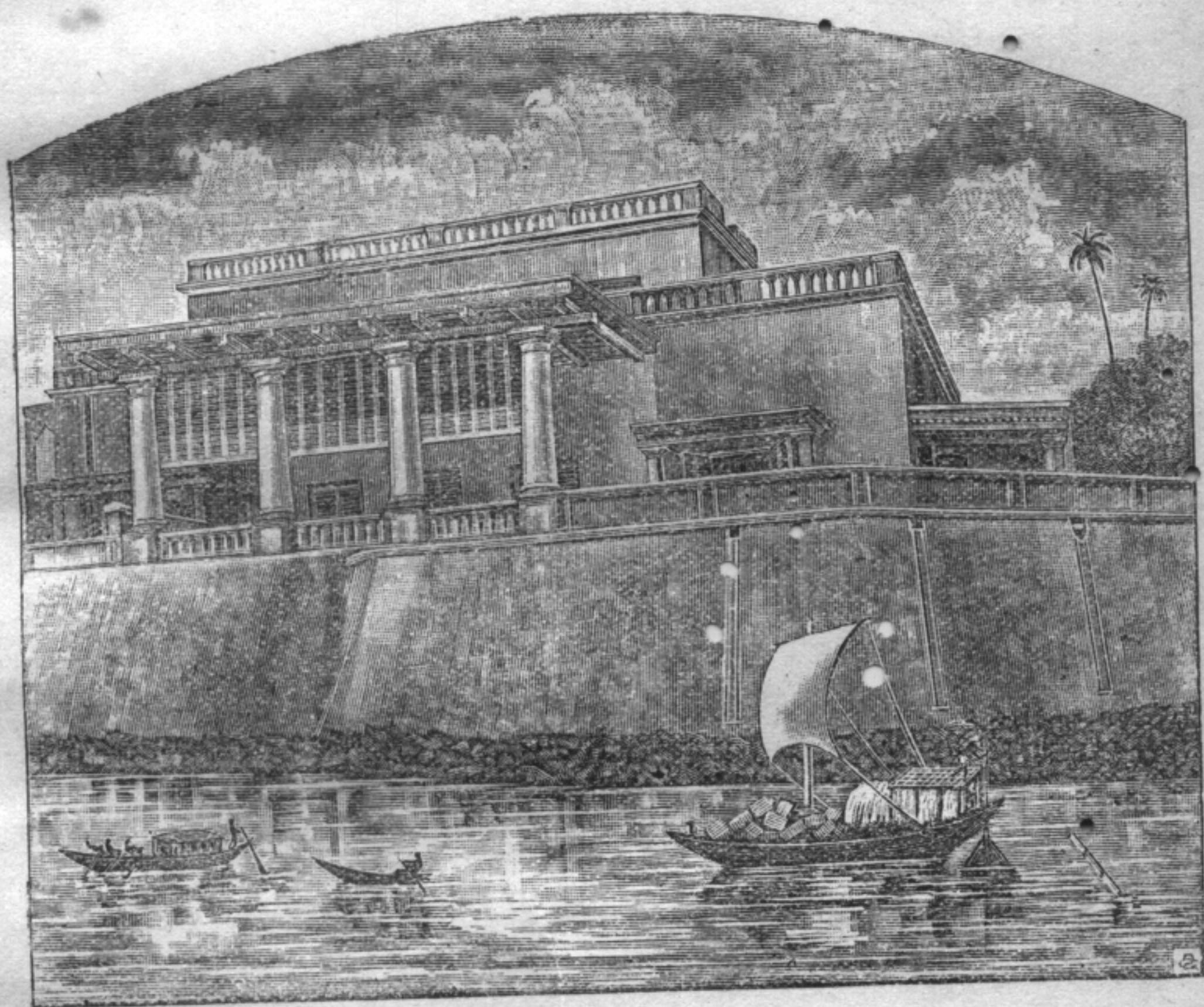
সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্যে, বাস্তববাদ (Realism) ও আদর্শবাদ (Idealism) এতদুভয়ের কলহ নূতন না হইলেও, আজকাল বড় বেশী মাত্রায় চলিয়াছে। বাস্তববাদের এমনই মোহ যে, লোকে পরিণাম গণনা না করিয়া দলে দলে উহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। আর লোকের মতি-গতি বুঝিয়া বাস্তববাদী লেখকেরাও পদ্ধতিটাকে দিন দিন নিতান্ত হীন ও জঘন্য করিয়া তুলিতেছেন। যাঁহারা পবিত্র শিল্পসৌন্দর্য্য এবং আদর্শের উপাসক ও মনুষ্যসমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের বাস্তবিকই একটা বিষম ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে।

Realismএর প্রভাব।

এপ্রিল্ মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে, কাউন্টেস্ কাউপার উপরি-উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। Realism কিম্বা Idealism প্রকৃতপ্রস্তাবে দূষ্য না হইলেও, ইহাদের উপর কলঙ্কের দাগ লাগিয়াছে। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কাউন্টপত্নী শব্দ দুইটির অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের বাস্তববাদীগণ Realiam কথাটার প্রকৃত অর্থ কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ডাক্তার জন্সন্ বলেন, "যাহা সত্য, প্রত্যক্ষ, অকৃত্রিম, তাহাই Real; আর যাহা মানসিক, বুদ্ধিগত, কল্পিত, তাহাই Ideal."। আপাততঃ দুইটি পদার্থকে নিতান্ত বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এতদুভয়ের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ; এমন-কি, কলাবিদ্যায় একটিকে অপরটি হইতে বিযুক্ত করিলে উভয়েরই প্রভূত ক্ষতি। কাব্য-সাহিত্যে উভয়েরই অল্প বিস্তর প্রয়োজন আছে; Real এবং Idealএর সম্মিলন দেখাইতে না পারিলে কোনও কাব্যগ্রন্থই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

Real ও Ideal ইহাদের প্রকৃত অর্থ কি?

এই সম্মিলনের উপায় কি? কাউন্টেস্ তাহা বলিয়া দিয়াছেন,—"যাহা সত্য ও প্রকৃত, তাহারই উপর গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তৎপরে বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনার সাহায্যে উহার বিশিষ্ট বিকাশ সম্পাদন কর। কিম্বা যদি কল্পনার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া থাক, তবে যাহাতে সেই কল্পনা পরিণামে সত্য ও প্রত্যক্ষ কোনও একটা পদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হও।"

সম্মিলনের উপায়।

সচরাচর সত্য ও মিথ্যা ভেদে দুই প্রকারের Realism ও Idealism দৃষ্টিগোচর হয়। যথার্থ বাস্তববাদী জগৎকে যেরূপ দেখেন, ঠিক সেইরূপই বর্ণনা করেন; দোষ-গুণ, সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য, কিছুই ঢাকিয়া রাখেন না। কিন্তু যিনি ইহার অপব্যবহার করেন, তিনি সৌন্দর্য্যের অংশগুলি চাপা দিয়া, কেবল কুৎসিতের বর্ণনা করেন; অথবা, যাহা ছায়া এবং আলোক উভয়েই গঠিত, তাহাকে কেবল নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রতিপন্ন করিয়া ফেলেন। প্রকৃত আদর্শবাদ, সত্য ও বাস্তবের উপর নির্ভর করিয়া, উহাকে কমনীয় রূপ ও গুণরাশি দ্বারা এরূপে বিভূষিত করেন যে, আমরা উহার অপূর্ব্ব, অপার্থিব সৌন্দর্য্যে একেবারে বিমোহিত হইয়া যাই। ঝুঁটা আদর্শবাদীগণ, দাঁড়াইবার স্থলটাকে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবিয়া, একবারে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হন; আর এই ধূলি-মৃত্তিকাময় সংসারের সহিত কোনও প্রকার সম্পর্ক লজ্জাকর মনে করিয়া, কোন নিরুদ্দেশ সাগরে

Realism ও Idealism সত্য ও মিথ্যা ভেদে দ্বিবিধ।

আপনাদের কল্পনা-তরণী ভাসাইয়া দেন। এই প্রকার কপট Realist ও কপট Idealist, উভয়েই নিন্দার্হ।

বাস্তববাদীর যুক্তি।

বাস্তববাদীগণ আত্মপক্ষসমর্থনার্থ দুইটি যুক্তি প্রদান করেন। প্রথম,—কুৎসিতের ভিতরেও সৌন্দর্য্য আছে; তাহা কেবল Realist দেখিতে পান। দ্বিতীয়,—সকল অবস্থাপন্ন লোক ও সকল জিনিষেরই চিত্র অঙ্কিত করা কবির কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্র অশ্লীল ও হেয় হইলেও ক্ষতি নাই। কারণ, উহা স্বভাবের অবিমিশ্র, নিখুঁত ফটো। Realist কেবল আবরণখানি উন্মোচন করিয়া দেন। প্রথম কথাটি মন্দ নহে। দ্বিতীয় কথাটির কোনও মূল্য নাই। কারণ, যাহা অশ্লীল ও হেয়, তাহা কোনও মতে কাব্যের বিষয় হইতে পারে না। আসল কথা, বাস্তববাদীগণ আপনাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারাই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তিবশতঃ ইহাঁরা Idealismএর ছায়া দেখিলেও আতঙ্কে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ইঁহারা Real ও অশ্লীল এতদুভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন;—যেন Real হইলেই অশ্লীল। ইঁহাদের বিশ্বাস যাহা আদর্শ, তাহা সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু সত্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই।

বাস্তববাদীর ভ্রম।

এইরূপে বাস্তব ও আদর্শের সামঞ্জস্যবিধান ইহাঁদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং Realisticএর নাম শুনিলেই আজ কাল আমাদের মনে অতি ভীষণ একটা বীভৎস ভাবের উদয় হয়। ইহা সমাজের পক্ষে বড় শুভকর নহে।

চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য।

ফরাসী-রাজ্যে চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্যে এখন Realismএর পূর্ণাধিপত্য। জার্ম্মাণি, বেলজিয়ম প্রভৃতিও সেই পথের পথিক। পারিসের বার্ষিক প্রদর্শিনীতে কয়েক বৎসর হইল, ৫,০০০ হাজার করিয়া যে চিত্র প্রদর্শিত হইত, তাহার অধিকাংশই অশ্লীল উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি; অথবা অস্ত্রচিকিৎসালয় হইতে গৃহীত মুমূর্ষু বা মৃতের ভীষণ প্রতিকৃতি।

সাহিত্য,—উপন্যাস।

সাহিত্য,—উপন্যাসের অবস্থাও তদ্রূপ। কয়েক জন ফরাসী ঔপন্যাসিক মানব-প্রকৃতির নিকৃষ্টতম অংশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে এমন লোক আছে, যাহারা সয়তানের পূর্ণাবতার;—কোনও প্রকার সৌন্দর্য্য বা সাধুতার লেশমাত্র তাহাদের ভিতর দেখিতে পাইবে না। এই সকল মানব-পশুর আপাদমস্তক ছবি তুলিয়া লোককে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু, পূর্ণপাষণ্ডতা বিশ্বপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আলো ও ছায়ার ন্যায় এ জগৎ সর্ব্বত্রই ভাল মন্দে মিশ্রিত। অধিকন্তু, কোনও চরিত্রে মন্দের অত্যন্ত আধিক্য থাকিলেও, তাহাকে সেইভাবে চিত্রিত করিয়া কোনও উপকার নাই; বরং অপকার আছে। একদেশদর্শী চিত্রের শিক্ষা সর্ব্বথা নিষ্ফল; লাভের মধ্যে নূতন নূতন পাপাচার সম্বন্ধে লোকের একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া যায়।

জোলা ও বুর্জেট।

মঁসো জোলার নবেলগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষকে অতি কদর্য্য অবস্থায় স্থাপিত করিয়া, তিনি তাহাদের কদর্য্য পাশব-লালসার এরূপ জীবন্ত ও রঙ্গভঙ্গীময় বর্ণনা প্রদান করেন যে, তাহাতে পাঠকের অবৈধ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন, আর কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। জোলা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, তাহা মঁসো বুর্জেট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

রঙ্গালয় ও নাটকের অবস্থা আরও শোচনীয়। এমন কদর্য্য, অশ্লীল দৃশ্য নাই, যাহা আজ কালকার নাট্যমঞ্চে প্রদর্শিত না হইতেছে। ইহা নাটককারের দোষ

বাস্তববাদীগণ যদি বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী হন, তবে ইন্দ্রিয়জাত সুখ দুঃখ এবং বিকৃত বা পীড়িত মস্তিষ্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাদের সহজবুদ্ধিটা একটু সূক্ষ্ম করিয়া লউন; আর জাগতিক পদার্থসমুদায়ের বাস্তবিক যে অবস্থা, তৎপ্রতি মনোযোগী হউন। আদর্শের কথা একবারে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যে হেতু ঐ উপেক্ষাই তাঁহাদের দুর্গতির একমাত্র কারণ।

বাস্তববাদীর কর্ত্তব্য।

মনুষ্যপ্রকৃতি যে বাস্তববাদে সন্তুষ্ট নহে, তাহার একটা প্রমাণ ফটোগ্রাফি। ক্রমওয়েলের মত আজ কাল আর বড় কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না—"Paint me as I am, or I wont pay you a shilling." ফটোগ্রাফারদিগকেই জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বাবু ও বিবিগণের অন্যায় আবদারে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যিনি নিভাঁজ কালো, তিনি চান মুখখানি শ্বেতপদ্মের ন্যায় সুন্দর হইবে; আর তদুপরি ঈষৎ গোলাপীর একটু আভা খেলিবে। যাঁহার চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, ক্ষুদ্রাকৃতি, তিনি বলেন, চক্ষু দুইটি ভাসা-ভাসা বিশালায়ত না হইলে ছবি লইবেন না। ইত্যাদি আরও অনেক আবদার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়। খোদার উপর এই খোদ্‌কারী ভাল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু ফটোগ্রাফি যে Realism-এর একটা প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ঠিক।

ফটোগ্রাফি ও বাস্তববাদ।

কাউণ্টেসের শেষ কথাগুলি বড়ই সত্য এবং প্রয়োজনীয়। আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের জন্য আমরা আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়া দিলাম।—"বিশাল আকাশের মত একটা উচ্চ আদর্শ মাথার উপর না রাখিয়া, কেবল Realismএর মৃত্তিকা ঘাঁটিয়া বেড়াইলে কর্দ্দম ও ময়লার ছিটাই আমাদের পুরস্কার। অন্য পুরস্কারের আশা করাও অন্যায়। পক্ষান্তরে, চতুর্দ্দিকব্যাপী সত্য ও প্রত্যক্ষের সংস্পর্শ একবারে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল স্বপ্ন ও কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হইয়া থাকিলেও চলিবে না। স্পর্শক্ষম সহজবোধ্য সত্য প্রত্যক্ষের প্রতি মনুষ্যের যে একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, উহাতে তাহার অবমাননা করা হয়। আমরা পূর্ণতার ভিখারী। এ জগতে অসম্ভব হইলেও অপর কোনও জগতে তাহা মিলিবে না, এমন কে বলিতে পারে? অতএব যদি পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে চাও, তবে বাস্তব ও প্রত্যক্ষের উপর কাব্যের ভিত্তি সংস্থাপিত কর; তার পর, সর্ব্বোচ্চ আদর্শের কল্পনা করিয়া, উহার সহিত সংযোজিত করিয়া দাও।"—অর্থাৎ, কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার Skylark সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, কাউণ্টেস্ কাব্যকারদিগের সমক্ষে সেই আদর্শই ধরিতে চান—

কাউণ্টপত্নীর শেষ কথা।

মীমাংসা।

"Type of the wise who soar, but never roam;
True to the kindred points of Heaven and Home."

আদর্শ-উন্নতির পথে মনুষ্য-সমাজের সাহায্য করাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু, আমাদের অভাব কি, বুঝিতে হইলে, কি আছে, তাহারও কতকটা জ্ঞান থাকা চাই। এইখানেই Realএর আবশ্যকতা। তবে মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনার্থ যতটুকুর প্রয়োজন, কাব্যগত Realism যেন তাহাকে অতিক্রম করিয়া না উঠে। অশ্লীলতায়, কুৎসিত কদর্য্য দৃশ্যে সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয়; সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয়। আর, কাউণ্টেস্ মহোদয়া বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের যে সম্মিলনের কথা বলিয়াছেন, তাহা মনুষ্যপ্রকৃতির পূর্ণচিত্রাঙ্কনে প্রয়োজনীয় হই-[illegible] Realism এর একটা উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। জগৎ-পদ্ধতি ভালমন্দে মিশ্রিত,

লাভের সম্ভাবনা। প্রতিভার অধিকারীগণ এ পর্য্যন্ত তাহা করিয়াও আসিতেছেন। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ,—বাল্মীকি, কালিদাস, টেনিসন, হুগো প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত;—সার্বণ্টিস্, সুইফ্‌ট, ইত্যাদি। ব্যঙ্গ কাব্য, শ্লেষ-প্রহসন প্রভৃতির যে একটা উপযোগিতা আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলে না, অথচ এই সকল গ্রন্থে মনুষ্যপ্রকৃতির কেবল নিকৃষ্ট অংশেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

সমাজ-তত্ত্ব।

উপস্থিত সংখ্যা নাইটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে সার্ জন্ সিমন "আদি কালের সামাজিক শাসন" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

অনৈতিহাসিক কাল হইতে কোনও প্রকার সত্য আবিষ্কার করা বড় সহজ নহে। মানুষের আদিম অবস্থার ছবি আঁকিতে গিয়া আমরা অনেক সময় আপনাদিগকেই চিত্রিত করিয়া ফেলি। সত্য-মিথ্যা, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয়ে সভ্য নর নারীর যে জ্ঞান, আমরা ভাবি, অসভ্যাবস্থায়ও ঠিক ততদূর না হউক, কতকটা এই রকমই ছিল। সুতরাং, এ সকল কথার কোনও সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অতীব সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীস্থ সকল প্রাচীন জাতির ইতিহাসের প্রথমাংশ বংশপরম্পরাগত কিম্বদন্তীতে পরিপূর্ণ। উপস্থিত বিষয়ে এই সকল প্রাচীন জনপ্রবাদই আমাদের প্রধান অবলম্বন। প্রাণীবিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ হইতেও কতকটা আলোক পাওয়া যায়। পরন্তু, এখনও অনেক জাতি সভ্যতার অতি নিম্নতম সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের অবস্থার সহিত আমাদের পূর্ব্বোপায়লব্ধ তত্ত্বগুলির সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইলে তাহা বোধ করি অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না। জীবজগতে আত্মরক্ষা ও আত্মসুখসাধনই প্রকৃতির প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। এই নিয়মের বশে মানুষ নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। একমাত্র বিবেক বা হিতাহিতবুদ্ধি ব্যতীত মানবমনে এই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির অপর কোনও অন্তরায় নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে বংশরক্ষা ও অপত্যপালনেরও একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

জীবন-সংগ্রামে পরস্পরের সহায়তা প্রকৃতির আর একটি নিয়ম। এই প্রবৃত্তি যে জাতির মধ্যে যত প্রবল, জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিবার তাহাদের ততই সম্ভাবনা। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, এই দুই বৃত্তির যথাপরিমিত ও সুসঙ্গত পরিচালনই মানব-জাতির উন্নতির উপায়। নীতিবিজ্ঞান আর কিছুই নহে; কেবল এই দুই বৃত্তির মধ্যে কোনও প্রকার বিরোধ উপস্থিত না হইয়া যাহাতে সাধারণের হিতসাধন হয়, তাহারই ব্যবস্থামাত্র।

ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে যে সকল মনুষ্য-সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ বংশ বা পরিবার হইতে সমুদ্ভূত। এই সকল পরিবার বা বংশ কালক্রমে বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইয়া অবশেষে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িত। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ খুব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে, পরস্পরের মধ্যে যে কখনও শোণিতের সম্পর্ক ছিল, তাহা আর কাহারও মনেই আইসে না। কিন্তু, যেমন এক দিকের বন্ধন এইরূপে ঘুচিয়া যায়, স্বশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি প্রাণের আকর্ষণটা তেমনই বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

আসিরিয়া, মিশর, গ্রীস্, রোম প্রভৃতির প্রাচীন ইতিহাসে যে সমুদয় যক্তি[illegible]

হয়। প্রায় এই সকল সংগ্রাম ও কলহ যে অনৈতিহাসিক পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেও সংশয় থাকে না। চারিদিকে কেবল হত্যা ও শোণিতপাত। প্রাচীনতম কিম্বদন্তীসমূহও ইহার সাক্ষী। রাক্ষস, দৈত্য, অসুর ইহারা মানুষেরই পূর্ব্বপুরুষ, বিজয়লাভার্থ কেবল রক্তস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইত। দেবতারাও মানবের সাহায্যার্থে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেন। পুরাণ-কল্পিত স্বর্গরাজ্য পর্য্যন্ত সংগ্রামস্রোতে বিপর্য্যস্ত। এ স্বর্গলোক আর কিছুই নহে;—তখনকার ভূলোকেরই অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে যে কত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে, কত জাতি যে একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্য স্থির করিয়া বলা সম্ভাবিত নহে। আধুনিক সুসভ্য সময়ের বিগ্রহাদির পরিণাম ভাবিয়া দেখিলেই তাহা অনেকাংশে উপলব্ধ হইবে। কিন্তু তথাপি ইহাতে এমত বুঝায় না যে, তদানীন্তন লোকদিগের হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কোনও ভাবেরই অস্তিত্বমাত্র ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বার্থপরতা যেরূপ স্বাভাবিক, পরার্থপরতাও তদ্রূপ। বর্ত্তমান স্থলেও তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। একদিকে যেমন স্বার্থরক্ষার্থ শত্রুনাশের আগ্রহ, অপরদিকে তেমনই জাতীয়ত্বের বন্ধন ও প্রতিবেশী সম্প্রদায়বর্গের সাহায্য।

উপরি-লিখিত জাতীয়ত্ব কথাটার উপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, ঐ জাতি স্নেহ বশতঃই ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতি-গত স্বার্থের ভিতর ডুবিয়া পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জাতির মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব একবারে লুপ্ত হইয়া যাইত। কোনও দৈব দুর্ঘটনা না ঘটিলে জাতিভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কখনও কোনও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইত না। জাতিবিশেষের অভ্যন্তরে পূর্ণ সহানুভূতি ও সহায়তার ভাব সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত। ১৮৯১ সালের এপ্রিল সংখ্যা সেঞ্চুরীতে প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্ ঐ কথা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনের উপর জাতিগত জীবনের এতদূর প্রাধান্য ছিল যে, প্রতি বৎসরেই রাশি রাশি লোক স্বজাতির কল্যাণার্থ দেবতার সমক্ষে আপনাদের প্রাণ পর্য্যন্ত সানন্দে বলি দিত।

জাতি-প্রাধান্যের জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ আর একটা কথা লিখিত হইতেছে। খাদ্যাভাবের ভয় প্রাচীনদিগের মধ্যে এরূপ প্রবল ছিল যে, যাহাতে কোনও লোক খাদ্য-আহরণে কোনও প্রকার সাহায্য না করিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া উদর পূর্ণ করিতে না পায়, তদ্বিষয়ে নানা উপায় অবলম্বিত হইত। যাহারা অকর্ম্মণ্য, বৃদ্ধ, পীড়িত,—কেবল সমাজের ভারস্বরূপ,—তাহাদিগকে আত্মহত্যা দ্বারা কিম্বা অপরের সাহায্যে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। জাতি-রক্ষার্থ যতদূর প্রয়োজন, নবজাত শিশুদিগের সংখ্যা তাহার অতিরিক্ত হইলে, তাহারাও বিনষ্ট বা পরিত্যক্ত হইত। এই নিয়মটা প্রধানতঃ কন্যা বা রুগ্ন সন্তানদিগের উপরেই খাটিত। যাহাতে বেশী সন্তান জন্মাইতে না পায়, সে জন্যও কতকগুলা কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত ছিল।

সিমন্ সাহেব বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত প্রথা হইতেই মানব-মনে ক্রমশঃ নীতিজ্ঞানের উদয় হইল। তাঁহার কথাগুলি এইস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম;—"যে জাতি জীবন মরণের উপর এরূপ প্রভুত্ব চালাইত, তাহারা কখনই নীতির সাধারণ স্বাভাবিক সূত্রগুলি উপেক্ষা করিতে পারিত না। বিপদআপদের পরিমাণ নির্দ্ধারণার্থ এবং নির্দ্দিষ্ট উপায়ের প্রয়োগার্থ ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই তাহাদের ক্রমশঃ একটা শিক্ষালাভ হইয়াছিল। এইরূপে, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে মারিতে হইবে, কোন্ উপায় ছাড়িয়া কোন্‌টিকে বাছিয়া লইতে হইবে, ইত্যাকার বিষয়ের বিচার করিতে করিতে মানবের চিন্তা সত্বরেই নীতির গভীর তত্ত্বে আসিয়া উপনীত হইল।" তা'র পর ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত সাধুচিত্তের লোকেরা স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া

পরার্থের কথা ভাবিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা ব্যক্তিগত স্নেহবশতঃ বৃদ্ধ ও বালকদিগের হত্যাবিষয়ে জাতীয় সভায় আপত্তি উত্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে কোনও কোনও আপত্তি কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়া বুঝিতে পারিল যে, দুর্ব্বলের রক্তপাত করিয়া বলসঞ্চয়, এবং প্রকৃতির বিরোধী নিষ্ঠুর ও অশ্লীল উপায়াবলম্বনে আ আত্মতিলাভ, উভয়ই নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

উপসংহারে সার্ জন সিমন ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন—"যেদিন জাতি-বিজাতির সম্বন্ধ ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি তর্কের সাহায্যে নিরূপিত হইবে, সকলে একমাত্র বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে, পরস্পরের উপর আর নিষ্ঠুরাচরণ করিবে না, সেদিন—সেই শুভদিন, যত বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই আসিতেছে।" সিমন্ মহোদয়ের মানব-হিতাকাঙ্ক্ষার জন্য ধন্যবাদ দিয়া, এবং তাঁহার প্রবন্ধের সমালোচনভার পাঠক মহাশয়দিগের উপর অর্পণ করিয়া, আমরা বিদায় লইলাম।

***

"এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার" মে মাসে প্রকাশিত সংখ্যায়, "পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমান" ইতিশীর্ষক একটি ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বাইস্ উক্ত বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ রচিত করেন, বর্ত্তমান সন্দর্ভ তাহারই সারসংকলন। পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস কোন্ কোন্ অংশে খাঁটি মহম্মদীয় ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন, এবং তাহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার কতটা হিন্দুভাবমিশ্রিত—তাহাই প্রধানতঃ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য কোন্ কোন্ কারণে সংভূত, তাহাও বিবেচিত হইয়াছে। শেষ কথাটার আলোচনাই বোধ হয় সাহিত্যের পাঠকবর্গের অধিকতর কৌতুহলপ্রদ হইবে, সেই জন্য আমরা উহারই অবধারণে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ, মুসলমান ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবগত না থাকিলে, অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা তত প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা নাই।

১৮৭২ সালের লোকগণনায় স্থির হয় যে, নিজ বাঙ্গালায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অতি বহুল—ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে সেরূপ নহে। ইহার হেতু কি?

উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে যে অনেক মুসলমান পরিবার এদেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে, এ কথার প্রমাণাভাব। বরং ইহাই ইতিহাসসিদ্ধ যে, বাদসাহ আকবরের সময় বঙ্গদেশের জলবায়ু এত অস্বাস্থ্যকর ছিল যে, নবাবসুবাদিগকে এদেশে পাঠাইলে তাঁহারা আপনাদিগকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত মনে করিতেন। কিন্তু একটা ব্যাপারের কিছু মীমাংসা করা যায় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালার পূর্ব্ব দক্ষিণ উপকূলে এক আরব্য মুসলমান সম্প্রদায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বারবোসা (খৃষ্টীয় ভ্রমণকারী) ঐ প্রদেশ মুসলমানশাসিত দেখিয়া যান। ১৫৭০ সালে লে ব্লাঙ্ক সোন দ্বীপে মুসলমানাধিষ্ঠান দেখিয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ। ১৩৩৮ সালে দেখা যায়, সুবর্ণগ্রামে মুসলমান নবাবের রাজধানী ছিল। তার পর সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান মোল্লাগণের সুবর্ণগ্রামই কেন্দ্রভূমি ছিল। কথিত আছে, জালালুদ্দিনের গুরু ঐ স্থান হইতেই আনীত হইয়া তাহাকে সঙ্কীর্ণ কঠোর ধর্ম্মতত্ত্বে দীক্ষিত করেন। পরে জালালুদ্দিন তাঁহার রাজত্বকালে (১৪১৪—১৪৩০) হিন্দু জাতির উপর যারপরনাই অত্যাচার আরম্ভ করেন। হয় যম—নয় কোরাণ, ইহাই তাঁহার শাসনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠে। সার্দ্ধ পাঁচ শতাব্দী যুড়িয়া বঙ্গভূমি মুসলমানকরগত ছিল, কিন্তু এরূপ ব্যাপক অত্যাচার আর কখনও হয় নাই। শাস্তার বাইজ সাহেবের বিশ্বাস যে, মুসলমান জেতার খরধার তরবারির ভয়ে অনেক ভীরু বাঙ্গালী

মহম্মদীয় ধর্ম্ম আশ্রয় করে। তেজস্বী মুসলমান সেনা সুদূর শ্রীহট্টেও চন্দ্রকলাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন করে।

কিন্তু কেবল বলপ্রয়োগ দ্বারাই বঙ্গে মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার হয় নাই। ইহার অন্যান্য পন্থাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মুসলমান সাম্রাজ্যের একটা অঙ্গ—দাসপ্রথা। বাঙ্গালায় এ প্রথার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। শুনা যায়, দিল্লীর রঙমহলের অনেক খোজা বাঙ্গালা হইতে আনীত হইত। বাইস্ সাহেবের মত এই যে, অত্যাচার অবিচার দুর্ভিক্ষ ও উৎপাতে পীড়িত বাঙ্গালী নৈরাশ্যের দায়ে দাসত্ব স্বীকার করিত। মুসলমান প্রভুর পরিবারভুক্ত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ মহম্মদীয় ধর্ম্ম আশ্রয় করে।

বাইস সাহেব আরও বলেন যে, অনেক বাঙ্গালী হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ঐরূপ করিলে অপরাধীর কসুর মাপ হইত।

ঐ প্রথার অনুকরণে কোনও কোনও দুর্দ্দান্ত নবাব এই নিয়ম করেন যে, জমিদার বাকী খাজনার দায়ে পড়িলে, সপরিবারে মুসলমান হইয়া রক্ষা পাইতে পারেন, নহিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে।

বাইস সাহেব বলেন যে, উক্ত হেতুনির্দ্দেশে যে এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা হইল, এরূপ কেহ মনে না করেন। কারণ, অধুনা ইংরাজ রাজত্বে ঐ সকল কারণের অভাব সত্ত্বেও মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যথার্থ কারণ এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে মহম্মদীয় ধর্ম্মের একটা আকর্ষণ আছে। আর্য্যবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অনার্য্যপ্রসূত চণ্ডালাদিকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। হিন্দু সমাজে চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য। বোধ হয়, এ কথা বাঙ্গালা সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, আর কোথাও সেরূপ নহে। কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্মে বলে, রাজা প্রজা দাস প্রভু জমীদার রায়ত সকলই একজাতীয়, এক শ্রেণীভুক্ত, সমাজে সমান সমান। অতএব, চণ্ডাল প্রভৃতির এই সাম্যবাদী মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ কিছু বিচিত্র কথা নহে। হিন্দু চণ্ডাল দাসের দাস,—ব্রাহ্মণাদি মুসলমান দাসের দাস। মুসলমান চণ্ডাল—রাজধর্ম্মাবলম্বী—কাজীর স্বজাতি—ভূতপূর্ব্ব প্রভুর প্রভু। বাইস সাহেবের মতে, এই শেষোক্ত কারণই বঙ্গভূমিতে মহম্মদীয় ধর্ম্মের ভূয়ঃপ্রচারের প্রধান হেতু। এ সকল গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না। অতএব আমরা ইহাতে ক্ষান্ত রহিলাম।

শিল্প ও শিক্ষা।

মিষ্টার উইলিয়ম মরিস ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবক ও চিত্রশিল্পী। শিল্প ও শিক্ষা লইয়া আজকাল অনেক তর্কবিতর্ক, বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। "মেরি-গো-রাউণ্ড" পত্রিকায় এই সম্বন্ধে মিষ্টার মরিসের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বেশ সাংসারিক লোকের মত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন; কবিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার মতের সারাংশ আমরা এখানে দিলাম। সাহেব বলেন, কবিতা বা কল্পনামূলক রচনার জন্য অর্থ প্রত্যাশা করা উচিত নহে। রচনার জন্য কালি, কলম এবং কাগজের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু এই তিন জিনিসের মূল্য বড় অধিক নহে। দুর্ম্মূল্যের অত্যাচার ও অভাবের অভিযোগ নাই। এই সকল রচনার জন্য পরিশ্রম আবশ্যক হয় না, একবার লিখিতে আরম্ভ করিলেই কলম চলিল। ইতিহাস বা বিজ্ঞা-

কবির রচনার মূল্য।

ন্যের কথা স্বতন্ত্র। সে সকলের জন্য বিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক ; অনেক অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করিবার পর সে সকল পুস্তক রচিত হয়—তাহার জন্য অর্থপ্রত্যাশা করা অস্বাভাবিক নহে, বরং উচিত। তিনি বলেন যে, সাহিত্য মোটের উপর অধিক অর্থ আনয়ন করিতে অসমর্থ। সত্য বটে, শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড ছয় বৎসরে প্রভূত ধনলাভ করিয়াছেন ; কিন্তু সাহেব বলেন, তাঁহার সময় দিনকাল ভাল ছিল—সুবিধা পাইয়াছিলেন। তখন সাধারণের মধ্যে যে বিষয় বিশেষরূপে আন্দোলিত হইতেছিল, তিনি সেই বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার সহিত সকলের তুলনা করা সম্ভব নহে।

সাহেব বলেন, আজ কাল লোকে নীতিপ্রবণ উপন্যাস লইয়া পাগল। এই যে নিত্যনূতন নীতির নেশা, সাহেব ইহার বড় পক্ষপাতী নহেন ; এই যে নব নব নীতির নিয়ম,—সাহেব বলেন,—এ সব কেন ? এই সব "novels with a purpose" কেন ? তিনি এ সব ভালবাসেন না ; তিনি কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য উপন্যাস পাঠ করেন। তিনি বলেন, যদি দর্শন প্রভৃতির কথা বলিবে, স্পষ্ট করিয়া তাহাই বল ; সেগুলিকে নভেলের সঙ্গে মিশাইয়া চিনিমাখা ঔষধের বড়ীর মত জোর করিয়া লোকের গলাধঃকরণ করাইবার আবশ্যক নাই। বিশুদ্ধ আমোদের জন্য সকলের পক্ষে অত্যাবশ্যক অবকাশ, সর্ব্বদা কিছু-না-কিছুর চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত থাকা ভাল নহে। সাহেব বলেন, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া একটা মস্ত ভুল। যে সকল শিক্ষার কোনও ফল নাই, সেই সকল শিক্ষায় অনেক সময় বৃথা ব্যয়িত হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স হইলেই ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। এবং কাহার কোন বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক আছে, তাহা বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগকে একই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠে ব্যাপৃত রাখা হয়। যে বিষয়ে যাহার ঝোঁক আছে, সেই বিষয়ের শিক্ষাই তাহার পক্ষে উপকারী। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে তাহা হয় না। যে সকল শিক্ষা শিশুদিগের উপযোগী নহে, তাহাদিগকে সেই সকল শিক্ষায় বৃথা বিরক্ত, বিড়ম্বিত করিয়া লাভ কি ? বিদ্যালয়ে জোর করিয়া যে গণিত এবং গ্রীকভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়—বিদ্যালয়পরিত্যাগের পর কয় জন সে সকল মনে রাখিতে পারে ? শৈশবে শিশুদিগকে এইরূপ শিক্ষা না দিয়া আপনার হস্ত ব্যবহার করিতে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদির বিষয় জানিতে শিক্ষা দিলে ভাল হয়। তিনি বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি মহৎ দোষ এই যে, ইহাতে শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না।

নৈতিক।

সাহেব বলেন, বর্ত্তমান জটিল সমাজের অধীনে আমাদিগকে বৃথা অনেক কষ্ট পাইতে হয়। লোকের যাহা আবশ্যক, লোকে তাহাই পায় ; এইরূপ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। কারণ, সেটি নিতান্তই সহজসাধ্য, সরল, সঙ্কটহীন। ইংরাজগণ জাতীয় ভাবে যতই ধনবান হউন না কেন—ইংলণ্ডের সাধারণ লোকেরা দরিদ্র এবং জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগকে ভীষণ পরিশ্রম করিতে হয়। সকলের পক্ষেই সে drudgery মন্দ। তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াই এখন প্রধান উদ্দেশ্য। লোকে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা তাহার পক্ষে আনন্দজনক হওয়া চাই—নীরস না হয়। যে কার্য্য যাহার ভাল লাগে না, তাহার পক্ষে সে কার্য্য করা যে কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহা নহে। তাহাতে বিশেষ গৌরব নাই। এখন সমাজ সুচারুরূপে পরিচালিত হয় না—তাহা হইলে এই drudgery থাকিত না, যে যে কাজ ভালবাসে, সে সেই কাজ করিত, এবং যে যে শিল্প ভালবাসে, সে তাহাতেই মনোনিবেশ করিত। তাহা হইলে লোকে নিজ নিজ অবলম্বিত ব্যবসায়ে আনন্দ অনুভব করিত। সাহেব বলেন, এই মত অনুসারে কার্য্য করিলে আর কোনও গোল থাকিবে না।

Drudgery.

এইবার সাহেব আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন। সাহেব সোসিয়ালিস্‌মের কবি; তিনি সোসিয়ালিস্‌মের মন্ত্রে মুগ্ধ, সোসিয়ালিস্‌ম-সাগরে সংজ্ঞাহীন,—সন্তরণরত। তিনি বলেন,

স্ত্রীলোকদিগের শ্রম।

স্ত্রীলোকেরা যে কলকারখানা প্রভৃতিতে কার্য্য করে, তাহা সত্য সত্যই বড় দুঃখের বিষয়। সত্য বটে, এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের মত সুচারুরূপে কিম্বা তাহাদিগের অপেক্ষাও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম করিবে, এমন নহে; তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহাদিগের শরীর পুরুষদিগের ন্যায় দৃঢ়-গঠিত নহে, কাজেই তাহারা কম বেতন পায়। কাজেই রমণীদিগের পরিশ্রমফলে পুরুষদিগের পর্য্যন্ত বেতন কম হইয়া আসে, ইহাতে মোটের উপর বড় ক্ষতি হইতেছে। এখন সমাজে সোসিয়ালিস্‌ম প্রবল নহে, এবং কুমারী ও বিধবাগণ অনেক সময় উপায়ান্তরবিহীন হইয়া এই সকল কার্য্যগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সোসিয়ালিষ্টিক প্রণালী মতে কার্য্য করিলে, যে কার্য্য যাহার উপযোগী, সে সেই কার্য্য করিবে। সমাজের প্রচলিত প্রথায় স্ত্রীলোকদিগের বড়ই কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। অনেক স্থানে সংসারে পতি, পত্নী, সন্তান সকলেই অর্থোপার্জ্জনরত, তাহাতে অনেক অনিষ্ট অবশ্যই ঘটিতেছে; বিশেষতঃ কর্ম্মদাতৃগণ দেখে যে, ইহারা মোটের উপর অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু দেখিতে গেলে, প্রত্যেকের উপার্জ্জন, বিশেষতঃ রমণী ও শিশুদিগের উপার্জ্জন, বড়ই সামান্য। যদি পতি একাকী উপার্জ্জন করিত, তবে সে অধিক বেতন পাইত; তাহা ভিন্ন তাহার গৃহে শৃঙ্খলা থাকিত, এবং তাহার সন্তানগণেরও যত্ন হইত। যে গৃহে জননী প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কারখানায় কাজ করে, সে গৃহের অবস্থা কি ভীষণ! যদি সে পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় হয়, তবে সে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়; তাহা বড়ই অন্যায়। নতুবা গৃহ শ্রীহীন হইয়া পড়ে, সন্তানগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া দাঁড়ায়; যদি এই সকলের জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হয়, তবে জননীর উপার্জ্জন প্রায় তাহার বেতনে ব্যয়িত হয়। যে সকল স্থানে রমণীগণকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না, সে সকল স্থানে শ্রমজীবীদিগের সামাজিক জীবন অনেক গুণে ভাল। সেখানে পুরুষগণ অধিক বেতন পায়, এবং তাহারা প্রায় ভাল লোক হয়। সে সকল স্থানে রমণীগণও ভাল, এবং সন্তানগণ সুস্থকায় ও বলশালী। জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য বালিকাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করান, মিঃ মরিসের অভিপ্রেত নহে; যদি তাহারা ইচ্ছা করে, কুমারী থাকুক, এবং ইচ্ছামত পরিশ্রম করুক, তাহাতে হানি নাই। তবে অনেক বালিকা পুরুষ আত্মীয়দিগের দ্বারা প্রতিপালিত হয়; তাহারা নিজ ব্যয়ের (Pocketmoney) জন্য সামান্য অর্থের অনাটন উপলব্ধি করে। তাহাদিগের অভাব অল্প, কাজেই তাহারা অল্প বেতনে কার্য্য করে; ইহাতে শ্রমজীবীদিগের বড় অপকার হয়। ইহার নিবারণ অত্যন্ত আবশ্যক। এখন (এই সকল অভাবনিবারণের জন্য) অনেক অনাবশ্যক ব্যবসাদির আরম্ভ হইতেছে। রমণী কিম্বা কোনও বিশেষ শ্রেণীর জন্য এইরূপ অভাব-উদ্ভাবন, সাহেব ভাল বলেন না। এই সকল অনাবশ্যক অভাব, অনেক অনিষ্ট অবশ্যই করিতেছে, এবং ইহাতে বাজার খারাপ হইয়া যাইতেছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—বৈশাখ। এবারকার সাধনায় সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বঙ্কিমচন্দ্র"। বঙ্কিম বাবুর বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্র

বাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিম বাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু, বাঙ্গলা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্ত্তির উজ্জ্বল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্র বাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব। "নববর্ষে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা—কিন্তু ইহাতে কিছু বিশেষত্ব নাই। "ভারতবর্ষে—বারাণসী" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃত অনুবাদ। প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য,—একজন সহৃদয় চিন্তাশীল বৈদেশিক কি ভাবে হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহা অধ্যয়নের উপযুক্ত। আমাদের নিজের জিনিস, এই ফরাসী পর্য্যটকের মন্তব্য ও চিন্তারূপ চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে,—একটু নূতন হইলেও—নিতান্ত মন্দ দেখাইবে না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের "নূতন তাম্রশাসন" প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই। "বৃত্তিনির্ব্বাণের" লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে। "প্রলয়" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি সুলিখিত, সুচিন্তিত, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রলয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের উক্তি কি, লেখক তাহা প্রাঞ্জল ভাষায়, সরল প্রণালীতে বুঝাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন এবার "বুদ্ধদেবের মনের ইতিহাস" লিখিয়াছেন। "কাব্যে প্রকৃতি" শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্র বাবুর ভাবুকতা ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের ভাষাও বেশ তেজস্বিনী এবং বর্ণনাভঙ্গী অতি সুন্দর। বলেন্দ্র বাবুর সৌন্দর্য্যদৃষ্টির প্রশংসা করিয়া আমরা "সাধনার" কথা শেষ করিলাম।

ভারতী।—বৈশাখ। এবারকার "ভারতীর" প্রথমেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বন্দী" নামক একটি ক্ষুদ্র গল্প। নগেন্দ্র বাবুর ভাষা চমৎকার, কিন্তু বন্দী গল্পে, সেও যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে। গল্পটি কৃত্রিমতাপূর্ণ,—নগেন্দ্রবাবুর লেখনীর অযোগ্য। লেখক এক স্থলে বলিতেছেন,—"নীতি যাহাই বলুক, আত্মসুখই ইংরাজের জীবনের প্রচলিত আদর্শ।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা। নগেন্দ্র বাবুর মত একজন পাকা লেখক সহসা অসঙ্কোচে কথাটা লিখিয়া ফেলিলেন, ইহা বস্তুতই বড় আশ্চর্য্য। একটা জাতি সম্বন্ধে এক কথায় একটা গুরুতর বিষয়ে ফয়তা দেওয়া নিতান্ত অন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে এরূপ সঙ্কীর্ণতা শোভা পায় না। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ" বেশ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। "অশ্বপৃষ্ঠে" দার্জ্জিলিঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত। জোর করিয়া ইহাতে আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেকখানি হাস্যরস ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রবন্ধটি বেশ চিত্তাকর্ষক ও কৌতুকজনক বলিয়া বোধ হয়। "মুসলমানের গোবলি" শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্রের মৌলিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি খুব উৎকৃষ্ট। লেখক মসলেমদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, "গোবলি না হইলে যে মুসলমানের 'কুরবাণী' মাটী হয়, ইহা নিতান্ত অমূলক।" অপর পক্ষ কি বলেন, দেখা যাক। কিছু দিন পূর্ব্বে, এসিয়াটিক্ কোয়াটার্লী পত্রে ডাক্তার লিট্নার এ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সিদ্ধমোহন বাবুর প্রবন্ধে তদপেক্ষা অনেক অধিক বস্তু আছে। আমরা সকলকে, বিশেষতঃ আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদিগকে ধীরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি। ভারতের ভাবী বিপদ এই গোবলি উপলক্ষ করিয়াই দেখা দিবে,—বোধ হইতেছে। যদি এ বিষয়ে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক একটা মীমাংসা হইয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক

কবিতা। "রবির প্রেম" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি কবিতা।—সাধারণ কবিতার অপেক্ষা ভাল বটে, কিন্তু লেখিকার উপযুক্ত হয় নাই। এবারকার "ভারতীতে" পারসীর ঝাঁক কিছু বেশী। স্বরলিপির গানটিও 'পারস্য গজল।' তা ছাড়া শ্রীমতী সরলা দেবী একখানি পারসী নাটকের অনুবাদ করিতেছেন। নাটকের নাম—"লান্‌করানের উজীর।" উজীরের এক পত্নী জীবাখানুম চটিয়া স্বামীকে বলিতেছে,—"আমি কেন বেরোতে যাব? তোমার সোহাগিনী তার উপপতিকে নিয়ে বেরোক—" এ গুলি কি সুরুচিসঙ্গত? সাহিত্যের—বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এরূপ অনেক বিষয় আসিয়া পড়ে,—যাহার উল্লেখ করিতে পুরুষদেরও হাত বাধ-বাধ করে। সেরূপ স্থলে মহিলাদের পক্ষে কি কর্ত্তব্য? ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। আমাদের দেশের মহিলারাও যখন সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যসেবায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী যখন সাধনায় "পিয়ের লোটী ও ইস্তাম্বুলের" অনুবাদ করেন, তখন তাহার অনেকটা বাদ দিয়াছিলেন। সাহিত্যের হিসাবে তাহা ক্ষতি,—কিন্তু স্ত্রীজাতির শালীনতার হিসাবে তাহা বহুমূল্য। আমাদের প্রশ্ন,—সাহিত্যের অঙ্গ হানি, না শালীনতার বিসর্জ্জন, কোনটা বড়? শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "নক্ষত্রদিগের জাতিবিচার" সারপূর্ণ, সুন্দর প্রবন্ধ। "প্রবাসে" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কবিতা। কবিতাটি ভাল হয় নাই।

নব্যভারত। বৈশাখ। এ সংখ্যায় প্রথমেই শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর লিখিত "ত্রয়োদশ শতাব্দী" নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধের ফুটনোট এই;—"সম্পাদকের প্রবন্ধ কোনও সংখ্যায় সর্ব্ব প্রথমে ছাপা হইলে, আমাদের দেশের পরনিন্দাব্যবসায়ী 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' (?) মাসিকের অসাধারণ ভাষাবিৎ সম্পাদক অত্যন্ত বিরক্ত হন। আমরা এই হামবড়া, 'গায়-মানে-না-আপনি-মোড়ল' সম্পাদকের অমূল্য (gratis) উপদেশানুসারে চলিতে না পারিয়া খুব দুঃখিত হইতেছি। তিনি পৃথিবীর কোন তত্ত্ব রাখুন বা না রাখুন, দুঃখ নাই; নব্যভারতের প্রতি বৎসরের নিয়ম জানিয়া কথা বলিলে বাধিত হইতাম। তাঁহার নিকট এখন নিবেদন এই, তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করুন। আর কেহ না হইলেও, দেশ কাল ও পাত্রাপাত্র ভুলিয়া, ভারতী ও নব্যভারত সম্পাদক শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে।" গত বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যে", মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় লিখিত হইয়াছিল,—"সাধারণতঃ এইরূপ নিয়ম আছে যে, মাসিকপত্রের সম্পাদক পত্রিকার সর্ব্বপ্রথমে স্বরচিত কোনও প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিবেন না। নব্যভারত সম্পাদক এই সংখ্যায় প্রথমেই 'সান্ত ও অনন্ত' শীর্ষক স্বলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত 'হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' প্রবন্ধ শীর্ষস্থানীয় করিলে সুরুচিসঙ্গত হইত।" নব্যভারতের সম্পাদক, ঠিক এক বৎসর পরে, পূর্ব্বোল্লিখিত মন্তব্যপ্রকাশরূপ অপরাধের জন্য, উদ্ধৃত ফুটনোটে আমাদিগকে গালি দিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছেন। শিশুশিক্ষায় পড়িয়াছিলাম, এক মাহুত একবার হাতীর মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়া খাইয়াছিল; নিরুপায় হাতী তখন চুপ করিয়া সহিয়া রহিল;—তাহার পর, আর এক দিন বাজারের ভিতর দিয়া যাইবার সময় শুঁড় দিয়া একটা নারিকেল তুলিয়া লইয়া মাহুতের মাথায় ভাঙ্গিয়াছিল"—কিন্তু দেবীবাবুর প্রতিহিংসা তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক,—শিশুশিক্ষায় লিখিয়া রাখিবার যোগ্য,—তিনি এক বৎসর পরে আমাদের কথার জবাব, এবং সুদের হিসাবে গুরুতর গালাগালি দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিলে, তিনি আবার আমাদের অকৃতজ্ঞ বলিবেন। তিনি আমাদের অবৈতনিক স্কুল খুলিয়া তাঁহাকে ও ভারতীর সম্পাদ-

শিক্ষা দিতেও আহ্বান করিয়াছেন। তিনি যেরূপ অভদ্র ভাবে ও অভদ্র ভাষায় আমাদের আক্রমণ করিয়াছেন, আমাদের তাহার প্রতিদান করিবার প্রবৃত্তি নাই। কারণ, যাঁহাদের বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানবোধ আছে, তাঁহারা কখনও নব্যভারত-সম্পাদকের শিষ্ট ভাষার 'উত্তোর গাহিতে' পারেন না। তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা যাইতে পারে, "নব্যভারত"-সম্পাদককে জোর করিয়া "ভারতীর" শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া "দাঁড় কাক ও ময়ূরপুচ্ছের" গল্প মনে পড়ে। বলা বাহুল্য যে, তিনি ভারতীর দলে ঢুকিতে চাহিলেও, এবং তাঁহার নব্যভারত খানিকে "ভারতীর" সমশ্রেণীস্থ মনে করিলেও, আমরা তাহাতে সায় দিতে পারিব না। তিনি "ভারতীর" নিকট এখনও দশ বৎসর নীতিজ্ঞানের প্রথম পাঠ শিক্ষা করিতে পারেন। আর সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি যে, নব্যভারতসম্পাদকের শিক্ষক হইবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। বরং প্রার্থনা করি, আমাদের সহিত ব্যবহারে, তিনি সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের যে উজ্জ্বল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া, দেবীবাবুর কীর্ত্তিস্তম্ভ ও সম্পাদকগণের কর্ত্তব্যনীতির আদর্শ হইয়া থাকুক। সে যাহা হউক, গালি খাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্বেও, আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, "ত্রয়োদশ শতাব্দী" নামক "নব্যভারতের" শীর্ষস্থানীয় প্রবন্ধটি পড়িয়া নিরাশ হইতে হয়। লেখক পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি পূর্ণ ও সুদীর্ঘ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে নূতন, শিক্ষাযোগ্য বা জ্ঞাতব্য কথা একটাও নাই। বিষয় বিস্তৃত,—কিন্তু লেখকের শক্তি সঙ্কীর্ণ; কাজেই প্রবন্ধটি "অকাল কুষ্মাণ্ডে" পরিণত হইয়াছে। আর একটি বিচিত্র সংবাদ পাঠকেরা শুনিয়া রাখুন,—নব্যভারত-সম্পাদক "ত্রয়োদশ শতাব্দী" প্রবন্ধে দাশুরায় পর্য্যন্ত অনেকের নাম করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের গৌরব, গীতি কবিদের শিরোমণি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করেন নাই। ইহার কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি? নবযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে যিনি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিভা বাদ দেন,—আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—"তাঁহার জন্য দাশু রায়ের পাঁচালী ব্যবস্থা,"—বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার এক বিন্দুও নাই। "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের একটি ক্ষুদ্র রচনা। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি, রমেশ বাবুর নিকট আমরা এ বিষয়ে স্বভাবতই অনেক অধিক আশা করিয়াছিলাম। "বঙ্কিমচন্দ্র" শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের একটি পদ্য।—এমন বাজে পদ্য সচরাচর দেখা যায় না;—বঙ্কিম বাবুর মত প্রতিভাশালী লেখকের বিয়োগ উপলক্ষ করিয়া এরূপ ধৃষ্টতাপ্রকাশ অসহ্য। লেখক বলিতেছেন,

> " 'রোহিণীর' সমতুল বিধবা বকুল ফুল,
> কোন দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন?
> কি শোভা পুকুর পারে, গোবিন্দ তুলিলা তারে,
> ইন্দিরা লভিল যেন নিজ নারায়ণ।"

ইহার উপর আর কলম চলে না। ব্যভিচারিণী রোহিণী বকুলফুল!—গোবিন্দ বাবু—দেখিতেছি—সৌরভে মাতোয়ারা হইয়াছেন। নহিলে, হিন্দুর জননীরূপিণী দেবতা ইন্দিরার সঙ্গে একটা কামুকীর উপমা দিতেন না। "প্রতিভার পূজা" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর একটি কবিতা।—ইহাও বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত। এই কবিতায় কবিত্বের কিছু দেখিলাম না। শোকগাথার উপদ্রবে বড়লোকের মরিয়াও নিস্তার নাই, বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুতে অনেক রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এটিও দলছাড়া নহে। "প্রতিভার অবতার—বঙ্কিমচন্দ্র" সম্পাদকের রচনা। প্রবন্ধটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না,—সম্পাদক ক্ষমা করিবেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "গরিবসেবা—ভিক্ষাদান" আলোচনার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "বৌদ্ধসঙ্ঘ" চিন্তাপূর্ণ, সুলিখিত ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ক্ষীরোদ বাবুর কল্যাণে এতদিনের পর বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণভাবে অনেকটা পরিচিত হইল। আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, আশা করি, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইব। "বৌদ্ধসঙ্ঘের" মত প্রবন্ধ সাময়িক সাহিত্যের গৌরব। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের "নগ্ন প্রকৃতি" আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি" নামক সুন্দর প্রবন্ধটি এখনও চলিতেছে। এবার অষ্টম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে।

জন্মভূমি।—বৈশাখ। এবারকার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "৺ কাশীরাম দাস।" প্রবন্ধটিতে বাজে কথা বেশী, কাজের কথা কম। কেবল অতিশয়োক্তির সাহায্য লইলে বিষয়টাকে জমকাল করা যায়, কিন্তু তাহা হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে না। এ প্রবন্ধটি এই জন্যই বোধ করি ভাল হইতেছে না। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "নূতন বৃক্ষ",—বিদেশ হইতে আনীত একটি বৃক্ষের বিবরণ। কাজের কথা, কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত। "গুজরাট" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বিদ্যানিধি মহাশয় যে 'বঙ্গভাষার উদ্ধারব্রত' ত্যাগ করিয়া ইতিহাসে অনুরক্ত হইয়াছেন,—এজন্য আমরা পরম শান্তিলাভ করিলাম। "টু জেণ্টলমেন্ অফ্ ভেরোনা"—সেক্সপীয়রের একখানি নাটকের গল্প,—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। গল্পটি অনেকের ভাল লাগিবে। "বিহার" শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ভ্রমণবৃত্তান্ত, "১০ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত স্থান চকিতের ন্যায় দেখিয়া এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া ও কতিপয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া" এত বড় প্রবন্ধ লেখা বাহাদুরী বটে, কিন্তু অকর্ত্তব্য মনে করি। কেন না, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে। এই সংখ্যায় "আমার জীবনচরিত" শেষ হইল। এই আষাঢ়ে গল্পটি বেশ সুখপাঠ্য ও চিত্তবিনোদন। "জন্মভূমিতে অবশিষ্ট জীবনী আর প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত নহে" কেন? পুস্তকাকারে অবশিষ্টটা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে কি?

কল্প।—বৈশাখ। জনৈক আর্য্যের "শ্রীমতী আনি বেসাণ্টের বক্তৃতা" ও শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিতের "ধর্ম্ম," এই দুইটি প্রবন্ধ এখনও চলিতেছে।

বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ।—বৈশাখ। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান আন্দোলনের অনুরাগী ও শাস্ত্রীয় মতের অধুনাতন সমালোচনাপ্রণালীর অনুমত আলোচনার অভিলাষী, তাঁহারা শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির "জীব বা অন্তঃকরণাদির গতি, ক্রিয়া ও স্থানাদি নিরূপণ" পড়িবেন। এইবার হইতে "বেদব্যাসের" সহিত "ব্রাহ্মণের" সংযোগ হইয়াছে।

জ্যোতিঃ।—বৈশাখ। ইহা একখানি নূতন প্রকাশিত সাহিত্যপত্র। "মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী" না লিখিয়া সম্পাদক মহাশয় "মাসিক পত্র ও সমালোচন" লিখিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। যে কয়খানি নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "জ্যোতিঃ" উল্লেখযোগ্য ও আশাপ্রদ। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের "সমর্থ রামদাস স্বামী" এক মহারাষ্ট্র মহাপুরুষের বিবরণ। রচনাটি বেশ হইয়াছে। আমরা আশা করি, জ্যোতিঃ ক্রমশঃ আরও উজ্জ্বল হইবে।

চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ।—১ম খণ্ড; ৮ম সংখ্যা। সমীরণ চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া অনেক উন্নত হইয়াছে। এখন খ্যাতনামা লেখকগণের কেহ কেহ "সমীরণে" লিখিতেছেন। এই সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত "জনা" নাটকের সমালোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা সমালোচনাটির প্রশংসা করি। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে "জনার" উপযোগিতা এত অল্প যে, সাহিত্য-পত্রে তাহার উল্লেখ না করিলেও ক্ষতি

হইত না। "জনার" সমালোচক যখন প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন থিয়েটারের বহিগুলির আদ্যন্ত সমালোচনা না করিয়া বিরত না হন, এই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। সমীরণে ভগবদ্গীতা-বিষয়ক যে প্রবন্ধটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইল কেন? প্রবন্ধটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।—আমরা সমীরণের ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

দাসী।—মে। পত্রিকার কভারের "করজোড়ে নিবেদন" প্রত্যেক বাঙ্গালীর পড়িয়া দেখা উচিত। "পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়াতেও অনেক গ্রাহক দাসীর মূল্য দিতেছেন না। প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার গ্রাহকের নিকট দাসীর মূল্য বাকী পড়িয়াছে।" দাসী ব্যবসার উদ্দেশে প্রকাশিত হয় না, লোক-সেবা, আতুরের রক্ষা,—দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য। ইহার মূল্য সেই অন্ধ খঞ্জ আতুর অসমর্থ বৃদ্ধদের উপকারার্থ কৃত দান;—সেই দানে—একটি টাকার মামলায়—এই কাণ্ড। ধন্য বাঙ্গালী পাঠক! এই সংখ্যায় "বিবিধ প্রসঙ্গ" বেশ হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী।—বৈশাখ। "সত্যযুগে মানবায়ু" শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের রচনা। লেখক নানাবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দক্ষতাসহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "সত্যযুগীয় নরগণের শতবর্ষ পরমায়ু শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ।" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "গিরিগুহা" একটি অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ। তত্ত্ববোধিনীতে ইহার উপযোগিতা কি, তাহা সম্পাদকই বলিতে পারেন। "মৎস্যরহস্য" শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর প্রণীত। "তত্ত্ববোধিনীর" পাঠকেরা নিতান্ত শিশু কি না, বলিতে পারি না। আজ কাল অনেক স্কুলে 'লংম্যানের রীডার' পড়ান হয়,—যে সকল বালক ঐ রীডার পড়িয়াছে, তাহারাও প্রাণীবৃত্তান্তের এতটুকু "রহস্য" অবগত আছে, এমন আশা করা অন্যায় নহে। "তত্ত্ববোধিনী" পূর্ব্বগৌরব হারাইয়া দিন দিন অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িতেছে। এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ইহার প্রতিবিধান কি শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের সাধ্যাতীত?

পূর্ণিমা।—জ্যৈষ্ঠ। "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এইটিই এবারকার পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য ও পাঠ্য প্রবন্ধ। এই ক্ষুদ্র কাগজে তিনটি কবিতা ও একটি গান প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু একটিও উল্লেখযোগ্য নয়। "কুরুক্ষেত্র" এখনও চলিতেছে। "সুধাময়ী" নামক একটি উপন্যাসও পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইতেছে।

পুরোহিত।—বৈশাখ। সম্পাদক-লিখিত "সামাজিক ইতিহাস" মন্দ প্রবন্ধ নহে। আর একটু সাধারণ ভাবে লিখিলে বোধ করি ভাল হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইনের "বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্বলেখকগণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে লেখক যে সকল মতামত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিছু মূল্য নাই। পুরোহিত-সম্পাদক বলিতেছেন,—"লেখকের আগ্রহাতিশয়ে ইহা পুরোহিতেই প্রকাশিত হইল।" প্রথমে আমরা এই টিপ্পনীর অর্থ বুঝিতে পারি নাই। শেষে দেখা গেল, "বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ" প্রবন্ধে, পুরোহিতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির সম্বন্ধেও একটি সুদীর্ঘ প্যারা প্রশংসা ও স্তুতিবাদে পূর্ণ হইয়াছে। তাই বিদ্যানিধি মহাশয় উল্লিখিত টীকা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নিজের প্রশংসাকীর্ত্তনে তাঁহার তত আগ্রহ ছিল না, কেবল লেখকের আগ্রহেই প্রবন্ধটি পুরোহিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতেছি যে, তিনি নিজের ঢাক নিজে অনায়াসে বাজাইতে পারেন, সে জন্য কুণ্ঠিত হইয়া কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যক কি?

মাধুরী।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন পূর্ব্বে সেই রাজপুরী দেখিয়াছিলে, আর আজ একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখ। রাজ্যময় সে নৃত্যগীত, সে বাদ্যভাণ্ড, সে আনন্দ-কোলাহল নিভিয়া গিয়াছে; তাহার পরিবর্ত্তে আজ ঘরে ঘরে হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস ও শোকধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সে আনন্দভবন আজ নিরানন্দে পরিপূর্ণ। শুভ বোধনের দিনেই যে এমন বিজয়ার কালরাত্রি আসিবে, ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখনও সেই পথে পথে দীপাধার শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, এখনও মঞ্চে মঞ্চে পতাকাশ্রেণী মৃদু বায়ুহিল্লোলে উড্ডীন হইতেছে, দ্বারে দ্বারে তেমনি কদলীতরু রোপিত রহিয়াছে—উৎসবের সকল চিহ্নই বিদ্যমান, কিন্তু সে উৎসব আর নাই—সকলই শোভাহীন, ভ্রষ্টশ্রী, বিষাদখিন্ন। নাট্যশালা আছে, কিন্তু সে নাট্যরঙ্গ ফুরাইয়াছে; নন্দনকানন আছে, কিন্তু সে শচী শচীনাথ নাই; কাঠাম আছে প্রতিমা নাই, দীপ আছে আলোক নাই, দেহ আছে প্রাণ নাই। রাজপথে লোক চলিতেছে, কিন্তু সে হাসি, সে কলরব, সে উৎসবমত্ততা আর লক্ষিত হয় না। সকলেই ম্রিয়মাণ, শোকাচ্ছন্ন, দারুণ ব্যথাগ্রস্ত। সেই মন্দিরে মন্দিরে দেবারাধনা হইতেছে, কিন্তু সেখানেও আরতির ঘণ্টা আর তেমন করিয়া বাজে না। তোরণদ্বারে হস্তী সকল তেমনি সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু সেও আর তেমন করিয়া শুণ্ড সঞ্চালন করিতেছে না। নহবতের কাড়া বাদকের অনাদরে একপার্শ্বে কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই অতিথিশালা ও রুগ্নাশ্রম সেখানে বন্দোবস্ত তেমনই আছে, কিন্তু লোক আর তেমন নিত্য নূতন আসিতেছে না। যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে কত অতিথি আহার করিতে বসিয়া একটি-মূর্ত্তির কথা ভাবিয়া ভাবিয়া এমনই অধীর হইয়া পড়ে যে আর তাহার আহার করা হয় না—দুই গ্রাস অন্ন মুখে না দিতেই নিঃশব্দে অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। কত রোগী পথ্যসেবনকালে একজন পরিচিতের জন্য চারি দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখে, চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নীরবে উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া রোদন করিতে থাকে—পরিচারক তাহা দেখিয়া সেইখানে পথ্য-পাত্র

রাখিয়া অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া যায়। রাজ্যময় সকলের মুখে একই কথা—"হা নারায়ণ কি করিলে? কেন এমন হইল? কিসে আবার যেমন ছিল তেমনি হইবে?" ব্রাহ্মণ শালগ্রামকে তুলসী দিতেছেন, বৃদ্ধেরা ঠাকুর দেবতার নিকট মানত করিতেছেন, যুবক ও প্রৌঢ়গণ দুই বেলা দূর পথ হাঁটিয়া রাজবাটী আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইতেছেন। রাজকার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাজা আর রাজসভায় আসেন না। বৃদ্ধ দেওয়ানকেও আর কেহ দেখিতে পায় না। আজ দুই দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া তিনি রুগ্নার সেবায় নিরত রহিয়াছেন। মাধুরীর অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন।

বিবাহ রাত্রে অকস্মাৎ ঘন ঘন মূর্চ্ছার পর সেই যে বালিকা প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত রাত্রি অশেষ চেষ্টা করিয়াও রাজবৈদ্যগণ কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারেন্ নাই। প্রভাতে গায়ের উত্তাপ একটু কমিয়া আসিল। রাজা তখন সেখানে ছিলেন না। রাণী হৈমবতী সারারাত্রি জাগিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছিলেন, একজন পরিচারিকাকে রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। সে পরিচারিকার ফিরিতে বিস্তর বিলম্ব হইল। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে একা আসিয়া চুপ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। রাণী চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। ভিষকৃগণ তখন পরস্পরে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। ব্যাকুল হইয়া রাণী পরিচারিকাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বাহিরে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে তাহা বিবৃত করিল। সেই সর্ব্বনেশে কথা—সেই ভুবনের চুরী অপবাদ, তাহার পর পিতাপুত্রের পুলিষে গমন—রাজার গভীর মর্ম্মবেদনা—শুনিয়া রাণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। একবার কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কুক্ষণে তখন তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্ঞানোদয় হইতেছিল—সেই কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। শূন্যনয়নে কন্যাও মাতার মুখের প্রতি চাহিলেন। বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মাতার ক্রোড় হইতে মাথাটা ভূমে লুটাইয়া পড়িল। এক সঙ্গে আহতা হইলেও পক্ষিণী যেমন্ আপনার ব্যথা তুচ্ছ করিয়া সন্ত্রস্তভাবে শাবকটিকে পাখায় ঢাকিয়া বুকের ভিতর রক্ষা করে, রাণী হৈমবতীও তদ্রূপ মুহূর্ত্তের জন্য আপনার বেদনা বিস্মৃত হইয়া মাধুরীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মাতার সমস্ত...

যন্ত্রণাসূচক সেই চীৎকারশব্দ শুনিয়া চিকিৎসকগণ ছুটিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রুগ্নার প্রতি চাহিয়া সহসা তাহার আকারের বিকৃতভাব দর্শন করিয়া তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। সাবধানে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। মহাভীত হইয়া একজন চিকিৎসক বাহিরে উঠিয়া গেলেন। তিনি রাজাকে খুজিতেছিলেন। রাজা এবং মুকুন্দরামও ঠিক্ সেই সময়ে সেইখানে আসিতেছিলেন। চিকিৎসককে দেখিবামাত্র রাজা আগ্রহে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চিকিৎসক হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয়চকিত দৃষ্টি দেখিয়া রাজা আকুল হইয়া বলিলেন, "বল, মা আমার কেমন আছেন?"

বৃদ্ধ মুকুন্দরাম কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "আর কি তবে ভরসা নাই?"

নতমুখে আর্দ্রস্বরে চিকিৎসক বলিলেন, "ভরসা ভগবান। তবে হঠাৎ অতটা মন্দ আশঙ্কা নাই। এই অবস্থায় যদি আরও চারি ঘণ্টা কাটে, তাহা হইলে একটু আশা হইলে হইতে পারে।"

রাজার সর্ব্বশরীর তখন কম্পিত হইতেছিল—সেই উন্নতকায় প্রশান্তবদন গম্ভীরপ্রকৃতি রাজা বালকের ন্যায় অধীর হইয়া রোদন করিতেছিলেন—অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া মুকুন্দরাম তাঁহাকে ধরিয়া রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

প্রতীক্ষার দীর্ঘ ঘণ্টা অতি কষ্টে কাটিতে লাগিল। ক্রমে চারি ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইল। আর কোন নূতন উপসর্গ দেখা দিল না। এ কয় ঘণ্টা গায়ে হাত দিয়া দিয়া মুকুন্দরামের উত্তাপ-অনুভবশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া আসিয়াছিল। সাগ্রহে চিকিৎসককে ভয়ের কারণ গিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু চিকিৎসক বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"যখন সমভাবেই কাটিয়াছে তখন ভরসা আছে বটে। তবে রাত্রি দুই প্রহর অতীত না হইলে ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না। সে সময়ে নাড়ীর পুনরায় গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা যদি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন চিন্তাই থাকিবে না।"

আবার সেই আশঙ্কা! সকলে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এক একটি ঘণ্টা যেন এক একটি বৎসর কাটিতে লাগিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্রমে প্রহর উত্তীর্ণ হইল। রাত্রি দশটা—এগারটা বাজিল। চিকিৎসকগণ ঘনঘন নাড়ী পরীক্ষা

করিল। দেখিতে দেখিতে রুগ্নার বিষম যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘনঘন শ্বাস পড়িতে আরম্ভ করিল। অচেতন অবস্থাতেই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। চিকিৎসকগণও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। অর্দ্ধ ঘণ্টা এইভাবে কাটিল। তারপর নির্জ্জীব হইয়া রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। ভিষক্‌গণ হাত দেখিয়া বলিলেন, প্রাণের আশঙ্কা আর নাই। বিকারের লক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু রোগের বিকার কাটিয়াছে বটে, এই নিদ্রাভঙ্গের পর চিত্তের বিকার ঘটিবার সম্ভাবনা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক যাহা বলিল, তাহাই ঘটিল। শেষ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর মাধুরী ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার সে বিকৃত দৃষ্টি, বিকৃত হাসি ও অর্থশূন্য অসম্বদ্ধ কথা দেখিয়া সকলের চক্ষু জলে ভাসিয়া আসিল।

কাঁদিয়া মুকুন্দরাম চিকিৎসকদিগকে বলিলেন, "এ রোগের উপায় কি? মার আমার এ অবস্থা দেখিয়া যে প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

চিকিৎসক বলিলেন—"অধীর হইবেন না। এ রোগ দুশ্চিকিৎস্য নয়, তবে যাপ্য। ঔষধপ্রয়োগে ইহার প্রতিকার করিতে দিন লাগিবে। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে এ রোগ যে ত্রাসজনিত তাহার আর সন্দেহ নাই। যে ভয়ে এ রোগ জন্মিয়াছে, যদি তাহার অপেক্ষা সেই বিষয়ে ইহাঁর মনে আরও অধিক ভয় উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মন্ত্রবৎ এখনই আবার ইহা সারিয়া যাইতে পারে।"

ব্যাকুল হইয়া মুকুন্দরাম বলিলেন, "সে কি উপায়, তাহাই কেন করিয়া দেখুন না।"

চিকিৎসক বলিলেন, "সে উপায় করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। ভয়টি যে কারণে যাহার জন্য হইয়াছে, সে সময়ে ইহার মানসিক অবস্থা যেরূপ ছিল, ঘটনাগুলি ঠিক্ একত্র মিল হওয়া দরকার। তাহা ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন আর কিছুতেই হইবার নহে। আপাততঃ যে কোন প্রকারে হউক, ইহার চিত্তের গতি কতকটা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বোধ হয়, আমাদের সকলের এ স্থান ত্যাগ করিয়া নবজামাতাকে এখানে রাখিলে অনেকটা ফল দর্শিতে পারে।"

জামাতা! বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া কপাল টিপিয়া দুই বিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন।

পাঠাইয়া দিলেন। আগ্রহে বিস্তর প্রজা সেই মোকদ্দমা দেখিবার জন্য তাহাদের পাছু পাছু ছুটিয়া গেল।

* * * *

মোকদ্দমার সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিণাম দর্শনে আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে যখন সেই সমস্ত লোকমণ্ডলী আদালতগৃহ হইতে নামিয়া আসিল, তখন অমূল্যের জন্য ব্যথিতান্তঃকরণে ভুবন বিষণ্ণ মুখে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতার কাতরতা দেখিয়া আরও অধিক অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি করিবেন, অন্য উপায় তখন ছিল না। পিতা পুত্রে ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দরামের লোক গিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে তাঁহারা উভয়েই বিশেষ চিনিতেন। সে ব্যক্তি আদালতে আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে এক উপায় ঠাহরিল। আর তো কোন প্রতিকার নাই, তবে যাহাতে খাটুনিটা একটু কমে, তাহার যোগাড় করিতে উদ্যত হইল। জেলদারোগা মুকুন্দরামকে ভাল রকম জানিত, বড় ভয় ও ভক্তি করিত। তাঁহার লোকের মুখে কথা পাইয়া সে অমূল্যের পরিশ্রমলাঘবের জন্য স্বীকার পাইল। মুকুন্দরামের লোকজন তখন হরিহর ও ভুবনকে লইয়া গৃহে ফিরিল। সেখানে ফিরিতে ভুবন কতবারই ইতস্ততঃ করিল। কি করিয়া যাইবে, কেমন করিয়া আবার সকলের নিকট মুখ দেখাইবে, আর কাহারও নিকট না হউক, সেই সরলা বালার নিকট সে কি বলিয়া আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিবে—আর যদি তাহার মনে ক্ষণকালের জন্যও একটুও সন্দেহ জন্মে?—ভুবন তাহার সন্দেহভাজন হইবার পূর্ব্বে সহস্রবার আপনার মৃত্যুকামনা করিল। যাইতে মন সরে না, পা উঠে না; কিন্তু আবার যতক্ষণ যাইতে না পারিতেছেন, যতক্ষণ সেই মুখ—যাহা হিমানীপীড়িতপঙ্কজবৎ মূর্চ্ছাম্লান দেখিয়া আসিয়াছিলেন—দর্শনীয়ের সার তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব সেই মুখ দেখিতে না পারিতেছেন, হৃদয়ও কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না। আশঙ্কা, উদ্বেগ ও অশুভচিন্তায় রহিয়া রহিয়া বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিতেছে। লজ্জায় কাহাকে সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেও কথা আসে না। সে কি আজিও সুস্থ হয় নাই? আজিও কি পীড়ার যাতনায় কষ্ট পাইতেছে? না জানি সে স্বর্ণলতা কেমনই শুখাইয়া গিয়াছে? সেই সুধাংশুলাঞ্ছন সদাপ্রফুল্ল ঢল ঢল মুখখানি সহসা

সেই স্নিগ্ধবিদ্যুদ্বর্ষী প্রীতিভরা অচপল নয়ন দুটি তাহাকে দেখিয়া কি আর তেমনি করিয়া হাসিতে উছলিয়া উঠিবে না? ভুবন যতই সে কথা মনে করেন, ততই প্রাণের ভিতর যে প্রাণ তাহা কেমন করিতে থাকে; পথ যেন দূর-প্রসারিত হইয়া পড়ে। মনে হয়, গাড়ী না করিয়া যদি পদব্রজে যাইতেন, তাহা হইলে বুঝি অনেক শীঘ্র গিয়া পৌঁছিতেন। অনন্যমনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে ভুবন যাইতে লাগিলেন।

হৃদয়ের বেগের নিকট শকটের বেগ হারি মানিল। চালক বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রাত্রি ৮টার কমে রাজবাড়ীতে পৌঁছিতে পারিল না। অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল। মুকুন্দরাম ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। মোকদ্দমার অবস্থা সংক্ষেপে অবগত হইয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। অন্য সময় হইলে তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন চলিত, কিন্তু সে আন্দোলনের সময় এখন ছিল না। হরিহর সোৎকণ্ঠে রাজকুমারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে মুখ নত করিলেন। ধীরে ধীরে দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মুকুন্দরাম সরোদনে সব কথা বলিলেন। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভুবন জোরে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন। বুক বুঝি তখন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। সেই ছল ছল কাতর মুখখানিতে নিমেষের মধ্যে কত নীরব ভাষা ফুটিয়া উঠিল। পুত্রের দিকে চাহিয়া হরিহর আরও কাতর হইয়া পড়িলেন। সেই দণ্ডেই সকলে সেই পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। মাধুরী একবার তাঁহাদিগের দিকে উদাস নেত্রে চাহিয়া আপন মনে কি বকিতে বকিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিস্ফারিত নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া জড়বৎ ভুবন দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপগতবন্ধ প্রস্রবণের ন্যায় দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"মাধুরী!"—চিকিৎসকের সঙ্কেতে সকলে উঠিয়া চলিয়া গেলে, বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে ভুবন ডাকিলেন—"মাধুরী!"

মাধুরী কোন কথা না কহিয়া, এক তীব্র কটাক্ষ করিয়া ভুবনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

প্রশ্ন শুনিয়া ভুবন মর্ম্মপীড়িত হইলেন। অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, "চিনিতে পারিতেছ না, আমি যে ভুবন।"

"ভুবন!" মাধুরী চমকিতা হইল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভুবন! ঐ নামে একজন ছি্ল—সে আমার—তাকে কি আর দেখিতে পাইব না?" সেই অর্থশূন্য দৃষ্টিময় চক্ষে জলধারা উছলিয়া উঠিল। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া পড়িল।

সরোদনে ভুবন বলিলেন, "এই যে আমিই তোমার সেই ভুবন।"

"অ্যাঁ—তুমি—তুমি—" ভুবনের মুখের প্রতি সেই আধিক্লিষ্ট বড় বড় চক্ষু দুটি স্থাপন করিয়া এক দৃষ্টে বালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চল ভাবে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"হা ভগবন, শেষে অদৃষ্টে এই লিখিয়াছিলে?" মর্ম্মাহত হইয়া ভুবন গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অন্তরাল হইতে চিকিৎসক সমস্ত লক্ষ্য করিলেন। ভুবনের দর্শনে পূর্ব্ব-স্মৃতি যে ঈষন্মাত্রায়ও জাগিয়াছে, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। এত শীঘ্র যে এরূপ উপকার দর্শিবে, ইহা আশা করেন নাই। সেই রাত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে ভুবনকে পীড়িতার পার্শ্বে একা রাখিয়া অন্য সকলে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি যখন দশটা, তখন অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকিয়া কত কি চিন্তা করিতে করিতে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। চিকিৎসক সেই সংবাদে আরও অধিক আশান্বিত হইলেন। তখন নির্ভাবনায় সকলকে বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিলেন। আর আর সকলে নিকটবর্ত্তী গৃহে গিয়া শয়ন করিল। রাণী কিন্তু কিছুতেই সহজে মন বাঁধিয়া ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। শেষ চিকিৎসক ভয় দেখাইলে অগত্যা পাশের ঘরে গিয়া শয়ন করি-লেন। তবু কতবার উঠিয়া আসিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেলেন; পরিচারিকাদিগকে কি প্রয়োজন অপ্রয়োজন জিজ্ঞাসার ছলে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। অনাহারে অনিদ্রা ও উদ্বেগ বশতঃ শরীর যারপরনাই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কন্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে রাণী তন্দ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। সহচরীর দলও দুই একবার উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, কোন সাড়া শব্দ পাইল না। শেষ নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল। একাকী বিনিদ্র হইয়া ভুবন পত্নীর ঘুমন্ত মুখখানির প্রতি নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া গুরুভার অন্তঃকরণে বসিয়া রহিলেন।

সহসা কিসের শব্দ হইল। ত্রস্তে ভুবন চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই লক্ষিত

হইল না। বায়ু সঞ্চালন জন্য গবাক্ষ সকল উন্মুক্ত ছিল, একবার দণ্ডায়মান হইয়া ভুবন বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, রজনী সার্দ্ধদ্বিযাম অতিক্রম করিয়াছে। প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যভীষণ। সুপ্তিতে দিগন্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের পর অন্ধকার ছুটাছুটি করিতেছে। সেই অন্ধকারের বক্ষে চন্দ্রের ম্লান জ্যোতি নিপতিত হইয়া ছায়ার ন্যায় ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছে। কোথাও একটিও শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। কোথাও একটিও প্রাণীর সজীবতা অনুভূত হয় না। নীরবে নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশের গায় মীটি মীটি জ্বলিতেছে। নীরবে উচ্ছ্রিতশীর্ষ পাদপশ্রেণী অন্ধকার ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নীরবে মুক্ত গবাক্ষপথ বাহিয়া নিদ্রিত নরনারীর নিশ্বাস আসিয়া বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। সেই শব্দশূন্য স্তব্ধীভূত রজনীর গম্ভীরতা, সেই মূর্চ্ছিতবৎ অচেতন পৃথিবীর গম্ভীরতা, সেই সচন্দ্রজলদ দিগন্তবিস্তারী অনন্তধূমময় আকাশের গম্ভীরতা—সর্ব্বত্রই গম্ভীরতাপূর্ণ। তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলে সহসা ত্রাসে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। ত্রাসে ভুবন চক্ষু ফিরাইলেন।

চক্ষু ফিরাইতে দ্বারপথে মনুষ্যছায়া লক্ষিত হইল। বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভুবন সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই ছায়ামূর্ত্তি তাঁহাকে হস্তসঙ্কেত করিয়া নিকটে ডাকিল। ভীতিমন্থর পদে ভুবন অগ্রসর হইলেন। বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার চক্ষুর উপর অবিশ্বাস জন্মিল। তিনি দেখিলেন, ক্ষেমা। যদি সেই দণ্ডে তাঁহার সম্মুখে বজ্রপতন হইত, যদি ক্ষেমা না হইয়া সত্যসত্যই সে কোন ভীষণদর্শনা পিশাচিনী হইত, তাহা হইলেও ভুবন তত আশ্চর্য্য হইতেন না। তাঁহার বাক্য লোপ হইল। হতবুদ্ধি হইয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ক্ষেমা—ক্ষেমাই বটে—মুখের উপর অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া ভুবনকে একটিও কথা কহিতে নিষেধ করিল। একটু একটু করিয়া পাশের একটি গলির পথে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভুবনও ধীরে ধীরে তাহার অনুবর্ত্তন করিলেন। একি ? ভুবন দেখিলেন, পিতা। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সকলই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল। এ কি স্বপ্ন না কুহক ? মূকের ন্যায় ভুবন চাহিয়া রহিলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, হরিহর কি বলিতে গেলেন। এই সময়ে গৃহের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিয়া কি শব্দ হইল। ঠোঁটের কথা ঠোঁটে রহিয়া গেল। দৌড়িয়া হরিহর সেই গৃহের দিকে ধাবিত হইলেন।

দ্বারে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, পার্শ্বে যেখানে রুগ্নার সেবন জন্য দুগ্ধ ও পথ্যাদি রহিয়াছে, সেইখানে কে একজন

স্ত্রীলোক উপুড় হইয়া পড়িয়া কি করিতেছে। হরিহর চিনিলেন, সে তারাসুন্দরী। ক্ষেমার মুখে তিনি তাহার এখানে আসিবার কথা শুনিয়াছিলেন—বলা বাহুল্য, তারাসুন্দরী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে যে একজন ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল, সে আর কেহ নহে ক্ষেমা—তাহার কথা কিন্তু কিছুতেই হরিহর বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাও কি সম্ভব? কুলনারী হইয়া কি কখন এতদূর করিতে পারে?—তিনি বিস্তর তোলাপাড়া করিয়াও কথাটা ঠিক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি স্থির হইতে না পারিয়া পুত্রকে সতর্ক করিবার জন্য শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন। এখন বুঝিলেন, স্ত্রীলোকের অসাধ্য কিছুই নাই। ঘৃণায় চক্ষে জল আসিল।

আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে পশ্চাৎ হইতে গিয়া হরিহর তারাসুন্দ[illegible] হাত ধরিয়া ফেলিলেন। হাতের ভিতর হাতখানি একবার নিমেষের জন্য [illegible] উঠিল। মুখ ফিরাইয়া তারাসুন্দরী পিছন দিকে চাহিল। বলিল, "তুমি! তুমি আসিয়াছ!" স্বর পরিষ্কার, অকম্পিত, মর্ম্মভেদী।

সে স্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য হরিহর চমকিয়া উঠিলেন। কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "তুই এখানে কেন?"

পূর্ব্ববৎ স্থিরস্বরে তারাসুন্দরী বলিল, "আমি এখানে কেন, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? কি করিব, তুমি তো বধূ ঘরে লইয়া গেলে না, তাই রাত্রে লুকাইয়া দেখিতে আসিয়াছি।"

হরিহর সে ব্যঙ্গোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড স্বরে বলিলেন, "ও দুধের সঙ্গে কি মিশাইলি?"

তারাসুন্দরী তীব্র কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "তাহাও দেখিয়াছ! তা আমার কি সাধ আহ্লাদ নাই? বধূ বরণ করিব বলিয়া দুধে আল্‌তা গুলিতেছিলাম।"

আর সহ্য হইল না। হরিহর সেই করধৃত হাতখানি নাড়া দিয়া, রূক্ষস্বরে বলিলেন, "পিশাচি, এখনও ছলনা!"

"পিশাচী!" তারাসুন্দরী গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমি পিশাচী? আর তুমি কে? তুমি পিশাচের অবতার, তাই তো আমি পিশাচিনী। পিশাচিনী আমায় করিল কে? পুরুষকুলের কলঙ্ক, নির্লজ্জ কপটী, আবার মুখ নাড়িয়া তাই আমায় ভৎর্সনা করিতে আসিয়াছ? কেন আগে আমার কথা শুনিলি না? কেন আমার অমূল্যকে ছাঁটিয়া ভুবনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলি? কেন?

আমরা মাতাপুত্রে কি অনিষ্ট করিয়াছিলাম? যদি আমার এই জোর না খাটিবে, তবে কেন ঐ জরাগ্রস্ত শরীর লইয়া রূপলালসায় মজিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে গিয়াছিলি? শেষ যদি মনে ইহাই ছিল, তবে কেন আগে কৈতববাক্যে জ্ঞানহীনা অবলা রমণীর মনে আশার বাতি জ্বালাইয়াছিলি? কোন্ মাতা তাহার পুত্রের শুভ ও উন্নতি কামনা না করে? আমি তাই করিয়াছিলাম, এই আমার দোষ? তুই বুড়ো মিন্সে কেন তাহাতে প্রতিবন্ধক হইলি? তাহা না হইলে তো সব যেমন ছিল, তেমনই বজায় থাকিত। আমি পিশাচিনী?—"

হতবাক্ হইয়া জড়ের ন্যায় নিশ্চলভাবে হরিহর দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রতি কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কুশ বিদ্ধ করিতে লাগিল। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ধিক, ধিক্। পশুর অধম তুমি, তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিয়াছ? আমি কি করিতেছি সেই খবর লইবার জন্য ব্যস্ত, আর তুই কি করিয়াছিস? তুই না পিতা, তুই না রক্ষাকর্ত্তা, তুই কি না ষড়যন্ত্র করিয়া পুত্রে জলে দিয়া আসিলি? সে না হয় আমার মন্দ—আমি না হয় বুঝিতে না ...য়া রাগের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলাম,—কিন্তু তুই না পুরুষ? তুই বুড়া মিন্সে কোন্ প্রাণে সেই দুধের বাছাকে—যাকে এক দণ্ড না দেখিলে চারি দিক অন্ধকার দেখিতাম—সেই সর্ব্বস্বধনকে সচ্ছন্দে চোর ডাকাত খুনে-দের মধ্যে রাখিয়া আসিলি? সেই ননীর পুতুল—সে আমার পাথর ভাঙ্গিবে, আর তুমি বৌ বেটা লইয়া সুখে সংসার করিবে? তারাসুন্দরীর শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে তাহা মনেও স্থান দিও না। তবে শোন্ পাষণ্ড, কি করি-তেছিলাম বলি শোন্—"

সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া ভ্রূকুটী-কুটিলমুখে তারাসুন্দরী একবার চাহিয়া দেখিলেন। কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ তখনও হরিহর আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া। দ্বারদেশে আরও দুই জনের মূর্ত্তি লক্ষিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল, যেন আরও কত অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে সব মূর্ত্তি কি ভয়ঙ্কর—কি বিকটদর্শন। কেহ পাকল-নেত্রে ভ্রূকুটী করিতেছে, কেহ লোল রসনা বিস্তার পূর্ব্বক অট্টহাস্য করিতেছে, কেহ ছুটিয়া গলা চাপিয়া ধরিতে আসিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য আতঙ্কে শরীর কাঁপিয়া উঠিল। "অমূল্য রে—বাপ আমার, তোমার প্রতিশোধ লওয়া হইল না। অভাগিনী মাকে মার্জ্জনা করিও।"—অতি কষ্টে এই কয়টি কথা উচ্চারিত করিয়া পলকমধ্যে মুঠার ভিতর হইতে সেই গরলের শিশি বাহির করিয়া মুখের উপর স্থাপন

করিল। "কি কর—কি কর" বলিয়া, হরিহর ব্যস্ত হইয়া তাহা কাড়িয়া লইতে গেলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিষ পান করিয়া, নৈরাশ্যের ভীষণ হাসি হাসিয়া তারাসুন্দরী সেই শিশি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অবাক্‌-মুখে যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে সেইখানে চিত্রার্পিতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।

অচিরাৎ মস্তিষ্কের উপর সে তীক্ষ্ণ হলাহলের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। ফেনপূর্ণ মুখে অজ্ঞান হইয়া তারাসুন্দরী পড়িয়া গেলেন। ছুটিয়া আসিয়া ভুবন তাঁহাকে তুলিতে গেলেন। দেহ হিম, অবশ, প্রস্তরবৎ কঠিন। বালকের ন্যায় ভুবন কাঁদিয়া উঠিলেন।

* * * * *

সেই রোদনশব্দ শুনিয়া অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, দৌড়িয়া আসিল। একটা গোল উঠিল। সেই গোলে মাধুরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, চকিতনেত্রে চাহিয়া বালিকা দেখিল, গৃহ লোকে পুরিয়া গিয়াছে, সকলে হায় হায় করিতেছে, আর এক জন—সে কে জানে কে?—তাহাকে দেখিলে আপনা হইতেই প্রাণ কেমন অবশ হইয়া পড়ে, একবার দেখিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা যায়—সে কাহার মৃতদেহ কোলে করিয়া অজস্রধারে রোদন করিতেছে। বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। উদাস অথচ ছল ছল নেত্রে একবার চারি দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। একদৃষ্টে সেই মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া রহিল। এ যে সেই—সেই—সেই সন্তানহারা কাঙ্গালিনী! এ কি! কে ইহার এ দশা করিল? সহজ অবস্থায় যাহাকে চিনিতে পারেন নাই, মনের এই বিকৃত অবস্থায় বোধ হইল—যেন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের স্মৃতির ন্যায় মনে হইল—ইহাকে যেন আরও পূর্ব্বে অন্য কোথাও দেখিয়াছেন। ঠিক ঐ সেই মুখ—মুখে সেই ভ্রূকুটী। সেই চোখ—এখন উর্দ্ধতার, কিন্তু গরল-উগারিণী দৃষ্টির আধার সেই চোখই তো বটে। চিনিতে পারিয়া, ভয়ে সে উন্মাদগ্রস্তা কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে একটা বিকট চীৎকার ছাড়িয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ সকলে দৌড়িয়া আসিয়া বালিকাকে তুলিয়া ধরিল। দেখিল, দাঁতি লাগিয়াছে, মূর্চ্ছায় সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। চিকিৎসকগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মুখে চোখে অবিরাম জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন;

দাসীরা বীজন করিতে আরম্ভ করিল। চৈতন্যসম্পাদনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইল, কিন্তু কিছুতেই সে মূর্চ্ছার অপনোদন হইল না। হাত ধরিয়া দেখিলেন, নাড়ী অতি ক্ষীণ। নাসায় হস্ত প্রদান করিলেন, নিশ্বাস অতি কষ্টে অল্প মাত্রায় বহিতেছে। সে অচেতন অবস্থায় তখনও সে রুগ্না থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ চিকিৎসকগণ ভীত হইলেন। কিন্তু, আধ ঘণ্টার পর আবার যখন নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তখন তাঁহাদের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। বলিলেন—"ভগবানের কৃপায় বোধ হয় এ দুরন্ত ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ হইল।"

দুই ঘণ্টা ধরিয়া চেতনার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কতক্ষণ পরে সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালিকা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। তার পর, কেমন একটা আচ্ছন্নতায় শরীর স্পন্দহীন হইয়া রহিল। অনেক ক্ষণের পর বালিকা আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। একেবারে যেন এ মাধুরী আর সে মাধুরী নয়। অবগুণ্ঠনবতী, ব্রীড়ামৌনী, মৃত্তিকাসিম্বদ্ধদৃষ্টি। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। ভগবানের অপার কারুণ্যের কথা স্মরণ করিয়া যুগপৎ সকলের চক্ষু উচ্ছ্বসিত, ভক্তিবারিস্রোতে পরিপ্লাবিত হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার নহবতের কাড়া বাজিয়া উঠিল। আবার ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। মন্দিরে মন্দিরে আবার অগুরু গুগ্‌গুল স্তূপে স্তূপে জ্বলিয়া চতুর্দ্দিকে আমোদিত করিয়া তুলিল। নিশার অন্ধকার ঘুচিয়া ঊষার স্বর্ণকিরণ স্পর্শে পৃথিবী যেমন হাসিয়া উঠে, তেমনি সেই রাজ্যভাগ রাজকুমারীর আরোগ্য-সংবাদে আবার হাসিয়া উঠিল। যে দিন প্রথম এই সংবাদ প্রচারিত হইল, সে দিন অতিথিশালায় রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন ফেলা গেল—আহ্লাদেই সকলের উদর পুরিয়া গিয়াছিল, তা ভোজন করিবে কি? অনেক রোগী মনের আনন্দে অর্দ্ধেক রোগমুক্ত হইল, যে অতি কষ্টে বিছানায় পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, সেও মুহূর্ত্তের জন্য রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া একবার উঠিয়া বসিল। বৃদ্ধ মুকুন্দরাম রাজকুমারীর কল্যাণে অকাতরে দীন দরিদ্রদিগকে ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। রাজারাণী আনন্দে এতই অধীর হইলেন যে, সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি কেবল কন্যার কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সকলেই যখন আনন্দে মগ্ন, তখন হরিহরেরও আনন্দ না হইবার কোন

সেই অপরিণতবুদ্ধি হতভাগ্য বালকের কুক্রিয়ানুরতির বিষম প্রতিফল, আর মন্দভাগিনী তারাসুন্দরীর অচিন্তিতপূর্ব্ব ভয়াবহ পরিণাম মনে হইয়া তাঁহাকে বড়ই আকুল করিয়া তুলিল। যেদিন ত্রিরাত্রি গতে সেই অচিরমৃতার প্রেতাত্মার উদ্দেশে ভুবন শ্রাদ্ধ করিয়া উঠিলেন, সেদিন হরিহর কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। একাকী নিরালায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। পত্নীর শেষ কথাগুলি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই কথা যখনই মনে হইত, তখনই প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত। মনে মনে আপনার মৃত্যুকামনা করিতেন। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই অন্তর্দাহে হরিহর শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পিতার জন্য ভুবন যারপরনাই কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রভাতে একদিন শয্যা হইতে উঠিয়া আর হরিহরকে কেহ দেখিতে পাইলেন না। বিস্তর অন্বেষণেও কেহ কোন সংবাদ বলিতে পারিল না।

রাজা দেবীবর ক্রমঃশই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এক এক করিয়া সকল কাজই দেখিবার ভার ভুবনের উপর পড়িল। ভুবন কৃতবিদ্য, স্থিরবুদ্ধি, সৎস্বভাবশীল—অতি সুচারুরূপে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কলেজে পড়া আর হইল না। তাহাতে ভুবনের বড় মনঃকষ্ট দেখিয়া রাজা কলিকাতা হইতে সুশিক্ষিত মাষ্টার পণ্ডিত আনাইয়া গৃহে রাখিয়া দিলেন। ভুবন প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। রাজা যখন ভুবনের স্বভাব চরিত্র অধ্যবসায় ও কার্য্যপটুতা দর্শনে সন্তৃপ্ত হইলেন, এবং রাণীর মুখে কন্যা ও জামাতার মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসার কথা শুনিয়া আরও অধিক পুলকিত হইলেন, তখন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ মনে সংসারপাশ কাটাইয়া পতিপত্নী তীর্থযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। অকস্মাৎ সে কথা যে শুনিল, সেই কাতর হইয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণলোচনে মাধুরী কতই নিষেধ করিলেন, হৃদয়ের কাতরতা জানাইলেন। রাজা সস্নেহে সে নয়নজল মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পতিসহায় হইয়া দেবদর্শনে যাইবেন, ইহা অপেক্ষা জীবনের উচ্চতর ব্রত আর কি আছে, কিন্তু তবু কন্যাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সেই চাঁদমুখ আর দেখিতে পাইবেন না—রাণীর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পাছে দুহিতা তাঁহার মনের অবস্থা জানিতে পারিয়া আরও অধিক কাতর হইয়া পড়ে, এ জন্য তাহার নিকট সে ব্যাকুলতা গোপন করিয়া, নিভৃতে অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া, যে কয়দিন যাত্রার বিলম্ব ছিল, সে কয়দিন নিত্য সন্ধ্যার সময় কন্যাকে কাছে বসাইয়া নানা নীতি উপদেশ দিতেন। কি করিয়া সংসার

ধর্ম্ম পালন করিতে হয়—দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুজনে সম্মান, দীন দরিদ্রে দয়া, অতিথি অতুরের সেবা, হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বলোকহিতসাধন, একটি সামান্য প্রজার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহপ্রদর্শন, আর নারীধর্ম্মের সারধর্ম্ম পাতিব্রত্য-রক্ষা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা করিলে ফল কি, না করিলেই বা কি প্রত্যবায়, একে একে কত কথাই বুঝাইতেন। সে কথায় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মাতা আপনার ব্যাকুলতা ভুলিয়া যাইতেন, কন্যা আপনার কাতরতা বিস্মৃত হইতেন। ক্রমে যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। রাজ্যশুদ্ধ লোক রাজা রাণীর আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য ভাঙ্গিয়া আসিল। নানাবিধ ধনরত্ন বিলাইয়া, প্রশান্তমুখে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, প্রণত কন্যা ও জামাতার শিরশ্চুম্বন করিয়া অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সামলাইয়া, শুভমুহূর্ত্তে রাজারাণী শকটারোহণ করিলেন। ঘর্ঘরচক্রে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

সেদিন বৃদ্ধ মুকুন্দরাম বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন। পাগলের ন্যায় একাকী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ কিছুতেই স্বীকার পান নাই। মাধুরীকে ছাড়িয়া তিনি বৈকুণ্ঠেও যাইতে চাহেন না, তীর্থ তো সামান্য কথা। তাঁহার অসামান্য স্নেহ দেখিয়া রাজারাণী বিস্মিত হইলেন। তিনি তাহাদের মাথার উপর আছেন,—ইহা ভাবিলেও অনেকটা উদ্বেগের লাঘব হইবে, এই মনে করিয়া বুড়াকে আর বেশি পীড়াপীড়ি করিলেন না। রাজাকে ছাড়িয়া থাকা যে বড়ই কষ্টকর হইবে, তাহা যে মুকুন্দরাম অগ্রে বুঝেন নাই তাহা নহে, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিবন্ধক হওয়া অকর্ত্তব্য, ইহা ভাবিয়া কোন কথা কহেন নাই, বরং নিজেই উদ্যোগী হইয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন; আজ কিন্তু আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহার সে কাতরতা দেখিয়া মাধুরী আপনার কষ্ট চাপিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর তবে বৃদ্ধ কতক শান্ত হইয়া স্নান করিয়া আসিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সেই স্নেহময় হাস্যপ্রদীপ্ত করুণাপ্রফুল্ল মুখযুগল পৌরজনবর্গ কিছুতেই কিন্তু ভুলিতে পারিল না। সে মুখ যে আর কেহ কখন ভুলিতে পারিবে, তাহাও এক দণ্ডের জন্য কাহারও মনে স্থান পাইল না। কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল,—সেই কৌশলে এক বৎসর পরে আর একখানি নূতন মুখ আসিয়া সকলকে সে কথা ভুলাইয়া দিল। সেই

তখন পিতামাতার চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন। কে বলিবে, প্রাণের ভিতর কি সুখ উছলিয়া উঠিত? জগৎসংসারের অন্য কোন কথাই আর হৃদয়ে স্থান পাইত না, অনিমিষনেত্রে কেবল তাহারই পানে চাহিয়া থাকিতেন। আপনি দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি হইত না, স্বামীকে আনিয়া তাহা দেখাইতেন। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ভুবন মমতাবিগলিতপ্রাণে অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানে ডুবিয়া যাইতেন। দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুকুন্দরাম সেই নিসর্গসুন্দর মুখখানিতে সহস্র সহস্র চুম্বন করিতেন, আর বৃদ্ধের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া প্রেমধারা গড়াইয়া পড়িত।

মনোহরপুরে গিয়া বাস করা আর ভুবনের ঘটিল না। বৃদ্ধ মুকুন্দরাম আর রাজকার্য্য দেখেন না। তিনি যদি সে কাজ করিবেন, তবে তাঁহার ছোট্টটো ভাইটির জন্য বিড়াল ধরিয়া বেড়াইবে কে? কাজেই সকল কাজ ভুবনের না দেখিলে হয় না। তিনি মনোহরপুরের সমস্ত সম্পত্তি অমূল্যের নামে লিখিয়া দিলেন। তাহার কারামুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্য্যোধন খুড়ার উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইল। দিন কতক দুর্য্যোধন লোকের হাতে মাথা কাটিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে দুর্যোধন ও ক্ষেমার নাম একত্র বাজিয়া উঠিল। সময় পাইয়া সকল লোকে দল বাঁধিয়া তাঁহাকে একঘরে করিল।

তার পর, আর আর সকলের কার কি হইল, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। আমরা অত খবর রাখি নাই।

সম্পূর্ণ।

য়ুরোপীয় ও মার্কিন শ্রমজীবী।

শেষ প্রস্তাব।

বেলজিয়ামের শ্রমজীবীগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পানদোষ অত্যন্ত প্রবল; শনিবারের সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রবিবারের সমস্ত রাত্রি ইহারা মদ্যপান ও বিবিধ কুক্রিয়ায় সময় ক্ষেপণ করে; এমন কি, অনেকে এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, সোমবারেও কার্য্যে যোগ দিতে পারে না, সুতরাং ইহাদের অনেক আর্থিক ক্ষতিও ঘটে। বাস্তবিক বেলজিয়াম শ্রমজীবীগণ যেরূপ কার্য্যকুশল এবং পরিশ্রমী, তাহাতে ইহাদের সংখ্যা প্রয়োজনাতি-

রিক্ত না হইলে ইহাদের অবস্থাগত উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইত। কোনও কোনও সুবৃহৎ কাচের কারখানায় এক এক জন কারিকর প্রত্যহ পাঁচ ছয় টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে; এই সকল লোক মাসিক পঁচিশ ত্রিশ টাকা দিয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দ বাসোপযোগী বাড়ীভাড়া করে। বেলজিয়ামের সাধারণ শ্রমজীবীগণ প্রত্যহ গড়ে এক টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। ইহারা বাসের জন্য ছোট ছোট কুটীর ভাড়া করে, প্রত্যেক কুটীরে তিনটি কক্ষ, মাসিক ভাড়া পাঁচ ছয় টাকা। মেরিওয়েদার সাহেব এক কাগজনির্ম্মাতার পরিচয় দিয়াছেন, এই ব্যক্তির বাড়ী এ্যাণ্টওয়ার্পের নিকট, তাহার পরিবারের সংখ্যা পাঁচটি—সে নিজে, স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যা; পুত্রদ্বয়ের একটির বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, অন্যটি একাদশবর্ষীয়, কন্যাটি আট বৎসরের। এই ব্যক্তি সপত্নীক কাগজের কলে কাজ করিত, সে নিজে বার আনা এবং তাহার স্ত্রী ছয় আনা হিসাবে প্রত্যহ উপার্জ্জন করিত, বালকবালিকাগণ এক চুরটের দোকানে নিযুক্ত ছিল—বালকটির প্রত্যহ চারি পাঁচ আনা, এবং বালিকাটির দুই তিন আনা উপার্জ্জন হইত; সকলে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা দ্বারা তাহারা একটি জনবহুল অপরিচ্ছন্ন পল্লীতে এক দুর্গন্ধময় খালের ধারে তিনটি কুঠুরী ভাড়া করিয়া বাস করিত। রুটি, কাফি, ভাত, পেঁয়াজের ডাল্‌না এবং বিয়ার মদ্য ইহাদের দৈনিক খাদ্য, এতদ্ব্যতীত কখন কখন মাংস আনাইয়াও খাইত।

বেলজিয়ামের সেরাইং নামক নগরে লৌহসম্বন্ধীয় কারবারই অধিক, এখানে নানাপ্রকার কল (Engins) প্রস্তুত হয়, এবং ঢালা লোহার অনেক কাজ হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন এখানে কয়লা ও লৌহের খনি থাকায়, বেলজিয়ামের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে শ্রমজীবীদিগের অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহের বিভিন্ন কারখানায় প্রায় দশ বার হাজার শ্রমজীবী প্রত্যহ পরিশ্রম করে; তাহাদের জন্য এখানে একটি হাঁসপাতাল আছে, তাহাতে বার্ষিক প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ হয়; কেবল তাহাই নহে, শ্রমজীবীদিগের সুবিধার জন্য সেভিংস ব্যাঙ্ক, পীড়িতের ব্যাঙ্ক, উৎকৃষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাধারণ রন্ধনশালা এবং ভোজনাগার স্থাপন করা হইয়াছে। বেলজিয়ামে যে সকল কয়লার খনি আছে, তাহাতে স্ত্রীলোক, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাগণ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া থাকে, তাহারা পৃষ্ঠে করিয়া কয়লা বহন করে, এবং এ জন্য দৈনিক আট আনা হিসাবে পায় করে।

ফরাসী শ্রমজীবীগণ প্রত্যহ একবার করিয়া পুরামাত্রায় খাইতে পায়, কিন্তু তাহারা যাহা আহার করে, সকলের মতে তাহা পূর্ণমাত্রা নহে। প্রত্যহ প্রভাতে বহির্গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ইহারা কোনও হোটেলে প্রবেশ করে, এবং দুই আনা দিয়া খানিক রুটী ও মদ কিনিয়া লয়। প্যারী নগরীর শ্রমজীবীগণই কেবল বাজারে মধ্যাহ্নভোজনের বন্দোবস্ত করে। পণ্য-বিক্রেতা পরিচ্ছদবিভূষিত হইয়া একখানি হাতা হস্তে তাহার স্তূপাকার পণ্য-দ্রব্যের নিকট দাঁড়াইয়া থাকে; কোনও গৃহিণী এই বাজারে রেশমী বস্ত্র, খাদ্য-দ্রব্য বা খেলেনা কিনিতে আসিলে, অগ্রে আবশ্যক দ্রব্য মনোনীত করিয়া লয়—পরে বিক্রেতার হাতায় মূল্য রাখিয়া দেয়, দোকানী সেই অর্থ তাহার নিকটস্থ একটি বাক্সে ঢালিয়া রাখে। এই সকল সাধারণ ফরাসী দোকানে একমাত্র পণ্যবিক্রেতাই সকল কাজ করে, তাহার অন্য সহকারী নিযুক্ত দেখা যায় না। খাদ্যক্রেতৃগণ সজ্জিত ডিসের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনানুরূপ ডিস্ গ্রহণ করে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে—এক টুক্‌রা রুটী অর্দ্ধ আনা, এক প্লেট ঝোল দেড় আনা, তরকারী এক আনা, ইত্যাদি। মেরিওয়েদার সাহেব যে বাজারে আহার করিতেন, সেখানে প্রতিদিন প্রায় তিন সহস্র শ্রম-জীবী খাদ্যগ্রহণ করিত, এবং এজন্য প্রত্যেককে পাঁচ আনা হিসাবে দিতে হইত। কোনও কোনও শ্রমজীবী সেখানে বসিয়া খাইত না, রুটি, মাখম, তরকারী পকেটে পুরিয়া আপনাদিগের ইপ্সিত স্থানে লইয়া যাইত।

ইংরেজ শ্রমজীবীগণ য়ুরোপীয় সকল দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে, কিন্তু ইহাদের আহারাদির ব্যয়ও অনেক অধিক। তথাপি ইহারা ইটালীয় বা ফরাসী শ্রমজীবী অপেক্ষা সন্তুষ্ট ও সুখী কি না সন্দেহ। ইটালীয় বা ফরাসী জাতি অপেক্ষা ইহাদের অভাব অনেক অধিক, সুতরাং উপার্জ্জন অধিক হইলেও ইহারা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। মদ্য মাংস খাইতে না পাইলে ইহারা মনে করে, বুঝি অনাহারে মৃত্যু ঘটিল; যাহা হউক, ইহাদের সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্য নিতান্ত দুর্ম্মূল্য নহে। অধিকাংশ ইংরেজ-শ্রমজীবীই প্রত্যহ প্রায় তিন টাকা উপায় করিতে পারে, দক্ষ শ্রমজীবীগণ চারি পাঁচ টাকাও উপায় করে। ইয়র্কসায়রের শ্রমজীবীগণের বিভিন্ন বাসগৃহ আছে, এই সকল গৃহ ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের নিম্নতলে দুইটি কুঠুরী, প্রত্যেকটির পরিসর চতুর্দ্দশ ফিট মাত্র, দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। এই সকল গৃহের ভাড়া সপ্তাহে আড়াই টাকা হইতে তিন টাকা, এতদ্ভিন্ন গ্যাস ও কয়লার

দান নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী দুর্ম্মূল্য নহে, দশ পয়সা হইলেই এক সের ভাল ময়দা পাওয়া যায়, এক সের ভাল চিনির মূল্য প্রায় ছয় আনা, কিন্তু টাট্‌কা মাংস এক সের এক টাকার কমে পাওয়া যায় না। লণ্ডনের বাহিরে শ্রমজীবীগণ নিজ নিজ গৃহেই রন্ধন করিয়া থাকে। উপরে আমরা যে ঘরের কথা বলিয়াছি, তাহার নিম্নতলের একটি প্রকোষ্ঠে রন্ধনকার্য্য ও আহার সম্পন্ন হয়, অন্যটি বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়। যে সকল নগরে কল কারখানা অধিক, সেখানে শ্রমজীবীদিগকে ভাড়া দিবার জন্য এরূপ অনেক গৃহ প্রস্তুত থাকে; এমন কি, বৈঠকখানাটি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া, দেওয়ালে ছবি টাঙ্গাইয়া এবং মেজেতে কার্পেট মুড়িয়া ভাড়ার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়; কারণ, ইহাতে শ্রমজীবীগণ সহজেই আকৃষ্ট হয়।

বিলাতী তাঁতিরা সপ্তাহে দশ বার টাকা উপার্জ্জন করে। এই টাকায় অবশ্য তাহাদের বিলাসলালসা পরিতৃপ্ত হয় না, কিন্তু প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সচ্ছন্দে দিন চালাইতে পারে। সকালে কাজে যাইবার পূর্ব্বে ইহারা চা, কাফি, রুটি, মাখম, এবং কখন কখন ডিম্ দিয়া উদর পূর্ণ করে। মধ্যাহ্নে আহারের সময় কোনও এক প্রকারের মাংস অথবা মটন চপ, রুটি, মাখম, আলু ব্যবহৃত হয়; এতদ্ভিন্ন সপ্তাহে দুই তিন দিন "পুডিং"এর বন্দোবস্ত করিয়া লয়; বলা বাহুল্য, ইহার উপর অধিকাংশ পরিবারই মদ্য ব্যবহার করে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রমজীবীদিগের অনেক "ক্লব" হইয়াছে, এই সকল ক্লবে যোগ দেওয়াতে অনেকের মধ্যে পানদোষের পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস দেখা যায়। এই সকল ক্লবের অধিকাংশই রাজনৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শ্রমজীবীগণ এখানে আসিয়া নানাপ্রকার গল্পে বা সংবাদপত্রপাঠে সময়াতিপাত করে, এবং যে সময় হয় ত ইহারা মদ খাইয়া পড়িয়া থাকিত, সেই সময় নির্দ্দোষ আমোদে অতিবাহিত করে। যে সকল শ্রমজীবী ক্লবের সভ্য, তাহাদিগকে বার্ষিক দুই টাকা হিসাবে চাঁদা দিতে হয়, এই সামান্য চাঁদা দিয়া ইহারা নানাপ্রকার সংবাদপত্র পাঠ করিতে ও বিলিয়ার্ড খেলিতে পায়; এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের পরিতুষ্টির জন্য কখন কখন ক্লবে বক্তৃতা দেওয়া বা ক্রীড়া কৌতুক দেখান হয়।

মার্কিন শ্রমজীবীদিগের উল্লেখ করিয়া মেরিওয়েদার সাহেব লিখিয়াছেন, "আমি যে অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঘুরিতেছি, তাহার সাধনপথে আমেরিকায় যত বাধা, ইংলণ্ড বা যুরোপীয় অন্য কোনও

দেশে তত বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না।” দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, য়ুরোপের এই সম্প্রদায়স্থ লোক তাহাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথা কহিতে কতকটা ইচ্ছুক, কিঞ্চিৎ ব্যগ্রও বটে, তাহারা তাঁহাকে তাহাদের কঠোর পরিশ্রম ও অল্প পারিশ্রমিকের কথা বলিত, এবং তাহাদের মার্কিন সহযোগীগণের অবস্থার কথা মনোনিবেশসহকারে শ্রবণ করিত ; কিন্তু আমেরিকায় শ্রমজীবীগণের বিশ্বাসভাজন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। অল্পদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় শ্রমজীবীগণের মধ্যে “শ্রম ও পারিশ্রমিক” লইয়া যে ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই তাহারা অত্যন্ত সন্দিগ্ধচেতা হইয়া উঠিয়াছে। যদি অনেক চেষ্টায় তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইতে পারা যায়, তাহা হইলেই তাহাদের নিকট হইতে কোনও কোনও কথা জানিতে পারা যায় ; কিন্তু তাহাদের উপকার করিবার উদ্দেশে তাহাদেরই মনস্তুষ্টি করিতে কয় জনের প্রবৃত্তি হয় ? মেরিওয়েদার একবার নিউইংলণ্ডের এক “তুলার কলে” উপস্থিত হইয়া কতকগুলি শ্রমজীবীর নাম ও ঠিকানা টুকিয়া লন, অভিপ্রায়—তাহাদের গৃহে গিয়া তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করিবেন। তিনি কল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—“মশায়, আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিয়েছেন, তা ফেরত দেন।” সাহেব প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইলেন, তাহার পর “নোটবুক” খুলিয়া গম্ভীরভাবে বৃদ্ধার নাম ও ঠিকানা পাঠ করিলেন ; স্ত্রীলোকটি তখন শান্তভাবে নিজের কাজে ফিরিয়া গেল।

অতঃপর সাহেব যখন এই বৃদ্ধার গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন সে যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইল, কারণ সাহেব তাহার নাম ও ঠিকানা ফেরত দেওয়া সত্ত্বেও কিরূপে তাহার বাড়ী ঠিক করিয়া আসিলেন! এই বৃদ্ধার পরিবার সংখ্যা সর্ব্বসমেত নয়টি, সমবেত সাপ্তাহিক উপার্জ্জন ত্রিশ টাকা, ইহাদের বাড়ী একতলা, বাড়ীতে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ, দুইটি কক্ষ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, অন্য তিনটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, এবং তাহার ভিতরের স্থান এতই সঙ্কীর্ণ যে, একটি পরিমিত আয়তনের শয্যাও তাহার মধ্যে বিস্তৃত রাখা যায় কি না সন্দেহ। এই বাড়ী পূর্ব্বোক্ত তুলার কলের স্বত্বাধিকারীর ; তিনি কম ভাড়ায় ইহা বৃদ্ধাকে বাস করিতে দিয়াছেন, বৃদ্ধাকে মাসিক বিশ টাকা ভাড়া দিতে হয়। বাস্তবিক মাসিক বিশ টাকার কমে আমেরিকায় বাড়ীভাড়া পাওয়া দুর্ঘট। মেরিওয়েদার সাহেবের মতে এই বৃদ্ধা যে বাড়ীতে আছে, এরূপ বাড়ী আমেরিকার কোথাও মাসিক ত্রিশ টাকার কম ভাড়ায় পাওয়া যায় না।

এই পরিবারকে বৃহৎ শ্রমজীবী পরিবারের আদর্শরূপে ধরা যাইতে পারে; ইহারা যে নিয়মে দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করে, তাহাতেই মার্কিন শ্রমজীবীগণের আহারাদি সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা হয়।

ইহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে সাড়ে পাঁচটার সময় উঠে। ছয়টার সময় কাফি, রুটি, মাখম ও আলু দিয়া জলযোগ করে; সাড়ে ছয়টার সময় কলে কাজ আরম্ভ করিবার নিয়ম, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়; কেবল মধ্যাহ্নে সকলে আহারার্থ এক ঘণ্টা ছুটী পায়। এই বৃহৎ পরিবারের আয় যেরূপ সামান্য, তাহাতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উঠাই তাহাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু পরিমাণে যতই অল্প হউক, অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভিন্ন অপকৃষ্ট দ্রব্য ইহারা কখনও ক্রয় করে না। মার্কিন-শ্রমজীবীগণের ইহা এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। আমাদের দেশের "মোটা ভাত মোটা কাপড়" কথাটি ইহাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে খাটে না; কারণ, ইহারা মোটা, শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিবে, অন্ধকারময় কুটীরে কাল কাটাইবে, যাহা আহার করিবে, তাহাও হয় ত ক্ষুধার পক্ষে সামান্য,—কিন্তু "মোটা ভাত" ইহাদের অসহ্য, কেবলমাত্র অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যই ইহাদের গ্রহণোপযোগী।

যে শ্রমজীবী সপ্তাহে কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করে, সে এই বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে যে, "কেহই বলিতে পারে না, আমি আমার পরিবারবর্গকে অতি উত্তম ময়দা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিনি ও খুব টাট্‌কা মাংস খাইতে দিই না।" বাস্তবিক, বার্ষিক তিন হাজার টাকা উপার্জ্জনক্ষম উকীল কিম্বা পুস্তকব্যবসায়ী যে রকম ময়দা, চিনি ও মাংসের ব্যবহার করেন, শ্রমজীবীগণ তাহা ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়াই মনে করে না। মার্কিন শ্রমজীবীগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার ধারণাই নাই, সর্ব্বস্বান্ত হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু "বাজারের সেরা" জিনিষ খাইতে হইবে, ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। মেরিওয়েদার সাহেব বলেন, বাজারে যখন খুব ভাল মাখম বার আনা হিসাবে পাউণ্ড বিক্রয় হইত, তখন শ্রমজীবীগণ চৌদ্দ আনা পাউণ্ড মাখম কিনিয়া লইত। মাংসের খরচও অল্প নহে। উপরে যে বৃদ্ধার কথা বলা গিয়াছে, সে রাত্রি সাতটার সময় কল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাঁধিতে আরম্ভ করিত; প্রকৃতপক্ষে নৈশভোজনই ইহাদের প্রধান আহার, মধ্যাহ্নে কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আহার তত ভাল হয় না।

নিউইংলণ্ডের অনেক কলের সঙ্গেই শ্রমজীবীগণের ভোজনাগার সংযুক্ত আছে। বেলা বারটার সময় দলে দলে লোক এই ভোজনশালায় খাইতে বসে,

পনের মিনিটের মধ্যেই প্রায় সকলের খাওয়া শেষ হয়, তাহার পর তাহারা খোলা যায়গায় বসিয়া গল্প বা আমোদপ্রমোদ করে। ১টা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ঘণ্টা দেওয়া হয়; ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই সকলে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া যায়, এবং ঠিক একটার সময় নির্দ্দিষ্ট কাজ আরম্ভ করে।

মেরিওয়েদার সাহেব রোড্ দ্বীপে এগারটি বালিকাকে কাজ করিতে দেখিয়াছিলেন; ইহাদের একজন সপ্তাহে বার টাকা, দুইজন প্রত্যেকে নয় টাকা, দুইজন তের টাকা হিসাবে এবং ছয়জন প্রত্যেকে সাত টাকা উপার্জ্জন করিত। একজন ভিন্ন ইহাদের সকলেই নিজ নিজ গৃহে বাস করিত; কেহ বাড়ীতে চারি পাঁচ টাকা খরচ দিত, অনেকে তাহাদের উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থই পিতামাতাকে সমর্পণ করিত। যে বালিকা গৃহে থাকিত না, সে আয়র্লণ্ড হইতে আসিয়াছিল। সে সপ্তাহে নয় টাকা উপার্জ্জন করিত; তন্মধ্যে নিজে সাত টাকা খরচ করিত, অবশিষ্ট যাহা বাঁচিত, মাসে মাসে পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দিত। এই কয়েকটি বালিকা যে কলে কাজ করিত, সেখানে শ্রমজীবি সংখ্যা উনিশ শত; ইহার মধ্যে এক হাজার বিশ জন স্ত্রীলোক; এই হতভাগিনীগণের অধিকাংশের নিকটই দিবারাত্রি সমান। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ইহারা কলে আসিয়া কাজ আরম্ভ করে, সমস্ত দিন সেখানেই কাটিয়া যায়; এই সমস্ত কারখানা অন্ধকারময় এবং অবরুদ্ধ, সুতরাং কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবহৃত হয়। এই বায়ুপ্রবাহশূন্য, উত্তপ্ত, রুদ্ধ গৃহে প্রত্যহ দিবসের অধিকাংশ সময় আবদ্ধ থাকায়, এই সকল শ্রমজীবীদিগের অবস্থা, কারারুদ্ধ অপরাধীদিগের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। কারণ, কয়েদীগণও পরিষ্কার খাদ্য, উপযুক্ত বিশ্রাম, নির্ম্মল বায়ু ও সূর্য্যালোক ভোগ করিতে পায়, এবং রাত্রে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে নিদ্রা যাইতে পারে। কয়েদীদিগের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু কলে যাহারা কাজ করে, তাহারাও নিতান্ত পরাধীন; পীড়া বা অন্য কোনও অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কাহারও কল ছাড়িয়া যাইবার অধিকার নাই।

নিউইয়র্ক, ফিলাডেল্‌ফিয়া, সেণ্টলুই প্রভৃতি আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরে অন্যান্য ক্ষুদ্র নগর অপেক্ষা পারিশ্রমিকের হার কিঞ্চিৎ অধিক; কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যয় অপেক্ষাকৃত এত অধিক যে, এই বর্দ্ধিত হারে শ্রমজীবীদের কিছু মাত্র আনুকূল্য বোধ হয় না। নিউইয়র্কে শ্রমজীবিগণ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে অতি কষ্টে তাহাদের দিনাতিপাত হয়; ঘরভাড়া অত্যন্ত অধিক,

জিনিষপত্র ভয়ানক মহার্ঘ, খাদ্যসামগ্রীও দুর্ম্মূল্য, সুতরাং কোনও দিকেই কাহারও সুবিধা হয় না। মাসিক ত্রিশ টাকার কম কেহ বাড়ী ভাড়া পায় না, এবং ত্রিশ টাকায় যে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা বাসের এক প্রকার অনুপযোগী।

নিউইয়র্কের নিকট ব্রুকলিনে বাড়ী ভাড়া বেশ সস্তা। মেরিওয়েদার ব্রুকলিনে এক তন্তুবায়পরিবারের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন; ইহারা নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত ফিতে প্রস্তুত করে। ইহাদের বাড়ীটি ধূসরবর্ণের, দেখিতে বেশ সুন্দর, এবং দেখিলে মনে হয়, কোনও ধনাঢ্য বণিকের বাড়ী। এই পরিবারে পুরুষ মানুষ কেহ নাই, গৃহকর্ত্রী এই বাড়ী মাসিক ৭৫৲ টাকায় ভাড়া করিয়াছে; সে আবার সর্ব্ব নিম্নতল ত্রিশ টাকায় এবং তৃতীয় তল কুড়ি টাকায় ভাড়া দিয়াছে। দ্বিতীয় তলে তন্তুবায়রমণী তাহার এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী এবং পিতামহীর সহিত বাস করে, নিজে পঁচিশ টাকা মাত্র বাড়ী ভাড়া দেয়। ইহাদের সম্মুখের ঘরটি উচ্চ রেল পথের ঠিক উপরেই, সুন্দররূপে সজ্জিত এবং ছবি, গালিচা, পিয়ানো প্রভৃতি দ্রব্যে ভূষিত। গৃহকর্ত্রীর দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী আহার ও বাসাভাড়ার জন্য সপ্তাহে ছয় টাকা দেয়, এবং সে নিজে ফিতে বুনিয়া সপ্তাহে পনের টাকা উপার্জ্জন করে; এই পনের টাকা ও ভগিনীদত্ত ছয় টাকা, ইহাতেই তাহাদের সুখে সচ্ছন্দে কালযাপন হয়। অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে যাহাই হউক, ব্রুকলিনে একটি ছোট খাট সুন্দর দোতালা বাড়ী মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়াতেই পাওয়া যায়। এইরূপ একটি বাড়ীতে মেরিওয়েদার সাহেব এক সূত্রধরপরিবারের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। এই বাড়ীতে বাসোপযুক্ত ঘর ব্যতীত বৈঠকখানা, স্নানের ঘর, ভাণ্ডারগৃহ প্রভৃতিরও অভাব ছিল না; বাড়ীটি বেশ সজ্জিত, এবং সূত্রধরের পরিবারবর্গ বুদ্ধিমান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। গৃহস্বামী একজন সর্দ্দার মিস্ত্রী, তাহার বার্ষিক আয় প্রায় তের শত টাকা; তাহার দুই কন্যা টুপীর (Straw Hat) দোকানে কাজ করিত, একজন বার্ষিক ছয় শত ও অন্যটি পাঁচ শত টাকা উপায় করিত। এতদ্ভিন্ন মিস্ত্রীর বাইশ বৎসর বয়স্ক এক পুত্র শুক্র সওদাগরী আফিসে কাজ করিয়া সপ্তাহে ত্রিশ টাকা পাইত। সকলের উপার্জ্জনলব্ধ অর্থ হইতে ইহাদের বার্ষিক প্রায় নয় শত টাকা উদ্বৃত্ত হইত।

এই সূত্রধরপরিবারের সহিত আলাপ করার অতি অল্পদিন পরে, সাহেব

সমুদ্রতীরবর্ত্তী জার্সি নগরে ভ্রমণোপলক্ষে গমন করেন। সেখানে এক হোটেলে উপস্থিত হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুঃস্থির।—দেখিলেন, উল্লিখিত সূত্রধরের টুপীওয়ালী কন্যা এক তুষারধবল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সোফায় উপবিষ্ট,—তাহার ওষ্ঠ বিম্ববিনিন্দিত শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং পাউডার-রঞ্জিত কপোলদেশ কি মধুর আরক্তিম!

সাহেবকে দেখিয়াই বেচারী কিছু অপ্রতিভ হইল, এবং একটু নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমি এখানে দিন কত ছুটী ভোগ করিতে আসিয়াছি; আপনার কাছে আমার কিঞ্চিৎ অনুরোধ আছে।"—তাহার পর কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে আপনার কিরূপে পরিচয় হইয়াছে, তাহা কাহাকেও না বলিলে বড়ই বাধিত হইব; আমি টুপীর দোকানে কাজ করি, এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। এখানে সকলের বিশ্বাস, আমি কোনও বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী; আমি টুপীর দোকানে কাজ করি, এ কথা প্রকাশ হইলে এখানে আমার যে প্রতিপত্তি আছে, তাহা মাটী হইয়া যাইবে।"

এই যুবতী এরূপ ভাবে কথা বলিতে লজ্জিত হইল না দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; তিনি সবিস্ময়ে এই যুবতীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই হোটেলে তাহার অনেকগুলি "ইয়ার" জুটিয়াছে; ইহাদের মধ্যে একজন কালোয়াৎ, কোনও জজের একটি কুলতিলক পুত্র ও এক ডাক্তারী স্কুলের জনৈক ছাত্র, এই তিনজন প্রধান। যুবতী গান করিতে লাগিল, এবং গীতবাদ্যে হোটেল জমকাইয়া উঠিল।

য়ুরোপের কোনও শ্রমজীবীর কন্যাই এই টুপীওয়ালী যুবতীর মত আমোদ প্রমোদে ছুটী কাটাইতে সক্ষম নহে, এবং আমেরিকাতেও শ্রমজীবীশ্রেণীর মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে সাহেব এক তামাকওয়ালার বাড়ী যান। ছয় জন লোক দুইটি ক্ষুদ্র কুঠুরীতে বাস করিত। গৃহকর্ত্তা ও তাহার স্ত্রী তামাকের কারখানায় সপ্তাহে পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করিত, ইহার মধ্যে পাঁচ টাকা সপ্তাহে বাড়ী ভাড়া যাইত, অবশিষ্ট বিশ টাকায় ছয় জন লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। আহারের জন্য তাহারা রুটি, কাফি ও আলু ভিন্ন অন্য কিছু সং[illegible]গ্রহ করিত না।

উন্মুক্ত আছে; সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে অনেকে বেশ সুখ-সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, কিন্তু এই সকল রমণী সাপ্তাহিক বিশ টাকা বেতনে প্রত্যহ এগার ঘণ্টা ধরিয়া কলে খাটিবে, তথাপি ইহা অপেক্ষা অধিক বেতনে কাহারও গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে না। সাহেব বলেন, ইহার কারণ এই যে, শ্রমজীবিবর্গের স্ত্রীকন্যাগণ প্রায় কেহই রাঁধিতে জানে না, এবং রাঁধিতে জানিলেও তাহারা কলে কাজ করা সুবিধাজনক মনে করে; তাহাদের বিশ্বাস,—পরিশ্রম অধিক ও উপার্জ্জন অল্প হইলেও, ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতাও সম্মান আছে।

ভারতীয় শ্রমজীবী।—য়ুরোপীয় ও মার্কিন শ্রমজীবী সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ করা গেল, উপসংহারে ভারতীয় শ্রমজীবী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। য়ুরোপীয় ও মার্কিন শ্রমজীবীগণের আয়ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দুর্ভাগ্য দেশের শ্রমজীবীগণের আয়ব্যয়ের কি তুলনা হয়? কি য়ুরোপ, কি মার্কিন, এমন কোনও দেশ নাই, যেখানে শ্রমজীবীগণ সপ্তাহে ন্যূনকল্পে দশটি টাকা উপার্জ্জন না করে, এবং তাহাদের আহারের মধ্যেও অনেকটা সুখসাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। সেখানে তাহাদের জীবিকা সম্মানজনক; তাহাদের সেই গৌরব, স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তি কি আমাদের দেশের শ্রমজীবীর মধ্যে সম্ভব? আমাদের দেশে খাদ্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত সুলভ বটে, কিন্তু শ্রমজীবীদিগের ভাগ্যে পুষ্টিকর আহার জুটিয়া উঠে না। পঁচিশ টাকা মাসিক আয় হইলেই আমাদের দেশের শ্রমজীবীদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইল, বঙ্গের সাধারণ শ্রমজীবী কুলি মজুরগণের মাসিক আয় চারি টাকার অধিক নয়, অথচ এক এক জনের অনেকগুলি পোষ্য। এই সামান্য আয়ে কিরূপে তাহাদের দিনপাত হয়, তাহা য়ুরোপ এবং আমেরিকার লোক কল্পনাও করিতে পারেন না। আমাদের দেশ এমন শস্য-শ্যামলা না হইলে, অরণ্যে অযত্নসম্ভূত শাক শবজী উৎপন্ন না হইলে, এবং নদী ও বিল খালে পর্য্যাপ্ত মৎস্য না পাইলে, অনাহারে অধিকাংশ লোককেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। আজ কাল সভ্য দেশে জীবনসংগ্রামের গভীর কলরব উত্থিত হইয়াছে, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাহার প্রাবল্য অনুভূত হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র পরিবার হইতে প্রতি-নিয়ত যে নীরব দীর্ঘশ্বাস শূন্যে বিলীন হইতেছে, কয় জনের সে [illegible]

চারি দিক হইতে ক্রুদ্ধ হস্ত উত্থিত হইতেছে, এবং দুর্ব্বলের প্রতি প্রতিদিন অত্যাচারের বিরাম নাই, ইহার প্রতিকার কোথায়? বৎসর বৎসর যেরূপ দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি ও সংক্রামক পীড়ার প্রকোপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে দরিদ্র শ্রমজীবিগণ যে অধিক দিন দুই সন্ধ্যা নিয়মিত আহার পাইবে, এরূপ বোধ হয় না। সর্ব্বসাধারণের উন্নতি ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, এবং যদি জাতীয় উন্নতিই না হইল, তবে বৃথা আমাদের এ শিক্ষা, সভ্যতা এবং প্রাধান্যের ভান। কেহ কেহ বলেন, আমরা শ্রমশীলতা হইতে আধ্যাত্মিকতায় 'প্রমোশন' পাইয়াছি, য়ুরোপীয় এবং আমেরিক জাতি শারীরবলে জগতে কীর্ত্তি এবং প্রাধান্য স্থাপন করুক, আমাদের সে অবস্থা গিয়াছে, এখন আধ্যাত্মিকতাই আমাদের অবলম্বনীয়। কিন্তু আমরা এ কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাই কি?—এখনও আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন; অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য না হইলে আমাদের প্রাণ এবং মান কিছুই রক্ষা পায় না, আমাদের কি আধ্যাত্মিকতার অভিমান চলে? জগৎ মায়াময় বল ক্ষতি নাই, সংসারে আসক্তি না থাকিলেও অচল হয় না; কিন্তু সংসার যাহাতে রক্ষা হয়, সে দিকে দৃষ্টি গেলেই, অগত্যা কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগকেও অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে; যাহা আমাদিগের প্রধান অভাব, তাহা দূর করিবার জন্য সকল শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিকে একাগ্র হইতে হইবে; জানি, এই প্রস্তাব অতি সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন;—তথাপি যদি এ বিষয়ে চেষ্টা করা যায়, অন্যান্য কথার সঙ্গে এই প্রধান কথাটিও আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠে, তবে কালে একটা পথ বাহির হইলেও হইতে পারে, এবং সেই আশাতেই আমাদের এই আলোচনা।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পরমাণু।

"If, as would seem to be supposed in this doctrine, all the material ingredients of the earth existed in this diffuse nebulosity, either in the state of vapour, or in some state of still greater expansion, whence were they and their properties?"—Whewell.

(হরিহর এবং পূর্ণচন্দ্রের কথোপকথন)

পূর্ণ। কেন মহাশয়! লাপ্লাসের মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া জড় পরমাণু এবং জড়শক্তির সংযোগে হইয়াছে। তিনি বলেন—আদিতে সমুদায় সৌরমণ্ডল ব্যাপিয়া বিশাল পরমাণুসমষ্টি ঘূর্ণ্যমান ছিল, এবং তাহাদেরই [illegible]

সমেত কেন্দ্রস্থ সূর্য্য আবির্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টি সেই পরমাণু সকলের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের ফলমাত্র, মূলে সেই জড়পদার্থ এবং জড়শক্তি। —A fortuitous concourse of blind atoms—

হরি। থাম বাপু! থাম, অত ব্যস্ত হ'ও না। একটু ধীরে ধীরে চল। আদিতে পরমাণু-সমষ্টি ছিল—আচ্ছা বাপু! আমাকে বুঝাইয়া দাও পরমাণু কাহাকে বলে।

পূর্ণ। আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন, কোনও একটা পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ করিয়া গেলে অবশেষে এমন একটা সূক্ষ্ম অংশে উপনীত হইব, যাহাকে আর ভাগ করা অসম্ভব। এই অবিভাজ্য সূক্ষ্ম পদার্থাংশকে পরমাণু বলে।

হরি। বেশ বাপু! বেশ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ দেখি। যদি পদার্থের বিভাজ্যতার একটা সীমা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও কল্পনীয় শক্তির দ্বারা পদার্থের শেষ অংশগুলিকে (ultimate particles)-ভাগ করা যায় না, কিন্তু এরূপ স্বীকার করা অসম্ভব। এ কল্পনা শুধু কথায় বলা যায় মাত্র, কিন্তু চিন্তাতে আনা যায় না। মনে কর, পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে কতকগুলি ভাগাবশিষ্ট অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশ রহিয়া গেল, এখন ইহাদের প্রত্যেকেরই (যদি ইহাদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়) অবশ্য বড় অংশগুলির ন্যায় একটা উপরিদেশ এবং নিম্নদেশ আছে, একটা দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্ব আছে। এই পার্শ্বগুলি এত সন্নিহিত মনে করিতে পার কি যে, তাহাদের মধ্য দিয়া একটা plane of section যাইতে পারে না? অথবা তাহাদের সংযোগশক্তি যতই প্রবল হউক, তাহার জয়োপযোগী একটা বিরোধী-শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পার না কি? পদার্থের বিভাজ্যতার সীমাকল্পনা মনুষ্যচিন্তার অতীত, এবং এইরূপে ইহাও দেখান যাইতে পারে যে, পদার্থের বিভাজ্যতার অনন্তত্ব-কল্পনাও মানুষের চিন্তার বিষয়ীভূত নয়। এখন পদার্থের বিভাজ্যতার সীমা আছে, অথবা সীমা নাই, এ দুইটির একটি অগত্যা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে; কারণ দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রতিজ্ঞার একটি স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝিয়াছ, এ দুইটার কোনটাই মনুষ্যের পক্ষে conceivable নয়।* এই ত তোমার পরমাণু। হা! হা!

পূর্ণ। বলেন কি? আপনি যে বিষম metaphysicsএর মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন! পরমাণুর অস্তিত্ব মানিব কি না, তাহা ত বুঝি না। পদার্থকে ভাগ করিলে তাহার শেষ আছে কি না, তাহা ত জানা যায় না। তবে কি পরমাণু একটা কল্পনা মাত্র?

হরি। কল্পনা বটে, এবং এ কল্পনা করিবার গুরুতর কারণও রহিয়াছে, কোনও একটা পদার্থ যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম অংশের সমষ্টিমাত্র, ইহা রসায়নবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য। Laws of definite and multiple proportions প্রভৃতি নিয়মগুলি এই Atomic theory ব্যতীত অসম্ভব মনে হয়। যাহা হউক, স্বীকার করিলাম, পরমাণু আছে। তার পর?

পূর্ণ। এই পরমাণুর পরস্পর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ জনিত আবর্তনে সমগ্র সৌরজগতের সৃষ্টি। পরমাণু সকল কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ, সেই নিয়মগুলি তাহারা চিরকাল পালন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের আবির্ভাবের সময় (সে সময় কখন, তাহা অবশ্য আমরা জানি না, হয় ত তাহারা অনাদি), তাহাদের আবির্ভাবের সময় অবধি একটা অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধানুযায়ী হইয়া থাকে, এবং তাহা অঙ্কশাস্ত্রানুসারে নির্ণীত। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সৃষ্টি—

হরি। থাম, থাম, নিয়মপালন? তাহারা কি নিয়মগুলি জানে, না সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে যে, সেগুলি পালন করিবে?

* H. Spencer's First Principles, Part I, Chap. III.

সমেত কেন্দ্রস্থ সূর্য্য আবির্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টি সেই পরমাণু সকলের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের ফলমাত্র, মূলে সেই জড়পদার্থ এবং জড়শক্তি।—A fortuitous concourse of blind atoms—

হরি। থাম বাপু! থাম, অত ব্যস্ত হ'ও না। একটু ধীরে ধীরে চল। আদিতে পরমাণু-সমষ্টি ছিল—আচ্ছা বাপু! আমাকে বুঝাইয়া দাও পরমাণু কাহাকে বলে।

পূর্ণ। আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন, কোনও একটা পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ করিয়া গেলে অবশেষে এমন একটা সূক্ষ্ম অংশে উপনীত হইব, যাহাকে আর ভাগ করা অসম্ভব। এই অবিভাজ্য সূক্ষ্ম পদার্থাংশকে পরমাণু বলে।

হরি। বেশ বাপু! বেশ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ দেখি। যদি পদার্থের বিভাজ্যতার একটা সীমা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও কল্পনীয় শক্তির দ্বারা পদার্থের শেষ অংশগুলিকে (ultimate particles) ভাগ করা যায় না, কিন্তু এরূপ স্বীকার করা অসম্ভব। এ কল্পনা শুধু কথায় বলা যায় মাত্র, কিন্তু চিন্তাতে আনা যায় না। মনে কর, পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে কতকগুলি ভাগাবশিষ্ট অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশ রহিয়া গেল, এখন ইহাদের প্রত্যেকেরই (যদি ইহাদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়) অবশ্য বড় অংশগুলির ন্যায় একটা উপরিদেশ এবং নিম্নদেশ আছে, একটা দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্ব আছে। এই পার্শ্বগুলি এত সন্নিহিত মনে করিতে পার কি যে, তাহাদের মধ্য দিয়া একটা plane of section যাইতে পারে না? অথবা তাহাদের সংযোগশক্তি যতই প্রবল হউক, তাহার জয়োপযোগী একটা বিরোধী-শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পার না কি? পদার্থের বিভাজ্যতার সীমাকল্পনা মনুষ্যচিন্তার অতীত, এবং এইরূপে ইহাও দেখান যাইতে পারে যে, পদার্থের বিভাজ্যতার অনন্তত্ব-কল্পনাও মানুষের চিন্তার বিষয়ীভূত নয়। এখন

নাই, এ দুইটির একটি অগত্যা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে; কারণ দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রতিজ্ঞার একটি স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝিয়াছ, এ দুইটার কোনটাই মনুষ্যের পক্ষে conceivable নয়।* এই ত তোমার পরমাণু। হা! হা!

পূর্ণ। বলেন কি? আপনি যে বিষম metaphysicsএর মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন! পরমাণুর অস্তিত্ব মানিব কি না, তাহা ত বুঝি না। পদার্থকে ভাগ করিলে তাহার শেষ আছে কি না, তাহা ত জানা যায় না। তবে কি পরমাণু একটা কল্পনা মাত্র?

হরি। কল্পনা বটে, এবং এ কল্পনা করিবার গুরুতর কারণও রহিয়াছে, কোনও একটা পদার্থ যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম অংশের সমষ্টিমাত্র, ইহা রসায়নবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য। Laws of definite and multiple proportions প্রভৃতি নিয়মগুলি এই Atomic theory ব্যতীত অসম্ভব মনে হয়। যাহা হউক, স্বীকার করিলাম, পরমাণু আছে। তার পর?

পূর্ণ। এই পরমাণুর পরস্পর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ জনিত আবর্ত্তনে সমগ্র সৌরজগতের সৃষ্টি। পরমাণু সকল কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ, সেই নিয়মগুলি তাহারা চিরকাল পালন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের আবির্ভাবের সময় (সে সময় কখন, তাহা অবশ্য আমরা জানি না, হয় ত তাহারা অনাদি), তাহাদের আবির্ভাবের সময় অবধি একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধানুযায়ী হইয়া থাকে, এবং তাহা অঙ্কশাস্ত্রানুসারে নির্ণীত। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সৃষ্টি—

হরি। থাম, থাম, নিয়মপালন? তাহারা কি নিয়মগুলি জানে, না সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে যে, সেগুলি পালন করিবে?

* H. Spencer's First Principles, Part I, Chap. III.

একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য করিবে। বাঃ! একটা নিয়ম থাকিতে পারে বটে, কিন্তু কোনও উপস্থিত ঘটনায় তাহারা কি সে নিয়মটি খাটাইতে জানে? তাহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধানুরূপ হইয়া থাকে। বেশ! কিন্তু সে সম্বন্ধ তাহারা জানিবে কিরূপে? মনে কর, এই তোমার পরমাণু ক, আর ওই তোমার পরমাণু খ। কখএর মধ্যে দীর্ঘ একটা ব্যবধান রহিয়াছে, এবং তাহাদের সংযোগের একটা রজ্জু পর্য্যন্তও নাই। এখন ক কেমন করিয়া জানিবে—খ কোথায়, এবং কেমনেই বা জানিবে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ কি? আহা! blind atomগুলি বড়ই দুঃখী, সন্দেহ নাই।

পূর্ণ। আপনার প্রশ্নের আমি আর উত্তর দিতে পারি না। আপনি শেষে এমনি একটা সমস্যায় আনিয়া ফেলেন যে, তাহা হইতে আর উদ্ধার নাই। আপনি নিজেই বলুন।

হরি। না হে বাপু! না, আমি এমন কি জানি যে বলিব। কিন্তু ওইখানেই ত পরমাণু লইয়া যত গোল। তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধটা বড় সহজ নয়। যত বিজ্ঞান এবং "Ology" ও "Ometry"র সৃষ্টি হইয়াছে, সবগুলিই এই সম্বন্ধ লইয়া। তাহাদের গতি এবং স্থান-পরিবর্ত্তন, ঘৃণা এবং ভালবাসা, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ, সকলই ঘটনাস্থলে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়া যায়। ইহাতে গোলমাল নাই, পরীক্ষা নাই, এবং ভুল নাই। Dynamycsএর এক একটা অঙ্ক, যাহা লাগ্রাঞ্জের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে, তাহাও তাহারা ঘটনাস্থলে মুহূর্ত্তমধ্যে কষিয়া ফেলে। একটা differential equation, যাহা কাগজে লিখিলে সমুদায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারে, তাহা তাহারা চক্ষুর নিমেষে integrate করিয়া লয়; এবং সমুদায় গণনা এমন সুন্দরভাবে করে যে, লাপ্লাস্ অথবা নিউটনের সাধ্য নাই, তাহাদের সহিত লাগে। বস্তুতঃ এই পরমাণুগুলা বড়ই অদ্ভুত!

পূর্ণ। ইহা অপেক্ষা আর বেশী বিস্ময়কর কি আছে, জানি না। তাহাদের স্মৃতিশক্তি যেমন অদ্ভুত, তাহাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও তেমনি অত্যাশ্চর্য্য। একটা ঘটনা পড়িলে মুহূর্ত্তমধ্যে এমন নির্ভুলরূপে (অথচ চিরন্তন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া) কার্য্য করা বড়ই আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই।

হরি। ঠিক বলেছ হে ঠিক বলেছ! ওইখানেই সমুদায় রহস্যের অবসান। হাঁ! তাহাদের মধ্যে একটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। এইখানেই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি।

পূর্ণ। আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আমায় একটু ভাবিবার অবসর দিন। আমি কই কখনও এমনধারা ভাবি নাই! তাই ত, ব্যাপারখানা বড় সহজ নয়! *

* Herschel's Popular Lectures: "On atoms—a dialogue."

সমাজ।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরমার পরামর্শ।

বিন্দু। বলি অ সুধা, সুধা, তোর কি আজ খোঁপা বাঁধা হবে না বোন? সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনও কি তোর চুলবাঁধা শেষ হল না? এমন চুলবাঁধা ত বাপের জন্মেও দেখি নি!

সুধা। দেখ না, দিদি, এই ঠাকুরঝিকে বল্‌লাম এক রকম করে চুল বেঁধে দিতে, তা ঠাকুরঝি যে কি কর্‌ছেন তার ঠিক নেই।

কালীতারা। হেঁ লো হেঁ, ঠাকুরঝিরই বড় সাধ, তোর মনে কিছু সাধ নেই, কেমন? লোকের ভাল কর্‌লে মন্দ হয়, না? তা এই নে বোন, এই খোঁপা বাঁধা শেষ হ'ল, এখন রূপার ফুল দুটি দে দিথি, বসিয়ে দি।

সুধা। না ঠাকুরঝি, রূপার ফুলে কায নাই, ছেড়ে দাও, তোমার দুটি পায়ে ধরি।

কালী। আর নেকামি কায কি লো? এই নে ফুল দিয়ে দিয়েছি, এখন একবার তোয়ালেখানা দাও ত বিন্দুদিদি, সুধার মুখখানা বেশ ভাল করে মুছিয়ে দি।

কালীতারা ছাড়বার মেয়ে নয়। মুখখানি বেশ করে মুছিয়া দিয়া, গলায় হার পরাইয়া দিয়া, হাতে দুখানি গয়না পরাইয়া দিয়া, একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরাইয়া, পরে আর্‌সীখানি সুধার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—"এখন শরৎ বাড়ীতে এসে বলুক মনের মত বৌ হয়েছে কি না?"

লজ্জায় সুধা আরক্তমুখী হইয়া ছুটিয়া পলাইলেন, বিন্দু ও কালীতারা হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু সুধার আয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। শুইবার ঘরে গিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিলেন, কি ভাবিতে ভাবিতে, হাসি হাসি মুখে বিছানা করিলেন, বিছানার ভিতর দুই একটি ফুলের মালা লুকাইয়া রাখিলেন, ডিবে ভরিয়া পান সাজিয়া রাখিলেন। কালীতারা ঘরে থাকাতে রন্ধনকার্য্য আর কাহাকেও দেখিতে হইত না, তবে সুধা মিছরিপানা, ফল মূল, মুগের ডাল ভিজান, প্রভৃতির আয়োজন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

রেকাবি করিয়া সমস্ত সাজাইতেছেন, এমন সময় সেই ঘরে "ঠাকুরমা"কে লইয়া বিন্দুদিদি প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরমা সুধাকে দেখিয়া বলিলেন, "বলি বড় আয়োজন যে লো!" সুধা লজ্জায় হেঁটমুখী হইলেন।

ঠাকুরমার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিন্দু ও সুধার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানি না, গ্রামের কোন্ ঘরের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক, তাহাও জানি না,—তবে বৃদ্ধা বিধবাকে গ্রামের বৃদ্ধগণ আদর করিয়া মা বলিয়া ডাকিত, সুতরাং তিনি গ্রামের মধ্যবয়স্ক ও যুবকযুবতীদিগের "ঠাকুর-মা" হইতেন। বাল্যকাল হইতেই বিধবা, সুতরাং স্বামী-ঘর কখনও করেন

নাই। মনটি সাদা, হৃদয় মমতাপূর্ণ, আর ছেলে দেখিলেই ঠাকুরমা কোলে লইতেন। সকল বাড়ীতেই তাঁহার যাতায়াত ছিল, সকল ঘরের ছেলেরা তাঁহাকে ভাল বাসিত, সকল গৃহের গৃহিণীরা ঠাকুরমাকে বসাইয়া দুইটি গল্প করিতেন। তবে ঠাকুরমা একটু রসিকা ছিলেন, এবং কথাগুল একটু অম্লমধু, নিতান্ত মিছরি-মাখান নয়।

আজ অনেক দিন পরে শরৎবাবু বাড়ী আসিবেন, শরৎবাবুকে ঠাকুরমা ছেলেবেলা থেকে বড় ভাল বাসিতেন, তাই আজ একবার দেখিতে আসিয়াছেন। শরৎবাবুকে গ্রামের লোক একঘরে করেছে, কিন্তু ঠাকুরমা মায়া ও মমতা কাটাইতে পারেন নাই।

হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমা বলিলেন,—"বলি আজ বড় আয়োজন যে লো! বিদেশে কি আর কারও স্বামী চাকুরি করে না, না বিদেশ থেকে কেউ ফিরে আসে না! এত আয়োজন কিসের লো? বুড়ি ঠাকুরমা এসেছে তা কি এক বার চেয়ে দেখতে নেই গা?"

সুধা। না ঠাকুরমা, তুমি এসেছ জান্‌তাম না। আয়োজন আর কি ঠাকুরমা, একটু জলখাবার তৈয়ার করে রাখ্‌ছি। তা ঠাকুরমা তুমি রেকাবিখানা সাজিয়ে দাও না।

ঠাকুরমা। দেখি, দেখি, কি রেখেছিস। ইস্ এ যে পানফল, আক, মুগের ডাল, আর এ পাথরের গেলাসে বুঝি মিছরিপানা?

বিন্দু। হেঁ গো ঠাকুরমা, শরৎবাবু মিছরিপানা বড় ভাল বাসেন।

ঠাকুরমা। আর এ বাটীতে কি? ও মা এ যে চিনির রসে রসবড়া রে! এ বুঝি তুই আপনার হাতে করেছিস? এ যে ভারি যত্ন রে। দেখিস্ বাছা, এত যত টত্ন করে যেন শরতের মাথাটি খাস্ নি।

বিন্দু। কেন ঠাকুরমা, শরতের মাথা খেতে যাবে কেন? অনেক দিন পরে শরৎ বাড়ী আস্‌ছে, তা সুধা একটু যত্ন কর্‌বে না ত কে কর্‌বে?

ঠাকুরমা। তা কর্‌বে বৈকি বাছা, সুধা ভাল মেয়ে, শরতের যত্ন টত্ন কর্‌বে বৈ কি। তবে কি জানিস, আজ কাল যে রকম সময় পড়েছে, বেয়াদা যত্ন টত্ন করলেই পুরুষ মানুষ আবার মাথায় চড়ে। তা বুঝি জানিস নি?

বিন্দু। না ঠাকুরমা, সে আবার কেমন, বল না, ঠাকুরমা।

ঠাকুরমা। ওলো দেখবি দেখবি, যখন আমার মত বয়স হবে দেখে শিখবি। আমি বাড়ী বাড়ী যাই, ঢের দেখিছি লো, তাই শিখিছি।

বিন্দু। তা আমাদের শিখাও না ঠাকুরমা, আমরা শুনি।

ঠাকুরমা। ওলো শুন্‌বি ত শোন্‌। ঐ যে তোরা বিয়ে বিয়ে করে পাগল হস, ছেলের বিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দাও বলে পাগল হস, আমি ত বলি ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় না ত, ছেলে মেয়ের লড়াই লাগে। এই যেমন রাজায় রাজায় লড়াই হয় না? সেই রকম লড়াই লাগে। নে, তোরা যে হেসে গড়িয়ে গেলি। বুড়ীর কথা শুনে যদি অমন করে হাসিস ত আমি এই চল্লাম।

বিন্দু। না ঠাকুরমা হাস্‌ব না, সত্য হাস্‌ব না, বল, বল, তোমার পায়ে ধরি।

ঠাকুরমা। বলছিলাম কি, বিয়ে নয় ত ছেলে মেয়ের লড়াই লেগে যায়। যে যত আদায় কর্‌তে পারে, বুঝলি কি না, মেরে ধরে, বকে ঝকে যে যত আদায় করতে পারে। ঐ আমাদের পাড়ার ঐ ঘোষালের পো আছে না? তার দুইটা ছেলে হয়েছে তা জানিস বাছা। তা ঘোষালের বৌটি রোগা শরীর নিয়ে দুই ছেলে কাঁকে করে সমস্ত দিন খাটছে গো, সমস্ত দিন খাটছে, বাসন-মাজা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, জল-আনা, রাঁধা-বাড়া, সমস্ত সংসারের কায কর্‌ছে, তার উপর দুবেলা গাল খেতে খেতে প্রাণটা যায়। বাবুর যদি গরম দুদটুকু পেতে একটু দেরি হইল, তা অমনি গালাগালি, সে ত এমন গালি নয়, আমা-দের কাণে আঙ্গুল দিতে হয়! বৌটি নিতান্ত ভালমানুষ, মুখে রক্ত উঠিয়ে বাবুর যত্ন করে, তবু ত উঠতে নাবতে গাল খায়। ভাল মানুষ হলে অমনি হয় লো, পুরুষের হাতে প্রাণটা যায়। তাই বলি, বেশী ভাল মানুষ হওয়া কিছু নয়, একটু আদায় কর্‌তে শেখ।

বিন্দু। তা সব পুরুষ কি ঐ রকম ঠাকুরমা?

ঠাকুরমা। না তা বলছিনি, তা বলছিনি, আবার মেয়েও তেমনি আছে। ঐ যে বড়ালদের বৌটি কেমন পাকা মেয়ে! স্বামীকে ঠিক যেন ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। কর্ত্তাটি বৌয়ের কথায় উঠে, বৌয়ের কথায় বসে, মুখে কথাটি কইবার যো নাই! তবু ত বড়ালের বৌয়ের বকুনি থামে না, সকাল থেকে পিট্‌ পিট্‌ করে বক্‌ছে, আর রাত দুই প্রহরের সময় সে বকুনি শেষ হয়! বাবুটি কলুর বলদের মত চখ্‌ কাণ ঢাকিয়া মুখ বুজিয়া বৌয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সারাদিন ঘুরছেন। সাবাস মেয়ে যা হউক! কেমন স্বামীকে বশ করেছে! কেমন কায আদায় করে নিচ্ছে!

বিন্দু। আ ও রকম কি আদায় করা ভাল? উহাতে কি সংসারে সুখ হয়।

ঠাকুরমা। ঠিক বলেছিস বাছা, আহা ঠিক ধরেছিস। তারিণী বাবুর সোণার সংসার ছিল, উমার মাকে কখন একটা রেগে কথা কহিতে শুনিনি গো। তা তাকে ভালমানুষ পেয়ে তোমার জেঠামশাই তাকে পায়ে ঠেল্‌লেন দেখলি ত। আহা তাকে দগ্ধে মারলেন গো, দগ্ধে মারলেন। এ লড়াই লো লড়াই,—যে ভালমানুষ তারই মরণ, যে হারামজাদা তারই জিত! আবার এখন কেমন লড়াই বেধেছে! সেই ত তারিণী বাবু,—পাড়ায় পাড়ায় ষাঁড়ের মত ফেরেন, সকলকে শাসন করেন, বাড়ীতে প্রভুত্ব করুন দেখি! কৈ এবারও ত ছেলে হ'ল না, আর একটি বৌ করুন দেখি! তার যো নেই,—ছোট গৃহিণী তারে বাড়া শক্ত, লড়াইয়ে তারিণী বাবুকে হারাইয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে? বেশ করেছে! খুব করেছে! মেয়ের মত মেয়ে বটে! বেশ করেছে, আরও করবে। এ রকম মেয়ে না হইলে কি পুরুষ জব্দ হয়?

বিন্দু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা গোপী জেঠাই যা করলে, সে কি ভাল কায ঠাকুরমা? ও রকম কাযে কি সংসারে সুখ হয়?"

ঠাকুরমা। ভাল আর কি? এই সংসারের রীতি, চিরকাল এই হয়ে আসছে! সুখ আবার কি? লড়াইতে সুখ হয় না বিয়েতে সুখ হয়? যে যত কেড়ে নিতে পারে, মেরে ধরে বকে ঝকে যে যত আদায় করতে পারে। আমি ত সংসারে এই দেখি, তোরা বাছা লেখা পড়া শিখেছিস, কি ভাবিস জানি না। ওলো শরৎ ছেলেটি ভাল, তোকে বড় ভালবাসে। একটু একটু মুখঝামটা দিস্ লো, মেয়ে হয়ে জন্মিয়াছিস, একটু আদায় করতে শেখ।

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরমা, দিদি ত হেমবাবুকে সেবা টেবা করে, আর হেমবাবুও দিদির যত্ন করে। কৈ দিদি ত আদায় করতে শিখে নাই।"

ঠাকুরমা। ওলো ওদের কথা বলিস্ কেন? হেম বাবুটি ত সন্ন্যাসী, আর বিন্দু ত চিরকালই একটু বোকা সোকা মেয়ে, ওদের কথা ছেড়ে দে। তা ও রকম বোকা সোকা ভালমানুষ লোক সংসারে কটা আছে? আমি ত দেখি, সংসারে প্রায় লড়াই, যে ভাল মানুষ হয়, তারই সর্ব্বনাশ। তা পুরুষের কি বল?—তারা রোজকার করে, তাদের বিষয়সম্পত্তি আছে, তাদেরই আয় আছে,—তারা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, আর বৌগুলাকে দাসীর মত খাটাতে চায়। তা বৌগুলা যদি একটু ধারাল না হয়, একটু ঝাঁঝাল না হয়, তোর জেঠাইয়ের মত শক্ত না হয়, তা হলে কেবল খেটে খেটে তাদের প্রাণটা

যাক ? পুরুষের লাথি ঝেঁটা খেয়ে থাকুক ? কেমন ? তাই বলি বাছা, একটু ধারাল হবি, একটু ঝাঁজাল হবি, একটু শক্ত হবি। তা হলে মানে মানে থাক্‌বি, আদায় করতে শিখবি, কাপড়খানা গয়নাখানা, প্রভুত্বটুকু আদায় কর্‌বি। পুরুষকে ভয়ে ভয়ে রাখবি, পুরুষের গতর থাটিয়ে আদায় করে নিবি, তবে ত বলি মেয়ের মত মেয়ে। আদায় করতে শিখ্‌বি নি ত মেয়ে জন্ম নিয়ে এসেছিলি কেন ?

বিন্দু। ঠাকুরমা, আদায় কর্‌তে গিয়ে যদি সব লোক্‌সান হয় ?

ঠাকুরমা। যে রাঁধতে জানে, তার হাতে কি বেগ্নন খারাপ হয় ?

বিন্দু। ঠাকুরমা, এই বয়সেই আমি কত লোক্‌সান দেখলাম! কত পরিবার ঝগড়া ঝাঁটী করিয়া যেন শ্মশানের মত হয়ে গিয়েছে! স্বামী কিম্বা স্ত্রী একটু বরদাস্ত করিলে সোণার সংসার থাকিত, কিন্তু সেইটুকু বরদাস্ত না করাতে সংসার-সুখ গোল্লায় গিয়াছে। অধিক আদায় করিতে গিয়া সব লোকসান হইয়াছে, ঠাকুরমা, শেষে যে আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিল, সেই মাথায় হাত চাপড়াইয়াছে !

ঠাকুরমা। ওলো সে রাঁধুনীর দোষ। বলি ঐ যে এক একটা রাঁধুনী বেগ্ননে যেয়দা নুন দিয়ে ফেলে,—তাই বলে কি নুন না দিলে রান্না হয় ? তুই ত একজন ভাল রাঁধুনী, কৈ নুন না দিয়ে কেবল মিছরি দিয়ে সব বেগ্ননগুলো রাঁধ দেখি ?

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রিয়সমাগম।

রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময় শরচ্চন্দ্র বাটী আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহাকে দুই বৎসর পর দেখিবার জন্য আজ বাড়ী লোকে পূর্ণ। হেমচন্দ্র এত দিন পর ভ্রাতৃসম শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া যথার্থই আনন্দলাভ করিলেন। অন্যান্য বয়স্ক বন্ধুগণও শরৎকে সানন্দে অভিবাদন করিলেন। গ্রামের বৃদ্ধগণ (যাঁহারা শরচ্চন্দ্রকে একঘরে করিতে অগ্রগামী ছিলেন), তাঁহারা উচ্চপদাভিষিক্ত বহুক্ষমতাশালী যুবককে "বাবাজী" "বাবাজী" বলিয়া বড়ই প্রীতি, স্নেহ ও যত্ন দেখাইলেন। শরৎ সকলকে হৃদয়ের সহিত সম্মানিত করিয়া মার ঘরে গেলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া স্নেহময়ী মাতাকে প্রণাম করিলেন। শুক্লকেশী শুভ্রবসনা বৃদ্ধা সজলনয়নে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনেকক্ষণ মাতার কাছে বসিয়া মাতার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শরতের মাতা সংসার হইতে প্রায় অবসর লইয়াছেন, সংসারের কাযকর্ম্ম কিছু দেখেন না। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা আহ্নিক করেন, তৎপরে কিছু জলগ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যার সময় আবার আহ্নিক করিয়া নিরামিষ ভোজনানন্তর শয়নগৃহে প্রবেশ করেন।

শরৎকে সকলে যখন একঘরে করে, তখন শরতের মাতা হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, "মা, কিছু ভাবিবেন না, ব্রাহ্মণ পূজারি আপনার বাড়ীতে আসে না আসে, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আপনি যে নিয়মে পূজা আহ্নিক করেন, সেই নিয়মেই করিতে থাকুন, পূজারি ব্রাহ্মণের সাহায্য অনাবশ্যক। মনের সহিত ভগবান্‌কে ডাকিবেন, ভগবানের আরাধনায় মোক্তারনামা আবশ্যক হয় না।"

শরতের মাতা সেই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুণ্যবলে শরৎ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত কার্য্য পাইয়াছেন, আজ বিদেশ হইতে আসিয়া ভক্তিভাবে মাতাকে প্রণিপাত করিলেন।

বিন্দু ও কালীতারা কাছে বসিয়া কত যত্ন করিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্ভাষণ করিলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা অবগুণ্ঠনবতী সুধার ক্রোড় হইতে প্রিয় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিলেন,—আনন্দে সুধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাজপুরুষদিগের আহ্বানার্থ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে বড় ধূমধাম হয়। পুণ্যচরিত্র পুণ্যহৃদয় শরচ্চন্দ্রকে আহ্বান করিবার জন্য আজ সেই ক্ষুদ্র কুটীর যেরূপ স্নেহের লহরীতে ভাসিল, তদপেক্ষা প্রকৃত স্নেহ, প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা এ জগতে দৃষ্ট হয় না।

অনেকক্ষণ পর মুখ প্রক্ষালন করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী সুধা সযত্নে জলখাবার আনিয়া দিলেন। জল খাইয়া পুনরায় হেমচন্দ্রের সহিত বাহিরের ঘরে যাইয়া সমবেত বন্ধুদিগের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করিতে লাগিলেন। গ্রামের সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, দরিদ্র ও বিপদ্‌গ্রস্তদিগকে আশু সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলেন, সাধারণের ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী ও পথ ঘাট সংস্কারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, পীড়িতদিগের ঔষধাদিদানের ব্যবস্থা করিলেন, দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যালয়ের মাহিয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধদিগের কাহারও ছেলেদের পড়িবার পুস্তক চাই, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধে কিছু সাহায্য চাই, কাহারও ঘরটি ছাইবার জন্য কিছু খড় চাই। শরৎ দুই বৎসর

পর দেশে আসিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করিলেন না, সকলকেই সাহায্য-দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় আহার প্রস্তুত হইয়াছে। হেম ও শরৎ আহারে বসিলেন। বিন্দু তাঁহাদের কাছে বসিলেন, কালীতারা রন্ধনে অতুল্যা, তিনি ভাইকে মনের মত খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।

পরে মেয়েদের খাওয়া দাওয়া হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হেম ও বিন্দু বিদায় হইলেন। বিন্দু বিদায় হইবার পূর্ব্বে শরতের হাত ধরিয়া তাঁহার শয়ন-ঘর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বলিলেন, "এখন তোমার ধন তুমি বুঝে লও, আমরা চলিলাম।"

ঘরে প্রবেশ করিয়া শরৎ দেখিলেন, শয্যায় শিশু নিদ্রিত রহিয়াছে, পার্শ্বে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এবং শিশুর নিকটে পূর্ণযৌবনা, পতিপ্রাণা, লজ্জা-বিদগ্ধা সুধা রঞ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন!

এক মুহূর্ত্তকাল সেই পুণ্য ছবিটি দেখিলেন,—প্রদীপের স্তিমিত আলোকে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব রত্নকে নিরীক্ষণ করিলেন,—ধীরে ধীরে সুধার পার্শ্বে আসিয়া সেই কোমল প্রেমবিহ্বল দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় গাঢ় চুম্বন করিলেন।

সুধা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কোমল বাহুলতা দ্বারা পতির গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন,—বহুদিনের হৃদয়ের ব্যথা ভুলিলেন। পতিপ্রাণা সুধার পূর্ণ হৃদয় বারবার স্ফীত হইতে লাগিল, নয়ন দুটি আনন্দবারিতে আপ্লুত হইল।

সাদরে সে জল মুছাইয়া দিয়া, সে সুন্দর নয়নদ্বয় বারবার চুম্বন করিয়া শরচ্চন্দ্র বলিলেন, "সুধা,—আমি জগতের মধ্যে ভাগ্যবান্ যে তোমার মত রমণীরত্ন আমার হৃদয়াকাশে শোভা পাইতেছে, আমার জীবনাকাশে চিরকাল দীপ্ত রহিয়াছে। স্বদেশে, বিদেশে, সুখে, সন্তাপে তুমিই আমার নয়নমণি, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী।"

সুধা কিছু উত্তর দিতে পারিল না,—স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে আবার সজল নয়নে চাহিল, আবার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া নয়নজল ত্যাগ করিল।

পতিপ্রাণা সুধার মনের কথা যদি বাক্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত,

দিয়াছ,—দুঃখিনীর জন্য কত নিন্দা ও কষ্ট সহ্য করিয়াছ,—হৃদয়েশ্বর! আমি কি তোমার রত্ন হইলাম? চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া থাকিব, জন্মে জন্মে ঐ পুণ্যপদ সেবা করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

(১) নির্ধূম বারুদ।

যুদ্ধকালে, বারুদজাত ধূম দ্বারা, রণক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সৈন্যচালনাদি কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে; ইহার জন্য প্রায়ই শত্রুমিত্র উভয়েরই অল্প বা অধিক পরিমাণে ক্ষতি হইতে দেখা যায়। অধিকক্ষণ অগ্নিযুক্ত হইলে, আপেক্ষিক গুরুত্বের আধিক্যবশতঃ, সকল ধূমই ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত ও যুদ্ধক্ষেত্র ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া, বিপক্ষ সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব করিয়া তোলে, এবং দূরস্থিত শত্রুগণও গুপ্তভাবে আক্রমণ করিবার বেশ অবসর পাইয়া যায়, এবং এই সময়ে ধূমাবৃত মিত্র সৈন্যকে শত্রুভ্রমে নিহত করাও বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়। বারুদোৎপন্ন ধূম দ্বারা এই প্রকারে উভয় পক্ষই নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ও বহু অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, ধূমের এই মহানিষ্টকারিতার গ্রাস হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য য়ুরোপীয় সভ্যজাতিগণ অনেকদিন অবধি নানা চেষ্টা করিতেছেন। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি প্রদেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ, গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া নানা গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং নির্ধূম বারুদ প্রস্তুত করিয়া, প্রচলিত সধূম বারুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার উদ্দেশে সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

কিছু দিন পরীক্ষাদিতে নিযুক্ত থাকিয়া, কয়েকটি বৈজ্ঞানিক, দুই একটি নির্ধূম দাহ্য-পদার্থ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বন্দুক কামান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে ব্যবহার করিবার সম্যক্ উপযোগী হয় নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, বারুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় নাই। অল্প দিন হইল, আলফ্রেড নোবেল নামক জনৈক সুইডিস্ বৈজ্ঞানিক, এক প্রকার ধূমহীন বারুদ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং নানা পরীক্ষায় ইহা বারুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অনেকাংশে উপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নূতন বারুদের প্রস্তুতক্রিয়া বুঝিতে হইলে, সাধারণ বারুদ কি প্রকারে দগ্ধ হয়, এবং ধূমই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহার স্থূল বিবরণ জানা আবশ্যক। বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলে ইহার উপাদান সকলের এক প্রকার রাসায়নিক সংমিশ্রণ সংঘটিত হইয়া কয়েক জাতীয় বাষ্প ও কয়েকটি নূতন কঠিন যৌগিক পদার্থ সহসা উৎপন্ন হয়।* এই প্রকারে বাষ্প উৎপন্ন হওয়ায় বারুদের পূর্ব্বায়তন হঠাৎ অনেক বর্দ্ধিত হইয়া, বাষ্প সকল মহা-

* সোডা, কয়লাচূর্ণ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে, বারুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, পোটাসিয়ম্ সলপেট, পোটাসিয়ম্ কার্ব্বোনেট, এবং কার্ব্বনিক অক্সাইড ও নাইট্রোজেন্ উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কঠিন যৌগিক পদার্থ, এবং শেষ দুইটি স্বচ্ছ বাষ্পীয় পদার্থ।

বেগে মুক্তস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; এবং এই সময়ে কঠিন যৌগিক পদার্থগুলি বাষ্পে পরিণত হইয়া ও অবিকৃতভাবে কঠিনাবস্থায় থাকিয়াই, শুভ্রধূমরূপে পরিণত হয়। প্রচলিত বারুদের উপাদান পরিবর্ত্তন করিয়া, দাহসময়ে ইহা কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত না হইয়া, যাহাতে সকলই স্বচ্ছ বাষ্পে পরিণত হয় ও ধূমোৎপাদন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ঈপ্সিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে পারেন নাই। এই প্রকারে প্রচলিত বারুদের উন্নতিসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া, রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ, অপরাপর দাহ্য পদার্থ লইয়া অনেক দিন পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে সম্প্রতি নোবেলই এই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এই নূতন বারুদটি পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ধূম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডাইনামাইট (Nitroglycerines) এবং গন্‌কটন (Nitrocelluloses) নামক দুইটি প্রসিদ্ধ দাহ্যপদার্থ হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে; অগ্নি সংযুক্ত হইবা মাত্র, এই বারুদের সমস্ত উপাদানই রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, এককালে স্বচ্ছ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায়, এবং কোনও অংশই ধূমে পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহার মধ্যে গন্-কটনের দাহ্য গুণটির, ধূমহীন বারুদ প্রস্তুতে উপযোগিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন হইতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এবং ভিলি নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গন্‌কটন, ঈথর ও আলকোহলে গলাইয়া, অল্প দিন হইল, এক প্রকার বারুদও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই বারুদজাত বাষ্প দ্বারা ধাতব আগ্নেয় অস্ত্রাদি অতি শীঘ্র অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে দেখিয়া, এবং ইহার বাষ্পের বল অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, বন্দুকাদি যন্ত্র ফাটিয়া গিয়া নানা অনর্থ ঘটিবার সম্ভব বিবেচিত হওয়ায়, এই বারুদ যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নবাবিষ্কৃত নির্ধূম বারুদে, পূর্ব্বোক্ত কোনও দোষই দৃষ্ট হয় না। ১৫০ ভাগ গন্‌কটনের সহিত, ১০০ ভাগ ডাইনামাইট ও শতকরা দশভাগ কর্পূর মিশাইয়া, সুইডিস্ বৈজ্ঞানিক এই অদ্ভুত বারুদ প্রথম প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্প্রতি নানা দেশে এই বারুদ লইয়া বহুল পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে, এবং সকল পরীক্ষাতেই ইহা অতি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে নির্ধূম বারুদের নানা গুণ দেখিয়া, এবং ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ আদর হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, আবিষ্কারক নোবেল সাহেব, টিউরিণ সহরে, ইহার একটি সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং বহুলপরিমাণে বারুদও প্রস্তুত করিতেছেন।

নির্ধূম বারুদ আবিষ্কারের পর হইতেই যুদ্ধকার্য্যে ইহা ব্যবহার করিবার জন্য সকল দেশেই মহা আয়োজন হইতেছে, এবং ইহার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইলে, যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মাদির কোনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না,—এই প্রশ্ন লইয়া নানাদেশীয় সৈনিক বিভাগে মহা আন্দোলন চলিতেছে। অনেকেই বলিতেছেন, নূতন বারুদ প্রবর্ত্তিত হইলে, সামরিক ব্যাপার মাত্রেই এক অদ্ভুত বিপ্লব উপস্থিত হইবে; সাধারণ বারুদের ব্যবহারকালে, ধূমাবরণে আবদ্ধ থাকিয়া যোদ্ধৃগণ অলক্ষিতভাবে শত্রুর উদ্দেশে অনায়াসেই গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া জয় লাভ করিয়া থাকেন, এবং শত্রু সৈন্যগণও অবিচলিতচিত্তে যুদ্ধ করিতে করিতে অলক্ষিত গোলা দ্বারা আহত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু নির্ধূম বারুদ ব্যবহৃত হইলে, সৈনিকগণ পূর্ব্বোক্ত সুবিধা হারাইয়া, ও বিপক্ষ কামানের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইয়া, অকম্পিত দেহে ও স্থিরপদে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় কি প্রকারে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনেক সমরনিপুণ পণ্ডিত, এখন তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। কয়েকটি রাজ্যে, যুদ্ধপোষাকের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছে। রণক্ষেত্র ধূমহীন থাকিলে শুভ্র ও লোহি-

জ্জল বর্ণের পোষাক ব্যবহার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জর্ম্মান সাম্রাজ্যের রণবিভাগের কর্ত্তারা, কেবল পোষাক পরিবর্ত্তন করাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, সৈনিকদিগের উজ্জ্বল ধাতব শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীগণের বহুমূল্য উজ্জ্বল রণসজ্জাও, পূর্ব্বোক্ত কারণে, আমূল পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

(২) পৃথিবীর বৃহত্তম দুরবীক্ষণ যন্ত্র।

চল্লিশ-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত কাচ দ্বারা "বস্তুখণ্ড" (Object glass) * নির্ম্মাণ করিয়া, একটি দুরবীক্ষণযন্ত্র নির্ম্মাণার্থে অনেক দিন হইতে কয়েকটি মার্কিন বৈজ্ঞানিক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহার "বস্তু-খণ্ডের" একাংশ পারিস হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। এক খণ্ড কাচ দ্বারা যদি "বস্তু-খণ্ডের" কাজ চলিত, তাহা হইলে এ প্রকার একটি দূরবীক্ষণনির্ম্মাণ সহজসাধ্য বিষয় হইয়া পড়িত ; কিন্তু "বস্তু-খণ্ডের" জন্য আরও একখানি ভিন্ন প্রকৃতির কাচ আবশ্যক, এবং এই কাচ প্রস্তুত করা এত কঠিন ব্যাপার যে, তিন বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে কার্য্যতৎপর ও সুনিপুণ শিল্পীগণ দ্বারা কায করাইলেও, একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাচ প্রস্তুত হইবে কি না, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছে। এই কাচখণ্ড এমন ভাবে গঠিত হইবে যে, ইহার বিভিন্নাংশের স্থূলতা, পূর্ব্বপ্রস্তুত কাচের তত্তৎ অংশের স্থূলতার সহিত একটি নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রাখিবে, এবং আলোকরশ্মি সকল প্রথম কাচখানির মধ্যে "বিক্ষারিত" (refracted) ও বিশ্লেষণজনিত রঙ্গিণ হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলে, যাহাতে রশ্মি সকলের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অপনোদিত হইয়া, দুরস্থ বস্তুর ছায়া এককালীন বর্ণচ্ছটাশূন্য হয়, এবং যাহাতে কাচ দ্বারা কেবলমাত্র বিক্ষারণের কার্য্য সুসাধিত হয়, তাহা বস্তুখণ্ডের দ্বিতীয়াংশের প্রস্তুতসময়ে সাবধানের সহিত দেখা আবশ্যক † ;—সুতরাং একখণ্ড এইপ্রকার কাচ ঘসিয়া মাজিয়া প্রস্তুত করিতে যে তিন বৎসরেরও অধিক সময়ের আবশ্যক হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? এই প্রকারে চল্লিশ-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত বস্তু-খণ্ড নির্ম্মিত হইলে, ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের একটি অতুলনীয় আদরের সামগ্রী হইবে, এবং এই নিষ্প্রভ কাচ দুইখানির মুল্য, কহিনুরের ন্যায় মহারত্নের মূল্যের সমকক্ষ হইবে।

প্রস্তাবিত দুরবীক্ষণনির্ম্মাণ শেষ না হইতেই, ইহা দ্বারা কি কি কার্য্য সাধিত হইবে, এবং আধুনিক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ অপেক্ষা, ইহার আকৃতি-বৃদ্ধিকরী ক্ষমতা কত অধিক হইবে, এখনই সেই সকল বিষয়ের গণনা করা হইতেছে।

লিক্ মানমন্দিরের দুই-হাত-ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ ও আয়র্লণ্ডের লর্ড রশের চারি-হাত-ব্যাসযুক্ত যন্ত্রই, আজ কাল, পৃথিবীর দুইটি সর্ব্ববৃহৎ যন্ত্র বলিয়া কথিত আছে। ইহার মধ্যে লর্ড রশের যন্ত্রটির ব্যাস-পরিমাণ অপরটি অপেক্ষা দ্বিগুণ হইলেও, এইটি "প্রতিফলক দূরবীক্ষণ" (Reflecting telescope) বলিয়া, লিকের যন্ত্রটি অপেক্ষা ইহার পরিসর-বৃদ্ধিকরী শক্তি অনেক কম। এখন লিক্ মান-মন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ক্ষমতায় সর্ব্বপ্রধান বলিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ কল্পিত দূরবীক্ষণের ক্ষমতা এই যন্ত্রটির সঙ্গে তুলিত করিতেছেন, এবং গণনা করিয়া দেখিয়া-

---

* সাহিত্যের সুযোগ্য লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে, ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের যে সকল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইল।

† বস্তু-খণ্ড প্রস্তুতের বিস্তৃত বিবরণ Deschanel's Natural Philosophy গ্রন্থের ১০৮১

ছেন, নূতন যন্ত্রের "রশ্মিপুঞ্জীকরণ শক্তি" (Light-gathering power) লিক্ যন্ত্র অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অধিক হইবে ‡; সুতরাং এই যন্ত্রটি দ্বারা অপরিজ্ঞাত তারকা ও নীহারিকা মণ্ডলের প্রকৃতি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, এবং ওরায়ন্ (Orion) প্রভৃতি জ্যোতিষ্করাশির রহস্য কতক্‌টা উদ্ভেদ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোক-রশ্মিপ্রেরণে বায়ুস্তরের বাধা ও আকাশের অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ধরিয়া হিসাব করিয়া, এই নূতন যন্ত্রটির আকৃতিবৃদ্ধিকরী ক্ষমতা শেষে কি দাঁড়াইবে, এই প্রশ্ন লইয়া, সম্প্রতি অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, এবং ইহা দ্বারা নগ্ন-চক্ষু-দৃষ্ট পদার্থ, যে একলক্ষ গুণ বৃহদায়তন দেখাইবে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই যন্ত্র দ্বারা শুক্র ও মঙ্গলাদি গ্রহের উপরিস্থ নানা বিষয়ের আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা, এবং ইহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে জোতিষীগণের বিবিধ অনুমানের কোনটি সত্য, তাহাও নিরূপিত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু ইহা গ্রহবাসী জীবগণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করাইবার উপযোগী হইবে না। কয়েক জন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এই দূরবীক্ষণ-যন্ত্রটি দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল পরীক্ষা করিলে, ইহা ১২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদার্থের ন্যায় বৃহৎ দেখাইবে, এবং চন্দ্রলোকে পৃথিবীস্থ বৃহৎ অট্টালিকার ন্যায় দুই একটি বাড়ী থাকিলে ও ভূলোকের ন্যায় সধূম বাষ্পীয়যানাদির গতায়াত চন্দ্রলোকে বিদ্যমান থাকিলে, এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে সে সকলও প্রত্যক্ষ হইবে। ¶

(৩) আইওডিন ও জাললিপি।

মঁসিয়ে ব্রলান্টস্ নামক জনৈক য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক, অল্প দিন হইল, আইওডিনের একটি অত্যাশ্চর্য্য শক্তির আবিষ্কার করিয়া ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই নবাবিষ্কৃত শক্তির সদ্ব্যবহার হইলে, জগতের অশেষ উপকার হইবে। ব্রলান্টস্ সাহেব বহুকাল ব্যাপিয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া দেখিয়াছেন,—সাধারণ কাগজ সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় আইওডিন-বাষ্পে নিমজ্জিত করিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার স্বাভাবিক বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া এক প্রকার হরিদ্রাভ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়, এবং কাগজের কোনও অংশ যদি প্রথমে জলসিক্ত ও পরে শুষ্ক করিয়া, সমগ্র কাগজখানি আইওডিন বাষ্পের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে সিক্তাংশের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া নীলাভ বেগুনে রঙ্গে পরিণত হয়, কিন্তু ইহার অবশিষ্টাংশের বর্ণ, পূর্ব্ববৎ হরিদ্রাবর্ণই থাকিয়া যায়। সাহেবটি আরও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—কাগজের কোনও অংশ জলসিক্ত করিয়া শুকাইয়া, পরে যদি সমস্ত কাগজখানি এককালীন পুনরায় জল-নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে ইহা শুষ্ক করিয়া নানাকৌশলে অবিকৃতাবস্থায় আনিলেও, কোন্ অংশ প্রথমে সিক্ত হইয়াছিল, তাহা আইওডিনের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অনায়াসেই চিনিতে পারা যায়।

---

‡ আলোক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের "রশ্মিপুঞ্জীকরণ শক্তি" ইহার "বস্তুখণ্ডের" ব্যাসের বর্গের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে, কম ও অধিক হইয়া থাকে; কিন্তু এই স্থলে ৩৬ শের বর্গ ১২৯৬ এবং ৪০ শের বর্গ ১৬০০, সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদিও একটির ব্যাস অপরটি-অপেক্ষা কেবল এক নবমাংশ গুণ বড়, কিন্তু "রশ্মিপুঞ্জীকরণ শক্তি" একচতুর্থাংশ অধিক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

¶ For a Detailed Description of the telescope Vide, The New-york Sun of 1890.

কোনও নিদর্শন পত্রাদির অক্ষর অসদুদ্দেশে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে, আমরা সাধারণতঃ ইহা আলোক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি, এবং সন্দেহ-যুক্ত অংশের কাগজ অপরাংশ অপেক্ষা পাতলা, স্বচ্ছ বা মলিন বোধ হইলে, সন্দেহ অযথা নয় বলিয়া, উপসংহার করি। কিন্তু অভ্যস্ত ব্যক্তি দ্বারা সতর্কতার সহিত অক্ষর উদ্ধৃত হইলে, এই উপায়ে সন্দেহযুক্ত অংশ বাহির করা প্রায়ই অসাধ্য হইয়া পড়ে। ব্রলান্টস্ সাহেব এখন, আইওডিন্ বাষ্পের সাহায্যে, অতি সহজেই উদ্ধৃতাক্ষরের স্থান বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন;—প্রতারণাকুশল সুনিপুণ শিল্পী দ্বারা অতি কৌশলে অক্ষর উদ্ধৃত হইলেও, উদ্ধৃতাংশে বাষ্প সংলগ্ন হইলেই, তৎক্ষণাৎ ইহার বর্ণ, সকল অবস্থাতেই লোহিতাভ বেগুনিয়া রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইবে। আবিষ্কারক অনুমান করেন, এই ব্যাপারটি আইওডিনের একটি সাধারণ রাসায়নিক গুণ দ্বারা সম্পন্ন হয়; অক্ষর কাটিবার সময়, কাগজাভ্যন্তরীণ শ্বেতসার (Starch) কোনও প্রকারে উপরে আসিয়া পড়ে, কাযেই ইহাতে আইওডিন সংযুক্ত হইলেই এই বর্ণবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়,—সুতরাং এটি আইওডিনের নূতন গুণ নয়, তবে ইহার ব্যবহারে সম্পূর্ণ নূতনত্ব আছে বটে। এতদ্ব্যতীত, কোনও সূক্ষ্মাগ্র পদার্থ দিয়া ধীরে ধীরে কাগজে অক্ষরাদি লিখিলে, এবং ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্ন না পড়িলেই, ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায়, অক্ষর-গুলি বেশ পাঠ করিতে পারা যায়, সাহেবটি তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

পেন্সিল-লিখিত কাগজের কোনও অংশ সম্বন্ধে যদি পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ঠিক উল্লিখিত উপায়ে জাললিপির স্থান অনায়াসেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, এবং একটু সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিলে, উক্ত স্থানে কি কি কথা লিপিবদ্ধ ছিল, তাহাও বাহির করিতে পারা যায়। ব্রলান্টস্ সাহেব লিখিয়াছেন,—প্রথমোক্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইলে, পূর্ব্বকথিত উপায় অবলম্বন করিলেই, জাললিপিস্থানের বর্ণবৈচিত্র্য হইবে, এবং ইহা দ্বারা সহজেই সন্দেহযুক্ত স্থান বাহির হইবে;—কিন্তু কি কি অক্ষর পূর্ব্বে লিখিত ছিল, তাহা জানিতে হইলে, কাগজের অঙ্কিতাংশে বাষ্প সংযোগ করিলে কোনও ফলই হইবে না, অতিসাবধানে ইহার পশ্চাদ্ভাগে বাষ্প সংলিপ্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে পূর্ব্বলিপি স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এই লিপি সকল সময়েই বিপরীতাকারে প্রকাশিত হয় বলিয়া, পড়িবার বড়ই অসুবিধা হয়; এই অসুবিধার নিবারণার্থ, প্রায়ই প্রকাশিত লিপি-সম্মুখে একখণ্ড দর্পণ রাখিয়া, এই দর্পণের প্রতিবিম্বে পাঠ করা হইয়া থাকে।

আবিষ্কারক বলেন, সকল কাগজের উপর আইওডিনের প্রভাব সমান নয়। কাগজের প্রকৃতি অনুসারে, ইহার বর্ণেরও প্রভেদ লক্ষিত হয়, এবং কাগজ যতই উৎকৃষ্ট হইবে, অক্ষ-রের স্পষ্টতাও তত সুন্দর হইবে। যাহা হউক, আজ কাল যে সকল উপায়ে জাললিপি বাহির করা হইয়া থাকে, তাহা বড়ই অসম্পূর্ণ ও অনিশ্চিত, সুতরাং ব্রলান্টসের আবিষ্কৃত উপায়ে প্রত্যক্ষদৃশ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া জাল বাহির করা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে, আশা করা যায়। ইতিমধ্যেই এই নূতন আবিষ্কারের উপর য়ুরোপীয় কয়েকটি রাজ্যের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং এখন হইতে সেই সকল দেশে নবাবিষ্কৃত উপায়েই জাললিপি পরী-ক্ষিত হইতেছে।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

---

* Vide the *Revue Scientifique* of January, 1893.

অপরাধনিদান।

অজ্ঞানতা বিস্ময়ের জননী। যাহা জানি না, তাহা যে যাহা জানি তাহার মত হইতে পারে, যে সাধারণ নিয়ম সকলকে শাসন করে, তাহা যে তাহাকেও শাসন করে, এরূপ বুঝিলে জগৎ অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। ভ্রমণের শ্রম, অনুসন্ধানের কষ্ট তখন সফল হয়, যখন অসাধারণ কোনও কিছু দর্শন বা আবিষ্কার করিতে পারি। যে জন্তু কখন দেখি নাই, সে জন্তু অন্য জন্তুর মত ক্ষুৎপিপাসাসম্পন্ন, রোগজরাজীর্ণ, কামক্রোধপীড়িত; এক সাধারণ প্রকৃতি যে জগতের যাবতীয় পদার্থ যাবতীয় জীবকে একত্বে পরিণত করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে জীবন উদ্যমশূন্য হইয়া পড়ে। অজ্ঞাতকুলশীল পরিচিত জনের মত নহে, নূতন পথে অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কার সম্ভাবনা, অন্ধকারে একটা চিরনূতনত্ব, বিস্ময় ও আশঙ্কার আকর। যখন বাষ্পযান ভীষণ মূর্ত্তিতে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া লৌহবর্ত্মে প্রথম ধাবমান হইয়াছিল, কে বুঝিয়াছিল, জলাগুনে ইহার প্রাণ, একটা টিপে ইহার প্রবলতা প্রশমিত হইতে পারে, পালিত বলদের ন্যায় ইহাও সারথির ইঙ্গিতে পরিচালিত। বাষ্পযানে প্রথমে পদার্পণ করিতে কাহার সাহস হইয়াছিল? শেষে আশঙ্কার কিছু হ্রাস হইলেও, পুরুষেরা পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতে, আরোহণ করিতে সাহস করে নাই। হাফকিনের বিসূচিকাবীজে টীকা দিতে যাহারা সাহস করে, তাহারা বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া টীকা দেয়; পরিবারে দুই জনকে টীকা দিয়া চারি জনকে নিবৃত্ত করে। গোবীজে বসন্তটীকার মত বিসূচিকাবীজে কয় জনের সাহস হইয়াছে?

যথেচ্ছাচার প্রভুত্বের নিদর্শন। রাজা আইনে বাঁধা, প্রজার মত শাসনদণ্ডে নিয়ত, অসভ্য দেশে ইহার কল্পনাই হইতে পারে না। প্রভুত্বের প্রাণ যথেচ্ছাচার। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মারিব, যাহা ইচ্ছা হুকুম দিব, যত ইচ্ছা খাজনা লইব। যে নিয়মে বদ্ধ, সকলে সে নিয়মে বদ্ধ হইলে রাজার রাজত্ব যায়। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এ দেশে আসিলে, লোকে তাঁহার লাঙ্গুল বা শৃঙ্গ কল্পনা করিয়া না থাকুক, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করিলে তাঁহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইতে হয়, এ দেশের লোক ইহা প্রাণান্তে বিশ্বাস করিতে পারে না। একটি গল্প আছেঃ—একজন সিপাহী উর্দ্দী পরিয়া আসিতেছিল,—সঙ্গে একটি মোট।

পাইয়া কৃষক অম্লানবদনে মোট লইয়া চলিল। পথে শৌচের আবশ্যক হওয়াতে সিপাহী উর্দ্দী খুলিয়া গামছা পরিয়া মাঠে গেল। কৃষক দেখিয়া অবাক, এ ত সিপাহী নয়, মানুষ; সিপাহী যে মানুষ, কৃষকের সে বিশ্বাস ছিল না। শৌচান্তে সিপাহী ফিরিয়া আসিয়া মোট উঠাইতে বলিল; কৃষক অকুতোভয়ে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, তুমি সিপাহী নও, তুমি যে মানুষ।

মানুষ দেবতাকে যথেচ্ছাচারী বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি কোনও নিয়মের অধীন নহেন। সাধুর দণ্ড, অসাধুর পুরস্কার, রোগ শোক জরা মৃত্যু, যথেচ্ছাচারী দেবতার প্রসাদ বা অপ্রসাদ জন্য। সাধারণ নিয়মে লোকের রোগ হয়, বর্ব্বর জাতি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না। বিদ্যুৎ ও বজ্র কখন কোথায় তিনি প্রক্ষেপ করিবেন, প্রফুল্ল কুসুম কখন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবেন, কখন কাহাকে শূলে দিবেন, কাহার মাথায় রাজটীকা দিয়া হাতীতে চড়াইয়া সিংহাসনে বসাইবেন, কেহ জানে না। কল্পনা করিতে পারে না, কারণ তিনি স্বেচ্ছাচারী, আইন কানুনের অধীন নহেন। এ জন্য পাঁঠা কাটিয়া নৈবেদ্য দিয়া হাতযোড় করিয়া থাকিতে হয়। বড়দিনের ডালি উপহার না দিলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; আপশোষ, এই ডালি দিয়াও তাঁহার মন পাওয়া যায় না। খামখেয়ালী না হইলে রাজা কি? যথেচ্ছাচারী না হইলে দেবতা কি? সাধারণতন্ত্র, আইন কানুন বেনে মুদির জন্য, নবাব ও বাদশাহ আইনে নিত্য পদাঘাত করেন।

মনুষ্য জীবের শ্রেষ্ঠ। সাধারণ পশু পক্ষীর মত নিয়মবদ্ধ নহেন। মনুষ্য দেবতার নিকট আত্মীয়, কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে? স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিলে পীড়া হয়, এখন নিম্নশ্রেণীর বালকেরাও ইহা জানে; কিন্তু এই সত্য আবিষ্কার করিতে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল। এখনও বর্ব্বরমাত্রের বিশ্বাস, ডাকিনীর কুহকে বা প্রেতপুরুষের অপ্রসাদে পীড়া হয়। দেহ কলের ন্যায় নিয়মে চলে, জলাগুনের কম বেশী হইলে বিকল হয়, এ জ্ঞান অতি আধুনিক। দেহের উপর প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যাহত শাসন স্বীকৃত হইলেও, মনের উপর কোন নিয়মের শাসন আছে, এ কথা অদ্যাপি কয় জনে স্বীকার করিয়াছে? শিশুর হাঁসি কান্না প্রাকৃতিক নিয়মের অতীত। সূতিকাগৃহে মায়ের কোলে শিশুকে যখন ষষ্ঠীদেবী বলেন, "তোর মা ম'ল", তখন শিশু হাসে; যখন বলেন, "তোর বাপ ম'ল", তখন শিশু কাঁদে। একটা অজ্ঞাত বিস্ময়পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিয়মে মানসরাজ্য

শাসিত হয়, পণ্ডিতেরা ইহার উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। মূর্খের বিশ্বাস, ভূতের খেলার মত মনের লীলা যথেচ্ছাচারী দেবতার অসংযত আদেশ বা ইহাই মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা। মনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দেহের অবস্থার উপর নির্ভর করে, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ইচ্ছা, হাঁসি কান্না, কাম ক্রোধ, মস্তিষ্কের পরমাণু-আন্দোলনের উপর নির্ভর করে। যে নিয়মে দেহ শাসিত, সেই নিয়মে মন শাসিত, মস্তিষ্ক শাসন করিয়া হাসির সময় কান্না, কান্নার সময় হাসি, রাগের সময় ভয়, ভয়ের সময় রাগ উৎপাদন করা যাইতে পারে, ইহা কয় জনে এখন বিশ্বাস করে? অথচ অনেকেই শুনিয়াছেন, দেহ শাসন করিয়া ঋষিরা চিত্তসংযম করিতেন।

জলবায়ুর উপর যেমন দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, জলবায়ুর উপর তেমনি মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। হয় ত এ কথা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিবেন। অপরাধ-তত্ত্ব প্রবন্ধে বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট প্রমাণ সহিত দেখাইয়াছেন,—চুরি, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধ সকল শীতাতপের উপর নির্ভর করে। প্রমাণ পাইয়াও কয় জনে একথা বিশ্বাস করিয়াছেন? ইচ্ছার স্বাধীনতা একটি অর্থশূন্য প্রলাপ। "রাম গোপালের বই চুরি করিয়াছিল কেন"? ইচ্ছার স্বাধীনতাবশতঃ, এ কথা বলিলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না। কেবল বলা হইল, রাম ইচ্ছা করিয়াছিল, তাই চুরি করিয়াছিল। রাম চুরি করিতে কেন ইচ্ছা করিয়াছিল? আর কোনও উত্তর চলে না।

অথচ শাখা হইতে ফলপতনের ন্যায় রাম কর্ত্তৃক গোপালের বই চুরি একটি ঘটনা। নিউটন ভাবিয়াছিলেন, ফলপতন এ ঘটনা কেন হইল? এই অনুসন্ধানের ফলে একটি নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল,—যে নিয়মে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বাঁধা আছে। বৃক্ষের শাখা হইতে ফলপতন অপেক্ষা গোপালের বই চুরি সামান্য ঘটনা নহে। সমাজের প্রতিদ্বন্দী অপরাধী। আত্মীয় স্বজন পরিবার বন্ধু বান্ধব, দেশের ও সমাজের সুখ দুঃখ অপরাধীর উপর নির্ভর করে। অপরাধনিবারণের জন্য আদালত মাজিষ্ট্রেট পুলিসের সৃষ্টি, সে সকলের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নিরপরাধীকে ট্যাক্স দণ্ড সহিতে হয়। শিক্ষা অপরাধনিবারণের জন্য। দুষ্প্রবৃত্তির মূল উৎপাটিত হইয়া সৎপ্রবৃত্তির অনুশীলন জন্য শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের সৃষ্টি। পুত্র কন্যাকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম ও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া, শেষে তাহার কলঙ্কে জীবনমৃত্যুলাভ বিরল ঘটনা নহে। সুতরাং, অপরাধতত্ত্বের আলোচনা অনাবশ্যক নহে।

অপরাধ-ইচ্ছা মানসিক পীড়া। জ্বর বিসূচিকার ন্যায় এ পীড়ার চিকিৎসা আবশ্যক। নিদাননির্ণয় না হইলে রোগের চিকিৎসা হয় না। অপরাধনিদানের আলোচনা সামাজিকের আবশ্যক। ভারতবর্ষে দৈহিক পীড়ার নিদান আলোচিত হইয়াছিল। অপরাধনিদান আলোচিত হয় নাই। অপরাধনিবারণের বিবিধ উপায় বিবিধ গবর্মেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অপরাধনিদানের আলোচনায় কোনও গবর্মেণ্ট উৎসাহ দেন নাই। ফ্রান্স ও ইতালীতে সম্প্রতি বিশেষ উৎসাহের সহিত অপরাধনিদান আলোচিত হইতেছে। অপরাধনিদানের প্রধান আচার্য্য লম্ব্রোসো।

বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় জলবায়ুর উপর অপরাধপরিমাণ নির্ভর করে—দেখাইয়া বিরত হইয়াছেন। চন্দ্রশেখর বাবু অপরাধতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহার অন্য নিদানগুলি নির্দ্দেশ করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইত। তিনি তাঁহার প্রাচীন বন্ধু বিবর্ত্তবাদের পরিচয় দিতে আবার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অপরাধতত্ত্বের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেন দেখিয়া, আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তিনি একটি নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের উপকার হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে অপরাধনিবারণে আমাদের সামর্থ্য জন্মে নাই। বাঙ্গালার জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া হয়,—এ কথা শুনিয়া বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া-নিবারণের কোনও ক্ষমতা জন্মে নাই। বাঙ্গালী বাঙ্গালা ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইয়া বসবাস করিতে পারিবে না। কয় জন দেশের মমতা ছাড়িতে পারে? অপরাধের অন্য নিদানগুলি শিক্ষার আয়ত্ত। সেগুলির নির্দ্দেশ করিলে পুত্র কন্যাকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

আনি বেসাণ্ট।

বৈরাগ্যপ্রবণ আর ধর্ম্মপ্রবণ বলিলে, প্রাচ্যজীবন ও প্রতীচ্যজীবনের মূলগত পার্থক্য কতক বুঝা যায়। প্রতীচ্যজীবনের অপেক্ষা প্রাচ্যজীবন উৎকৃষ্ট, এই ভাবের একটা হাওয়া কিছু দিন হইতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি আনি বেসাণ্ট আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, হাওয়ার গতিটা আর একটু প্রবল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসাময়িক না হইতে পারে।

বৈরাগ্য অর্থে জীবনে অনাসক্তি; এবং এই অর্থে বৈরাগ্য আধুনিক হিন্দুর মজ্জাগত, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে সম্পূর্ণ ভুল না হইতে পারে। কর্ম্ম এ দেশে নাই, এমন নহে; কেন না, কর্ম্মই জীবন। কর্ম্মলোপে জীবনের অস্তিত্ব টিকে না। তবে বৈরাগ্যধর্ম্মের এতটা প্রাদুর্ভাব, অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তবে চিরকাল এমন ছিল না। বৈদিক সময়ে আর্য্যমানবের জীবন সংসারে বীতস্পৃহ হয় নাই। তখন কর্ম্মই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যনিবাস ও আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইত না। যখন চারি দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হয়, তখন জীবনে সহসা অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে জীবনযাত্রা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বৈরাগ্য ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে ছিল, আশা আর উদ্যম, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম; আর সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থময়তা।

আজি কালি যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সুরে সুর মিলাইয়া বৈদিকধর্ম্মের স্তুতিগান ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম শব্দটার কিরূপ অর্থবিপর্য্যয় করিয়া ফেলেন,—দেখিয়া একটু ব্যথিত হইতে হয়। ইংরাজী ভাষায় রিলিজন শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম শব্দটার সে অর্থে ব্যবহার করিতে আমরা বড়ই নারাজ। রিলিজনের প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক্ পাওয়া যায় না; কেন না, ভারতবর্ষে সুতরাং বঙ্গদেশে, রিলিজন নামক একটা কিছু গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে ছিল না। খৃষ্টানের রিলিজন কতকটা খৃষ্টানের জুতা, টুপি প্রভৃতি পরিচ্ছদের স্থলীয় একটা কিছু; কতকটা শোভার জন্য, কতটা লোকদেখানর জন্য, এবং হয় ত শরীরটা একটু গরম রাখিবার জন্য উহার আবশ্যকতা। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহবর্ত্তী ও সহব্যাপী; জীবনের প্রধান লক্ষণ ও বিশেষণ। মনুষ্যের সম্পাদিত ক্রিয়ার সমষ্টিকে যদি জীবন বলা যায়, মনুষ্যের সম্পাদ্য কর্ত্তব্যের সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ইংরাজিতে এক Duty ভিন্ন ইহার সমার্থসূচক সমকক্ষ প্রতিশব্দ আর পাওয়া যায় না।

মানুষের কর্ত্তব্যসমষ্টিকে স্থূলতর তিন ভাগ করিতে পারা যায়; নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, আপনার লোকের প্রতি কর্ত্তব্য, এবং পরের প্রতি কর্ত্তব্য। এই তিন কর্ত্তব্যের সমষ্টিতে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস মনুষ্যজাতির ইতিহাসের সহিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞানটারই

উৎপত্তি সকলের আগে। মানুষকে প্রাণী হিসাবে দেখিলে দেখা যায়, আত্ম-প্রীতিই তাহার স্বভাবগত ধর্ম্ম। সমাজবন্ধনের সহকারে পরপ্রীতি আত্মপ্রীতির অনুকূল হয়, তাই ক্রমশঃই প্রীতিটা আপনার সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়া বাহিরের অপরের অভিমুখে প্রসার লাভ করে। পরপ্রীতি কতকটা আত্মপ্রীতির প্রতি-কূল, কিন্তু সামাজিক মানুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূল নহে, কতকটা অনুকূল। পরকে ক্রমশঃ আপনার করিয়া না নিলে সমাজবন্ধন চলে না। তাই পরপ্রীতি ক্রমশঃ ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, কোনও কোনও বিচক্ষণ শাস্ত্রকারের মতে পরার্থপরতাই ধর্ম্ম; এবং স্বার্থপরতাই অধর্ম্ম। প্রকৃত-পক্ষে উভয়ের সামঞ্জস্যেই ধর্ম্মের স্থিতি।

আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ও পরের প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া আর একটা কর্ত্তব্য মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ জগতের খানিকটা বুঝে, খানিকটা বুঝে না। খানিকটা তাহার জ্ঞানের পরিধির অন্ত-র্গত; খানিকটা সেই পরিধির বাহিরে। এই সীমাবিভাগ চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকিবে। মানুষ যেটুকু বুঝে, তাহার আবার কতকটাকে ভালবাসে; কতকটা ভালবাসে না; অথবা অগত্যা ভালবাসে। আর যেটুকু বুঝে না, সেইটুকুকে ভালবাসিতেও পারে না, না বাসিতেও সাহস করে না; সেইটুকুকে ভয় করে। জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশটুকু মানুষের চক্ষে বিভী-ষিকাময়। অকস্মাৎ, অতর্কিতে, এমন ভাবে মানুষের জীবনের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষের জীবন-শৃঙ্খল সহসা ছিঁড়িয়া যায়। ইহা মানু-ষের শক্তির অধীন নয়; মানুষের ক্ষমতার আয়ত্ত নহে, তাই মানুষ বড়ই সাবধানে, অসহায় ভাবে, কাতরনেত্রে জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশের প্রতি চাহিয়া থাকে; স্তুতি করে, তোষামোদ করে, এবং সময়ে সময়ে নিতান্ত ক্ষীণ-প্রাণ দুর্ব্বল অসহায়ের মত উৎকোচ দিয়া বশ করিতে চায়। এই স্তুতিবাদ, এই তোষামোদ, দুর্ব্বলের একমাত্র গতি, অসহায়ের একমাত্র বল, আত্মরক্ষার উদ্দেশে এই একমাত্র অবলম্বন। অসহায় মানুষ জগতের সেই জ্ঞানাতীত পরাক্রান্ত শক্তি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই হীন উপায় অবলম্বন করি-য়াছে, ইহাকে আপনার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য করিয়াছে। উপায়-টাকে হীন বল, কাপুরুষোচিত বল, আর যাহাই বল, রুদ্ধশ্বাসে ভয়ে ভয়ে

সুতরাং স্বার্থ ও পরার্থ ছাড়িয়া মনুষ্য-জীবনের আর একটা অর্থ আছে, আর একটা কর্ত্তব্য আছে ; সেইটা মানুষের রিলিজন। জগতের অজ্ঞেয় শক্তিকে যেন তেন সন্তুষ্ট রাখিতে পার, তোমারই মঙ্গল ; তবে কিসে সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যাইবে, তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। বোধ করি—যত মানুষ, তত মত। সন্তুষ্ট রাখা বড় সহজ নহে ! ইহজীবনে সকল সময় ফললাভ হয় না। না হউক, পরলোক আছে। সেখানে ফল পাইবে। দুর্ব্বলের এইরূপ সান্ত্বনা, অথবা আত্মপ্রবঞ্চনা।

বৈদিক সময়ে মানুষের জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অনুরাগ ছিল ; আপনার শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রভূত চেষ্টা ছিল, এবং আত্ম-রক্ষণের কামনায়, শত্রুনিপাতের কামনায়, ইন্দ্রের প্রতি, বরুণের প্রতি, রুদ্রের প্রতি, স্তুতিপ্রয়োগ ও উৎকোচপ্রয়োগেরও অভাব ছিল না। পরার্থে আত্মোৎসর্গ বৈদিক সময়ে ধর্ম্মের অন্তর্গত হয় নাই। হয় নাই ; তাই ভারত-বর্ষ ভারতবর্ষ হইয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। জাতিমাত্রেরই অভ্যু-দয়ের এই ইতিহাস। বেদের পর উপনিষদ্ ও দর্শন। এখন আর শত্রুভয় নাই, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা নাই, বসুন্ধরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ; অন্নকষ্ট নাই। প্রচুর অবকাশ, আর্য্যজাতির ধীশক্তি জীবনের রহস্যের, জগতের রহস্যের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণে নিযুক্ত। বিশ্লেষণে স্থির হইল, জীবন দুঃখময়, এত সুখেরও পরিণাম দুঃখ, দুঃখময়তাই জীবন। নিরপেক্ষ সুখ অসম্ভব ; দুঃখনিবৃত্তিই সুখ ; দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দুঃখনিবৃত্তির উপায় শুদ্ধ জ্ঞানে। তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, ও সত্যজ্ঞানে মোক্ষ। সত্যজ্ঞান কি ? না জগৎ কল্পনা ; আমি মাত্র আছি ; জগৎ আমার কল্পনা, আমার সৃষ্টি, আমার অংশ। এই জ্ঞানলাভ হইলে বুঝিতে পারিবে, দুঃখ জীবনের সহচারী হইলেও আমারই কল্পিত পদার্থ। সুতরাং দুঃখ আর দুঃখ থাকিবে না। ফল হইল সংসারে বিরক্তি,—বৈরাগ্য। সকলেই যে বিরাগী হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা নহে ; তবে সেই অবধি হিন্দুর অস্থি মজ্জা শোণিতের সহিত একটা সংসারে বিরক্তি, কর্ম্মে অনা-সক্তির রস মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

তাহার পর বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব জগতে দুঃখ ভিন্ন সুখ দেখিতে পাইলেন না। কর্ম্মবশে জীব কেবল দুঃখের চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিলেন। বুদ্ধ-দেব আদেশ দিলেন,—এই দুঃখনিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। স্বার্থ

আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া সর্ব্বজীবে প্রীতি বিতরণ কর। ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম, ইহাই মনুষ্যের কর্ম্ম। এমন মহতী বাণী ইতিপূর্ব্বে নরকণ্ঠ হইতে কখনও নির্গত হয় নাই; পরেও হইয়াছে কি না সন্দেহ। বৈরাগ্য হইতে কর্ম্ম প্রসূত হইল; কর্ম্ম ধর্ম্ম আখ্যা প্রাপ্ত হইল; শত্রু মিত্র হইল, পর আপনার হইল। আর্য্য অনার্য্যের সহিত মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বৈষম্য দূরে গেল। বৌদ্ধপ্রচারক এই অপূর্ব্ব উপদেশ লইয়া দেশে বিদেশে বাহির হইল। হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া, ভারতসাগর পার হইয়া, বুদ্ধপ্রচারিত প্রীতি-ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে চলিল। ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যপিপাসায় বা শোণিততৃষ্ণায় কখনও স্বদেশের সীমা পার হয় নাই; ধর্ম্মপ্রচারের নামে জীব-রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত করে নাই। ধর্ম্মপ্রচার ভান করিয়া পরস্বাপহরণ ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। ভারতবর্ষের চতুঃসীমার ভিতরেই তাহার অধ্যবসায় চিরকাল আবদ্ধ আছে। একবার মাত্র সেই চতুঃসীমা পার হইয়াছিল; কটিতে তরবারি ও করপুটে ধর্ম্মপুস্তক তাহার সঙ্গে যায় নাই। সঙ্গে ছিল কেবল মনুষ্যত্ব, ললাটে জ্ঞানের প্রতিভা ও কণ্ঠে প্রীতির অমৃতময়ী বাণী।

প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে জীবনসংগ্রামের কঠোরতা ছিল না; তথাপি জীবন-দুঃখ দুর্ভর হইয়া পড়িয়াছিল। কেন, ঠিক্ বলা যায় না। বোধ করি, ইহাই প্রাকৃত নিয়ম। অন্য দেশে এমন নয়। ইউরোপে জীবনসমরের কঠোরতার মাত্রা পূর্ণ। অথচ জীবনে সেখানে আসক্তি প্রবল। যে কারণেই হউক, আর্য্যাবর্ত্তে জীবন দুঃখদুর্ভর হইয়া পড়ে। দুঃখমুক্তি পরমপুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়। ফলে দাঁড়ায় বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই মূর্ত্তি গ্রহণ করে; দুই পথে চলিত হয়। কেহ বলেন, মুক্তি জ্ঞানে; কেহ বলেন, মুক্তি কর্ম্মে। জ্ঞানের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান; কর্ম্মের অর্থ প্রীতি ও মৈত্রী। বৈরাগ্যের স্রোত দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। এখনও বোধ করি, দুই মুখেই দুই প্রবাহ চলিতেছে। দুই স্রোত মিলিবে কি না, জানি না। যে দিন মিলিবে, মানবজাতির ইতিহাসে সেই দিন পুণ্য দিন। যে স্থানে মিলিবে, ধরাতলে সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগসঙ্গম।

তবে ভারতবাসী বুদ্ধের উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। অন্য জাতি যে মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত। চীন তিব্বতে, অসভ্য জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান, বুদ্ধের জন্মভূমিতে

দেশে বৌদ্ধ রিলিজন নামে একটা কিছু প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ ভারতবর্ষে যেরূপে যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অন্য কুত্রাপি হয় নাই, ইহা অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই নিরীহ, দান্ত, শান্ত, ধীর, ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান্ প্রকাণ্ড হিন্দুজাতিই ইহার প্রমাণ।

ভালর মন্দ আছে। আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের ফল যে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বুদ্ধদেব পরার্থপরতা শিখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধমাত্রেই পরার্থপর হইয়াছিল, বলা যায় না। মনুষ্যচরিত্র এইরূপ। শুনা যায়, যীশুখৃষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন, একগণ্ডে চপেটাঘাত পাইলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে চপেটাঘাত-সহিষ্ণুতা খৃষ্টানের লক্ষণ বলিয়া কোন কালে গণ্য হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ কথা লেখে না। বিনা বাক্যব্যয়ে নিরীহের গণ্ডে চপেটাঘাত দ্বারা পরম সুখের অনুভবলিপ্সু যদি কেহ থাকেন, তিনি খৃষ্টান। যাহাই হউক, ভারতবাসী মাত্রেই বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করে নাই। তবে মিলিয়া মিশিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। মন্দির গড়িয়া বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধূপ ধূনা আরতি দ্বারা প্রসাদলাভের চেষ্টা করিয়াছিল। যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্রের সৃষ্টি দ্বারা নানা কৌশলে অতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বার্থরক্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিল। বড় বড় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। জ্ঞানচর্চ্চার খরস্রোত প্রতিহত হইয়াছিল। শূদ্র ও অন্ত্যজ সমাজ-সোপানে উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের অধোগতি হইয়াছিল। আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্য-শোণিতের বিশুদ্ধতার সহিত আর্য্যপ্রতিভার খর জ্যোতি মলিনত্ব পাইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের নূতনভাবে পুনরভ্যুদয়ের সময়, ব্রাহ্মণমহিমার পুনঃস্থাপনের সময়, দুই একবার সেই প্রতিভা, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত, বৃষ্টিশেষে তড়িল্লতার মত দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা রীতিমত স্থায়ী হয় নাই, লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসে নাই; মলিন প্রতিভা পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হয় নাই।

* বৈদিক কালের অতিপ্রাকৃতের নিকট অসহায় স্তুতিবাদের সহিত দর্শনোপনিষৎ-প্রচারিত জ্ঞান ও বুদ্ধপ্রচারিত প্রীতি, ও বৌদ্ধগণপ্রচারিত যন্ত্র মন্ত্র

স্বীকার করে, এবং জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, সর্ব্বদা মুখে কহিয়া থাকে। হিন্দু পরোপকারে কুণ্ঠিত নহে, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীকে পরাভব করে, সংযম ও ব্রতোপবাস একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। হিন্দু, রাজার নিকট দণ্ডসহিষ্ণু প্রজা, গুরুর নিকট বিনীত শিষ্য, পরিবারের নিকট কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য। অত্যাচারী রাজপুরুষের নিকটে হিন্দুর বাক্‌স্ফূর্ত্তির ক্ষমতা নাই, উপদেষ্টা গুরুর নিকট হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার অবসর নাই। জীবনধারণের উপযোগী অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইলেই সে পরিতুষ্ট; কঠোর জীবন-সমরে লিপ্ত হইতে পরাঙ্মুখ, শ্রমসাধ্য জ্ঞানার্জ্জনে কাতর। সংসার মায়াময়, জীবন মোহময়, সুতপরিবার ভববন্ধনের শিকল; এমন কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা এই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। বাহির হইতে কি একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি তাহাকে কাজ করায়, তাই সে কাজ করে; তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকেও সেই অনির্দ্দেশ্য শক্তি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করেন। মানুষও যেমন পরাধীন, মানুষের দেবতাও তেমনি পরাধীন। তথাপি হিন্দু বিরাগী হইয়াও গৃহী; এবং সংসার মিথ্যা জানিয়াও, কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, হিন্দু পুত্রকামনায় দেবতার নিকট বলি মানস করে, পরকালে সুখের কামনায় গঙ্গাস্নান করে, ইহকালে স্বাস্থ্যকামনায় গাছতলে মাথা ঠুকে, এবং সময়ে সময়ে শত্রুনিপাতকামনায় গুপ্তভাবে আগুনে ঘি ঢালে।

মোটের উপর ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। অন্য জাতির তুলনায় ভারতবাসী দুঃখী বলা যায় না। অন্যের তুলনায় ভারতবাসী দরিদ্র; কিন্তু সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্। ভারতবাসী পরপীড়িত, কিন্তু পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে তাহার প্রতিবাদ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা ভারতবাসী ঠিক বুঝে না! তাহাতে ভারতবাসী নিতান্ত অসন্তুষ্ট নহে; কেন না, সে ত বিধিলিপি, তাহা নিবারণের বোধ করি কোন উপায় নাই। ভারতভূমির শস্যসম্পত্তি কখনই অপ্রচুর নহে; সুতরাং জঠরজ্বালা কখন বেশী তীব্র হয় নাই। অথবা কোনও বার ফসল না জন্মিলে ভারতবাসী দল বাঁধিয়া মরিয়া যাইতে কোনও মতেই পশ্চাৎপদ নহে। ভারতবাসীকে এ বিষয়ে কখনও কাপুরুষ বলিও না। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, তাহা ভারতবাসী ঋষিমুখে শুনিয়াছে; কিন্তু পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান-আহরণের দরকার নাই; তাহা তাহার পূর্ব্বপুরুষের ভাণ্ডার খুলিলেই যথেষ্ট পরিমাণে মিলিবে। কর্ম্মে মোক্ষলাভ হয়,—তাহাও সে জানে; তাই সন্ধ্যাবন্দনা তাহার নিকট ফাঁক যায় না, এবং মাসের মধ্যে ঊনত্রিশটা একাদশীর

কি হইতে পারে? আর সংসারে অনাসক্তি তাহার শাস্ত্রের উপদেশ। যদিও গৃহিরূপে অবস্থানকালে এই উপদেশটার সম্যক্ প্রতিপালন সহজ হয় না; তবে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইলেই দারা সুত পরিবার বিধাতার মরজিতে সমর্পণ করিয়া গৃহাশ্রম হইতে দূরে পলায়ন করিয়া কুম্ভক রেচক অভ্যাস করিয়া হাঁফ ছাড়িবার পথ পায়।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির ইতিহাস এইরূপ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই হউক, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, যে প্রতীচ্য জাতিদের সহিত ভারতবর্ষের সম্প্রতি পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস মূলতঃ বিভিন্ন। হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্তে মূলকথা—তৃপ্তি আর তৃপ্তি। পাশ্চাত্য দেশের ইতিবৃত্তে মূল কথা—অন্ন আর অন্ন। ইউরোপে যতদিন লোক সংখ্যা অন্নসংস্থানের সীমা ছাড়াইয়া উঠে নাই, ততদিন ইউরোপের লোকে পরস্পর রক্তারক্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু চিরদিন এমন চলে নাই। স্থান অল্প, ভূমি অনুর্ব্বর, লোকসংখ্যা বর্দ্ধমান, সকলের অন্ন জোটে না; জঠরজ্বালার তীব্র উত্তেজনায় ইউরোপের লোক স্বদেশ ছাড়িয়া বাহির হইল। প্রথমে বাহির হয় স্পানিয়ার্ড। দেখা দেখি পোর্টুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইউরোপ হইতে লোক দলে দলে বাহির হইল; সঙ্গে ছিল জঠরজ্বালা ও তজ্জনিত অমানুষিক উত্তেজনা, অর্থতৃষা ও রক্তপিপাসা। আর তার সঙ্গে ছিল ধর্ম্মপ্রচারের ভান। এই ভান ও এই পিপাসা লইয়া দস্যুর দল লোকোপপ্লবের জন্য পূর্ব্বে পশ্চিমে যেখানে সেখানে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু হায় ধূমকেতুর আবির্ভাব অচিরস্থায়ী; আর এই নৃশংস দস্যুর দল যেখানে একবার প্রবেশ করিল, সেখান হইতে আর বাহির হইল না। প্রাচীন রাজ্য ছারখারে গেল, প্রাচীন সভ্যতা লুপ্ত হইল; প্রাচীন মানববংশ ভবিষ্যকালের ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে অস্থিকঙ্কাল রাখিয়া ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। একমাত্র ভারতবর্ষে এই ধ্বংসদাবানল সম্যকভাবে জ্বলিতে পায় নাই; অন্ততঃ ভারতবাসী ধরাতল হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। সে ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত পুণ্যফলে বলিতে হইবে।

যাহা হউক, ইউরোপ পরস্বাপহরণ ও পরের সর্ব্বনাশ চারি শত বৎসর ধরিয়া করিতেছেন বটে, কিন্তু ইউরোপের জঠরজ্বালার তীব্রতা তাহাতে কমে নাই। জীবনের কঠোরতা, অতৃপ্তির তীব্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। ইংরাজের,

রুশের, ফরাসীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জর্ম্মনি ইতালি প্রভৃতিও বহিঃসাম্রাজ্য-স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। অন্নচেষ্টার অধ্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি বিপুলবেগে ঘটিয়াছে। যশোগৌরবে, জ্ঞানগৌরবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মহিমাময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

কিন্তু হইলে কি হয়। ধরাপৃষ্ঠ অসীম নহে; খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণেরও সীমা আছে। লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর এখানে ওখানে, সেখানে যে একটু আধটু খালি জায়গা আছে, তাহা কিছু দিনেই জনপূর্ণ হইবে। তখন আর ইউরোপ সেখান হইতে অন্ন পাইবে না। তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম কি হইবে? এই এখন প্রধান সমস্যা।

ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। বর্ত্তমানের চাকচিক্য শোভার অন্তরেও গোলযোগ দেখা যায়। ইউরোপে যেন একটা মহা কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় জাতিই তাহার উদ্যোগপর্ব্বে ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন। হয় ত সেই মহা কুরুক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার বিপুল সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিস্তূপে পরিণত হইবে। সমাজের অভ্যন্তর হইতেও একটা অতৃপ্তির ও অশান্তির ও যাতনার তীব্র নিনাদ উঠিতেছে। সমাজ প্রতিক্ষণেই বিপ্লবোন্মুখ। দরিদ্রের প্রতি ধনীর দৃষ্টি নাই। দরিদ্র ধনীর কণ্ঠশোণিতপানে ক্ষুৎযন্ত্রণা মিটাইতে প্রস্তুত। উপরে জ্ঞান বিজ্ঞান শোভা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য লোকনয়ন ঝলসিতেছে। অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা ক্ষীণ চর্ম্মে কঙ্কাল আচ্ছাদন করিয়া ত্রাহিস্বরে ডাকিতে ডাকিতে পৈশাচিক বদন ব্যাদান করিয়া সমাজশরীর গ্রাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। রাজপুরুষগণ রাক্ষসীকে শাসনে রাখিবার চেষ্টায় আছেন; কিন্তু শাসন আর মানে না।

ইউরোপের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, এই জীবনমরণ-সমস্যা লইয়া বিব্রত। কিন্তু মীমাংসা খুঁজিয়া মিলিতেছে না। আনি বেসাণ্টের বিচিত্র জীবনের বিবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলা-সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যাপূরণের জন্যই এই অসামান্যা নারীর জীবনের প্রধান ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। লণ্ডনের দরিদ্রতার সহিত বহু দিন ধরিয়া তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্তা ছিলেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া ক্লান্ত শরীরে তিনি এই শান্তরসাস্পদ পুরাতন পুণ্যতপোবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ স্থির ক্ষমাশীল সহিষ্ণু সংযত জাতির প্রতি চাহিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, এমন আর

ইউরোপ কর্ম্মপ্রবণ, আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্যপ্রবণ। কর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব ইউরোপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আর বৈরাগ্য হইতে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শান্তি, অনাসক্তি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। তাই হিন্দু জাতির তৃপ্তি ও শান্তি স্থিতিশীলতায় হিমাচলের স্পর্দ্ধা করে। অক্ষুব্ধতায় প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনীয় হয়। আর ইউরোপের জ্ঞান গৌরব পরাক্রম হয় ত আকাশবাহী উল্কার মত, অগ্নিগিরির উদ্গীরিত বহ্নির মত, ক্ষণস্থায়ী শোভাবিস্তার করিয়া নির্ব্বাণ হইতে পারে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্নমুখবর্ত্তী দুই পথ বর্ত্তমান। কোন্ পথ অবলম্বনীয়, ইহাই হিন্দুসন্তানের প্রধান বিচার্য্য। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

আয়েসা।

(ঐতিহাসিক চিত্র)

পাঠক! আমাদের "আয়েসা" কবিকুলপিক, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা "আয়েসা সুন্দরী" নহেন। আমাদের চিত্র ঐতিহাসিক।

বর্ত্তমান প্রস্তাবের শীর্ষোল্লিখিত আয়েসা, সাহানসা মহাপ্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বর সাহজাহানের পৌত্রী, এবং বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা, তৎপুত্র সাহসুজার একমাত্র কন্যা।

আয়েসা সুন্দরী—সে সৌন্দর্য্যে প্রাণোন্মাদিনী মোহিনী শক্তি ছিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় ছায়া বিস্তার করাতে, তাহা আরও মধুর, আরও মনোহর, হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতেশ্বরের পৌত্রী—তাহাতে আবার দিল্লীর রাজগৃহে প্রতিপালিতা, সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার সকলই হইয়াছিল। নৃত্য-গীতে, চিত্রাঙ্কনে, সুকুমার শিল্পে, সেই অতুল সৌন্দর্য্যাধিকারিণী রমণীর কমনীয়তা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। রাজান্তঃপুরে আমীর ওমরাহ ও প্রধানবর্গকে লইয়া যখনই কোনও সমারোহ উপস্থিত হইত, বাদসাহ সাগ্রহে স্বীয় পৌত্রীকে তথায় উপস্থিত রাখিতেন। খোস্‌রোজের উৎসবে, নওরোজের কোলাহলে, যমুনার নীলতরঙ্গময় বক্ষে "সখের ভ্রমণে," সমানভাবে আয়েসার

মোগল রাজান্তঃপুরে অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ অতি বিরল ছিল। যাঁহারা এ সম্বন্ধে আয়েসার পূর্ব্ববর্ত্তিনী ছিলেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য তখন সম্পূর্ণরূপে কালের অস্তাচলশিখরে অস্তমিত হইয়াছে। নুরজাহান তখন শীতল সমাধিগর্ভে, মমতাজ্ তখন তাজমহলের বেষ্টনীর মধ্যে; কেবল একমাত্র আয়েসাই, সেই সময়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠা ছিলেন।

আর ছিলেন বটে, জেহানারা, রসিনারা। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারা দুই ভগিনীতে এত ব্যস্ত যে, অন্য দিকে রাজপুরীর মনোযোগ আকর্ষণে তাঁহাদের আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না।

অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণ সুন্দরী আয়েসার হস্তপ্রার্থী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। একমাত্র রাজকুমার মহম্মদই এই বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন।

যুবরাজ মহম্মদ কূটবুদ্ধি আরঙ্গীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সুপুরুষ, সুচতুর; তাঁহার প্রকৃতিও সুমধুর ছিল। তাঁহার বুদ্ধি পিতার অনুরূপ, শৌর্য্য পিতামহের অনুরূপ, কিন্তু একমাত্র একাগ্রতার অভাবে তিনি পিতার ন্যায় প্রতিষ্ঠাশালী হইতে পারেন নাই।

কবি বলেন, প্রণয়ের পথ সরল নহে; উপন্যাসকার বলেন, প্রেমের পথে অনেক বিঘ্ন; একটু বেশী দরের ভাবুক বলেন, প্রকৃত প্রণয় যেখানে, সেইখানেই অশ্রুবিনিময়ের অভিনয়। আরম্ভটা অসম্ভব সম্ভব হওয়ার মত, কিন্তু পরিণামে অশ্রুধারাই থাকিয়া যায়। এই তিন শ্রেণীর কথাই আমরা মানিয়া চলিতে বাধ্য। আয়েসা ও মহম্মদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। সেইটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বের কয়েকটি ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক।

রাজত্বকালের একোনত্রিংশ বৎসরে সাহজাহান বাদসাহ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগের পরিণামস্বরূপ আংশিক পক্ষাঘাতও ঘটে। সাহজাহান পুত্রদিগের ক্ষমতা সংযত রাখিবার জন্য, দ্বিতীয় পুত্র সাহসুজাকে বঙ্গদেশে, তৃতীয় মুরাদকে গুজরাটে, এবং চতুর্থ আরঙ্গীবকে দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার দিয়া প্রেরণ করেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র পুত্রেরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে রাজধানী অভিমুখে সিংহাসনের জন্য ধাবিত হইলেন।

সনাধিকারী, সুতরাং তিনি পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্যে সহায়তার জন্য রাজধানীতেই ছিলেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বিদ্রোহী ভ্রাতাদিগের মধ্যে কুমার আরঙ্জীব স্বীয় কূটনীতিকৌশলে পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

আরঙ্জীব ভাক্ত ধার্ম্মিকতায় স্বীয় অগ্রজ মুরাদকে হস্তগতি করিয়া, উভয়ের একত্রিত সৈন্যবলের সহায়তায়, সিংহাসন অধিকার করেন; পরে গোয়ালিয়রের দুর্গে তাঁহাকে বিষধর সর্প দ্বারা দংশিত করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত করেন। দারা চৈত্রবায়ুবিতাড়িত প্রচণ্ড তরঙ্গমালার ন্যায় অগণ্যবাহিনী সহিত গুজরাটে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু আরঙ্জীব তাঁহারও প্রাণবধ করিয়া সেই রুধিরপ্লাবিত, সন্থবিখণ্ডিত, ছিন্ন শির স্বীয় পিতা সাহজাহানের নিকট ভীষণ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

একমাত্র অবশিষ্ট কেবল সাহসুজা। সুজা কয়েক বার পরাজিত হইয়াও পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত রাজভ্রাতার প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত ছিলেন। আরঙ্জীব সম্রাট হইয়া সুজার বিরুদ্ধে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ ও প্রধান সেনাপতি মীর জুমলাকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। সুজা এই সময়ে মুঙ্গেরে থাকিয়া ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত সেনাদল কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন। মুঙ্গের সুরক্ষিত করিয়া, তিনি সম্রাটসৈন্যের অপেক্ষায় সেই স্থানে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ মহম্মদ ইতিপূর্ব্বেই আয়েসার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মধুর প্রকৃতির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। আয়েসাও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। আয়েসার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ পর্ব্বতবক্ষমধ্যস্থ প্রস্রবণের ন্যায় তরঙ্গায়িত হইতেছিল। যদিও এই সব যুদ্ধবিগ্রহে পরস্পরের সাক্ষাৎসন্দর্শন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল, তথাপি অন্য পক্ষে অনুরাগের পরিমাণ শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আরঙ্জীবও পুত্রের প্রণয়কাহিনী অবগত ছিলেন, কিন্তু সিংহাসনাধিরোহণের অব্যবহিত পরেই এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, সুজার কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে সুদূরপরাহত।

কর্ত্তব্যপরায়ণ, পিতৃভক্ত মহম্মদ কর্ত্তব্যের চরণতলে প্রণয়কে বলিদান করিয়া, অগণ্য সৈন্য লইয়া পিতৃব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, কয়েক দিন পরে মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মুঙ্গেরে দুই একটা সামান্য যুদ্ধের পর অসুবিধা বুঝিয়া সুলতান সুজা রাজমহলে স্বীয় সৈন্যবৃন্দ পরিচালিত করিলেন। সেই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

সম্রাটের সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। সুজা ছয় দিন ধরিয়া অকুতোভয়ে যুঝিলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্রাদি, এক ঝটিকাময় নিশীথে একখানি নৌকায় তুলিয়া দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাণ্ডা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাণ্ডায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। তাণ্ডায় কয়েকবার বাঙ্গলার রাজধানীও স্থাপিত হইয়াছিল। সুজার তাণ্ডায় পৌঁছিবার দিন হইতেই বাঙ্গলায় ভয়ানক বর্ষা আরম্ভ হইল। বর্ষা দেখিয়া সম্রাটসৈন্য কয়েক মাসের জন্য যুদ্ধবিমুখ হইয়া একস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল; সুজা ইত্যবসরে পুনরায় বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সময়ে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, কার্য্যস্রোত বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল। রাজকন্যা আয়েসা তাণ্ডা হইতে যুবরাজকে গোপনে পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে প্রেমময় মধুর ভৎর্সনা, তাঁহার পিতার শোচনীয় অবস্থা প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ ছিল। মহম্মদ সেই পত্র পাইয়া প্রেমোদ্বেলিত চিত্তে প্রণয়ের প্রতিদানে অগ্রসর হইলেন।

সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ আশা, পিতার রোষময় কটাক্ষ, সাম্রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য, বিদ্রোহীর প্রতি শত্রুতাচরণ ভুলিয়া গিয়া, তিনি প্রেমের সম্মুখে আত্মবলি প্রদান করিলেন।

আয়েসার পত্রের উত্তরে যুবরাজ লিখিয়া পাঠাইলেন, "প্রিয়ে! তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক, আমি আমার অধীনস্থ সৈন্যসামন্ত লইয়া গোপনে পিতৃপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতার সঙ্গে মিলিত হইব।"

সেই দিন রাত্রে যুবরাজ তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সেনানায়কগণকে ডাকিয়া নিভৃতে তাঁহার মনোভিলাষ পরিব্যক্ত করিলেন। মীর জুমলা অন্য কার্য্যে সেই সময়ে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সুবিধা ও অবসর সুতরাং বিলক্ষণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থ সামন্তেরা তাঁহার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করিল।

যুবরাজ মহম্মদ স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া তাণ্ডায় গিয়া সুজার সহিত মিলিলেন। সাহ সুজা যুবরাজকে স্বীয় দলভুক্ত দেখিয়া, অধিকতর আশান্বিত চিত্তে তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অনেক দিনের পর বিরহী প্রণয়ীযুগলের পূর্ণমিলন হইল। সে মিলনে বহুকালের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইল। যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা বিধাতার লিপিবশে অখণ্ডনীয় হইয়া উঠিল।

সাহ সুজা এই রুধিরোৎসবের মধ্যেও বিবাহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র নগরী তাণ্ডা এক দিন রজনীযোগে শত সহস্র আলোকময় নেত্র উন্মীলিত করিয়া, ফুলমালায় বিভূষিতা হইয়া সাধারণের নেত্রে অপরূপ শোভা বিকাশ করিল। সে বিবাহোৎসবে সকলে দুই চারি দিনের জন্য যুদ্ধকোলাহল ভুলিয়া গেল। প্রণয়ীযুগল পরস্পর মিলিত হইয়া, সমসূত্রে তাঁহাদের ভাগ্য বন্ধন করিয়া, ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণামের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কে জানিত, অমৃতে হলাহল মিশিবে, সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রমোদকানন শ্মশানের কালধূমে আচ্ছাদিত হইবে, শশধরের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ কালমেঘে আবৃত হইবে, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বাসন্তীপ্রসূন ঝটিকাহত হইয়া ভূপাতিত হইবে? ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া কবে কোথায় কার্য্যস্রোত থামিয়াছে? সে নিজের কার্য্য করিয়া নীরবে চলিয়া যায়, তাহার সহিত সমসূত্রপাতে জড়িত ভাগ্যের প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করে না।

প্রণয়ের মধুর মিলন শেষ না হইতে হইতে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, মলয়পরিসেবিত, বাসন্তী রজনী না পোহাইতে পোহাইতে, উৎসবের কোলাহল না ডুবিতে ডুবিতে, আবার রণকোলাহল জাগিয়া উঠিল। প্রেমিকযুগল যখন মখমলমণ্ডিত কক্ষে বসিয়া, আত্মহারা হইয়া, পরস্পরের প্রেমদৃষ্টিতে নিবদ্ধ, তখন সহসা সেই পুষ্পপরিমলবাহী প্রভাতবায়ু তাঁহাদিগের কর্ণে কামানের ভীষণ গর্জ্জন আনিয়া দিল।

মহম্মদ বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্টচক্র ক্রমশঃই সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বক্রপথে অগ্রসর হইতেছে। ঘটনা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি প্রেমোন্মত্ততায় মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত সৈন্য পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা আমীর জুমলার সৈন্যদলের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে তাণ্ডা অবরোধ করিয়াছে। কিন্তু তখন তিনি নিঃসহায় ও নিরুপায়। একমাত্র শ্বশুরের সৈন্যবলই তাঁহার প্রধান সম্বল। তাহাদের সহায়তাতেই তিনি পিতার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধের পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইল। মহম্মদও সুজার পক্ষে অনেক সৈন্য

ঘটিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রচ্ছন্নভাবে শরীর ঢাকিয়া তাঁহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নগরও তখন নিরাপদ নহে; অগত্যা তাঁহারা নৌকায় মাল পত্র বোঝাই করিয়া গোপনে ঢাকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

মীরজুমলা যুবরাজের মোগলশিবিরত্যাগের সংবাদ দিল্লীতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আরঙ্গীব প্রথম জয়লাভসংবাদে আনন্দিত হইবেন কি, পুত্রের বিদ্রোহব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহার রোষাগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত হইল। আয়েসার সহিত, শত্রুর কন্যার সহিত, সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীর কন্যার সহিত, তাঁহার পুত্রের, তাঁহার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর পরিণয়, তাহাও আবার তাঁহার অজ্ঞাতে অসম্মতিক্রমে হইয়াছে, এ ব্যাপারে বাদসাহের সেই স্থির মস্তিষ্ক সংক্ষুব্ধসাগরবৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাদসাহ স্বয়ং বাঙ্গলার দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যখন মীরজুমলার নিকট হইতে তাণ্ডা-অবরোধ ও যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার মন কতক প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। আরঙ্গীব স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন, সুজার সহিত মহম্মদের মিলনব্যাপার ভবিষ্যতের পক্ষেও সুখাবহ নহে। সুতরাং তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া এক কৌশলাবলম্বনে উভয়কে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন।

সুজার শিবিরে আরঙ্গীবের নিকট হইতে এক পত্র গেল। পত্রবাহককে এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল—সে যেন কৌশলক্রমে, পত্র খানি কোনও উপায়ে সাহ সুজার নজরে ফেলিয়া দেয়। তাহাই হইল। সাহসুজা পত্র পাঠ করিয়া *

---

* পত্রে লেখা ছিল—প্রাণাধিক কুমার! সুজার—রাজবিদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রকৃতরূপে সৈন্য চালনা করিয়া যে ক্ষেত্রে তাহাকে দমন করা আবশ্যক, সেই স্থলে তুমি তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনাকে ও তোমার স্নেহময় পিতাকে বিপন্ন করিতেছ। ইহাতে আমাদের অতিশয় মর্ম্মপীড়া জন্মিয়াছে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী; কোথায় তোমার জয়শ্রীলাভ পূর্ব্বক প্রত্যাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিব, তাহা না হইয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে নিরানন্দ হইতে হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে শত্রুকে আমার পদতলে বন্দী করিয়া দিবে, এই কথা বলিয়া তুমি দিল্লী ত্যাগ করিয়াছিলে; কিন্তু সাত মাস অতীত হইয়া গেল, তাহার কিছুই হইল না। তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার স্নেহময় পিতার সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, তোমার নিষ্কলঙ্ক যশে কলঙ্কারোপ করিয়াছ। হায়! হায়! কি পরিতাপ! পিতৃস্নেহ কি না রমণীর মধুর হাস্যে ডুবিয়া গেল? যশোভাতি কি না রমণীর-সৌন্দর্য্যের নিম্নে স্থান পাইল? যে এক সময়ে সমস্ত হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইবে, সে কি না আজ সামান্য রমণীর পদানত হইল? কিন্তু তুমি যদি স্বীয় দোষের জন্য অনুতাপ করিতে প্রস্তুত থাক,

বিস্ময়বিমূঢ়নেত্রে একবার চারি দিকে চাহিলেন ; পরে যুবরাজ মহম্মদকে স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস ! আমি তোমায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, কিন্তু এখন তৎপরিবর্ত্তে আমার 'বিশ্বাসটি' ফিরাইয়া লইতেছি। এই দেখ তোমার পিতার পত্র। তুমি পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে আসিয়াছ, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সন্দেহ আমার স্নেহপ্রবৃত্তিকে ক্ষীণতেজ করিয়া দিয়াছে। তুমি মক্কায় গিয়া শপথ করিয়া বলিলেও এতৎসম্বন্ধে আমি বিশ্বাস করিব না। এত দিন তোমায় মিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, আজ হইতে তুমি আমার শত্রু হইলে। আমার কন্যাকে লইয়া ধনরত্নাদি সমেত তুমি এখনই আমার স্কন্ধাবার পরিত্যাগ কর। কোনও দূষণীয় কর্ম্মে হস্তদ্বয় শোণিতরঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে তোমায় এ স্থান পরিত্যাগ করাইলে, আরঙ্গীব আমার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন।"

মহম্মদ দুঃখিতচিত্তে সুলতান সুজার নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথাগুলি শুনিলেন। একদিকে তিনি তাঁহার অকারণ তিরস্কারে যেরূপ ব্যথিত হইলেন, অন্য পক্ষে আবার তাঁহার উদারতা দেখিয়া সেইরূপ প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পিতা সম্রাট আরঙ্গীবকে তিনি বিশেষ চিনিতেন। পিতৃবিদ্রোহিতার পরিণাম যে গোয়ালিয়রের অন্ধতমসাবৃত দুর্গ, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বৃথা চিন্তায় কি হইবে, তিনি অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া পিতৃশিবিরে যাত্রা করিলেন।

অশ্রুধারা ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বিদায় লইয়া, পরদিন প্রাতে কুমার মহম্মদ স্বীয় বনিতাকে লইয়া বাদসাহশিবিরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচর অশ্রুপূর্ণ নয়নে মিনতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার! কোথায় যাইতেছেন ? একবার পরিণামের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দিল্লীর রাজপ্রাসাদে আর আপনার স্থান নাই। চলুন, রাজমহলের জঙ্গলে এই জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত করি।" মহম্মদ সেই বিশ্বাসী অনুচরকে তাহার মঙ্গলেচ্ছার জন্য শত শত ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল না।

যে সকল সৈন্য এক সময়ে তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে ছিল, যাহারা তাঁহার আজ্ঞার

পাইবে। তোমাকে মার্জ্জনা করা হইয়াছে, কিন্তু তুমি যাহা সম্পন্ন করিতে গিয়াছ, তাহার কত দূর হইল?"

অপেক্ষায় সঙ্গীণ ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিত, যাহাদের পরিচালিত করিয়া তিনি বৃদ্ধ পিতামহ ভারতেশ্বর সাহজাহানকে বন্দী করিয়াছিলেন, এখন সেই সমস্ত সৈন্য তাঁহাকে বন্দীভাবে দিল্লীতে লইয়া যাইবে, এ চিন্তায় যুবরাজের হৃদয় সম্পূর্ণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি এক এক বার ভাবিতে লাগিলেন, হায়! কেনই বা পিতৃশিবির পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কেনই বা ভবিষ্যতের অত্যুচ্চ আশা পদতলে দলিত করিলাম। কিন্তু যখন সেই পথশ্রমক্লিষ্ট, বিষাদ-মণ্ডিত, আয়েসার মলিন মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলেন, তখন গতানুশোচনা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে প্রেয়সীর অশ্রু-পূর্ণ মুখে চুম্বন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার জন্য মহম্মদ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সিংহাসনের পরিবর্ত্তে তোমায় কারাগার আশ্রয় করিতে হইবে। সযত্নপালিত উদ্যানলতাকে পূতিগন্ধময় ভীষণ শ্মশানে রক্ষা করিতে হইবে।

শিবিরসন্নিহিত হইয়া তিনি মীর জুমলার নিকট দূত পাঠাইলেন। মীর জুমলা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে শতাধিক, উন্মুক্তকৃপাণহস্ত সৈনিক দৃঢ়পদবিক্ষেপে কুমারের সম্বর্দ্ধনার জন্য ছুটিল। মীর জুমলা সেই অস্ত্রধারী সৈন্যে বেষ্টিত করিয়া কুমারকে শিবিরে লইয়া গেলেন। সৈন্যগণ চিরকালের মত একবার তাহাদের অস্ত্র নোয়াইয়া তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিল। অভ্যর্থনার ব্যাপার শেষ হইলে জুমলা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "জাঁহাপনা! কুমার! আপনি রাজবিদ্রোহী। দিল্লীর ক্ষম-তার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছেন। সম্রাটের আদেশে আপনি আমার বন্দী। বাদসাহ আপনাকে দিল্লীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন।"

পিতার স্নেহময় ক্রোড় আর তখন তাঁহার নাই। বন্দীদশায় রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, আরঙ্গীব প্রত্যাগত পুত্রকে মার্জ্জনা করা দূরে থাক, বরং যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন, রোষকষায়িত লোচনে আদেশ করিলেন, "ইহাকে গোয়ালিয়ারের অন্ধতমসাবৃত কারাগারে লইয়া যাও।"

সেই নির্জ্জন কারাগারে, সেই সুদৃঢ় প্রস্তরমণ্ডিত কক্ষের মধ্যে, সেই মর্ম্ম-পীড়িত, নিরাশাদলিত, যন্ত্রণাবিদগ্ধ, প্রেমমুগ্ধ দম্পতি নির্জ্জনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই কারাগারের ভীষণ অন্ধকারে, ভবিষ্যতের

মহম্মদ এক দিনের জন্যও নিজের অসম্ভাবিত অদৃষ্টপরিবর্ত্তন জন্য, আয়েসাকে তাহার মূলীভূত কারণ জানিয়াও তিরস্কার করেন নাই। তিনি নিরবচ্ছিন্ন প্রণয়ের জন্য, স্বার্থ, সিংহাসন, সম্মান, জগতের সুখ ঐশ্বর্য্য, সমস্তই অকাতরে বলিদান করিয়াছিলেন। *

এই অন্ধতমসাবৃত সময়ের মধ্যে আয়েসার সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। আমাদের "আয়েসার" ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ নাই।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ।

প্রতিবাদ।

গত জ্যৈষ্ঠের 'সাহিত্যে' প্রতীচ্য সাহিত্যের আলোচনায় 'বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ' সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিচারসাপেক্ষ; এবং সে বিচার প্রাচ্যনীতি মতে করিলেই ভাল হয়।

লেখক বাস্তব ও আদর্শ কথা দুইটি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিদেশী আমদানী; দেশী অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। একটা প্রাচীন কথা এই যে, "সতের অতিরিক্ত কিছুই নাই বা থাকিতেও পারে না, তবে 'সতের' বিকৃতি হয় বটে।" কিন্তু তাহা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য দর্শনের সৃষ্টি; দর্শন মানুষকে মূল পদার্থ দেখাইতে চেষ্টা করে, তাহার উপর যে একটা বিকৃত আবরণ থাকে, সেটা নষ্ট করিয়া দেয়। বাস্তববাদ যদি তাহাই হয়, তাহাতে দোষ কি? আদর্শবাদ মানে বুঝাইতেছে যে, সত্যের উপরে একটা উজ্জ্বল আবরণ দেওয়া, এবং তাহার অনুসরণ করা। ইহা টিকে কি? ঘেঁটু ফুলকে কুৎসিত বলিলে পাছে মন্দ শুনায়, এই জন্য তাহার উপর মল্লিকার সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের আরোপ করা চলে কি?

* * * * *

বাস্তববাদকে 'সদ্বাদ' বলিব, না 'অসদ্বাদ' বলিব?

অবশ্য শ্লীলতা, অশ্লীলতার কথা আমি বলিতেছি না; আদর্শচিত্র যতই উন্নত হউক না

---

* অন্য মতে, কয়েক বৎসর ধরিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর, আরঙ্গীব পুত্রকে ক্ষমা করিয়া ১৬৭২ খৃঃ অব্দে মুক্তিদান করেন। এই সময় হইতে ইঁহারা "সিবনী গড়" নামক স্থানে বসবাস করিতে লাগিলেন। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে দেখিতে পাওয়া যায়, মহম্মদ বিশহাজারী মন্সবদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে আরঙ্গীব তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা উপহার দেন। আরঙ্গীবের সিংহাসনাধিরোহণসময়ে কুমার মহম্মদ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই বোধ হয় এই কৃতজ্ঞতা। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে রাজকুমারের মৃত্যু হয়। আয়েসার মৃত্যুসম্বন্ধে কোনও কথা আমরা জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ, বোধ হয় জীবনের শেষ অবস্থায় তত-

কেন, বাস্তবচিত্রের কাছে তাহার মূল্য অনেক কম; এই জন্যই 'কৃষ্ণচরিত্র' মহাগ্রন্থে স্বর্গীয় গুরু বঙ্কিম বাবু 'অতিপ্রকৃতের' সাহায্য মাত্র না লইয়া, শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবচরিত্র অঙ্কিত করিবার এত যত্ন ও আয়াস করিয়াছেন।

* * * * *

কাব্যের ঈশ্বরে এবং দর্শনের ঈশ্বরে ভেদ অনেক; কাব্য প্রকৃত রহস্য না জানিয়া, একটা কৃত্রিম ঈশ্বর গড়িয়া মানুষের সমক্ষে খাড়া করে, এবং দর্শনকে উপহাস করিয়া বলে, "দেখ, তোমার নীরস কথা, নীরস ঈশ্বর কেহ গ্রহণ করিবে না; আমার কেমন সুন্দর চিত্র! ইহাতে কত সুখ!" সুখ কিসে, বলে কে? যে চিরকাল অবিনশ্বর সত্যের অনুসন্ধান করে, সে সুখী? না যে তাহার উপর একটা আপাতরমণীয় কৃত্রিমতার আবরণ ঢাকা দেয়, সে সুখী?

শ্রীকামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর।

"সহযোগী সাহিত্যে" যাহা লিখিত হইয়াছিল, আপত্তিকারী মহাশয়ের প্রবন্ধে তাহার একটা কথারও প্রকৃত প্রতিবাদ দেখিলাম না। তিনি কেবল কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কাব্যগত বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ কাহাকে বলে, প্রতিবাদকারী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাই আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার "স্বর্গীয় গুরু বঙ্কিম বাবু"র কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রতিবাদলেখক দেখিবেন, আদর্শের অর্থ "কৃত্রিমতার আবরণ" নহে; "অতিপ্রকৃতও" নহে। কারণ, মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় অতিপ্রকৃত কোনও মতে তাহার আদর্শ হইতে পারে না। প্রতিবাদ-লেখক যাহাকে "সৎ" বলেন, বাস্তবের ন্যায় আদর্শও তাহার অন্তর্ভূত। কাদাখোঁচাও পাখী বলিয়া পাপিয়াকে কি পক্ষী-শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে? "কৃষ্ণচরিত্রে" বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে কোথাও বাস্তব (realistic) বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তিনি পদে পদে তাঁহাকে "আদর্শমনুষ্য"রূপে আমাদের নয়নপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। লেখকের সকল ভ্রমের উল্লেখ করিতে গেলে বাহুল্য হয়। সুতরাং স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই শেষ করিলাম:—

"সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া, শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি।

"কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না? রহিল বৈ কি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি।"

সহযোগী সাহিত্য।

রাজনীতি।

শ্যামরাজ।

শ্যামের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া সকল সময় সম্ভব নহে। এই সকল বৃত্তান্তের জন্য আমাদিগকে অনেক সময় ইংরাজ লেখকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইংরাজ লেখকদিগের গুণের সময় আমরা অন্ধ নহি, কিন্তু ইহাও এক প্রকার প্রমাণিত সত্য যে, 'পরের ভাল' জন-পুঙ্গবের প্রায় সহ্য হয় না। গালি দিবার সময় ইংরাজ লেখকের কলম পিচ্ছিল কাগজের উপর বড় দ্রুত চলিতে আরম্ভ করে। তাঁহারা সে কাজ বড় সহজে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। এই দোষের জন্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড মেকলেও বাঙ্গালীদিগের মিথ্যা নিন্দাবাদে আপনার অমর প্রবন্ধ কলঙ্কিত করিয়াছেন। ইংরাজের গুণ অনেক, দোষ কি নাই? তাই আজ পর্য্যন্ত শ্যামের একখানি ভাল, নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই।

শ্যাম।

এপ্রিল মাসের "লিজার আওয়ার" পত্রিকায় মিষ্টার ষ্টান্‌ডিং, শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরের বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি ব্যাঙ্কক সহরের বড় প্রশংসা করেন না। পূর্ব্ব মহাদেশের এই জিনিস তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি বর্ত্তমান শ্যামরাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ এখানে দিলাম।

শ্যামরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই সংস্কারে মনোনিবেশ করেন তিনি যথাসাধ্য সংস্কার করিয়াছেন; শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্ট করিয়াছেন, এবং আপনিও যথাসম্ভব পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুস? করিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে যত দাস হ? য়াছে, তিনি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলেও, এখনও অনেক দাস আছে।

সংস্কার।

কোনও বুদ্ধিমান ইংরাজকে পাইলেই তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কিসে শ্যামের শাসনকার্য্য আরও ভাল হইবে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হয়।

ব্যাঙ্কক সহরে রাজউদ্যান নামক একটি শোভাময় সুন্দর উদ্যান আছে। সেখানে ইউরোপ হইতে আনীত একটি সূর্য্যঘড়ি ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দেখা যায়। রাজা সেগুলি আপনি ব্যবহার করেন, এবং করিতেও জানেন। ধর্ম্মযাজক প্যালি গোয়ি রাজাকে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান।

ব্যাঙ্কক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় মতের অদ্ভুত সংমিশ্রণে সজ্জিত। বৈদ্যুতিক আলোকের জন্য একটি কোম্পানী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা চলিল না। তবে ট্রাম কোম্পানী ভালরূপ চলিতেছে। লাভ দেখিয়া তাহারা স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক ট্রামের বন্দোবস্ত করিয়াছে; তাহাতেও লাভ হইতেছে। রাস্তার দৃশ্য চমৎকার! একই রাস্তায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চ্চার ফল বৈদ্যুতিক ট্রাম চলিতেছে, আবার সেই

সহর।

আফগানিস্থানের আমীর।

আফগানিস্থানের সহিত আমাদিগের দেশগত সান্নিধ্য অপেক্ষা আজকাল রাজনৈতিক নৈকট্য আরও অধিক দাঁড়াইয়াছে। এক দিকে অজ্ঞাতরহস্যময় উদ্দেশ্যপূর্ণ রুস ভল্লুক, অপর দিকে ভারতবর্ষের শান্তিবিধাতা ইংরেজ-সিংহ। এসিয়া খণ্ডে এতদুভয়ের মধ্যে আফগানিস্থান রহিয়াছে, কাজেই আফগানিস্থান একটা রাজনৈতিক সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন দুই দিক হইতে দুইটি খরবাহিনী স্রোতস্বতী আসিতেছে; মাঝে একটা বালির বাঁধ। এখন প্রবাহ মুখে নীত বালিতে বাঁধ দৃঢ়ীকৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বাঁধ দৃঢ় হউক। যাঁহারা জগতে শান্তিস্থাপনেচ্ছু, এবং মানবের শুভানুধ্যায়ী, তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা যে, এই বাঁধ স্থায়ী হউক। এই দুই খরস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে, প্রাচ্য মহাদেশের বক্ষে সেই গণনাতীত কালের সভ্যতার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যেন বিধ্বস্ত হইয়া না যায়। এই সেদিনও ত ইংরাজদূত আফগানিস্থানের চোরাবালিতে আবার টাকা ঢালিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। সেই আফগানিস্থানের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা আমীরের বৃত্তান্ত অবগত হইতে সহজেই ইচ্ছা হইতে পারে।

আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ।

এপ্রিল মাসের "এসিয়াটিক কোয়াটারলী" পত্রিকায় আমীরের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক মিষ্টার জন, এ, গ্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, আফগানিস্থানের আমীর যথেচ্ছাচারী; সেখানে তাঁহার ইচ্ছাই আইন। সংবাদপত্রাদি সেখানে নাই, এবং আমীর ধর্ম্মযাজকদিগের ক্ষমতাও কমাইয়া দিয়াছেন; এখন প্রধান ধর্ম্মযাজকের ক্ষমতা একজন সাধারণ বিচারকের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক নহে।

আমীর।

আমীর আবদার রহমান বেশ শিক্ষিত লোক। তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া, লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, এবং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়, শিল্পসম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। দোস্ত মহম্মদের মত তাঁহার আচার ব্যবহার নিতান্ত সরল এবং আতিথেয়তাও প্রবল। তিনি যদিও নানা প্রলোভন এবং হীন তোষামোদের মধ্যে বাস করেন, তথাপি তিনি গম্ভীর এবং স্থির। প্রজারা তাঁহার সহিত সহজেই সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ; এবং বাতরোগে ক্লিষ্ট হইলেও, তিনি সকলের অভিযোগ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ এবং ন্যায়বিচার করেন।

শিক্ষা ও শাসন।

ডাক্তার গ্রে বলেন যে, বর্ত্তমান আমীরের শাসনকালে আফগানিস্থানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। সহরে এখন চৌর্য্য বা হত্যা আর দেখা যায় না; এমন কি, বাহিরেও আর ডাকাতি বা হত্যা নাই। এখন ইংরাজেরা নিরাপদে ভারতসীমা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন, কোনও বিপদাশঙ্কা নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসালয়ের কার্য্যের জন্য টার্কিস্থান হইতে কাবুলে দুই জন লোক আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা সঙ্গে একটা মাত্র ফাঁকা বন্দুক লইয়াছিল, পথে কোনও বিপদ হয় নাই। এই পাপনিবারণকার্য্য সহজে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে; তাহা হয়ও নাই। তবে তাহার জন্য যে সকল নরহত্যাদি করিতে হইয়াছিল, তাহা না করিলে চলিত না।

শান্তি।

আমীর ভাবেন যে, দেশের লোকের উপকারার্থ রাজ্যশাসন করিতে হইবে; তাহাই রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্য। তাঁহার ঋণদানপদ্ধতি চমৎকার, ঋণের শুদ নাই। যদি কোনও কাবুলী মূলধনাভাবে ব্যবসায়াদি চালাইতে অসমর্থ হয়, সে আমীরকে

আমীর আফগানিস্থানে কতকগুলি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এইগুলিকে জাতীয় শিক্ষালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কারখানায় যুদ্ধের অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; পার্শ্ববর্ত্তী রুসিয়া বা ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল অস্ত্রাদি তিনি সস্তাদরে কিনিতে পারেন, কিন্তু তাহা করেন না। কারণ, তাঁহার উদ্দেশ্য দেশীয়দিগকে শিক্ষাদান। কেবল যুদ্ধসজ্জা নহে, এখন য়ুরোপের সকল দ্রব্যই কাবুলে আদৃত।

কারখানা।

একটা চিলাজামা বা কোট সামগ্রীটা বড় তুচ্ছ নহে। আমীর বিলাতী পোষাক ভালবাসেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে এক জন দরজি আনাইয়াছিলেন, সে কাবুলী দরজিদিগকে ইংরাজের মত পোষাক তৈয়ারি করিতে শিখাইয়া আসিয়াছে, এখন কাবুলেই তাহা প্রস্তুত হইতেছে।

পোষাক।

ইহাই আশ্চর্য্য যে, যে জাতি চিরদিন অর্দ্ধবর্ব্বর, সমরদক্ষ এবং দস্যুবৃত্তি-অবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জাতির মধ্যে এইরূপ শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই জানিত না যে, এই জাতির মধ্যে শিক্ষা এত দূর বিস্তৃত হইতে পারে। আমীর কোনও মৌলিক, এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য বহুমূল্য পুরস্কার দিয়া থাকেন।

কাবুলীগণ।

ডাক্তার লিটনার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, আফগানিস্থান ও গ্রেটব্রিটেন, এতদুভয় রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন, সার মর্টিমর ডুর‍্যাণ্ডের কৃত নহে। সার মর্টিমর্ কাবুলে যাইবার প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে (২২শে আগষ্ট, ১৮৯৩) আমীর তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, এই দুই রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, উভয়েরই হৃদয়ে কোনও রূপ কুভাব নাই। অসদভিপ্রায়ে কুলোকে যাহাই করুক, এ সদ্ভাব নষ্ট হইবে না।

আফগানিস্থান ও গ্রেট ব্রিটেন।

সদ্ভাব যেন নষ্ট না হয়, ইহাই আমাদিগেরও প্রার্থনা।

সাহিত্য।

হাইন এবং লেডী ডফ্‌গর্ডন।

আজ কত দিন হইল, হাইনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু জর্ম্মান কবির প্রেমসঙ্গীতগুলির আজ পর্য্যন্ত বড় আদর। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সেগুলি অনুবাদিত হইয়াছে। য়ুরোপ প্রতিভার সম্মান করিতে জানে, সেখানে প্রতিভার পুরস্কার ও পূজা আছে; য়ুরোপ বাঙ্গালা নহে, সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির গ্রন্থ ওজনদরে বিক্রয় হয় না। সেখানে লোকে পরলোকগত মহাত্মাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহাতে কখনও শ্রান্তি বোধ করে না। সম্প্রতি কোনও পত্রিকায় Early Days Recalled প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী শ্রীমতী জেনেট রসের জননী লেডী (লুসি) ডফগর্ডনের সহিত কবির পরিচয়াদির বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

হাইন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে লুসি অষ্টিনের সহিত বোলোন সহরে কবির পরিচয় হয়। তখন তিনি দ্বাদশবর্ষীয়া, বিশালাক্ষী এবং সুকেশী। জর্ম্মান ভাষায় বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই এই পরিচয়ের মূল। বালিকা মাতার সহিত

প্রথম পরিচয়।

লেন, "যখন তুমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবে, তখন বন্ধুবর্গকে বলিতে পার যে, তুমি হেনরিচ্ হাইনকে দেখিয়াছ।" বালিকা বলিলেন, "হাইন কে?" এই প্রশ্নে কবি বড় আনন্দিত হইলেন, এবং বুঝাইয়া বলিলেন যে, হাইন একজন জর্ম্মন কবি।

তখন হইতে উভয়ের বন্ধুত্ব। লুসি তাঁহাকে ইংরাজী গীত গাহিয়া শুনাইতেন, আর কবি তাঁহাকে মৎস্য এবং জলদেবীদিগের গল্প শুনাইয়া আনন্দিত করিতেন। হাইন তাঁহার নিকট একজন ফরাসী বেহালাবাদকের গল্প করিয়াছিলেন; তাহার একটা কৃষ্ণকায় কুক্কুর ছিল, এবং সে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিত। তাহা ভিন্ন জলদেবগণ তাহার সহিত আলাপ করিতেন। কবি ইংরাজ বালিকার নামে তাঁহার একটি কবিতা উৎসর্গ করেন।

লুসির সহিত সার ডফগর্ডনের বিবাহ হইয়া গেল। আঠার বৎসর পরে, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, প্যারিসে লুসি শুনিলেন যে, তাঁহার বাসার নিকটেই হাইন বাস করেন। তিনি কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যে ইংরাজ বালিকাকে গল্প শুনাইতেন, তাহাকে তাঁহার মনে আছে কি না, এবং সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে কি না। উভয়েরই হৃদয় সুখময় অতীতের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। হাইন তখন বড় রুগ্ন, এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। মৃত্যুশয্যাশায়ী কবি তখনই তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন। লুসি তাঁহাকে যে সকল গান শুনাইতেন, তাহা আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া লেডী বড় ব্যথিতা হইলেন; কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি সমধিক প্রবল। দেহ যত জীর্ণ, মন তত নহে।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ।

শীর্ণ শ্বেত অঙ্গুলি দ্বারা তিনি তাঁহার শক্তিহীন নয়নপল্লব উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, লুসির নয়নদ্বয় এখনও সেইরূপ বড় বড় আছে। তবে ক্ষুদ্র লুসি এখন বড় হইয়াছে, এবং বিবাহিতা হইয়াছে, সেইটুকুই আশ্চর্য্য।" তিনি এখন সুখী এবং সন্তুষ্ট কি না, কবি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। লুসি বলিলেন যে, বাল্যকালের মত প্রফুল্ল না হইলেও তিনি সুখী এবং সন্তুষ্ট। কবি বলিলেন, "সেই ভাল। ফরাসী রমণীরা সকল প্রকারের মানব দ্বারা হৃদয় জুড়াইতে চায়। যাহারা সেরূপ করে না, তাহাদিগকে দেখিলে বড় আনন্দ হয়। সেরূপ করা যে দোষ, ফরাসী মহিলাগণ তাহা ভাবে না; তাহাদিগের হৃদয় নাই।"

ফরাসী মহিলা।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লেডী ডফগর্ডন দুই মাস প্যারিসে ছিলেন। এক স্থানেই কবি ও তিনি বাস করিতেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া কবি এক টুকরা কাগজে পেনসিলে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন;—

"গ্রেটব্রিটেনের শ্রদ্ধেয় দেবী! এই চাকরের কাছে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তুমি আসিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু দেবীর সেই শুভাগমনের জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়াছি। আর দেরী করিও না। আজ আসিও, কাল আসিও, সদাসর্ব্বদা আসিও। আমাকে যেন আর অধিক অপেক্ষা করিতে না হয়। আমার গ্রন্থের মধ্যে যেগুলির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে, তাহার প্রথম চার খণ্ড এই সঙ্গে পাঠাইলাম। দেবীর অনুগত পূজক হেনরিচ্ হাইন।"

পত্রপ্রাপ্তির অল্পক্ষণ পরেই লেডী ডফ্‌গর্ডন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে শয্যায় ছিলেন, সেই শয্যা! দেহ শীর্ণ, তিনি যেন মৃতের মত। লেডীকে দেখিয়া কবি বলিলেন:—

"জগৎ এবং ঈশ্বর, উভয়ের সহিত আমার শান্তিস্থাপন হইয়া গিয়াছে— ঈশ্বর তোমাকে দেবদূতের মত আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি জানি, আমি শীঘ্রই মরিব। আমি

ঘৃণা করি নাই। একবার আমি ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম; লণ্ডন আমার কাছে বড় প্রীতিহীন বোধ হইয়াছিল—রাস্তার লোকেরা ত একেবারে অসহনীয়! কিন্তু প্রতিফলস্বরূপ ইংলণ্ড আমাকে কয় জন চমৎকার বন্ধু দিয়াছে—তুমি, মিল্‌নেস্ এবং আরও কয় জন।"

মিল্‌নেস্ (লর্ড হটন) কবি এবং রাজনৈতিক ছিলেন।

এই সময় লেডী ডফগর্ডন প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার কবিকে দেখিতে যাইতেন। হাইন তাঁহার কবিতাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি লেডী ডফ-গর্ডনকে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহাকে গ্রন্থসত্ত্ব দান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যেখানে আবশ্যক হইবে, ছাঁটিয়া কাটিয়া লইবার অনুমতি দান করেন, এবং কবিতাগুলির সাজানর জন্য একটা খসড়াও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহাকে গদ্যে অনুবাদ করিতে বলেন। লেডী যখন তাঁহাকে Almansor এর অনুবাদ শুনাইলেন, তখন কবি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং যাহাতে তিনি অন্যগুলির অনুবাদ করেন, সে জন্য অনুরোধ করিলেন।

লেডী ডফগর্ডনের অনুবাদ।

হাইন আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার, রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতেন, এবং তাঁহার কষ্টে যদি লেডী ডফগর্ডনের চক্ষে জল আসিত, তাহা হইলে তিনি আনন্দিত হইতেন—কিন্তু যদি তাঁহার কোনও রহস্যকথা শুনিয়া তিনি হাসিতেন, তবে কবির আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কবির ইংলণ্ডে আসিবার কথা ছিল—সেখানে দুইজনে আবার সাক্ষাৎ হইবে, লেডী ডফ সেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবির মৃত্যুতে সে আশা ফলবতী হইল না।

হেন্‌রী রচফোর্ট।

এপ্রিল মাসের "আইড্‌লার" পত্রিকায়, কুমারী বেলক, এই বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদপত্রলেখকের জীবন বড় বিচিত্র বৈষম্যপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ।

যদিও তিন বৎসর হইতে তিনি ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন নাই। তিনি মনে করেন যে, ইংরাজী শিক্ষা করিলে তাঁহার ফরাসী লেখার ধরণ খারাপ হইয়া যাইবে। সেই ভয়ে তিনি কেবল ফরাসী ভাষার চর্চ্চা করেন। তিনি ফরাসী পুস্তকাদি পাঠ করেন, ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, কাজেই তাঁহার দেহ ইংলণ্ডে থাকিলেও, প্রাণ সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রাণ-প্রিয় প্যারিসের সভ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকে। তিনি মনে করেন যে, এইরূপে দূরে থাকিয়া তিনি ফ্রান্সের রাজনৈতিক ভাবের নাড়ীনক্ষত্র নখদর্পণে দেখিতে পারেন।

ইংলণ্ডে বাস।

বার বৎসর বয়সের সময় অধ্যয়নাভিলাষে তিনি সেণ্টলুই কলেজে আসেন। কিন্তু সেখানে উপন্যাসপাঠে এবং কবিতারচনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। এই কবিতার জন্যই তাঁহাকে প্রথম রাজনৈতিক মতের জন্য বিপদে পড়িতে হইয়া-ছিল। হ্রস্ব কোমলপ্রাণা, কল্পনাসেবিতা কবিতা! সেই সাধারণ-তন্ত্রমূলক কবিতা লইয়াই গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

যৌবন।

সাহেব এখন একজন প্রসিদ্ধ মসীযোদ্ধা—ঐন্দ্রজালিকের মত কলমের সাহায্যে লোকের মত পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন; কিন্তু পূর্ব্বে একজন অসিযোদ্ধাও ছিলেন বটে। বিলাসের বিলোল তরঙ্গে মন্দ মন্দ আন্দোলিত ফরাসী সমাজে বীর বালকের অভাব নাই। সাহেব কত দৈরথ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তবে কয়েকটি আজও মনে আছে। তাঁহার প্রথম দৈরথ যুদ্ধ এক জন স্পেনদেশীয়

দ্বৈরথ যুদ্ধ।

রাজকর্ম্মচারীর সহিত। সে ভাবিয়াছিল যে, তিনি একটা প্রবন্ধে সেই মহিমাময় সম্রাটকে উপহাস করিয়াছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ প্রিন্স মুরাটের সহিত, তাহাতে সাহেব আহত হইয়াছিলেন। আর একটি পল ডি কসান্যাকের সহিত, তাহাতেও সাহেব আহত হইয়াছিলেন। আর একবার এক জন তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করে; সে বলিয়াছিল যে, তিনি কোনও প্রবন্ধে তাহার অপমান করিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাহেব জানেন না, তিনি কি দোষ করিয়াছিলেন।

রচনা।

লিখিবার সময় তাঁহার বড় আনন্দ হয়। তাঁহার পুত্র আমেরিকা হইতে তাঁহার জন্ত একটি Stereoscopic কলম আনিয়াছিলেন, তিনি সেইটিই ব্যবহার করেন। প্রবন্ধ লিখিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি কি লিখিবেন, স্থির করিয়া লিখিতে বসেন। লোকে অনেক সময় তাঁহার কাছে অনেক প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দলিল আনে, (তিনি) সুসময়ে সে সকলের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, পানামাযোজক কেলেঙ্কারীর সময় যে সকল ডেপুটী এবং সিনেটর ঘুস লইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নামের তালিকা তাঁহার কাছে আছে। আশ্চর্য্য সংগ্রহ বটে!

উইডা।

মার্চ্চ মাসের "কালিফর্ণিয়ান ম্যাগাজিনে" মিষ্টার চার্লস রবিনসন্ অধুনা ফ্লোরেন্স-বাসিনী শ্রীমতী উইডার বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমতীর চিত্র বড় সন্তোষজনক নহে।

পোষাকে বাবুগিরি।

শ্রীমতী উইডার পাণ্ডুবর্ণ পুরুষোচিত বদনে সর্ব্বদা ক্লান্তির ছায়া দৃষ্ট হয়, সেই বিশাল ধূসর নয়নদ্বয় যেন একটু জ্যোতিঃহীন। তাঁহার কুন্তলজালও যেন একটু ধূসর—লোকে কানাকানি করে যে, তাঁহার দাসী বহুক্ষণ ধরিয়া এই কেশরাশির সজ্জা করে। তিনি বহুমূল্য সুগন্ধি ব্যবহার করেন। পোষাকে তিনি চিরদিন অকাতরে অনেক সময় অকারণে অপব্যয় করেন। তাঁহার একজন রুস ভক্ত তাঁহাকে এক সেট সেবল উপহার পাঠাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি বড় ভাল বাসেন। পুরাতন ফিতা তিনি অবসর পাইলেই সংগ্রহ করেন, এখন তাহাদের সংখ্যা বড় অল্প নহে; তিনি সেগুলিও বড় ভাল বাসেন। তাঁহার জুতাও অনেক, এবং নানা রূপের, সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত। তাঁহার দস্তানাগুলিও ফরমাইস মত প্রস্তুত।

পুস্তকে রচনা দ্বারা তিনি যেমন প্রচলিত সমাজনীতিকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহার আচার-ব্যবহারও সেইরূপ। তিনি গৃহে ব্রাণ্ডি পান করেন, চুরুটের ধূম পান করেন, এবং অনেক সময় আগন্তুকদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জীবন ও সাহিত্য-সেবা।

শ্রীমতী লুইসাডিলা রেমির বয়স এখন প্রায় ৫৩ বৎসর। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বেরি-সেণ্ট এডমন্সে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন ফরাসী পলাতক; তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন। অল্প বয়সে তিনি ও তাঁহার মাতা লণ্ডনে আগমন করেন, এবং সেই সময় তিনি "উইডা" নাম অবলম্বন করিয়া রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উইডা কি? শিশু লুইসা বলিতে উইডা উচ্চারণ করে

বিগত ২০ বৎসর হইতে শ্রীমতী উইডা ফ্লোরেন্সের সহরতলীতে বাস করিতেছেন। যে কক্ষে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, সে কক্ষটি বড় সুন্দর—তাহা ইতালীয় ধরণে চিত্রিত—তাহাতে পদ্মফুল অনেকগুলি। অগ্নিকুণ্ডের কাছে (Hearth stone) একখানি বহুমূল্য পারস্যদেশীয় গালিচা পাতা আছে। তিনি তাহার উপর শয়ন করিয়া সময় সময় চিন্তামগ্না থাকেন, এবং সময় সময় এক একবার চীৎকারও যে করেন না, এমন নহে। তাঁহার উপাসনাগৃহে ম্যাডোনার একটি মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা আলোক থাকে। অগ্রে তিনি প্রায়ই প্রধান যেসুইট ধর্ম্মযাজক অ্যাণ্ডারলেডির কাছে ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসার জন্য যাইতেন। এই দুই কারণে লোকে বলিত যে, তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন।

ধরণ-ধারণ।

দুই বৎসর অন্তর তাঁহার এক একখানি পুস্তক রচিত হয়। দীর্ঘপর্য্যটনের সময় তিনি তাহার মূলভাগ ভাবিয়া রাখেন। তবে পূর্ব্বে তিনি যেরূপ কষ্ট সহিতে পারিতেন, এখন আর সেরূপ পারেন না। প্রভাতে ৫টার সময় তিনি সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। অবশ্য তখনই তিনি লিখিতে বসেন না। তিনি কেবল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করেন—যখন নিতান্তই ভাব আসে, তখন তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখেন না। সম্মুখে একটি দোয়াত রাখিয়া একখানি নীচু চেয়ারে উপবেশন করেন, এবং জানুর উপর ব্লটার রাখিয়া তাহার উপর কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। হর্ম্ম্যতল পুস্তকের খসড়ায় প্রায় পূর্ণ হইয়া যায়। প্রত্যেক কাগজে তিনি গুটিকতক মাত্র কথা লিখেন; কারণ, তাঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত বৃহৎ। লিখিবার জন্য তিনি পেন কলম ব্যবহার করেন।

রচনা।

শ্রীমতী উইডা খুব বেড়াইতে পারেন, এবং বেড়াইতে বাহির হইলেই তিনি এক পাল কুক্কুর সঙ্গে লইয়া যান। অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র সকল প্রকার কুক্কুর এই পালে থাকে। কুক্কুর সম্বন্ধে উইডা যে সকল অদ্ভুত গল্প বলেন, তাহা ত প্রসিদ্ধ। এক একটি কুক্কুর যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন উপযুক্ত উৎসবের সহিত তাহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কুক্কুর।

প্রায়ই দেখা যায়, তিনি তাঁহার বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত একটু অদ্ভুত রকমের খোলা গাড়ীতে Lung Arnoয় যাইতেছেন। ঘোড়ার সাজও একটু অদ্ভুত রকমের। তিনি সাধারণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন না; সমাজে মিশিতে চাহেন না। গৃহে বৃদ্ধা দাসী ও তিনি নির্ব্বিবাদে, নির্জ্জনে, নিস্তব্ধভাবে বাস করেন। Under Two Flags গ্রন্থে মিজারেটের আদর্শ এই দাসী।

গৃহে ও বাহিরে।

করমর্দ্দন তিনি ভালবাসেন না, বরং ঘৃণা করেন। তিনি বলেন, ইহা সর্ব্বনিকৃষ্ট অভিবাদন। কোনও গৃহে প্রবেশ করিলে আগেই তিনি আসন খুঁজিয়া লয়েন। তার পর একবার বসিলে যতক্ষণ না উঠিবার সময় হয়, ততক্ষণ স্থির। কেহ তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে, তাঁহাকে তাঁহার কাছে যাইতে হয়। আগন্তুক যেই কেন হউক না, তিনি উঠিয়া তাঁহার কাছে যাইবেন না।

অভিবাদন।

জগতের স্ত্রীজাতির মধ্যে তিনি কেবল রোজা বনহিউরকে ঈর্ষ্যা করেন; তিনি আমেরিকানদের ভালবাসেন না। যখন শ্রীমতী জন বিগিলো একপ্রকার জোর করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই আমেরিকানদিগকে ঘৃণা করেন। শ্রীমতী বলিলেন,

আমেরিকান।

জন্মভূমি।—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের "স্বাধীন ভারত" সুপাঠ্য, চিন্তা-কর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। "বাণভট্ট সংস্কৃত কাব্যে একজন মহাকবি। তিনি অন্ততঃ বার শত বৎসর পূর্ব্বের লোক। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের বা আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল," লেখক এই প্রবন্ধে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাণভট্ট কোন্ সময়ের কবি, কাদম্বরীতে সমগ্র ভারতের চিত্র পাওয়া সম্ভব কি না, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা লইয়া তর্ক করুন। তর্করত্ন মহাশয় সাধারণের জন্য বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত হইতে যে ছবি তুলিয়াছেন, তাহা হইতে সহজে অনেক ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ করা যায়। "ভূদেব-বিয়োগ" শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের একটি পদ্য, চৌদ্দ লাইন ইহার কলেবর,—অতএব ইহাও একটি সনেট। এমন কটমট কবিতা কামস্কট্‌কায় চলিতে পারে, ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অপাঠ্য। "অভিমান" শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের একটি কবিতা। গিরীশ বাবু বলিতেছেন,—

"রাখিতে পারি হে যদি গুরুপদে মতি,
বুঝিব হে অভিমান! তোমার শকতি।
ইচ্ছামত ধন পাব, "নারী পাব যারে চাব,"
অতি হীন হয়ে হব ধরণীর পতি।" ইত্যাদি।

"নারী পাব যারে চাব"—এ পদটির অর্থ কি? যদি ইহার কোনও আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে, বলিতে পারি না। কিন্তু সাদা কথায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা বড় ভয়ানক। প্রকাশ্য ভাবে প্রাণের এ কামনা জন্মভূমির মারফৎ প্রকাশ না করিলেই ছিল ভাল। "জন্মভূমির" আর একটি দুর্ব্বোধ কবিতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "আহ্বান"। কবিতাটি আন্তরিকতাশূন্য ও কৃত্রিমতাদুষ্ট, সুতরাং হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

জ্যোতিঃ।—জ্যৈষ্ঠ। এ সংখ্যার "বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ" বেশ সুখপাঠ্য। "বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস" যত দূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ নূতন কথা কিছু নাই।

পূর্ণিমা।—জ্যৈষ্ঠ। "৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়" এবারকার পূর্ণিমার একমাত্র যোগ্য প্রবন্ধ। ইহাতে ভূদেব বাবু সম্বন্ধে দুই একটি সুন্দর গল্প আছে।

অনুসন্ধান।—অষ্টম বর্ষ; সপ্তম সংখ্যা। অনুসন্ধান পাক্ষিক ছিল, সাপ্তা হইয়াছে। এই পত্রখানি মধ্যে "মন্দের ভাল" হইয়াছিল, আবার অত্যন্ত অধঃপতিত সুপাঠ্য ও উল্লেখযোগ্য কিছু থাকে না বলিয়া এত দিন আমরা অনুসন্ধানে উল্লেখ করি নাই। কিন্তু অনুসন্ধান ভালপথে বড় হইতে না পারিয়া অন্য পথ ধ কেহ সুকাজে নাম রাখে, কেহ বা দুষ্কার্য্যে বিখ্যাত হয়। রোমের সম্রাট নীরো নি দুরাচারিতায় নাম কিনিয়া গিয়াছে; অনুসন্ধানেরও সাধ, গালি দিয়া নাম জাহির এই সংখ্যার অনুসন্ধানে "চাঁদের হাট" নামক একটা জঘন্য, অপাঠ্য, কুরুচিপূর্ণ পাঁচাল প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার প্রায় আধ লেখককে ইতর ভাবে গালি দিয়াছেন। লেখকের মতে "চাঁদের হাট" Satire। লেখকে বলি, স্যাটায়ার লেখা তাঁহার কর্ম্ম নয়। "চাঁদের হাটকে" আমরা অন্য কি বলিব,—মাই কেলের ভাষায় পাঠকদের অনুরোধ করি,—

"চণ্ডালের হাড় দিয়া পোড়াও পুস্তকে,
ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা-জলে।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—জ্যৈষ্ঠ। এবারকার সাধনার প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা—"মৃত্যুর পরে।" এই সুন্দর ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কবিতার নিগূঢ় রহস্যরস কেবল অনুভবগম্য। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতবর্ষে—বারাণসী" এখনও চলিতেছে। "সাময়িক সারসংগ্রহ" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত। এবারকার সাময়িক সারসংগ্রহের বিষয়নির্ব্বাচন ও রচনা বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের "নূতন তাম্রশাসন" এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "কৃতজ্ঞতা" এখনও চলিতেছে। "যোগসিদ্ধ জ্ঞান ও যোগানন্দ" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। বিষয়টি সাধারণের জন্য বেশ মধুর ভাবে, মিষ্ট ভাষায় ও প্রাঞ্জল প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "শোকসভা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাময়িক প্রবন্ধ। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর, যখন তাঁহার স্মরণার্থসভার উদ্যোগ হয়, তখন অনেকে উদ্যোগকারীদের বাধা দিয়াছিলেন। শোকসভার উপযোগিতা কি, রবীন্দ্র বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশদভাবে তাহা দেখাইয়াছেন, এবং অতি সমীচীনরূপে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির নিরাস করিয়াছেন।

ভারতী।—জ্যৈষ্ঠ। এবার প্রথমেই একটি এক সংখ্যায় সমাপ্ত গল্প,—"আর একবার।" শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়, এই গল্পটির লেখক। গল্পটি আমাদের ভাল লাগিল না। ভাষা ছোট গল্পের উপযুক্ত নয়,—গল্পেরও তেমন বাঁধুনি নাই। ছোট গল্পে যে একটা সংযত, সংক্ষিপ্ত রচনাপদ্ধতির আবশ্যক, এ গল্পে তাহারও সম্পূর্ণ অভাব। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের "কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি হীরক প্রস্তুত করণ" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। লেখক প্রবন্ধের উপ- বলিতেছেন, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হীরা "সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বতোভাবে খনিজ অকৃত্রিম দৃশ।" শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্রের "নিজামরাজ্য" প্রবন্ধটি আশানুরূপ হয় নাই। গ" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত—সুপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু প্রয়াগ ক্রমে ইয়া আসিল। "অশিক্ষিতা" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি ক্ষুদ্র কবিতা, ইহাতে রিবার কিছু দেখিলাম না। শ্রীমতী সরলা দেবীর "লান্‌করাণের উজীর"—দ্বিতীয় র প্রকাশিত হইয়াছে। এবারও সুরুচির শ্রাদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টো- । "বিদ্বজ্জনমিলন" এবারকার ভারতীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ। ইহাতে বিষয় পর্য্যাপ্ত। লেখক এই প্রবন্ধে কতিপয় নূতন শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সুপ্রযুক্ত ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবী "মুদ্রারাক্ষসের" সমালোচনা করিয়াছেন। লেখিকা বলিতেছেন, "দুই শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, সহস্র সর ধরিয়া সংস্কৃত নাটকের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, অথচ সবে খানদশেক মাত্র সুপাঠ্য টিক আমরা পাইয়াছি—অপাঠ্যের সংখ্যা যে খুব বেশী তাহা নয়, আর গোটাকুড়িক মাত্র।" লেখিকা শি ধ্রুবসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা একুনে ত্রিশখানি মাত্র? কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি "দৃশ্যকাব্য" বুঝাইতে "নাটক" শব্দের ব্যবহার করিয়া- ন। সংস্কৃত অলঙ্কারে দৃশ্যকাব্যের নানা ভেদ আছে, নাটক তাহার অন্যতম। শ্রীমতী সরলা কি ত্রিশখানি "দৃশ্যকাব্য" দেখিয়াছেন, না দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত ত্রিশখানি "নাটক" ছেন? লেখিকা মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসের রচয়িতাদের "ইতর কবি" এই সুমিষ্ট প্রদান করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সমালোচনাটির মুখবন্ধ বেশ হইয়াছে।

মধুচ্ছন্দার সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে ঋষিসমাজে বিজ্ঞানের অবস্থা।

মাসিকপত্রের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব, এবং তজ্জন্য যে বহু অধ্যয়নের প্রয়োজন, তাহাও আমার নাই। আমি কেবল এই বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিব। মধুচ্ছন্দার বেদ বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে, ঐ কয়েকটি কথার প্রয়োজন বলিয়া, এখানে তাহার অবতারণা করা হইল।

বেদপাঠীগণ বেদের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন, তাহা "বেদাঙ্গ" বলিয়া গণ্য। সচরাচর "বেদাঙ্গ" ছয় প্রকার বলিয়া পরিগণিত; যথা,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা উচ্চারণবিষয়ক বিজ্ঞান। শিক্ষ ধাতুর মূল অর্থ,—দান। গুরু শিষ্যকে বেদ দান করিতেন; শিষ্যকে গুরুর মুখে শুনিয়া বেদ কণ্ঠস্থ করিতে হইত। সুতরাং তৎকালে আবৃত্তি ও উচ্চারণ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার একটি অতি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। আবৃত্তি ও উচ্চারণের নিয়ম সকলের নাম ছিল "শিক্ষা"। এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া গুরু বেদ "দান" করিতেন, এবং শিষ্যের করিয়া লইতেন। দ্বিতীয় বেদাঙ্গের নাম "কল্প", অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম যজ্ঞ লইয়াই বেদ; যজ্ঞে ব্যবহারই বেদের প্রয়োজন; যজ্ঞের জন্যই রচনা। বেদের আগেই যজ্ঞ, যজ্ঞের আগে বেদ নহে। যাঁহারা ঋগ্বেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ কথা প্রমাণিত করিবার জন্য বাক্যব্যয় বশ্যক। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলী ঋষিদের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে ছি

পাঠকবৃন্দকে মনে রাখিতে হইবে, "বেদ" বলিলে একটি বিশেষ প বুঝিলে চলিবে না। বহুসংখ্যক ও নানাজাতীয় বাক্যরাশির নাম "বেদ" বহু শতাব্দ ব্যাপিয়া বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচিত হয়। সে সময়ে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে পৌঁছেন নাই, তখনও তাঁহারা অগ্নি জ্বালিয়া সোমাহুতি দিয়া যজ্ঞ করিতেন; তখনও তাদৃশ যজ্ঞে "মন্ত্র"-নামক বাক্য (যাহা পরে বেদের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়) ব্যবহৃত হইত; তখনও হোতা ও অধ্বর্য্যু নামক ব্যবসায়ী যাজকের দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহিত হইত। সেই প্রাচী

গানে বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। তবে তখনও বেদের কিয়দংশ রচিত হইতেছিল—তখনকার ঋষিরা আপনাদিগকে নবীন ঋষি বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রাচীন ঋষিদের বেদ শিক্ষার নিয়মানুসারে উচ্চারিত,—এবং কল্পের নিয়মানুসারে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঋষিদের বেদের অর্থবোধের জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক হয়। এই দুই শাস্ত্রের নিয়মাবলী অনুসারে কোন্ বৈদিক শব্দ কিরূপে গঠিত, তাহা জানা যায়, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের অর্থবোধের সাহায্য হয়।

ছন্দস্ শাস্ত্রে পদ্য রচনার নিয়ম নিবদ্ধ। ঋক্ সকল গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ অনষ্টুপ, জগতী, বৃহতী, পংক্তি, উষ্ণিক্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সুললিত ছন্দে বিরচিত; যে যে নিয়মে ঐ সকল ছন্দ গঠিত হয়, তাহাদের নাম ছন্দস্ শাস্ত্র।

ষষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রধান বেদাঙ্গের নাম জ্যোতিষ। যে সকল নিয়মের অধীন হইয়া জ্যোতিষ্ক সকল নভোমণ্ডলে ভ্রাম্যমাণ হয়, তাহাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়।

এই ষড়ঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গই কেবল কতকগুলি নিয়ম। যাঁহারা এই ষড়ঙ্গের সঙ্কলনকর্ত্তা, তাঁহারা নিয়ম কি পদার্থ, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বিজ্ঞান নিয়মের একাধিপত্য, তাহা তাঁহারা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। র বিষয়ীভূত সমুদায় কার্য্যই নিয়মের অধীন। নিয়মকে অবগত হও- জ্ঞান; নিয়মই বিজ্ঞানের কেন্দ্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মের অধীন হইয়া ছে—সেই সকল নিয়ম যে অচল অটল, তাহা ষড়ঙ্গাধ্যায়ীরা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম ছিলেন। সংসারে নিয়মেরই রাজত্ব দেখিয়া, তাঁহারা শিক্ষার নিয়ম, নিয়ম, ব্যাকরণ ও নিরুক্তের নিয়ম, ছন্দের নিয়ম এবং জ্যোতিষের সকলের অনুশীলন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের আকারে সঙ্কলন করেন।

এই ষড়ঙ্গের মূলে মীমাংসা বা হেতুশাস্ত্র। তর্কের দ্বারাই নিয়মের অবধারণ প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং ঋষিসমাজে তর্ক বা ন্যায়শাস্ত্রের যে অনুশীলন ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার বেদাঙ্গেরই মূলীভূত বলিয়া ইহা পৃথক্ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই।

মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র যখন আপনার গুরুকে "বক্ত্বানাং মেলিং" (ঋগ্বেদ ৩।২৬।৯) বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন তৎকালে তর্কবিতর্ক যে ...র অঙ্গ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। "বক্ত্বানাং"=বক্তব্যানাং বিষ-

ধাভাসের মীমাংসা করেন। কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিলে তাহার যিনি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। তৎকালে গুরুশিষ্যের মধ্যে তর্কবিতর্কের এবং পূর্ব্ব পক্ষ ও সিদ্ধান্ত-করণের রীতি যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল—তাহা বিশ্বামিত্রের বাক্যে বেশ বুঝা যায়।

এক্ষণে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বৈদিকঋষিরা সংসারে যদি নিয়মের একাধিপত্য বুঝিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা নিয়মের কোনও পারিভাষিক নামকরণ করিয়াছিলেন কি ?—ইংরাজিতে Law যেমন পারিভাষিক শব্দ, তাদৃশ কোনও শব্দ বেদে পাওয়া যায় কি ?—তদুত্তরে বলিতে পারি যে, একটি নয়, তাদৃশ অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ ঋগ্বেদে দৃষ্টিগোচর হয়। যথা,—"ধাত", "সত্য", "ধর্ম্ম" ও "ব্রত"।

১। ধাত=ধা (ধা গতৌ)+ক্ত। অর্থাৎ, যাহা গত হইয়াছে। অতীতের মধ্যেই আমরা নিয়ম দেখিতে পাই। অগ্নি বহুকাল হইতে দাহ করিয়া আসিয়াছে, সূর্য্য বহুকাল হইতে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া আসিয়াছে, অঙ্কুর সকল বহুকাল হইতে বীজ হইতেই উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে ; অতএব, যে যে নিয়মের অধীন হইয়া অতীত ঘটনা সকল ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাদের বৈদিক পারিভাষিক নাম "ধাত।"

২। সত্য=সতে হিতং যৎ। যাহা বর্ত্তমান, তাহার নাম "সৎ" ; যাহা সেই বর্ত্তমানের অনুকূল (হিত), তাহার নাম "সত্য।" অর্থাৎ, যদ্দ্বারা বর্ত্তমান ঘটনা সকল নির্ব্বর্ত্তিত হইতেছে, তাহার নাম "সত্য।" যে নিয়মের অধীন হইয়া সূর্য্য আজিও পূর্ব্ব দিকে উঠিতেছেন, বহ্নি আজিও উত্তাপ দিতেছেন, অঙ্কুর কেবল বীজ হইতেই জন্মিতেছে, তাহারা যেমন "ধাত", তেমনি আবার "সত্য"। ধাত ও সত্য সমানার্থক ;—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে একই ভাব প্রকাশ করে বলিয়া, ইহারা অনেক সময়ে যুগপৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। ধর্ম্ম। সংস্কৃতে "ধৃ" ও "ম্রি" বিপরীতার্থজ্ঞাপক দুইটি ধাতু। ধৃ=স্থিতৌ। ধ্রিয়তে, যাহা বাঁচিয়া আছে ; ম্রিয়তে, যাহা মরিতেছে। এই "ধৃ" ধাতু হইতে "ধর্ম্ম" পদ সিদ্ধ। পরিবর্ত্তমান সংসারে যাহা স্থায়ী, তাহার নাম "ধর্ম্ম।" সংসারে সকলই পরিবর্ত্তনশীল, স্থায়ী কেবল নিয়ম ; তাই তাহার বৈদিক পারিভাষিক নাম "ধর্ম্ম।" যাহা নশ্বর বর্ত্তমান ঘটনা সকলের পর ভবিষ্যতে স্থায়ী হইবে, তাহার নাম ধর্ম্ম।

সকল বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিতেই ব্রত শব্দে জগন্নির্ব্বাহক নিয়ম বুঝিয়া থাকেন। ইয়ু-রোপীয় বেদপাঠীগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ প্রশংসনীয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদক মার্টিন হোগ সাহেব তন্মধ্যে একজন। হোগ সাহেব ব্রত শব্দকে Laws of nature বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা প্রকৃত অনুবাদ।

আমাদের পাঠকবৃন্দ নূতন বর্ষাগমে পল্লীগ্রামে মণ্ডূকের শব্দ অবশ্যই শুনিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে বিল, খাল, পুষ্করিণী যখন নূতন জলে প্লাবিত হইতে থাকে, তখন অসংখ্য ভেকে যুগপৎও পর্য্যায়-ক্রমে শব্দ করিয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করে। বসিষ্ঠ ঋষি এই মণ্ডূকধ্বনিকে তাঁহার টোলের ছাত্রদের অধ্যয়নকালীন নির্ঘোষের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। এই উপমাটি বড়ই কৌতুককর। কুতূহলী পাঠক ঋগ্বেদের ৭।১০৩ সূক্ত দেখি-বেন। আমরা এই অতিবিচিত্র সূক্ত হইতে কেবল একটি ঋকের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিব। তাহা এই,—

যদেষাম্ অন্যো অন্যস্য বাচং শক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ।

এষাং মণ্ডূকানাং মধ্যে অন্যঃ মণ্ডূকঃ অন্যস্য মণ্ডূকস্য বাচং বদতি অনুবদতি অনুকরোতি। কথমিব? শক্তস্য ইব শক্তিমতঃ শিক্ষকস্য বাচং যথা শিক্ষমাণঃ শিষ্যঃ অনুবদতি॥

এ স্থলে শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। শক্তিমান অর্থাৎ শিক্ষাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে শিষ্যকে অধ্যাপক করাইতে সমর্থ শিক্ষকেরও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। শিক্ষাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে এইরূপ গুরুর মুখ হইতে পাঠ লওয়ারও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্রের সমকালীন বসিষ্ঠ ঋষির সময়ে "শিক্ষা" নামক বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রচলিত ছিল।

অধিকন্তু তৎকালে "কল্প" নামক বিদ্যারও যে অনুশীলন ছিল, তাহা ঋগ্বে-দের সহিত যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহাকেও বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক। তবে আমরা যে সূক্ত হইতে একটি ঋক্ এইমাত্র উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে অপর একটি ঋক্ এ স্থলে উদাহরণ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাহা এই,—

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচম্ অক্রযে ব্রহ্মকৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীনং।

অধ্বর্য্য বো ঘর্ম্মিণঃ সিষ্বিদানাঃ আবির্ভবংতি গুহ্যা ন কেচিৎ॥

এ স্থলে সোমযাজী ব্রাহ্মণগণের সংবৎসরব্যাপী সত্রের এবং প্রবর্গ্য [illegible]

অধ্বর্য্যুগণের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। ইহারই পূর্ব্বের ঋকে "ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে" ইত্যাদি বাক্যে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অতিরাত্রনামক সোমযাগের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। যে সময়ে যজ্ঞক্রিয়ার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব, যখন ব্রাহ্মণেরা সম্বৎসর ধরিয়া "সত্র" নামক যাগের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন যে "কল্প" নামক বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল না, এ কথা কোনও ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিতে পারে না। এক বৎসর ধরিয়া ষোড়শ সম্প্রদায় ঋত্বিকের দ্বারা যে সত্রের অনুষ্ঠান হইত, তাহা যে "কল্প" শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা বলা বাহুল্য।

পাঠকবৃন্দ যে কোনও কোনও আধুনিক ইংরেজী বিদ্যালঙ্কারদের মুখে শুনিতে পান যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে ব্রাহ্মণ ছিল না—যজ্ঞের আড়ম্বর ছিল না—প্রত্যেক House father (গৃহস্থ) আপন আপন গৃহে অতি সরল ভাবে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন, এক বাটী "সোম" সুরা বা এক চামচ ঘি আগুনে "স্বাহা" বলিয়া নিক্ষেপ করিয়া দিলেই তৎকালে যজ্ঞ হইয়া যাইত,—এ সকল কথা যে কত অলীক, তাহা উল্লিখিত উদাহরণে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। উহাতে আমরা "অধ্বর্য্যবঃ" = অধ্বর্য্যুগণের, অর্থাৎ বহুসংখ্যক অধ্বর্য্যুনামক ঋত্বিকের অস্তিত্বের পরিচয় পাই। তাহার পর স্বয়ং মধুচ্ছন্দা এক স্থানে বলিতেছেন—

> গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ অর্চ্চন্তি অর্কম্ অর্কিণঃ।
> ব্রহ্মাণস্ত্বা সতক্রতো উদ্বংশমিব যেমিরে॥

এ স্থলে গায়ত্রীগণ অর্থাৎ উদ্গাতাগণ, অর্কীগণ অর্থাৎ হোতাগণ, এবং ব্রহ্মাগণের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাতে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের "চত্বারস্ত্রিং পুরুষাঃ" নামক সূত্রের ষোড়শ সম্প্রদায়ের সমুদায় ঋত্বিকই যে মধুচ্ছন্দার সময়ে বিদ্যমান ছিল, তাহা সুস্পষ্ট। হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা নামক চারি সম্প্রদায় ঋত্বিক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন প্রধান এবং তিনজন সহকারী ঋত্বিক ছিলেন। ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মহাড়ম্বরে মধুচ্ছন্দার পিতার সময় হইতে নানাবিধ সোমযাগের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সমুদায় সোমযাগের মধ্যে "সত্র" নামক সোমযাগ "পরিবৎসরীন" ছিল, অর্থাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে এক বৎসর লাগিত। সোমযাগ সকল তৎকালে কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহা মধুচ্ছন্দাই বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—

> "যৎ সানোঃ সানুম্ আরুহৎ ভূরি অস্পষ্ট কর্ত্ত্বং।"

যজমানকে সোমযাগের জন্য "ভূরি" পরিমাণে ক্রিয়া করিতে হইত; ভূরি

আয়োজনের আবশ্যক ছিল। তখন যজ্ঞক্রিয়া আড়ম্বরের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছে বলিলেও বলা যায়।

এক্ষণে ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্রের বিষয় কিছু বলিব। যে ভাষায় ঋগ্বেদ রচিত, তাহা মধুচ্ছন্দার সময়ে চলিত ভাষা ছিল কি না, ইহার নিরূপণ করা কিছু কঠিন। আমার বিবেচনায়, বেদভাষা মধুচ্ছন্দাদির সময়ে প্রচলিত ভাষা ছিল না। সায়ণাচার্য্য-ধৃত এক "ব্রাহ্মণ" প্রমাণে শুনা যায়, "তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণা উভয়াং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যানামিতি।" ইহাতে অন্ততঃ বেদের ব্রাহ্মণভাগরচনাকালে বেদভাষা "দেবভাষা" মনুষ্যভাষা হইতে পৃথক বলিয়া পরিগণিত ছিল, দেখা যায়। ব্রাহ্মণেরা এই দেবভাষাতে এবং লৌকিক ভাষাতে, উভয়েই কথা কহিতেন, শুনা যায়। তাহার পর ঋগ্বেদে দীর্ঘতম ঋষির এক প্রসিদ্ধ মন্ত্রে দেখা যায়,—

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীনি নেহিতা নেংগয়ন্তি তুরীয়ং বাচঃ মনুষ্যা বদন্তি॥" ১।১৬৪।৪৫

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দীর্ঘতমার সময়ে ভাষা চারি প্রকার বলিয়া পরিগণিত ছিল। মনীষী ব্রাহ্মণেরা এই চারি প্রকার ভাষাই অবগত ছিলেন; কিন্তু ইহার মধ্যে তিন প্রকার ভাষা সাধারণ লোকে বুঝিত না, কেবল চতুর্থ প্রকার ভাষাই সচরাচর অশিক্ষিত লোকের বোধগম্য ছিল। এই চারি প্রকার ভাষা কি কি, তদ্বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন, সায়ণ তাহার অধিকাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাজ্ঞিকেরা ও নৈরুক্তেরা যে অর্থ বুঝিতেন, তাহাই আমার বিবেচনায় সমীচীন। যাজ্ঞিকেরা বলেন, মন্ত্রের ভাষা, কল্পের ভাষা, ব্রাহ্মণের ভাষা, এবং প্রচলিত লৌকিক ভাষা, এই চারি প্রকার। নৈরুক্তেরা বলেন, ঋক্, যজু ও সামের ভাষা তিন প্রকার, আর লৌকিক ভাষা চতুর্থ প্রকার। কল্প ও ব্রাহ্মণ বেদেরই অংশ বলিয়া পরিগণিত। কল্প সকল পরে সংগৃহীত হইয়া সূত্রের আকারে নিবদ্ধ হয়। যাজ্ঞিকদের অপেক্ষা নৈরুক্তদের ব্যাখ্যাই আমার অধিক প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে দীর্ঘতমার অর্থ এই যে, ঋকের ভাষা, যজুর ভাষা, এবং সামের ভাষা তদানীং সচরাচর লোকের বোধগম্য ছিল না। "গুহা ত্রীণি নিহিতা নেংগয়ন্তি" সাধারণ লোকের নিকট এই ত্রিবিধ ভাষাই অন্ধকারময় ছিল, কিন্তু মনীষী ব্রাহ্মণেরা যেমন লৌকিক ভাষা বুঝিতেন, তেমনি উক্ত ত্রিবিধ ভাষাও বুঝিতেন।

১০।৭১ সূক্ত)। বেদের ভাষা কিরূপ, তাহা উক্ত সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। বেদের ভাষা "সংস্কৃত" ভাষা। যেমন চালনার দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার (সংস্কার) করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমানেরা মনের দ্বারা সংস্কারসাধনানন্তর বেদভাষা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা বিদ্বানগণের "মনের দ্বারা নির্ম্মিত ভাষা।" ইহা রচনার ভাষা; ইহা সংস্কৃত, পূত। সচরাচর লোকে যে ভাষায় কথা কহে, তাহা অসংস্কৃত, অপূত। প্রথমোক্ত ভাষার রহস্য কেবল সখাগণ অর্থাৎ ঋষিগণ অবগত আছেন। ইহাতে ভদ্রা লক্ষ্মী অর্থাৎ গুপ্ত মঙ্গলময়ী শোভা নিহিত। প্রচলিত লৌকিক ভাষাতে সে শোভা নাই। যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যনির্ব্বাহের দ্বারা ঋষিরা ভাষায় এই অভিনব পদবী লাভ করিয়াছিলেন; সাধারণ লোকে ঋষিদের মুখেই সেই ভাষা শুনিতে পাইত। সেই ভাষায় রচিত মন্ত্র সকল সংগৃহীত হইয়া বহুসংখ্যক পরিষদে সংরক্ষিত ছিল। তাহার পর বলা হইতেছে,—

উতত্ব পশ্যম্ ন দদর্শ বাচম্ উতত্ব শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।

সাধারণ লোকে ইহা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনেন না; কেন না, ইহা অস্পষ্ট অপ্রচলিত ভাষা। ইহাতে সুস্পষ্ট জানা যায়, তদানীং লৌকিক ভাষা ও বেদভাষা বিভিন্ন ছিল। সাধারণ লোকে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা কিছুই বুঝিত না। ঋষিসমাজে সেই ভাষা বুঝিবার জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্র গঠিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, "বাগ্‌বৈপরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তাম্ ইন্দ্রঃ মধ্যতঃ অবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাক্ উদ্যাদ্যতে"।— অর্থাৎ, এক সময়ে বেদভাষা সমুদ্রের ধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট ছিল। পরে সেই ভাষার প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির বিশ্লেষণ সংসাধিত হইলে, তাহা "ব্যাকৃতা" ভাষা বলিয়া গণ্য হয়। এই মহৎ কার্য্য ইন্দ্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি "ব্যাকৃত" বাক্য ঋষিদের মুখে অভ্যুদিত হইতেছে।

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানা।"—ঋগ্বেদ; ১০।৭১ সূক্তে।

এই ঋকে যে "নামধেয়ং দধানাঃ" পদ আছে, আমার বিবেচনায় তাহার অর্থ— যাহারা "বস্তুর নাম নির্দ্দেশ করে—"অর্থাৎ প্রধানতঃ নৈরুক্তগণ। তাঁহারা এক বস্তুর যত প্রকার নাম, তাহা সংগ্রহ করেন।—মূলের তাৎপর্য্য এই যে, নিরুক্তের সাহায্যে বেদবাক্যের স্থূলার্থ অবগত হইয়াছি; এক্ষণে হে বৃহস্পতি, বেদভাষার মর্ম্মার্থ প্রকাশিত কর—ইহা অনুদ্ধৃত অপরাংশের অর্থ। ফলতঃ, "নামধেয়ং দধানাঃ শব্দে, এ স্থলে নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ, উভয়বিধ শিক্ষকেরই উল্লেখ পাওয়া যায়, বিবেচনা হয়। অতএব, আমার বিবেচনা হয়, মধুচ্ছন্দার

সময়ে ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্রেরও অনুশীলন ছিল। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সাহায্য ব্যতিরেকে, অপ্রচলিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষা তদানীং লোকে শিখিতে পারিত না।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

পরাগলী মহাভারত। (১)

হুসেন সাহার সেনাপতি পরাগল খাঁ অতি সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। হুসেন সাহা তাঁহাকে বিপুল বৈভবের অধীশ্বর করিয়া চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরাগল খাঁ ফেণী (২) নদীর তীরে তাঁহার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। পরাগলপুরে (৩) এখনও তাঁহার কীর্ত্তির স্বাক্ষী ভগ্ন ইষ্টকাবলী পড়িয়া আছে। বিখ্যাত পরাগলের দীঘির জল এখনও নির্ম্মল। যাঁহার আদেশে ঐ দীঘি খাত হয় ও যাঁহার নাম উহা এখনও ঘোষণা করিতেছে, তাঁহার হৃদয় উদার ও নির্ম্মল ছিল, তাঁহারই পুণ্যে অদ্য প্রায় ৪০০ বৎসর পরেও ঐ দীঘির জল পান করিয়া লোক পরিতৃপ্ত হইতেছে।

পরাগল খাঁ যখন চট্টগ্রামে আগমন করেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। তাঁহার গৃহ পুত্রপৌত্রে পরিপূর্ণ; অতুল বৈভব ও রাজসম্মানে তাঁহার জীবনের সায়ংকাল সমুজ্জ্বল। নব-অধিষ্ঠিত শৈলবেষ্টিত রাজ্যে, ঐহিক সমস্ত সুখের অধিকারী পরাগল খাঁ কি ভাবে জীবনযাপন করিতেন, পরাগলী মহাভারতে তাহার আভাষ আছে। তিনি অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রতিদিন অমৃতময় মহাভারতের প্রসঙ্গ শুনিতেন। আমরা ভাবি, ইংরাজী পড়িয়া আমরা উদার ভ্রাতৃভাব শিখিয়াছি; ইতিপূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানে অহিনকুল-সম্বন্ধ ছিল, মুসলমান খাদক ও হিন্দু খাদ্য ছিল। ইংরেজ-লিখিত ইতিহাস পড়িয়া আমরা আমাদিগের সুহৃদ্‌দিগের প্রতি সন্দিহ্ন ও অযথাবিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছি।

প্রায় ৪০০ বৎসরের কথা; তখন কাশীদাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহও জন্মগ্রহণ করেন নাই; সেই সময় পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইয়া-

(১) পরাগল খাঁর আদেশে অনুবাদিত মহাভারতকে পূর্ব্বে চট্টগ্রামের লোকগণ "পরাগলী মহাভারত" বলিয়াই আখ্যাত করিতেন, এখন আর সে দেশে উক্ত মহাভারত প্রচলিত নাই।

(২) ফেণীনদী—এই নদী নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার সীমান্তে। পূর্ব্বে এই নদীর নাম ছিল ফণী নদী, প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এই নদী ফণীনদী বলিয়াই উল্লিখিত দেখা যায়।

(৩) পরাগলপুর চট্টগ্রাম জোরারগঞ্জ থানার অন্তর্গত।

ছিল। অনুবাদ করিয়াছিলেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ। এই অনুবাদ জৈমিনির মহাভারত দৃষ্টে সংকলিত হইয়াছিল, এইরূপ উক্ত আছে। পরাগলী মহাভারতের ভাষা অতি প্রাচীন। আমরা যত পুস্তক পড়িয়াছি, তন্মধ্যে পরাগলী ভারতের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন ভাষার পুস্তক আর দেখি নাই। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বঙ্গীয় গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে,-কিন্তু চট্টগ্রামের পর্ব্বত-রক্ষিত ভাষায় প্রাকৃতের দুরূহতা বহুলপরিমাণে রহিয়া গিয়াছে, তাই ভাষার প্রাচীনত্বে এই পুস্তক এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কিন্তু পরাগলী মহাভারতের ভাষা প্রাচীন হইলেও প্রাঞ্জল। কবি যে ভাষায় কথা কহিতেন, পুস্তকে তাহারই ব্যবহার করিয়াছেন, কালাতিপাতে তাহা কঠিন হইয়াছে; তিনি মুখে বিদ্যুৎ বলিয়া লেখনী দ্বারা ইরম্মদের সৃষ্টি করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম, পরাগলী মহাভারতের ভাষা প্রাচীন হইয়াও প্রাঞ্জল ও সরস। এই গ্রন্থ প্রায় ১৫০০০ শ্লোকে পরিসমাপ্ত, মুদ্রিত কাশীদাসের মহা-ভারতের শ্লোকসংখ্যা ৩৭০০০।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর স্বীয় পুস্তকের পত্রে পত্রে তাঁহার অনুগ্রাহক পরাগল খাঁর স্তুতির জন্য দুইটি করিয়া সুমিষ্ট পদ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃতজ্ঞ হৃদয় মুসলমান প্রভুর গুণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল; ইহা বঙ্গদেশে নূতন কথা নহে। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে হুসেন সাহের স্তুতি করা হইয়াছে, (৪) চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য প্রভুর মহিমা ও গৌরব স্বীকার করিতেন বলিয়া হুসেন সাহার প্রশংসা কীর্ত্তিত আছে। বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে হুসেন সাহ ও তৎপুত্র নছরত জঙ্গের প্রশংসাসূচক পদ আছে। রাজভক্তি হিন্দুর মত আর কোনও জাতির নাই, হিন্দুর মত উদার আর কোনও জাতি নহে, এ দেশে যে রাজা প্রজার বিরাগভাজন, অন্য দেশে প্রজার লোষ্ট্রক্ষেপে সে রাজার মৃত্যু অবধারিত।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বর্ণিত বিবরণে আমরা জানিতে পাই, পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁন, তাঁহার পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, উহাতে আর দুইটি আব-শ্যক কথা আছে। ১ম, পরাগল খাঁর খুল্লতাত নসরত খাঁনের আদেশে একবার "ভারতপাঞ্চালী" রচিত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বর্ণিত মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী। ২য়, পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁন অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

(৪) ছায়া শূন্য রবি শশী পরিমিত শক,
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।—বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

শেষোক্ত কথাটি আমরা কেন মূল্যবান বিবেচনা করিলাম, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। আমরা একখানা প্রাচীন মহাভারতের কিঞ্চিৎ অংশ পাইয়াছি, তাহা শ্রীসুরনন্দী প্রণীত। এই সুরনন্দী লিখিতেছেন, পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁনের আদেশে তিনি মহাভারত রচনা করিলেন। সুতরাং পুরুষানুক্রমে এই উদারচেতা মুসলমান জমীদারগণ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গে মুসলমানদের সর্ব্বদা বৈরিতা ছিল না, এই বৈরিতার সৃজন করা যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা আপনাদের কুটনীতিতে আপনারা আবদ্ধ হইবে।

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আমার পিতৃতুল্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় আমাকে যে সব উপকরণ দিয়াছেন, তাহা অতি অভিনব পদার্থ। তাহার প্রসঙ্গ এখানে সমস্ত লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস অতি প্রাচীন লেখক; "বঙ্গবাসী" তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসীতে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কিছু বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার বংশাবলী পাইয়াছিলাম, ও সময়-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে যদি কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করিয়া থাকেন, তবে তাহার ২৫০ বৎসর পরে, (কারণ, কাশীদাস ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রচনা করেন) মহাভারতের প্রথম অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ আমরা দেখাইয়াছি, পরাগল খাঁর মহাভারত প্রায় ৪০০ বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা উচিত। চট্টগ্রামস্থ মুসলমান জমীদার মহাভারত শুনিতে উৎ-সুক হইয়া তাহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন, আর সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুর অধিষ্ঠানক্ষেত্রে কি তখন মহাভারতের অন্য কোনও অনুবাদ প্রচ-লিত ছিল না? এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে সময় কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন, প্রায় সেই সময় অপর এক ব্যক্তি সম্ভবতঃ মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কাশীদাস তাঁহারই রচনা হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আঁধারে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। নিমতা-নিবাসী কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর ও রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর কে পড়ে? ভারতচন্দ্র পরস্ব গ্রহণ করিয়াও কবিচূড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর-রচকগণ,—যাঁহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তিনি যশের অমৃত ফল আহরণ করিতেছেন,—তাঁহারা কেবল ভারবহনের জন্যই এ সংসারে আসিয়াছিলেন। কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত-রচকেরও সেই অবস্থা। ইহা আমাদের শুধু অনুমান-গড়া কথা নহে। আমরা বোধ করি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনকে পাইয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বে সমস্ত বিষয়ে নিরাপদ স্থানে না

দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আলোকে আনিতে সাহসী নহি। আর এক কথা, পরাগলী মহাভারতের অনেক স্থান কাশীদাসী মহাভারতের মত। যে পুস্তক আমরা পাইয়াছি, তাহার হস্তলিপিই কাশীদাসের প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং কাশীদাসের পদ তাহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, কাশীদাস পশ্চিম বঙ্গের বিহঙ্গ হইয়া যে চট্টগ্রামের জঙ্গল হইতে মহাভারতের ভাষা চুরি করিতে আসিবেন, এ কথায়ও সহজে প্রতীতি জন্মে না। বোধ হয়, সেই লুপ্ত মহাজনের গৌরব উভয় লেখকই অপহরণ করিয়াছেন, তাই এই সাদৃশ্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বঙ্কিম বাবুর কবিতা।

এই কবিতাটি হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় বঙ্কিম বাবু রচনা করিয়াছিলেন। ইহা আমি আমার পিতৃদেব ৺ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তলিখিত নোট-বুকে পাইয়াছি। ৩৫।৪০ বৎসর হইল, তিনি কলিকাতায় অবস্থানকালে এই নোট বুক লিখিয়াছিলেন; ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি সেই সময়ের প্রসিদ্ধ কবিদিগের অনেকগুলি কবিতা উদ্ধৃত আছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি প্রভাকর অথবা সাময়িক অন্য কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানি না। ইহা বঙ্কিম বাবুর বাল্যকালের রচনা। তাঁহার প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যের এক নব উৎস ঢালিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই কবিতায় সেই প্রতিভা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের অনুসৃত পথে সীমাবদ্ধ। যাঁহারা "সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং" কি "মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী, মালতী মঞ্জুল মালা" প্রভৃতি মধুবর্ষী পদের কর্ত্তা, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁহাদেরই শিষ্য।—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বর্ষার মানভঞ্জন।

নায়কের উক্তি।

ত্রিপদী।

বিধুমুখি করে মান, কিরূপ দেখালে প্রাণ
হেরিতেছি অপরূপ ভাব
বরষার আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে
রহিয়াছে সকল স্বভাব।
বন উপবন চয়, রসময় সমুদয়
রসপূর্ণ যত জীবগণ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব
কেন প্রিয়ে বিরস বদন।

বুঝেছি কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার
বরষাকালেতে সব করে;
সুধাকর এই কালে, জড়িত জলদ জালে
স্বভাবে মলিন ভাব ধরে।
গগনের শশধরে, যদি এই ভাব ধরে
শোভাহীন হয়ে সদা রয়;
তব মুখচন্দ্র তবে, কেন বল নাহি হবে
সেরূপ বিরূপ অতিশয়।

আকাশেতে জলধর, মনোহর নিশাকর
ঢাকি আছে দিবস যামিনী;
কেন না তোমার তবে, শশীমুখ ঢাকা রবে
অম্বর অম্বরে বিনোদিনী।
মান ভাঙ্গিবার তরে, ধরিলাম তুই করে
মুখ-পদ্মে কর-পদ্ম দিলে;
বুঝি এই ভাব তার, আগমনে বরষার
কমলিনী মুদিতা সলিলে।
এ কালের প্রতিকূল, কাননে কোকিলকুল
কুহু কুহু কাকলি না করে।
কোকিল বাদিনী বুঝি, তাই আছ মুখ বুজি
মৌনবতী বরষার ডরে।
গগনের যত তারা, বরষা কালেতে তারা
সদা কাল নহে প্রকটিত;
তাই বুঝি জ্যোতিহারা, তোমার নয়ন-তারা
অভিমানে রোয়েছে মুদিত।
বরষার অনুক্ষণ, বারি ধারা বরিষণ
ধারে ধারে ধরা পূর্ণ তায়;
তাই বুঝি নিরন্তর, তব নেত্র-নীরধর
নীর-ধারে ফেলিছে ধরায়।

নায়িকার উক্তি।

পয়ার।

শুনিয়া শেষের শ্লেষ কুপিল কামিনী,
বিধুমুখে মৃদু রবে কহিল মানিনী।
বরষার ধর্ম্ম যদি বারি বরিষণ,
তবে কেন বলহীন তোমার নয়ন।
দুঃখিনীর দুখতাপে হইয়া সদয়,
তোমার নয়নে কেন বৃষ্টি নাহি হয়।

নায়কের উক্তি।

ত্রিপদী।

চেও না চেও না আর, অধীনের অশ্রু ধার
এক বিন্দু নাহি প্রাণধন,
তোমার মিলন ছেদে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া খেদে
নীর-হীন করেছি নয়ন।
নাহি আর জলধার, কোথা বল পাব ধার
প্রেমাধার, ধার বটে ধারি;
প্রাণের সম্বল বল, দুই এক ফোঁটা জল

যে হেতু যখন পুনঃ, তোমার নয়নাগুণ
করিবেক দহন আমারে;
নিবারিতে সে অনল, তখন না পেলে জল
প্রাণান্ত হইবে একেবারে।

পয়ার।

শুনিয়া শুনিল না ভামিনী কামিনী,
পূর্ব্ববৎ মৌনভাব রহিল মানিনী।
ঘোমটা টানিয়া দিল মুখের উপরে,
বারিদে বসনে বিধু আচ্ছাদন ক'রে।

নায়কের পুনরুক্তি।

ত্রিপদী।

থাক থাক মানে থাক, বদনে বসন রাখ
ঢাক ঢাক শশী ঢাক মেঘে,
দীর্ঘশ্বাস বায়ু মোর, এখনি করিয়া জোর
জলদে উড়াবে অতি বেগে।

পয়ার।

তবু না কহিল কথা মানিনী রমণী,
হাসিয়া কহিছে শুন কান্ত গুণমণি।

ত্রিপদী।

একি বিপরীত ভাব, হোলে বর্ষা আবির্ভাব
সতত চপলা চমকায়,
তোমার অধরে আর, হাস্যাকার চপলার
চমক নাহিক হায় হায়।

পয়ার।

দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাধে,
ফলতঃ বাহিরে সেটা সাধে বাদ সাধে।
পরে নিজ গাঢ় মান জানাবার তরে,
ঘর ছেড়ে ছলেতে বাহিরে যাত্রা করে।
মধুভাষে বঁধু কহে কি কর ললনা,
যেও না যেও না ধনি, বাহিরে যেও না।

ত্রিপদী।

প্রণয়িনী মান পালা, ঘোর কাল মেঘমালা
ঝালাপালা করিল আমারে;
শত ফিরে ফিরে চাও, মাথা খাও ঘরে যাও
দোহাই দোহাই বারে বারে।
দুরন্ত অবোধ মন, ঢাকিতেছে ঘন ঘন
গগন শোভন শশধরে;
কি জানি যদ্যপি পুন, প্রকাশিয়া নিজগুণ

তাহা হ'লে আর প্রাণ, আমার চকোর প্রাণ
রহিবে না শরীর-পিঞ্জরে ;
তাই বলি প্রাণপ্রিয়ে, বাঁচাও ঘরেতে গিয়ে
এসো এসো ধরি দুই করে।

পয়ার।

নিবিড় নীরদ নব নিরখি নয়নে,
বাহিরেতে গিয়া ধনি ভাবিতেছে মনে।
ঘন ঘন ঘননাদ, গভীরা যামিনী,
পলকে পলকে তার নলকে দামিনী।
মানে মানে মান হরি মানিনী ভামিনী,
গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্রগামিনী।
মানের নিগূঢ় ভাব শেষে গেল বোঝা,
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

ইতিহাস।

স্বর্গীয় বিষ্ণু শাস্ত্রী মহোদয় "নিবন্ধমালার" ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় ইতিহাস সম্বন্ধে যে অতি-বিস্তৃত চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে (তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে) স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পুস্তিকার শেষে শাস্ত্রী মহোদয়ের একটি চিত্র ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। জীবনীলেখকের মতে,—This worthy Indian citizen displayed an enterprise and energy in the pursuit of benevolent aims which is nowhere too common, and is especially valuable in India, where the people are rather wont to lean upon the Government for every improvement. * * * He deserves a hearty recognition as one of those pioneers of progress who, if they become numerous enough, will some day make India a self-governing community." দুই তিন বৎসর হইল, মারাঠী ভাষায় তাঁহার এক স্বতন্ত্র বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহোদয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্থাপনের জন্য সংগঠিত সমিতি দ্বারা বহুদিন হইতে অর্থসংগ্রহ হইতেছিল। এতদিন পরে তাঁহাদের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মাননীয় মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে প্রভৃতি দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুণা নগরীতে "মহারাষ্ট্র-সরস্বতী-মন্দির" নামক এক পাঠাগার স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই সরস্বতী-মন্দিরে সর্ব্বপ্রকার মহারাষ্ট্রীয় পুস্তক সংগৃহীত হইবে। সমিতির চেষ্টা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে, আশা করা যায়। যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

লেখক, প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ইতিহাস-শব্দের বুৎপত্তি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলেন,—

ইতিহাসের বুৎপত্তি।

"ইতি—হ—আস" এই পদত্রয়ের সংযোগে "ইতিহাস" শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। "ইতি"—এই ; "আস"—হইয়াছিল ; "হ"—একটি অব্যয় ;—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এতাবতা ইতিহাস শব্দের ধাত্বর্থ,—"পুরাকালে সংঘটিত ঘটনাবলী।" কিন্তু এই শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক অর্থের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অর্থ—যুক্তি-মূলক প্রামাণিক ইতিহাস। প্রাচীন কালে পৌরাণিক উপকথা অর্থাৎ পুরাণাদিতে প্রসঙ্গক্রমে কীর্ত্তিত প্রাচীন উপাখ্যানাবলী বুঝাইবার জন্য 'ইতিহাস' শব্দ ব্যবহৃত হইত, দৃষ্ট হয়।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি জ্ঞানগৌরবে জগতের তদানীন্তন প্রাচীন জাতিসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদের ইতিহাসরচনায় অনভিজ্ঞতা ও অপ্রবৃত্তি, বস্তুতই অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। লেখক বলেন,—

"বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দুগণের ইতিহাসরচনায় অপ্রবৃত্তির কয়েকটি বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিরূপ অবস্থায় ইতিহাসের উৎপত্তি সম্ভবে, এ কথার বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যখন রাজ্যমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি মহাবিপ্লবকর ব্যাপারসমূহ সংঘটিত হয়, তখনই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে সাধারণতঃ লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। গ্রীক, রোমান ও ইংরাজগণের ন্যায় মুসলমান, মোগল ও মারাঠাগণের মধ্যেও এইরূপ অবস্থাতেই ইতিহাসরচনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। (১) প্রাচীন হিন্দুগণকে কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে হয় নাই বলিয়াই, তাঁহাদের মধ্যে ইতিহাসগ্রন্থের এতাদৃশ অভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যে ভূখণ্ডে বাস করিতেন, তাহার চতুঃসীমা প্রায় সর্ব্বপ্রকারে অলঙ্ঘ্য ছিল। এই নিমিত্ত প্রাচীন চীনবাসীগণের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও স্বস্থানে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান প্রভৃতি জাতিগণকে যেরূপ তাহাদের প্রতিবেশীগণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে কখনও তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইতে হয় নাই। তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে কখনও যুদ্ধবিবাদাদি না হইত, তাহা নহে। কিন্তু সে সকল ঘটনা, বোধ হয়, কখনই এরূপ গুরুতর ছিল না, যাহা ইতিহাসরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির বর্ণনাপাঠে অনুমিত হয় যে, তদানীন্তন অধিকাংশ নরপতিই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অধীনস্থ প্রদেশাদি শাসন করিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ভূপালবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পদানত করিয়া কেহ সার্ব্বভৌমত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না। (২) অতএব ইতিহাসরচনার উপাদানভূত যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিপ্লবাদি ঘটনার অভাব, হিন্দুগণের ইতিহাসরচনায় প্রবৃত্তি না জন্মিবার এক প্রধান কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের অভাব কেন?

প্রথম কারণ।

"হিন্দুগণের মধ্যে ইতিহাসের অভাবের দ্বিতীয় কারণ এই যে, হিন্দুগণের মন স্বভাবতঃ নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী। সমগ্র জগৎ ও জাগতিক ঘটনাসমূহ সর্ব্বদা যাঁহাদের চক্ষে ক্ষণিক মায়াময় ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, পরমার্থের প্রতি যাঁহাদের আসক্তি অত্যন্ত অধিক, তাঁহাদের নিকট রক্তপাত ও রাজ্যবিপ্লবাদির বর্ণনা দ্বারা নরস্তুতি গান করা যে বিরক্তিকর ও উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

দ্বিতীয় কারণ।

---

(১) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের দাক্ষিণাত্যের আধিপত্য লইয়া যখন হইতে বিবাদের সূত্রপাত হয়, সেই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ জাতীয় ইতিহাসের (বখর) রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের অবস্থাজ্ঞাপক কোনও ইতিহাস (বখর) মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রচিত দৃষ্ট হয় না।—অনুবাদক।

(২) যে দুই এক জন নরপতি এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আংশিক (যেহেতু ধর্ম্মেতিহাসবর্ণনই পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য) বিবরণ পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সামাজিক বিপ্লবের বিবরণও পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ফলকথা, বোধ হয় এরূপ ঘটনা তৎকালে অতি বিরল ছিল বলিয়াই সে কালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ধারাবাহিক

তার পর লেখক রাজতরঙ্গিনীর উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমাদের দেশে ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি ও প্রথা একবারেই ছিল না, এমন নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি ইতিহাস দেখিয়াছিলাম; মনে পড়িতেছে, তাহাতে বঙ্গদেশীয় মোগল নরপতিগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। 'কাশীরাজ' নামক জনৈক পণ্ডিত নবাবের অনুমতিক্রমে পানিপথের শেষ যুদ্ধের বিবরণ ফারসী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কাশীরাজ পণ্ডিতের ইতিহাসরচনার উপযুক্ত শক্তি, ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়াই নবাব অপর কোনও মুন্সীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।" লেখক অনুমান করেন, (আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ তাদৃশ প্রবল না হইলেও) এরূপ গ্রন্থ আমাদের মধ্যে নিতান্ত অল্প ছিল না; বোধ হয়, কালক্রমে সে সকলের লোপ হইয়াছে।

ইতিহাসও ছিল।

ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক অতি বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তাঁহার বহুদর্শিতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানাভাবে এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তদীয় আলোচনার স্থূলমর্ম্ম প্রকাশিত করিলাম। যথা,—

"ইতিহাসপাঠের প্রথম ফল জিজ্ঞাসাতৃপ্তি; ২য় ফল, সদুপদেশ; ৩য়, চিত্তের উদারতা ও শান্তি; ৪র্থ, মনোরঞ্জন; ৫ম, রাজনীতিসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা; ৬ষ্ঠ, স্মৃতি, চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক শক্তিনিচয়ের উন্মেষ ও পুষ্টিবর্দ্ধন। ইতিহাস প্রাচীন মহাপুরুষগণের বিবরণ সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুকরণে স্বদেশের ও সমাজের উপকারসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে সাধারণকে উৎসাহিত ও পাপপুণ্যের ফলাফল প্রদর্শন পূর্ব্বক সৎপথে পরিচালিত করে। হোমার যদি অ্যাকিলিসের বীরত্ববর্ণনা না করিতেন, তাহা হইলে সেকন্দর সাহার আবির্ভাব সম্ভব হইত কি? সেকন্দরের ইতিহাস পাঠ না করিলে সীজার খ্যাতিলাভের উপযুক্ত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ব্যাস যদি পাণ্ডবগণের জীবনী লিপিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে মহাত্মা শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়া যবনগণের হস্ত হইতে রাজশ্রী পুনরুদ্ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেন কি? ফলকথা, ইতিহাস থাকিলে, দেশের অবস্থা যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, উহা পাঠ করিয়া বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনেরও লোকহিতকর কার্য্যসাধনে উৎসাহ হওয়া সম্ভব। অধিকন্তু কিরূপ অবস্থায়, কিরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল কীদৃশ হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিলে মনুষ্যসমাজ সংসারপথে সাবধান হইতে ও সুখলাভ করিতে পারে। গ্রীক, রোম, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক রাজ্যসমূহের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বেরও প্রধান কারণ,—ইতিহাসের আলোচনা। ইতিহাসের আর এক উপকারিতা এই যে, ইহা পাঠে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, রাজ্যশাসনপ্রণালী, জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে ও তদ্দ্বারা কুসংস্কার ও বৃথাহঙ্কার দূরীভূত এবং দূরদর্শিতা ও সত্যাসত্যনির্ব্বাচনশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইতিহাস এইরূপে আমাদের নানাপ্রকার উন্নতির কারণ হইলেও, অনেকে ইহার আবশ্যকতা বুঝিতে অসমর্থ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাঃ জনসনের ন্যায় সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণও ইতিহাস, বিশেষতঃ প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা ও তিরস্কারবুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া, স্ব স্ব স্থূলবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

ইতিহাসপাঠের ফল।

গণের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, ভারতবাসীমাত্রই দুর্নীতিপরায়ণ, অসভ্য, মূর্খ, ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে অস্মদ্দেশীয় স্বাধীনচিন্তা-শক্তিশূন্য কতিপয় নবশিক্ষিত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিও সেই সকল গ্রন্থকারদের অলীক উক্তি পাঠ করিয়া স্বদেশবাসীগণকে অতিশয় কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করেন! মিশনরীগণের ত কথাই নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে একপ্রকার "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়াই মনে করেন। এই মিশনরীগণের কল্যাণে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ স্বদেশে ও বিদেশে, উভয়ত্রই সমানরূপে বিড়ম্বিত। লেখক বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় পাদকে "মিশনরীযুগ" নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং বিশিষ্ট দক্ষতাসহকারে তাঁহাদের ও মেকলে, মিল প্রভৃতির মতের তীব্র সমালোচনা ও যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষার যে তেজস্বিতা, যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রসরসিকতা, সসার উক্তি ও অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল মূল প্রবন্ধেই অনুভবনীয়,—তাহার অনুবাদ বা সারসংকলন অসম্ভব।

ভারতবাসী সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের মত।

মেকলে ও মিলের ন্যায় ভারতবিদ্বেষী লেখক আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতের প্রশংসনীয় বিষয়গুলিও তাঁহাদের নিকট নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইত। তাঁহারা ভারতবাসীকে সুসভ্য ইউরোপীয়গণের সহিত কথা কহিবারও অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিজ্ঞবর স্যার জন মালকম সাহেব এই মতের বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যে ভারতবর্ষ রত্নপ্রসূ বলিয়া চিরকাল বিখ্যাত, যাহার অতুলনীয় ধনসম্পত্তি তাহার বর্ত্তমান পরাধীনতার প্রধান কারণস্বরূপ, যাহার সম্পত্তি লইয়া ইংলণ্ড আজ ইয়ুরোপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধনশালী রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই ভারতের দরিদ্র্যসম্বন্ধে মেকলে বলিয়াছেন,—The most absurd notions were then entertained in England regarding the wealth of India. * * Nobody seemed aware of what was nevertheless most undoubtedly the truth, that India was a poorer country than countries which in Europe are reckoned poor, than Ireland for example or than portugal."—*Warren Hastings.*

মেকলে ও ভারতের দারিদ্র্য।

এখানে সাহেব মহোদয় স্বীয় সত্যপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন!

"দেখা যায়, জেমস্ মিল প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুগণের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য লেখনী চালিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ হইতে স্বীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থে ভারতবাসীর যে সকল প্রশংসার কথা আছে, সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের অগৌরবের কথাগুলি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া তিনি স্বীয় ইতিহাসের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন (৩)। এমন কি, আগ্রার তাজমহল, ঢাকার মলমল, কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তল" ও বেঙ্গলের বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দিরসমূহও সাহেব মহোদয়ের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই! এই সকল মন্দির সম্বন্ধে তিনি অতি অদ্ভুত বিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট গুহামন্দিরগুলি হিন্দুগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে; এগুলি সম্ভবতঃ ভূগর্ভ হইতে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়াছে!! পাঠক! বিলাতী কল্পনার দৌড়টা কত দূর দেখিলেন ত? এই

মিলের ইতিহাসে ভারতবিদ্বেষ।

(৩) মিল এক স্থলে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ জয় করিয়া ইংলণ্ডের কিছুমাত্র লাভ হয় নাই; বরং ক্ষতিই হইয়াছে! তাঁহার ইতিহাসের প্রকাশক উইলসন সাহেব এই উক্তির সম-

পাঠ করিয়া ভারতের সম্বন্ধে জগতের কিরূপ ধারণা জন্মিবে, তাহা
।"

পেক্ষাও অধিকতর মূর্খতাপরিচায়ক ও লজ্জাকর বিষয় এই যে, যে ভারতের
গণের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেরও
অতি অল্প। * * * * উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি সর্ব্বত্রপ্রচলিত "মরিস" সাহেবের
বর্ষের ইতিহাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ইতিহাসে আর্য্যগণের ভারতে আগ-
কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১৭৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত কালের ইতিবৃত্ত, ৩০।৩৫ পৃষ্ঠার মধ্যে
বর্ণিত হইয়া অবশিষ্ট সমগ্র গ্রন্থখানি ইংরাজগণের বিবরণে, বিশেষতঃ মেজর লরেন্স, কর্ণেল ম্যান্-
সন্ প্রভৃতি মহাশৌর্য্যশালী বীরপুরুষগণের স্তুতিগানে পরিপূরিত হইয়াছে! এই গ্রন্থে পেশ-
ওয়েগণের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই! যে সকল মুসলমান রাজবংশ ভারতবর্ষে বহুকাল
রাজত্ব করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রাজবংশের বিবরণ ২।৪ পংক্তিতে ও আকবরের
৫০ বৎসরের ইতিহাস এক পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আমাদের শিবাজীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছে,
তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শিবাজীকে প্রথমেই দস্যুরূপে পাঠক-
গণের সমক্ষে উপস্থাপিত ও কেবলমাত্র তৎকৃত প্রসিদ্ধ হত্যাকাণ্ডটি
(আফজুল খাঁর হত্যা) বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং
যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা কল্পনাবলে বুঝিয়া লইবার ভার পাঠক-
গণের উপরেই সমর্পিত হইয়াছে! এইরূপে ২।৩ পৃষ্ঠার মধ্যে মহারাষ্ট্র-রাজ্যসংস্থাপকের যে
ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাও শত শত ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। এই সুবিজ্ঞ ইতিহাস-
লেখক শিবাজীর রাজ্যাভিষেক দশ বৎসর পূর্ব্বে টানিয়া আনিয়াছেন, এবং আফজুল খাঁকে
তিন বৎসর বিলম্বে নিহত করাইয়াছেন। শিবাজীর জীবদ্দশাতেই তৎপুত্র সম্ভাজীর মৃত্যু
প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন! * * * 'পেনী সাইক্লোপীডিয়া' নামক সর্ব্বসংগ্রহরূপ গ্রন্থে
মারাঠাগণের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আরও অদ্ভুত! তাহাতে লিখিত আছে,—
বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র 'বালাজী বাজীরাও'! মাধবরাও নারায়ণের প্রকৃত নাম শিবাজী-
মাধব রাও!! এবং তাঁহার পুত্র সর্ব্বশেষ পেশওয়া বাজীরাও!!! (৪) ফলকথা, আমাদের
দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য এখনও ইংরাজগণ উৎসুক নহেন। গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব
প্রণীত ইতিহাসের প্রারম্ভে প্রকাশিত একটি পত্রে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যাইবে।"

ইংরেজের রচিত ভারত-ইতিহাসে মিথ্যার আধিক্য।

উপসংহারে শাস্ত্রী মহোদয় স্বদেশীয় ইতিহাসালোচনায় আমাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ
করিয়া বলিয়াছেন,—

"আমাদের দেশের ইতিহাস মনোরঞ্জকত্বে অন্য কোনও দেশের ইতিহাস অপেক্ষা কোনও
অংশে ন্যূন নহে। বৈদেশিকগণের লিখিত ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের বিবরণ
ব্যতীত, আমাদের (মহারাষ্ট্রজাতির) শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থাদি সম্বন্ধে
কিছুই বর্ণিত থাকে না। সাধারণের পাঠোপযোগী মনোরঞ্জক ইতিহাসের অভাবও ইতি-
হাসের প্রতি সাধারণের অনাস্থার এক প্রধান কারণ। গ্রাণ্ট ডফ্
ও মালকম্ প্রণীত ইতিহাস বিশেষ যত্নপূর্ব্বক লিখিত হইলেও
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। অতএব আমরা স্বয়ং আমাদের স্বদেশের ইতিহাস
না লিখিলে সে অভাব দূরীভূত হইবে না। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাচীন দেশীয়

স্বদেশীয় ইতিহাসের প্রয়োজন।

(৪) ইঁহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ এইরূপ,—"বালাজী বাজীরাও" বালাজী বিশ্বনাথের পৌত্র।
মাধবরাও নারায়ণ সাধারণতঃ "সওয়াই মাধবরাও" নামে অভিহিত হইতেন। ইনি অপুত্রক
অবস্থায় আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন।

রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে এবং সেই সঙ্গে আমাদের অল্পকালমৃত পরাক্রমশালী পূর্ব্বজগণের কীর্ত্তি তাঁহাদিগের সেবা ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়ে না করিলে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত ও পূর্ব্বপুরুষগণের ঋণ পরিশোধিত হইবে তাঁহাদের কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও, উহা বি... দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে। ইংলণ্ডাদি দেশের "Pictorial Hand-book of Lo... প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় ঐতিহাসিক পুস্তকাবলী রচনার উপাদান, আমাদের দেশে এখনও ... পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বীরপুরুষগণের বংশধরদিগের নিকট এখনও নানাবি... ঐতিহাসিক কাগজপত্র অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের বন্ধু "বিবিধজ্ঞানবিস্তার" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক এই সমস্ত প্রাচীন কাগজপত্র প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া, কতিপয় বখর ও পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণের উৎসাহের অভাবে তিনি স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, এতদ্ব্যতীত, প্রাচীন কালের বিবরণপূর্ণ প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থসমূহ হইতেও মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাৎকালিক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিহাস অনেক পরিমাণে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি এখন আর তাদৃশ প্রচলিত দেখা যায় না। ইঁহারা মহাজ্ঞানী মেকলের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ পূর্ব্বক এ দেশে আগমন করেন নাই। এই নিমিত্ত ইঁহারা স্বয়ং যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই নিরপেক্ষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এবং এই নিমিত্তই ইঁহাদের গ্রন্থে ভারতবাসীর প্রশংসার কথা অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয়, বোম্বাইয়ের রেকর্ডার স্যার জেম্‌স্ ম্যাকিংট্যাশ্ ইহাঁদিগকে 'Bramhanised Europeans' নামে অভিহিত করিয়াছেন! আমাদের দেশের প্রাচীনেরা বলেন, ইহাঁরা অতিশয় অমায়িক, দয়ালু ও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন। ম্যালকম্ স্কট্ ও মেডোজ্ টেলার প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতবর্ষের ইতিহাস অপক্ষপাতিতার সহিত সঙ্কলন করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আজকালকার ২।১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসেও এইরূপ পক্ষপাতশূন্যতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে বোধ হইতেছে যে, ভারত সম্বন্ধে য়ুরোপীয় লেখকদিগের পূর্ব্বের অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ সত্য জ্ঞানের উদয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

দেশীয় ইতিহাসের উপকরণ এখনও প্রাপ্তব্য।

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক জগতে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহম্মদীয় নরক।

১

শৈশবকালে জ্ঞানের উন্মেষ হইবার সময় হইতেই আমরা ঠাকুরমার উপকথায় নরকের সহিত প্রথম পরিচিত হই, এবং এই অপার্থিব জগতের বিভীষিকাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের রোমাঞ্চকর কল্পনায় আমাদের সেই সদানন্দময়, নির্ভীক, বিধাতার পুণ্য আশীর্ব্বাদবেষ্টিত কোমল শিশুহৃদয়ে নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়।

ক্রমে জ্ঞানের পরিসরবৃদ্ধির সহিত আমরা রামায়ণ মহাভারতে, কাব্য উপন্যাসে নরকের উজ্জ্বল ছবি চিত্রিত দেখি, এবং হিন্দু নরকের বর্ণনায় যখন আমরা অভ্যস্ত হইয়া যাই, তখন খৃষ্টানের নরক আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমরা য়ুনানীর অন্ধকবি মিল্টনের বর্ণিত, বহুযোজনবিস্তৃত, অন্ধকারময়, কিন্তু দৃশ্যমান গন্ধকাগ্নিতে কর্দ্দমিত, নিরাশার চিরবিরাজ-ক্ষেত্র অনন্ত নরকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভীত হই, স্তম্ভিত হইয়া যাই। কিন্তু এখানেই শেষ নহে; ইহার উপর দান্তের প্রখর কল্পনা শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ মাত্রায় আলোড়িত করিয়া তুলে। অতএব, নরক ইহলোকের পরপ্রান্তে অবস্থিত হইলেও, ইহলোকে আমরা তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষিত পাঠকমণ্ডলী এই সকল নরকযন্ত্রণাতে অস্থির, তাহার পর আজ আবার মহম্মদীয় নরকের চিত্র তাঁহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিতেছি, এ অপরাধ হয় ত অমার্জ্জনীয়; কিন্তু আশা আছে, যাঁহারা পুণ্যাত্মা, পরলোকে তাঁহাদিগকে কখন এ দৃশ্য দর্শন করিতে হইবে না, সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু সংবাদ জানিতে পারিলে তাঁহাদের কৌতূহলবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু লেখকের ন্যায় যাঁহাদের স্বর্গগমনের সম্ভাবনা অল্প, (যদি এমন কেহ থাকেন) তাঁহাদের এই নরকের পরিচয় জানিয়া রাখা নিতান্ত অন্যায় নহে। কারণ, যদি সত্যসত্যই মুসলমানের একটা স্বতন্ত্র নরক থাকে ও কাহারও তাহাতে পদার্পণ করা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে পথঘাট কতক কতক জানিয়া রাখা ভাল।

কোরাণের মতে অবিশ্বাসীগণের জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে-সকল সনাতন মোল্লা মৌলবী মহাশয়েরা উক্ত পবিত্র গ্রন্থের এবং মহম্মদের উক্তির টীকাটিপ্পনী ও ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, মানুষের মৃত্যুর পর তাহার প্রতি "সওয়াল কবর" হয়; "সওয়াল কবরের" অর্থ "সমাধিমধ্যে প্রশ্ন"। মৃতব্যক্তি সমাহিত হইবামাত্র, দুই জন যমদূত সেই সমাধিমধ্যে প্রবেশ করে; এই দুই জনের সাধারণ নাম "ফতানান্" অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তা; কিন্তু ইহাদের স্বতন্ত্র নাম আছে; একজনের নাম "মুনকর," অন্যের নাম "নকির।" এই যমদূতদ্বয় বিকটাকৃতি, ভীষণদর্শন, নীলনেত্র ও কৃষ্ণকায়; ইহাদের নাম উচ্চারণ করিতেই আরব জাতির হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোনও কোনও মতে ইহারা অন্ধ, মূক ও বধির, কিন্তু এ কথা সত্য হইলে তাহারা কিরূপে "সওয়াল" জিজ্ঞাসা

আমরা অবগত হইতে পারি নাই। তাহারা যমদূত, তাই বোধ করি, চক্ষু কর্ণ এবং জিহ্বার অভাব তাহাদের নিকট সেরূপ গুরুতর নহে।

যাহা হউক, এই যমদূতের সম্মুখে মৃত ব্যক্তির উপবেশন করিতে যাহাতে স্থানাভাব না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে মুসলমানেরা কবরের ভিতর অনেকটা যায়গা খালি রাখে। যমদূত কবরে প্রবেশ করিয়াই তাহার ক্ষমতাবলে মৃত ব্যক্তিকে উঠাইয়া বসায়, এবং জিজ্ঞাসা করে, "তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম্ম কি? কাহাকে তুমি প্যাগম্বর বলিয়া স্বীকার কর? তোমার কিব্‌লা কোথায়?" যদি এই সকল প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে যম-দূতদ্বয় মৃত ব্যক্তির প্রতি যে দণ্ড বিধান করে, তাহা মুসলমান বাদ্‌সাদিগের দণ্ডবিধির সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহারা অপরাধীর কর্ণ-দেশে লৌহ দণ্ড দ্বারা এমন গুরুতর আঘাত করে যে, তাহাতে মৃত ব্যক্তি যন্ত্র-ণায় অধীর হইয়া গভীর আর্ত্তনাদে পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের জীবিত প্রাণীর কাণে তালা লাগাইয়া দেয়, কিন্তু মনুষ্য ও জীন্‌গণ এই কাতর চীৎকারধ্বনি শুনিবার অধিকারী নহে। অনন্তর সমাধি-মধ্যে সহসা নিরেনব্বইটি "তান্নিম" আসিয়া উপস্থিত হয়; "তান্নিম" শব্দটির সহিত বোধ হয় আমাদের অনেক পাঠকের পরিচয় নাই। "তান্নিম" আমাদের পুরাণোক্ত নাগাধিরাজ বাসুকির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ; ইহাদের সাতটি করিয়া ফণা, এই ফণাদ্বারা তাহারা মৃতব্যক্তিকে ক্রমাগত দংশন করিতে থাকে, এবং যখন তাহাদের পরিতৃপ্তি বোধ হয়, তখন এমন জোরে নিশ্বাস ছাড়ে যে, সেই মৃত ব্যক্তি অন্তিম বিচার দিন পর্য্যন্ত শূন্যমার্গে ঘুরিতে থাকে। আবুসৈয়দ নামক জনৈক ভাষ্যকার বলেন যে, "তান্নিমের" বিষ এমন তীব্র যে, দংশন দূরের কথা, যদি কখনও একটি "তান্নিম" পৃথিবীতে কেবল নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে এই সসাগরা ধরা মরুভূমিতে পরিণত হয়। যাহা হউক, মুসলমান ধর্ম্মবৈদ্যগণ ইস্‌লাম শিশুদিগের প্রতি তাহাদের অতি শৈশবকালেই আধ্যাত্মিক রোগের অব্যর্থ টীকার ব্যবস্থা করিয়াছেন; প্রত্যেক মুসলমান বালক (আমাদের দেশের সর্ব্বত্র নহে বলিয়া বোধ হয়) বাল্যকালেই শিক্ষিত হয়, "আল্লা আমার প্রভু, ইস্‌লাম আমার ধর্ম্ম, মহম্মদ আমার প্যাগম্বর, কাবা আমার কিব্‌লা"। *

* "কিবলা"র অর্থ যে দিকে সম্মুখীন হইয়া উপাসনা করা হয়। মুসলমানগণ পশ্চিম দিকে

"সওয়াল কবর" সম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা লিখিলাম, এ বিষয়েও মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এলিজা বেন আসের তাঁহার "তিস্‌বি" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, মৃত্যুর পর কোনও ব্যক্তি সমাধিস্থ হইলেই যমদূত তাহার সমাধিমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সেই মৃত দেহে তাহার দেহমুক্ত আত্মার পুনরাবির্ভাব হয়, এবং সে উঠিয়া দাঁড়ায়। যমদূতের হাতে একগাছি শৃঙ্খল থাকে, তাহার কিয়দংশ অগ্নিময় এবং কিয়দংশ লৌহময়; এই শৃঙ্খলের দ্বারা যমদূত সমাহিত ব্যক্তির দেহে আঘাত করে। প্রথম আঘাতে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহচ্যুত হয়, দ্বিতীয় আঘাতে অস্থি ও মাংস পৃথক হইয়া যায়; তখন যমদূত সেই অস্থিগুলি একত্র সংগৃহীত করিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার আঘাত করে; এই তৃতীয় আঘাতে সমস্ত অস্থি ধূলিবৎ চূর্ণ হয়। সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক বৃদ্ধ হইতে নিষ্পাপ শিশু পর্য্যন্ত সকলকেই এই কঠোর দণ্ড সহ্য করিতে হয়; তবে যাহারা পবিত্র দিনে, বা মুসলমানের বারাণসীধামে দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের প্রতি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।

এতদ্ভিন্ন ইহাও লিখিত আছে, যে, কোনও ব্যক্তি সমাহিত হইবামাত্র, যমদূত মহম্মদের সহিত সেখানে উপস্থিত হয়, এবং মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি ইহার সম্বন্ধে কি জানেন?" মৃত ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য কি কপটা-চারী হইলে মহম্মদ উত্তর করেন, "ইহাকে আমি জানি না, অন্যলোকে ইহার সম্বন্ধে যাহা বলে, আমি তাহার অধিক বলিতে পারি না।" তখন ক্রুদ্ধ যমদূত গর্জ্জন করিতে করিতে সেই হতভাগ্যের মস্তকে লৌহদণ্ডের এমন নির্ঘাত আঘাত করে যে, সে আঘাতে পর্ব্বতশৃঙ্গও গুঁড়াইয়া যায়। অনন্তর স্বর্গ হইতে দৈববাণী হয়, "ইহার জন্য অগ্নিময় শয্যা প্রস্তুত কর, ইহাকে অগ্নিনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিতে দাও, এবং নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখ।" তাহার পর পাপীকে প্রচণ্ড উত্তাপ ও অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত, শুষ্ক, শ্বাসরুদ্ধকারী বায়ুর প্রখর প্রবাহ সহ্য করিতে হয়; পৃথিবী ক্রমে তাহার উপর চাপিয়া বসে, সেই কঠিন চাপে তাহার অস্থি স্থানচ্যুত হইয়া যায়, এবং পৃথিবীর প্রলয় পর্য্যন্ত সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

আছে। "কাবা" মহম্মদের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রতিমামন্দির ছিল, এবং যখন আরবীয় মুসলমানগণের পূর্ব্বপুরুষ জড়োপাসক ছিলেন, তখন আরবে কাবার গৌরব ও প্রতিপত্তি অখণ্ড ছিল। মহম্মদ সিদ্ধি লাভ করিয়া মেদিনা হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কাবার অভ্যন্তরস্থ প্রতিমাগুলি ধ্বংস করেন, এবং সেখানে একেশ্বরবাদের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করেন। তাঁহার পর হইতে কাবা পবিত্র মসজিদ শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible]

মতান্তরে জানিতে পারা যায়, কাহারও মৃত্যু হইলেই যমদূত এজরাইল মৃত দেহের সমীপস্থ হয়, এবং "পাপ দেহ হইতে দূষিত আত্মা বাহির হইয়া আয়!" এই কথা বলিয়া শরীরের ভিতর হইতে আত্মাকে টানিয়া বাহির করে; তাহার পর তাহা লইয়া স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়, কিন্তু দূষিত আত্মার দুর্গন্ধে স্বর্গদ্বার আপনা হইতেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়; তখন সেই আত্মা "সিজ্জিনে" নিক্ষিপ্ত হয়। "সিজ্জিন" নরকের অংশবিশেষের নাম, ইহা পৃথিবীর নিম্নতম-তলবর্ত্তী সপ্তমস্বর্গের নিম্নস্থ একটি হরিদ্বর্ণ পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। অন্য কোনও দেহে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত সেই আত্মাকে এই স্থানে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবস্থান করিতে হয়।

শেষ বিচারের অবসানে সকল আত্মাকেই "সিরাতের সেতু" অতিক্রম করিতে হয়; "সিরাত" কোরাণোক্ত নরকের গন্তব্য পথ; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সেতু বলিয়াই বিখ্যাত। এই সেতু পৃথিবী হইতে নরকের ভিতর দিয়া স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার পরিসর একগাছি লোম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এবং তরবারীর ন্যায় তীক্ষ্ণধার; এই সেতুর উভয় পার্শ্ব তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকে পরিপূর্ণ। কেবল ইহাই নহে, এই পথ এমন পিচ্ছিল যে, পাপীগণ ইহার উপর দিয়া যাইবার সময় অত্যন্ত সতর্কিয়া না হইলে পদস্খলিত হইয়া কণ্টকের মধ্যে পতিত হয়। কিন্তু "ইয়াকুৎরুবেনী" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সেতু একগাছি সূত্রের ন্যায়, পৌত্তলিকগণকে ইহার উপর দিয়া যাইতে হয়, এবং যাইতে যাইতে তাহারাই পদস্খলিত হইয়া কণ্টকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। মহম্মদ বাকির মজ্‌লিসি নামক একজন ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রণীত "হাক্‌আল্ ইয়াকীন্" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এই সেতু অতিক্রম করিতে তিন সহস্র বৎসর সময়ের প্রয়োজন; তন্মধ্যে এক সহস্র বৎসর নিম্নদিকে চলিতে হয়, এক সহস্র বৎসর ক্রমাগত কণ্টকপূর্ণ, সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত সীরস্পসঙ্কুল প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধাভিমুখে যাইবার নিয়ম। মহম্মদ বাকির ইহাও বলেন, এ বিষয়ে যে বিশ্বাস না করে, সে সয়তানের মন্ত্রশিষ্য।

যাহা হউক, এই পথে পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলকেই যাইতে হয়, এবং সকলেই "মিজান" অর্থাৎ তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়া থাকে। "আল্ আরকে" লিখিত আছে, এই তুলাদণ্ডের পরিমাণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম; যাহারা লঘুভার, তাহারাই পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়।

"আরকের" অর্থ, স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী [illegible]

পরিমাণ সমান, স্বর্গ বা নরকে তাহাদের স্থানাভাব ; এই "আরকের" উপর তাহাদিগকে অধিষ্ঠান করিতে হয়। স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরাল কতটুকু, ইহা লইয়া মুসলমান শাস্ত্রবেত্তাগণ অনেক আলোচনা এবং বাদানুবাদের পর স্থির করিয়াছেন, একটি প্রাচীর দ্বারা এই ব্যবধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার কেহ কেহ্ কল্পনা করেন, ইহা অর্দ্ধ হস্ত মাত্র ; কাহারও মতে এই ব্যবধানের মধ্যে কোনও আবরণ নাই, এবং ইহা এত সামান্য যে, এক স্থান হইতে অপর স্থান স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

মহম্মদীয় নরকের সাধারণ নাম "জাহান্নম" ; কাহারও অনুমান, ইহুদীয় 'যেহিন্নাম' শব্দ হইতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে। 'যেহিন্নাম্' জেরুজেলাম নগরের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী একটি উপত্যকার নাম।

'আল্‌হিদ্দরে' লিখিত আছে, জাহান্নমের দ্বার সাতটি, এবং প্রত্যেক দ্বার দিয়া নরকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতে হয়। ধর্ম্মে আস্থাহীন মুসলমানগণ প্রথম দ্বারপথে প্রবেশ করে ; দ্বিতীয় দ্বারের নাম "লাথা", অর্থাৎ অগ্নিময় ; এই দ্বারপথে খৃষ্টানগণের প্রবেশের ব্যবস্থা ; তৃতীয় দ্বারের নাম "হুতামা" অর্থাৎ চূর্ণকারী ; এই দ্বার ইহুদীদিগের জন্য ; চতুর্থ দ্বারের নাম "সাইর," অর্থাৎ জ্বালাময় ; সেবিয়ানদিগের জন্য এই দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে ; পঞ্চম দ্বারের নাম "সাকর," অর্থাৎ দগ্ধকারী ; মেজিয়ানগণ এখানে দগ্ধ হয় ; ষষ্ঠের নাম "জাহিম" ; পৌত্তলিকদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য "জাহিমের" সৃষ্টি। সপ্তমের নাম "হাউইয়া," অর্থাৎ গহ্বর ; কপটাচারীগণ এই দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে নিপতিত হয় ; নরকের মধ্যে এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা-ভয়ানক।

কিন্তু নরকের এই অধিকার লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। কাহারও কাহা-রও মতে "জাহান্নম" "দরিয়া"দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যাহারা পৃথিবীকে চিরস্থায়ী মনে করে, এবং পৃথিবীর লয়তত্ত্বে বিশ্বাস করে না, তাহারাই "দরিয়া"। এতদ্ভিন্ন "লাথা"তে পৌত্তলিক আরবগণ, "হুতামা"তে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ, "সাইরে" ইহুদীগণ, "সাকরে" খৃষ্টানগণ, এবং "জাহিমে" মেজিয়ানগণ নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া, অনেকে দৈববাণী করেন। ইব্রাহিমে লিখিত আছে, যে সকল লোক অবিনীত ও অহঙ্কারী, নরকে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে "সাদিদ্" নামক অতি তীব্র কটু দ্রব্য পান করিতে দেওয়া হয় ; ইহা অধিক মাত্রায় পান করা যায় না, এবং তাহা গলাধঃকরণ করিবার সময় অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ হয়।

নরকের আর এক প্রকার পানীয়ের নাম "ঘসাক্" ; আবুসৈয়দ আল্-খাদ্রি বলেন যে, যদি এক বাল্‌তি "ঘসাক্" পৃথিবীর উপর ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত লোক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিতে কিয়ৎপরিমাণে সাদিদের মত ; কিন্তু ইহা দুর্গন্ধময়, কর্দ্দমের ন্যায় দ্রব, অত্যন্ত আঠাল, এবং এরূপ ভয়ানক শীতল যে, ইহা জিহ্বাসংলগ্ন হইবামাত্র প্রাণ-বিয়োগের উপক্রম হয়। "জাখুম" বৃক্ষের ফল এবং নরকের প্রধান খাদ্য ; নরকের অধিবাসীগণের জন্যই ইহার প্রয়োজন ; আরবের সমতলক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা বিস্বাদ ফল কিছুই নাই।

আবু সৈয়দাল্ খাদ্রি বলেন, নরকের চতুর্দ্দিকে ধূমময় যবনিকা নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; এই যবনিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হয়। শেষ বিচারদিনে নরক ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইবে। প্রলয়পয়োধিজলে ধরাতল নিমগ্ন হইলে ভগবান বিষ্ণু যেমন বরাহমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক বিশাল দ্রংষ্টায় তাহা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপে উৎক্ষিপ্ত হইবে ; কিন্তু এক জনের দ্বারা নহে, জালালের মতে সত্তর হাজার দেবদূত সত্তর হাজার লাঠি ধরিয়া ইহাকে ঠেলিয়া তুলিবে, নরক তখন ক্রোধে চীৎকার আরম্ভ করিবে।

নরকে একটি অগ্নিময় বৃহৎ পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; এই পর্ব্বতের নাম "সাউদ" ; আবু সৈয়দ বলেন, পাপীদিগকে সত্তর বৎসর ধরিয়া এই পর্ব্বতের উপর উঠিতে হয় ; কিন্তু শিখরদেশে আরোহণ করিবামাত্র তাহারা পর্ব্বতের পাদদেশে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এই আর্ত্তনাদের সময় তাহাদের যেরূপ মুখভঙ্গী হয়, আবু সৈয়দ তাহার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যন্ত্রণার সময় তাহাদের উপরের ওষ্ঠ মস্তক এবং নিম্ন অধর নাভিদেশ স্পর্শ করে।

কথিত আছে, অবিশ্বাসীগণ সত্তর হাত দীর্ঘ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে ; এই অলৌকিক শৃঙ্খল সম্বন্ধে আবদুল্লা উমার বলেন, পাপীদিগের মস্তকের ন্যায় এক একটি গোলা যদি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা যায়, তাঁহা হইলে পাঁচ শত বৎসরে সেই গোলা পৃথিবী স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু এই শৃঙ্খলের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়।

"আল্ আরকে" লিখিত আছে, নরকের অধিবাসীগণ স্বর্গস্থ পুণ্যাত্মাদিগকে

শ্বর তোমাদিগকে যে জলে পবিত্র করিয়াছেন, তাহা দাও" ; স্বর্গ হইতে উত্তর আসে, "তোমরা অবিশ্বাসী, তোমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ নিষিদ্ধ।"

কোরাণের "গো" নামক সুরা বা পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, মুসলমান ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদিগকে চিরকাল নরকে পচিতে হইবে, কিন্তু জেলাল মন্তব্য করিয়াছেন, নরক হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, তবে মুসলমানগণ কর্ম্মফল অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ইহা হইতে পরিত্রাণ হইতে পারেন ; এই নির্দ্দিষ্ট কালের পরিমাণ নয় শত বৎসরের কম, এবং সাত সহস্র বৎসরের অধিক নহে। এখানে যাহারা আসে, তাহাদের ত্বক নরকাগ্নির উত্তাপে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু তাহাদের জানুদ্বয়, ললাটদেশ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উপাসনাকালে মৃত্তিকা স্পর্শ করে, তাহা শ্বেত বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। কারণ নরকাগ্নির সেই সকল স্থান স্পর্শ করিবার কিছু মাত্র অধিকার নাই। কাহারও কাহারও অনুমান, শরীরের এই সকল পবিত্র অংশের প্রভাবে নরকাগ্নির ভীষণতা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অনেকের বিশ্বাস, যে সকল আত্মা নিরয়গামী হয়, তাহারা যতদিন "জাহান্নমে" থাকে, তত দিন এক প্রকার গভীর নিদ্রা তাহাদিগের চেতনা বিলুপ্ত করিয়া রাখে ; কিন্তু পাপের অবসানে যখন তাহারা স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকারী হয়, তখন সুরতরঙ্গিণীর পুণ্যসলিলে সমস্ত কলঙ্ক এবং অপবিত্রতা ধৌত হইয়া সুপবিত্র শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া থাকে।

কোরাণে পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায় যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, "তোমাদের দ্বারা আমি নরক পূর্ণ করিব।" গোঁড়া মুসলমানেরা বিবেচনা করেন, অন্তিম বিচারদিনে নরক বিলক্ষণ গুলজার হইয়া উঠিবে। "কাফ্" নামক একখানি আরবী ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, শেষ বিচারদিনে যদি কেহ নরককে প্রশ্ন করে, "তুমি কি পরিপূর্ণ হইয়াছ ?" তাহা হইলে নরক উত্তর দিবে, "আমার সীমাবৃদ্ধির আরও কি প্রয়োজন আছে ?" আনাস্ বলেন, নরক ক্রমাগত পাপীদিগকে গ্রহণ করিবে, এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া এই প্রকার উত্তরই প্রদান করিবে ; অবশেষে মহিমাময় পরমেশ্বর ইহার ভিতর পদপ্রবেশ করাইলে নরকের পরিসর সহসা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, এবং সে উচ্চৈঃস্বরে বলিবে, "আপনার মহিমায়, আপনার দানশীলতাগুণে যথেষ্ট হইয়াছে ! যথেষ্ট হইয়াছে ! যথেষ্ট হইয়াছে!" আবু হুরাইয়া নামক প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে. স্বর্গের সহিত যখন অগ্নির ঘোরতর বিবাদ বাধিবে, তখনই এই ঘটনা

কোরাণের "আল্ মোতাপ্‌ফিফিন" নামক অধ্যায়ে লিখিত আছে, "এমন এক দিন আসিবে, যে দিন বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদিগের দিকে চাহিয়া ঘৃণার সহিত হাস্য করিবে, এবং তাহাদের সুখময় বাসরশয্যার উপবেশন পূর্ব্বক দেখিবে—" কি দেখিবে, এ সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু বাইদাওয়াই তাঁহার স্বরচিত ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহারা দেখিবে, অবিশ্বাসীগণ নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহার পর হঠাৎ তাহারা "যান্না" অর্থাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে, এবং দৈববাণী শ্রবণ করিবে, "যাও, এই দ্বারপথে প্রবেশ কর," এই কথা শুনিবামাত্র সকলে দ্রুতবেগে সেই পথে প্রবেশের চেষ্টা করিবে, কিন্তু দ্বারদেশে তাহারা পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই স্বর্গের সেই মুক্তদ্বার সহসা রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং পাপী-দিগের অবস্থা দেখিয়া অভ্যন্তরস্থ বিশ্বাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিবে।

মুসলমানদিগের মধ্যে "আলসাফি" নামক জ্ঞানীগণের এক সম্প্রদায় আছে। "আল্‌সাফির" অর্থ "জ্ঞানসাগর ;" এই সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান ব্যক্তি ৫১৬ হিজিরা সালে অর্থাৎ ১১২২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এই জ্ঞান-সাগরের নামটি কিঞ্চিৎ আড়ম্বরযুক্ত, যথা—আবু মহম্মদ আল্ হোসেন ইব্নো মসুদ ইব্নো মহম্মদ ; কিন্তু এই নামে তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাকিয়া উঠা মানুষের ক্ষুদ্র পরমায়ুর পক্ষে একটু দুঃসাধ্য ভাবিয়া, লোকে সাধারণতঃ তাঁহাকে আলকরো-আল্ বাঘাউই (অর্থাৎ, বাঘ সহরের পালকবিক্রেতা) এই নামে আহ্বান করিত। এই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির জীবন অতি সংযত ভাবে অতিবাহিত হইত ; অল্প পরিমাণ শুষ্ক রুটী তাঁহার একমাত্র আহার্য্য ছিল, কিন্তু অবশেষে কোনও বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি এই রুটীর সহিত অল্প পরিমাণ অলিভ তৈল ব্যব-হার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কোরাণের আনুষঙ্গিক মহাজনোক্তির এক খানি অতি উৎকৃষ্ট টীকা প্রস্তুত করেন ; এই টীকার নাম "মসাবি আল্‌সুনান", অর্থাৎ "মহাজনোক্তির লণ্ঠন"। কিন্তু সেক্‌ওয়ালী আলাদীন আবু আবদুল্লা মহম্মদ ইব্‌নাবদুল্লা আলখাতি নামক আর একজন পণ্ডিত এই গ্রন্থের পরি-বর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন, এবং তাঁহার গ্রন্থের "মিসকাত আল্‌মসাবি" অর্থাৎ "লণ্ঠনের মধ্যভাগ" এই আখ্যা প্রদান করেন ; এই লণ্ঠনের আলোকে অন্ধ-কারপূর্ণ নরকের অনেক ব্যাপার স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

আবু হরাইরা বলেন, পৃথিবীতে যে অগ্নি প্রজ্জলিত রহিয়াছে, তাহা নর-

ইহা কৃষ্ণবর্ণ ছিল না ; প্রথম সহস্র বৎসর ইহার আভা লোহিত ছিল, দ্বিতীয় সহস্র বৎসর তাহা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, অবশেষে তৃতীয় সহস্র বৎসর হইতে ইহা কৃষ্ণাভ হইয়া গিয়াছে। পুনরুত্থানদিনে চন্দ্র সূর্য্য দুই খণ্ড পনীরের ন্যায় এই অগ্নিমধ্যে নিপতিত হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের উক্তপ্রকার দুর্গতি সম্বন্ধে এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া আল্ হাসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের অপরাধ ?" আবু হরাইরা বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ এইরূপই কহিয়াছেন।" অগত্যা আল্হাসেন তাঁহার নিরুপায় কৌতূহলবৃত্তিকে নিঃশব্দে পরিপাক করিতে বাধ্য হইলেন।

নুমানবসির বলেন, পদদ্বয়ে অগ্নিনির্ম্মিত পাদুকা পরিধান করান নরকের সর্ব্বাপেক্ষা লঘুদণ্ড ; কিন্তু এই পাদুকা পরিধান করিবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকে। ইব্‌ন আব্বাসের মতে এ পর্য্যন্ত একজন মাত্র লোক এই লঘুদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছেন ; এই ব্যক্তি আর কেহ নহেন, ইনি মহম্মদের পিতৃব্য আবু তালিব।

আবদুল্লা ইব্‌নাল হারিথ লিখিয়াছেন, নরকে যে সকল সর্প আছে, সেগুলি বাক্‌ট্রিয়াদেশীয় উষ্ট্রের ন্যায় ; এই সর্প কোনও নারকীকে দংশন করিলে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তাহার বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার বৃশ্চিক আছে, সেগুলি দেখিতে অনেকটা জিন ও লাগামে সজ্জিত অশ্বতরের মত, এবং ইহাদের দংশনজ্বালাও উক্ত সর্পাঘাতের ন্যায় তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নরকাগ্নির কথা উল্লেখ করিয়া আবু হোরাইরা বলিয়াছেন, এই অগ্নির সৃষ্টি হইলে পরমেশ্বর গেব্রাইলকে ডাকিয়া এই অগ্নি পরীক্ষা করিয়া আসিতে বলিলেন। তদনুসারে গেব্রাইল পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া উত্তর করিলেন, "প্রভু, যাহারা ইহার কথা অবগত হইবে, তাহারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না।" এই কথা শুনিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা কামজ মোহ এবং ইন্দ্রিয়সুখের আবরণে এই নরকাগ্নি আচ্ছাদিত করিলেন ও গেব্রাইলকে পুনর্ব্বার তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতে বলিলেন। গেব্রাইল এবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয়, এমন ব্যক্তি কেহই থাকিবে না, ইহার মধ্যে যাহার প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা অল্প।" যাহারা এই নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, ইব্‌নমারের মতে তাহারা বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট, ও স্থূলকায় হইবে ; উল্লিখিত মৌলবী সাহেব এই স্থূলতার পরিমাণ প্রকাশ করিতেও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে [illegible]

কিন্তু আবু হোরাইরা তাঁহার এই বিচক্ষণ সহযোগীটির উক্তির প্রবল প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, নরকাগ্নিস্থ অবিশ্বাসীগণের স্কন্ধদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে বিশেষ দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের অধিক সময় লাগে না। মৌলবী সাহেব আরও বলেন যে, এই পাপীগণের জিহ্বা ছয় মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, ও তাহার উপর দিয়া মনুষ্যগণ গমনাগমন করে; তাহাদের এক একটি দন্ত 'উহুদ' পর্ব্বতের ন্যায়, এবং ত্বকের স্থূলতা সত্তর হাত। ইহাদের উরুদেশ বৈদা পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল, এবং নিতম্বের উভয় অংশের দূরত্ব, মক্কা ও মেদিনার দূরত্বের সমান। আবু বুর্দ্ধা নামক আর একজন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বলেন, নরকে "হাভাব" নামক একটি উপত্যকা আছে; "হাভাবে"র প্রকৃত অর্থ ক্ষীণকায়, দ্রুতগামী নেক্ড়ে বাঘ। উদ্ধত, অহঙ্কারী ব্যক্তিগণের বাসের জন্য এই উপত্যকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

কস্‌মিকাল টেলিফোন।

জগদ্বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসন নানা অদ্ভুত যন্ত্রাদির উদ্ভাবন করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বহু-পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক সত্যের সাহায্যে, আজকাল যে সকল বিস্ময়কর যন্ত্রাদির গঠন করিতেছেন, তাহা দেখিলে এডিসনকে বাস্তবিকই অলৌকিক ক্ষমতাশালী পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ফোনোগ্রাফ প্রভৃতির আবিষ্কারের পর, সম্প্রতি এডিসন আর একটি অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রনির্ম্মাণের কল্পনা করিয়াছেন; উপস্থিত ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে, ইহাও এডিসনের অপর একটি অমর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া, আবিষ্কারকের নাম নিশ্চয়ই চির-স্মরণীয় করিবে।

সূর্য্য জগতের প্রাণস্বরূপ; এই মহাজ্যোতিষ্কের অবস্থাবৈচিত্র্য দ্বারা সৌর গ্রহ উপগ্রহাদিরও নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, দূরবীক্ষণ দ্বারা অথবা কখনও কখনও নগ্নচক্ষুতে সূর্য্যমণ্ডল পরীক্ষা করিলে, সৌরশরীরে একপ্রকার কৃষ্ণচিহ্ন (Dark Spots) পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিহ্নসংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না, বৎসরের সকল অংশেই ইহার হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন অবধি এই আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজও কোনও সন্তোষজনক কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং চিহ্নগুলির হ্রাসবৃদ্ধির কালনিরূপক প্রকৃষ্ট উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিত নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন, সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বদাই মহাঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, এবং এই ঝটিকাবর্ত্তেই সূর্য্যাবরণস্থ বাষ্পরাশি সৌরশরীরে প্রোথিত হইয়া গিয়া,

উক্ত কৃষ্ণচিহ্ন উৎপন্ন করে। যাহাই হউক, সহস্র কোটী যোজন ব্যবধানস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলস্থ এই ক্ষুদ্র ঘটনা বড় উপেক্ষণীয় নয়। সৌরচিহ্নের বৃদ্ধি হইলে, পৃথিবীতে তাহার প্রভাব বিশেষ-রূপে অনুভূত হইয়া থাকে,—ইহা দ্বারা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশেই চৌম্বক শক্তির এক মহা-বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, চুম্বকশলাকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং পৃথিবীর চৌম্বকরেখাও (Magnetic Meridian) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত রৌদ্র বাত্যাদি প্রাদেশিক আবহাওয়া, এই সৌরচিহ্ন দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে নিয়মিত হইয়া থাকে, দেখা গিয়াছে। কাযেই এই অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবসম্পন্ন চিহ্নগুলি দ্বারা আমরা সময় সময় নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ, যাঁহারা চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি লইয়া কায-কর্ম্ম করেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয়; এই ঘটনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণাদি জানিবার কোনও উপায় না থাকায়, অনেক সময়েই ইহা কার্য্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এখন এডিসন তাঁহার নবকল্পিত কস্‌মিকাল টেণিফোন নামক যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল পরীক্ষা না করিয়াই, সৌরচিহ্ন সকলের অবস্থা নিরূপণ করিবার উপায় উদ্ভা-বন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা চৌম্বক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা প্রথম হইতেই জানিয়া ও সকলকে সতর্ক করিয়া, ইহার অনিষ্টকারিতা বিদূরিত করিবেন, আশা দিয়াছেন।

কস্‌মিকাল টেনিফোন যন্ত্রটির নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সহজ। একটি বৃহৎ লৌহ (Soft Iron) স্তম্ভে একগাছি সুদীর্ঘ তার উপর্য্যুপরি পুনঃপুনঃ জড়াইয়া * এই তারের মুক্ত প্রান্ত-দ্বয়, অপর আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর স্তম্ভের (Electro-magnet) তারের উভয় প্রান্তে সংলগ্ন করিয়া, এবং ইহার মধ্যস্থ লৌহের এক প্রান্তের অতি নিকটে, একখানি অতি সূক্ষ্ম লৌহফলক রাখিয়া, এই কল্পিত যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিবার কথা হইতেছে। এডিসন বলি-তেছেন, যখন সৌরচিহ্ন সকল দ্বারা পৃথিবীতে নানা চৌম্বক উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তিরও কিঞ্চিৎ অল্পাতিরেক হইতেছে, সুতরাং এখন এই চৌম্বক শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা, পূর্ব্ববর্ণিত সামান্য যন্ত্রটি অতি সহজেই চালাইতে পারা যাইবে।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন, একটি তারের মোড়কের (Coil) মধ্যে, একটি চুম্বকশলাকার এক প্রান্ত সহসা প্রবিষ্ট করাইলে, বা প্রবিষ্ট করাইয়া হঠাৎ টানিয়া লইলে, মোড়কের তারে একটি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে; পাঠক হয় ত আরও দেখিয়া থাকিবেন, শলাকা মোড়কে প্রবিষ্ট না করাইয়া, যদি একটি বৃহদায়তন চুম্বক মোড়কের সম্মুখে রাখিয়া, ঘন ঘন আন্দোলিত করা যায়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিদ্যুৎপ্রবাহের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল বৈদ্যুতিক ব্যাপারের কারণোল্লেখকালে বলেন,—শলাকা প্রবিষ্ট বা চুম্বক আন্দোলিত করায়, মোড়কের নিকটস্থ স্থানের চৌম্বক শক্তির (Lines of force) পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এখন যদি এই কথাই সত্য হইল, তাহা হইলে সৌর কৃষ্ণচিহ্নজাত চৌম্বকশক্তির পরিবর্ত্তন দ্বারাও, মোড়কের তারে তড়িৎপ্রবাহ লক্ষিত হইবে। † এডিসন এই

---

* পাঠক তার জড়াইবার প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক হইলে Hopkin's Experimental Science নামক গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারিবেন।

† তাড়িতপ্রবাহের উৎপাদনকার্য্যে, লৌহস্তম্ভ (Iron Core) ব্যবহারের উপযোগিতা জানিতে হইলে, S. P. Thompson's Electricity and magnetism গ্রন্থের ২৯১ পৃষ্ঠা

কথা ভাবিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রে, আপনা-আপনিই বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইবে বলিয়া, স্তম্ভযুক্ত বৃহৎ মোড়কটি ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং আরও বলিতেছেন, উল্লিখিত উপায়ে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইলেই যন্ত্রটি নিরুপদ্রবে চলিতে থাকিবে; কারণ, এই প্রবাহ তার দ্বারা প্রবাহিত হইয়া দ্বিতীয় ক্ষুদ্র মোড়কের (Electro-magnet) তারে প্রবেশ করিয়া, তদভ্যন্তরীণ লৌহখণ্ডকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করিবে, এবং এই চুম্বক ইহার লৌহাকর্ষণ-শক্তি দ্বারা নিকটস্থ সূক্ষ্ম লৌহফলককে, তাড়িতপ্রবাহের অল্পাধিক্যানুসারে, ক্রমাগত আন্দোলিত করিয়া এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিতে থাকিবে, এবং এই শব্দ দ্বারাই চৌম্বকশক্তির পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ সৌরচিহ্নের হ্রাসবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। এই যন্ত্রের কার্য্যের সহিত টেলিফোনের কতকটা ঐক্য আছে বলিয়া, এটিকে কস্‌মিকাল টেলিফোন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আজও যন্ত্রটির নির্ম্মাণ শেষ হয় নাই, তবে এডিসনের অতীত কীর্ত্তির কথা ভাবিলে, এবং তাঁহার যন্ত্রনির্ম্মাণকুশলতার পরিচয় পাইলে, এই দুরূহ কার্য্যের ভার উপযুক্ত পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং, ইহার আশু কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

ভূ-গর্ভ।

পৃথিবীর 'রত্নগর্ভা' আখ্যাটি প্রায় সকল দেশের সকল ভাষাতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এ সম্বন্ধে নানা প্রবচনও শুনিতে পাওয়া যায়। আজ কাল অনেকেই বলেন, প্রবচন মাত্রেই সত্যমূলক; কিন্তু পৃথিবীর সুবৃহৎ উদরের সহিত, প্রাপ্ত রত্নরাশির পরিমাণ তুলিত করিলে, ধরাদেবীর 'রত্নগর্ভা' বিশেষণটি বাস্তবিকই অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, সম্প্রতি কয়েকটি বহুদর্শী মার্কিন বৈজ্ঞানিক, ভূগর্ভনিহিত রত্নাদির বাস্তব অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া, সত্যের আবিষ্কারার্থ, কিছু দিন নানা চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং অল্প দিন হইল, পরীক্ষাদি দ্বারা বিষয়টির কতকটা মীমাংসা করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, বাস্তবিকই পৃথিবীর মধ্যভাগ বহুমূল্য ধাতু দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং ইহার পরিমাণ এতই অধিক যে, মনুষ্য-হস্তগত ধনরাশি একত্র করিলে, ভূগর্ভস্থ ধনরাশির সহিত তুলনা করা যায় না।

ভূগর্ভস্থ অধিকাংশ স্থানই ধাতুপরিপূর্ণ বলিয়া, ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনেকদিন হইতে অনুমান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইহার কোনও সন্তোষজনক প্রমাণাদি দিতে না পারায়, কথাটি কেহ বড় বিশ্বাস করিতেন না,—এখন পূর্ব্বোক্ত মার্কিন পণ্ডিতগণ, নানা উপায়ে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাদির গুরুত্ব বাহির করিয়া, ইহা জল অপেক্ষা কেবলমাত্র দুই গুণ ভারি দেখিয়া, এবং ভূমধ্যস্থ পদার্থের গুরুত্ব এগার গুণ অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, ভূগর্ভ ধাতুময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় যখন পার্থিব সমস্ত পদার্থই তরল অবস্থায় ছিল, সেই সময় হইতেই ধাতব পদার্থ সকল ভারাধিক্যপ্রযুক্ত কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে নামিয়া আসিয়া, কেন্দ্রেরই চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হইয়া আছে। এখন তাপবিকীরণাদি দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ক্রমে কঠিন ও শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত ধাতু প্রায় অবিকৃতাবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে। আমরা এখন খনি হইতে যে সকল ধাতু পাই, সেগুলি পৃথিবীর কঠিনাবস্থায় পরিণত হইবার সময় সহসা জমিয়া বা অন্য কোনও কারণে নিম্নে তলাইতে না পারিয়া, ভূমধ্যস্থ ধাতুসমুদ্র হইতে পৃথক রহিয়া গিয়াছে, এবং কাজেই অনেক সময় মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

আছে,—এই প্রশ্নটি লইয়া অনুসন্ধানপরায়ণ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে কিছু তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এবং কয়েকটি পণ্ডিত উক্ত দ্রবধাতুর অধিকাংশই লৌহ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ধাতুর অধিকাংশই লৌহ থাকিলে, ভূমধ্যস্থ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব, পরীক্ষালব্ধ ফল অপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইত বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, লৌহ ব্যতীত ইহাতে স্বর্ণ রৌপ্যাদি গুরুভারবিশিষ্ট ধাতুর অস্তিত্ব আছে; ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত পণ্ডিতগণ ভূগর্ভস্থ ধাতুর অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, এখন বহুমূল্য ধাতু সকল কি প্রকারে সহজে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হইবে, তাহার উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট রহিয়াছেন। ভূগর্ভস্থ ধাতু উত্তোলনের অন্য কোনও সদুপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, ভূপৃষ্ঠ হইতে কূপ খনন করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি ইহাঁদেরই পরামর্শে জর্ম্মানিতে একটি কূপ খননও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার গভীরতা এক মাইল হইতে না হইতেই ধাতুর পরিবর্ত্তে জল উঠিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে ব্যর্থমনোরথ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, আমেরিকার এক স্থানে নানা কৌশলে ইহাঁরা আর একটি কূপ খননের চেষ্টা করিতেছেন; এইটি ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজার হাত গভীর হইয়াছে; কিন্তু এখনও জল বা পেট্রোলিয়ম্ উঠিয়া সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিবার আশঙ্কা তিরোহিত হয় নাই।

য়ুরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই অদ্ভুত চেষ্টা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না স্থির করিয়া, ইহা কেবল কয়েকটি উষ্ণমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিকের আসন্ন উন্মত্ততার পরিচায়ক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শেষোক্ত পণ্ডিতগণ বলিতেছেন,—পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ চারি হাজার মাইলের মধ্যে কেবলমাত্র এক মাইল পৌঁছিতে যখন এত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে, তখন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আরও যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভিনব বিপদ উপস্থিত হইবে না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? এবং যদি বা কোনও অলৌকিক উপায়ে কূপের গভীরতা কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে কূপখননস্থানে একটি ছোটখাট আগ্নেয় গিরির আবির্ভাব হইবে বলিয়া ভয় হয়; আবার এ দিকে স্বর্ণরৌপ্যাদি বহুমূল্য ধাতু উত্তোলিত করিবার সম্ভাবনাও বড় কম, কারণ লৌহাদি নিকৃষ্ট ধাতু আপেক্ষিক গুরুত্বের অল্পতাবশতঃ প্রথমেই উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে, কাযেই ভূগর্ভস্থ সমগ্র লৌহ নিঃশেষিত করিয়া ও ভূতলে স্থানদান করিয়া, পরে স্বর্ণাদি ধাতু উত্তোলন করিতে হইবে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু পক্ষান্তরে অনুসন্ধানপরায়ণ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, কার্য্যসিদ্ধির জন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত খনন করিবার কোনও আবশ্যক নাই, কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত কূপ খনন করিলেই যথেষ্ট হইবে; কারণ ভূপৃষ্ঠ হইতে কুড়ি মাইল নিম্নে সকল পদার্থই দ্রবাবস্থায় আছে, কোনও উপায়ে মুক্তপথ পাইলে এইগুলি সবলে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইতে থাকিবে, এবং ধাতুনির্গমনপথ স্বতঃই প্রশস্ত হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, এখন এই অত্যদ্ভুত প্রয়াস কার্য্যে পরিণত হইলে, স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু এককালে মূল্যহীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের এই উন্মত্ত চেষ্টা সার্থক হইবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে।

আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক লক্ষণ।

জনৈক সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক, নানা পরীক্ষাদি দ্বারা, আবহাওয়ার সহিত, প্রাকৃতিক লক্ষণাদির কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি "সায়েণ্টিফিক্ আমেরিকান" নামক সাময়িক পত্রে ইহার একটি বিস্তৃত বিবরণও প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, আবহাওয়া পরিবর্ত্তন ঠিক কোন্ সময়ে হইবে, শীঘ্র হইবে কি না, তাহা পূর্ব্বে জানিবার বিশিষ্ট উপায় আজও আবিষ্কৃত হয় নাই, মেটিরিওলজি এখনও সম্পূর্ণ শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে, ইহাকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্র করিয়া গড়িতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) দ্বারা কেবল রৌদ্রবাত্যাদি পরিবর্ত্তনের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বকার লক্ষণগুলি জানিতে পারা যায় মাত্র, তাহাও আবার সকল সময় ঠিক হয় না, তাই সাহেবটি বলিতেছেন, যন্ত্রাদি বৃথা নাড়া চাড়া না করিয়া, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক লক্ষণগুলি দেখিলে, অনেক সময়েই সুফল লাভ হইবে।

সাহেব লিখিয়াছেন, প্রাণীগণের মধ্যে পক্ষী জাতিরই আকাশের পরিবর্ত্তন অনুভবশক্তি, সমধিক প্রবল দেখা যায়। গল্ নামক একজাতীয় সমুদ্রচর পক্ষী, জলঝড় আসিবার অনেক পূর্ব্বে, ভবিষ্য বিভ্রাটের কথা ঠিক্ জানিতে পারে বলিয়া কথিত আছে। এই পক্ষী জাতি আত্মরক্ষার্থ বৃষ্টিপতনের অনেক পূর্ব্বে তাহাদের উপকূলস্থ ক্ষুদ্র গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিপদব্যঞ্জক মহা কলরব করিতে থাকে; এইজন্য অসময়ে ও পরিচ্ছন্ন আকাশেও দুই এক ঝাঁক গলপক্ষী উপকূলাভিমুখী হইতে দেখিলে, নাবিকগণ বিপদ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া সতর্ক হইয়া থাকেন। নাবিকগণ আর এক জাতীয় পক্ষী দ্বারা (Black Petrel) আসন্ন বিপদের কথা প্রায়ই জানিয়া থাকেন। এই জাতীয় পক্ষীকে জাহাজের নিকটে উড়িয়া বেড়াইতে বা সানন্দে মুক্তাকাশে বিচরণ করিতে দেখিলে, নাবিকগণ মহা ভীত হইয়া থাকেন, এবং আকাশে মেঘচিহ্ন না থাকিলে ও বায়ুমান যন্ত্রে আশু বিপদের চিহ্ন সূচিত না হইলেও, ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে লাভের আয়োজন করিতে থাকেন। নাবিকসমাজে, ইহা মৃত্যুর চিরকিঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত, গৃহপালিত ও গ্রাম্য পক্ষী ইত্যাদির মধ্যেও, লেখক পূর্ব্বোক্ত শক্তিটি দেখিয়াছেন;—তালচোঁচ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পক্ষী যখন ঊর্দ্ধ বিহার ত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠের অনতিদূরে বিচরণ করিতে থাকে, তখন প্রায়ই শীঘ্র বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। রাজহংস সকল বৃষ্টির পূর্ব্বে অত্যন্ত অধীর ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, এবং কাঠঠোকরা এক প্রকার শব্দ করিতে আরম্ভ করে। ইহা ছাড়া, ভেকজাতির আকাশ পরিবর্ত্তনানুভবশক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহারা প্রায়ই বৃষ্টিপাতের অনতিপূর্ব্বে বিকটস্বরে চীৎকার করে। কতকগুলি উদ্ভিদের মধ্যেও লেখক পূর্ব্বোক্ত শক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। মেঘ সঞ্চিত হইবার ও বৃষ্টিপতনের অনেক পূর্ব্বে, প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল মুদিত হইয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে গন্ধের তীব্রতাও কিছু বাড়ে, এবং যতক্ষণ অবধি আকাশ পরিচ্ছন্ন ও বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত পুষ্প সকলও সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রস্ফুটিত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ব্যতীত, লেখক মাকড়সার মধ্যে আকাশ-পরিবর্ত্তন-অনুভবশক্তি অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মাকড়সা, জালবয়নকালে সহসা কার্য্যে বিরত হইলে, শীঘ্রই বৃষ্টিপাত হইবে বলিয়া স্থির করা যায়; তদ্ব্যতীত মাকড়সার তন্তু পরীক্ষা করিলেও, অনেক সময় আকাশের অবস্থা জানিতে পারা যায়,—সাহেবটি বলেন, তন্তু আকুঞ্চিত হইলে, আশু ঝড়বৃষ্টির বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিতে হয়; কিন্তু পরে ইহা প্রকৃত দৈর্ঘ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, সে সম্ভাবনা আর থাকে না। লেখক কয়েকটি মাকড়সা পুষিয়া উক্ত উপায়ে আকাশের অবস্থা জানিতেন; পরিষ্কার মেঘহীন দিনে, মাকড়সার উপদেশানুসারে, তিনি প্রায়ই ছাতা হস্তে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, এবং ইহার জন্য তাঁহার বন্ধুগণের নিকট প্রায়ই নানা বিদ্রূপ সহ্য করিতেন, কিন্তু পরক্ষণে আবার তাঁহারাই জলসিক্ত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী আবৃতমস্তক বন্ধুটির

গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে কুক্কুটের ব্যবহার দেখিলে, আকাশের ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেক জানিতে পারা যায়। বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে যদি কুক্কুট আহার ত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে বৃষ্টি শীঘ্রই প্রশমিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়, কিন্তু ইহারা বৃষ্টিপাতে লক্ষ্য না করিয়া যদি কেবলমাত্র আহারান্বেষণে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে কিছুতেই হঠাৎ বৃষ্টি নিবৃত্ত হয় না, এবং দুই এক দিবসের মধ্যে আকাশ পরিচ্ছন্ন হইবার আশাও বড় থাকে না। চন্দ্র সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল চক্র দৃষ্ট হইলে প্রায়ই আশু বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন, আকাশের অবস্থা জানিবার, সাহেবটি আরও কয়েকটি উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—শুক্লপক্ষীয়া তৃতীয়া বা চতুর্থীর চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, এবং চন্দ্রের শৃঙ্গদ্বয় অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিয়া বিবেচিত হইলে, পরবর্ত্তী দুই তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়। আর চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইলে, অচিরাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সহসা ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হয়। সাহেব বহু অনুসন্ধানের পর বিষয়টি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে আশা করা যায়, কথাগুলি নিতান্ত অমূলক হইবে না। যাহা হউক, এখন ইহাদের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, এবং এ গুলিকে দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগান কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহাও দেখা আবশ্যক।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

গুরুদ্বার।

আজ একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে ইতিহাস-পাঠের দুর্দ্দশা অসাধারণ। অনেকে বলেন, উপযুক্ত ইতিহাসের অভাবই ইহার কারণ; কিন্তু অনেকে এরূপ মতও ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, ইতিহাসপাঠে লোকের তেমন স্পৃহা নাই, তাই এদেশে উৎকৃষ্ট ইতিহাসের অভাব। কোন্ কথাটি সত্য, তাহা সমালোচকগণ আলোচনা দ্বারা অবধারণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে এক একটি 'হেরোডোটস্' করিয়া তুলিবার পথ পরিষ্কার করুন; "টেক্স্টবুক কমিটী"র মনোনীত পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠার মধ্যে যতটুকু তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বর্ত্তমানে আমরা ততটুকু মাত্র শিক্ষক ও নোটের সাহায্যে অতি কটু পদার্থের ন্যায় গলাধঃকরণ করি। কিন্তু বলা বাহুল্য, ইহাতে ফলও সেইরূপ হইয়া থাকে; অর্থাৎ "পাশ" বা "ফেলের" সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল বরণীয় কীর্ত্তির গৌরবপূর্ণ স্মৃতি আমাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়। ইহার পর কোনও সময়ে কোথাও কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বের কথা উঠিলে, বা কোনও বীরশ্রেষ্ঠের চরিত্রসম্বন্ধে কিছু আলোচনা উপস্থাপিত হইলে, আমরা তামাক টানিতে টানিতে "হাঁ, হাঁ, সেদিনের কি যেন

একটা ব্যাপারের কথা ছেলেবেলায় পড়া গিয়াছিল” বলিয়া, মুরুব্বিয়ানার পরিচয় দিই; যেন সে কথাগুলি বাল্যকালেই ভাল সাজিত, এখন আর তাহা লইয়া আলোচনা করা ভাল দেখায় না, বরং তাহা অপেক্ষা তামাক টানিতে টানিতে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। সকলের না হউক, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিতের এইরূপ গতি!

বিদেশের, রোম গ্রীশের ইতিহাস দূরে থাকুক, আমাদের গৃহপ্রান্তে, আমাদের নয়নসমক্ষে অবস্থিত যে একটি মহাপরাক্রান্ত জাতির অতুলকীর্ত্তির দুই একটি ক্ষুদ্র কাহিনী আমাদের কর্ণগোচর হয়, যাহাদের দুই একটি সামান্য কথামাত্র “টেক্‌স্‌টবুকে”র সাহায্যে আমরা অবগত হই, সেই অমিতবলশালী, প্রচণ্ডতেজা শিখজাতির ইতিহাসের সহিত আমরা কতটুকু পরিচিত? ইংরাজীতে “কি” সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নানা কারণে তাহা নির্দ্দোষ নহে; হুইলারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা ঐতিহাসিক, তাঁহাদের বিড়ম্বনা ততোধিক। বাল্যকালে বিদ্যালয়পাঠ্য ক্ষুদ্র ইতিহাসে যাহা লিখিত দেখিতাম, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। অবশেষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’ ও ‘শিখ’ নামক সুন্দর প্রবন্ধে শিখজাতির বীরত্ব ও মহত্ত্বের অনেক বিবরণ পাঠকসাধারণের গোচর হইয়াছে। রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার গৌরবময় সংগ্রামক্ষেত্রে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া তাহার উজ্জ্বল আলোকে সমগ্র ভারত আভাময় করিয়া তুলিয়াছিল, অপক্ষপাত লেখকের লেখনীমুখে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া, আমাদের এই দুর্ব্বল অসাড় হৃদয়েও মৃদু কম্পন উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ভূখণ্ডের স্বাধীনতার গৌরবস্বরূপ “মারাথান” ও “থর্ম্মাপলী” স্বাধীন য়ুরোপীয় জাতিগণের হৃদয়ে যে বরণীয় আসন লাভ করিয়াছে, স্বাধীনতার যেরূপ মহাতীর্থরূপে পরিগণিত রহিয়াছে, আমাদের দেশের মারাথন ও থর্ম্মাপলী, আমাদের সুপবিত্র পুণ্যতীর্থ হলদীঘাট, রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালাকে আমরা এখনও সেরূপভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমি ইতিহাসের পাঠক নহি, যতক্ষণ ইতিহাস পড়িব, ততক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলে আমার লাভ আছে; কিন্তু আমি যেখানে থাকিতাম, পাঠ না করিলেও সেখানে অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার নয়নগোচর হইত, এবং সেই সকল ব্যাপার একত্র লিপিবদ্ধ করিলে একখানি সুবৃহৎ সুন্দর ইতিহাস প্রস্তুত

আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না; "ওটা কি একটা ছিল" এইটুকু মাত্র বলিয়াই অনেকের কৌতুহলবৃত্তির পরিতৃপ্তি হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই বীরভূমি পঞ্চনদের লুপ্তগৌরবের নীরব শ্মশানে দাঁড়াইয়া আর শুধু "ওটা কি একটা ছিল" বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তন্নতন্ন করিয়া সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা হয়, এবং সমস্ত দেখা শেষ হইলে একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়, চক্ষুঃপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া আসে। পঞ্চনদের প্রাচীন গৌরব অধিক নাই, এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের উপর যে যুগব্যাপী অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি আধিপত্য করিতেছিল, মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে তাহার অবসান হয়, এবং ধর্ম্মবীর নানক তাঁহার শুকতারা। দেখিতে দেখিতে যেন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রবলে চতুর্দ্দিক আলোকপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং পঞ্চনদবাসীগণ দীর্ঘনিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল; সে আজ কয় দিনের কথা, কিন্তু অতি অল্প কালের মধ্যেই সে সূর্য্য অস্তমিত হইল; শুধু একটা সুখের স্মৃতি, এবং অতীত গৌরবের চিহ্ন চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলে কেবল হৃদয় ব্যথিত হয়।

কিন্তু আমি আজ যে ক্ষুদ্র কাহিনী বলিতে যাইতেছি, ইতিহাসের বিষয় হইলেও, প্রচলিত ছাপার বহিতে সে সম্বন্ধে অধিক কথা দেখা যায় না। মনে হয়, একখানি মাত্র পুস্তকে এ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ দেখিয়াছিলাম; সুতরাং বিষয়টি অধিকাংশ পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক হইবে, এরূপ আশা বোধ করি দুরাশা নহে।

দেরাছুন সহরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেই বাজারের নিকট একটি সুবৃহৎ মন্দির সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি মন্দির বলিলে ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, এবং হঠাৎ দেখিলে ইহাকে মন্দির বলিয়া মনে না হইয়া মুসলমান বাদসাহদিগের সমাধিমঞ্চ বলিয়া বোধ হয়। মনোহরকারুকার্য্যময় উচ্চপ্রাচীরপরিবেষ্টিত একটি স্থান, প্রাচীরের চারি কোণে চারিটি উচ্চ মনুমেণ্টের মত মিনার, এবং পশ্চিমদিকে একটি প্রকাণ্ড সিংহদ্বার,—তাহাতে লৌহ কবাট শোভা পাইতেছে, যেন কত দিনের পুঞ্জীকৃত রহস্য এই কপাটের অন্তরালে গুপ্ত রহিয়াছে। এই মন্দিরের অপর তিন দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আরও তিনটি দ্বার রহিয়াছে, সেগুলি এই লৌহদ্বারের ন্যায় "সদর দরজা" নহে।

লৌহনির্ম্মিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারা যায়; এই প্রাঙ্গণটি প্রস্তরমণ্ডিত এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

মানবের মলিন পদস্পর্শে সেই পরিচ্ছন্নতার ঈষৎ হানি হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও বোধ করি ক্ষণকালের জন্য ইহার প্রস্তুতকারীর মনে স্থান পায় নাই। এই প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মন্দির; মন্দিরের উপর উঠিতে হইলে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে হয়, এবং এইজন্য মন্দিরের চারি দিকে সিঁড়ি আছে। মন্দিরটি অষ্টকোণ, অতি সুন্দর বিচিত্র চিত্রে ভূষিত; ইহার অভ্যন্তরে কোনও দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত নাই; মুসলমানেরা উপাসনা করিবার জন্য যেরূপ মসজিদ প্রস্তুত করেন, ইহাও অনেকটা সেই প্রকার। এই মন্দির শিখগুরু রামরায়ের সমাধিমন্দির, আর এই প্রাঙ্গণের চতুষ্কোণে যে চারিটি মনুমেণ্টের ন্যায় মঞ্চ আছে, তাহা রামরায়ের চারি স্ত্রীর সমাধিস্থান; এই মন্দিরের নাম অনুসারে স্থানের নাম হইয়াছে,—"গুরুদ্বার" বা "গুরুদেরা"। মন্দিরসম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, রামরায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র একখানি ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন, কি জন্য ধর্ম্মবীর, শান্তপ্রকৃতি, সাধুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নানকের মন্ত্রশিষ্যেরা কর্ম্মবীর, মহাপরাক্রান্ত দুর্জ্জেয় যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং একটি সংসারবিরাগী, ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্বিরোধ সম্প্রদায় কিরূপে কয়েক জন অবিমৃশ্যকারী মুসলমান সম্রাটের অমানুষ অত্যাচার ও পাশবিক কঠোরতায় উৎপীড়িত হইয়া, সাম্প্রদায়িক ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এক সুবিখ্যাত রাজনৈতিক জাতিতে অভ্যুত্থান লাভ করিল; শিখজাতির ক্রমপরিবর্ত্তনের সেই ধারাবাহিক বিবরণ ইতিহাসে আলোচিত হইয়াছে, আমরা এখানে কেবল শিখসম্প্রদায়ের আদিগুরু নানকের তেজস্বী বংশতরুর একটি শাখার ইতিহাস বর্ণন করিব।

রামরায় শিখগুরু; ইনি গুরু হরগোবিন্দ সিংহের প্রপৌত্র। যে সময়ে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রভূত ক্ষমতার পীঠস্থান দিল্লীর রত্নসিংহাসন লইয়া, দারা, সুজা, আরঙ্গেব ও মুরাদ, পবিত্র ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় পরস্পরের বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবেশ করাইবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিল, এবং রোগক্লিষ্ট অক্ষম বৃদ্ধ সম্রাট অন্ধকারময় কারাগারের বিষাদময় কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক অনুতপ্তহৃদয়ে প্রতি দিন মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন, সেই [illegible] সময়ে যিনি শিখসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, তাঁহার নাম

বিরোধে যোগদান করেন, এবং সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র "দারাশেকো"র সহায় হন। যাহা হউক, এই ভ্রাতৃবিরোধের যে পরিণাম হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন; আরঙ্গেব ধূর্ত্ততাপ্রভাবে সিংহাসন লাভ করিয়া বিদ্রোহাপরাধে গুরু হররায়কে সপরিবারে দিল্লীতে আবদ্ধ রাখেন। গুরু হররায় কারারুদ্ধ হন নাই বটে, কিন্তু সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত দিল্লী ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এই সময় গুরু রামরায়ের জন্ম হয়, এবং এই দিল্লী নগরেই ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে পনের বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতৃহীন হন। সিংহশাবক পিঞ্জর মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত, যে স্বাধীনতার উষ্ণ শোণিতস্রোত তাঁহার গৌরবান্বিত পিতৃপুরুষদিগের ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, গুরু রামরায় জীবনে এক দিনের জন্যও সে স্বাধীনতার মাধুর্য্য আস্বাদনের অবসর পান নাই; দিল্লী তখন প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিলাসিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরশ্রেণীর মধ্যে রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় বিরাজিত ছিল, মোগলসাম্রাজ্য তখন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ়, এবং তাহার বিশাল বীর্য্য, অখণ্ড প্রতাপ, অসীম অর্থগৌরব, এবং অনিয়ন্ত্রিত আনন্দোৎসব ও উচ্ছ্বসিত হর্ষকোলাহল, সেই জনাকীর্ণ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যবহুল রাজধানী পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। এই উৎসবময় নাট্যশালায় উপবিষ্ট হইয়া, বিস্মিতপ্রায় দর্শকের ন্যায় গুরু রাম কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই, কর্ম্মস্রোত কি গভীর গর্জ্জনে তাঁহার পিতৃভূমি পঞ্চনদের পুণ্যপ্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উপর কূটবুদ্ধি সম্রাট আরঙ্গেবের স্নেহ ও যত্ন তাঁহার পিতৃস্নেহের স্থান পূর্ণ করিল, তাঁহার আদর ও সম্ভ্রম বাদসাহপুত্রগণ অপেক্ষা ন্যূন রহিল না, সুতরাং বালক দিল্লীশ্বরের সুবর্ণশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এক দিন এ জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল, এক দিন তিনি এ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অভীষ্টপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। শিখজাতির হৃদয় হইতে, বিশ্বাস ও ভক্তি হইতে তখন তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত; এই রাজপ্রাসাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে নাই। অবশেষে তিনি বিলাসের কাম্যকানন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের একটি নির্জ্জন নেপথ্যে উপস্থিত হইয়া উদাসভাবে জীবনযাপন করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

আরঙ্গেব যতই কূটবুদ্ধি ও ধূর্ত্ত হউন, তথাপি তিনি মানব; মানসুলভ ভ্রমজাল হইতে মুক্ত থাকা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নয়। যে অভিপ্রায়ে তিনি রাম-

নৈতিক ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট ক্রূরচেতা আরঞ্জেবের সেই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রকাশিত। স্নেহের অনুরোধে স্নেহ করা, কর্ত্তব্যের অনুরোধে যত্ন বা আদর করা, আরঞ্জেবের স্বভাবে বা কার্য্যে কখনও দেখা যাইত না; স্নেহ, মমতা, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি তাঁহার শঠতাময় অভিপ্রায়সিদ্ধির প্রধান সহায় ছিল, সুবিধা বুঝিয়া তিনি অপরকে যত্ন করিতেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি পরের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। তাহার পর কার্য্য সফল হইলে, সেই হতভাগ্যদিগকে কীটের ন্যায় পদতলে দলিত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দিল্লীর বাহ্যদৃশ্য যতই উজ্জ্বল ও উৎসবপূর্ণ থাক, এবং দিল্লীর পুষ্পসমাচ্ছন্ন রত্নরাজিপরিশোভিত রাজপ্রাসাদে অপ্সরোসদৃশী সুন্দরীবৃন্দের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে যতই হর্ষ ক্ষরিত হউক, সম্রাট আরঞ্জেবের হৃদয় চিন্তা কিম্বা ভয়শূন্য ছিল না। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে রাজপুত জাতি যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহা ক্রমে বিস্তৃততর হইয়া বিপুল মোগলসাম্রাজ্য স্পর্শ করিয়াছিল; তাহার উপর যদি পঞ্চনদের এই যুদ্ধকুশল পরাক্রান্ত বীরজাতি মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধনে যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য, এই মনে করিয়াই ক্রূরচেতা সম্রাট আরঞ্জেব রামরায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বৃথা হইয়াছিল। শিখেরা রামরায়কে গুরুপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন; শিখ সম্প্রদায় এখন মুসলমান সম্রাটের শত্রু, সুতরাং গুরুপুত্র হইলেও আরঞ্জেবের বন্ধুকে তাঁহারা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। সত্য বটে, এক দিন তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, বিনীত সাধুসম্প্রদায় ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কর্ম্মপ্রাণ, মহাযোদ্ধা, অমিততেজা বীরজাতি; শান্তস্বভাব ধার্ম্মিক রামরায়কে অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা হরিকিষণকে গুরুপদে বরণ করিলেন। এই শিশু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করায়, রামরায় শিখসম্প্রদায়ের গুরুপদলাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার শিখসমাজে প্রবেশদ্বার চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। হরিকিষণের মৃত্যুর পর, শিখেরা একমত হইয়া গুরু হরগোবিন্দের পুত্র, মহাতেজস্বী, স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাবীর তেগবাহাদুরকে গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তেগবাহাদুর সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শিখগুরুর খ্যাতি, শিখপরাক্রমের প্রতি-

মুসলমানের তীক্ষ্ণ তরবারীতে তেগবাহাদুরের ছিন্ন শির ধূলিলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই শোণিতস্রোত বৃথা প্রবাহিত হয় নাই; তাহা শিখজাতির দুর্দ্দমনীয় প্রতি-হিংসা-অনলে আহুতিস্বরূপ হইল। অবশেষে তেগবাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র গোবিন্দ সিংহ, শিখ জাতির হৃদয়ে যে অভিনব শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, তাহা মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ডের পর গুরু রামরায় আর একবার গুরুপদপ্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার তৃতীয় উদ্যম; ক্রমাগত তিন বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন, শিখেরা এবারও পূর্ব্ববারের ন্যায় তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া গোবিন্দ সিংহকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গোবিন্দ সিংহের ন্যায় কয় জন লোক এ পর্য্যন্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? পৌরাণিক ভারতের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আধুনিক জগতের চারি জন মহাপুরুষকে স্বদেশহিতৈষী বীরের শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে; এই চারি জন—প্রতাপসিংহ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ এবং রণজিৎসিংহ।

গোবিন্দ সিংহ শিখগুরুর পদে আরোহণ করিলে রামরায়ের সমস্ত আশা বিদূরিত হইল; তিনি বুঝিলেন, এই নবদীক্ষিত যুদ্ধনিরত জাতির গুরুগিরি করা তাঁহার ন্যায় শান্তপ্রকৃতি উদাসীনের কর্ম্ম নহে। তিনি স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং গুরু নানকের নামে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিনায়কত্ব করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। লোকালয়ের বিচিত্র কলরবের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই নির্জ্জনবাসে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিসুখে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজার নামে এক খানি অনুরোধপত্র লইয়া, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। গাড়োয়ালরাজ তাঁহাকে সশিষ্যে দেরাদূনে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, তদনুসারে তিনি প্রথমে টনস্ নদীর তীরে 'কাণ্ডলী' নামক একটি নির্জ্জন স্থানে কিছু দিন বাস করেন। এই স্থানে অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি কাঁঠাল গাছ ছিল, (এখন আর নাই, অতি অল্প দিন হইল, বিনষ্ট হইয়াছে।) জনরব তিনি স্বহস্তে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অধিক দিন এখানে বাস করা তাঁহার অনভিপ্রেত হওয়ায়, "ধামুওয়ালা"তে তিনি এই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন; 'ধামুওয়ালা' এখন দেরাদূন নগরের মধ্যে পড়িয়াছে।

সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল, শোকতাপে জর্জ্জরিত, ব্যথিত-হৃদয় নরনারীগণ তাঁহার পবিত্র উপদেশে হৃদয় সংযত করিবার জন্য তাঁহার চরণোপান্তে উপনীত হইল, এবং ধীরে ধীরে দেরাদূন সহর সংস্থাপিত হইল। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'গুরুদ্বার' বা 'গুরুদেরা,' ক্রমে ক্রমে 'গুরু' লোপ পাইয়া, ইহা 'দেরা' নামেই প্রসিদ্ধ হইল, ও 'দুন' প্রদেশে অবস্থানের জন্য "দেরাদূন" এই পূর্ণ নাম গ্রহণ করিল। কিন্তু 'দেরাদূন' নাম এইরূপে উৎপন্ন হইলেও, ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সাধারণ লোক এই স্থানকে "দ্রোণকা ডেরা" অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবের আচার্য্য দ্রোণের 'দেরা' বা বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং তাহাদের মতে এই জন্যই এ প্রদেশের নাম "দুন" হইয়াছে। এই উভয় মতের মধ্যে কোন মতটি যথার্থ, ঠিক বলা কঠিন, তবে যাঁহারা মহাভারতোক্ত ঘটনাকে একটা রূপক জ্ঞান করিয়া কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষক সেই বৃদ্ধ গুরুটিকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের নিকট প্রথমোক্ত মতই আদরণীয় ও বিশ্বাসযোগ্য।

দেরাদুনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর, রামরায় আর কখনও শিখ সম্প্রদায়ের গুরুপদলাভের চেষ্টা করেন নাই; তাঁহার শিষ্যশ্রেণী 'উদাসী সাধু' নামে প্রসিদ্ধ। গুরু নানকের নামে তিনি যে সাধুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন, পঞ্জাবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত লোকও দেখা যায়।

গাড়োয়ালের রাজা ফতে সা এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সেই সময় চারি খানি গ্রাম দান করেন, প্রথমে এই গ্রাম কয়েক খানি হইতে যে আয় হইত, তাহা অধিক নহে; কিন্তু এখন তাহার যথেষ্ট আয় হইয়াছে। গুরুদ্বারের মোহন্তই এখন দেরাদুনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনী ও পদস্থ ব্যক্তি। অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে সাত খানি গ্রাম নিষ্কর দান করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিহরীর রাজার নিকটও তাঁহারা ছয়খানি গ্রাম লাভ করিয়াছেন।

অনেক দিন হইল, এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এবং তাহার কোনও প্রকার অবস্থান্তর ঘটে নাই, আর যদি কখনও ইহার জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন হয়, তবে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের মন্দিরসংস্কারের জন্য যেমন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, এই মন্দিরসংস্কারের জন্য সেরূপ ভিক্ষাবৃত্তির আবশ্যক হইবে না। গুরুদ্বারের

উদাসী সন্ন্যাসীগণের পুণ্য তীর্থ মাত্র; আর আমাদের পুরুষোত্তম আট কোটি বঙ্গবাসীর এক মহাতীর্থ; শুধু বঙ্গবাসী কেন, উৎকল, বিহার, উত্তরপশ্চিম, ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই অগণ্য ভক্ত, অসংখ্য পাপী তাপী প্রতি বৎসর জলস্রোতের ন্যায় শতশতক্রোশবিস্তৃত দুরতিক্রমণীয় পথ অক্লান্তভাবে অতিক্রম করিয়া, বঙ্গসাগরোপকূলবর্ত্তী এই মহাতীর্থে সমাগত হইয়া, জগন্নাথের প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জীবন পবিত্র করিয়া লয়; বিধাতার বিড়ম্বনা! আজ সভাস্থলে ক্ষীণকণ্ঠে সেই জগন্নাথদেবের প্রাচীন মন্দিরের গৌরবকাহিনী ঘোষণা পূর্ব্বক মন্দিরসংস্কারের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

গুরুদ্বারের মন্দিরের সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী বর্ত্তমান; এদেশে পুষ্করিণী খনন করা বিলক্ষণ কষ্টকর ও অর্থসাধ্য ব্যাপার, এইজন্য এখানে প্রায়ই পুষ্করিণী দেখা যায় না। এই পুষ্করিণীর জল অভ্যন্তরস্থ প্রস্রবণ হইতে সমুদ্ভূত নহে, রাজপুর খাল হইতে এই জল আনয়ন করা হয়। এই পুষ্করিণীতে নানাবিধ মৎস্য আছে।

প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র এখানে একটি মেলা হয়, তাহার নাম "ঝাণ্ডার মেলা"। "ঝাণ্ডা" কথাটির অর্থ আগে একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। সন্ন্যাসীদিগের হস্তে এক গাছি করিয়া লাঠী থাকে, কোনও স্থানে বাস করিতে হইলে প্রথমে সেইখানে লাঠী প্রোথিত করে, এবং তাহার অগ্রভাগে নিশানের মত এক খণ্ড লালকাপড় বাঁধিয়া দেয় ও তাহার পর সেখানে আসন পাতে। আমাদের দেশেও কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ফকিরের মধ্যে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু রামরায়ও চৈত্র মাসের প্রথমদিনে এখানে আসিয়া আড্ডা করেন ও ঝাণ্ডাস্থাপন করেন। সেই উপলক্ষে এখনও প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে। পঞ্জাব হইতে এখন দলে দলে শিখ এখানে এই "ঝাণ্ডার মেলা" দেখিয়া ও গুরু রামরায়ের "ঝাণ্ডা" নামাইয়া উঠাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। রামরায়ের সেই 'ঝাণ্ডা' এখন আর ক্ষুদ্র লাঠী নাই, সুবৃহৎ জাহাজের মাস্তুলের মত একটি প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ডে পরিণত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বশরীর লাল বস্ত্রখণ্ডে পরিবৃত, শিরোদেশে সমুজ্জল লোহিত নিশান। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর ইহা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার নিয়ম নাই; সিংহদ্বারের সম্মুখে, পুষ্করিণীতীরে প্রায় ১৫।২০ হস্ত উচ্চ স্থান ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা বাঁধান হইয়াছে; তাহারই ভিতর সেই প্রকাণ্ডকায় 'ঝাণ্ডা' দণ্ডায়মান থাকে।

যদি সেই কাষ্ঠদণ্ডের অবস্থা ভাল থাকে, তবে তাহার গাত্রেই নূতন লাল কাপড় জড়াইয়া নূতন নিশান খাটাইয়া 'ঝাণ্ডা' উঠান হয়, নতুবা কাষ্ঠদণ্ড বদলাইয়া দিতে হয়। ঝাণ্ডা তুলিবার সময়ের দৃশ্য অতি চমৎকার, আমাদের দেশে এত উত্তেজনাপূর্ণ কোনও উৎসবই নাই, এবং অতি অল্পসংখ্যক উৎসব উপলক্ষেই বিদেশ হইতে এত জনসমাগম হইয়া থাকে।

১লা চৈত্রের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে, সহস্র সহস্র নরনারী ঝাণ্ডা-তলে সমবেত হইতে আরম্ভ করে; সককেরই মুখ প্রফুল্ল, এবং সর্ব্বশরীর অবস্থানুরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত। ক্রমে ঝাণ্ডা তুলিবার সময় হইলে মন্দিরের মহান্ত সেখানে উপস্থিত হন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকগণ উৎসাহে "জয় গুরুজি কি জয়" শব্দে কর্ণ বধির ও আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ঝাণ্ডা নামাইয়া ফেলে, তাহার. অল্পক্ষণ পরে সেই সমস্ত লোক পুনর্ব্বার সেই 'ঝাণ্ডা' পূর্ব্ব স্থানে সংস্থাপিত করে; অনন্তর প্রত্যেকে 'ঝাণ্ডার' গাত্রে "রাখি" বাঁধিয়া দেয়। গুরুদ্বারের মহান্ত সেদিন অনাহারে, গলে উত্তরীয় বাঁধিয়া, নগ্নপদে, কৃতাঞ্জলিপুটে ঝাণ্ডার নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। যে মহান্ত মঠপ্রান্তে পদার্পণ করিতেও অপমান বোধ করেন, যাঁহার মস্তকে ছত্রধারণের জন্য এবং পদতলে পাদুকাপ্রদানের নিমিত্ত শত শত ব্যক্তি সদা সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করে, আজ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীনবেশে, বিনীত ভাবে, গললগ্নীকৃতবাসে ঝাণ্ডার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আজ জনসাধারণের মধ্যে তিনি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দূরে দাঁড়াইয়া আমি এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম; আমার মনে হইল, বিধাতার সিংহাসনের সম্মুখেও বুঝি এই নিয়ম, সমদর্শিতাই বুঝি সেখান-কার অলঙ্কার, এবং সেই সুখস্বর্গে অহঙ্কার ও অবিনীত ভাব লইয়া মানবের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সেই দিনের পবিত্র দৃশ্য চিরকাল আমার মনে থাকিবে।

এক বৎসর এমন হইয়াছিল যে, 'ঝাণ্ডা' আর কিছুতেই তুলিতে পারা যায় না; যাহারা ইহা তুলিবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতেছিল, তাহারা আমাদের মত দুর্ব্বল বাঙ্গালী নহে; এক একটা অসুরের মত বলবান। সহস্র সহস্র লোকে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন ঝাণ্ডা উঠাইতে পারিল না, তখন সেই উৎসবক্ষেত্রে সমাগত ভক্ত নরনারীর মধ্য হইতে একটা ঘোর ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল, এবং এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলেই ভীত ও

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে আরও অধিক ভীত হইয়া পড়িল, হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সকলের মুখেই বিষাদকালিমা পরিব্যাপ্ত। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে উৎসবক্ষেত্র আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা যেন তরঙ্গায়িত শোকসাগর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "হো গুরুজী, হো গুরুজী"; অর্ণবযান সমুদ্র মধ্যে বিপথগামী হইলে বা ঝঞ্ঝাবাতে জলমগ্ন হইবার উপক্রম ঘটিলে, যেমন বিপন্ন আরোহীগণ আকুলভাবে পোতচালকের মুখে একটি আশ্বাসবাণী শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে, এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য তাঁহার মিনতি করে, এই সমাগত দর্শক ও ভক্তগণের অবস্থাও সেইরূপ। কিন্তু কে তাহাদের আশ্বাসবাণী দিবে? মহান্ত নিজে মুহ্যমান।

যাহা হউক, চেষ্টার ত্রুটি হইল না; ক্রমে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, কিন্তু এতগুলি লোক চেষ্টা করিয়া কিছুতেই 'ঝাণ্ডা' উঠাইতে পারিল না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতি শক্ত, স্থূল কাছি ধরিয়া উন্মত্ত ভক্তগণ টানাটানি করে, আর সেগুলি জীর্ণসূত্রের মত ছিঁড়িয়া যায়। আর উপায় নাই, সকলের বিশ্বাস হইল, গুরুজীর অকৃপা হইয়াছে; নতুবা 'ঝাণ্ডা' এমন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিবে কেন? অনেকে বলিতে লাগিল, হয় ত মহান্ত মহাশয়ের সেবার ত্রুটি হইয়াছে, তাই এ বিপদ। কেহ কেহ মহান্তের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কেহ কেহ বা মহান্তকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিয়া নূতন মহান্ত নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিল।

অবশেষে মহান্ত মহাশয় উন্মত্তের মত হইয়া সেই জনতার চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; রৌদ্রে তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার উপর নিরাশা ও বিষাদের মলিনতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া অনেকেই সন্তপ্ত হইল, তাঁহার উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া সকলে আর একবার অগ্রসর হইল, শরীরের সমস্ত বল এবং প্রাণের সমস্ত ভক্তি নিয়োজিত করিয়া, স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, আর একবার 'ঝাণ্ডা' উঠাইবার জন্য টানাটানি করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝাণ্ডা উঠিয়া গেল। সহসা সেই বিষাদাচ্ছন্ন জনস্রোতের মধ্যে যে আনন্দকল্লোল উত্থিত হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়; উৎসাহে সকলে "জয় গুরুজী কি জয়" রবে আকাশ

আমি, আমার হৃদয়ও যেন এই বীর জাতির ন্যায় উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া উঠিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে সমস্বরে "জয় গুরুজী কি জয়" বলিয়া উঠিলাম।

এই দিনে মহান্তর বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়, সকলেই তাঁহাকে প্রণামী দেয়। গুরুদ্বারে নিত্য অতিথিসেবা আছে। 'ঝাণ্ডা' মেলার ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে অহোরাত্র মন্দিরপ্রাঙ্গণে গান হয়, দলে দলে গায়কেরা চারি দিকে গান করিতেছে, দিবারাত্রির মধ্যে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এক দল যাইতেছে, এক দল আসিতেছে; লোকে লোকারণ্য। মন্দিরের মধ্যে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পায় না, বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশের ন্যায় জুতা চুরী যাইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

গুরুদ্বার এবং ঝাণ্ডার কথা কিছু কিছু বলা হইল। গুরু রামরায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এরূপ প্রবাদ আছে যে, রামরায় মধ্যে মধ্যে একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই তিন দিন ধরিয়া তাহার অভ্যন্তরেই বাস করিতেন; ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিতেন, সুতরাং অন্য কেহই সে ঘরে যাইতে পারিতেন না। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সময় তিনি যোগবলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একবার তিনি তাঁহার চারি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি সপ্তাহ কাল গৃহমধ্যে থাকিবেন, এই সময়ের মধ্যে যেন কেহ তাঁহাকে না ডাকে। প্রথম চারি দিন এক ভাবেই অতিবাহিত হইল, কিন্তু গৃহমধ্যে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রীগণ অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন; পঞ্চম দিনে তাঁহার পতিপ্রাণা তৃতীয়া স্ত্রী আর থাকিতে পারিলেন না, ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গুরুজী যোগাসনে বসিয়া আছেন, চক্ষু নিমীলিত মুখে প্রসন্ন ভাব বিরাজিত, কিন্তু দেহ স্পন্দহীন, দেহে প্রাণ নাই। চারি দিকে হাহাকার রব উঠিল; সকলেই বুঝিল, দেহে প্রাণ আর ফিরিয়া আসিবে না, তাঁহার ইহ-জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

রামরায় যে আসনে বসিয়া যোগমগ্ন অবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন, সেই আসন এই মন্দিরমধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। গুরুজীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা পত্নী মাতা পঞ্জাব কুয়ার সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন; অবশেষে গুরুজীর শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হরপ্রসাদ, মহান্ত পদ লাভ করেন। এই সময় হইতে নিয়ম হয় যে, মহান্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান

কোনও কোনও মহান্তের ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ব্যসনাসক্ত না হইলেও, বিলাসিতাশূন্য নহেন। যে দেবসম্মান ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইঁহারা প্রতিপালিত, তাহাতে বিলাসী হওয়া আশ্চর্য্য নহে, বরং বিলাসশূন্য হওয়াই বিচিত্র। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে মঠ সংস্থাপিত করেন, তাঁহারা প্রায়ই অনাসক্ত যোগী, কিন্তু পরবর্ত্তী মহান্তেরা সেই সকল মহৎপ্রকৃতি গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও, তাঁহাদের অলৌকিক গুণগ্রাম, অবিচল একনিষ্ঠা এবং একান্ত নির্লিপ্ততা লাভ করিতে পারেন না, বিবিধ কামনা কঠোরতার আবরণের অভ্যন্তরে সামান্য বহ্নিকণার ন্যায় লুক্কায়িত থাকে; এবং কালক্রমে তাহা প্রজ্জলিত হইয়া দাবানলের সৃষ্টি করে, এবং তাহাতে মঠের পবিত্রতা, গৌরব সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। গুরুদেবের এই মঠ সম্বন্ধে অবশ্য এতখানি কথা বলা যায় না; কারণ, এই মঠ বঙ্গদেশে নহে, এবং এই স্বাধীনপ্রকৃতি বীরজাতির মধ্যে এখনও ইহার অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। বিবাদ বিসম্বাদে, কিম্বা মামলা মকদ্দমায় ইহার অর্থভাণ্ডার শূন্য হইবার এখনও কোনও কারণ ঘটে নাই; কিন্তু পূর্ব্বের সেই ভাব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস এখন আর নাই। তবে শিখজাতির মঠ, তাই ইহা হইতে এখনও প্রাণ অন্তর্হিত হয় নাই; হইলে, আমাদের দেশের মঠগুলির ন্যায় ইহা ধর্ম্মমহিমার স্থায়ী উপহাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইত।

শ্রীজলধর সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

দর্শন।

অহংজ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ।

অহংজ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ।

মে সংখ্যা কণ্টেম্পোরারি রিভিউয়ে বিবি এমা কৈলার্ড 'অহংজ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ' বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হয়, বিবি পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞা। আর্য্য দর্শনশাস্ত্রেরও দুই চারিটা তত্ত্ব যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, বোধ হয়।

মানব জগতের অংশ।

বিবির বিবর্ত্তনবাদে পূর্ণ বিশ্বাস। তাঁহার মতে নিরঙ্গ জড়জগৎ হইতে সাঙ্গ চেতন জগতের বিকাশ। ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভিদ হইতে ইতর প্রাণী, শেষ মানুষ। অতএব মানুষ জগতের অংশভূত, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র নহে। জড় বা জীব জগৎ হইতে মানুষের এইমাত্র প্রভেদ যে, মানুষ উন্নতির পথে সমধিক অগ্রসর। অতএব যাহা ইতর জগতে বীজ বা অঙ্কুর, মানুষে তাহা

নহে। নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তু—অধিক কি, নিম্নতম প্রাণীও অহংজ্ঞানাপন্ন। সকলেই অনুভব করিতে পারে যে, তদিতর জগৎ হইতে সে স্বতন্ত্র। তবে মানুষেই এই জ্ঞান বিশেষ স্ফূর্ত্ত।

মানুষ যখন জড়জগতের বিবর্ত্তন এবং জড়জগতে যাহা বীজভূত, তাহাই যখন চেতন মানুষে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, তখন এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, জড়জগৎ বাস্তবিক জড় নহে। ইহাকে জড় বলা বড় ভ্রম। জড়বাদী জড়জগৎ বা প্রকৃতিকে (matter) জৈব জগতের মূল বলিয়া বর্ণনা করেন। যেমন বটবীজ বটবৃক্ষের মূল, অথবা গর্ভবীজ জীবদেহের মূল, ইহাও সেইরূপ। কথা যথার্থ, কিন্তু বটবীজ বা গর্ভবীজ কি, জড় না জীবন্ত? অবশ্যই জীবন্ত। প্রকৃতিও এইরূপ। প্রকৃতি জড় নহে, জীবন্ত। জীবন হইতে জীবনের উদ্ভব সম্ভবে, জড় হইতে নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে, এই মানুষের উদ্দাম আশা, অতুল্য ধী, অমেয় প্রেম, উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা—এ সকল নগণ্য প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত? হইবে বৈ কি। প্রকৃতি নগণ্য নহে, প্রকৃতি (matter) জীবন্ত, চিতিময়।

জগতের সজীবতা।

জগৎ চিতিময়।

জড়বাদ এই ভাবে বুঝিলে ইহাতে আমরা নিত্য সত্যের সাক্ষাৎ পাই। বাস্তবিক চিতিময় বলিয়াই প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি, তাই ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বিচিত্রতম মানুষের পরিণতি। মানুষে যে অহংজ্ঞান সুব্যক্ত, তাহা প্রকৃতির সর্ব্বত্রই অনুস্যূত। প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন অন্ধ জড়শক্তির অর্থহীন ক্রীড়ামাত্র নহে, কিন্তু ঈক্ষাময় চিতি শক্তির সার্থক লীলাতাণ্ডব।

প্রকৃত জড়বাদ কি?

জড় জগৎ চিতিময়; কিন্তু চিতি ও জড় এক পদার্থ নহে। তবে ইহাদের সম্বন্ধ নিত্য। চিতিশক্তি অনাদি, এই সম্বন্ধও অনাদি, সুতরাং জড়জগৎও অনাদি। অতএব যাহাকে সৃষ্টি বলা যায়, তাহা অভাবের ভাব নহে, অসত্তার সত্তা নহে। কিন্তু অবিশেষের বিশেষ, সতের পরিণাম, ভাবের অভিব্যক্তি।

জগৎ অনাদি।

জগৎ চিন্ময়—এই চিতিশক্তি আবার ঈক্ষান্বিতা (Intelligent); অতএব জগৎ ঈশশক্তির অভিব্যক্তি, অর্থাৎ জগতের আদি অন্ত ঈশ্বরে; তাঁহা হইতে উদ্ভব, তাঁহাতেই লয়। ঈশশক্তিতে জগৎ অনুপ্রাণিত, জড়ে চেতনে, সাঙ্গ জগতে নিরঙ্গ জগতে সর্ব্বত্রই সমান বিকশিত। জগতের স্থিতি ঈশ্বরাবলম্বী, জগতের গতি ঈশ্বরাভিমুখী। ঈশ্বর ভিন্ন জগৎ নাই।

জগৎ ঈশ্বরের রূপ।

বিবির প্রবন্ধ যাঁহারা অনুধাবন করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বিবির সিদ্ধান্তিত তত্ত্বের সহিত আর্য্যদর্শনের তত্ত্ব সকলের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'—'আমাতে জগৎ প্রোত সূত্রে মণিগণ যথা'। গীতার উক্ত মহাবাক্যের সহিত কি বিবির সিদ্ধান্ত অভিন্ন নহে? ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে জগতের আদ্যন্তমধ্য বলিয়া জগৎকে 'তজ্জলান' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ জগতের ঈশ্বরেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে। জগৎ তজ্জ (ঈশ্বরজাত) তল্ল (ঈশ্বরে লীন) এবং তদন (ঈশ্বরে অবস্থিত) একটি সূত্রে কি গভীর তত্ত্বরাশি! বিজ্ঞান এত দিনে দূরে দূরে তাহার অনুসরণ করিতেছে। 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'—'প্রকৃতি পুরুষ আর অনাদি উভয়'। বিবি জগৎকে চিন্ময় বলিয়া ও প্রাকৃত সৃষ্টির অপলাপ করিয়া ঐ কথারই সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃতিই বিবির জড়জগৎ (matter) এবং পুরুষ চিৎশক্তি। গীতাকার বলেন,—

মতামত।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং। স্থাবর জংগম কিবা যাহা কিছু জগন্ময়,

চিন্ময় জগতের বিবর্ত্তবাদ কি ঐ এক শ্লোকে সূত্রিত নহে? বেদান্ত মতে মায়োপহিত চৈতন্য হইতে জগতের বিকাশ বা আভাষ। এই মায়া প্রকৃতির নামান্তর। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—'মায়ারে প্রকৃতি মান'। অতএব, চিন্ময় প্রকৃতি বা জগন্ময় চিতিই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। ইহাই অব্যক্ত অবিশেষ অব্যাকৃত নামে পরিচিত। ইহাই বিবির ঈশ্বরাণুপ্রাণিত জড়জগৎ।

পাশ্চাত্যেরা অল্পে অল্পে গভীর গবেষণা ও মার্জ্জিত ধীশক্তিবলে আর্য্যযোগীর আবিষ্কৃত তত্ত্বে উপস্থিত হইতেছেন। জগতের শুভাদৃষ্ট বটে!

সাহিত্য।

জোলার জীবন ও কার্য্য।

বর্ত্তমান যুগে জোলা এক জন প্রতিভার অবতার। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এক্ষণে নানা দিক হইতে এত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইতেছে যে, সে সকলের উপর সহসা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে বলেন, জোলার প্রণীত উপন্যাস গুলিতে সমাজের অন্ধকার বা দুঃখময় অংশ প্রদর্শিত হয়—আমরা বুঝিতে পারি, আমাদিগের এই বাহ্যচাকচিক্যময় সমাজ কিরূপ অন্তঃসারশূন্য—কিরূপ পাপপঙ্কিল,—ইহাতে অনেক উপকার আছে। আবার অনেকে বলেন যে, জোলার উপন্যাস সকল সমাজে ব্যাধির বিস্তার করে মাত্র, উপকার অপেক্ষা তাহাতে অপকার অনেক অধিক। টেনিসনের ন্যায় রসজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। Locksly Hall কবিতার উপসংহারভাগে তিনি লিখিয়াছেন,—

জোলা।

"Feed the budding rose of boyhood with the drainage of your sewer;
Send the drain into the fountain, lest the stream should issue pure.
Set the maiden fancies wallowing in the troughs of Zolaism,—
Forward, forward, ay and backward, downward too into the abysm."

কিন্তু জোলার মত প্রতিভাশালী লেখক যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অল্প, তাহা ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান নীতির উপাসক সম্পাদক মিষ্টার ষ্টেডও স্বীকার করিয়াছেন। কয় বৎসর হইল, "নর্থ আমেরিকান রিভিউ" পত্রিকায়, সার এডউইন্ আর্ণল্ড লিখিয়াছিলেন যে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জোলার "La Bete Humaine" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ পুস্তকে এমন সকল কদর্য্য ভাব আছে যে, পাঠমাপ্তির অব্যবহিত পরে, তিনি ঐ পুস্তক আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিপুল বারিগর্ভে নিক্ষিপ্ত করেন, কিন্তু তথাপি তিনি মনে করেন যে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মধ্যে ঐ পুস্তক সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। হায় যদি এই প্রতিভাবান্ লেখকের প্রতিভা যোগ্যতর বিষয় ব্যবহৃত হইত!

এপ্রিল সংখ্যা "ম্যাক্‌লুরস্ ম্যাগাজিন" পত্রে মিষ্টার সারার্ড, জোলার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রবন্ধটি অত্যন্ত দীর্ঘ; আমরা সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

যাঁহারা কখনও জোলাকে দেখেন নাই, তাঁহাদিগের জোলার চেহারা সম্বন্ধে ধারণা বড়ই ভ্রান্ত। তাঁহারা মনে করেন, জোলার শরীর মেদাধিক্যযুক্ত, আলস্যজড়িত, এবং ইন্দ্রিয়সুখলোলুপের মত। বাস্তবিক জোলার চেহারা এরূপ নহে। তিনি ক্ষীণশরীর এবং দীর্ঘও নহেন। সমস্ত মুখমণ্ডলে গভীর চিন্তার রেখা অঙ্কিত; দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি দুঃখভারাক্রান্ত এবং সংসারাসক্তিশূন্য। যে সকল বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, কেবল সেই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার

আকার প্রকার।

সময় সেই চিন্তাক্লিষ্ট বদন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, এবং সেই প্রতিভাদীপ্ত নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতে থাকে; তখন সেই বিরূপ দেহাবরণ ভেদ করিয়া অসামান্য প্রতিভা-জ্যোতিঃ আপনাকে প্রকাশ করে।

অন্ধকারবাদ।

জোলা মনে করেন যে, তাঁহার মত সম্বন্ধে লোকের প্রচলিত বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত। লোকে মনে করে যে, তিনি অন্ধকারবাদের অন্ধ উপাসক; কিন্তু তিনি আলোক বা সুখবাদের উপাসক। তিনি বলেন, বংশানুক্রম বড় ভয়ানক, ইহাতে পূর্ব্বপুরুষদিগের পাপের ভার পরবর্ত্তী বংশধরদিগকে বহন করিতে হয়। যদি স্ত্রীপুরুষের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বৈষম্যগত প্রভেদ লইয়া এই বংশানুক্রমের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের কোনও নিয়মানুযায়ী উপায় হয়, তবে মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে অনেক আশা করা যায়।

প্রথম পুস্তক।

অল্প বয়সেই জোলা গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। এইক্স কলেজে অধ্যয়নকালে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম পুস্তক রচনা করেন। বোধ হয়, সেখানি "মধ্যযুগের ইতিহাস" (History of the Middle Ages) গ্রন্থ পাঠ করিবার পর ধর্ম্ম সংগ্রাম (the Crusades) সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—কাজেই সেখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস "বোধ হয়"। কেন না, এখন তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যদিও গ্রন্থকারের নিকট সেই গ্রন্থলিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান, তথাপি তখন তাঁহার হস্তাক্ষর এতই কদর্য্য ছিল যে, এখন তিনি আর তাহার এক বর্ণও পাঠ করিতে সমর্থ নহেন। তিনি এত দিন পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কাগজখণ্ড যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছেন।

প্যারিসে আসিয়া যখন জোলা জীবিকার উপযোগী অর্থের জন্য জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার সে সময়কার জীবন বড় যাতনা ও দুঃখময়। উপযুক্ত কার্য্যাভাবে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহার পর যখন স্রোত ফিরিল, তখন তিনি এত কার্য্য পাইলেন যে, সে সকল এক জনের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে বলিয়াই সহসা মনে হয়। তবে সুশৃঙ্খলানুসারে কার্য্য করিয়া জোলা এখন বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

কার্য্যের নিয়ম ও নিয়মপ্রিয়তা।

জোলা অত্যন্ত নিয়মপ্রিয়; তিনি এক নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। বহু দিন হইতে তিনি প্রতিদিন প্রভাতে নিয়মমত তিন হইতে চারি ঘণ্টা সাহিত্য-সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। তিনি প্রতিদিন দ্বিখণ্ডিত ফুল্‌স্‌কেপ কাগজের চারি হইতে ছয়খানি পর্য্যন্ত লিখিয়া থাকেন। তিনি ধীরে ধীরে লেখেন, এবং চিন্তাপূর্ব্বক যত্নসহকারে প্রতি ছত্র লিখিয়া থাকেন। ইহাতে এই হয় যে, তাঁহার রচনায় আর সংশোধনের আবশ্যক হয় না। প্রতিদিন তিনি প্রায় ১৫০০ কথা লিখিয়া থাকেন; সুতরাং বর্ষশেষে তাঁহার রচনা বড় ক্ষুদ্রায়তন হয় না। যদি একটি ছত্র শেষ করিবার পূর্ব্বেও তাঁহার মনে হয় যে, যথেষ্ট কার্য্য করা হইয়াছে, তবে তিনি তখনই লিখিতে বিরত হয়েন। কিন্তু রচনার বিষয় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, এবং পরদিবস তিনি সেই অসম্পূর্ণ ছত্র পাঠ না করিয়াও তাহার ঠিক পর হইতে লিখিয়া যাইতে পারেন।

জোলা চিরদিন নিয়মানুসারে কার্য্য করেন, এবং কখনও নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। তিনি মনে করেন, সাহিত্যচর্চ্চার জন্য নিয়মিত পরিশ্রম অত্যাবশ্যক; কাজেই পুস্তকরচনা করিতে হইলে নিয়মিত পরিশ্রম না করিলে হইবে না। তাড়াতাড়ি ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন কার্য্য কখন ভাল হয় না—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

এক এক খানি পুস্তক রচনা করিতে যথেষ্ট শ্রম এবং সময় সময় যন্ত্রণা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে

হয়। পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিবার সময় সেখানি যে কি হইবে, তাহা স্থির হয় না; সারাংশ পূর্ব্বেই স্থির হয় না; কেবল বড় জোর একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া থাকেন। প্রথমেই তিনি পুস্তকের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া লয়েন। লিখিতে বসিলে তবে তাঁহার রচনাশক্তি আসে, তৎপূর্ব্বে নহে; অলস ভাবে বসিয়া তিনি ভাবিতে পারেন না। তাঁহার খসড়াগুলি যেন তিনি আপনাকে পত্র লেখেন—তাহাতে, ঘটনা, নরচরিত্র প্রভৃতি বিষয় সকল আলোচিত হয়, সেগুলি প্রায় উপন্যাসের সমান হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর গল্পাংশ এবং চরিত্রতালিকা লিখিত হয়। তাহার পর, প্রত্যেক চরিত্র বিশেষরূপে আলোচিত হয়, এবং যে সকল স্থানের বা দ্রব্যের বর্ণনা করা আবশ্যক হইবে, সে সকল দৃষ্ট হয়; সেই সময় সে সকলের বিশেষত্ব খসড়া করিয়া তিনি লিখিয়া আনেন। "La Curee" রচনার সময় তিনি বর্ণিত যান সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং কয় জন প্রসিদ্ধ যাননির্ম্মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া আসিয়াছিলেন। "Renee"র উদ্ভিদগৃহ বর্ণনার সময় তিনি "Jardin des Plantes"এর উদ্ভিদগৃহ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ "La Dibacle" গ্রন্থ-রচনার সময় তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আর একখানি গ্রন্থরচনার জন্য তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ ধর্ম্মপুস্তক হইতে ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তখন ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া ধর্ম্মযাজকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আসিতেন।

পুস্তকরচনা।

এখন তিনি একখানি উপন্যাসরচনায় ব্যাপৃত আছেন। ইহার পর জোলা কি করিবেন, তাহা তিনিও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। ইহার পর তাঁহার শিশুদিগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিবার ইচ্ছা আছে। বহুকাল হইতে তাঁহার আর একটি ইচ্ছা আছে, তিনি ফরাসী সাহিত্যের একখানি ইতিহাস রচনা করিবেন—সেখানি ঐ বিষয়ে প্রচলিত সকল পুস্তক হইতে বিভিন্নরূপ হইবে, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চিত। কারণ জোলার প্রতিভা যে বিষয়ে নিয়োজিত হয়, সেই বিষয়কেই নূতনত্বময় করিয়া তোলে। বর্ত্তমান পুস্তক সমাপ্ত করিবার পর, হয় ত তিনি সেই ইতিহাস রচনা করিতে আরম্ভ করিবেন।

জোলার ভবিষ্যৎ গ্রন্থ।

সংবাদপত্রের জন্য রচনা।

এখন সভ্যজগতে কোনও মতামত প্রচারের এবং সাধারণ উন্নতিসাধনের উপায় সংবাদপত্র। সংবাদপত্র একমাত্র উপায় না হইলেও মুখ্য উপায় বটে। বাগ্মীর উত্তেজক, গম্ভীর বা বাগ-বৈদগ্ধপূর্ণ বক্তৃতা অনেক সময় সভাগৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে নিগড়বদ্ধ; এবং তাঁহার অসীমক্ষমতাশালী অগ্নিময় বাক্যস্রোত প্রায় সভাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়কন্দরে উপস্থিত হইয়া, সেইখানেই পর্য্যবসিত হয়; সেই কয়টি ক্ষুদ্রপ্রাণীর হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াই সে অনলরাশি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। পুস্তকরচনাও একটি উপায় বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের মত পুস্তকের বহুল প্রচার নাই; সংবাদ পত্র যত লোকে পাঠ করে, পুস্তক তত লোক পড়ে না। সংবাদপত্র সাধারণের, পুস্তক অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির। সেই জন্যই পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনা অপেক্ষা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত রচনা অধিক ফলোপধায়ী হইয়া থাকে। দেশের সাধারণ জনগণের উপর

সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের প্রভাব অপ্রতিহত, অসীম। কাজেই তাহাদিগের মতামতের জন্য সংবাদপত্রের লেখকগণ অনেক সময় দায়ী। তাঁহাদিগের সামান্য অবিবেচনার ফলে, অনেক সময় অনেক লোক ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক অকার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ উপদেশ লাভ করিয়া পরে তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হওয়া উচিত।

"ন্যাশান্যাল রিভিউ" পত্রে প্রসিদ্ধ লেখক মিষ্টার লেস্‌লী ষ্টিফেন, গ্রন্থকারদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন; তাহার মধ্যে তিনি সংবাদপত্রলেখকদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে বিশেষ কিছু নূতন কথা না থাকিলেও, সেই উপদেশ সারগর্ভ ও সুন্দর। অস্মদ্দেশে এখন সংবাদপত্রের অভাব নাই। আমরা মিষ্টার ষ্টিফেনের উপদেশের সারভাগ এইখানে দিলাম।

উচ্চচিন্তা ও ভাব।

সংবাদপত্রলেখকদিগের মধ্যে যিনি উচ্চচিন্তাশীল ও মহৎভাবময়, এবং যিনি সময়ে বা অসময়ে প্রকৃত সহৃদয়তা ও দৃঢ়তার সহিত সেই সকল চিন্তা ও ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব শীঘ্রই অধিক হইয়া উঠে। মহৎ বিষয়ের চিন্তা করাই কর্ত্তব্য, এবং হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে মহৎভাবময় করিতে পারিলে সাফল্য নিশ্চিত।

মৌলিক চিন্তা।

লেখক বলেন যে, নব্য লেখকদিগের প্রতি তাঁহার প্রথম উপদেশ এই যে, তাঁহারা কোনও মৌলিক চিন্তায় নিরত থাকিবেন; পুরাতন চিন্তার প্রভু হওয়া অপেক্ষা মৌলিক মহৎ চিন্তার দাস হওয়াও ভাল। মৌলিক চিন্তায় ব্যাপৃত না থাকিলে, রচনার নিকট, সংবাদপত্রের নিকট, আত্মবিক্রয় করিতে হয়। তাহা অপেক্ষা হীন আর কি হইতে পারে!

সত্য।

এই সকল লেখকদিগের পক্ষে সত্য অত্যাবশ্যক। যদি কোনও লেখক সত্যসত্যই কোনও মহৎ মতের পক্ষ সমর্থন করেন, এবং প্রকৃত অপরাধকে তাড়না করেন, তবে তাঁহার কার্য্য আত্মসম্মানোপযোগী হয়। লেখকের মনে থাকা উচিত যে, সত্য জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব নহে; সময় সময় তাহা কষ্টসাধ্যও হইতে পারে, কিন্তু কখনই অসম্ভব নহে।

কার্য্য ও কারণ।

লেখক বর্ত্তমান সকল ঘটনার ও প্রশ্নের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করিবেন; সে সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিবেন, এবং সে সকল রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ইতিপূর্ব্বে যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহারও অনুশীলন করিবেন। তিনি উদারহৃদয় দার্শনিকের মত উচ্চ মতের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বর্ত্তমান ঘটনা ও প্রশ্ন সকল দর্শন করিবেন। কোনও সম্প্রদায় বা বিশেষ মতামতের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবেন না। তিনি বর্ত্তমান সময়ের সকল বিষয় সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন; কারণ, ঐরূপ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। যদি লেখক এইরূপে আত্মোৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করেন, তবে তিনি লোকের অনেক উপকারসাধনে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

এই সকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, সাধারণের এবং লেখকদিগেরও অনেক উপকার হয়; কারণ লেখকদিগের দায়িত্ব গুরুতর, কর্ত্তব্যও সহজ নহে।

সমাজনীতি।

ইংরাজ ও ফরাসী।

বারিধির বিস্তৃত বিশাল বক্ষে জলবিম্বের মত, ইংলণ্ড ও মহাভূখণ্ডের প্রান্ত সীমায় সভ্যতার সুন্দর-আলোকে উজ্জ্বল, বিলাসতরঙ্গরঙ্গে প্লাবিত ফ্রান্স। যেন দুইটি বিপরীতগামী স্রোত। এক জন কর্ম্মকে জগতের সার বলিয়া মনে করে, এক জন আরামকে জগতের সার বলিয়া মনে করে; এক জন ধনদেবতা কুবেরের উপাসক, এক জন সভ্যতা-সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করে। এমন বিষম বিরোধ বৈচিত্র্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাই বুঝি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিদ্বেষভাব উভয় দেশের মজ্জাগত রোগ। তাই বুঝি, শত সহস্র বৎসরের পরিবর্ত্তনস্রোত আজ পর্য্যন্ত উভয় দেশের হৃদয় হইতে সেই ইতিহাসপত্রবদ্ধ কালের প্রাচীন ভাব মুছিয়া দিতে পারে নাই। যেখানে সবল সহৃদয়তার অভাব, সেখানে প্রকৃত ভালবাসা জন্মিতে পারে না।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স।

"ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রিকায় মিষ্টার ফ্রেডরিক কারেল, এই দুই দেশের আচার ব্যবহারাদির তুলনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।—

ফরাসীগণের চরিত্রে সর্ব্ববিষয়ানুভাবকতা এবং প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে দৃষ্টির ভাব অত্যন্ত প্রবল, তাই তাহারা সামান্য দ্রব্য হইতে এত নূতন নূতন দ্রব্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ। ইংরাজগণের চরিত্রে দ্বিধাশূন্য হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাচ্ছীল্যভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রথমটি না থাকিলে লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্‌লি প্রভৃতি কোথা হইতে জন্মিত? দ্বিতীয়টি না থাকিলে ইংরাজ ইচ্ছামাত্র প্রজাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আইন জারী করিতে পারিত না। উচ্চ ও নীচের মধ্যে ভদ্রব্যবহার ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে অধিক দৃষ্ট হয়। ফ্রান্সে বর্ত্তমান সমাজনীতি অনুসারে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থাই ভাল।

প্রধান বৈষম্য।

ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে, বিশেষ প্যারিসে, সাধারণ লোকদিগের অবস্থা অনেক উন্নত তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল, সুখ অধিক, এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান। তাহাদিগের পরিচ্ছদ ব্যবসার উপযোগী, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহারা মিতব্যয়ী, এবং কখনও নিতান্ত ইতরের মত ব্যবহার করে না। তাহারা রমণীদিগের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান। রমণীগণও চিন্তাভারকাতর নহে, এবং তাহাদিগের শারীরিক বিকাশ ইংরাজরমণীর মত মানসিক উদ্বেগজনিত শ্রমে শীঘ্র থামিয়া যায় না। ইংরাজরমণীর ধর্ম্মভাব, ফরাসী রমণীর অপেক্ষা প্রবল হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজরমণীর তেমন মিতাচারিতা ও উদ্ভাবনীশক্তি নাই।

সাধারণ জনগণ।

ফরাসীগণ দেশহিতৈষিতার বড় আদর করে। তাই বলিয়া দেশহিতৈষিতা যে সকল সময় তাহাদিগের সমগ্র হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ, তাহা নহে। সেই জন্যই বিলাসের রঙ্গভূমি ফ্রান্সে মাঝে মাঝে এই মহৎ প্রবৃত্তি হইতে অত্যাচারাদি কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যবহারদোষে সুধাও গরল হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবসায় বাণিজ্যগত দেশহিতৈষিতা অনেক সময় উপযুক্ত দ্রব্যের অনাদর করিতে শিক্ষা দেয়। ইংরাজের দেশহিতৈষিতায় ফরাসীর দেশহিতৈষিতার স্বপ্নাবেশ নাই, তাহা নিতান্ত হৈ-চৈ প্রবণ নহে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং অটল সাহস

দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি।

ইংরাজচরিত্রের ভিত্তিরূপে দণ্ডায়মান। সেই জন্যই কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজের সাফল্যও এত অধিক। লেখকের মতে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের বন্দোবস্ত ফরাসী শাসনপ্রণালী হইতে উৎকৃষ্ট।

ফরাসী সংবাদপত্রের মত, বৈচিত্র্যপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংবাদপত্র আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সাহিত্যের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা ফরাসীপত্রে যেরূপ ভাবে আলোচিত হয়; সেরূপ আর কোথাও হয় না। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র অপেক্ষাকৃত শান্ত-প্রকৃতি, এবং ঠিক কাজের কথাটুকু লইয়াই ব্যস্ত; ফরাসী সংবাদপত্র রহস্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক।

সংবাদপত্র।

ইংরাজের নৈতিক মতানুসারে বিচার করিতে গেলে, ফ্রান্সবাসীদিগের নৈতিক অবস্থা বড় শোচনীয়। এমন কি, সেখানে পুরুষদিগের নীতিজ্ঞান প্রায় নাই; কারণ, রমণীদিগের সহিত অবৈধ প্রণয় সেখানে ইংলণ্ডের মত দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় না। দুই দেশীয়েরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়। অধিকাংশ ফ্রান্সবাসী ইংরাজের প্রিয় প্রেমখেলা (Flirting) অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া মনে করে। তাহারা মনে করে যে, কোনও পুরুষ তাহার কাহিনী কোনও রমণীর নিকট ব্যক্ত করিলে, রমণীর কর্ত্তব্য তাহাকে সান্ত্বনা দান করা। ইংলণ্ডে নীতিহীনতা বড় অসংযত হইয়া পড়ে, এবং অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থায় তাহা একেবারে নিতান্ত নীচ এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়।

নীতি।

ইংরাজগণ যদি বা নীতিজ্ঞানে প্রকৃতপক্ষে অসমর্থ হয়, তথাপি তাহারা তাহাদিগের দুর্নীতিকে নীতিপরায়ণতার আবরণে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ইংরাজেরা জাতীয় ভাবে পবিত্র বলিয়া খর্ব্ব করিতে চাহে। ইহা প্রথম দৃষ্টিতে হীন ভণ্ডামি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাতে বড় উপকার হয়; যাহা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না, লোকে সহসা তাহার অনুকরণ করে না। ইংলণ্ডের দুর্নীতি নীতির আবরণে আবৃত থাকায়, সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, তাই তাহার ব্যাপ্তিও অল্প।

নীতির ভণ্ডামি।

ইংলণ্ডে বিবাহিতা রমণীদিগের ধর্ম্মজ্ঞান প্রবলতর, তাহাদিগের নৈতিকজ্ঞানও প্রবল। ব্রিটিশ রমণীর ধর্ম্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগেচ্ছার স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া যায় না; তাহা পর্ব্বতের মত সে প্রবাহবেগ প্রতিহত করে। ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগলালসা ইংলণ্ডীয়া রমণীর বিবাহের মূল নহে। অন্যান্য বিষয়ের মতামত এবং প্রেমই তাহার মূল।

রমণীদিগের নৈতিকজ্ঞান।

ইংলণ্ডের সমাজে, ধনী এবং দরিদ্র, এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ দুর্নীতিপরায়ণ হয়; কারণ, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দুই কারণে তাহাদিগের দুর্নীতি আবৃত রাখিতে সমর্থ। ধনী ধনবলে, দরিদ্র আপনার নগণ্যতায়। ইংলণ্ডের সামাজিক সোপানের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন সীমায় দুর্নীতি প্রবল।

দুর্নীতি।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বন্দোবস্তে ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতায় ইংরাজ ফরাসী অপেক্ষা অগ্রসর, কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্সের পদতলে উপবেশন করিয়া এখনও বহুকাল শিল্পশিক্ষা করিতে পারে।

জীবনচরিত।

লুই কসাথ।

মধ্য শতাব্দীর মহান্ রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় যে সকল মহারথী কীর্ত্তিগৌরবে সমস্ত সভ্য

হইয়াছেন। হেমাভ অম্বুদময় পশ্চিমগগনে অস্তগমনোন্মুখ তপনের মত একে একে সকলেই যশগৌরবময় জীবনের দিন ও সীমায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন। সভ্যদেশে যুবকের আদর্শ, প্রৌঢ়ের ভক্তিপাত্র, বৃদ্ধের শ্রদ্ধাভাজন সেই সকল কর্ম্মযোগী মহাপুরুষ একে একে ধরণীর কার্য্যক্ষেত্র হইতে কার্য্যাবসানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যাজিনী, গ্যারিবল্ডী, হুগো, কসাথ, একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত—এখন কেবল তাঁহাদিগের জীবনের সমাধিমন্দির তাঁহাদিগের বিপুল যশঃসৌরভে সৌরভময়। লুই কসাথ সেই সকল মহাপুরুষদিগের শেষ। এখন যাঁহারা প্রায় জীবনের প্রান্ত সীমায় উপনীত, তাঁহারা সেই বিপ্লবের ভীষণ রাজনৈতিক আকাশের এই ভাস্কর প্রখর জ্যোতিষ্কের উদয়ের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না; কারণ, সেই উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপর্য্যয়করী বাত্যা বহিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। হাঙ্গেরির অন্ধকারময় রাজনৈতিক আকাশে কসথের মত জ্যোতিষ্কের উদয় বড় সাধারণ ঘটনা নহে। এখন শান্তির স্তব্ধতায় অশান্তির ভেরীনিনাদ নিমগ্ন, এখন রাজনৈতিকের জীবন শান্তিসুখ পূর্ণ; পীড়ন ও অত্যাচারের ভয় নাই। এখন তাঁহার উপর বিদ্বেষ কেবল সাধারণ সভাস্থলে অগ্নিময় বক্তৃতাস্রোতে ও সংবাদপত্রে বাক্যলহরীস্ফীত প্রবন্ধেই শেষ হয়,—কঠোর কারাগার, নির্দ্দয় নির্ব্বাসন, তীক্ষ্ণ তরবারি, এই সকল জীবন্ত যাতনার ভয়ে এখন রাজনৈতিকের হৃদয় ভীত নহে। সে সময়কার রাজনৈতিককে যে কত ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইত তাহা বর্ত্তমান শান্তিময় সময়ের লোকেরা ভাবিতেও পারিবেন না। সেই সকল ভীষণ ভীতির শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, মহাবলশালী এক এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, মানবজাতিকে এক এক উচ্চ আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন, যাহা স্মরণ করিয়া মানবকুল চিরদিন ধন্য হইবে। কসাথ তাঁহাদিগেরই অন্যতম।

কসাথ।

জুন মাসের "সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন" পত্রে, মিষ্টার ষ্টিল্‌ম্যান, লুই কসাথের সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। কসাথের আমেরিকায় অবস্থানকালে যে সকল যুবক তাঁহার মুখে হাঙ্গেরির কথা শুনিয়া হাঙ্গেরির উদ্ধারসাধন এক মহান্ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছিল, এবং সেই উত্তালতরঙ্গময় রাজনৈতিক বিপ্লব সমুদ্রে আপনাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, মিষ্টার ষ্টিল্‌ম্যান তাঁহাদিগের এক জন। তাঁহার এই বিবরণ সাধারণের পক্ষে কৌতূহলজনক হইতে পারে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, কসাথ হাঙ্গেরির স্বাধীনতার প্রচারক হইয়া মানবকুলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিবার অভিলাষে আপনার বাগ্মিতার সহায়তা লইয়া, নবসভ্যতাগৌরবের রঙ্গভূমি আমেরিকায় উপনীত হইলেন। দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের সময় তিনি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে দুই খানি মহা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—বাইবেল ও সেক্সপীয়র এখন তিনি সেই অগ্নিময় প্রাচ্য চিন্তাস্রোত ইংরাজী ভাষার স্রোতে মিশাইয়া ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। হাঙ্গেরির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম লোকে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিল। সে সংগ্রাম যেন, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষিত ধর্ম্মসংগ্রাম। যে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিল, সেই মোহিত হইল, তাহারই হৃদয় যেন বিদ্যুৎস্পর্শে আলোড়িত হইল। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতার হৃদয়ের প্রত্যেক অংশে আঘাত করিত। কেবল দাস প্রদেশে (Slaves states) তিনি কিছু হতাশ হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক স্থানের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন, কাজেই যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলে শ্রোতার হৃদয় আলোড়িত হইবে, সময়ে সে

আমেরিকায় কসাথ।

এই সময় মিষ্টার ষ্টিল্‌ম্যান, কসাথের নির্ব্বাসনসঙ্গী, এবং ইংরাজী কার্য্যকারক পাল-জকীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাঙ্গেরির কার্য্যের জন্য আত্মসমর্পণ করেন। পাল্‌জকী কসাথের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন, এবং তিনি নিশীথের অন্ধকারে একাকী কসাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। অষ্ট্রিয়ার গুপ্তচরগণ কসাথের কার্য্যাবলি লক্ষ্য করিত, তাই এতই সতর্কতা।

ইহার অল্পদিন পরেই কসাথ আমেরিকা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে গমন করেন। যুবক ষ্টিল্‌ম্যানও কয়েক সপ্তাহ পরে লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। যে সকল স্থানে দূতগণের গতায়াতের বড় সম্ভাবনা নাই, সেই সকলের একস্থানে যুবক বাসা লইলেন, এবং গভীর নিশীথে হাঙ্গেরির মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

লণ্ডনে কসাথ।

ভূমধ্যসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখিবার সঙ্কল্প, এই সময়ে কসাথের মনে উদিত হয়, পরে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছিল। স্থির ছিল, একই সময়ে ম্যাজিনীর নেতৃত্বাধীনে মিলানবাসীগণ, এবং কসাথের নেতৃত্বাধীনে হাঙ্গেরিবাসীগণ বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। কসাথ স্থির করেন যে, যুবককে তিনি হাঙ্গেরিতে পাঠাইবেন; তিনি সেখানে সৈন্যদিগকে তাঁহার নাম করিয়া বলিবেন যে, মিলানবাসীগণ বিদ্রোহী হইলে তাহাদিগের প্রতি অস্ত্রাঘাত করা না হয়; কারণ স্বদেশীয়ের রক্তস্রোতে ক্রীড়া করা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। কোনও কারণবশতঃ ঐ কার্য্যভার অন্যের প্রতি অর্পিত হয়। ম্যাজিনী আর অপেক্ষা করিলেন না; একাকী অগ্রসর হইলেন। কসথ বুঝিলেন, তাঁহার আপনার চেষ্টা বৃথা হইবে।

কসাথের তুরস্কে পলায়নের পূর্ব্বে, তিনি হাঙ্গেরির রাজমুকুটাদি ড্যানিউব নদীর তীরে এক স্থানে প্রোথিত করিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সকল উদ্ধারের জন্য যুবক ষ্টিল্‌ম্যান হাঙ্গেরি যাত্রা করিলেন। গুপ্তচরদিগের চক্ষে ধুলি দিবার জন্য তিনি প্যারিস, বার্লিন, ড্রেসডেন প্রভৃতি ঘুরিয়া ভিয়েনায় গমন করেন। কসাথ তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ার জনগণের মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন।

হাঙ্গেরি যাত্রা।

কাজেই এখন সাঙ্কেতিক পত্রের আবশ্যক হইল। যাহাতে বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর আছে সেইরূপ একটি গান স্থির করা হইল। কোনও অক্ষর লিখিবার আবশ্যক হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে একটি ভগ্নাংশ ব্যবহৃত হইত। ঐ অক্ষরটি যে ছত্রে থকিত, সেই ছত্রের সংখ্যা ভগ্নাংশের "লব" (numierator) এবং সেই অক্ষরটি যে কয়েকটি অক্ষরের পরে থাকিত, সেই সংখ্যাটি ভগ্নাংশের "হর" (Denominator) রূপে ব্যবহৃত হইত। ষ্টিল্‌ম্যানের সহিত পত্রব্যবহারে সচরাচর এই জটিল প্রণালী ব্যবহৃত হইত না। সমআয়তন বিশিষ্ট দুইখানি কাগজ উভয়ের নিকট ছিল; দুই খানির ঠিক একস্থানে ছিদ্র করা ছিল। কাগজের উপর সেইখানি রাখিয়া ছিদ্রে ছিদ্রে পত্রলেখা হইত; পরে মধ্যেস্থিত অলিখিত অংশ অন্য কথা দিয়া পুরাইয়া দেওয়া হইত। পত্র পাইয়া পাঠক তাঁহার নিকট-স্থিত কাগজখানি ঐ কাগজের উপর স্থাপন করিয়া ছিদ্র অংশে পত্র পাঠ করিতেন। লোকে বুঝিতে পারিত না।

সাঙ্কেতিক পত্র।

ষ্টিল্‌ম্যান যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কসাথ তাঁহাকে একজন বিদ্রোহীদলভুক্ত দেশহিতৈষির বিবরণ বলিয়াছিলেন। পুলিস তাঁহাকে ধৃত করে। যদি যন্ত্রণার ভয়ে তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই ভয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। কারাগারে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। গাত্রে শয্যা জড়াইয়া

আর একজন।

তখন কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাহারা তাঁহার নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারিবে না। ষ্টিল্‌ম্যান বুঝিলেন, তাঁহারও ঐরূপ সাহসের প্রয়োজন। ভিয়েনার আসিয়াই, তিনি যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তবে তিনি তাঁহার পরিবাপরস্থ পাঁচ জন মহিলার নিকট তাঁহার পরিচয় দেওয়াতে যুবক ভীত হইয়াছিলেন।

পেষ্ট।

ভিয়েনা হইতে ষ্টিল্‌ম্যান পেষ্টে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কারণ পুলিস সন্দেহ করিয়া তাঁহার সন্ধান করিতেছিল—কাজেই তাঁহার তখন অজ্ঞাতবাস। ষ্টিল্‌ম্যান এখানে কাজে কাজেই হতাশ হইলেন। এই সময় পুলিস সন্দেহ করিয়া তাঁহার কার্য্য এবং উদ্দেশ্যের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিল।

এইখানে একবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। লণ্ডন হইতে আসিবার সময় তিনি জুতার গোড়ালীর ভিতর ছিদ্র করিয়া, তাহার মধ্যে সাঙ্কেতিক পত্রাদি গটাপার্চা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়া, ছিদ্রমুখ আবার চামড়া দিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। ব্যবহারে ব্যবহারে সেই চামড়া ক্ষয় হইয়া গেল, কাজেই ছুরি দিয়া চামড়া খুলিয়া তিনি সেই প্যাকেট বাহির করিয়া লইলেন, কিন্তু জুতার কি করিবেন? ঐরূপ ছিদ্রযুক্ত জুতা দেখিলেই হোটেলের লোকেরা সন্দেহ করিবে। কাজেই অন্ধকারময় রজনীতে তিনি জুতা লইয়া ডানিউব তীরে উপনীত হইলেন। জুতা জোড়াটি সেই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। তখন সহরে নিয়ম ছিল যে, রাত্রি আটটার পর কেহ পুলিসের অনুমতি ভিন্ন রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। ষ্টিল্‌ম্যান তাহা জানিতেন না; প্রহরী দেখিতে পাইল। তিনি ছুটিয়া আলোকস্তম্ভের নিম্নে আসিলেন। এরূপ করিবার দুই উদ্দেশ্য ছিল; আলোকের নিকট দূর হইতে গুলি করা সহজ নহে, এবং আলোকে বিদেশীয় দেখিলে প্রহরী ছাড়িয়া দিতেও পারে। তাহাই হইল। গৃহে আসিয়া প্যাকেটে পিচ মাখাইয়া, তাহা দীর্ঘ কেশরাশির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

বৃথা বসিয়া থাকিলে লোকে সন্দেহ করিবে ভাবিয়া, তিনি অসুস্থতার ভান করিয়া, কসাথের সেনাদলের চিকিৎসককে সংবাদ দিলেন। কয় দিবস পরে চিকিৎসকের নিকট সকল

প্রত্যাগমন।

ব্যক্ত করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন যে, তিনি ঐ সকল ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকিবেন না, এবং তিনি সংবাদ অবগত আছেন জানিলে তাঁহার শাস্তি হইবে। ভয়ে ষ্টিল্‌ম্যান যথাসম্ভব শীঘ্র পেষ্ট ত্যাগ করিলেন। লণ্ডনে আসিলে কসাথ সকল শুনিলেন। কেবল একবার বলিলেন, "তিন মাস বৃথা নষ্ট হইল!" তাহার পর আবার সরলভাবে আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। পাথেয় লইয়া তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুকুটাদির বিষয়ে কসাথের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। তিনি ঐ সকল আনিতে লোক পাঠাইয়াছেন জানিয়া, তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু জিমিয়ার গভর্মেণ্টকে ঐ সকলের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি ঐ সকল রত্নাদির কথা জানিতেন।

চল্লিশ বৎসর পরে, গত গ্রীষ্মকালে মিষ্টার ষ্টিল্‌ম্যান টুরিনে আবার কসাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন কসাথ বার্দ্ধক্যভারাবনত, তাঁহারও জীবনের অপরাহ্ণ উপস্থিত। ষ্টিল্-

আর একবার।

ম্যান তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন যে, তিনিই মুকুটাদি আনয়ন করিবার জন্য হাঙ্গেরিতে গিয়াছিলেন। কসাথ বলিলেন যে, তিনি সে সম্বন্ধে ত কিছুই জানেন না, সে সকল জিমিয়ার জানিতেন। এই বয়সে অনেক কথা বিস্মৃত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। যখন ষ্টিল্‌ম্যান তাঁহার নিকট পূর্ব্ব কাহিনী ব্যক্ত করিতে

স্মরণ নাই। কথার যাথার্থ্য প্রমাণার্থ তিনি তাঁহার নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত পত্রাদি প্রেরণ করেন, কিন্তু সেগুলি আর প্রাপ্ত হয়েন নাই।

কসাথ ইচ্ছাপূর্ব্বক নির্ব্বাসন ভোগ করিতেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃভূমি হাঙ্গেরিতে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন, তবে কেবল অষ্ট্রীয়ার রাজাকে হাঙ্গেরির রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না বলিয়া, এবং মনোদুঃখে হাঙ্গেরিতে কখনও প্রতিগমন করেন নাই। পশ্চিমাকাশে অস্তগমনোন্মুখ ক্ষীণজ্যোতিঃ সূর্য্যের মত, রাজনৈতিক আকাশে বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্ষীণপ্রভ কসথ কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন—জগতে রহিল কেবল তাঁহার অমর কীর্ত্তি।

নির্ব্বাসন।

বাঘের নখ।

১

সরলা! নামটি তোমার কেমন লাগে? প্রথম যৌবনে যখন আমার বাসনা কামনা সেই প্রথম মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন এই নাম শুনিলে আমি মুগ্ধ, চকিত হইতাম। হায় সেই প্রথম যৌবন!

সরলাকে যখন প্রথম দেখি, তখন তাহার বয়স আট বৎসর। আমার পিতা বসন্তপুরে কর্ম্ম করিতেন, সরলার পিতাও তথায় বদলী হইয়া আসিলেন। তিনি সপরিবারে কর্ম্মস্থলে আসিয়াছিলেন।

বিদেশে শীঘ্র মিত্রতা হয়। চিরপরিচিতদের মুখ দেখিতে না পাইয়া মানুষ হাঁপাইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিচয়লাভে ব্যগ্র হয়। প্রবাসে, যেখানে স্বদেশী জনমানবের গতিবিধি বড় বিরল, সেখানে উৎসুক হৃদয় সহজেই স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উভয় পরিবারে প্রথমে আলাপ, পরে মিত্রতা জন্মিল। বন্ধুত্ব শেষে আত্মীয়তায় পরিণত হইল।

সরলাদের বাড়ী একটু দূরে, কিন্তু রোজ আমরা একত্র খেলা করিতাম। আমি প্রতিদিন সরলাদের বাড়ী খেলা করিতে যাইতাম; সরলা আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত,—দূর হইতে আমায় আসিতে দেখিলে তাহার সুন্দর শ্রী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত।

২

চারি বৎসর এই প্রকারে কাটিল। সরলা ভিন্ন আমার অন্য সুখ ছিল না,—আমি তখন সতের বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি। এই সময়ে আমি সহসা এক

বাবা দারাগঞ্জে বদলী হইয়াছিলেন। আমরা বসন্তপুর হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার এই প্রথম দুঃখ, অথবা দুঃখের প্রারম্ভ। সে কষ্ট বলিবার নয়। সরলার অশ্রুজলসিক্ত রোদনলোহিত, আকর্ণবিশ্রান্ত, বিরহকাতর নয়ন দুটি এখনও আমার মনে আছে। সেই শিশির-মাখা যুগল কমল কি জীবনে ভুলিতে পারিব?

৩

দারাগঞ্জে পঁহুছিয়া যেন সব শূন্য বোধ হইল। খেলিবার অনেক সঙ্গী ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত খেলিতাম না। আর কিছু আমার ভাল লাগিত না। দারাগঞ্জে আমার একমাত্র সুখ ছিল,—সরলার চিঠি। বসন্তপুরে আমি ভাল ছেলে ছিলাম; দারাগঞ্জে আসিয়া আমার কি হইল বলিতে পারি না। সেবার স্কুলের পরীক্ষায় আমি পাস হইতে পারিলাম না। বাবা বড় দুঃখিত হইলেন,—আমায় কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইলেন।

৪

মেসে থাকি, স্কুলে পড়ি, আর বিস্ময়বিহ্বল হইয়া কোলাহলপূর্ণ কলিকাতার রাজপথের জনতার দিকে চাহিয়া দেখি।

এক বৎসর বাসায় কাটিয়া গেল। পূজার সময় দারাগঞ্জে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে বাবার বাসায় পঁহুছিলাম। একবারে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকিলাম, "মা!"

কে বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "উপেন দা!"

আমি চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, সরলা! মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে আমার সরলা।

সরলার এমন রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। কি উজ্জ্বল মধুর মিষ্ট শ্রী! প্রথম বর্ষায় তটিনীর যে আবেগ, নববসন্তাগমে ব্রততীর যে হরিত শোভা, প্রথম বিকাশকালে কোরকের যে উদ্ভিন্ন সৌন্দর্য্য,—সরলার ঈষদুদ্ভিন্নযৌবন কমনীয় দেহে সেই সৌন্দর্য্যরাশি মৃদু মৃদু তরঙ্গিত হইতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত, স্বপ্নাবিষ্টের মত সরলাকে দেখিতে লাগিলাম।

মার আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল; অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি মাকে প্রণাম করিলাম। শুনিলাম, সরলার বাবা দেশে গিয়াছেন; সরলার মাকে ও সরলাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, ফিরিবার সময় বসন্তপুরে লইয়া

৫

সরলার বিবাহের কথা হইতেছিল। সরলার বাপ কুলীন, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। সরলার মা বলিলেন, "কুলীনের মুখে ছাই, ভাল বর ভাল ঘর না পাইলে আমি মেয়ের বিয়ে দিব না। আমার সোনার প্রতিমা রাজমন্দিরে না দিয়া কুলীনের কুঁড়ে ঘরে পাঠাইব কেন ?"

আমার হৃদয়ে সহসা আগ্রহ বড় প্রবল হইল। সরলা আমার হয় না ? লজ্জায় মুখ ফুটিল না ; কিন্তু আশাও ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

সরলার বাবা দারাগঞ্জে আসিলেন। সরলাদের লইয়া বসন্তপুরে চলিয়া গেলেন। আমার হৃদয় অন্ধকার হইল। যাইবার সময় হরিহর বাবু বলিয়া গেলেন,—"উপেন ! কলিকাতায় গিয়া একটা ছোট বাড়ী দেখো। আমি এক বৎসরের ছুটী লইতেছি, কলিকাতায় থাকিব, স্থির করিয়াছি।" তথাস্তু !

৬

কলিকাতায় আসিয়া মহা উৎসাহে বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। একটা বাড়ী ঠিক করিলাম। হরিহর বাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। আমি ষ্টেশন হইতে তাঁহাদের লইয়া আসিলাম।

হরিহর বাবু বাবাকে চিঠি লিখিলেন,—"যে ক'দিন আমি কলিকাতায় আছি, উপেন আমার কাছে থাক।" বাবা আমাকে হরিহর বাবুর বাসায় গিয়া থাকিতে লিখিলেন। আমি প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিলাম, শেষে হরিহর বাবুর আগ্রহে সম্মতপ্রায় হইলাম। তার পর সরলা যখন সস্মিতমুখে মিষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিল, "উপেন দা' ! বড় হয়ে এখন আমাদের পর ভাব", তখন রাজী হইয়া বাসায় ফিরিলাম। পর দিন প্রভাতে বাসা ছাড়িয়া হরিহর বাবুর বাড়ীতে আসিলাম।

৭

এই বৎসর আমি এল্-এ দিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। হরিহর বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, আমায় শতমুখে উৎসাহিত করিলেন।

বাবা ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। মা'ও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সরলার সম্বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যহ ঘটকীরা যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাকে ধরিয়া বসিল, "ছেলের বিয়ে দাও।" বাবা বলিলেন, "পড়া শুনা শেষ করিয়া বিবাহ করিবে।" মা শুনিবার পাত্র নন, জেদ করিতে লাগিলেন।

মা ও বাবার দারাগঞ্জে ফিরিবার দিন স্থির হইল। যাত্রার পূর্ব্ব দিন মা বলিলেন, "বাবা, বিয়ে কর।" আমি একবারে বলিয়া ফেলিলাম, "সরলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ত করিব।"

শুনিয়া মার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। কেন?

৮

রাত্রি। শুইতে যাইতেছি, বাবা ডাকিয়া বলিলেন, "উপেন! আমার সঙ্গে চল। সব গুছাইয়া রাখিয়া শুইতে যাও, ভোরে আমরা যাত্রা করিব।"

আমার ত সঙ্গে যাইবার কথা ছিল না। সহসা এ বন্দোবস্ত কেন?

আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। কখনও বাপ মার অবাধ্য হই নাই, কলিকাতায় থাকিবারও আপাততঃ বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না। একটা ট্রঙ্কে খান কত বহি ও কাপড় পুরিয়া ঠিক হইয়া রহিলাম।

ভোরে আমরা কলিকাতা ছাড়িব। প্রস্তুত হইয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।

সরলা আসিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সরলার মাকে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরসুখী হও!" আমি মনে মনে বলিলাম, আমার সুখ তোমাদের হাতে।

বাহিরে আসিবার পথে একটা ঘরের দ্বারে সরলা দাঁড়াইয়াছিল। সরলা ডাকিল, "একটা কথা শুনে যাও।" আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "কি সরলা?"

অসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলাম, সরলার কাছে সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। সরলা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "উপেন দা'! বিয়ে কত্তে যাচ্ছ?"

আমি বলিলাম, "কে বলিল?"

সরলা বলিল, "তুমি জান না?—কাল রাত্রে মা ও সইমা তোমার বিয়ের কথাই বলিতেছিলেন।"

আমি একটু বিচলিত হইলাম। কেমন একটু সাহস হইল, ইচ্ছা হইল,—দমন করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "সরলা! যদি তোমাকে পাই, বিবাহ করিব। নহিলে এ জীবনে নয়।"

সরলা কথা কহিল না। সরিয়া আসিয়া আমার বুকেব চেনটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সরলা বলিল, "তোমার চেনে ওটা কি? বাঘের

আমি বলিলাম, "কেন সরলা?" সরলা আমার মুখে দৃষ্টি সংযত করিয়া বলিল, "বাঘের নখটা আমায় দাও; দেবে?"

তুচ্ছ বাঘের নখ, সরলাকে অদেয় আমার কি ছিল? তখনই চেন হইতে খুলিয়া, সোনা দিয়া বাঁধান বাঘের নখটি সরলার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসিলাম, "কি হবে সরলা?"

সরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "যত দিন বাঁচিব, আমারি কাছে রাখিব।"

জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, কেন? এমন সময়ে বাবা ডাকিলেন, সরলার নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

সমস্ত পথটা অস্থির হৃদয়ে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া অতিক্রম করিলাম। সরলা স্মরণচিহ্ন চাহিয়া লইল কেন? সরলাকে কি পাইব না? কে বলিল, আমার বিবাহ? বিবাহ কথাটি মনে হইবামাত্র প্রতিজ্ঞা করিলাম, সরলাকে না পাইলে বিবাহ করিব না। যদি বাবা জোর করেন? তবুও না; কখনও না।

৯

দারাগঞ্জে বড় কষ্ট হইতেছিল।

চারি দিকে স্নিগ্ধ শ্যামল বনানী, নির্ম্মল শুভ্র আকাশ, ঘনপত্র তরুশাখায় পাটল নব কিসলয়, হরিত ক্ষেত্রে সোনার ধান, দূর প্রান্তরে কাশফুলের শ্বেত চামরশোভা,—স্নিগ্ধ, সুন্দর! কিন্তু শান্তি কোথায়?

দারাগঞ্জে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এক দিন বসিয়া কি পড়িতেছি, এমন সময়ে বাবা ডাকিলেন। আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন, "পড়।" হরিহর বাবুর হস্তাক্ষর; তিনি বাবাকে পত্র লিখিয়াছেন, আমার পড়িবার দরকার? বাবার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি আবার বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।" হরিহর বাবু লিখিতেছেন,

"নমস্কারা নিবেদনঞ্চ,

"তুমি সরলার সহিত উপেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব আবার করিয়াছ। কলিকাতায় যখন তুমি এ প্রস্তাব কর, আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। উপেন্দ্রনাথের মত জামাতা লোকের প্রার্থনার বস্তু। কিন্তু কি করিব বল, গৃহিণী তাহাতে কিছুতেই সম্মত নহেন। তাঁহার কন্যাকে তিনি রাজরাণী না করিয়া ছাড়িবেন না।

চৌধুরীর পুত্র শরৎকুমার চৌধুরী, পড়াশুনা উপলক্ষে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। গৃহিণী ও সরলা এক দিন বিকালে উমাচরণ বাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বাড়ী হইতে গাড়ীতে উঠেন, সেই সময়ে শরৎকুমার বেড়াইতে যাইতেছিলেন। সরলাকে দেখিয়া তাঁহার ভারী পছন্দ হইয়াছে,—সেই দিনই শরতের দেওয়ানজী আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। পাত্র ঐশ্বর্য্যশালী বটে, কিন্তু কুলীন নহেন। গৃহিণীর ধনুর্ভঙ্গ পণ, শরতের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবেন। আমি কি বৃদ্ধ বয়সে অর্থলোভে কৌলীন্যরত্নে বিসর্জ্জন দিব? আর এ বিবাহে তুমিই বা কি মনে করিবে? যাহা হউক, এ বিষয়ে তুমি আমাকে সুপরামর্শ দিয়া উপকৃত করিবে। এখানকার সকল মঙ্গল। ও বাটীর মঙ্গলাদি লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। ইতি তাং ২৪ শে কার্ত্তিক ১২— সাল।

"গুণমুগ্ধস্য
"শ্রীহরিহর শর্ম্মণঃ।"

আমি পত্র পড়িয়া বাবার হাতে দিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?"

আমি আর কি বলিব? বাবা বলিতে লাগিলেন, "চেষ্টার ক্রটী করি নাই, কিন্তু দেখিতেছি,—সরলার সঙ্গে তোমার বিবাহ অসম্ভব। হরিহর পত্রে যাহাই লিখুন, জমীদার শরৎকে ছাড়িয়া আমার ঘরে কন্যা দান করিবেন না। এ দিকে তোমার গর্ভধারিণী বলিতেছিলেন, সরলা ভিন্ন আর কাহাকেও তুমি বিবাহ করিবে না, বলিয়াছ। সরলা ভিন্ন দেশে কি আর পাত্রী নাই?"

আমি অধোবদনে নীরব হইয়া রহিলাম। উপেক্ষার শেলটা বড় জোরে বুকে বিঁধিয়াছিল। মনে মনে ভাবিতেছিলাম, টাকাই কি বড়! বাবা আমার দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন,—"কি বল?"

নিরাশেরও সুখ আছে। সে সুখ গর্ব্ব। বলিলাম, "সংসারে টাকাই বড়। আমি টাকা না করিয়া বিবাহ করিব না।"

বাবা বলিলেন, "বেশ কথা!"

১০

সংবাদ পাইলাম, শরতের সঙ্গে সরলার বিবাহ হইয়া গেল। তখন মনে হইতে লাগিল, সরলা এ বিবাহে সুখী হইবে ত? নিশ্চয়। নহিলে সে ত এক-বার ঘুণাক্ষরেও মনের ভাব জানাইতে পারিত, তাহার অসম্মতি হইলে কিছু আর হরিহর বাবু এ বিবাহে সম্মত হইতেন না। মেয়ের জন্যই ত সব? যাক্,

মধ্যাহ্ণে আহার করিতেছি, মা সম্মুখে বসিয়া। মা বলিলেন, "তুই এবার বিয়ে কর; সরলার ত বিয়ে হয়ে গেল। আমিও এবার ঘরে বউ আনি।"

বাবার কাছে চোখের জল ফেলি নাই, কিন্তু মার কাছে চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। যে স্নেহে তন্ময়তা আছে, সেখানে বুঝি লুকোচুরী চলে না। আমি তখনই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "বলিয়াছি ত মা, টাকা না করিয়া বিবাহ করিব না।"

আমি রুড়কীর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে পড়িতে গেলাম।

১১

অনেক দিন, প্রায় দশ বৎসর হইল, কলেজ ছাড়িয়াছি, ইঞ্জিনীয়ার হইয়া গভর্মেণ্টের চাক্‌রী করিতেছি। টাকা করিতেছি বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাইতেছি না।

দুঃখের উপর দুঃখ। যে অমৃতপ্রস্রবণের ধারায় এত দিন বাঁচিয়া ছিলাম, সে প্রস্রবণও শুকাইয়া গেল। স্নেহের প্রতিমা মা আমার দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বাবা মাঝে মাঝে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান,—কিন্তু আর কেন?—আমি উত্তরে লিখি,—"এখনও টাকা করিতে পারিলাম কৈ?"

১২

ঘন ঘোর বর্ষা। মেদুর অম্বরে মেঘের মালা,—অজস্র ধারায় ধরা প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। শীতল উগ্র পবনে কদম্বকেশরমিশ্র সৌরভ বহিয়া আনিতেছে। বৃষ্টিস্নাত তরুলতা উজ্জ্বল, হরিত; দূরে বনমধ্যে কেতকী ফুটিয়া রেণু ও গন্ধ ছড়াইতেছে।

আমি একটা বাঁধের তদারকে আসিয়াছিলাম। ডাকবাঙ্গলার বারাণ্ডায় বসিয়া দূরে প্রান্তরে বন্যার জল দেখিতেছিলাম। আকাশ অন্ধকার, প্রকৃতি মলিন, বায়ুর প্রবাহ শীতল, উগ্র,—যেন প্রকৃতির মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাস।

বন্যার শান্ত, মলিন জলরাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া, বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন একখানা দৈনিক কাগজ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম। নোট্‌, প্যারা, তার, কিছুই ভাল লাগিল না। বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতে পাইলাম,

"হাজার টাকা পুরস্কার!

"জালালপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী

"বাঘের নখ" হারাইয়াছেন। যে কেহ ঐ বাঘের নখটি আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। বাঘের নখটির মূল্য ১০৲।১৫৲ টাকার অধিক হইবে না,—যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তিনি ফিরাইয়া দিলে উল্লিখিত টাকা পুরস্কার পাইবেন। বাঘের নখের উপরে সোনার পাতে, U.L.M. এই তিনটি ইংরাজী হরফ খোদা আছে।

শ্রীরামেশ্বর রায়।

দেওয়ান, জালালপুর।"

আমার নাম উপেন্দ্রলাল মজুমদার, বাঘনখ-চারমের উপর অক্ষর তিনটা খোদাইয়া ছিলাম বটে। কি জানি কেন, এক ফোঁটা চোখের জল কাগজের উপর পড়িল।

* * * *

সেই সময়ে সব্ ওভার্সীয়ারটা সেই দিকে আসিয়াছিল,—সে আমার চোখে জল দেখিতে পায় নাই ত?

প্রমথ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—আষাঢ়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদিত "ভারতবর্ষে—বারাণসী" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "প্রতীচ্য গণিত" একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের "নূতন তাম্রশাসন" তৃতীয় প্রস্তাব, এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "বিহারীলাল" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃত, স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিত্ব-সমালোচনা। এই প্রবন্ধটি এবারকার সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এতদ্ভিন্ন এবারকার সাধনায় "সাময়িক সারসংগ্রহ" ও "কৃতজ্ঞতার" কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতী।—আষাঢ়। "প্রলয়" শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "ষ্টীমারে" শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দের একটি বিলাতভ্রমণের উপক্রমণিকা। প্রবন্ধটি কৌতূহলজনক। "পাণ্ডুকেশ্বর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত। "কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের রচনা। লেখকের ভাষার বাঁধুনি নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্তের "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে, দুই একটি ঘটনা সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" একটি চলনসই রচনা। "যোগী" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি দুর্বোধ, অদ্ভুত, অতএব আমাদের মতে অপাঠ্য কবিতা। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "রামমোহন রায়" একটি সুপাঠ্য জীবনসমালোচনা। "হর পার্ব্বতী" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর যুগল কবিতা;—হর ও পার্ব্বতী, এই দুই ভাগে দুইটি কবিতায় সমাপ্ত। কবিতা দুটি সুন্দর ও কল্পনাশক্তির পরিচায়ক।

তত্ত্ববোধিনী।—আষাঢ়। "ফাহিয়ানের ভারতভ্রমণ" শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর রচনা। বহুদিন পূর্ব্বে, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় "ভারতীতে" ফাহিয়ানের

পাইলাম না। শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 'আইন আকবরী অবলম্বন করিয়া লিখিত' "জৈন গৃহী ও জৈন সন্ন্যাসী" ইতিশীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি মৌলিক না হইলেও মন্দ নহে।

সুহৃদ্।—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। এই মাসিক পত্রখানি 'ইডেন্ হিন্দু হষ্টেল' হইতে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক লিখিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। সুহৃদের উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আশা করি, সুহৃদের উদ্যোগীগণ সফলতা লাভ করিবেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বঙ্কিম বাবুর ছবি খানি ভাল হয় নাই। "আমি কি হত্যাকারী" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। "সৌরজগৎ—সূর্য্য" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে।

জ্যোতিঃ।—আষাঢ়। "প্রাচীন আর্য্যসমাজে বক্‌রা-ইদ্" একটি উল্লেখযোগ্য, গবেষণাপূর্ণ, সুপাঠ্য প্রবন্ধ। লেখক বলেন, প্রাচীন ভারতেও গোবধ হইত, তবে এখন গোবধের নামে শিহরিয়া উঠিবার কারণ কি? আমি লেখকের মতের প্রতিবাদ বা সমর্থন করিতেছি না;—আমার অনুরোধ, সকলে একবার প্রবন্ধটি পড়িয়া স্ব স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিবেন। শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সাধু খাঁর "বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য" একটি উল্লেখযোগ্য সুন্দর প্রবন্ধ।

দাসী।—জুন। "স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা" শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর রচনা। প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। "কালীকৃষ্ণ মিত্র" প্রবন্ধটি একবার "ধর্ম্মবন্ধুতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। "কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবন উপদেশপূর্ণ বলিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আবার" দাসীতে প্রকাশ করা ভাল হয় নাই।

পূর্ণিমা।—আষাঢ়। এ মাসের পূর্ণিমাতে একটিও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ দেখিলাম না। শেষ পৃষ্ঠায় হিমাচল প্রবন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, "লজ্জাস্কর ভাবে অনভিজ্ঞ।" একে এই বিলাতী বাঙ্গলা, তদুপরি "লজ্জাস্কর!" গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্।

সমীরণ।—৯ম ও ১০ম সংখ্যা। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" উল্লেখযোগ্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক সুন্দর প্রবন্ধ। "অধ্যাত্ম ধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। "দাদামহাশয়ের স্বর্গলাভে" ভাষার বৈচিত্র্য ও বাহার আছে; আশা করি, লেখক উত্তম আখ্যানবস্তু লইয়া ভাষার সদ্ব্যবহার করিবেন।

ভিষক্-দর্পণ।—জুলাই। "বঙ্গভাষায় চিকিৎসাতত্ত্ববিষয়ক মাসিকপত্র।" এই মাসিক খানি চিকিৎসকগণের উপযোগী। "বিবিধ তত্ত্বে" সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলে মন্দ হয় না। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কুঞ্জবিহারী দাসের "শারীরিক শ্রম" প্রবন্ধটি সাধারণ পাঠকের উপযোগী ও উপকারী হইয়াছে।

সখা ও সাথী।—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। মৃত সখার ভূত ঘাড়ে করিয়া সাথী এতকাল পরে দেখা দিয়াছেন। সখা ও সাথীর মিলনে দ্বিগুণিত উৎকর্ষের আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যা দেখিয়া, "সখার" জন্য আমাদের চোখে জল আসিয়াছিল। সখাকে এতদিন পরে নামশেষ হইতে দেখিয়া, বাস্তবিক আমরা ব্যথিত হইয়াছি। আজ সেই স্বর্গীয় সখা-সম্পাদক প্রমদাচরণকেও মনে পড়িতেছে। শুনিয়াছিলাম, প্রমদাচরণ বাবু নিজের জীবন বিমা করিয়াছিলেন, এবং সেই অর্থ "সখার" জন্য দান করিয়া যান। এ কথা সত্য কি? তাহা হইলে সহসা "সখার" অকালমৃত্যু হইল কেন? বাঙ্গলায় শিশুপাঠ্য কাগজ আর রহিল না, সুতরাং এই খানির উপর সকলের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

রাজা দিগম্বর মিত্র, সি. এস্. আই। *

আত্মাভিমানে আঘাত করা অভিপ্রেত নয়,—তাহা করা অতিপাতক বলিয়াই অগত্যা বিশ্বাস করি;—কিন্তু, পুরুষকার পদার্থটা বাঙ্গালীর যে বড় বেশী স্পৃহনীয়, তাহাও বোধ হয়, বলা যায় না;—বলিলে কেহ প্রত্যয় করিবে না। বহুকাল এবং বহু পুরুষ হইতে, পিতৃপিতামহ ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে, উক্ত পদার্থ আমাদের মধ্যে বিরল। বিরল,—যে হেতু উহা বাঞ্ছনীয় নয়। এই বিরলতা এবং বাঞ্ছাহীনতার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কারণ আছেও বটে, এবং আমরা ক্রমে, এ ক্ষেত্রে, সে কারণের কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানও করিব; কিন্তু, আপাততঃ কারণ নহে, কারণোদ্ভূত কার্য্য যাহা, তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। পরানুবর্ত্তিতা আমাদের পুরুষানুক্রমিক পৈতৃক প্রথা, পরানুবর্ত্তিতা জাতিগত এবং ব্যক্তিগত;—সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে বাঙ্গালীকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই জাতির জাতীয় অভিধানে স্বানুবর্ত্তিতা শব্দটিরই অভাব,—পুরুষকার বহুযুগবিস্মৃত তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত একটা সংজ্ঞামাত্র;—অস্থি-মজ্জা-মেদ-মাংসহীন, তাহা নিঙ্গড়াইলেও রক্তবিন্দু পড়ে না; তাহা শুষ্ক কঙ্কাল অপেক্ষাও শুষ্ক কঠিন, কার্য্যের অনুপযোগী। পুরাতন সংজ্ঞা—পুরুষকার, আমাদের মধ্যে, একান্ত অর্থহীন একটা অপার্থিব পদার্থ; নেহাত নিরাকার! "নিরাকার" অথচ "চৈতন্যস্বরূপ"ও নহে;—কারণ, অস্মদ্দেশীয় "আর্য্যত্ব" অষ্টপৃষ্ঠললাটে "অদৃষ্ট" দ্বারা আচ্ছন্ন;—"প্রারব্ধে"র পেষণে পুরুষকারের প্রাণ বহুকাল হইল বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তবে আমাদের পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় বৃত্ত-ভাণ্ডারটি নাকি যারপরনাই বিশাল এবং জাতীয় চরিত্রটি ততোধিক উর্ব্বর, সুতরাং স্বভাবতই সংসারে এমন কোনও দ্রব্য থাকিতে পারে না, যাহা তথায় নাই। সকল রত্নই যখন আছে, তখন পুরুষার্থ রতনখানিও বা না থাকিবে কি বলিয়া! পরপদলেহন এবং অবস্থানুকূল্যে তাহা গোপনে দংশন দ্বারা গৃহলক্ষ্মীকে গহনা এবং গ্রহবিপ্রকে মুগ, মাষকলাই বা স্বর্ণ-মাষা দিয়া, পাপগ্রহের পিত্তদমন করা পরমপুরুষার্থ।—নব্য বঙ্গীয় পাস-করা পুরুষকারেরও চরম পরিচয় এবং প্রতিষ্ঠা প্রায় এখন উহাতেই পরিণত হইতে বসিয়াছে। যিনি এ প্রতিষ্ঠালাভে অপারগ, তাঁহার পক্ষে "প্রবৃত্তিনিরোধ"ই অগত্যা পুরুষার্থ;—

* Raja Digambar Mitra, C. S. I., His Life and Career. By Bhola Nath

"যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ"

তবে পোড়া প্রবৃত্তির নিরোধ হয় না, ইহাই যাহা কিছু আক্ষেপ। নহিলে নিশ্চয়ই আমরা এত দিন নির্ব্বাণমুক্তির নৌকা অনড় স্থানে লইয়া গিয়া নঙ্গর করিতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরানুবর্ত্তিতা বা পরমুখপ্রেক্ষিতা পূর্ব্বাপর প্রথা; অথচ যে পরানুবর্ত্তিতায় পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে জাতীয়তার ঐকতানিক বাদ্য ধ্বনিত হয়, "বডি পলিটিক" জন্মে, সে প্রকৃতির পরানুবর্ত্তিতা ইহা নহে। ইহা পুরুষার্থ-বিহীনতার বিকৃত ব্যাধি; অসমর্থতার বিদ্বেষবিষে জীর্ণ, জ্বর-জ্বর, ছিন্ন, ভিন্ন; হিংসাধূর্ত্ততা-প্রতারণাময়;—ইহা কাপুরুষের পরানুবর্ত্তিতা। স্বানুবর্ত্তিতার সতেজ সরলতাপ্রাণোদিত পরানুবর্ত্তিতা পুরুষার্থেরই নামান্তর, তাহাতেই সমাজের মঙ্গল, তাহারই শক্তিতে পাশ্চাত্যেরা উন্নতি-মঞ্চে উত্থিত হইয়াছেন। কিন্তু, আমাদের পরানুবর্ত্তিতা সে প্রকৃতির নহে,—ইহাতে ঐক্যের কোলাকুলি নাই, অনৈক্যের কলহ কোন্দলেই ইহার আপাদমস্তক পূর্ণ। ইহা এক অতীব অমৌলিক পদার্থ। কারণ আমাদের মধ্যে স্বানুবর্ত্তিতার একান্ত অভাব। "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ" বলিয়া এ দেশে একটি প্রাচীন প্রবচন ছিল বটে, কিন্তু বহুকাল হইতেই তাহার আর চলন নাই। ইংরেজের অতি প্রকাণ্ড Individuality এ দেশে আমদানি হইয়াও, উন্নতির পথে, আমাদের জাতির বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই; বরং তাহার রাসায়নিক সংমিশ্রণে বা বঙ্গীয় রন্ধনশালায় তাহার বিকৃত ভেয়ানে, বাঙ্গালী চরিত্রে এমন একটি কুৎসিত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার দুর্গন্ধ প্রকৃতই দুরপনেয়। ইংরেজের "ইণ্ডিভিজুয়ালিটী" আমাদের মধ্যে যে দ্রব্যের জন্ম দিয়াছে, তাহাকে নীচাদপি নীচ স্বার্থপরতার অতিনিম্নতম সঙ্কীর্ণতা বলিলেও সমস্ত বলা হয় না। অথচ ইংরেজের Individuality জাতিগত বা ব্যক্তিগতই হউক, তাহার অর্থ নীচ স্বার্থপরতা নহে, পরার্থপরতাবিরহিত অসামাজিক সংকীর্ণতাও নহে;—তাহা সহজ, সরল, শক্তিময় স্বানুবর্ত্তিতার স্বাধীনতা; মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক গতি; তাহা এই পৃথিবীর পুরুষকার,—প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যার অপৌরুষেয় পদার্থ নহে। আমাদের ইতর সাধারণ সমাজের কথা ধর্ত্তব্য নহে;—কারণ, তাহা একান্ত অব্যবহিত ঘরকন্নার কথা ভিন্ন, আর কিছুরই কোনও ধার ধারে না; কিন্তু, এ দেশীয় ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ সমষ্টিভাবে, এই পুরুষকারে স্পৃহাবান্ কি না, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে।

সাধারণতঃ কত দূর আদৃত হইয়াছে,—উহা সাধারণ্যে আদৌ পঠিত এবং পর্য্যালোচিত হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া বলিব ? কারণ যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন,—তাঁহার এই জীবনী, পার্থিব পুরুষকারের এক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ; কারণ, ইহা বাঙ্গালী-সুদুর্লভ ব্যক্তিগত স্বানুবর্ত্তিতার এক সুদীর্ঘ বিবরণী।

কিন্তু, এই "বিবরণী" বাঞ্ছানুরূপ বিশদভাবে এবং বিস্তার পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না ; ইহাতে সর্ব্বথা সুবিচারও হইয়াছে, তাহাও নহে ;—বহু অর্থব্যয়, শ্রম ও যত্ন সত্বেও, এ দেশে, জীবন-বৃত্তবিষয়ক গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় না, এই অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ইংরেজী গ্রন্থই, তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এ দেশে, এ কাল পর্য্যন্ত, যতগুলি জীবন-বৃত্তবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই শীর্ষস্থানে, এই গ্রন্থ সংস্থাপিত হইবার যোগ্য। ঘটনার সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খল সমাবেশে, এবং লিপিনৈপুণ্যে, উপস্থিত আলোচ্য গ্রন্থ, আমাদের এই শ্রেণীর ইংরেজী ও বাঙ্গালা যত গুলি গ্রন্থ আছে,—আমরা জানি, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট। কিন্তু সর্ব্বায়বে পূর্ণ নহে; উহার সর্ব্বায়ব পরিপুষ্টও নহে। ঘটনা অনেক সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু, আরও অধিক সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক ছিল ;—যে সকল অনতিবৃহৎ বা অতিক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমাবেশে জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দেদীপ্যমান হয়, চরিত্র পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হয়, এক কথায়, যদ্দ্বারা জীবনীতে জীবনীশক্তি স্বতঃ সঞ্চারিত হয়,—আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য,—তাহার অভাব, আমাদের আলোচ্য এই জীবনীগ্রন্থের অনেক স্থলেই আছে। গ্রন্থকার প্রবীণ, লিপিশক্তিতে পরিপক্ক এবং প্রতিষ্ঠান্বিত, তাঁহার এই গ্রন্থ তদুপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু, এই গ্রন্থ একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, উপাদেয় জীবনচরিত নহে। তবে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন জীবনীর উপযোগী সমস্ত উপকরণ এ দেশে সুরক্ষিত হয় না ; রক্ষিতই হয় না ; অতএব তাহা জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির জীবন-বায়ু নিঃশেষিত হইবার অত্যল্প কাল পরেও সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব ; এ কথাও এ স্থলে অবশ্য স্বীকার্য্য। বোধ হয়, এই কারণেই আলোচ্য গ্রন্থ অনেক স্থলে অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণতঃ জীবনী গ্রন্থের প্রধান এবং সুমহৎ গৌরব ও আকর্ষণশক্তি সত্যবিবৃতি ; খাঁটি সত্য, নিরবচ্ছিন্ন সত্য, অসঙ্কোচ সরলতার সহিত বলিতে

উহাতে প্রয়োজন। সত্য সঙ্কুচিত হইবে না, আবৃত হইবে না, তাহার অক্ষরার্দ্ধও অপ্রকাশিত থাকিবে না। জীবনী গ্রন্থের ইহা প্রথম অঙ্গ, এবং অতি-প্রধান অঙ্গ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এ অঙ্গে উপযুক্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্যই বলিতে হইবে। তিনি সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা সংগ্রহ করিতে না পারুন, তাহা যতদূর পারিয়াছেন, তাহাতে উপরি-উক্ত সত্য-বিবৃতি-কার্য্য সরলতা, সাহস এবং সুনৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। জীবনীর হিসাবে এই গ্রন্থের ইহাই গুণ, এবং ইহা অতি প্রধান গুণ। কিন্তু, তথাচ একটি কথা আছে। গ্রন্থকার সরলতা, সাহস এবং সুনৈপুণ্যের সহকারে সত্য বিবৃত করিয়াছেন; কিন্তু সহানুভূতিমূলক উদারতার পরিচয় সর্ব্বত্র দিতে পারিয়াছেন, এমত বলা যায় না। বোধ হয়, সাহসিকতার পরিচয় দিতে যাইয়াই, অতিসাবধানতাজনিত, এক এক স্থলে সহানুভূতির অসামঞ্জস্য এবং অভাব হইয়াছে। সে কিরূপ স্থল, আমরা ক্রমে দেখাইব।

সাহসিকতার সহিত সহানুভূতির সামঞ্জস্য হওয়া উচিত ছিল, সবিশেষ আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র হয় নাই; সুতরাং সমালোচ্য জীবনীর বিষয়ীভূত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বথা সুবিচার হইয়াছে, ইহা বলিতে পারি না। অবিচার অপেক্ষা বিচারাভাব শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ, বিচার অপেক্ষা বিবৃতিই জীবনবৃত্তলেখকের অধিকতর উপযোগী। বিবৃতি যথাযথ হইলে, বিচার না করিলেও চলে;—তাহা অতিরিক্ত, অনাবশ্যক। সমালোচনার প্রলোভনে পড়িয়া যদি একান্তই বিচার করিতে বসিতে হয়, তবে অতি সাবধানে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সূক্ষ্ম এবং সুবিচার করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু এ কর্ত্তব্যপালন এক কথায়, এবং অল্প কথায় হইয়া উঠে না। এক কথায় "ডিক্রি ডিস্‌মিস" কাজীর বিচার, তাহাকে বহুদর্শী বিচক্ষণ জজের বিচার বলা যাইতে পারে না। অপিচ, তদ্দ্বারা কেবল জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি অন্যায় নহে, তাহাতে শিক্ষাপ্রার্থী সাধারণ পাঠকেরও অত্যন্ত অনিষ্ট করা হয়। আদর্শ অত্যুচ্চ হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা যদি এত অধিক উচ্চই হয় যে, সংসারবাসী মনুষ্যমাত্রেরই স্পর্শের অতীত, তবে কাব্যোপন্যাসের কাল্পনিক চিত্রই প্রচুর, স্বভাবাতিরিক্ত দেবচরিত্রই যথেষ্ট, মানুষের উপকারার্থে মানুষের জীবনচরিত লেখার বড় বেশী আবশ্যকতা থাকে না।

কিন্তু জীবনবৃত্তের আরও অঙ্গ আছে। জীবন দীর্ঘ। চরিত্র জটিল। জীব-

ভাবাপন্ন; জীবনের এক সময়ের কার্য্য ও ঘটনাবলীর সহিত হয় ত অপর এক সময়ের কার্য্য ও ঘটনাবলীর সঙ্গতি হয় না; অন্ততঃ সে সঙ্গতি হয় ত অত্যন্ত অস্পষ্ট। অতএব, জীবনবৃত্তলেখকের যে কিরূপ সাবধানতার সহিত সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম ভাবে এ সকল অবিকল অঙ্কিত করা আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। উহা এরূপ ভাবে, এরূপ উপযুক্ত এবং প্রকৃত অনুপাতে অঙ্কিত করা চাই, যদ্দ্বারা জীবনী-বিবৃত ব্যক্তি পাঠকের মানসপটে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন। তিনি নিজে জীবনকালে তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ, অতিঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের নিকট চিত্তমন উন্মুক্ত করিয়া আপনাকে আপনি যেরূপ ভাবে পরিচিত ও প্রত্যক্ষীভূত করিতেন, জীবনীলেখকের কর্ত্তব্য, তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট ঠিক তদনুরূপ প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা। নহিলে জীবনবৃত্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সাধারণ বাঙ্গালীজীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য অতীব অল্প বটে, কিন্তু তাই বলিয়া রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনঘটনা নিতান্ত অল্প, ইহা আমরা স্বীকার করিতে সম্মত নহি; কারণ, তদীয় জীবনীর কঙ্কালমাত্র দেখিয়াও বিলক্ষণ বুঝা যায় যে, বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে সে জীবন গঠিত, এবং তাহার কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। স্কুলমাষ্টারের আসন হইতে ব্যবস্থাপকসভার বিশাল সৌধ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে, তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের বহুবৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং অপরিসীম প্রাজ্ঞতা দিগম্বর মিত্রের প্রবল পুরুষকারের অন্যতম ফল, যাহা রাজদরবারের মন্ত্রণাকক্ষের দ্বার তাঁহার জন্য স্বতঃ উন্মুক্ত করিয়াছিল, এবং যাহার জন্য রাজপ্রতিনিধি এবং অত্যুচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষগণ তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন; তাহা,—সেই অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞত্ব, এক দিনে, এক স্থানে, একই কার্য্যে, একই প্রকার বৃত্তিব্যবসায়ে, বা কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে লব্ধ হয় নাই। তাহা জীবনস্রোতের বহু আবর্ত্ত ও বহু বৈচিত্র্য এবং বিপুল পরিশ্রম সঞ্জাত। পুরুষকার অপরিমেয় পরিশ্রম-শীল। পুরুষকারের আর যে যে এবং যত যত লক্ষণই থাকুক, অপরিসীম পরিশ্রম তাহার প্রধান লক্ষণ। প্রতিভা যে প্রকৃতিরই হউক, বিনা পরিশ্রমে তাহা প্রস্ফুট হয় না। প্রতিভা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত আকাশ হইতে উড়িয়া আসিয়া "এক দমসে" উদরে প্রবেশ করে, এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিনা আয়াসে তাহা উদ্গার করিয়া অমর হন, এরূপ মনে করাই মহাভ্রম। প্রতিভামাত্রেরই মূলে,

জীবনবৃত্তের বিশ্লেষণ করিলে ইহা বুঝা যায়। স্কুলমাষ্টারী হইতে আমলাগিরি, আমিনী, তহশীলদারি বা সেরেস্তাদারি এবং কেরাণীগিরি; পরন্তু মনিটারী, এবং ম্যানেজারী, তৎপরে সওদাগরি, নীল-কুঠিয়ালী, রেশম-কুঠিয়ালী, ব্যাঙ্কের অংশীদারি; পরে জমিদারির সৃষ্টি, সংগঠন এবং শাসন; রাজনৈতিক আলোচনা এবং মন্ত্রণা; রাজনৈতিক সভার সম্পাদকতা সভাপতিত্ব, রাজনৈতিক কমিসনের সদস্যত্ব, রাজধানীর সেরিফত্ব; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, একবার দুই-বার নহে, তিনি তিনবার সদস্যত্ব; মধ্যবৃত্ত গৃহস্থসন্তানের রাজসম্ভ্রমে, রাজপদে উত্থান, "ইন্দ্রাদির" আকাঙ্ক্ষণীয় ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধিপ্রাপ্তি; ৺ দিগম্বর মিত্রের জীবন বহু বিভিন্ন অবস্থা, বহু প্রকৃতির ঘটনা, এবং বহুল বৈচিত্র্যে বিখচিত। ইংরাজীতে যাহাকে eventful life বলে, ইহা তদনুরূপ; ইহা প্রায় তাহাই। জীবনীলেখক জীবনঘটনার কঙ্কালগুলিমাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, তাহার সুবিস্তৃত বিবরণী প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ, গতাসু রাজার সমগ্র জীবনই সুনিয়মিত, তাহাতে সঙ্গতিহীনতা সম্ভবতঃ কখনও ঘটে নাই; অথবা অতি অল্পই ঘটিয়াছিল। সুতরাং জীবনী লেখার উপরি-উক্ত অঙ্গের প্রথমাংশে বিবৃত বিষয়ে এই জীবনী লেখককে সবিশেষ নৈপুণ্য চালনা করিতে হয় নাই। পরন্তু, জীবনবৃত্তবিবৃতির উল্লিখিত শেষোক্ত প্রয়োজনীয়তাপূরণে জীবনীলেখক সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই অকৃত-কার্য্যতার প্রধান কারণ, বোধ হয় এই যে, গ্রন্থকার তদীয় নায়কের সংসর্গে সংমিলিত হইয়া তাঁহাকে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করিবার তাদৃশ সুবিধা হয় ত কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই সুবিধা অথবা সৌভাগ্যের উপর জীবনবৃত্তের জীবনীশক্তি প্রচুরপরিমাণে নির্ভর করে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এস্থলে আর একটি কথা বলিবার আছে।

রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন তাঁহার সময়ের প্রায় ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। জীবনীলেখক, সে ইতিবৃত্ত প্রস্ফুট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সে চেষ্টা সাধারণতঃ সফলও হইয়াছে। কিন্তু এ সফলতার পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি হইতে পারিত, এবং তাহার সহিত মিত্র মহোদয়ের রাজনৈতিক এবং বৈষয়িক জীবন অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে প্রতিবিম্বিত হইত,—জীবনীলেখক যদি জীবনীগ্রন্থপ্রণয়নের একটি অতি অপরিহার্য্য আবশ্যকতার অন্ততঃ কতকাংশেও পরিপূরণ করিতেন। সমালোচ্য সমগ্র জীবনীটিতে নায়-

টিত্র হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের লিখিত বা তাঁহার অসংখ্য বন্ধু বান্ধব-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রও আমরা ইহাতে দেখিতে পাই না। অথচ, এইরূপ চিঠিপত্রে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হয়,—বর্ণনীয় চরিত্রের অনেক অংশ, অনেক স্থল উজ্জ্বলীকৃত হয়। কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার করি বটে যে, শিক্ষা দীক্ষা এবং সাধনায়, আকাঙ্ক্ষায়, আচারে এবং অভ্যাসে, বঙ্গ-সমাজ এবং বাঙ্গালী-প্রকৃতি যখন য়ুরোপীয় সমাজ ও ইংরেজ-প্রকৃতির সদৃশ নহে, তখন বাঙ্গালী যত বড় লোকই হউন, চিঠিপত্র খুব কমই লিখেন, অন্ততঃ ইয়ূরোপীয় বড় লোকে যত চিঠিপত্র লিখেন, ইহাঁরা তত লিখেন না; পরন্তু যে দুই দশ খানা চিঠিপত্র লিখেন, তাহাতে অব্যবহিত আত্ম ঘর-গৃহস্থালীর কথা এবং আত্মীয় স্বজনের কথাই থাকে,—সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্য, শিল্প, সাহিত্য রাজনীতির কোনও কথাই প্রায় তাহাতে থাকে না;—কারণ সে প্রকারের পত্র লিখিতে বাঙ্গালী প্রকৃতি অভ্যস্ত নয়,—বঙ্গসমাজের তাহা রীতিও নয়, যে হেতু সমাজ সাধারণতঃ অশিক্ষিত। সুতরাং বঙ্গীয় বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তি রাজনীতি, শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি যে কোনও বৃহৎ বিষয়ে সমগ্র জীবন ব্যাপৃত থাকুন না, চিঠিপত্রে, য়ুরোপীয়বৎ, সে বিষয়ের ক্বচিৎ উল্লেখ করেন *। এ উক্তিতে কিঞ্চিৎ সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহা সম্যক্ সত্য-উক্তি নহে; কারণ মনুষ্য-প্রকৃতি ইয়ূরোপে, ইংলণ্ডেও মনুষ্য-প্রকৃতি, ভারতে, বঙ্গেও মনুষ্য-প্রকৃতি। যখন যে বিষয়ে মন ব্যাপৃত থাকে, তখন সে বিষয়ের স্বাভাবিক স্ফূরণ মনের অতি সাধারণ মৌলিক লক্ষণ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন একেবারেই এ লক্ষণবিবর্জ্জিত, ইহা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি? তবে অভ্যাসবশতঃ ও দেশের অবস্থানুসারে বিষয়ের অল্পাধিক্য সম্ভাব্য বটে। শিক্ষিত ইয়ূরোপীয় যে স্থলে তাঁহার চিঠিপত্রে সাধারণ বিষয়ের বহুল বিবৃতি করেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী সে স্থলে না হয় তাহা খুব কমই করেন; কিন্তু একেবারেই না করা সম্ভবে না। কারণ তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক। পরন্তু, শিক্ষিত লোকের মানসিক সংযোগ শিক্ষিত লোকের সহিতই হয়। রাজনৈতিকের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব নেহাত মুদী রাখালী কুলি মজুরের সহিত হয় না। সাহিত্যসেবকের সাহিত্যবন্ধু, সাহিত্য-সেবী শিক্ষিত ব্যক্তিই হইয়া থাকেন। বন্ধুত্বের চিঠিপত্র বন্ধু বান্ধবকেই লিখিত হইয়া থাকে। শিক্ষিত বন্ধুবর্গের নিকট [illegible] অশিক্ষিত ইতর সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে নহে; অতএব

অশিক্ষিতে বুঝিবে না বলিয়া, সেরূপ চিঠিপত্রে, রাজনীতি সাহিত্যাদি সাধারণ বিষয়ের উল্লেখ না করা সম্ভবে না। ফলতঃ এমন কখনও হইতে পারে না যে, দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় রাজনীতিবিশারদ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের চিঠিপত্রে ভুলিয়াও কখনও রাজনীতির উল্লেখ করেন নাই। এমন কখনও হইতে পারে না যে, রাজা দিগম্বর মিত্রের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন কয়েকখানি মাত্র সরকারি ও অর্দ্ধ-সরকারি পত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; তিনি নিজে কখনও রাজনীতি সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখেন নাই, বা কাহারও নিকট হইতে সে বিষয়ের চিঠিপত্র প্রাপ্ত হন নাই, এবং তাহার একখানিও কোথাও কাহারও কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে এমনও যদি হয় যে, আমাদের বড়লোকেরাও তাঁহাদের চিঠিপত্রে আপনার অব্যবহিত ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর কিছুই লিখেন না, তাহা হইলেও সে প্রকৃতির চিঠিপত্রও ত দুই চারি খানা আমরা তাঁহাদের জীবনীতে দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে ঘর-গৃহস্থালীর কথাও বড় কম কথা নহে;—বরং বৃহৎ কথা অপেক্ষা, অনেক সময়ে এই সকল ক্ষুদ্র কথার মূল্য অধিক হয়; কারণ, তদ্দ্বারা চরিত্রের এবং তাহার চৌহদ্দীর অনেক আভাস পাওয়া যায়; চরিত্রের অজ্ঞাত অন্ধকার অংশ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। কিন্তু, জীবনবৃত্তের এ অঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থ অত্যন্ত অঙ্গহীন। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

কিন্তু, তাহা হইলেও, আলোচ্য গ্রন্থের উপরি-উক্ত অল্পাধিক অঙ্গহীনতা সকল সত্ত্বেও, আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, এ গ্রন্থ, এ দেশীয় এ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অদ্বিতীয়।

তা, এই অসাধারণ বাঙ্গালী জীবনের এই অদ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন কি? একান্ত চিত্তে অনুধাবন করিয়াছেন কি? না করারই সম্ভাবনা; কেন না, আমরা পুরুষকারে স্বভাবতই উদাসীন। কিন্তু, আমরা পুরুষকারে উদাসীন বলিয়াই এই গ্রন্থ অধিক পঠিত ও আলোচিত হওয়া আবশ্যক। দিগম্বর মিত্রের জীবনী সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রত্যেক পাঠশালায় প্রেরিত হওয়া উচিত। শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহা সমান পাঠ্য। বৈরাগ্যের ইতিবৃত্ত ও বিরাগীর জীবনাখ্যায়িকা আমরা অনেক পাঠ করিয়াছি। কিন্তু, দেশশুদ্ধ লোক বিরাগী হওয়া সম্ভবে না। অন্ততঃ অদ্যাবধি তাহা সম্ভব হয় নাই। বুদ্ধ চৈতন্যাদির জীবনবৃত্ত কণ্ঠস্থ করিয়াও সংসারের সাড়ে ষোল আনা লোক বিষয়ী। বৈরাগ্য

নিজেই ব্যবসা বিশেষ। আমরা ঘোর বিষয়ী, অথচ বৈষয়িক পুরুষকার বর্জ্জিত, অধ্যয়ন করি বৈরাগ্যের কাহিনী ; বিশিষ্ট বিষয়ী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পুরুষকারের ইতিহাস আমাদের নাইও বেশী ; তাহা ক্বচিৎ থাকিলেও আমাদের খবরে আসে না। কিন্তু, এ অবস্থা বড়ই বিসদৃশ,—ইহা সামাজিক স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অন্তরায়। এতদ্দ্বারা "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইতেছে। ইহা বিষয় এবং বৈরাগ্য, উভয়েরই ব্যভিচার। আপাততঃ আমাদের বালক ও যুবকদিগকে "গীতোক্ত ধর্ম্ম" হইতে কিছু অবসর দিয়া, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পার্থিব পুরুষকারের ইতিবৃত্তঘটিত উপদেশ দিলে মন্দ হয় না। সেইটাই প্রকৃত সময়োপযোগী, অবস্থা ও আবশ্যকতার উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করি।

সম্প্রতি শিক্ষিত সমাজ দুটি অতি কঠিন সমস্যায় আন্দোলিত ; কেবল আন্দোলিত নয়, বিব্রত, বিধ্বস্ত। প্রথম সমস্যা, শিক্ষিত বাঙ্গালির অন্ন ; দ্বিতীয়, তাহার রাজনীতি। কিন্তু, এ দুই সমস্যাই নেহাত নূতন নয়। দুটিই পুরাতন সমস্যা, এখন তাহার নূতন অভিনয় হইতেছে মাত্র। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ এই উভয় সমস্যাপূরণের ইতিবৃত্ত। দিগম্বর মিত্র, এই দুই সমস্যাই তদীয় জীবনে ছিন্ন করিয়া শিক্ষিতদিগের পথ পরিষ্কার ও প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে পথ পুরুষকারের পথ ; কিন্তু সে পথে আমাদের সম্যক দৃষ্টি পতিত হয় না, ইহাই বড় দুঃখ। সকলেই যে এক পথে যাইবে, তাহা নহে। প্রত্যেকেরই পথ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু, পুরুষকার একই। পুরুষকার নিজের পথ নিজে ক্ষোদিত করে; প্রত্যেকের জন্য পৃথক পথ ক্ষোদিত করে। এককে অপরের পথে প্রায়ই যাইতে দেয় না। ইহাই তাহার ধর্ম্ম, ইহাই তাহার মহীয়সী মৌলিকতা। অতএব সকলেই যে দিগম্বর মিত্র বা দিগম্বর মিত্রের মতন হইবে, তাহা নহে। তাহা সম্ভবই নয়। স্বভাবের মিতব্যয়িতা তাহা মানা করে। দিগম্বর মিত্রের যে বৃহৎ প্রকৃতির পুরুষকার ছিল, তাহা স্বভাবে সুদুর্লভ। তাঁহার স্বদেশীয় পরানুবর্ত্তী, পরান্নপ্রিয়, দুর্ব্বল বাঙ্গালী ত দূরের কথা,—স্বানুবর্ত্তী দিগ্‌দেশেও সে প্রকৃতির প্রবল পুরুষকার সচরাচর সম্ভবে না। সে বিষয়ে স্বভাব বড়ই সংযতহস্ত। দিগম্বরের পুরুষকার পাওয়া বা তাহাতে পূর্ণমাত্রায় পৌঁছান সচরাচর সম্ভব নয়। তবে তাহা স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব বৈষয়িক ও রাজনৈতিক পথে চলিতে পারিলে শিক্ষিতদিগের এবং তাঁহাদের দেশের সবিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

আজ ১৮৯৪ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালী যেমন জীবনসমস্যায় পড়িয়া জীব-

মুষ্টি অন্ন উপার্জ্জনার্থে আর্‌জী হস্তে আপিসে আপিসে ঘুরিতেছেন;—১৮৩৪ সালে একটি সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক গৃহস্থ যুবক কলেজ ছাড়িয়া, ঠিক এমনি জীবন-সমস্যার অকূল পাথারে পড়িয়াছিলেন। সেই সপ্তদশবর্ষীঃ বালকটি আর কেহই নহেন,—পরবর্ত্তী কালের কৌন্সিলের মহামান্য মেম্বর রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই। ইহা অদৃষ্টও নহে, অ্যাক্সিডেণ্টও নহে;—পুরুষকার; খাঁটি, নিরেট, নির্জ্জলা পুরুষকার। সে আজ ৬০ বৎসরের কথা, কিন্তু এখনকার সময় অপেক্ষা তখনকার সময় যে কিছু বেশী সহজ ছিল, তাহা নয়। তখনও চাকরীর বাজার চড়া, মুরুব্বীর বাজার কড়া। বরং তখন অপেক্ষা এখন এ বাজারের পথ বহু দিকে বিস্তৃত, পরিষ্কার ও প্রশস্ত হইয়াছে। পরন্তু, এখন যেমন আমাদের অনেকে রাজনৈতিক আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন,—তখনও তেমনি, তখনকার "নব্য বঙ্গ"—দুই চারি ডজন মাত্র শিক্ষিত যুবক,—রাজনীতির আবর্ত্ত অনুভব করিয়াছিলেন। তখনকার আবর্ত্ত এখনকার অপেক্ষা অধিকতর উত্তাল, অধিকতর ঘূর্ণজলপূর্ণ ছিল। তখন "কোম্পানীর মুল্লুক"—কুইন ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্য গ্রহণ করেন নাই। আজ প্রায় দশ বৎসর হইতে চলিল, ন্যাশানাল কংগ্রেস হইয়াছে; এ দেশবাসী অল্প স্বল্প যতটুকু হউক, আত্মশাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে; বিভাগীয় কমিশনরের মসনদে নেটিব বাঙ্গালী বসিতে পাইয়াছেন; চিহ্নিত সিবিলিয়ানি নেটিবকে দেওয়া হইতেছে; উচ্চতম আদালতের অত্যুচ্চ জজিয়তি নেটিবের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে; সর্ব্বোপরি নেটিব এখন বৃটিশ পার্লামেণ্টের মেম্বর। কিন্তু তখন বৃদ্ধ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৩৫ সালে নেটিবদিগকে সবে ডেপুটীগিরি ও মুন্সেফি দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছিল। এখন কন্সেণ্ট এক্ট পাস হইয়াছে, তখন সহমরণেরও জের চলিতেছিল। আজ স্যর চার্লস এলিয়ট প্রভৃত প্রাইমারি শিক্ষার বিস্তারের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে হাঁক ডাক করিতেছেন, কিন্তু তখন রাজকীয় শিক্ষা রাজধানীরও চারিদিকে বিস্তৃত হয় নাই। সমাজের অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা, চাকরীর বাজার এবং রাজনীতির অন্ধকার, সকল দিক ধরিয়া বিচার করিলে, সময় এখনকার অপেক্ষা তখনই বরং বিলক্ষণ কঠিন ছিল। সেই কঠিন সময়ে উপরি-উক্ত দুই কঠিন সমস্যা, দিগম্বর মিত্র নিজের জীবনে মীমাংসা করিয়াছিলেন। যেরূপে করিয়াছিলেন, তাহা পরে বলিব। যদ্দ্বারা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহা পুরুষকার।

রাজা দিগম্বর মিত্রের পুরুষকার বৃহৎ, প্রবল, পরিস্ফুট, সফল। উহা সফল, কিন্তু বিফল হইলেও যে উহার মূল্য কমিত, তাহা নহে। তবে মিত্র মহোদয় যে প্রকৃতির পুরুষকার লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহা প্রায়ই বিফল হয় না। সফল হইয়াছিল বলিয়াই যে বিফল হয় না বলিতেছি, তাহা নহে। বিফল হয় না বলিতেছি এই জন্য যে, তাহা বিফলতাকে উপেক্ষা করে, বিফলতার প্রতি লক্ষ্য করে না, সফলতার প্রতিও লক্ষ্য করে না, সতেজে স্বক্ষোদিত সম্মুখস্থিত, আত্মনিরূপিত কর্ত্তব্যের পথে চলিয়া যায়; তাহা অদম্য, অজেয়, অবিচলিত; অবিশ্রান্ত উদ্যমময়; তাহা বহিরন্তরায়ে ব্যাকুল হয় না, ক্ষুণ্ণ ম্লান ও আচ্ছন্ন হয় না; অপ্রতিহত গতি, কোনও আঘাত, কোনও আবর্ত্ত, কোনও অননুকূল অবস্থা, তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। সুতরাং সফলতা স্বাভাবিক নিয়মে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সফলতা ও তদানুষঙ্গিক সুযোগ ও সুবিধাকে কেহ বলেন, অদৃষ্ট; কেহ বা বলেন, "অ্যাক্সিডেণ্ট"। পূর্ব্বে যাহাকে অদৃষ্ট বলা হইত, এখন শিক্ষিতগণ তাহাকে অ্যাক্সিডেণ্ট বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন গহ্বরে অদৃষ্ট বা অ্যাক্সিডেণ্ট থাকিতে পারে, আছেও, কিন্তু প্রকৃত ও প্রবল পুরুষকারের পক্ষে তাহা পরাজেয়। পুরুষকার পদে পদে দুরন্ত দুর্যোগ ও বিকট বিফলতার অতিক্রম করিয়া, একটা সুযোগ ও সফলতায় উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে অদৃষ্ট বা অ্যাক্সিডেণ্ট বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি না। তাহা কিয়ৎপরিমাণে পুরুষার্থহীনতারই সান্ত্বনা। তবে এমন হইতে পারে যে, কতকগুলি সানুকূল অবস্থার সমবায়ে পুরুষকারের পুরস্কার অনতিবিলম্বে আনীত হয়। এবং সেই সানুকূল অবস্থার অভাবে তাহার পুরস্কার পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; অথবা তাহা না পৌঁছিতে পৌঁছিতে পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তি ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া যান। অতএব অবশ্যই স্বীকার করি, পুরুষকার সফল বা বিফলই হউক, তাহার সমান মূল্য। অতএব "গ্রাম্য হাম্পডন্" ও অসম্ভ্রান্ত নীরব মিল্টন অসম্ভাবিত নহে। অসম্ভাবিত নহে, কিন্তু বিরল। নীরব রামমোহন রায়, অজ্ঞাত ঈশ্বর বিদ্যাসাগর অথবা অন্নহীন দিগম্বর মিত্র যদি দেশে থাকেন, সমগ্র দেশে অতি অল্পই আছেন। পুরুষকার এবং প্রতিভা অপুরস্কৃত থাকিলেও যখন তাহা মূল্যহীন নহে, তখন তাহা সফলমনোরথ হইলে মূল্যে কমিতে পারে না; সংসারের ইষ্টের হিসাবে মূল্য তাহার অবশ্যই অনেক বেশী।

কারণ দিগম্বর মিত্র কার্য্য-বীর) কিরূপ ব্যবস্থায় স্থানকাল এবং অবস্থায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল? অবস্থা একান্ত অননুকূল, ব্যবস্থা বিষম বিরোধী; স্থান-কাল দৃষ্টান্ত যারপরনাই দূষিত। পুরুষকার ও প্রতিভা পরিপোষণে যত কিছু প্রতিকূলতা থাকিতে পারে, তাহার সমস্তই আমাদের অন্যান্য স্মরণীয় ব্যক্তি-দিগের ন্যায় দিগম্বরকেও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অনেক স্থলে, ইহা বোধ হয়, স্বভাবের নিয়ম। পুরুষকারের কঠোর পরীক্ষা।

এই আলোচনার প্রথমেই আমরা পুরুষকার এবং প্রধানতঃ তদ্‌বিরহের কিছু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছি। অতি আবশুক বোধেই, তাহা করা হইয়াছে। আমরা তদ্দ্বারা পাঠককে এ দেশীয়দিগের সাধারণ অবস্থার সহিত ইহাও বুঝা-ইতে চাহি যে, কিরূপ প্রতিকূল স্রোতে ও প্রতিদ্বন্দী পন্থার মাঝখানে দিগম্বর মিত্রের স্বাতন্ত্র্যবর্ত্তিতা স্পষ্ট ও সফলীকৃত হইয়াছিল। বঙ্গসমাজের এবং বঙ্গদেশ-বাসীর উপরি-উক্ত অবস্থা, প্রকৃতি এবং প্রথার মধ্যে দিগম্বরের পুরুষকার প্রস্ফুট হইয়াছিল, ইহা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উহাতে কিছুই নাই। পথই যদি পরিষ্কার থাকিবে, তবে আর পুরুষার্থের সবিশেষ গৌরব কি?

কিন্তু এ দেশে প্রতিভা-পরিপুষ্টির প্রতিদ্বন্দী কারণ আরও আছে। আলোচ্য গ্রন্থের আরম্ভেই তাহার একটি কারণ সূচিত হইয়াছে। সেটি রাজনৈতিক কারণ, এবং একটি প্রকৃত কারণও বটে। কিন্তু তদতিরিক্ত এবং তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রবল, কারণও কয়েকটি আছে। প্রথমতঃ এই রাজনৈতিক কারণটি কি প্রকার, দেখা যাউক। গ্রন্থকার ৺ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই কারণটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাগ্মিবর, নব্যবঙ্গের স্মরণীয় রাজনৈতিক ঘোষজ মহাশয়ের কথা কয়টির মর্ম্ম এই;—

"এ দেশের যেরূপ অবস্থা এবং এ দেশে যে প্রকৃতির শাসনপ্রণালী, তাহাতে এখানে কোনও প্রকৃতির প্রতিভার গুণ গৃহীত এবং তাহা উৎসাহিত ও উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা অসম্ভব। এ দেশীয় লোক স্বাধীন দেশে বাস করে না; এ দেশের শাসনপ্রণালীও দেশীয় লোকের প্রতিনিধিত্বে নিয়মিত নহে। বর্ত্তমান শাসনের দোষোদ্ঘাটন অভিপ্রেত নহে; উপস্থিত অবস্থায় এই শাসনই সম্ভবতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার রুদ্ধ; উন্নতি অনুসরণের পন্থা নাই;—কার্য্যক্ষেত্রে শক্তি সাধন ও প্রদর্শন করিবার আকর্ষণ উৎ-সাহের অভাব।"

ইহা অবশ্য প্রকৃত কথা। গ্রন্থকার, এই উক্তির রাজনৈতিক অন্তরায়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করিয়া বলেন, এই অন্তরায় নিবন্ধনই এ দেশের ও এ দেশী দিগের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে; উপস্থিত অবস্থায় এ দেশে পূর্ণ-প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিবার এবং জন্মিলেও তাঁহার পুষ্ট ও পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সম্ভাবনা রণজিৎসিংহের সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে। তবুও যে ভারতভূমে এখনও রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেন, সে কেবল আর্য্যবংশের বীজের গুণে। শাসননৈতিক অবৈধাচার (২) অন্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এ দেশে হইবে না। পুরাতন মৃত্তিকার মাহাত্ম্যে যদিও বা এখন ক্বচিৎ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মেন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁহার প্রতিভা ফুটিতে পায় না; অবর্দ্ধিত, অবিকশিত অবস্থায় বা বিকলাঙ্গেই থাকিয়া যায়।

গ্রন্থকারের এ উক্তিও অপ্রকৃত নহে। তবে তিনি যে রাজনীতি বা শাসন-নীতির উপর বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত নহে; কেন না, অন্য প্রকৃতির কারণও বিদ্যমান। সে যাহা হউক, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ও অধিকারের অভাব যে এ ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুতর অন্তরায়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বাধীন দেশে, স্বাধীনতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। শত বন্ধনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তাহা বর্দ্ধিত ও বিকশিত হওয়া সুদূরপরাহত। সাধনারই শত বিঘ্ন, অতএব সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? সামরিক ও শাসননৈতিক শক্তি উপ-স্থিত অবস্থায় প্রায়ই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। পরন্তু পরাধীনতা-পাশে ওয়ালেস, ওয়াসিংটন, ম্যাটসিনি, কসথবৎ ব্যক্তি য়ুরোপীয় দেশেই জন্মিতে পারেন;—এ অঞ্চলে নহে;—কারণ এ অঞ্চলের লোক স্বাধীনতার স্বাদ বহু শত বৎসর হইল ভুলিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের জল বায়ু ও মনুষ্যপ্রকৃতির অবস্থাও তাহার বিরোধী। * পক্ষান্তরে, অন্য প্রকারের প্রতিভারও এ ক্ষেত্রে

(২) "Administrative outlawry"—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গবর্মেণ্টে অবিচলিত বিশ্বাস-বান্ রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনীর উদ্বোধনে, এ উক্তি তাদৃশ সুরুচিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

* তথাচ, সামরিক শক্তি, সাহস, বাঙ্গালী দেহে বিকাশ লাভ করা একান্তই অসম্ভব, এমন বলি না। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে উহারও বিকাশ বিলক্ষণ সম্ভব। এ মুহূর্ত্তের একটা দৃষ্টান্ত সুদূর ব্রেজিল ভূমে বাঙ্গালীর বীরত্ব। সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস বিদেশে না যাইয়া যদি স্বদেশে

উৎসাহাভাব। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীন রাজ্যের লোক হইলে, তাঁহাদের প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিভা কত অধিক পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিত, তাহা কেবল অনুভবনীয়। এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থের অধিনায়ক দিগম্বর মিত্রের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাউক।

প্রকৃতির যে সকল অতি মূল্যবান উপকরণে দিগম্বর গঠিত হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ গৃহস্থসন্তানের গঠনোপযোগী উপকরণ নহে,—তাহা রাজন্যোচিত;—রাজবংশোদ্ভূত ব্যক্তিরও সে উপাদানে নির্ম্মিত, প্রকৃতির সে অলঙ্কারে ভূষিত হওয়া বিপুল সৌভাগ্যসাপেক্ষ। দিগম্বর মিত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বভাবের সুকুলীন, "a nature's aristocrat"। প্রকৃতি দেবী তাঁহার বিশাল বক্ষের অতি গোপনীয় গৃহ হইতে জ্ঞানের এবং গৌরবের বহুতর, মহৎ ও মহিমান্বিত, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য দ্রব্য বাছিয়া বাছিয়া লইয়া এই গৃহস্থ সন্তানটির গঠন করিয়াছিলেন। রাজজন-আকাঙ্ক্ষিত সুরুচি ও সমুন্নত বাসনার সহিত সুধীর রাজনৈতিক সচিবোচিত অবস্থার অবস্থিতি ও অবস্থানবোধ সংমিশ্রিত; এক দিকে ইংরাজের ন্যায় অদম্য ও অবিচলিত কার্য্যশীলতা ও বৈষয়িক বুদ্ধি, অপর দিকে চতুর বাঙ্গালীর বিদ্যুৎবৎ তীক্ষ্ণতা, দিগম্বর মিত্রের দূরদৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও জটিল হইতে জটিলতর তথ্যসমন্বিত সমস্যার অন্তর্ভেদ করিত। বঙ্গদেশবিষয়ক অভিজ্ঞতায় দিগম্বর অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পরে এবং পূর্ব্বে, তদ্বৎ, বঙ্গীয় রাজস্বতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহই জন্মেন নাই। সে বিষয়ে তিনি তোদরমলের তুল্য, অথবা তোদরমল অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতরধী-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পরন্তু, এক দিকে নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণের তর্কশক্তি, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধজ্ঞান, এবং অপর দিকে কায়স্থসন্তানের সুতীক্ষ্ণ গণনানৈপুণ্য;—বৈজ্ঞানিকোচিত বিশ্লেষণশক্তি, ব্যবহারাজীবের সতর্কতা, বণিগ্‌বৃত্তির সাবধানতা, এবং কার্য্যবীরের সাহসের সহিত একত্রিত হইয়া, দিগম্বর মিত্রের মানসিক স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছিল। সে স্বরূপ কাব্য সাহিত্য সম্ভোগেও উদাসীন নহে। কঠোর কর্ম্মী কুঠিয়াল, বাণিজ্যপণ্যবিক্রয়শীল সওদাগর, এবং বিষয়ী বিষয়জ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ভূম্যধিকারী দিগম্বর মিত্র, গম্ভীরপ্রকৃতি রাজনীতিবিশারদ দিগম্বর মিত্র, "spouting Shakespere and Bacon." সেক্সপীয়র ও বেকন আওড়াইয়া আনন্দানুভব করিতেন। দিগম্বর মিত্রের তেজস্বিতা তাতারীয়, অথচ শিষ্টাচার

সংক্ষেপতঃ এই সকল স্বরূপ একাধারে সমষ্টীভূত হইয়া একটি উন্নত শ্রেণীর রাজনৈতিক, উদারপ্রকৃতির বিশ্বপ্রেমিক, এবং সমগ্র-প্রাণ-ময় স্বদেশহিতৈষী প্রস্তুত করিতেছিল। * কিন্তু পূর্ণমাত্রায় তাহা করিতে পারিয়াছিল কি? প্রকৃতি দেবী তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কে বলিবে, প্রতিদ্বন্দী কারণপরম্পরায় সে চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণেও সঙ্কুচিত করে নাই? দিগম্বর মিত্র প্রাণপণে রাজার জন্য এবং রাজ্যের জন্য খাটিয়াছিলেন; প্রাণপণে স্বদেশের এবং স্বদেশবাসীর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বহস্তে আপন সম্পত্তির সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; কিন্তু "There was no tinge of selfishness in his patriotism." তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতায় বিন্দুমাত্রও আত্ম-স্বার্থের সংস্রব ছিল না। তিনি রাজা প্রজা উভয়েরই জন্য সমপরিমাণে শ্রম ও সাধনা করিয়াছিলেন। মধ্য জীবনে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মিত্রজ মহোদয় এই মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এ কার্য্যে তিনি অর্থ সামর্থ্য, সময় এবং স্বাস্থ্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। সাংঘাতিক শোকসন্তাপের মধ্য কেন্দ্রে পতিত হইয়াও তিনি পুরুষকার প্রভাবে স্বকীয় রাজা ও স্বদেশের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু সে কার্য্য, সে শ্রম, সে সাধনা, সম্যক্ উৎসাহিত হইয়াছিল কি? উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হইয়াছিল কি? পরন্তু দিগম্বর যে প্রতিভা ও পুরুষকার লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহাও অবস্থাবৈগুণ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিল কি? রাজদ্বারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে যতদূর হইতে পারে, দিগম্বর মিত্রের মাহাত্ম্য স্বীকৃত না হইয়াছিল, এমন নয়; রাজা তাঁহাকে রাজপ্রসাদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্যক্ সানুকূল অবস্থায় পুরুষকারের তাহাই কি প্রচুর পুরস্কার? ওজনের মাত্রা বাড়াইয়া, ইংরাজীতে যাহাকে "ওভার এষ্টিমেট্" বলে, তাহা করা অভিপ্রেত নয়; কিন্তু স্বাধীন দেশে জন্মিলে, দিগম্বর মিত্র ইতিহাসের অনেকটা স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, ইহা অমূলক অনুমান মনে করিবেন না। "In England he might have been a Gladstone—in the united states an Arthur." দিগম্বর মিত্র ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় জন্মিলে একজন গ্লাডষ্টোন ও আর্থারের তুল্য আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন না, কে বলিবে? কিন্তু স্বাধীন রাজ্যের কথা যাউক,

* Rajah Digambar Mitra was a philosopher, a patriot, a philanthrophist. There was no tinge of selfishness in his patriotism:—অমৃতবাজার পত্রিকা।

হিন্দুর হিন্দুস্থানের কথাও পাড়িয়া কাজ নাই। দিগম্বর মিত্র যদি মুসলমান আমলেও এ দেশে জন্মিতেন, তাহা হইলেও ইহা স্থির যে, তিনি বাঙ্গালার বার ভূঁয়ার এক ভূঁয়া হইতেন ; সম্ভবতঃ বারভূঁয়ার বৃহত্তম ভূম্যধিকারী হইয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য করিতে পারিতেন। একটা প্রাদেশিক সুবেদারি বা সাম্রাজ্যের রাজস্বসচিবত্ব তাঁহার পক্ষে অপ্রাপ্য হইত না। কিন্তু-এ সব এখন কেবল স্বপ্ন মাত্র। তথাচ ইংরেজ সমালোচকও স্বীকার করেন, দিগম্বর মিত্র প্রকৃতই একটি রাজ্য-নীতি-বিশারদ, দক্ষতা এবং স্বাধীনতাসমন্বিত একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যবস্থাপক। He was essentially a statesman, a legislatar of high ability and independence. *

ইংরেজ শাসনের গঠন স্বতন্ত্র। সুতরাং উপরি-উক্ত স্বপ্ন বা সম্ভাবনা কার্য্যে পরিণত হইবার উপায় ছিল না। শাসনের সুকঠিন গঠনে, যত দূর সম্ভাবিত হইতে পারে, দিগম্বর মিত্র রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়াছিলেন ; এবং রাজ-মন্ত্রভবনে সমাদৃত হইয়াছিলেন। সে সম্মান এবং সে সমাদর কেবল মাত্র উপস্থিত অবস্থার অনুরূপ, এবং অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থার অনুপাতে অপ্রচুর হইলেও, সাধারণ হিসাবে বড় কম নহে। দিগম্বরের তুল্য পুরুষকারেই কেবল ইংরেজ রাজার তাদৃশ সমাদর ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, ইংরাজ শাসনে দিগম্বরের মত ব্যক্তির সম্যক গৌরব স্ফুরিত হইবার পথ না থাকিলেও, ইংরাজরাজ সে গৌরব স্বীকার এবং তাহার সমাদর করিতে অন্ততঃ একান্ত উদাসীন নহেন, ইহাও দিগম্বর মিত্র আদির রাজ-সমাদর ও সম্মান-প্রাপ্তি হইতে প্রতীত হইতেছে। অতএব প্রতিভার পুরস্কার ও উৎসাহাভাবের জন্য কেবল রাজনীতি দায়ী নহে, সে দায়িত্ব অন্যান্য কারণের উপরও সংস্থাপনীয়। এজন্য রাজনীতি আংশিকরূপে দায়ী বটে, কিন্তু সম্যকরূপে নহে।

গবর্মেণ্ট দিগম্বর মিত্রকে "রাজ"-পদ দিয়াছিলেন ; "ভারত নক্ষত্র" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহা ইংরাজ সাম্রাজ্যের উচ্চতর সম্মান। কিন্তু, সম্মান অনেক অযোগ্য লোকেও পাইয়া থাকে। কত কত অকালকুষ্মাণ্ড, অকর্ম্মণ্য ও অন্তঃসারশূন্য লোকেও রাজদ্বারে "ধামা ধরিয়া" খেতাব কুড়াইয়া আনে, তাহা কিনিয়াও আনে, জানি। কিন্তু, তাই বলিয়া, অযোগ্য লোকে উপাধি পায় বলিয়া, যোগ্য লোকের উপাধি অযোগ্য হয় না। অযোগ্য লোকে উপাধি পাইয়া কেবল উপহাসাস্পদ হয় মাত্র। সরকার বাহাদুর সরকারী প্রচ-

লিত রীতির অন্যথা করেন না। অযোগ্যকে উপাধি দিয়া হাস্যাস্পদ করেন, আর মনে মনে হাসেন। বাবুর্চী খানসামা খাঁ বাহাদুর হয়; রাজকীয় রজকের রাষভেও 'রায় বাহাদুর হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় না। সার্‌মেয় "স্তর" হইয়া সিংহত্ব লাভ করে না। গবর্মেণ্টকে স্বভাবতই সাধারণ নিয়মানুসারে কাজ করিতে হয়; সুতরাং কৃষ্ণদাস পাল ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় আরও অন্যান্যকে রায় বাহাদুরী ও "সি, আই, ই" উপাধি দিয়াছেন। তথাচ অন্যান্যের এ উপাধির অপেক্ষা কৃষ্ণদাসের ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপাধির গৌরব অনেক অধিক ছিল। দিগম্বর মিত্রের রাজা উপাধি এবং সি, এস, আই, অলঙ্কার সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা তাঁহার well earned তাঁহার পুরুষার্থের পরিচায়ক, সম্পূর্ণরূপে স্বোপার্জ্জিত পদার্থ। তিনি আত্মপ্রভাবে, পরিশ্রমে, এবং শরীরের রক্ত ব্যয় করিয়া যেমন ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন; এ উপাধিও সেইরূপে উপার্জ্জিত। তিনি উপাধিতে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন,—উপাধিও তাঁহাতে প্রভূত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। অসাধারণ ভাবে সাধারণ হিতকর কার্য্যের সাধন, স্বাধীনতা, শিষ্টাচার এবং সাহস, তাঁহার রাজনৈতিক ও প্রজানৈতিক পরিশ্রমের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদত্ত হইয়াছিল। মিত্র মহোদয়কে রাজা উপাধি প্রদানকালে বঙ্গেশ্বর মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন;—রাজা দিগম্বর মিত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"বিগত বহুকাল হইতে স্থানীয় গবর্মেণ্টের সম্মুখে যত শাসননৈতিক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মীমাংসাকল্পে, আপনার পরামর্শ ও মন্ত্রণাগ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং আপনি তাহা প্রদান করিয়া গবর্মেণ্টের সহায়তা করিয়াছেন। শাসনকার্য্যের এবং সাধারণের হিতার্থে আপনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বিখ্যাত এবং বহুল। তাহারই স্বীকৃতিস্বরূপ, আপনাকে, মহারাণীপ্রদত্ত এই রাজা উপাধি অর্পণ করিয়া, আমি পরম সুখী হইতেছি।"

যাদৃশ সম্ভব, এ দেশের বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক দিগম্বর মিত্রের প্রতিভা পুরস্কৃত, স্বীকৃত ও সম্মানিত, তবুও হইয়াছিল। কিন্তু দিগম্বরের দেশ, তাঁহার নিজের সমাজ, তাঁহার স্বদেশী এবং স্বজাতি বাঙ্গালী বাবু, তাঁহার সদ্‌গুণের ও শ্রমের সম্মানার্থে কি করিয়াছেন,—কিছু করিয়াছেন কি? জিজ্ঞাসা করিতেছি। সম্মান, সহানুভূতি, উৎসাহ ত দূরের কথা, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসী তাঁহাকে অসম্ভ্রম ও উপেক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন কি? পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আমরা এখনি যাহা দেখাইব, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে, এ দেশে পুরুষকারের বিকাশকল্পে বিজাতীয় রাজা অপেক্ষা স্বদেশীয় সমাজ অধিকতর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এ দেশের প্রতিভাশালী পুরুষদিগের প্রায় সকলেই দেশীয়-দিগের দ্বারা উপেক্ষিত, অসম্মানিত। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু আপাততঃ দিগম্বরের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করি।

"Like all self-made man he was intensely unpopular." * স্বানুবর্ত্তী স্বনাম-ধন্য-পুরুষ ব্যক্তি বঙ্গসমাজে অধন্য, অনাদৃত, নিন্দিত, লাঞ্ছিত; অতএব ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি যে, দিগম্বর মিত্র লোকপ্রিয় ছিলেন না। না থাকিবারই কথা। লোকে তাঁহার নিন্দা করিত, কুৎসা করিত; অমূলক মিথ্যা কলঙ্ক রটাইত। বলিত, "এ লোকটা লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াই এত বড় জমিদারিটা করিয়াছে।" ‡

পুরুষকারের ইহা চমৎকার সম্মান বটে !! কিন্তু এইরূপ সম্মানই এ সমাজে সম্ভবে। কেন ? তাহা পূর্ব্বেই সূচিত করিয়াছি। প্রবন্ধের আরম্ভেই পলিত, গলিত পরানুবর্ত্তী স্বদেশীয় সমাজের যে অবস্থা অঙ্কিত করিয়াছি, তৎপ্রতি পাঠকের পুনঃ চিত্ত আকর্ষণ করি। এতাদৃশ সমাজে পুরুষার্থের অসম্মান ভিন্ন আর কিছুই সম্ভবে না। সাধারণের শত পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার এই যে, লোকের সর্ব্বনাশ করা ব্যতীত, "এত বড় একটা জমিদারি" আপন হাতে উপার্জ্জন করিবার আর কিছুমাত্র পার্থিব পন্থা নাই।" তাহার উপর হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা, মনুষ্যস্বভাবের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্বভাবের কুৎসাপরায়ণতা আছে। সুতরাং পুরস্কারের উপরি-উক্ত অসম্মান। কিন্তু এরূপ অসম্মান কেবল এই অধঃপতিত দেশেই সম্ভবে। মিথ্যা অপবাদের অনুমাত্র কারণ না থাকিলেও লোকে তাহা আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহার যদি যথার্থ কারণ থাকিত, রাজা দিগম্বর মিত্র যদি প্রকৃতই পরস্বাপহরণ করিয়া, "লোকের সর্ব্বনাশ" করিয়া স্বকীয় সম্পত্তি গঠিত করিতেন, এবং তাহার এক কপর্দ্দকও রায়তের উন্নতি অর্থে, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে, প্রকৃত দরিদ্রের দুঃখমোচনে বা বিদ্যার্থী ছাত্রের অন্নদানে ব্যয়িত না করিয়া, যদি একটি কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার নিন্দা করিত না,—প্রত্যুত তাঁহার প্রশংসাবাদে

* অমৃতবাজারপত্রিকা।

‡ The [illegible] impression that he gathered this fortune round a nucleus

পৃথিবী পূর্ণ করিত!! রাজা দিগম্বর মিত্র যদি শত অবৈধ উপায়ে, মহাপাতক অতি পাতক করিয়াও ঐশ্বর্য্যশালী হইতেন, এবং সে ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ,—কড়া—ক্রান্তি—কাক, প্রতি দিন আলস্য-পরতন্ত্র, অকর্ম্মণ্য, ঔদরিক, পরানুবর্ত্তী, পরনিন্দুক, আজন্ম-উমেদার, চাটুকার ও ধামাধরা সম্প্রদায়ের পোষণার্থে ব্যয় করিতেন, এবং ৺ শারদীয়া পূজার নৈবেদ্যে রজতমুদ্রাপূর্ণ একখানা অতিরিক্ত খুরির ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" বলিয়া গণ্য হইতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই;—কারণ, এরূপ "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" সমাজে সত্য সত্যই বিরাজিত,—অস্মদ্দেশীয় সমাজের সাধারণতঃ অবস্থাই এই!!! অতএব তৎপ্রদত্ত সুখ্যাতি অখ্যাতির বিচার করিতে বসাই পণ্ডশ্রম।

দেশের লোক দিগম্বরকে এই চক্ষে দেখিত বটে; কিন্তু এ দেশীয় ইয়ুরোপীয় সমাজ তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিয়াছিল। কারণ, পুরুষকার কি পদার্থ, তাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ, রাজা দিগম্বর মিত্রের সত্য-পরায়ণতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, স্বাধীনতা, শিষ্টাচার, স্বানুবর্ত্তিতা এবং সৎকার্য্যে সহানুভূতি সম্যক অনুভব করিয়াছিল, এবং তিনি চোগা-চাপকান-পরা নেটিভ বাঙ্গালী হইলেও তাঁহাকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র, সাধারণতঃ নেটিভ-নিন্দুক স্বয়ং ইংলিশম্যান, দিগম্বর মিত্রের মৃত্যুর পর মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন;—

He (Raja Digambar Mitra) was about as unlike the general class of Bengalees as it was possible to imagine. Upright aud stern in all business matters, never afraid to express his opinions before either Europeans or his own countrymen and provided with plenty of good sense and arguments to maintain those opinions, at times the Bengalees hated him, whilest they respected him, and no native gentleman of Calcutta, has ever been held in higher esteem by Europeans. For though he disdained to cringe or flatter, and had a very direct way of expressing his opinion, every European felt that he was dealing with one of nature's gentleman, in whom was no guile. *

আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি, ইহা সাধারণতঃ তাহারই ইংরেজী আবৃত্তি; অতএব সম্যক্ অনুবাদের আবশ্যক নাই।

ইংলিশম্যানের উল্লিখিত উক্তিতে রাজা দিগম্বর মিত্রের স্পষ্টবাদিতা, স্বাধীন-

চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। তিনি বিকৃত বাঙ্গালী প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাকে অগত্যা মান্য করিলেও ঘৃণা করিত, ইংলিশম্যান ইহাও বলিতেছেন। কিন্তু, ইংলিশম্যানের মতে এ দেশীয় ইয়ুরোপীয়গণ, কলিকাতা-বাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দিগম্বর মিত্রকে অধিকতর সম্মান করিতেন। ইংলিশম্যান বলেন, য়ুরোপীয়গণ, দিগম্বরের সহিত আলাপে স্বভাবের স্বহস্তনির্ম্মিত কপটতা-পরিশূন্য ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথনের আস্বাদ অনুভব করিতেন।

অথচ, দিগম্বরের স্বদেশীয়েরা সাধারণতঃ "অনুভব" করিতেন অন্যরূপ!! সে কি রূপ, পূর্ব্বেই পুনরুক্ত করিয়াছি। কিন্তু, দূর হউক দেশের সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের কথা। দিগম্বর মিত্র যে সকল স্বদেশীয়, শিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, সদসদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ ব্যবহার করিতেন, যাঁহারা দিগম্বরের পুরুষকার, প্রতিভা, সদ্‌গুণ এবং স্বদেশহিতৈষিতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, এবং অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা,—পরন্তু যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উন্নতিকল্পে, দিগম্বর জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং যাহা তাঁহারই জন্য এক সময়ে দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রজানৈতিক শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল,—সেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ানের অতি বিদ্বান ও বিশিষ্ট সদস্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপ্রতি কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দিগম্বরের জীবনীলেখক নিজেই ত লিখিয়াছেন;—তাহা বাঙ্গালী প্রকৃতির কি পলিত অবস্থার পরিচায়ক, তিনিই বলুন না? সে ব্যবহার সম্বন্ধে জীবনী-কারের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি;—

* * The members of the Association stultified themselves by their cold refusal of the usual portrait with which it was their rule to honor the memory of all their departed and retiring presidents, and of all their distinguished members. It is surprising that the man, who had always been the foremost volunteer in bearing the burden and heat of all their onerous undertakings, who was their "backbone" and who had largely raised the Association in official and popular esteem, should at last be condemned to posthumous-ostracism. Thirteen years have passed without his pictorial honor.

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার চিরন্তন নিয়মানুসারে, ঐ সভার সভাপতিদিগের

পিত করার রীতি ;—কিন্তু, দিগম্বর মিত্রের মৃত্যুর পর, তদীয় মূর্ত্তির বর্ণচিত্র সভাগৃহে রক্ষা করার কথা উত্থাপিত হইলে, অকস্মাৎ এ রীতি অন্তর্হিত হয়, সভার সভ্যেরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতর সভাপতি রাজা দিগম্বরের একখানি প্রতিমূর্ত্তি-পট প্রতিষ্ঠায় অসম্মত হন!!! কিন্তু, কেন? দিগম্বর মিত্র কি উহার অযোগ্য ছিলেন, অথবা তিনি কোনও অপরাধ করিয়াছিলেন? না;—তাহা কিছু নয়। তবে উহার একটি কারণ ছিল বটে। কারণটি এই,—জীবনী-লেখক বলেন যে, এই সভার কোনও স্বার্থপর সর্দ্দার সভ্যের, সভাপতি দিগম্বরের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল। সভাপতির জীবন-কালে সেই বিকার-বিজৃম্ভিত বিদ্বেষের প্রতিশোধ দিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং কল্পিত শত্রুর মৃত্যুর পর, সেই বাদ সাধিয়া বঙ্গীয় পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন!! সভাগৃহে দিগম্বর মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে দেন নাই! এবং তাহার পর ১৩.১৪ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি রাজা দিগম্বর মিত্রের আলেখ্য জমিদার-সভার অঙ্গ অলঙ্কৃত করে নাই!

তা, প্রতিভা-পূজার, তাহার সম্মান, পুরস্কার, উৎসাহের, ইহা অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে! যে দেশে পণ্ডিতদিগের এই প্রবৃত্তি, তথাকার অশিক্ষিত বা ইতর সম্প্রদায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্মৃতি-চিহ্নস্থাপনে, স্বকীয় কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিলে, তাহাদিগকে বড় বেশী অপরাধী করা যায় না।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের যে অধিবেশনে রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রতিমূর্ত্তি-পট "নামঞ্জুর" হইয়াছিল, তাহার কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ ও বক্তাদিগের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া জীবনীলেখকের কর্ত্তব্য ছিল। কেন না, তাহা বাঙ্গালী-কলঙ্কের কঠোর ইতিবৃত্ত হইলেও, ভবিষ্যদ্বংশাবলীর বিচারার্থে, এই জীবনীর সহিত গ্রথিত হইয়া থাকা উচিত।

এখন, আমরা দেখাইয়াছি যে, পুরুষকার ও প্রতিভার পরিপোষণ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে, রাজকীয় ব্যবস্থা তাদৃশ দোষী নয়, যাদৃশ দোষী দেশের অবস্থা, দেশীয় লোকের প্রকৃতি,—প্রবৃত্তি। রামমোহন রায় এবং তদীয় সময় হইতে, এ কাল পর্য্যন্ত, এ দেশে যত প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই যথাসম্ভব রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত; কিন্তু দেশের লোক তাঁহাদের কাহার জন্য কি করিয়াছেন? দেশীয় লোকের প্রকৃতি প্রবৃত্তি, প্রতিভা-পরিপুষ্টির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ। তাহা ভিন্ন আরও দুইটা কারণ আছে। তাহার

অবস্থা, আর একটা আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু এই দুই কারণের আর এ স্থলে ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই।

প্রসঙ্গানুক্রমে রাজা দিগম্বর মিত্রের চরিত্রগত যে কয়েকটি স্বরূপ, সামান্যতঃ গ্রহণ করিয়া আমরা এই আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়াছি, তাহা তাঁহার জীবনের কার্য্য ও কার্য্যগতি দ্বারা প্রমাণীকৃত হওয়া আবশ্যক, এবং তদুপলক্ষে তাঁহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হওয়া প্রয়োজন। পরন্তু, তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যাবলী ও অভিমত, এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব, যথাসম্ভব সমালোচিত হওয়া উচিত। সমালোচকের কর্ত্তব্যানুরোধে আমরা তাহা করিতে বাধ্য। অথচ উপস্থিত প্রবন্ধ এত অধিক দীর্ঘ হইয়াছে যে, বাঙ্গালা সাময়িকের পক্ষে ইহা ধারণ করা সুকঠিন। ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালা পত্রের পাঁচ ফুলে ডালা সাজাইয়া পাঁচ রকম পাঠকের মন যোগাইতে হয়। অতএব সময় ও সুবিধা মতে, বরং অপর একটি প্রবন্ধে এ আলোচনার উপসংহার করা যাইবে। তবে তজ্জন্য আমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে উৎসুক নহি। কিন্তু আপাততঃ এই জীবনী-গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা আছে।

মহজ্জীবনের কোনও অংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়; তাহা যে স্থলে একান্ত উচিত বিবেচিত হয়, সে স্থলে জীবনী লিখিত ও প্রকাশিত না হওয়াই শ্রেয়ঃ। জীবনের কেবল আলোকিত অংশের প্রকাশ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন অপ্রকাশ রাখিলে, অন্ধকার অধিকতর গাঢ় হইয়া উঠে,—সে জীবনী পাঠের যে উপকার, তাহার অনেক লাঘব হয়। রক্ত মাংসে সবই যে উচ্চ এবং উচ্চতর হইবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। এরূপ আশা করিলে মনুষ্যজীবনী না লিখিয়া দেব-চরিত্রেরই সৃষ্টি করিতে হয়। মনুষ্যের জন্য মনুষ্যাদর্শ আবশ্যক। আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয়, দেবতারা মনুষ্য হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অবতার-তত্ত্ব, এই আবশ্যকতামূলক বলিয়াই বিবেচনা করি।

চরিত্রের অংশবিশেষ উদ্ঘাটিত হইলে মনুষ্যবিশেষের মাহাত্ম্য মারা পড়ে, এ আশঙ্কাই অনেকটা ভ্রম। আবৃত করা অপেক্ষা উদ্ঘাটিত করাতেই উপকার। কারণ, তদ্দ্বারা লোকে উপযুক্ত অনুসন্ধানের অবসর পায়, তথ্যঘটিত পরীক্ষা করিয়া আপন আপন আদর্শ ও আলোক অনুসারে বিবৃত বিষয়ের ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারে। এ দেশীয় অনেক জীবন-চরিত-লেখক কিন্তু ইহা বুঝেন না। জীবনীর ঘটনাবিশেষ বা জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির

রাখিয়া, উপকারের আকারে, অজ্ঞাতে সে ব্যক্তির মহা অপকার করিয়া বসেন। আলোচ্য জীবনীর গ্রন্থকার, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তদীয় নায়কের এ অপকার করিয়াছেন, আমরা এমন বলি না। তবে রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনের সমস্ত অংশই যে তিনি পরিষ্কার বা অন্ধকারপরিশূন্য করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু তাহার দুইটা একান্ত অনিবার্য্য কারণও আছে। প্রথম কারণ, তথ্যাভাব। দ্বিতীয় কারণ, দিগম্বর মিত্রের সমসাময়িক এবং অদ্যাবধি জীবিত কোনও কোনও ব্যক্তির জীবনগত বিবরণের বিবৃতি-প্রয়োজনীয়তা। প্রথম কারণ অতিক্রম করা এ দেশে একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়টিও অতি কঠিন সমস্যা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, এই জীবনীলেখক দুই একটি ঘটনা, একেবারেই ছাড়িয়া গিয়াছেন। হয় ত, অনাবশ্যক বা অতি সামান্য বোধে ছাড়িয়া গিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অনাবশ্যক নহে, অতি সামান্যও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এ স্থলে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। জীবনীলেখক রাজা দিগম্বর মিত্রের অনেক বিশিষ্ট বন্ধুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, অথবা তাহা আদৌ আবশ্যক বোধ করেন নাই। সে ব্যক্তির নাম,—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। দত্তের সহিত মিত্র মহোদয়ের সবিশেষ সদ্ভাব ছিল; তিনি সেই অভাগা কবিকে আন্তরিক স্নেহানুগ্রহ করিতেন। অথচ এই মাইকেল দত্ত ঘটিত একটি ব্যাপারে মৃত রাজার জীবনীর কোনও অংশের এক বিন্দু কিঞ্চিৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। জীবনী-লেখকের উচিত ছিল, এ অন্ধকার উন্মোচন করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। মাইকেলের নামই উল্লেখ করেন নাই। অথচ মাইকেল সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না, আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি না। মাইকেলের জীবনীকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু লিখেন, (আলোচ্য জীবনীর গ্রন্থকর্ত্তা) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়, মাইকেলের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং মাইকেলের জীবনী-সঙ্কলনে বসুজাকে আনুকূল্যও করিয়াছেন। সুতরাং মাইকেল-সম্বন্ধীয় কথা মিত্রজ-জীবনীতে অপ্রকাশ রাখিয়া আমাদের গ্রন্থকার, মাইকেল ও মিত্র, উভয়েরই প্রতি অজ্ঞাতে অবিচার করিয়াছেন; প্রত্যুত, তদ্দ্বারা মিত্র-জীবনীর উল্লিখিত প্রচ্ছন্ন অংশপ্রসঙ্গে লোকের সংশয়ান্ধকার অধিকতর প্রগাঢ় হইয়াছে। অথচ, মাইকেলের প্রতি মিত্র মহাশয়ের (অবিরত) ব্যবহারে কিছুই সমর্থনীয় ছিল না, আমরা এমনও

যদি সময় হয়, মৃত রাজার জীবনীর এই অবিবৃত অংশ এবং অন্যান্য অংশেরও এক আধ স্থল আমরা পরীক্ষা ও পরিষ্কার করিয়া, তাঁহার অপরাধ বা তাহার বিপরীত সাব্যস্ত করিলেও করিতে পারি।

জীবনীর উপসংহারে গ্রন্থকার, রাজার প্রকৃতি ও পুরুষকার সম্বন্ধে কিছু বিচার করিয়াছেন। সে বিচারকে সম্যক সুবিচার বলিয়া আমরা মনে করি না, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গ্রন্থকার "হীরো ওয়ার্শিপ্" অর্থাৎ পুরুষকারপূজার বিরোধী নহেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রকৃত প্রতিভাশালী পুরুষ অর্থাৎ হীরোরই অভাব। হীরোত্ব বা বীরত্ব তিনি খুঁজিয়া পান না। কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্রের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে "Star of the first magnitude" বলিয়াছিলেন বলিয়া, গ্রন্থকার কিছু গরম হইয়া তাহার পালটা গাইয়াছেন। তাঁহার মতে "first class star" অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর তারকা পৃথিবী হইতে এত অধিক দূরে যে, তাহার জ্যোতিঃ মর্ত্ত্যজগতে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব লাগে, কাযেই সে জ্যোতিঃ, দূর পথ পর্য্যটন করিয়া, অদ্যাপি আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই,—পথে পথেই আছে। কৃষ্ণদাস পালের মানসাকাশে জোনাকীর যৎসামান্য জ্যোতিঃও উজ্জ্বল নক্ষত্রালোক; কিন্তু আমাদের এই গ্রন্থকারের "গগন" ভিন্নপ্রকৃতির, গ্রন্থকার নিজেই এ কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। ইহা উত্তম।

গ্রন্থকারের আদর্শ, অবশ্য খুব উচ্চ,—উচ্চতর হইতেও উচ্চতম। আমরাও,—নাগাল পাই বা না পাই,—অত্যুচ্চেরই আকাঙ্ক্ষী। অতএব ছোট খাট "হীরো ওয়ার্শিপে" হাত দিয়া আত্ম-হীরোত্বের হানি বা হত্যা করিতে নারাজ। তবে আমাদের এবং আমাদের এই গ্রন্থকারের অত্যুচ্চ "গগন", আপাততঃ যে দূরে, সেই দূরেই রাখিয়া, ও হীরোত্বের হাস্যরসকে বিদায় দিয়া, এ স্থলে একটি কথা ধীরভাবে আলোচ্য হইতে পারে।

যে পুরুষকার উপযুক্ত অবসর থাকিলে, একটি রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিত, এবং যদ্দ্বারা একটি বৃহৎ সম্পত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সেই কার্য্যকে সচরাচরসংঘটিত "common place" ঘটনা বলিয়া সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা তাহা এক কথাতেই উড়াইয়া দিতে চাহেন। self-made man অর্থাৎ "স্বনাম-ধন্য পুরুষ" তাঁহার মতে common place কি—না সংসারের সচরাচর-সংঘটিত অতি সাধারণ বা ইতরঘটনা-মূলক! কিন্তু

লোক বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়টা লোক self-made? কয়টা লোক স্বনাম-ধন্য পুরুষ হইয়া থাকে? বিষয়-বাসনা ত সকলেরই আছে,—সংসারে এ বাসনাটি যেরূপ সাধারণ, এরূপ আর কিছুই নহে;—কিন্তু বিষয়সৃষ্টি বা সংগঠন করিয়া উঠিতে পারে কয় জন লোক? যখন লক্ষের মধ্যে কদাচিৎ একজনও সমর্থ হয় কি না সন্দেহ, তখন তাহাকে common place কহি কেমন করিয়া? পক্ষান্তরে দেখিতে পাইতেছি যে, কর্ম্মক্ষেত্রে যত লোক ঘুরে, তাহাদের সকলেরই সেই এক আদর্শ, আদর্শ;—বিষয়-উপার্জ্জন,—আত্ম-পুরুষার্থস্থাপন। আদর্শ অত্যুন্নত না হইতে পারে; কিন্তু সংসারী মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য উহা। লক্ষ্য উহা, অথচ ঐ লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হওয়া একান্ত কঠিন। যে কোনও কঠিন কার্য্য সৎশ্রমে এবং সুকৌশলে সম্পন্ন করাকে চলিত কথায় পুরুষার্থ বলে, বীরত্বও বলে। উল্লিখিত কঠিন কার্য্য যিনি যখন পুরুষার্থপ্রভাবে সম্পন্ন করেন,—সংসারের নিয়মানুসারে তাঁহাকে ন্যায়েই কর্ম্ম-বীর বলিতে হয়। এখন আমাদের সম্মুখে যদি একটি কর্ম্মবীর উপস্থিত হন, এবং তাঁহার জীবনকার্য্যকে আমরা common place বলিয়া উড়াইয়া দিই, তাহা হইলে কেবল তাঁহার প্রতি নহে, বিষয়কর্ম্মী মাত্রেরই মনুষ্যাদর্শের সফলতা মাটি করিয়া তাঁহাদেরও অপকার করা হয়। রাজা দিগম্বর মিত্র বিষয়ক বিচারপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার অজ্ঞাতে এই অন্যায় ও অপকার করিয়া বসিয়াছেন, আমাদের আশঙ্কা।

গ্রন্থকার উপরি উক্ত ক্ষেত্রে, দিগম্বর মিত্রের কার্য্যকে common place বলিলেও অপ্রশংসা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তিনি কারণোদ্ভূত কার্য্যাংশকে উড়াইয়া দিয়া, কারণের প্রশংসা করিতে কাতর হয়েন নাই। কিন্তু অনেক স্থলে, কার্য্য হইতেই কারণ প্রমাণীকৃত হয়। এ স্থলেও তাই হইয়াছে। রাজা দিগম্বর মিত্রের পুরুষকারের প্রমাণ কি? উত্তর,—তাঁহার কার্য্য। গ্রন্থকার প্রমাণ ছাড়িয়া প্রমাতব্যের প্রশংসা করিয়াছেন, এবং অজ্ঞাতে তাঁহার এ প্রমাদ স্বীকার করিয়াও বসিয়াছেন;

"Of Raja Digambar we entertain a favorable opinion from an unused omitted point of view."

হাঁ, এক হিসাবে ইহাই বটে। প্রমাণ ছাড়িয়া কেবল প্রমাতব্যকে গ্রহণ সচরাচর unused অর্থাৎ অব্যবহৃত এবং অভিনব প্রথা বটে। তা হউক, গ্রন্থকার মোটের উপর ঠিক আছেন। দিগম্বর মিত্রের দৃঢ়তা, সতর্কতা, সাহস,

স্বাধীনতা, অধ্যবসায়, অভিমতের ঐকান্তিক স্থৈর্য্য, সাধারণ কার্য্যে নিঃস্বার্থপরতা, এক কথায় তাঁহার পুরুষকারের আমরা প্রশংসা করি, গ্রন্থকারও তাহা করেন। তিনি কিন্তু প্রধানতঃ একটি বিষয়ের জন্য অধিক প্রশংসা করেন। সে বিষয়টি তাঁহার নিজেরই কথায় এই যে, দিগম্বর মিত্র possessed a heart approaching to an English stout heart and a force of will approaching to an English force of will. পুনশ্চ ;—Digambar is the hero of our epic on account of that manly character, which meets from Europeans with an enlightened appreciation.

ইহার অর্থ এই যে, দিগম্বর মিত্রের অন্তঃকরণ ও ইচ্ছা-শক্তি ইংরাজের সবল অন্তঃকরণ এবং ইংরাজের ইচ্ছাশক্তির কাছাকাছি পৌছিয়াছিল, অর্থাৎ মিত্রজা মহাশয় ইংরাজী অন্তঃকরণ প্রায় পাইয়াছিলেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার তাঁহার প্রশংসা করেন। পরন্তু, দিগম্বরের যে পুরুষার্থপূর্ণ চরিত্রের ইয়ুরোপীয়েরা "তারিপ" করিতেন, সেই ইয়ুরোপীয়-অনুগৃহীত চরিত্রের জন্যই, রাজা দিগম্বর, গ্রন্থকারের এই "এপিক" অর্থাৎ মহাকাব্যের, হীরো কি—না বীর হইতে পারিয়াছেন ; নহিলে পারিতেন না।

ফলতঃ, গ্রন্থকারের এই আদর্শকে খুব উচ্চ আদর্শ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ফলিতার্থে মিত্র মহোদয় ইংরাজ হৃদয় ও ইংরাজী ইচ্ছাশক্তির অনুকারী ইংরাজও হয়েন নাই। তাহা আমরা এই গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতেই অবগত হই। পরন্তু, তাহা হইলে স্বয়ং ইংরাজরাই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত, সর্ব্বথা সম্মান করিত না। পরন্তু তাহা হইলে আমরা তাঁহার যে পুরুষকারের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাও তাঁহাতে জন্মিত না। কেন না, স্বজাতির স্বাভাবিক এবং অবিকৃত প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরপ্রবৃত্তির অনুবৃত্তি ও পরানুকারী হইলে, কস্মিন কালেও কোনও ব্যক্তিতে পুরুষার্থ সম্ভবে না। অতএব, গ্রন্থকারের উপরি-উক্ত উক্তি আমরা একান্ত ভ্রমাত্মক বিবেচনা করি।

দিগম্বর মিত্র বাঙ্গালীর বিকৃত এবং পরানুবর্ত্তী প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন মাত্র ; কিন্তু তাই বলিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালিত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই ; তাহা তাঁহার হাড়ে হাড়ে ছিল। তজ্জন্যই তিনি পুরুষার্থলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, নহিলে হইতেন না। ইংরাজতুল্য কার্য্যকুশলতার সহিত বাঙ্গালীবৎ কোমল হৃদয়ের অধিকারী তিনি ছিলেন। এ বিষয়ে শিশির কুমার ঘোষের কথাই

simple as a child and as tender-hearted as a woman." ফলতঃ স্ত্রজাতির কোমলতার সহিত অবিকৃত মনুষ্যস্বভাবের কর্ত্তব্যপরায়ণতা সংমিশ্রিত করিয়াই দিগম্বর কৃতিত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য কাপুরুষ ভিন্ন আর সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

অত্র-আলোচিত গ্রন্থে অসামঞ্জস্য আছে, অভাব আছে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুনর্ব্বার বলি, ইহা এ দেশীয় জীবনীগ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং তজ্জন্যই আমরা ইহার এত অধিক আলোচনার শ্রম স্বীকার করিয়াছি। গ্রন্থপ্রাপ্তির বহুদিন বিলম্বে সমালোচনা হইল, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

রেণু।

এ বিশাল বিশ্ব সংসারে একটি ক্ষুদ্রতম রেণুকণা পর্য্যন্তও যে বৃথা অবস্থান করে না, চক্ষুর অগোচর ধূলিকণিকারও যে অত্যাবশ্যকতা আছে, সুজন পাঠক ! আজ আসুন, বিজ্ঞান আমাদিগকে এ সম্বন্ধে কি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করি।

আমরা সকলেই জানি, আমাদিগের এই ভূপৃষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বের বায়ুরাশি অনন্ত স্তর পর্য্যায়ে সংস্থিত ; নিম্ন স্তরগুলি অপেক্ষাকৃত ঘন ও উচ্চতম স্তরগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বায়ু দ্বারা সংগঠিত। এই অসীম বায়ুস্তূপ কেবল যে নিরবচ্ছিন্ন বায়বীয় পদার্থপূর্ণ, এমন নহে। সহজ দৃষ্টির গোচরীভূত না হইলেও, অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আমাদিগের সম্মুখের এই বায়ুরাশি নিরবচ্ছিন্ন বায়বীয় অণুপূর্ণ নহে। অনেক সময়ে, অন্ধকার গৃহমধ্যে ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথ দিয়া অল্পমাত্র সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, গৃহের যে অংশ দিয়া কিরণরেখা অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সেই রেখাপথটি আলোকিত নানা অণুকণায় পূর্ণ। আলোকপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিলে অথবা বাতায়নটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া দিলে সেই সব অণুকণিকা আর আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। আর কোনও পরিচ্ছন্ন গৃহ দুই তিন দিবস পরিষ্কার না করিলে দেখা যায়, গৃহমধ্যস্থ টেবিল, চেয়ার; বাক্স, পুস্তক প্রভৃতির উপর একটি অতি সূক্ষ্ম ধূলি-স্তর পড়িয়া রহিয়াছে। ধূলি বায়ুরাশিতেই অবলম্বিত ছিল। ক্রমে মাধ্যাকর্ষণভাবে গৃহমধ্যস্থ পদার্থের উপর অবস্থিত হইয়াছে। ইহা

হইতে আমরা স্পষ্টই জানিলাম যে, এই বায়ুমণ্ডল বায়বীয় অণু ব্যতীত নানাবিধ কঠিন পদার্থের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুকণা সংমিশ্রিত। তন্মধ্যে ধূলিকণার পরিমাণই অত্যধিক। ভূপৃষ্ঠ অনুক্ষণ জীবজন্তু দ্বারা ও অন্যান্য কারণে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। উৎক্ষিপ্ত রেণুর মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভারী, তাহারা পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে, আর যাহারা অপেক্ষাকৃত লঘু ও সূক্ষ্ম, তাহারা বায়ুপ্রবাহসহকারে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে নীত হইতেছে। এইরূপে অতি উচ্চতম বায়ুস্তর পর্য্যন্তও অতি সূক্ষ্মতম রেণুকণিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।

ধূলিকণা ব্যতীত অন্যান্য কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম অণুও বর্ত্তমান থাকে। নানাবিধ জান্তব ও ঔদ্ভিদিক ধ্বংস ও ক্ষয়, বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ক্রমাগতই বায়ুরাশিতে মিশিতেছে। প্রস্তর, কঙ্কর, অঙ্গার, লৌহ ও নানাবিধ খনিজ পদার্থের অণু বায়ুসাগরে ভাসমান থাকে। অনন্ত নভোমণ্ডলে উল্কাচূর্ণ অতি সূক্ষ্মতম রেণুর আকারে বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপ কেবল মৃত্তিকাচূর্ণ নহে, ঔদ্ভিদিক, জান্তব, ধাতব প্রভৃতি নানা স্থূল পদার্থাণু অনন্ত বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের রেণু কেবল ধূলিকণিকা নহে। তবে অধিকাংশ রেণুই,—যেমন ঔদ্ভিদিক বা জান্তব,—অনতি উচ্চ বায়ুস্তর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। ধূলিকণিকাই অতি সূক্ষ্মতম আকারে বায়ুপ্রবাহে অনেক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তন্মধ্যে অবলম্বিত হইয়া থাকে।

কেহ মনে করিতে পারেন, যে বায়ু আমাদের প্রাণ, যাহা নিশ্বাস দ্বারা পান করিয়া আমরা জীবন ধারণ করি, সেই বায়ু নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হওয়া কত আবশ্যক, অথচ আমরা দেখিতেছি, কত অগণ্য প্রকারের বিজাতীয় পদার্থাণু তৎসহ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। পাঠক আপনি কি ইহা হইতে মনে করিবেন যে, ইহা একটি অন্যায় ব্যাপার, অনন্ত বিশ্ব ব্যাপারের মধ্যে ইহা একটি অসঙ্গত দৃশ্য? আমরা কিন্তু আপনাকে তত সহজে এরূপ ভাবিতে পরামর্শ দিই না। আমরা ক্ষুদ্র মানব, বিশাল বিশ্বসংসারকে মানবের সুখ অসুখ, সুবিধা অসুবিধার মধ্য হইতে পরিদর্শন করিতে যাই বলিয়াই, এ জগৎ ব্যাপারের মধ্যে নানা অসঙ্গত ভাব দেখিতে পাই। বস্তুতঃ, জগৎ-সংসার অসঙ্গত ব্যাপারে পূর্ণ নহে।

পাঠক! যদি আপনি সুকবি হন, তাহা হইলে কত সময়েই না মস্তকোপরি সুনীল গগনের পানে তাকাইয়া সে অনুপম নীলিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে কবিত্বরসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকিবেন। অথচ কখনও কি ভাবিয়াছেন, ঐ সুন্দর নীলাভ আকাশ কোথা হইতে আসিল? আকাশ ত শূন্য, কিন্তু শূন্য-

দেশ কিরূপে, কিসের জন্য, ঈদৃশ নয়নানন্দ অনির্ব্বচনীয় নীলবর্ণে সুশোভিত হইল। বোধ হয়, যদি আমরা এখন আপনাকে বলিয়া দিই যে, শূন্যদেশে ধূলি-কণার বিদ্যমানতার জন্যই গগন সুনীল হইয়াছে, আপনি সহজে আমাদের কথা বিশ্বাস করেন কি না, সন্দেহ। অথচ প্রিয় পাঠক, দুই আর দুই চার, ইহা যেমন সত্য, তেমনি আপনার চরণবিক্ষুব্ধ ধূলিকণাই অনন্ত নভোমণ্ডলে উৎ-ক্ষিপ্ত হইয়া কোনও বি.শষ কারণে সুন্দর, অতিসুন্দর নীলাভা দ্বারা আকাশকে এরূপ কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছে। কেবল নীলাকাশ নহে, সান্ধ্য গগনের বিচিত্র বর্ণের অপূর্ব্ব শোভাও এই ধূলিকণার জন্য। কেবল তাহাই নহে। অন্ধকার গৃহে বায়ুকণা বিদ্যমান থাকে বলিয়া যেমন রশ্মিরেখা-পথ সমুজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ অনন্ত শূন্যদেশে অসংখ্য অসংখ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম ধূলি-কণিকা বিদ্যমান আছে বলিয়াই, সূর্য্যোদয় হইলে অনন্ত আকাশ আলোকিত পরিদৃষ্ট হয়। ধূলিকণা শূন্যপথে না থাকিলে, সূর্য্যোদয় হইলেও নিখিল গগন দীপ্ত দৃষ্ট হইত না। কেবল ইহাই নয়। আকাশে বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য রেণু অব-স্থান না করিলে মেঘ হইত না, বৃষ্টিধারা পতিত হইত না, শিলা, তুষার, হিমানী ও কুজ্ঝটিকা পরিগঠিত হইত না। সূর্য্যকরে মহাসাগর শুষ্ক হইয়া, অনন্ত আকা-শকে বাষ্প দ্বারা পূর্ণ করিলেও, রেণু অভাবে বৃষ্টি হইত না। পাঠক! ভাবুন, তাহা হইলে তৃণশস্যপূর্ণ ফল ফুলে সুশোভিত এই ধরার অবস্থা কি হইত? পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি সত্ত্বেও, ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য নদ নদী হ্রদ সাগর উপসাগর সত্ত্বেও, পরিশ্রমী কৃষক-হস্ত প্রাণপণে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিলেও, এই শস্য-শালিনী পৃথিবীর কি দুর্দ্দশা ঘটিত? শস্য অভাবে জীব জন্তু আমরা মানব পর্য্যন্ত আজ কোথায় থাকিতাম? হায়! তবে কি পদদলিত ধূলিকণার নিকট আমাদের ন্যায় এরূপ উচ্চ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানব পর্য্যন্ত উদরের অন্নের জন্য, এমন কি, আপনাদের অস্তিত্বের জন্য ঋণী? হাঁ, তাই ঠিক। ধূলিকণা বাস্ত-বিকই এত আবশ্যক পদার্থ। বিশাল সংসারে রেণু প্রকৃতই অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বিশেষতঃ এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ভৌতিক ঘটনা সম্বন্ধে রেণু এক অতি প্রয়োজনীয় কারণ। আমরা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে দেখাইব, এই সামান্য ধূলিকণা কিরূপে প্রকৃতি ভাণ্ডারে এত প্রয়োজনীয় গুরুতর কার্য্যের সাধন করিয়া থাকে।

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, যদি অন্ধকার গৃহে ক্ষুদ্র বাতায়ন-

আলোক-পথে যে সকল অবলম্বিত রেণু থাকিবে, তাহারা আলোকসংস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া আলোক-পথটি সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। ইহাতে যেমন এক দিকে বায়ুর সহিত ধূলিকণিকার সংমিশ্রণ বুঝা যাইতেছে, সেইরূপ অপর দিকে আর একটি বিষয়ের উপলব্ধি করা যায়। যদি গৃহে ধূলিকণা না থাকে, আলোক আসিলেও, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে না। পাঠক ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঘরের জানালাতে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, ঘরের অন্যান্য দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, যদি ঐ জানালাটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জানালার ছিদ্রপথ দিয়া গৃহমধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবে। অবশ্য জানালার ছিদ্র সূর্য্যের অভিমুখে হওয়া আবশ্যক। কিরণরেখা গৃহমধ্যে আসিতেছে কি না জানিবার জন্য আলোক-পথ অনুসরণ করিয়া যদি একখানা কাগজ কি বই কি অন্য কোনও একটা জিনিস ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের উপর আলোক দৃষ্ট হইবে, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া আলোকরেখা আসিতেছে, মধ্যবর্ত্তী বায়ুতে যদি ধূলিকণা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা দৃষ্ট হইবে না। মনে করুন, বায়ুতে ধূলি নাই; সুতরাং আলোকরেখাপথ দৃষ্ট হইতেছে না। এখন যদি কোনও প্রকারে খানিকটা ধূলা উড়ান যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সরল আলোকরেখা পথ প্রত্যক্ষ হইবে। ধূলিকণার বিদ্যমানতাতেই কিরূপে আলোকরেখাপথটি এমন উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টিগোচর হইল, আমরা তাহা এক্ষণে বিবেচনা করিব।

সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে (ঈথরের কথা ছাড়িয়া দিলে) কেবল বায়ুস্তরেরই ব্যবধান আছে, আর কিছু নাই। আলোক সকল প্রকার বাষ্পের অভ্যন্তর দিয়া অবাধে আসিতে পারে। অবাধে আসিতে পারে বলিয়াই বাষ্পের মধ্য দিয়া আলোক সরল ও ঋজু ভাবে বহির্গত হয়। সুতরাং প্রতিফলিত অর্থাৎ তির্য্যক্‌গতিবিশিষ্ট হয় না। এজন্য যখন নিরবচ্ছিন্ন বাষ্পস্তরের মধ্য দিয়া আলোকতরঙ্গ গমন করে, সে আলোক আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। কিন্তু প্রোক্ত অন্ধকার গৃহের ছিদ্রপথ দিয়া আলোক-রেখা আসিয়া ধূলিকণাসংস্পৃষ্ট হইলে যখন স্বীয় পথটিকে উজ্জ্বল করে, তখন আলোক-তরঙ্গ ধূলিকণা দ্বারা ব্যাহত হয়, অর্থাৎ ধূলিকণা আলোক-রেখাটিকে প্রতিফলিত করিয়া চারি দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়। সেই জন্যই আলোক-পথটি উজ্জ্বল হয়, আর আমরাও উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সেইরূপ, গগনে অসংখ্য ধূলিকণা আলোক-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করিয়া দিকদিগন্তে আলোককে পরিব্যাপ্ত করে।

করিত, সূর্য্যকিরণে আকাশ আলোকপূর্ণ ও উজ্জ্বল হইত না। দিবাভাগেই সূর্য্যালোকিত উজ্জ্বল আকাশের পরিবর্ত্তে ঘোর অমানিশার মসীবৎ আকাশ পরিলক্ষিত হইত। এই আঁধারময় ঘন কৃষ্ণবর্ণ আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র পাশাপাশি জ্বলন্ত পিণ্ডবৎ দেখা যাইত। ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমানের ন্যায় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধকর ও সমপরিব্যাপ্ত আলোকপূর্ণ না হইয়া অতি প্রখর আলোক ও ঘন অন্ধকারের দৃশ্যস্থল হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বায়ুরাশির মধ্যে অগণিত রেণু অবলম্বিত রহিয়াছে। আলোক-তরঙ্গ শূন্যপথ দিয়া আসিবার সময় ইহাদিগের দ্বারা প্রতিফলিত হয়। আলোক প্রতিফলিত হইয়া আকাশকে উজ্জ্বল করে, দিগন্তকে উজ্জ্বল করে, এবং আমাদের এই পৃথিবীও উজ্জ্বল ও সমভাবে পরিব্যাপ্ত কিরণে দীপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। আমাদের চক্ষুযন্ত্রও এইরূপ সমভাবে পরিব্যাপ্ত অতি প্রখর আলোক প্রত্যক্ষ করিবার উপযুক্ত। অপ্রতিফলিত প্রখর আলোক আমাদের দৃষ্টি সহিতে পারে না। আর বলা বাহুল্য, সূর্য্যালোক ধূলিকণা দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া নভোমণ্ডলকে সমভাবে উজ্জ্বল কিরণে পরিশোভিত করে বলিয়াই জগতের শোভা ; নীল পীত হরিত লোহিত ধূসর পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণের বিচিত্র বিকাশে ও সংমিশ্রণে প্রকৃতির মনোহারিণী সৌন্দর্য্যশ্রী।

কিন্তু আকাশ সুনীল হইল কেন? আকাশের এ সুনীলাভাও ধূলিকণারই জন্য। কিন্তু ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধার জন্য আলোকতত্ত্বের একটু আলোচনা আবশ্যক। আমরা জানি, সূর্য্যরশ্মি আপাততঃ শুভ্র প্রতীয়মান হইলেও আদৌ সাত প্রকার বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সংমিশ্রণফল। এই সাত প্রকার বর্ণের আলোকতরঙ্গ সমান আকারের নহে। লোহিত বর্ণের তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, আর নীল ও বেগুণের তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। আলোকতরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র আয়তনের। ইহারা ঈথর নামক এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ও জড়ধর্ম্মী পদার্থের মধ্য দিয়া অতি প্রবল বেগে (আলোকতরঙ্গ এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই সহস্র মাইল ধাবিত হয়) ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে। এই সাত প্রকার বর্ণের অসম আকারের আলোকতরঙ্গনিচয়ের মধ্যে কোনও একটা বস্তু যে বর্ণের আলোক তরঙ্গমালা প্রতিফলিত করিতে পারে, সেই বস্তু সেই বর্ণের দেখায়। কারণ, বাস্তবপক্ষে বর্ণ পদার্থগত ধর্ম্ম নহে। সূর্য্যরশ্মির সপ্তবিধ বর্ণালোকের মধ্যে যে বস্তু যে বর্ণের

দেখিতে লাল হইলেও প্রকৃতপক্ষে গোলাপের নিজের কোনও বর্ণ নাই। তবে গোলাপের এই বিশেষত্ব আছে যে, উহা সূর্য্যরশ্মির লোহিত বর্ণের আলোক-তরঙ্গকেই প্রতিফলিত করিতে পারে, এবং অন্য বর্ণের তরঙ্গকে প্রতিফলিত করিতে পারে না। এই জন্য এই ফল হয় যে, অন্য বর্ণের আলোকতরঙ্গগুলি গোলাপ আত্মসাৎ বা শোষণ করে, এবং কেবল লোহিত আলোকতরঙ্গগুলিই প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই গোলাপ লাল পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কেবল গোলাপ কেন, অন্য সকলবিধ পরিদৃশ্যমান পদার্থের বর্ণ সম্বন্ধেও ইহা সত্য। যে বস্তু যে কোনও বর্ণের তরঙ্গ প্রতিফলিত করিতে পারে, সেই বস্তু সেই বর্ণের হইবে। আলোক-বিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞান লইয়া আমরা এখন পুনর্ব্বার আমাদের ধূলিকণার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

আলোকতরঙ্গ সমস্ত গগনপথ দিয়া আসিবার সময় বায়ুস্তরাবলম্বিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণুকণিকা দ্বারা প্রতিফলিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রতি-ফলন শব্দের অর্থ এই যে, কতকগুলি তরঙ্গকে অবাধে যাইতে না দিয়া, ফিরা-ইয়া দেওয়া। তাহা হইলে ধূলিকণা কতকগুলি তরঙ্গকে, অর্থাৎ কোনও বিশেষ বর্ণের আলোকতরঙ্গকে বাধা দিয়া ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু এইরূপ প্রতিফলন করিবার কালে কেবল সেই বিশেষ ধর্ম্মের বর্ণেরই বিকাশ হইবে, এবং অন্য বর্ণের তিরোধান হইবে। সুতরাং ধূলিকণা সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করিয়া এক বিশেষ বর্ণের বিকাশ করে। সেই বিশেষ বর্ণ নীলবর্ণ, এবং সেই বর্ণই আকা-শের বর্ণ। রেণু, অতি সূক্ষ্ম রেণুও দেখিতে তাই নীলাভ। আকাশ নীলবর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পূর্ণ ও ধূলিকণা দ্বারা প্রতিফলিত নীলাভাযুক্ত হইয়া, ঈদৃশ সুন্দর স্নিগ্ধ নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, রেণুমাত্রেই সূর্য্যরশ্মির নীল আলোকতরঙ্গ প্রতিফলিত করে না। রেণুর মধ্যে যাহারা অতি সূক্ষ্ম, তাহারাই কেবল ইহা করিতে পারে। সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারে কেহ বা হরিৎ, পীত, এবং লোহিত বর্ণের আলোকতরঙ্গ পর্য্যন্ত প্রতিফলনে সক্ষম হয়। যাহারা অপেক্ষাকৃত স্থূল, তাহারা আলোক বিশ্লেষণ করিতে অক্ষম, অর্থাৎ কেবল শ্বেতরশ্মিই প্রতি-ফলিত করে। চুরুটের যে ধূঁয়া মুখ দিয়া বাহির করা যায়, তাহা শুভ্র দেখায়। কিন্তু উহার অপর প্রান্ত হইতে যে ধূম্র নিঃসৃত হয়, তাহা নীলাভ। ইহার কারণ এই যে, মুখ দিয়া যে ধূঁয়া বাহির হয়, তাহার সহিত স্থূল অণু মিশ্রিত

সহিত অতি সূক্ষ্ম অণু মিশ্রিত হইয়া থাকে বলিয়াই উহা সূক্ষ্ম রেণুর ধর্ম্ম প্রকাশ করে, অর্থাৎ নীলাভ প্রতীত হয়।

নগরে ও প্রশস্ত জনপদে অপেক্ষাকৃত স্থূল রেণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়াই সহরের আকাশ তত সুনীল দৃষ্ট হয় না। এমন কি, অনেক পরিমাণে শুভ্রই দৃষ্ট হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে কিম্বা পর্ব্বতের উপরে, যেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু ব্যতীত আর কিছুই বায়ুস্তরে মিশ্রিত থাকে না, সেখানকার আকাশ অতি সুন্দর নয়নানন্দদায়ী নীলবর্ণে মণ্ডিত। ক্রমে যত উচ্চদেশে উত্থান করা যায়, ততই সূক্ষ্ম রেণুর অভাব হয়; এই জন্য আকাশ নীল না হইয়া কৃষ্ণবর্ণের দেখায়। বেলুনারোহীগণ সমধিক উচ্চে উঠিলে আমাদের এই সুনীল আকাশের পরিবর্ত্তে তাই কাল আকাশ দেখিতে পান! শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশের আকাশ অপেক্ষাকৃত ঘনতর নীলবর্ণের। ইহার কারণ এই যে, শীতপ্রধান দেশে রেণুকণিকা সকল শীঘ্রই বাষ্পকণা দ্বারা আচ্ছাদিত ও আর্দ্র হইয়া একটু স্থূলায়তন হয়; সুতরাং আর নীল-রশ্মি প্রতিফলিত করিতে পারে না। কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে রেণুকণিকা অনেক দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়, আর বাষ্পকণিকা শীঘ্র জলরূপে পরিণত হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম রেণু সূক্ষ্মই থাকে, বাষ্পভারে গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া নীল-রশ্মিপ্রতিফলনের শক্তি বিবর্জ্জিত হয় না। এই জন্যই উষ্ণপ্রধান দেশের আকাশ গাঢ়তর নীলবর্ণ সমন্বিত। সান্ধ্য-গগনের বৈচিত্র্যও এই রেণু বা রেণুসংমিশ্রিত মেঘের প্রতিফলনক্রিয়ার ক্রিয়াফল।

এক্ষণে আমরা দেখিব, মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, কুজ্ঝটিকা, হিমানী ও তুষারের সংগঠনে ধূলিকণা কিরূপে সহায়তা করে। আমরা সচরাচর মনে করি, বাষ্প দেখিতে মেঘের মত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; বাষ্পের কোনও রূপ বর্ণ ও আকার নাই, ইহা অদৃশ্য পদার্থ। কিন্তু ধূলিকণাসংস্পর্শে ঘনীভূত ও সম্বদ্ধ হইয়াই বাষ্প মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পরীক্ষা দ্বারা ইহার যাথার্থ্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। একটি কাচ-স্থালীকে প্রথমে বায়ুশূন্য করিয়া পরে উহার মুখে তুলা দিয়া যদি বায়ু পুনঃপ্রবিষ্ট করান যায়, তাহা হইলে, স্থালীতে এখন যে বায়ু প্রবেশ করিল, তাহা রেণুশূন্য। তুলা ছাঁকনির মত বায়ু হইতে কঠিন পদার্থাণু সকল ধরিয়া রাখিয়া কেবল বায়বীয় অণুকে স্থালীমধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছে। যদি এই স্থালীপ্রবিষ্ট বায়ু সম্পূর্ণরূপে ধূলিকণিকাবিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে যদি উহার মধ্যে এক্ষণে খানিকটা বাষ্প (যেমন চা গরমের পাত্র হইতে) প্রবেশ করান যায়, সে বাষ্প চক্ষুর গোচর হইবে না। খানিক

পরে কেবল এই দেখা যাইবে যে, স্থালীর আভ্যন্তরীণ গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু সংগঠিত হইয়াছে। বাষ্প শীতল হইয়াই স্থালীর গাত্রে বিন্দু বিন্দু জলরূপে বাষ্প জমাট বাঁধিয়াছে। কিন্তু স্থালীর মধ্যদেশে কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। এক্ষণে যদি খানিক পরিমাণে ধূলিপূর্ণ বায়ু অথবা এই সাধারণ বায়ু প্রবেশ করান যায়, তৎক্ষণাৎ মেঘের ন্যায় ধূমবৎ পদার্থ স্থালীমধ্যে লক্ষিত হইবে। ইহার কারণ এই যে, স্থূল ধূলিকণাদিগকে আশ্রয়স্বরূপ পাইয়া, শূন্যাবলম্বিত বাষ্পকণা সকল উহাদের চতুঃপার্শ্বে সংলগ্ন ও সম্বদ্ধ হইয়া মেঘের মত ধূমের সৃষ্টি করে। শীঘ্রই দেখা যাইবে যে, ধূমবৎ পদার্থ ক্রমে বৃষ্টিধারার ন্যায় স্থালীমধ্যে পতিত হইতেছে। এই কাচস্থালীমধ্যে যাহা ঘটিল, আকাশেও তাহাই ঘটে। সমুদ্র হ্রদ নদ নদী তড়াগ হইতে জল বাষ্প হইয়া উত্থিত হয়। শূন্যে অদৃশ্য বাষ্পকণা ধূলিকণার আশ্রয়ে ঘনীভূত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে। মেঘস্থ ঘনীভূত ও সুসম্বদ্ধ বাষ্পকণা অধিক শীতল হইলে বৃষ্টিধারার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ধূলিকণার সহায়তা ব্যতিরেকে একটি বাষ্পকণাও কখনও আপনাপনি জল হইয়া পড়িতে পারে না। কেবল বৃষ্টি নহে। শিলা, তুষার ও কুজ্ঝটিকা ধূলিকণা ব্যতিরেকে কখনই সংগঠিত হইতে পারে না। বৃষ্টি না হইলে পৃথিবীতে শস্য জন্মিতে পারে না। শস্য না হইলে জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব। অতএব পাঠক দেখুন, ধূলিকণা, এই সামান্য পদদলিত ধূলিকণার নিকট আমরা কত ঋণী!

কিন্তু কেবল প্রাণধারণ নহে। আরও কত প্রকার অসুবিধা হইতে আমরা পরিত্রাণ পাই। আমরা দেখিলাম, বাষ্প ঘনীভূত ও জমাট বাঁধিবার জন্য কোনও প্রকারের একটা স্থূল আশ্রয় আবশ্যক করে, যেমন বায়ুরাশির মধ্যগত ধূলিকণিকা। ধূলিকণিকার অভাবে অন্য কোনও কঠিন পদার্থ, যেমন আমাদের পরীক্ষার কাচস্থালীর গাত্র। একটা স্থূল আশ্রয় ব্যতীত বাষ্প জমাট বাঁধিয়া বৃষ্টি, কুজ্ঝটিকা, শিলা বা হিমানী, কোনও প্রকার রূপান্তর ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি এইরূপ হইত যে, আমাদের এই নভোমণ্ডল, এই বায়ুস্তূপ ধূলি বা রেণুশূন্য হইত, অথচ সূর্য্য স্বকীয় কিরণ দ্বারা জলধি ও জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থাপিত করিত, তাহা হইলে কি হইত? সে বিড়ম্বনার চিত্র মনে করিতেও মনে আশঙ্কার উদয় হয়। বর্ষার সময় দোহারা কাপড়ের খুব বড় ছাতি মাথায় দিয়া পথে গেলেও, ছত্র দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র বা শরীরকে

বাষ্প-অণু ছাতি, বস্ত্র ও গাত্রে স্থূল আশ্রয় পাইয়া জমাট বাঁধিত। সুতরাং সুবৃহৎ ছত্র ব্যবহার করিলেও, সর্ব্বাঙ্গ ও সমুদয় পরিচ্ছদ জলধারায় সিক্ত হইত। গৃহদ্বার ও বাতায়ন মুক্ত থাকিলে, অসম্বদ্ধ বাষ্প-অণু সকল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যা, বস্ত্র, পুস্তক, টেবিল, চেয়ার, গৃহভিত্তি, ছাদ—সমুদয় স্থূল পদার্থ বাষ্পকণার জমাট বাঁধিবার আশ্রয় হইয়া জলে পূর্ণ হইয়া যাইত। শীতকালেও কুজ্ঝটিকা, তুষার গৃহমধ্যে সংগঠিত হইয়া গৃহের আসবাবপত্র সাজসজ্জাকে জলময় করিত। গাত্রের শীতবস্ত্র ভিজিয়া যাইত। গৃহমধ্যে থাকিয়াও বর্ষার জলের অত্যাচার হইতে নিস্তার থাকিত না, শীতবস্ত্রে আপাদমস্তক সমাচ্ছাদিত হইয়াও শীতের প্রাখর্য্য অনুভব করিতে হইত। এ বিষম অসুবিধার মধ্যে জীবনযাপন কতই না বিড়ম্বনাময় ও ক্লেশকর। প্রিয় পাঠক! তাই এখন ভাবুন, এই ধূলিকণা আমাদের কত উপকারী বন্ধু,—বাস্তবিক ধূলিকণার নিকট আমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে সকল সুকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে একটা জাতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সকলেরই জীবন অতি দুর্ব্বহ বিষাদভারে আক্রান্ত, নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত। ইহা কেবল ইংরাজী সাহিত্যের কথা নহে। ইংলণ্ডে বারন্‌স, শেলী, কিট্‌স্, বায়রণ; ফ্রান্সে চিনিয়র, মুসেট; জার্ম্মাণীতে হায়েন; ইতালীতে লিওপার্দি; আমেরিকায় এড্‌গার পো; ইহাঁদের সকলেরই সম্বন্ধে কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অমর উক্তিটি প্রযুক্ত হইতে পারে,—

প্রতিভার পীড়া।

"We poets in our youth begin in gladness,
But thereof come in the end despondency and madness."

বিগত এপ্রিল মাসের 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে চার্লস্ জনষ্টন সাহেব দুই জন রুসীয় কবির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের ন্যায় ইহাঁদেরও কবিজীবনের পরিণাম—অসংযম, আত্মপীড়া, মনস্তাপ, অপমৃত্যু বা অকালমৃত্যু। আমরা সাহেবের প্রবন্ধ হইতে কল্‌টসফ্ ও লারমন্‌টফ্ নামক সেই দুই জন দুর্ভাগ্য কবির জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

রুসীয় কবি।

আলেক্সি কল্‌টসফ্।

(খৃঃ ১৮০৮—১৮৪২)

স্কচ কবি বারন্‌সের ন্যায় কলট্‌সফ্‌ও একজন কৃষকের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বীয় সম্প্রদায়-

মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ লেখাপড়া জানিতেন না। উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতাও তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিনি মনে করিতেন, ব্যবসায়ের হিসাবপত্র রাখিবার নিমিত্ত যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, তাহাই যথেষ্ট। এই জন্য দশ বর্ষ বয়সে, আঠারো মাস মাত্র বিদ্যালয়ে কাটাইয়া, আলেক্সিকে তাঁহার পিতৃব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে হয়। তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন, কারণ ইতিমধ্যেই তাঁহার শৈশবহৃদয়ে বিদ্যানুরাগ প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সরস্বতীর চরণতলস্থ শতদলের সৌরভ যে একবার আঘ্রাণ করিয়াছে, সে ত কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। আর যাহার প্রাণে প্রতিভার স্বর্গীয় শিখা নিহিত রহিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। কল্‌টসফ্ সুবিধা ও অবসর পাইলেই পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। সে সুবিধাও সর্ব্বদা ঘটিত না; পিতৃনিদেশে তাঁহাকে প্রায়শঃ সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতে হইত। ইহার উপর আবার পুস্তক ও সুপরিচালকের অভাব। সুতরাং জীবনে তাঁহার রীতিমত শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

কল্‌টসফের বিদ্যাশিক্ষা।

এই সময়ে কল্‌টসফের পিতৃবন্ধু এক বণিকের পুত্রের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। বণিক কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ভূত প্রেতের কাহিনী ও আষাঢ়ে গল্পে পরিপূর্ণ। সুতরাং উহাতে কল্‌টসফের বুদ্ধিবৃত্তির তাদৃশ অনুশীল[illegible] সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি যাহা পাইলেন, তাহাতে তাঁহার কবি-হৃদয় [illegible] হইয়া উঠিল। তিনি মহান ও সুন্দরের উপাসনায় দীক্ষিত হইলেন।

কবি-হৃদয়ের শিক্ষা।

কল্‌টসফ্ চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি একটি ছত্রও ছন্দে গ্রথিত করেন নাই; কোনও কবিতা-গ্রন্থ পড়েন নাই। এক দিবস তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে বাজারে গিয়া, দৈবক্রমে রুসীয় কবি মিত্রিয়েফের গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। মিত্রিয়েফের মধুর গীতি পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজে কবিতা-রচনায় মন দিলেন। প্রথম প্রথম তিনি অতি আয়াসে, অনেক পরিশ্রমের পর, তবে দুই একটি কবিতা লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মনোনীত হইলেও, উহাদের গঠনপ্রণালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কবিতা সূক্ষ্মশিল্পের অন্তর্গত। ইহাতে অনায়াসে ক্ষিপ্রতা লাভ করিতে হইলে বহুল সাধনার প্রয়োজন। মালা গাঁথিবারও নিয়ম আছে; তিনি তখনও সে নিয়ম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সংসার-সমরে তাঁহার তেমন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। তাঁহার হৃদয় তখনও কোনও প্রকার গভীর সুখদুঃখে তরঙ্গিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনে কাব্যোপযোগী বিষয়েরও অভাব। এই অবস্থায় কল্‌টসফ্, সেরিব্রিক্সি নামক একজন কৃতবিদ্য বন্ধু লাভ করিয়া, তাঁহার সাহায্য ও উপদেশে, আপনার বাঞ্ছিত পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন।

রচনার আরম্ভ।

কল্‌টসফ্ সুকোমলশুভ্রশয্যাশায়ী 'কমলবিলাসী' ছিলেন না। তাঁহাকে অষ্টপ্রহর অনেক অকবিজনোচিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। জন্মস্থান বেরোনেজের সন্নিহিত শস্যশ্যামল প্রান্তরে তিনি পশুপাল চরাইয়া বেড়াইতেন। এইরূপে উহাদিগকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া, বিক্রয়ার্থ বাজারের অভিমুখে ছুটিতেন। পিতৃপরায়ণ যুবক পিতার আজ্ঞাপালনে কখনও অবহেলা করিতেন না। প্রকৃতির যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শোভা তাঁহার কবিতাসমূহে প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহা[illegible]

কল্‌টসফ্ সাংসারিক কবি।

সকলেই জানেন। ডফরিণ জননী তবে বংশানুক্রমে কবিত্বের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা মধুর। তাঁহার "Irish Emigrant" পাঠ করিয়া কত হতভাগ্য আইরিস্ অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহা এই :—

আজিও সেখানে আমি বসি', প্রিয়তমে!
যেখানে বসিয়াছিনু আমরা দুজন,
সুদূর অতীতে সেই বসন্ত প্রভাতে,
প্রথম করিনু যবে আত্মসমর্পণ।
হরিৎ সুন্দর শস্যে কে এসেছে ভরি'
চাতক মধুরস্বরে গাহি'ছে উপরে,
পক্কবিম্বসম ছিল ওষ্ঠাধর তব
প্রেমের আলোক তব দুনয়ন ভরে'!

লর্ড ডফরিণ তাঁহার জননীর কথায় বলিয়াছেন—তাঁহার আকারে লাবণ্য এবং দৃষ্টি-আকর্ষক মাধুরীর অভাব ছিল না। তাঁহার আকৃতি স্বর্গীয়, তাহা সৌন্দর্য্যের সমস্ফুরণ এবং লালিত্যের পূর্ণতম আদর্শ ছিল। তাঁহার হস্ত পদ ক্ষুদ্র ছিল—লর্ডের মনে আছে, অনেক ভাস্কর সেই হস্তের আদর্শ লইবার আদেশ চাহিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠস্বর নির্ম্মল এবং মধুর ছিল। তিনি সুন্দর গাহিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত অনেক গীতের সুর তাঁহার নিজ কৃত। গীতে তাঁহার ক্ষমতা আবার এমন ছিল যে, রজনীতে যদি তিনি কোনও গীতিনাট্যাভিনয় শুনিতে যাইতেন, তবে প্রভাতে তাহার সমস্ত প্রধান প্রধান গীতগুলি ঠিক সুরে গাহিতে পারিতেন। তিনি কখনও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, তথাপি চেহারা এবং দৃশ্য, দুইই আঁকিতে পারিতেন।

শারীরিক।

লেডী সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হয়েন। তখন সৌন্দর্য্য ও বিদ্যার জন্য ইংলণ্ডের ধনীসমাজে তাঁহার প্রভাব সাধারণ নহে। অনেক বড় বড় লর্ড তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু পাছে বিবাহ করিলে সন্তানের শ্রদ্ধার হ্রাস হয়, সেই ভয়ে তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন না। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। লর্ড গিফোর্ড তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইলেন, কিন্তু লেডী ডফরিণ বলিলেন যে, লর্ডের আশা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। চিরজীবন দারুণ হতাশা বহিয়া লর্ড গিফোর্ড মৃত্যুশয্যায় উপনীত হইলেন। ফল্গুর স্রোতের ন্যায় যে বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বহিতেছিল, তাহা প্রবল হইয়া উঠিল। যখন মরণের তীরে দাঁড়াইয়া, তাহার সেই জলরাশির স্পর্শ অনুভব করা যায়, তখন হৃদয়ের প্রিয়তম আশাকে আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখিতে ইচ্ছা হয় না। লর্ড গিফোর্ড মৃত্যুশয্যায় সে কথা বলিলেন। তখন আর 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' ভাল নহে বুঝিয়া লেডী তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তাহার কয় দিবস পরেই লর্ডের মৃত্যু হইল।

সন্তানের প্রতি স্নেহ।

অতিরিক্ত লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে যাহা করে, লর্ড ডফরিণ তাহা করেন নাই। তিনি তদীয় জননীর সন্তানের প্রতি লিখিত কয়টি কবিতাও পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার একটি এইরূপ :—

তোমারি সে ক্রীড়াময় দৃষ্টি সুমধুর,—
সেই কেশরাশি! সেই মৃদুহাস ভায়!
পবিত্র নদীর মত ভ্রূযুগ তব,
কত মধুময় চিন্তা লিখিত তাহায়!
সেই পূর্ণ অর্দ্ধোত্থিত নয়ন পল্লব,
স্বপন আবেশে ভরা সুনীল নয়ন,
বিশ্বাসে, প্রেমেতে ভরা দৃষ্টিতে যাহার
ভয় বা মিথ্যার ছায়া হয় নি পতন।
স্বরগের বারি ভরা সরসী যেমন
স্বরগের ছায়া ধরে হৃদয়ে আপন।

সেই সন্তান যে জননীর বিশেষ প্রশংসা করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু লর্ড ডফরিণ বলিয়াছেন যে, সন্তান বলিয়া তিনি জননীর এত প্রশংসা করেন নাই; তিনি জগতে

হাইন ও তাঁহার ভগিনী।

কোনও লোকের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে হইলে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং যাঁহাদিগের নিকট তিনি নিতান্ত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই সেই সকল কথা বলিবার যোগ্যতম পাত্র। সন্তানের জীবনের প্রত্যেক সামান্য ঘটনা জননীর মত আর কেহই স্মরণে মুদ্রিত করিয়া রাখেন না, কিন্তু সাধারণতঃ এই হইয়া থাকে যে, যখন কোনও প্রসিদ্ধ লোকের জীবনচরিত রচিত হয়, তখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণও অনেকে কালের তরঙ্গাঘাতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন, এবং সেই মধ্যাহ্নতাপ-দগ্ধ সংসারে চিরপ্রবাহিত স্নেহপ্রস্রবণ জননী তখন সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যক্ষেত্রে কার্য্যাবসানে চিরশান্তির ক্রোড়ে সংসারের শোক, তাপ, সুখ সকলের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছেন। তখন সেই ভস্মে পরিণত হস্তের স্পর্শ ও সেই চিরনীরব মধুময় কণ্ঠস্বরের জন্য হৃদয় বৃথা ব্যাকুল হইয়া উঠে! জননীর পরেই ভ্রাতা ও ভগিনী, তাঁহারাও ভ্রাতার জীবনে অন্যের অলক্ষিত অনেক ঘটনা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

জননী ও ভগিনী।

হাইনের মধুময় কবিতার যাঁহারা আদর করেন, তাঁহারা তৎসূত্রে তাঁহার ভগিনী "লচেন"কে অবশ্যই জানেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ফ্‌. এম্‌ডেন্‌। তাঁহার বয়স নবতি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ডাক্তার এডল্‌ফ কোহাট্‌ তাঁহাকে দেখিতে হামবার্গে গিয়াছিলেন। এখন তিনি সেই বৃদ্ধার একটি বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

ডাক্তার কোহাট্‌ বলেন যে, সেই ক্ষীণ, কার্য্যতৎপর, জ্যোতির্ম্ময় নয়ন, মৃদুভাষিণী রমণীকে দেখিলে, প্রথমে দর্শকের বোধই হয় না যে, তিনি নবতি বৎসরের বৃদ্ধা। প্রথমে তিনিও কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাহার পর যখন তিনি কোমল ও কাতর স্বরে ভ্রাতার কথা বলিতে লাগিলেন, এবং অনেক লেখক হাইনের সম্বন্ধে যে সকল অন্যায় অদ্ভুত অসম্ভব কথা বলিয়া থাকেন, তীব্র রোষবৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি সেই দূর অতীতের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন বটে। এখনও কালের তরঙ্গমালা দেহতট হইতে হাইনের সেই সঙ্গীতে প্রসঙ্গীকৃত সৌন্দর্য্য ও ব্যবহারের রেখা মুছিয়া লইতে পারে নাই।

এমডেন।

হাইন অপেক্ষা লচেন এক বৎসরের কনিষ্ঠা—কাজেই উভয়ে একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। শৈশবের ক্ষুদ্র সুখ ও দুঃখ, সংসারের আপদ, বিপদ সম্পদ, সুখের শুভ্রহাস্য, দুঃখের কাতর অশ্রুজল উভয়ে একত্র ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার ভগিনী প্রথম তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে লচেনের শিক্ষক একটি গল্প বলিয়া, সকল ছাত্রকে তাহা গৃহ হইতে লিখিয়া আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। লচেন তাহাতে অসমর্থ হইয়া ব্যাকুলভাবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে হাইন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সকল শুনিয়া বলিলেন যে, গল্পাংশভাগ শুনিলে তিনি একটি গল্প লিখিয়া দিতে পারেন। লচেন গল্প বলিলে প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে হাইন গল্প লিখিয়া আনিলেন। লচেন আপনার রচনা বলিয়া সেটি শিক্ষককে দিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ পাইল। শিক্ষক গল্পটির বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার-জননীর নিকট হাইনের প্রশংসা করেন।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

হাইন তাঁহার ভগিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার কবিতায় তিনি উভয়ের শৈশবের কথা গাহিয়াছেন; সে গীতি কি মধুর! তাহার পর তাঁহার কবিতায় তিনি ভগি-

শৈশবের সেই বিমল স্নেহ কখন পঙ্কিল হয় নাই। জগতের কর্ত্তব্যস্রোত উভয়কে শতমুখে আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু সে স্নেহসূত্র কখনও ছিন্ন হয় নাই। হাইন আপনিও বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ ভ্রাতারা ভগিনীকে যেরূপ ভালবাসে, তিনি ভগিনীকে তাহা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ভালবাসা।

এমডেন তখন কোহাটকে হাইনের পত্রগুলি দেখাইয়াছিলেন। সেই একশত বাইশখানি পত্র আজও তাঁহার নিকট আছে। সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠ্যাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত ঐ পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল। হাইনকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হ্যামবার্গের গৃহদাহে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তবে উত্তরগুলি দেখিয়া সেগুলি কি ছিল, তাহা বুঝা যায়। হাইন লিখিয়াছেন, "আমরা পরস্পরকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ। আমরা দুইজনই কেবল বুদ্ধিমান, আর সবাই পাগল।" তাঁহার অনেক কবিতা এবং অন্য রচনা তিনি প্রকাশের পূর্ব্বে মতামতের জন্য ভগিনীর নিকট প্রেরণ করিতেন।

পত্র-ব্যবহার।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে "Reisebilder" প্রকাশের পর লচেন একবার দেশভ্রমণার্থ বাহির হন। জর্ম্মেণীর সর্ব্বত্র ভ্রাতার প্রশংসা শ্রবণ করেন, এবং হাইনের ভগিনী বলিয়া রথচাইল্ড পরিবারের নিকট পরিচিত হয়েন।

মাথাপাগলা ভ্রাতার জন্য ভগিনীকে সময় সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হইত। তিনি একবার তাঁহার গৃহে ভ্রাতার সম্মানার্থ একটি ভোজ দিয়াছিলেন। কবির দর্শনপ্রার্থী অনেক বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হইয়াছিল—সকলেই কবির দর্শনপ্রার্থী। হাইন সে দিন ভালরূপ ব্যবহার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি নীরবে গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং ভগিনীর একটি শিশু কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সহিত নানারূপ গল্প করিতে লাগিলেন। তাহার পর লচেন যখন সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, তখন কবি অদৃশ্য হইলেন। পরদিবস ভগিনী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে তিনি বলিলেন, "তোমার উচিত ছিল, আমার গলায় শিকল দিয়া লোক-সমক্ষে আমাকে হাজির করা এবং লোককে বলা যে এই হেন্‌রিচ হাইন—কবিতালেখা ছাড়া এ আর কিছুই করিতে পারে না।"

প্রতিভার পাগ্‌লামী।

হ্যাম্‌বার্গের সহর-দাহের দিবস লচেন ভ্রাতার রচনাগুলি উদ্ধার করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। সেগুলি তাঁহার মাতৃগৃহে রক্ষিত ছিল। লচেন সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সেগুলি লইয়া বাহিরে আসিলেন—তখন কতকগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ভস্মে তাঁহার চক্ষু পূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি তিনি যাইতে লাগিলেন—কিন্তু পরে ঐগুলি হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং তিনিও অজ্ঞান হইয়া পড়েন—একজন বন্ধু তাঁহাকে উদ্ধার করেন। হাইন আমরণ সর্ব্বদা এই কথা বলিতেন।

রচনা-উদ্ধার।

হাইন ভগিনীকে তাঁহার বিবাহের সংবাদ দিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের দম্পতিকলহ হইত। সেই মৃত্যুশয্যা হইতে তিনি ভগিনীকে পত্র লিখিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার ভগিনীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লচেন সেই বৎসর শরৎকালে প্যারিসে গমন করেন। গৃহদ্বারে কবির পত্নী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, এবং ভগিনী তখনই ভ্রাতার শয্যা-পার্শ্বে উপনীত হইলেন। ভ্রাতা ভগিনীর সেই সাক্ষাতে উভয়ের হৃদয়ে যে আনন্দ উচ্ছলিত হইয়াছিল, তাহা কি ভাষায় ব্যক্ত হয়! তিনি সর্ব্বদা ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন, এবং

শেষ সাক্ষাৎ।

বর্ষশেষে পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া লচেন হ্যাম্‌বার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উভয়ের বিচ্ছেদদৃশ্য বড় অশ্রুজলসিক্ত। লচেন আবার ফিরিয়া আসিবেন প্রতিজ্ঞা করেন—কিন্তু আর সাক্ষাৎ হইল না। পর বৎসর জুলাই মাসে হাইনের মৃত্যু হয়।

হাইনের সম্মানার্থ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। ডুসেলডরফের কর্ত্তৃপক্ষগণ হাইনের জন্মস্থানে উহা স্থাপন করিতে অনুমতি দিবেন না,—এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরে দেখা গেল, অনেক লেখকেরও ঐ মত। এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, মেন্‌জেই উহা সংস্থাপিত হইবে।

যাঁহার মধুর গীতমালা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, সর্ব্বদেশে মানবগণের মন মোহিত করিতেছে, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন মানব-হৃদয়ে অক্ষয়। তবে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের জন্য বাহ্য কিছু হয় ত আবশ্যক। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে সকল শোক দুঃখ কৃতজ্ঞতা বাষ্পবিসর্জ্জনেই ধৌত হইয়া যায়। রিপনের স্মৃতিচিহ্ন, রাজেন্দ্রলালের স্মৃতিচিহ্ন, বিদ্যাসাগরের স্মৃতিচিহ্ন এখন অতীতের অসম্পূর্ণ ইতিহাসের মধ্যে পড়িয়াছে—সে আশা ত নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নের কি হইল?

জীবনচরিত।

কেমিলি ফ্লেমেরিয়ন।

জ্যোতিষ।

জ্যোতিষ হিন্দুর বড় প্রিয় বিদ্যা। গগনে গতিশীল গ্রহগণের গমনাগমন হইতে নাকি অনেক ঘটনা সূচিত হইয়া থাকে। সুশিক্ষিতেরা সময়ে সেই সকল দেখিতে পাইলে ভবিষ্যৎও নাকি তাঁহাদিগের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। অন্ধকার ঘটনাচক্র স্নিগ্ধ আলোক বিস্তার করিতে থাকে। কিন্তু গণনাতীত কালের কুজ্ঝটিকায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সেই সকল অমর কীর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। কোথায় সে জ্ঞানপিপাসু প্রাচীন হিন্দু, আর কোথায় সে সকল সমোৎকর্ষপ্রাপ্ত বিদ্যালোচনা! উৎসাহ, আলোচনা এখন সাগরপারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

মে মাসের "ম্যাক্‌লুরস্ ম্যাগাজিন" পত্রে মিষ্টার সারার্ড জ্যোতিষী ফ্লেমেরিয়নের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই বিবরণ হইতে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত করিলাম।

বেলুনবাজ।

জ্যোতিষী কেবল জ্যোতিষ লইয়াই থাকেন না। আকাশের সহিত তাঁহার আরও সম্বন্ধ আছে। তিনি বেলুনারোহণে পারদর্শী। তিনি দ্বাদশবার পৃথিবীর পাপপঙ্কিল ভূমি ত্যাগ করিয়া অনন্তবিস্তৃত নীল নভোমণ্ডলে বিহগবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিস হইতে বেজলোনে গিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহের আট দিবস পরে তিনি পত্নীসহ একবার বেলুনে উঠিয়াছিলেন। এরূপ ভ্রমণ নূতন বটে। তিনি বলেন, জ্যোতিষী এবং তদীয় পত্নীর পক্ষে, পক্ষীর মত আকাশভ্রমণ অপেক্ষা স্বাভাবিক আর কি আছে?

তিনি এই বিদ্যালোচনায় বিশেষ মনোযোগী। তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় দশ সহস্র পুস্তক আছে। তিনি সে সকল পাঠ করেন। তিনি চিরদিন জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায় ইচ্ছুক। পঁচিশ বৎসরেরও অধিক হইল, তিনি জ্যোতিষচর্চ্চা আরম্ভ করিয়ছেন। এত দিন আলোচনার ফলে তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, জগতে মানবের বোধাতীত বা জ্ঞানাতীত আরও অনেক প্রাকৃতিক শক্তি বিদ্যমান। কথাটা সাধারণ রকমে বড়

নূতন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার "Lumen" নামক পুস্তকে এই সকল আলোচনা আছে।

শ্রীমতী ফ্লেমেরিয়ন তাঁহার কার্য্যের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন ঃ—

তিনি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং নিয়মপ্রিয়। প্রভাতে আটটা বাজিতে পনের মিনিটের সময় তিনি প্রভাতি আহার গ্রহণ করেন। আটটা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপনার নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন। দ্বিপ্রহরের সময় ধীরে ধীরে আহার আরম্ভ করেন। একটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে। প্যারিসের সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ ভিন্ন আরও বহুলোক তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী; কারণ, জনারণ্য প্যারিসে তাঁহার পরিচিতের সংখ্যা খুব অধিক। জ্যোতিষবিষয়ক প্রশ্ন লইয়া জগতের নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র পত্র আসে। দুইটা হইতে সেই সকলের জবাব দেওয়া হয়, তিনি বলিয়া যান, আর তাঁহার পত্নী লিখিয়া যান। তিনটা বাজিলে তিনি বাহিরে যান। তিনি একখানি পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক, তাহার ও অন্য অনেক সভাসমিতির কার্য্য করিয়া, সাড়ে সাতটার সময় ফিরিয়া আসেন। তখন আহার করেন। আহারান্তে পাঠ করেন; তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নশীল। রাত্রি দশটার সময় তিনি শয়ন করেন। তিনি কেবল জ্যোতিষ লইয়া থাকেন না। সকল আবশ্যক বিষয়েরই আলোচনা করিয়া থাকেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, কিছুই অবহেলা করেন না। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন তাঁহার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ। গ্রীষ্মকালে তিনি তারকারাজ্য লইয়া ব্যাপৃত থাকেন।

দৈনিক কার্য্য।

মে হইতে নভেম্বর, এই সাত মাস তিনি তারকাজগৎ লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। তখন তিনি জুভিসে গমন করেন। সেখানে কার্য্যপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র, কারণ আকাশ মেঘশূন্য থাকিলে হয় ত কখনও কখনও ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কবিন্দুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। তবে সর্ব্বত্রই তিনি নিয়মপ্রিয়।

জ্যোতিষী ধূমপান করেন না। ধূমোদ্গারী চুরুট মুখে থাকিলে তারকা লক্ষ্য করিবার অসুবিধা হয়। তাহা ভিন্ন সময়ও অনেকটা নষ্ট হয়। তিনি কুক্কুর খুব ভালবাসেন, কিন্তু কুক্কুর দেখিলে বড় ভীত হয়েন। তাঁহার বোধ হয় যে, কোনও পূর্ব্ব জন্মে কখনও তাঁহাকে উন্মাদ কুক্কুরের দংশনযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবজন্তু, বিশেষতঃ কুক্কুর ভালবাসেন। প্রকৃতির সকল দ্রব্যই তাঁহার বড় ভাল লাগে, বসন্তে যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উছলিয়া উঠে, তখন মুক্ত বাতায়নপথে তরুগুলির নবমুকুল দেখিতে তাঁহার বড় আনন্দ হয়। জ্যোতিষী তবে প্রকৃতিপ্রিয়!

সমাজনীতি।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার গার্হস্থ্য-জীবন।

নব্য সভ্যতার রঙ্গভূমি আমেরিকায় ও য়ুরোপের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবভূমি ইংলণ্ডে, অনেক বিষয়েই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আমেরিকা উচ্ছৃঙ্খল বিস্ময়ের দেশ, ইংলণ্ড প্রাচীনকাল হইতে সংযত কর্ম্মের দেশ। আমেরিকা কেবল অদ্ভুত ভালবাসে—অদ্ভুত ইংলণ্ডের চখের বিষ।

মে মাসের "ফোরম" পত্রে মিষ্টার প্রাইস কোলিয়ার ইংরাজের ও আমেরিকের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক একজন আমেরিক। প্রবন্ধের উপসংহারভাগ এইরূপ ঃ—

বস্তু পুরুষের সুখোপযোগী; এবং আমেরিকায় গৃহের বন্দোবস্ত স্ত্রীলোকের সুখোপযোগী; ইংলণ্ডে পুরুষ অধিক স্বার্থপর, তাই সেখানে গার্হস্থ্য সুখও অধিক। আমেরিক অপেক্ষা ইংরাজ আপনার গৃহে অধিক সুখী; তাই ইংরাজ অপেক্ষাকৃত অধিক বেলা হইলে গৃহত্যাগ করে, এবং অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল প্রত্যাগমন করে। একজন সর্ব্বদা গৃহে যাইতে উৎসুক, অন্য সর্ব্বদা গৃহের বাহিরে কার্য্যে যাইতে ইচ্ছুক। ইংরাজ গৃহে গিয়া গার্হস্থ্য-সুখভোগের প্রয়াসী—আমেরিক কর্ম্মের ফেনিল জলস্রোতের মধ্যে আপনার সকল বাসনা কামনা নিমজ্জিত করিবার অভিলাষী।

ইংরাজ ও আমেরিক।

আমেরিকার পুরুষ বা রমণীগণ ইংলণ্ডে আসিয়াই মনে করে যে, ইংরাজের প্রাণপ্রিয় পবিত্র জন্মভূমি পুরুষের দেশ। আর ইংলণ্ডের পুরুষ বা রমণী আমেরিকায় যাইয়াই মনে করে যে, সাম্য ও স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খল স্রোতোবিধৌত আমেরিকা রমণীর দেশ। বোধ হয়, সেই জন্যই আমেরিকায় স্বামীরা ভাল, আর ইংলণ্ডে স্ত্রীরা ভাল। তবে মোটের উপর ইংলণ্ডের গার্হস্থ্য জীবনে সুখ অধিক।

স্বামী স্ত্রী।

যে সকল দেশে প্রতিযোগিতা প্রবল—অর্থ যেখানে সুখস্বাচ্ছ্যন্দের সোপান,—যেখানে সফলতা পূজিত ও বিফলতা ঘৃণিত, সেখানে পুরুষগণের বিশেষরূপ যত্ন ও শিক্ষালাভ করা উচিত। কেবল অসাধারণ ক্ষমতাবান্ লোকেরাই অন্যান্য কর্ম্মে সফলযত্ন হইয়াও সাংসারিক সুখলাভে বিফলমানস হইয়া থাকে। ইংরাজরমণীরা ইহা অবগত আছেন। তাঁহারা বুঝেন যে, পুরুষদিগের সম্মান এবং যশ হইলেই তাঁহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারিবেন। ইংরাজ-রমণীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কুরুচি ও সপ্রতিভ ব্যবহার সকলেই অবগত আছেন। ইংলণ্ডে ইংরাজের কর্ম্মক্ষমতা ও অন্যত্র ইংরাজের প্রভাব ও সাহস, ইংরাজ রমণীর গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলাস্থাপনে সহায়।

ইংলণ্ডে পুরুষ।

ইংলণ্ডে পুরুষদিগের যথাসম্ভব কম কাজ করাই গার্হস্থ্য মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্য। গৃহ সেখানে রমণীর ক্রীড়াক্ষেত্র নহে। পরন্তু তাহা পুরুষের বিশ্রামাগার; সেখানে বিশ্রাম করিয়া তাহারা পরিশ্রমশক্তি বর্দ্ধিত করে। সেই জন্য ইংলণ্ডে গৃহস্থালীর সুচারু বন্দোবস্ত দৃষ্ট হয়।

আপনার সুখস্বাচ্ছ্যন্দের জন্য এবং সময় সময় বন্ধুবান্ধবদিগের আদর অভ্যর্থনার জন্য গৃহের বিশেষ আবশ্যক। সেই জন্যই মানবগণ যত্ন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—তাহাদিগের উপার্জ্জন ভিন্ন গৃহ চলে না। রমণীগণ সেই উপার্জ্জিত অর্থ হইতে গৃহে যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করেন।

আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে লোকেরা আমোদ প্রমোদ এবং বাজে কাজে অধিক সময় ব্যয়িত করে, সন্দেহ নাই। এই সকল বাজে কাজের জন্য সময় আবশ্যক, আবার মিতব্যয়িতা ভিন্ন সময় আসিবে কোথা হইতে? ইংলণ্ডের লোক প্রায়ই একটা না একটা হুজুগ লইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে বাজে কাজ।

ইংলণ্ডে সোসিয়ালিসম্।

ধীর অথচ নিশ্চিতপদবিক্ষেপে ইংলণ্ডীয় সমাজে সোসিয়ালিসম্ আপনার প্রবল প্রতাপ সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে। এখন অনেক বড় বড় রাজনৈতিক, নৈতিক সামাজিক নেতৃগণ সোসিয়ালিসম্‌-সাগরে সংজ্ঞাহীন, সন্তরণরত। সোসিয়ালিষ্টদের মধ্যে লেখক ও ধর্ম্মপ্রচারকেরও না কি অভাব নাই। ইংলণ্ডীয় সমাজে সোসিয়ালিসম্ এখন একটি আবশ্যক অথচ অমীমাংসিত প্রশ্ন। অর্থের বিভাগই এখন প্রধান

সোসিয়ালিসম্।

"ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রিকায় মিষ্টার রবার্ট ওয়ালেস্ (রাজনৈতিক) দলের পরিণাম শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সোসিয়ালিসম্ সম্বন্ধে উদারনৈতিক দলে কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, একটা সামাজিক বিপ্লবকারী কলহ বড় দুরবর্ত্তী নহে। গভর্মেণ্টের উচিত, সেই জন্য প্রস্তুত থাকা। হাতে ক্ষমতা পাইলে সাধারণ জনগণ যে, সমাজ একবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চাহিবে, ইহা ত আর অসম্ভব নহে। এখন বোধও সেইরূপ হইতেছে। সোসিয়ালিসমের সেবক সংখ্যা কম নহে এবং এখন ক্রমেই বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও ইহা ভাল বলিতেছেন। খুব সম্ভবতঃ অল্প কাল মধ্যেই ইহার বহুসংখ্যক সেবক হইয়া দাঁড়াইবে।

সোসিয়ালিসম্-ভীতি।

সোসিয়ালিস্‌ম কি, ইহা লইয়া এখন অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। অনেকে সাধারণ ভাবে ইহাতে যাহা বুঝে, তাহাতে এখন প্রায় সাড়ে পনের আনা লোকি সোসিয়ালিসম্ সেবক। লেখক ইহার সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার অর্থ ব্যক্তিগত মূলধনের, অর্থাৎ মহাজনের বিনাশ। গভর্মেণ্ট সমস্ত মূলধন লইয়া মহাজন হউন—গভর্মেণ্টই একমাত্র কৃষক, কারখানা-ওয়ালা, ভাণ্ডার-রক্ষক হউন। দেশের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করুন। সকলে গভর্মেণ্টের অধীনে চাকরি করুক। ইহাতে যদিও সকলেরই যে অভাব ঘুচিবে, তাহা নহে; তবে এই হইবে যে, নিতান্ত হীন উপায় ভিন্ন কেহ তাহার প্রতিবেশী অপেক্ষা ভাল অবস্থাপন্ন হইতে পারিবে না।

সোসিয়ালিস্‌ম কি?

উল্লিখিত শেষ কারণে অনেকে সোসিয়ালিষ্ট হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, যেন ইহা নিতান্ত ন্যায়ানুমোদিত। এই সামান্য কথায় একটা খুব বড় আশা ভরসা স্থাপনের সুযোগ হয়। যাঁহারা সোসিয়ালিস্‌মের প্রচারক, তাঁহারা সাহসী, গোঁড়া এবং অটল; কাজেই তাঁহাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আছে বটে।

লেখকের মত যে, সোসিয়ালিস্‌মের সাফল্যের পথে এক বিষম বাধা বর্ত্তমান। প্রথমেই ব্যক্তিগত মূলধনের উচ্ছেদসাধন আবশ্যক। এখন যে সকল কারখানা বা খনির আইন হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে সোসিয়ালিস্‌ম নহে। তাহার মূলমন্ত্র মহাজনের উচ্ছেদ। তাহা সহজসাধ্য সাধন নহে।

গভর্মেণ্টের দাস হইয়া সর্ব্ববিষয়ে কার্য্য করিতে কে সম্মত হইবে? লোকে অর্দ্ধাশনে আপনার স্বাধীন কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিবে, তথাপি দাস হইয়া পূর্ণাশনলাভ প্রার্থনা করিবে না। কে আপনার নিজত্ব হারাইয়া গভর্মেণ্টের হস্তে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিবে?

কর্ত্তব্য।

উদারনৈতিক দলের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, স্পষ্টভাবে সাধারণের সমক্ষে স্বীকার করা যে, তাঁহারা সোসিয়ালিস্‌মের পক্ষপাতী নহেন। আর যদি উদারনৈতিক মহাজনেরা আপনাতে বিশ্বাস করেন, এবং সেই বহুকালশ্রুত "সাধারণে বিশ্বাস" এই মতের পরিপোষক হয়েন, তবে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য,—একটি সোসিয়ালিস্‌মের বিরুদ্ধ মত প্রচার করা।

সোসিয়ালিসম্ এখনও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন—ইহার মীমাংসা হইলেই এখন পাশ্চাত্য

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম।

উপন্যাসশ্রেণীর গ্রন্থ পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। নায়ক নায়িকার কথা লিখিতে হইলে রাধাগোবিন্দ স্মরণ করিতে হইত। বীরত্ব, সতীত্ব ও সাধুত্ব লইয়া কাব্য লিখিতে হইলে প্রাচীন শাস্ত্রগুলির মধ্যে যে সব উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহারই মধ্য হইতে কোনও একটি বাছিয়া লইতে হইত। এখন অনিবার খগেন্দ্র নগেন্দ্র অমলা বিমলার সৃষ্টি হইতেছে, সেকালে কিন্তু নিয়মিত কয়েকটি প্রসঙ্গ ব্যতীত একপদ অগ্রসর হইবার রীতি ছিল না; সকলই ধর্ম্মের নামে লিখিতে হইত। সাহিত্য ধর্ম্মপ্রচারের একরূপ যন্ত্রবিশেষ ছিল, ধর্ম্মের নামে মধ্যে মধ্যে অধর্ম্মের কথা কাব্যে না থাকিত, এমন নয়; তাই এই ধর্ম্মরাজ্যে বিদ্যাসুন্দরের উদয় হইয়াছে; কিন্তু উহাও অন্নদামঙ্গলের একাংশভুক্ত হইয়া ধর্ম্মের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা লাভ করিয়াছে—গৃহস্থের বধূগণও তাহা পড়িতেন, কেহ আপত্তি করিতেন না। তাই বলিয়া ভারতচন্দ্রকে অমান্য করিও না, তিনিও ধর্ম্মের পাণ্ডা; হইতে পারে, তারকেশ্বরের শ্রীমান মোহান্ত যেরূপ পাণ্ডা, ইনিও সেইরূপ। কিন্তু সামান্য মনুষ্যের ক্রিয়াকলাপ হইতে ইহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র; কারণ, তাহা আধ্যাত্মিক ও ব্যাখ্যা-যোগ্য।

পাণ্ডারা সাহিত্যসংসার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। এখন কত আয়েসা ওসমানী উৎপন্ন হইয়া সাহিত্যকে নূতন সাজে সজ্জিত করিতেছে, এখনকার কল্পনা আকাশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করিতেছে; কিন্তু তখনকার দেশের রুচি ঐরূপ ব্যাপারে কখনও স্বীকৃত হইত না। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ব্যতীত প্রতিভার দিগন্ত-উজ্জ্বলকারী শক্তির বিকাশ দেখিলেও তাহারা প্রণত হইত না। প্রাচীন শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রসঙ্গ রচিত না হইলে কবিতা, প্রতিভা মিথ্যা হইয়া যাইত। কল্পনা না ছিল, এমন নহে; কল্পনা অবারিত পক্ষে দ্যুলোকে, ভূলোকে বিহার করিত; কিন্তু রামায়ণ কি মহাভারত হইতে উপাখ্যানটি গ্রহণ করা চাই। ধর্ম্মের সঙ্গে একটু সংস্রব থাকিলে পর্ব্বতশিখাগ্রে পদ্মের বিকাশ হইতে পশ্চিমদিক্‌বিভাগে ভানুর উদয় পর্য্যন্ত সকল কথাই বিশ্বাস করিতে লোক প্রস্তুত হইত। কবিগণ হনুমানের কক্ষতলে সূর্য্যকে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেন, ইছাই ঘোষের কর্ত্তিত মস্তক যুক্ত করাইতে পারি-

করিতে পারিতেন। সেই কথা শুনিয়া কাহারও চক্ষে দরদর ধারা বহিত, কেহ আত্মহারা ও বিমোহিত হইয়া কবির চরণে জীবন বিকাইতে যাইত। মঙ্গলচণ্ডী কি শনিঠাকুরের কথা যে পুস্তকে আছে, তাহা পড়িবার কালে ভক্তগণ প্রতিপত্রে প্রণাম রাখিয়া অগ্রসর হইতেন। বেহুলার ক্রন্দনে, পদ্মার সান্ত্বনাবাক্যে কি-ঢেকুর পালা শুনিয়া হো হো স্বরে করুণ অশ্রুপাত করিতেন। ইহার এক কথা মিথ্যা বলিয়া বক্তার ত্রাণ পাইবার উপায় ছিল না। উদাহরণ, আমার ঠাকুরমাকে এক দিন দুর্গেশনন্দিনীর গল্পের সার শুনাইয়াছিলাম, প্রথম প্রশ্নই এই "গল্প সত্য কি না?" আমি বলিলাম, "তোমার শনির পাঁচালির সদাগরের কন্যা যে বোয়ালীর পেট হইতে অলঙ্কার পরিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা কি সত্য?" এই প্রশ্ন শুনিয়া, পাছে আমি শনির বিরাগভাজন হই, এই জন্য তিনি ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ শ্রোতাদিগের স্কন্ধে গন্ধমাদনের মত গুরুভার চাপাইয়া দেওয়াও সহজ। অথচ একটা তৃণের ভারবহনেই তাহারা অস্বীকৃত।

বঙ্গে এই জন্য মৌলিক গল্পের সৃষ্টি হয় না। বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রাচীনশাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান ব্যতীত চাঁদ সদাগরের কথা, লাউসেনের কথা, বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালি, কালকেতু ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের কিছু নাড়া চাড়া হইয়াছে। কিন্তু কোনটিই কবিগণের মনগড়া গল্প বলিয়া বোধ হয় না। চাঁদ সদাগরের প্রসঙ্গ বঙ্গদেশে পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, নানা দেশ হইতে এই একই বিষয়ের নানা গীতি পাওয়া যাইতেছে। কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, দ্বিজ বংশীনারায়ণ দেব, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, বলরাম দাস প্রভৃতি অনেক মনসা-উপাখ্যান-রচকের নাম ও রচনার অংশ আমরা পাইয়াছি। স্বয়ং নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ও ক্ষেমানন্দ ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের নিকট এজন্য ঋণী, তাহার প্রমাণ আছে। ইহারা শুধু পরস্বলুণ্ঠনকারী, পরচয়িত কুসুমদামে মালা গাঁথিয়া মালী। বটতলার ছাপা এবং পয়ার ছন্দ ও দীর্ঘছন্দ হেতু এই সব গীত নগণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু যে কোনও পাঠক ইংরেজী পড়িয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রতি নাসাকুঞ্চন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা অনুরোধ করি, গণেশবন্দনা মার্জ্জনা করিয়া, পয়ার ও দীর্ঘ ছন্দ সহ্য করিয়া, বটতলার ছাপা পড়িতে সোলেমানের চস্‌মা ধারণ করিয়া এক বার অগ্রসর হউন। নিশ্চয় বলিতে পারি, মেঘনাদ কি বৃত্রসংহারে যে তৃপ্তি হয় নাই, উহা পড়িয়া তাহা হইবে। হৃদয়-তন্ত্রীর সঙ্গে যে ভাবের গোপনে মিলন আছে,

বাঙ্গালীর মন প্রাণ যে স্থরে বাঁধা, সেই স্থর ঐ সব পুস্তকে স্পর্শ করিবে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দবৃষ্টি হইবে। মেঘনাদ কি বৃত্রসংহারে বিমানের ন্যায় উন্নত, শরদভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ ও খনির গর্ভশায়ী চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় কবিত্বরাশি পত্রে পত্রে আছে, স্বীকার করি—কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের খাঁটি চিত্র ঐ সব বড় বড় কাব্যে নাই; তাই এই সব কীর্ত্তির স্তাবকগণের সঙ্গে আমরা উহাদের স্থায়িত্ব-বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নহি।

এই খাঁটি বাঙ্গলা কবিতা বাঙ্গালীর নিকট এত প্রিয় কেন? পদ্মপুরাণ, চণ্ডীকাব্য, বিদ্যাস্থন্দর এক একখানা স্থায়ী কাব্য। কিন্তু মেঘনাদবধ কি বৃত্রসংহার সে শ্রেণীর কাব্য নহে। কে বড়, কে ছোট,—কোনটি মল্লিকা, কোনটি গোলাপ, তাহা বলিতে পারি না, এবং তারতম্যে মূল্যনিরূপণ করিতেও আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। কিন্তু উহারা দুই ভিন্নজাতীয় কাব্য; যেমন ইংরেজ বাঙ্গালী ভিন্নজাতীয়, ইহারা ও তেমনই ভিন্নজাতীয়।

পূর্ব্ব কালের কাব্যগুলি এক হস্তের রচনা নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বহু কবির চেষ্টায় এক একটি বিষয় সম্পূর্ণ হইয়াছে,—শেষ কবি ভাগ্যবান, তিনিই সমস্ত যশের ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন; পূর্ব্ববর্ত্তীকবিগণচয়িত স্থগন্ধ কুন্দ যূথী জাতি কুস্থমরাশি দ্বারা তিনি মালা গাঁথিয়া জাতিকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার হস্তে আমরা সেই উপহার পাইয়া, যাঁহারা কাঁটা সহিয়া কেতকীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা কীটের আঘাত সহিয়া রজনীগন্ধ, মালতী, বা মনোলোভা অপরাজিতা তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—আমরা মাধবাচার্য্যকে ভুলিয়া কবিকঙ্কণকে ভক্তি করিতেছি, কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কাশীদাসকে প্রশংসা করিতেছি, কানা হরি দত্তকে (১) ভুলিয়া নারায়ণ দেবকে সাধুবাদ করিতেছি, কৃষ্ণরামকে ভুলিয়া ভারতচন্দ্রের কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইতেছি। এই বহু কবির চেষ্টার গুণে এক একখানা পুস্তক এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে। একই কাব্য-কুস্থম বহু যুগের সমবেত চেষ্টায় বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু এখনকার কাব্যগুলি এক কবিরই রচনা;—বিষয়ের বাহুল্যে আমরা এখন লাভবান, কিন্তু ভাবের গাঢ়তায় ক্ষতিগ্রস্ত। রামায়ণ মহাভারতাদিও এক কবির রচনা নহে. যুগে যুগে সৌন্দর্য্য প্রক্ষিপ্ত হইয়া কাব্যের প্রথম কঙ্কাল হইতে সজীব মহাকাব্য গঠিত হইয়াছে, ইহাই এখনকার পণ্ডিতদিগের

---

(১) "প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।"—বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

মত। শ্রেষ্ঠ কবি প্রাচীন জগতের সমস্ত ধন মন্ত্রবলে হরণ করিয়া স্বীয় কাব্যে তাহা দেখাইয়া থাকেন, তাই উহা এত আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

বঙ্গসাহিত্যে ঘনরামের এক স্বতন্ত্র স্থান। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবির নিকট তাঁহার বিষয়ের উপকরণ পান নাই, জন-প্রসিদ্ধ লাউসেনের বৃত্তান্তটি অবশ্য তিনি গঠন করেন নাই। ধর্ম্মের প্রসঙ্গ ব্যতীত কাব্য আদরণীয় হইত না,—তিনিও দুর্গার মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির সম্বন্ধে একটি বিশেষ রীতি দেখা যায়, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতে কবিকঙ্কণের চণ্ডী অনেক বৃহৎ। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অনেক বড়। পরমেশ্বর কবীন্দ্রের মহাভারত হইতে কাশীদাসের মহাভারতও অনেক বড়। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচিত কাব্যকে নবভাবে গঠিত করিয়া পরবর্ত্তী কবিগণ একটু আকার বাড়াইয়াছেন—প্রথম কবিই যদি অত্যন্ত বৃহৎ কাব্য লিখিবার প্রয়াস পাইতেন,—তবে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতেন না। ঘনরাম এক বিরাট গ্রন্থ লিখিতে দাঁড়াইয়াছেন,—এ বিষয়ে তিনি কোনও মহাজন-পদ-চিহ্নিত পথে গমন করেন নাই। তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একজন কেইডমন কি দান্তে পথ না দেখাইয়া গেলে সহসা একজন মিল্টন হইতে পারেন কি না, সন্দেহের বিষয়। ঘনরাম তাঁহার নিজের প্রতিভায় অতিরিক্ত বিশ্বাসপরায়ণ। তিনি পত্রে পত্রে নব নব চরিত্রের বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নব নব ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা একবারে এত বড় কাব্যের বিষয় আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও উদ্ভাবনীশক্তি বহু বর্ষ ব্যয় করিয়াও শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকে একখানা সুপাঠ্য কাব্যরূপে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। লাউসেন কত বড় বীর! মৃতের দেহে জীবনসঞ্চার করিতেছেন, কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের বিক্রম ও মহিমা দেখাইয়াছেন, অজেয় ঢেকুর জয় করিয়াছেন, ইহা ছাড়া নৈতিক কত যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছেন ও জয় লাভ করিয়াছেন, কত রূপসীর কটাক্ষ ও বিমুগ্ধার তন্ত্র মন্ত্র বিফল করিয়া দুর্গা স্মরণ করিয়া রজনীযাপন করিয়াছেন! কিন্তু এই বীরের বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা তাঁহার কিছুমাত্র বীরত্ব দেখি না। কবি সর্ব্বত্রই দৈবশক্তির অবতারণা করিয়া এত বড় বীর লাউসেনকে খর্ব্ব করিয়াছেন। দেবী আসিয়া তাঁহার যুদ্ধগুলি জয় করিতেছেন, তাঁহার শরীরের মশক পর্য্যন্ত খেদাইতেছেন, সুতরাং

এই ভাবে তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রটিকে মাটি করিয়াছেন। এত বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়াও কবি কিছুমাত্র বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা এক মত্ত হস্তীর ন্যায় প্রফুল্ল পঙ্কজবন লক্ষ্য করিয়া শুধু পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে মাত্র। কাব্যে বর্ণিত চরিত্র গুলির কষ্টে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। দেবী আসিয়া তাহা নিবারণ করিবেন, জানি। পর্ব্বতপ্রমাণ দুরবস্থাও তজ্জন্য লঘুজ্ঞান হয়। ঘনরামের ভগবতীরও কিছু মাত্র মর্য্যাদা নাই। তিনি লাউসেনের আরাধ্যা দেবী হইয়া রূপসী যুবতী বেশে তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন, প্রতিবারেই ভগবতী আসিয়া তিনি যে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন, সেই সব কার্য্যের তুলনায় উপস্থিত বিপদ অতি সামান্য, তাহা অবহেলায় দমন করিতে পারিবেন, নিজের ভেরী এইরূপে নিজে বাজাইয়া তাঁহার উপাসকগণের নিকট বড় হইতেছেন, যখনই কোনও ভক্ত তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, তখনই তিনি কলম ধরিয়া স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছেন, কে স্মরণ করিল, তাহা কোনও রূপেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। ঘনরামবর্ণিতা দেবী একটি বুদ্ধিশূন্যা নির্লজ্জা ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণা রমণী।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের আর এক মহৎ দোষ, একরূপ ঘটনার পুনঃপুনঃ একই ভাবের বর্ণনা। কতবারই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের দম্ভ ও মালসাট বর্ণিত হইল, কিন্তু সব স্থলেই এক ছন্দ, এক কথা; কিছুমাত্র অভিনবত্ব নাই, পড়িতে পড়িতে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।

ঘনরামের বিপুল গ্রন্থে সৌন্দর্য্যের প্রভা না আছে, এমন নয়। উহা তাঁহার পরিচায়ক কীর্ত্তি। কিন্তু কবি সুচারুভাবে গল্পটি সম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই। উহার উজ্জ্বলতা মেঘান্তরে ঈষৎ-মুক্ত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় হঠাৎ প্রকাশ হয়; বহুদূর কবির সঙ্গে কণ্টকাকীর্ণ পথে যাইতে যাইতে পাঠক হয় ত একটা ক্ষুদ্র কুন্দ কি মালতী ফুল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়ান,—এইমাত্র লাভ। এই কাব্য যাঁহারা আগাগোড়া পড়িতে পারিবেন, তাঁহাদের ধৈর্য্য অসামান্য, তাঁহারা প্রশংসনীয় পাঠক। কিন্তু আদ্যন্ত না পড়িলে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তাহা জানা অসম্ভব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

প্রতিশোধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভরা ভাদ্রে চূর্ণীনদী কূলে কূলে পূরিয়া উঠিয়াছে। তীরের বাঁশঝাড়গুলি, লতা-সমাচ্ছন্ন আগাছার সারি প্রায় আগ্রীব ডুবিয়া গিয়াছে। নদীর খর স্রোত তাহাদের শাখায় প্রশাখায় প্রহত হইয়া স্থানে স্থানে ঈষৎমাত্র বাঁকিয়া চলিয়াছে। নদীকূলে কোমল তৃণ শোভা আর বড় দেখা যায় না—প্রায় সর্ব্বত্র নিবিড় হরিৎ ধান্যক্ষেত্র।

নদীর ধারে দেবীপুর নামে ক্ষুদ্র পল্লী তিনদিকে বন্যাজলে বেষ্টিত। সরোবরবক্ষঃস্থ কুবলয়কুঞ্জে জলচর পক্ষীর নীড়ের মত, তালনারিকেলবনখচিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি জলে ভাসিতেছে। তাহার বাঁধা ঘাটে নৌকা বাঁধা এবং ঘাটের উপর শিবমন্দির-সম্মুখস্থ অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সমাগম দেখিয়া মনে হইতেছিল, আজ বুঝি কোন পর্ব্বদিন।

বাস্তবিক কিন্তু কোন পর্ব্বদিন নহে। কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা সরলা আঠার বছর বয়সে সবে প্রথম শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছে, তাই আজ দেবীপুরের এ জীবন্ত ভাব। সরলা আর কখন গ্রামের বাহির হয় নাই। ছেলে বেলায় মার সঙ্গে দুই চারি বার গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, আবছায়ার মত মনে পড়িতেছে। সম্প্রতি মাতৃহীনা হওয়ায় সে অভিভাবিকা মাত্র শূন্য হইয়াছে,—এক শ্বশুরালয় ছাড়া ত্রিকুলে আর আশ্রয়স্থান ছিল না। মাতার ত্যক্ত ব্রহ্মোত্তর জমীগুলি এবং ভদ্রাসন অবলম্বন করিয়া, দেবীপুরে বাস করিতে গ্রামবাসীরা সরলাকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়সে সেখানে একাকিনী বাস করিতে তাহার সাহস হইল না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইদানীং গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে বাটীর অঙ্গনে ঢিল পাটিকেল আসিয়া পড়িত, এবং সরলার শয়নসঙ্গিনী আকালের মাও নাকি দুই দিন তিন চারি জন লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল।

অতএব কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, সরলা এই ভাদ্র মাসেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে, স্থির করিল। সে অনেক দূর—নৌকাপথে আড়াই দিনের পথ। নয় বছর বয়সে সরলার বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কপালে কখন স্বামী-

বড় কুলীনদুহিতার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, ভর্ত্তার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সরলা সুতরাং তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল না। যাঁর হাতে সমর্পণ করিয়া মাতা কন্যার নারীজন্ম সফল হইল ভাবিয়াছিলেন, এই নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় তিনি কি চরণে ঠাঁই দিবেন না? সেই আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় সরলা আশৈশবের বাসভূমি ছাড়িয়া সংসারসাগরে ঝাঁপ দিল।

আকালের মা অনেক দিনের মানুষ, সরলার মাতামহীর সমবয়স্কা। সরলার মাতাকে সে মানুষ করিয়াছিল। এজন্য সরলা তাকে আয়ি বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, "সলি, ভাদ্দর মাসে কুকুর বিড়েলের বাড়ী ছেড়ে যেতে নেই, আর একটা মাস কোন রকমে থেকে যাও।" সরলা বলিল, "আয়ি কুকুর বিড়েলকেও আহা করার লোক আছে—কিন্তু আমার কে আছে বল্? শেষে কি এখান থেকে একটা অখ্যাত নিয়ে বেরুব!" বুড়ী এই যুক্তিতে নিরুত্তর হইল। অতঃপর পাড়া প্রতিবেশিনীরা ভাদ্র মাসের দোহাই দিয়া সরলার যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করিলে আকালের মা বলিত—"বাবা ঠাকুর স্বপন দিয়েচেন, সোয়ামির কাছে যেতে দিন ক্ষণ দেখতে নেই!"

সরলার মা ধান্য বাড়ি দিয়া এবং কিছু কিছু মহাজনী করিয়া গ্রামের "ছোট লোক" গুলিকে বাধ্য করিয়াছিলেন, ইহাতে পল্লীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ভদ্র ও অভদ্র সমাজে ব্রাহ্মণবিধবার ধনশালিনী বলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। আজি কালিকার দিনে ইহাতে ইনকম ট্যাক্সের বিভীষিকা ছাড়া অন্য ভয় বড় থাকে না, কিন্তু সে কালে যারা আয়-কর সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত, লোকে তাহাদিগকে ডাকাইত বলিত। অতএব সরলার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক্ ঠাক্ হইলে, গ্রামস্থ বাগদী-জাতীয় চারি জন লোক লাঠি সড়কী লইয়া আপনা হইতে নৌকায় গিয়া উঠিল। সরলাকে বুঝাইল, "দিদি ঠাকরুণ গো, ছেরক কাল তোমাদের খেয়ে মানুষ, পথে যদিই তুমি কোন আপদে বিপদে পড়, আমাদের নেমকহারাম নাম কিছুতেই ঘোচবে না।" আকালের মা বহুকাল পূর্ব্বে পুত্রহীনা হইয়াছিল—ভববন্ধন আর বড় কিছু ছিল না। সেও সরলার সঙ্গে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবীপুর ছাড়িয়া যাইতে সরলার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। আপনার বলিতে সেখানে কেহ আর ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি

শোণিতসম্পর্কের গণ্ডী মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে চায়, কোথা হইতে প্রেম আসিয়া ধীরে ধীরে বলে, এই বৃক্ষলতা পশু পক্ষী, প্রতিবেশীর এই শিশু পুত্র কন্যা—এ সব তোমার নিজের। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত বায়ু প্রবাহ এবং অনন্ত উদার আকাশের মত স্থাবর জঙ্গম সবই যে তোমার নিতান্ত আপনার, ইহাতে সন্দেহ করিও না।

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সরলা নৌকায় গিয়া উঠিল। সদ্য মাতৃ-শোক আজ আবার নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিয়াছিল—যে কিছুর সঙ্গে মাতার মধুর স্মৃতি জড়িত, সকলেরই কাছে আজ চিরবিদায় লইতে হইয়াছে। প্রতি-বেশিনীরা অনেকেই উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছিল। সরলা কখন গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে জানে না—চোখের জল মুছিতে মুছিতে ধীর পদে সে যখন নৌকায় গিয়া উঠিল, তীরের লোকেদের মনে হইল, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী গ্রাম ছাড়িয়া অনিচ্ছায় চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা নদীস্রোতে ছুটিয়া চলিল। জ্ঞান হইয়া অবধি সরলা কখন দেবীপুরের বাহির হয় নাই, মনটা ভাল না থাকিলেও মুক্ত প্রকৃ-তির প্রাবৃটোৎসব দেখিতে দেখিতে সে আত্মবিস্মৃত হইতেছিল। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রাম, কত উদ্যান, কত দেবালয় দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল,—নৌকার ভিতর পর্দ্দার মধ্যে বসিয়া ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সরলা এক মনে সকলই দেখিতেছিল।

এইরূপে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। আকালের মা ততক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া পর্দ্দার বাহিরে শয়ন করিয়াছিল। প্রথমতঃ অনেকক্ষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিয়া নৌকারোহীরা ভাবিয়াছিল, বুড়ীর মন কেমন করিতেছে'; কিন্তু ক্রমে তাহা গভীর নাসিকাগর্জ্জনে পরিণত হইয়া আসিল। অতএব বুড়ী যখন উঠিয়া বসিল, এবং সরলা কাঁদিতেছে কি না দেখিবার জন্য পর্দ্দার ভিতর প্রবেশ করিল, সরলা তখন স্থির দৃষ্টিতে একটা কিছু দেখিতেছে। এইখানে চূর্ণীনদী কতকটা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে—দুই প্রবাহের বক্ষঃস্থলে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর নিবিড় বটচ্ছায়া এক অতি জীর্ণ শিবমন্দির প্রমুখ ইষ্ট-কালয়কে আশ্রয় দিয়াছে। প্রকাণ্ড বটগাছের শাখা প্রশাখা মাঝে মাঝে ভূমি-শায়ী হইয়া আছে—কচিৎ একটা জটা অথবা একটা শাখা নদী-স্রোতে প্রহত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। সরলা দেখিতে পাইল, বটগাছের নিবিড় ছায়া-

এইখানে নদীর দুই ধারে বন অতি নিবিড়। এবং নদী দ্বিধাভিন্ন হইলেও স্রোতের বেগ অতি তীব্র। মাঝিরা নৌকা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, বটচ্ছায়ায় লুক্কায়িত পানসীযুগল তাহারা কেহ দেখিতে পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পানসী দুই খানা দেখিয়া সরলা শিহরিয়া উঠিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিবলে সে আকালের মাকে আশঙ্কার কথা কিছু জানিতে দিল না। নদীতীরের বনদেশ হইতে কদম্ব কেতকীর ঘ্রাণ আসিতেছিল—আকালের মা নিকটে আসিবামাত্র সরলা সেই দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিল। ইহাতে বুড়ী সহজেই ভাবিল, গোটাকতক কেয়া ফুল আহরণ করিতে পারিলে "সলিকে" খুসী করিতে পারা যাইবে। অতএব সে বাগ্দী চারি জনের ভিতর এক জনকে ডাকিয়া বলিল, "বদন, তোর দিদিঠাকুরুণের জন্যে গোটা চারেক কেয়ার ফুল তুলে আন্ না ভাই,—নাতজামাইকে ভেট দেবে। নৌকো বাঁধ। কি বলিস্ দিদিমণি!"

তখন নৌকা "দ্বীপ" বেষ্টন শেষ করিয়া উভয় স্রোতের সন্ধিস্থলে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।—খরপ্রবাহে নৌকা স্থির রাখিতে মাঝিমাল্লা এবং সর্দারেরা সকলেই ব্যস্ত। আকালের মার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। তাহাতে বুড়ী তাহার সহজকর্কশ কণ্ঠ আরও চড়াইয়া দিয়া বদনকে ডাকিতে লাগিল, কেন না, নিজে সে ভাল শুনিতে পায় না!

এদিকে স্থিরবুদ্ধি হইলেও সরলা ক্রমে মহা উদ্বিগ্ন হইতেছিল। লুকান পানসী দেখিয়া অবধি তাহার মনে হইতেছিল, আজ রাত্রিটা ভালোয় ভালোয় যাবে না। আকালের মাকে ভারি ভীত বলিয়া সরলার বরাবর জানা ছিল। তাহার কাছে পানসীর কথা গোপন না করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এদিকে বেলা পড়িয়া আসিতেছে—সর্দারদিগকে সতর্ক না করিয়া দিলে অবশ্যম্ভাবী বিপদে প্রতীকারের কোনই যে উপায় হইবে না, ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য বুড়ী চীৎকারের উপর চীৎকার করিলেও সরলা তাহাকে নিষেধ করে নাই।

বদন যখন আসিল, নৌকা তখন নদীখাতে আসিয়া পড়িয়াছে। উভয় তীরে বনজঙ্গলের আর তেমন বাড়াবাড়ি নাই। আকালের মার পুষ্পাহরণ-

খবর শুনিল। সে ব্যস্ত হইয়া আর তিন জনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল। ইহাতে আকালের মা প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে ক্ষুব্ধ হইল। নৌকা বাঁধিয়া কেহ ফুল তুলিতে না যাওয়ায় তাহার মনে হইল, সকলে তাহাকে তাচ্ছীল্য করিতেছে। অতএব বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়া সে ভাল করে নাই, মনের এই ভাব সে গজগজ করিতে করিতে প্রকাশও করিতেছিল। সরলা হাসিয়া বলিল, "আয়ি, রাগ করিস্ নে। বেলা নেই, পথঘাট ভাল নয়, নৌকা বেঁধে দেরি করলে সন্ধ্যের আগে কোন গাঁয়ে পৌছন যাবে না। কাল ফুল তুলে তোর পাকা চুলে গুঁজে দেব।" ইহাতে বুড়ীর রাগ ভাল হইয়া গেল। সব কথা শুনিতে না পাইলেও "ওঃ তা হবে" বলিয়া সে সরলার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নানা গল্প যুড়িয়া দিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মাঝিমাল্লা এবং সর্দ্দারদের ভিতর কেহই আর কখন এ পথে আসে নাই। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা অনুভূত হইলে তাহাদের পরস্পরের ভিতর একটা নৈরাশ্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা আশ্রয়-স্থান পাওয়া চাই—নহিলে ডাকাইতের দলের মুখে সেই সাতজন লোক কতক্ষণ দাঁড়াইবে? বাগ্দী চারি জন বুঝিল, সেই "দ্বীপ" বিশে ডাকাতের একটা আস্তানা। কেন না, নদীয়া জেলায় অন্য দলপতি তখন ছিল না। দাঁড়িরা প্রাণপণে দাঁড় বাহিয়া চলিল। নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

যুগল নক্ষত্র।—বিখ্যাত সার জন হর্শেল আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেকগুলি যুগল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্শেলের পর আজ পর্য্যন্ত এইরূপ যুগল নক্ষত্র বিস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। যুগল নক্ষত্র, অর্থাৎ দুইটি নক্ষত্র, আয়তনে প্রায় সমান, পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এইরূপ নক্ষত্রের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা লইয়া বহু দিন হইতে বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। লাপ্লাস্ দেখাইয়াছিলেন, কোনও বর্ত্তুলাকার তরল পদার্থ বেগে আবর্ত্তন করিতে থাকিলে তাহার মধ্যভাগ (অর্থাৎ নিরক্ষ রেখার সন্নিহিত স্থল) ক্রমশঃ স্ফীত হয় ও মেরুস্থল ক্রমে চাপিয়া যায়। এই কারণে আমাদের পৃথিবীরও নিরক্ষদেশ স্ফীত ও মেরুপ্রদেশ চাপা। বেগবৃদ্ধিসহকারে সেই স্ফীতভাগ তফাৎ হইয়া গিয়া একটি অঙ্গুরীর আকারে অন্তঃস্থ ভাগকে বেষ্টন করে। শনিগ্রহে এইরূপ অঙ্গুরীর অস্তিত্ব দেখা যায়। কাল-ক্রমে সেই অঙ্গুরী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের আকার ধারণ করে। সম্প্রতি জর্জ ডারুইন

গোলাকার তরল পদার্থ আবর্ত্তন করিতে করিতে তাহার মধ্যভাগ ক্রমে সরু হইয়া যায়। কতকটা ডম্বেল অথবা ডমরুর আকারে দাঁড়াইয়া যায়। মধ্যভাগ আরও ক্ষীণ হইয়া শেষে একবারে ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তখন একটা বর্ত্তুল হইতে দুইটি বর্ত্তুলের উৎপত্তি হয়। ডারুইন্ বলেন, এইরূপে যুগল নক্ষত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। অন্তরীক্ষে নীহারিকা (ইংরাজিতে নেবুলা) নামক যে বাষ্পময় পদার্থ ভাল দূরবীক্ষণে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির আকার ডমরুর মত। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, এই নীহারিকারূপ বাষ্পময় মশলা হইতে সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং নীহারিকায় ডমরু আকৃতি অনেকটা ডারুইনের অনুমানের পক্ষে আছে বলিতে হইবে।

মঙ্গলগ্রহ।—কিছু দিন হইল, যখন মঙ্গলগ্রহ আমাদের খুব নিকটে আসিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, তখন মঙ্গলে জীবাধিবাস সম্বন্ধে নানা লোকে নানাবিধ কল্পনা জল্পনা আরম্ভ করেন। অনেকে বলিয়াছিলেন, মঙ্গলের মানুষে বড় বড় আলো জ্বালিয়া আমাদের নিকট সঙ্কেত পাঠাইতেছে। সে যাহাই হউক, মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে। চন্দ্রে বায়ু নাই, মঙ্গলে বায়ু আছে। মঙ্গলে মহাদেশ ও মহাসমুদ্র বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মেরুপ্রদেশ সর্ব্বদা বরফে আচ্ছন্ন দেখা যায়। শীতকালে এই তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশের পরিধি খুব বাড়িয়া যায়, আবার গ্রীষ্মকালে সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। মঙ্গলের উত্তরার্দ্ধে মোটের উপর ৩৮১ দিন শীতের ও ৩০৬ দিন গ্রীষ্ম ঋতুর প্রভাব। মঙ্গলের রক্তবর্ণ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, পৃথিবীতে উদ্ভিদের বর্ণ হরিৎ, কিন্তু মঙ্গলে উদ্ভিদের বোধ হয় রক্তবর্ণ। এই অনুমান যুক্তিযুক্ত না হইতেও পারে। মঙ্গলে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথা বলা যায় না। তবে পৃথিবীর মানুষের অপেক্ষাও উন্নত জীব না থাকিতে পারে, এমন বলা যায় না।

বৃহস্পতির উপগ্রহ। এতদিন বৃহস্পতির চারি চন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, সম্প্রতি পঞ্চমচন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিকারিং সাহেব বৃহস্পতির চন্দ্রগুলির নিয়ত আকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনুমান করেন, বৃহস্পতির চন্দ্র আমাদের চন্দ্রের মত জমাট এক খণ্ড পদার্থ নহে,—এক একটি চন্দ্র কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের সমবায়ভূত সমষ্টিমাত্র।

ভবিষ্যতের কয়লা। এক হিসাবে খনিজ পাথর কয়লা উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়লা ফুরাইলে, সুতরাং কলকারখানা বন্ধ হইলে, মনুষ্যজাতির ভাগ্যে কি ঘটিবে, ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়লার উৎপত্তি নাই, অথচ খরচ যথেষ্ট; সুতরাং কিছু দিনেই যে সমুদয় কয়লা ফুরাইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি হইতে সেই কয়লাহীন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বড় বড় ন্যুব্জগর্ভ দর্পণের দ্বারা সূর্য্যকিরণ সংগ্রহ ও একত্র করিয়া, তদুৎপন্ন তীব্র তেজের দ্বারা কল বানাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণ ব্যয়, সে পরিমাণ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। একটা উপায় আছে। আজ কাল তাড়িত শক্তির প্রয়োগে সমুদয় সাংসারিক ব্যাপার চালান যাইতে পারে। তাড়িতে সঙ্কেত ও শব্দ বহন করে, তাপ দেয়, আলো দেয়, গাড়ী টানে, জল তুলে, ময়দা পিষে। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে, কলিকাতায় তাড়িত উৎপন্ন করিয়া তদ্দারা দিল্লীতে কাজ করা যায়। তাড়িতের উৎপাদনেও কোনও রহস্য নাই। একটা চুম্বকের নিকট তাম্রর তার ঘুরাইলে ঐ তারে যত ইচ্ছা তাড়িত-প্রবাহ উৎপাদন করা চলে, তারটা ঘুরাইতে যা কষ্ট। অল্প কাজে মানুষে ঘুরায়, বেশী কাজে এঞ্জিনে ঘুরাইতে হয়। নায়াগ্রার জলপ্রপাতের নিম্নে চাকা পাতিয়া সেই জলের ধাক্কায় চিরকাল বিপুলবেগে কল ঘুরান ও

করিয়া সমুদয় ইউরোপের সমুদয় গৃহস্থের সমুদয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তবে ইউরোপ, আমেরিকার মুখ চাহিয়া ভরসা বাঁধিয়া থাকিতে চাহিবেন কি না স্বতন্ত্র কথা। যদি কোন রাজনৈতিক দ্বিধা না থাকে, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা হয়, তাহা হইলে নায়াগ্রার যে শক্তির নিয়ত অপচয় মাত্র হইতেছে, তদ্দ্বারা ইউরোপের চিরকাল স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম্ম চলিতে পারে, কয়লা ফুরাইবে বলিয়া ভাবিতে হয় না। সম্প্রতি নায়াগ্রার জলপ্রপাত হইতে তাড়িত উৎপাদনের জন্য যে সকল কোম্পানি সংগঠিত হইয়াছে, তাহারা কাজ আরম্ভ করিয়াছে, ও শস্তায় দূর দিগন্তে তাড়িত শক্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতেছে; খরিদদারগণ এতদ্দ্বারা ঘরে রোশনাই করিবেন, নগরের রাস্তা আলোকিত করিবেন, ভাত রাঁধিবেন, আগুণ জ্বালিবেন, জল তুলিবেন, পাখা টানিবেন, গাড়ী চালাইবেন, কল চালাইবেন, ইত্যাদি। ফলে ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইবে, এখন বলা যায় না।

ভবিষ্যতের আলো।—আজ কাল সচরাচর কাঠ, কয়লা, তেল, বাঁতি পোড়াইয়া আলোক উৎপাদনই রীতি। কিন্তু এই দহনকার্য্যে যে শক্তির ব্যয় হয়, তাহার এক আনা ভাগও আলো হয় না। পোনের আনার অধিক তাপ-উৎপাদনে যায়। সে তাপটা কোনও কাজেই লাগে না। তাপ ব্যতীত শুদ্ধ আলোক উৎপাদন ভবিষ্যতের সমস্যা। জোনাকী পোকা কেবল আলো উৎপাদন করে, তাহার আলোর সঙ্গে তাপ নাই। জগদ্ব্যাপী ঈথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ হইতে আলো জন্মে। কিন্তু আমরা সেই ছোট ঢেউ উৎপাদন করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে বড় বড় ঢেউ উৎপাদন করিয়া ফেলি। পাঁচটা ছোট ঢেউএর সঙ্গে পঞ্চাশটা বড় ঢেউ উৎপন্ন হইয়া পড়ে। এই বড় ঢেউগুলা কোনও কাজে লাগে না। ইহাদের মধ্যে আবার যে গুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহাতে তাপ জন্মে; কিন্তু যেগুলি অপেক্ষাকৃত বড় (এবং ইহাদের সংখ্যাই বেশী) তাহার দ্বারা তাপও জন্মে না। নিরর্থক ব্যয় ভালও লাগে না, উচিতও নহে। তাই শুদ্ধ আলোক, অর্থাৎ ঈথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ উৎপাদনের জন্য পণ্ডিতেরা সম্প্রতি আড়ে-হাতে লাগিয়াছেন। যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে দু দশ বৎসরের মধ্যে উপায় একটা আবিষ্কৃত হইবে, ভরসা হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী। শ্রাবণ। প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের "রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম"। "পুরাকল্প" শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের একটি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ক্রমশঃ-প্রকাশ্য রচনা; লেখক এই প্রবন্ধে বৈদিক কালের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত করিবেন। এরূপ প্রবন্ধ একটু বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের "হরিদাস ঠাকুর" বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে সঙ্কলিত একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত। "বুদ্ধোৎসব" শ্রীযুক্ত নকুড়-চন্দ্র বিশ্বাসের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। লেখক বলেন,—"বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির যেরূপ দুর্গোৎসব, * * * বৌদ্ধদিগেরও সেইরূপ বুদ্ধোৎসব। বুদ্ধদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। এই উৎসব উক্ত দিবস অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিব্বতের * * * ধর্ম্মই বল, সমাজনীতিই বল, যাহা কিছু সমস্তেরই আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং তিব্বতীয়েরা যে বঙ্গদেশের প্রতিমাপূজার অনুরূপ বুদ্ধোৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে।" তাহার পর লেখক বুদ্ধপ্রতিমাগঠন

ভারতী। শ্রাবণ। "আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি" শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রচনা। প্রবন্ধটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর "কোল জাতির আমোদ-প্রমোদ" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা যথেষ্ট আমোদ পাইয়াছি। লেখিকার সরল বর্ণনা ও আড়ম্বর-শূন্য প্রাঞ্জল রচনা, তৃপ্তিকর। তাঁহার বর্ণিত বিষয় কৌতূহলের উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। "হত্যারহস্য" একটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প,—লেখকের নাম নাই। "বিষম সমস্যা" আর একটি লেথকের নামহীন রচনা। "মেয়েরা পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, এই এক বিষম সমস্যা লইয়া আজ কাল সমস্ত সভ্যসমাজে এক তুমুল আন্দোলন উথাপিত হইয়াছে; তাহা লইয়া অনবরত তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদ চলিতেছে, অনেক যুক্তি অযুক্তি বর্ষিত হইতেছে।" বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক, তাহাদের সংখ্যাটি বাড়াইয়াছেন; "ফুল ও অলি" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি কবিতা। "মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের একটি অতিবিস্তৃত সঙ্কলিত প্রবন্ধ। ধর্ম্মানুরাগীদের পক্ষে প্রীতিকর হইলেও হইতে পারে,—পড়িতে সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্য থাকিবে কি না, সন্দেহ। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়ের "বোম্বাই সহরে পার্সি" একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ। "বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কৃত একটি "বিড়-ম্বনা"। আমাদের দেশের প্রথিতযশা লেখকেরা কেন যে এরূপ অন্তঃসারশূন্য, অকিঞ্চিৎকর, অক্ষরসর্ব্বস্ব রচনা প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। ভারতীর বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহার আর একটি উদাহরণ আছে,—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা—"নূতন যৌবন।" অনেকের অনেক রকম খেয়াল থাকে; সে জন্য কাহাকেও অপরাধী করা যায় না। কিন্তু সাহিত্যে খেয়ালের বাড়াবাড়ি দেখিলে সত্য সত্যই বিরক্ত ও ব্যথিত হইতে হয়। ইহা বঙ্গদেশের আবহাওয়ার দোষ বলিতে হইবে। শ্রীমতী সরলা দেবীর "লানকরানের উজীর" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ" বেশ হইয়াছে।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। শ্রাবণের "সাহিত্য" প্রকাশের পর নব্যভারত আমাদের হস্তগত হয়, সুতরাং গত মাসে আমরা নব্যভারতের উল্লেখ করিতে পারি নাই। "মন্থরা" শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর একটি অতিবিস্তৃত চরিত্রসমালোচনা। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ঠাকুর-দাস মুখোপাধ্যায়, অমৃতবাজার-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের কৃত "অমিয়নিমাই-চরিতের" সমালোচনা করিয়াছেন। লেখক সমালোচনা-প্রণালীর যেরূপ সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন, মূল গ্রন্থের সেরূপ আলোচনা করেন নাই। "অমিয়নিমাইচরিত" এ শ্রেণীর একমাত্র গ্রন্থ নহে। শিশির বাবুর নিমাইচরিত স্বশ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিসে বা কিরূপ নিজত্বে বড়, সমালোচকের নিকট আমরা তাহা জানিবার আশা করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে, সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাহার আভাসও পাওয়া গেল না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লিপিচাতুর্য্য সুন্দর। অনবরত একঘেয়ে রচনা পড়িয়া যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, ঠাকুরদাস বাবুর রচনা-প্রণালী নিশ্চয়ই তাঁহাদের তৃপ্তিবিধান করিবে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "বঙ্কিমচন্দ্র" পাঠ-যোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, তাঁহার "বর্ত্তমান বঙ্গভাষা" লইয়া আবার দেখা দিয়াছেন। কিন্তু "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদক, বিদ্যানিধি মহাশয়ের ঘরের কাটারী লইয়া তাঁহারই ঘাড়ে কোপ দিয়াছেন, সেটা ঠাহর আছে কি? বিদ্যানিধি মহাশয় নিজে ব্যাকরণ হাতে করিয়া দেশ শুদ্ধ লোকের লেখা বাতিল ও নামঞ্জুর করেন, কিন্তু নিজে লিখিবার সময় ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করেন, ইহাই হিতবাদীর অভিযোগ। অত্যন্ত আশ্চর্য্য বটে!

নব্যভারত। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত ডাক্তার এস্, বি, মিত্রের "পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি" একটি শিক্ষাপ্রদ সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। লেখক বোধ হয় নূতন বাঙ্গলা লিখিতেছেন,—

রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়;—কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের গৌরবে ও বুঝাইবার গুণে প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ হইয়াছে। "কেন কাঁদ?" স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতা। লেখকের নাম শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকে বলিতেছেন, ইনি বৃত্র-সংহার-রচয়িতা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতাটি পড়িয়া ত আমাদের তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যিনি মাইকেলের লোকান্তরগমনে লিখিয়াছিলেন,—

"খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি হিরণ্ময় জ্যোতি যার,"

তিনি বঙ্কিম বাবুর স্বর্গারোহণে

"বহিল বসন্ত অনিল বঙ্গেতে আহা কি মধুরতর!"

লিখিয়া ছাপাইতে পাঠাইবেন, ইহা বিশ্বাস করা দুরূহ। বোধ হয়, ইনি আমাদের সেই পুরাতন "খাঁটী" হেম নহেন,—কোনও নবাবিষ্কৃত "কেমিকেল" হইবেন। কেন না, আজ কাল যে সকল নূতন লেখক কবিতার মকস্ করিতেছেন, তাঁহারাও "কেন কাঁদ"র অপেক্ষা ভাল কবিতা লেখেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "বাক্‌টিরিয়া" একটি সুপাঠ্য, সুন্দর, শিক্ষণীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "বাঙ্গলা উপন্যাসের বিশেষত্ব" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর রচনা। গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতভেদ সত্ত্বেও স্বীকার্য্য যে, তাঁহার প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত বটে। কোনও জাতির সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ফয়তা দিতে হইলে, বৈদেশিক সমালোচকের পক্ষে আর একটু উদার ও সংযত হওয়া ভাল। অত্যুক্তিদোষে এরূপ প্রবন্ধের অত্যন্ত গৌরবহানি হয়। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষের "অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা" একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। আমরা পাঠকগণকে, বিশেষতঃ আমাদের আসামী ভ্রাতৃগণকে প্রবন্ধটি মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতে বলি। লেখক উপসংহারে বলিতেছেন,—"হিন্দুরাজত্বকালে আসাম প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; মধ্যে অনার্য্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল; পরে আহম-প্রাধান্য-যুগে ৺ শঙ্করদেব কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইত্যবসরে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে বিকৃত করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি গত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত করিয়া অসমীয়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুরও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন। ভাষাভেদ যে ভারতের অধঃপতনের অন্যতম হেতু, ইহা সকলেই আজ-কাল অনুভব করিতে পারেন; ঐক্য-বলসংস্থাপনের চেষ্টায়, সে জন্য, আজ কাল জাতীয় মহাসমিতিতে পরস্পর চিত্ত-বিনিময়ের উৎকৃষ্ট উপায় এক ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য উপায় না থাকায়, ইংরাজির দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সাধন করিয়া, অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন—ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে অনুরোধ করাই আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।" "এক অপরিজ্ঞাত কবি" শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের কৃত কবিবর বিহারীলালের কবিত্বসমালোচনা। প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ ও মৌলিক। এরূপ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক সুলিখিত প্রবন্ধ বাঙ্গলা মাসিকে প্রায় দেখা যায় না।

সাধনা। শ্রাবণ। "ডেপুটী-তত্ত্ব" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের একটি রহস্যময় নকসা। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় "মহাকবি কৃত্তিবাস" প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ের

চরিতের এক অংশ। "রাজা ও প্রজা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিন্তাপূর্ণ সন্দর্ভ। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "কৃতজ্ঞতা" এখনও চলিতেছে। "সাহিত্যের গৌরব" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পড়িবার ও ভাবিবার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "বঙ্কিমপ্রসঙ্গে" স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাগুলি সামান্ত বটে, কিন্তু চিত্তাকর্ষক। আমরা দুই একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "ইজিচেয়ারে বসিয়া বঙ্কিম বাবু ধূমপান করিতেছিলেন—আলবোলার সাজ সজ্জা এবং কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ নল দেখিয়া আমার 'বিষবৃক্ষের' হুঁকার স্তব মনে পড়িতেছিল। তখন ডায়েরি লিখিতাম না—কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, তাহার সারাংশ মাত্র মনে আছে। কথায় কথায় বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না, ইংরেজী ভাষাটা ভারি Insincere বলিয়া আমার মনে হয়।' আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'মাসিক সমালোচকে' আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই। প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, ইদানীন্তন কালে বঙ্কিম বাবু দেশের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে। কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, এখনকার ছেলেরা দেখিতে পাই, গুরুজনদিগকে আগেকার মত প্রণাম করে না। নিজের বাড়ীর রথ দেখিবার জন্য তাঁহার অপরাহ্ণে কাঁঠালপাড়ায় যাওয়ার কথা, অতএব আমরা বিদায় হইলাম। প্রথমে আসিয়া আমি বঙ্কিম বাবুকে নমস্কার করিয়াছিলাম, নব্য যুবকদের প্রতি তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া উঠিবার সময় সলজ্জভাবে প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিলেন। জামাতা রাখাল বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শ্রীশ বাবুকে আর বেহাইকে জল খাওয়াও।' এই সময়ে বাবু চন্দ্রশেখর কর আসিয়া পৌঁছিলেন—বঙ্কিম বাবুর কাঁঠালপাড়া যাওয়া হইল না। * * * আর এক দিন চন্দ্রশেখর (মুখোপাধ্যায়) বাবুর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবুর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। বঙ্কিম বাবু চন্দ্রনাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'ওঁকে চেন না?—উদ্ভ্রান্তপ্রেম!' মনে হইতেছে, এই দিন সন্ধ্যার পর বহরমপুর হইতে বঙ্কিম বাবুর একটি প্রাচীন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সে মিলনের আনন্দ এবং হাস্য এখনও আমার মনে জাগিতেছে। বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুত্রকে দেখিয়া বঙ্কিম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় পড়?' উ—Fourth year, Presidency College. বঙ্কিম বাবু—রাখালের সঙ্গে আলাপ নেই? উ—না। বঙ্কিম বাবু—সে কি হে, এক ক্লাসে পড়, আলাপ নেই? সঞ্জীব বাবু বলিলেন, 'তা জান না বুঝি? এখনকার ছেলেদের ভেতর নাম জিজ্ঞাসা যে একটা ঘোর বেয়াদবি। ওর একটা গল্প আছে। এক নব্যশিক্ষিতের সঙ্গে এক জন সেকেলে লোকের এক কুস্থানে দেখা হয়। বৃদ্ধ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, তাঁর নামটি কি? নব্য বাবু কষ্টে নাম বলিলেন। বৃদ্ধের কুবুদ্ধি আবার প্রশ্ন, 'মশায়ের পিতার নাম?' বাবুটি চটে লাল, বুড়োকে মারেন আর কি! ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া, বাড়ীর অধিকারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নব্য বাবুটিকে সুধাইল, 'বাবু বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ছেলেরাই চটিবে, আপনাদের রাগ কেন?' ভারি হাসি পড়িয়া গেল। এক দিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি, অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি। নবীন বাবু কথায় কথায় 'আনন্দমঠের' সুপরিচিত 'বন্দেমাতরং' সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিলেন, এমন ভাল জিনিসটিকে আধ-

লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছ, তাই ওরকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগবে কি না ভেবে আমি লিখব।' * * * আমি বলিলাম, আমার ইচ্ছা আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক কতক নোট এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি? বঙ্কিম বাবু হাসিলেন, বলিলেন, 'আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা ত সহজ নহে! জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ, তিনি জানেন, আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে, লোকে ভাবিবে কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দু ধর্ম্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে, লোকে আশ্চর্য্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছি-লাম, ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখন ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি। নীতি-শিক্ষা কখন হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখি নি, বলা যায় না।' বঙ্কিম বাবু হাসিলেন। আমি বলিলাম, 'শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?' উত্তর—'কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েছে।' একটু পরে বলিলেন, 'চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ, আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণস্বরূপা।' আমি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। বলিলাম, স্ত্রীচরিত্রগুলির উৎকর্ষ আপনার বেশী। পুরুষও কয়টি অতি সুন্দর আছে। অন্যান্য নামের সঙ্গে বঙ্কিম বাবু অমরনাথের নামও করিলেন। আমি বলিলাম, অমরনাথ আর প্রতাপ, একই চরিত্রের দুইরূপ বিকাশ। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী; কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন। বলিলেন, পূর্ণচন্দ্র বসু এইরূপ বুঝাইয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। আমি বলিলাম, অনেকে কপালকুণ্ডলাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে। উত্তর—'হাঁ, কাব্যাংশে খুব উঁচু বটে।' তার পর নিজেই বলিলেন, "প্রথম তিন খানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশ-নন্দিনী লেখার আগে আইভানহো পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্ষপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি।' চন্দ্রশেখরের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, ভাষার লীলা, দৃশ্যের এমন উৎকর্ষ আপনার আর কোনও কাব্যে দেখা যায় না। সেই 'অগাধ জলে সাঁতারের' মত সুন্দর অপূর্ব্ব দৃশ্য বড় দুর্লভ। আমার কথা স্বীকার করিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'অগাধ জলে সাঁতারের' মত দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।" "বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কাতায় দেশীয়দের মধ্যে বাস করেন। সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলেন, তাঁহার শব সমাধিস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তদনুসারে মৃতকে নিমতলার শ্মশানে দাহ করা হইয়াছিল। পবিত্র হিন্দুর শ্মশানে পতিত ম্লেচ্ছের দাহ হইতে দেখিয়া হিন্দুচূড়ামণি সম্পাদকেরা হিন্দুধর্ম্মের "সর্ব্বনাশ হইল!" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। রবীন্দ্র বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাই উদার হিন্দুধর্ম্মের এই সঙ্কীর্ণ অধঃপতন দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটির আদ্যন্ত একটা সংযত সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় পূর্ণ; রচনাপ্রণালী সজীব ও সুন্দর, আন্তরিকতাপূর্ণ, এবং সহজেই পাঠকের হৃদয়ে প্রভাববিস্তারে সক্ষম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদের উদার পূর্ব্বপুরুষগণ, এবং তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ সন্ততিধারা আমরা, এ উভয়ের মধ্যে কাহারা হিন্দু? তাঁহারা, না আমরা? হিন্দুত্ব মনুষ্যত্বে,—না, লোকাচারের কাপুরুষ শাসনে?

জন্মভূমি। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "কাশীরামদাস" প্রবন্ধে স্বর্গীয় জয়গোপাল বিদ্যাবাগীশের প্রতি ইতরজনোচিত ভাষার প্রয়োগ করিতেছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাবাগীশ, কাশীরামের কাব্য বিকলাঙ্গ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, লেখক ভদ্রভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। একজন ভদ্র লেখকের পক্ষে, মৃতের প্রতি এরূপ ব্যবহার ঘৃণাজনক, লজ্জাকর। যিনি এক কালে বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনে" লিখিবার একটু স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে, মৃতের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, অন্ততঃ তাহা জানা উচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতত্ব ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর আমাদের ভাল লাগে নাই,—এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে "কাশীরামের" সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম। কিন্তু প্রফুল্ল বাবু এটুকু সহ্য করিতে পারেন নাই। এবার আবার সেই কথার উপলক্ষ করিয়া অনর্থক দুটি প্যারা লিখিয়া পাঠকদের সময় নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু, এবারও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার কাঠরসিকতা ও মৃতের প্রতি প্রযুক্ত অভদ্র ভাষা পড়িয়া সময় নষ্ট না করিলেও, বঙ্গীয় পাঠকের বা কোনও সম্পাদকের বিন্দুমাত্র পাপ হইবে না। ইহাতে কেবল তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের গৌরবহানি হয় মাত্র। "সন্ধ্যা" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতা। লেখক এই কবিতায়, জগৎ বর্ত্তমানে যাহা আছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে, এই দুই বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মন্দের ও ভবিষ্যতে ভালর তালিকা। "মিনতি" শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটি কবিতা। ইহার এক চরণে—"থেকে থেকে কেন মাগো বীণায় মার তান?" মা সরস্বতীর প্রতি তদীয় উপযুক্ত বরপুত্রের এই প্রশ্ন শুনিয়া, আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শিখযুদ্ধের ইতিহাস ও মহারাজ দলিপ সিংহ। শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী দেখিলে সহজেই বুঝা যায়, লেখক নূতন ব্রতী। কিন্তু তাঁহার সংগ্রহ প্রশংসনীয়। শিখ যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিপ সিংহ সম্বন্ধে তিনি যে সকল দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বহুমূল্য। একজন নূতন লেখক, ভারতীয় ইতিহাসের সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য এমন পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং প্রথম উদ্যমেই এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বাস্তবিক আশাপ্রদ। আমরা আশা করি, গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় ভাষা ও ঘটনাবিন্যাসের সংস্কার

একটি পুরাতন বিষয়।

কতকগুলি কথা আছে, যাহা পুরাণো হইলেও চিরকাল নূতন থাকে। সেইরূপ একটি পুরাতন কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়ের গৌরববিবেচনায় পাঠকের ধৈর্য্যভিক্ষায় অধিকার আছে।

মনুষ্যের আত্মা সেই পুরাতন বিষয়। এবং এই পুরাতনের নূতনত্ব শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে না।

আত্মা আছে কি না, আত্মা অবিনাশী কি না, ইহা লইয়া চিরাচরিত পদ্ধতিক্রমে যথেচ্ছপরিমাণে বিতণ্ডা করা যাইতে পারে। আত্মার ধ্বংস সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই বিতণ্ডার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'আত্মা' অর্থে আমরা কি বুঝি, সেটা পরিষ্কার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, রাম অর্থে ভার্গব রাম কি রঘুপতি রাম, রামা হাড়ি চাপরাসী অথবা রামগিরি পর্ব্বত, সেটা উভয় পক্ষে স্থির করিয়া না লইলে, বড়ই বিড়ম্বনা ও শ্রমবাহুল্য উপস্থিত হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মা কি বুঝায়, স্থির করা কিছু দুষ্কর। কেন না, পাঁচ জনে পাঁচ রকম বুঝেন, এবং এক জনেও যে সর্ব্বদা এক রকমই বুঝেন, তাহাও বলা যায় না। অনেকের জ্ঞানে, বোধ করি সাধারণের জ্ঞানে, আত্মা এক রকম বায়বীয় পদার্থ, এক রকম সূক্ষ্ম বায়ু অথবা ঈথর। পুরাণ-প্রথিত সত্যবানের মৃত্যু হইলে যমরাজ আসিয়া সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটা সূক্ষ্ম পদার্থ বাহির করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সাবিত্রীর তর্জ্জনে তাহা আবার ফিরাইয়া দিতে হয়। সেই পদার্থটা সত্যবানের আত্মা কি না, স্পষ্ট বুঝা যায় না। এইরূপ সাকার অথবা বায়বীয় আত্মার নিকট আমরা উল্লেখ মাত্রে বিদায় লইতে পারি।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একরূপ সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীরের উল্লেখ দেখা যায়। বোধ করি ইহাও ঠিক্ আত্মা নহে। দর্শনশাস্ত্রোক্ত আত্মাকে শরীরী বুঝিবার কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই।

"মনুষ্য যেমন জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।" আত্মার অন্যান্য লক্ষণ ও বিবরণ ত্যাগ করিয়া, গীতোক্ত এই উক্তিটিকে প্রাচীন ও অধুনাতন

হিন্দু শাস্ত্রের ও হিন্দু ধর্ম্মের মজ্জাগত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই উক্তির ভিতরে কয়েকটি স্থূল কথা পাওয়া যায়। প্রথম, দেহব্যতিরিক্ত ও দেহ-আশ্রয়ী আর একটা কিছু আছে, যাহা লইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব; দ্বিতীয়, দেহের ধ্বংসে (অথবা মরণরূপ বিকারে) সেই পদার্থ দেহ হইতে পৃথক্ হয়; তৃতীয়, পরে সেই পদার্থ অন্য দেহে আশ্রয় করিতে পারে। এই দেহব্যতিরিক্ত ও দেহাশ্রয়ী পদার্থটি আত্মা; এবং এই আত্মার সম্বন্ধেই পূর্ব্বদেহের সহিত নর-দেহের সম্বন্ধ। ফল কথা, আত্মা রহিয়া যায়; দেহ আত্মার পরিধেয় বসনতুল্য পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব, ও দেহান্তরাশ্রয় (পুনর্জন্মগ্রহণ), আত্মার এই তিনটি লক্ষণ এই উক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য দেহও ধারণ করিতে পারে; সুতরাং মনুষ্যেতর জীবেও আত্মা বর্ত্তমান।

আত্মার নাশ নাই; তবে ইহা পুনর্জন্মগ্রহণ অথবা দেহাশ্রয় হইতে কোন রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে কখন কখন সমর্থ। তাহাকে নাশ বলা যায় না; তবে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ ইত্যাদি অভিধান দেওয়া যাইতে পারে। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

জীবনকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পর কখন স্বর্গনরকভোগ, কখন দেহান্তরগ্রহণ, এই দুই রকম কথাই শুনা যায়। এই উভয়ে কিরূপ সঙ্গতি আছে, তাহা ভাল বুঝা যায় না।

হিন্দুর ন্যায় খৃষ্টানাদিও আত্মার অস্তিত্ব ও অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা আত্মার দেহান্তরাশ্রয় বা পুনর্জন্মগ্রহণটা বোধ করি স্বীকার করেন না, এবং মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবকে আত্মার অধিকারী করিতে চাহেন না। ডারুইন্ শিষ্যেরা এই স্থানে বোধ করি, মাথা নাড়িবেন।

ইহাদের মতে আত্মা মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় ভাবে কোনও-না-কোনও রূপে শেষবিচারদিনের প্রতীক্ষায় রহে। বিচারশেষে কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখভাগী হইতে পারে। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ শুনিলে ইহারা চটিয়া উঠেন, এবং তাহাকে ধ্বংসেরই রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যাহাই হউক, হিন্দু ও অহিন্দু উভয়ের মধ্যে মোটা কথা কয়েকটাতে মিল আছে; দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটা আছে; সেটা দেহান্তেও রহে; এবং

উল্লিখিত হিন্দু শব্দে সাধারণ হিন্দু, এবং সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকার বুঝিয়াছি। হিন্দু দার্শনিক এই হিন্দুশব্দবাচ্য নহেন। আমার বিবেচনায়, হিন্দুদর্শনকার ও সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকার, এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ। যে সকল শাস্ত্রকার অকুণ্ঠিতভাবে সাংখ্য ও বেদান্তের দোহাই দিয়াছেন, তাঁহারা সাংখ্যের ও বেদান্তের অভ্যন্তরে কত দূর প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ আছে।

উক্ত দ্বিবিধ মত ব্যতীত আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আরও নানাবিধ মত বর্ত্তমান নাই, এমন নহে। বাষ্পীয় আত্মার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এমনও শুনা যায়, সুষুপ্তিকালে আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, স্বপ্নাবস্থায় অপরের আত্মা আসিয়া দেখা দেয়, আঁধারে বা নির্জ্জনে থাকিলে মৃতের আত্মা আসিয়া ভয় দেখায়। হাঁই তুলিলে আত্মা মুখকোটরের নির্গমপথ পাইয়া হাওয়া খাইতে যায়; কখন বা মাছির রূপ ধারণ করিয়া মুখে প্রবেশ করে। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকগণের আত্মা টেবিল উল্টাইতে বড় ভালবাসে। থিয়সফিসম্প্রদায়ের অনেকের সহিত ভাল ভাল আত্মার ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব আছে। এইরূপ আত্মা যাঁহাদের, তাঁহারা মহাত্মা। এতাদৃশ আত্মার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছু নাই।

আত্মার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন। বিচারে যুক্তিমার্গই আমাদের আশ্রয়। সম্প্রদায়বিশেষের নিকট একটা শাস্ত্রবহির্ভূত নূতনতরো যুক্তির পন্থা শুনিতে পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার একবার উল্লেখ আবশ্যক।

ইহারা এইরূপ বলেন, দেহ ব্যতীত মানুষের আর কিছু নাই, এ বড় ভীষণ কল্পনা। দেহ ফুরাইলেই সব ফুরাইল মনে করিলে, দুঃখের দুঃসহতা ও মরণের বিভীষিকা আরও দুঃসহ ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যের পক্ষে সান্ত্বনা আর কিছুই থাকে না। অতএব যে বলে, দেহ ছাড়া আত্মা নাই, সে মনুষ্যজাতির শত্রু। আবার আত্মা অস্বীকার করিলে পাপের নিষেধক ও পুণ্যের উদ্বোধক বিশেষ কিছু থাকে না। এক রকমে দিন কয়টা কাটাইতে পারিলেই যেখানে ফাঁকি দেওয়া চলে, সেখানে পাপপুণ্য লইয়া হাঙ্গামা বড় চলে না। সুতরাং যে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে পামর ও পাপিষ্ঠ। মরিয়া গেলে সব ফুরাইবে, মন কি তাহা চায়? তোমার অন্তরাত্মা কি বলে?

এইরূপ বিচারপ্রণালী যুক্তির অপলাপ মাত্র। মৃত্যুর পর সব ফুরাইবে, স্বীকার করিতে ইচ্ছা না হইতে পারে; এবং সেরূপ স্বীকারে অসুবিধা বা মন্দ ফল ঘটিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার আমার ইচ্ছা দ্বারা জাগতিক

ব্যাপারের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া ঘোরতর দুঃসাহসের পরিচয়। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তোমার বাড়ী আজ ফলাহারে নিমন্ত্রণ হউক, এবং এই নিমন্ত্রণব্যাপারটা না ঘটিলে চাই কি জগদ্‌যন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। তথাপি তোমার যে সেরূপ সুবুদ্ধি ঘটিবেই, এমন নিশ্চয় কোথায় ? হায়, তাহা হইলে সংসার কি সুখের হইত !

দুর্ভাগ্যক্রমে সংসার তেমন সুখের নয়, এবং সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ ইচ্ছা-যুক্তির প্রয়োগে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা সর্ব্বথা আবশ্যক নহে। যাঁহারা আপন মত কোন না কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ যুক্তি অবলম্বন করিলেই পারেন। বলিলেই হইল, আমার মত অবলম্বন কর, নচেৎ—। এই শেষোক্ত আশুফলপ্রদ বিচার-প্রণালীও যে সময়ক্রমে যুক্তিবিশেষে ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নহে। যেহেতু, হিন্দুস্থানে অদ্যাপি পাঁচ কোটী মুসলমান।

আমরা অন্যরূপ বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিব, যাহা সুস্থ মানবপ্রকৃতি, প্রকৃতপ্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ ও সঙ্গত বিচারপদ্ধতি এই। একটা সত্য প্রতিপন্ন করিতে হইলে পূর্ব্বে প্রতিপাদিত আর একটা সত্যের আশ্রয় লইতে হয়। এই দ্বিতীয় প্রমাণ করিতে হইলে তৃতীয়ের আশ্রয় লইতে হয়। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটা এমন মূল সত্যে পৌছিতে হয়, যেখানে মনুষ্যের বিচারশক্তি প্রতিহত হইয়া যায় ; সেই মূলসত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহার আর অন্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিলে চলে না, এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও কাহারও আপত্তি দেখা যায় না। ফলে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম স্বতঃসিদ্ধ অন্যপ্রমাণ-রহিত সত্যে ঠেকিতে হয়। তবে স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা যত কম হয়, বিচারের পক্ষে ততই ভাল ; এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণ ততই তৃপ্তিলাভ করে। ফল কথা, যদি একটা কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে কোন একটা তথ্য নিরূপিত ও প্রতিপন্ন হয়, তবে দুইটা স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইবার দরকারও নাই, মানিলেও তৃপ্তি হয় না।

উদাহরণ, ইউক্লিড-সঙ্কলিত জ্যামিতি শাস্ত্রে। সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণোপ-রিস্থ বর্গক্ষেত্র যে বাহুদ্বয়োপরিস্থ বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান হইবে, এ কথা

এই প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হয়। এইরূপে প্রতিজ্ঞাপরম্পরা ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত এমন দুই একটি প্রতিজ্ঞায় ঠেকিতে হয়, যাহার প্রমাণ দরকার করে না; কেন না, সকলেই মানিয়া লয়, কাহারও আপত্তি নাই। সেইগুলি ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ। সেইগুলি মানিয়া লইলে আর সবই প্রমাণ হইতে পারে, এবং সেইগুলিরই প্রমাণাভাব এবং প্রমাণেরও অনাবশ্যকতা। তবে এমন যদি একটিমাত্র মূল তথ্য থাকে, যেটিকে মানিতে কাহারও আপত্তি নাই, এবং মানিলে ইউক্লিডের বারটি স্বতঃসিদ্ধ তাহা হইতে আসিয়া পড়ে, তবে সেইটাকেই তখন স্বতঃসিদ্ধ এবং মূল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এবং সেইরূপ মূল সত্যের আবিষ্কারে মনুষ্য-বুদ্ধির সর্ব্বদাই অব্যাহত অধিকার রহিয়াছে।

ইউক্লিডের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও কতকগুলি সংজ্ঞা লইয়া উপপত্তি আরম্ভ হইয়াছে। স্বতঃসিদ্ধ গুলি এক রকম সাধারণের আবিষ্কৃত; সংজ্ঞাগুলি ইউক্লিডের নিজের। দুই বস্তু প্রত্যেকে তৃতীয় বস্তুর সমান হইলে তাহারা পরস্পর সমান, ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ, ইউক্লিড্ এবং অন্য সকলেই তাহা মানিয়া লয়েন। বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মযুক্ত ক্ষেত্রের নাম বৃত্ত, ইহা একটি সংজ্ঞা। এটি ইউক্লিডের নিজ দত্ত। সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রকে বৃত্ত আখ্যা দিতে ইউক্লিড্ প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং তিনি যখন বৃত্ত শব্দের প্রয়োগ করিবেন, লোকে যেন সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রই বুঝে, এই অভিলাষ জানাইয়াছেন। অবশ্য তোমার ইচ্ছা হইলে সেইরূপ ক্ষেত্রকে বৃত্ত না বলিয়া উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডষ্টোন্,—এই আখ্যা দিতে পার; তাহাতে কিছু যায় আসে না; বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষে মিলিয়া বরাবর এক অর্থে এক শব্দ ব্যবহার করিলেই হইল। উভয়ের এই মনের মিলটুকু না থাকিলে একের অভিপ্রায় অন্যকে বুঝান যায় না। বিশেষ, ভাষার সাহায্যে। সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে এই প্রভেদ দাঁড়াইল যে, স্বতঃসিদ্ধটা তোমার মানিয়া লইতে আপত্তি নাই, এবং দৈনন্দিন কার্য্যে বস্তুতঃই মানিয়া থাক; আর সংজ্ঞাটা আমার প্রার্থনামতে গ্রাহ্য করিয়া লও। সংজ্ঞা কোন প্রাকৃত সত্য নহে, উহা কেবল ভাষার কায়দা ও বুঝাইবার সময় শ্রমসংক্ষেপের উপায়।

সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধের বিভেদ লইয়া এই গণ্ডগোল তুলিবার একটু দরকার আছে। অনেক সময় অনেক কথা বলিয়া ফেলা যায়, সেটা সংজ্ঞা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহা সহজে বুঝা যায় না। একটি উদাহরণ দিব। সমগ্র পদার্থ

করি, ইহা একটি সংজ্ঞা মাত্র। কেন না, অংশ শব্দের সংজ্ঞা অথবা সচরাচর গৃহীত অর্থ ই এই, যাহা সমগ্র পদার্থের হইতে ছোট। ‘সমগ্র’ ‘অংশ’ ও ‘বড়’ এই তিনটি শব্দের সংজ্ঞা হইতেই এই বাক্যটি আসিয়া পড়ে; ইহাকে আর স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিতে হয় না। ইংরাজি straight line এবং বাঙ্গলা ‘সরল রেখা’ উভয়ই সংজ্ঞাক্রমে একার্থবোধক; সুতরাং সরলরেখা মাত্রেই straight line, এটা একটা নূতন স্বতঃসিদ্ধ বা মূল সত্য হইল না; ইহা সেই সংজ্ঞা-নিহিত তত্ত্বই হইল। তেমনই, হাত পা শরীরের অংশ; এ কথা স্বতঃসিদ্ধ নহে; শরীর অর্থেই আমরা হাত-পা-সম্বলিত পদার্থবিশেষ বুঝি, সুতরাং এটা শরীরের সংজ্ঞাতেই নিহিত রহিয়াছে।

যাহা হউক, অনেক সময়ে নিজের আবিষ্কৃত ও নির্ব্বিবাদে সর্ব্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞাকে সর্ব্বজনের আবিষ্কৃত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, এইটাই এ স্থলে বক্তব্য।

জ্ঞান বড় শ্রেষ্ঠ জিনিষ, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের উপার্জ্জিত জ্ঞানই আবার অনেক সময়ে বুদ্ধিকে অন্ধীভূত রাখিয়া দেয়। আমরা যে সকল লম্বা লম্বা বাক্য সকল সময়ে প্রয়োগ করি, তাহার মধ্যে কতটুকু সত্য, কতটুকু হাতগড়া, সকল সময়ে তলাইয়া দেখি না। দার্শনিক বিচারে এই অসাবধানতা বড় প্রবল শত্রু।

সম্মুখে গাছ দেখিতেছি; সুতরাং ‘ঐখানে গাছ রহিয়াছে’, এ কথা পূরা সাহসের সহিত বলা যায় না। কেন না মরীচিকা, প্রতিবিম্ব, স্বপ্ন, মানসিক অস্বাস্থ্য বা বিকারে, অনেক সময় গাছের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে; অথচ সেখানে গাছ নাই। তবে ‘আমি গাছ দেখিতেছি’, এ কথা সকল সময়ে, সকল অবস্থা-তেই বোধ করি সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। স্বপ্নই হউক, আর বিকা-রই হউক, আমার যে ঐরূপ বোধ হইতেছে, ইহা একটা সত্য কথা; ঐ বোধটুকু বা জ্ঞানটুকু সত্য, উহাতে কাহারও আপত্তি সম্ভবে না। এবং বোধ হয়, এই বোধ বা অনুভূতি বা জ্ঞানকে সকলেই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বতঃসিদ্ধ-রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। ঐখানে গাছ আছে, ইহা সত্য না হইতেও পারে; কিন্তু আমার ঐরূপ প্রতীতি হইতেছে, ইহা ঠিক।

গাছ দেখিতেছি, ইহা ঠিক। কিন্তু ইহার ভিতরেও একটু গোল আছে। এত বড় কথাটা জোর করিয়া বলিতে পারি কি না বিচার্য্য। একটা কিছু বিশেষ রকম জ্ঞান জন্মিতেছে, এবং সেই জ্ঞানটির আমি নাম দিয়াছি ‘গাছ

দেখা', এই পর্য্যন্ত ঠিক। জ্ঞান একটা জন্মিতেছে, এইটুকু স্বতঃসিদ্ধ; গাছ দেখাটা তাহার, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের সংজ্ঞা। একটা জ্ঞান জন্মিতেছে এবং সেই জ্ঞানের একটা বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি, যদ্দ্বারা এই জ্ঞানকে অন্য জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লইতে পারি; এই পর্য্যন্ত আমার বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জ্ঞানের সংজ্ঞাটা আমার ইচ্ছা ও সুবিধার উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, জ্ঞানই যে জন্মিতেছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? সেই জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিব যে, ইহার প্রমাণ নাই; স্বীকার করিতে চাও, ত এই মূল স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে আর পাঁচটা কথা তুলিয়া তোমার সহিত কথাবার্ত্তা বিচার তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। আর ইহা যদি অস্বীকার কর, তবে এইখানে নিরস্ত হইতে হইবে। যুক্তি অবলম্বনে শেষ সীমায় একটা মূল সত্যে পৌছিতে হইবেই; আপনার জ্ঞানের অস্তিত্ব, সেই মূল সত্য। ইহা উল্‌টাইলে আর কিছু থাকিবে না, অথচ সকলেই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন।

তবেই স্বীকার্য্য, সম্প্রতি একটা বিশেষলক্ষণনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া আমি বলি 'গাছ দেখিতেছি'। সেইরূপ আরও বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞাযুক্ত বিবিধ জ্ঞান জন্মিতেছে। যথা, ঐ গাছ দেখিতেছি, ঐ বাড়ী দেখিতেছি, এই তোমাকে দেখিতেছি, ঐ শব্দ শুনিতেছি, এই গরম লাগিতেছে, এই চলিতেছি, নড়িতেছি, ইত্যাদি। অপিচ, হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, ভয়, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষুধা শীত অনুভব করিতেছি। এইরূপ কতকগুলা বিবিধ জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, অনুভূতি জন্মিতেছে, ইহা প্রথমতঃ স্বীকার্য্য।

আরও কিছু স্বীকার্য্য রহিয়াছে। কতকগুলি জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মিতেছে, কেবল তাহাই নহে। এই জ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধের অনুভূতিও জন্মিতেছে। অথবা এমন আর একটা অনুভূতি জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা সেই সমুদায়ের সম্বন্ধানুভব।

এই সম্বন্ধও যে ঠিক এক রকমই অনুভব করি, তাহা নহে। অনুভবের ভেদানুসারে এই সম্বন্ধেরও বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া থাকি।

এই বিবিধ জ্ঞানসমূহের মধ্যে যে নানাবিধ সম্বন্ধ অনুভব করি, তাহার

আমাতে বর্ত্তমান, এ কথাটিও স্বীকার্য্য। এই সাদৃশ্য ও ভেদ অনুসারে কতক-গুলি জ্ঞানের সংজ্ঞা দেখা, কতকগুলির সংজ্ঞা শোনা, কতকগুলির সংজ্ঞা ঘ্রাণ, কতকগুলির স্পর্শ। আবার দেখার মধ্যেও আবার ঐ অনুসারে লাল দেখা, নীল দেখা, ছোট দেখা, বড় দেখা, গোল দেখা, চেপ্‌টা দেখা ইত্যাদি আছে। এইরূপ অন্যান্য জ্ঞান ও অনুভূতির পক্ষেও। এইখানে এই কুকুর দেখিতেছি, ঐখানে ওই গোরু দেখিতেছি, এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জ্ঞানের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে, তাহার সংজ্ঞা দর্শন; এবং একটা ভেদ আছে, যাহার দরুণ এক-টার কুকুর, আর একটার গোরু, একটার এই, আর একটার ওই। ফলে আমার পাঁচটা পাঁচ রকম জ্ঞান ও অনুভূতি যেমন আছে, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধ ও ভেদ সম্বন্ধ নিরূপণরূপ আর একটা জ্ঞান বা অনুভূতিও আছে।

না থাকিলে কি হইত? যদি সকল জ্ঞানুই আমি একাকার দেখিতাম, যদি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছুই না বুঝিতাম, তাহা হইলে কি হইত। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ইচ্ছা, প্রীতি সব একাকার হইয়া, নীল পীত হরিত শ্বেত কৃষ্ণ আলো আঁধার, সব এক হইয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব দাঁড়াইত। মনে কর, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ভয় নাই, আনন্দ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, ঘ্রাণ নাই, স্পর্শ নাই, শ্রবণ নাই; কেবল আঁধার আর আঁধার আর আঁধার, অথবা আলো আর আলো আর আলো (সুতরাং আলোও নাই, আঁধারও নাই); এইরূপ একাকার অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে তফাত করা আমাদের অনুভবে আইসে না। অর্থাৎ, সকল জ্ঞান ও সকল অনুভূতি একাকার হইলে আমার জ্ঞানরাশি হয় ত থাকিত ও আমিও হয় ত থাকিতাম; কিন্তু আমার বা আমার জ্ঞানের অস্তিত্বনিরূপণের উপায় কিছু থাকিত না। যদি কিছু থাকিত, তাহা আমা-দের বর্ত্তমান বুদ্ধির, সুতরাং বিচারপ্রণালীর অতীত। ফলে, ঐরূপ অস্তিত্ব আর নাস্তিত্ব, একই রকম কথা।

আবার মনে কর, জ্ঞানে জ্ঞানে কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেক অনুভূতিই অপর অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে বিসদৃশ। একটাকে আর দ্বিতীয় বার পাওয়া যায় না। কোন মিল নাই, সুতরাং কাহাকেও চিনিয়া লইবার উপায় নাই, কাহারও অস্তিত্ব ঠাহর করিবার যো নাই। সংজ্ঞামাত্র অসম্ভব, পরিচয়মাত্র অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। এরূপ ক্ষেত্রেও অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বে ভেদ করিবার শক্তি আমাদের থাকিত না।

এইখানে একটু সাবধান হইতে হইবে। পথ এমনই পিচ্ছিল যে, পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। 'গাছ দেখিতেছি' বলিলে একটা বিশেষ লক্ষণযুক্ত জ্ঞানের অস্তিত্বই প্রমাণ করে, জ্ঞানের বাহিরে একটা তাহার কারণভূত পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন করে না। আর এই টুকু প্রমাণ করে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপই এক একটা জ্ঞান জন্মিয়াছিল, যাহার যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ও মিলাইয়া এই বর্ত্তমান জ্ঞানটাকেও তৎসদৃশ ঠাহর করিতেছি ও সেই সেই জ্ঞানকে ও বর্ত্তমান জ্ঞানকে সজাতীয় অনুভব করিয়া একটা বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত স্থির করিয়া 'গাছ দেখা' এই সংজ্ঞা দিতেছি। আর একটু উঠা যাউক। 'গাছ দেখিতেছি' বলিলে যেমন জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের বাহিরে গাছ নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন হইল না, সেইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানে বা অনুভবে অনুভবে সাদৃশ্য দেখিতেছি বা ভেদ বোধ করিতেছি, তাহাতে আমারই সেই সাদৃশ্য সংজ্ঞ অনুভব ও ভেদ সংজ্ঞ অনুভবেরই অস্তিত্ব প্রমাণ হইল, বস্তুতঃই যে আমার অনুভূতি ছাড়াইয়া জ্ঞানে জ্ঞানে মিল আছে, ও অনুভূতিতে অনুভূতিতে ভেদ আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইল না। সেটা আমি বোধ করি ও ধরিয়া লই; এবং সেইরূপ ধরিয়া লওয়াতেই আমার নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া আমার অনুভূতি ছাড়িয়া, তাহার বাহিরে এমনইতর একটা কিছু আছে, এইরূপ বলিলে, এইরূপ কল্পনা করিলে আমার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই আছে, এ কথা জোর করিয়া বলিবার আমার কোন অধিকার নাই।

কত দূরে দাঁড়াইল, দেখা যাউক। কতকগুলি জ্ঞান আছে, ও তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য-ভেদ-সম্বন্ধ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট একটা প্রতীতি আছে। এই পর্য্যন্তের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য, অন্যথা বিচার চলে না ও কিছুই থাকে না। ইহার অধিক অস্তিত্ব স্বীকারের সম্প্রতি দরকার নাই। এই যে সাদৃশ্য ও ভেদ সম্বন্ধের প্রতীতি জন্মে, ইহা লইয়াই, অথবা ইহার অপর সংজ্ঞাই, জ্ঞানের প্রবাহ বা চৈতন্যের ধারা। এই প্রতীতি আছে, তাই যাহাকে চৈতন্য বলি, তাহা আছে, এই প্রতীতি না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারিত, কিন্তু সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আমরা জানিতাম না, অর্থাৎ চৈতন্য থাকিত না। গাঢ় স্বপ্নহীন সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞান আমাদের থাকিতে পারে,—অথবা থাকিতে না পারে; কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব তখন বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ চৈতন্য থাকে না।

বর্ত্তমান জ্ঞানকে আর পাঁচটা জ্ঞানের সদৃশ অথবা বিসদৃশ বলিয়া বুঝিয়া লই; জ্ঞানসমূহের একটা ধারাবাহিকতা অনুভব করি। এবং আমি বলিতে চাহি যে, এই পরস্পর-কিয়দংশে-সদৃশ ও কিয়দংশে-বিসদৃশ—রূপে—প্রতীত এই জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি, তাহারই নাম অথবা অভিধান, অথবা সংজ্ঞাই আত্মা অথবা আমি।

এই অর্থে আমি আছি ও আমার আত্মা আছে। ইহা স্বীকার্য্য। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্য কোন অর্থে আত্মা আছে কি না, ক্রমে দেখা যাইবে। এবং এই অর্থযুক্ত আত্মা ছাড়িয়া আর কিছু কোথাও আছে কি না, তাহাও দেখা যাইবে। মূল যে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণনিরপেক্ষ প্রমাণাতীত সত্য স্বীকার করিয়া লওয়া গেল, তাহার অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক কি না, অথবা এই কয়েকটি মূল স্বতঃসিদ্ধের সহিত কতকগুলি হাতগড়া সংজ্ঞা যোগ করিলেই বিশ্বজগতের প্রহেলিকাটা এক রকম বুঝা যাইতে পারে কি না, তাহাও ক্রমে দেখা যাইবে।

সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির কথা বলিয়াছি। এই সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি নানাবিধ ও নানাকার। যেমন দৃষ্টিজ্ঞান ও আকৃতিজ্ঞান। বর্ণজ্ঞানের ভিতর আবার নীলজ্ঞান, পীতজ্ঞান ইত্যাদি। আকৃতির মধ্যে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ত, বর্ত্তুল ইত্যাদি। এই সাদা কুকুরটা ও এই সাদা গোরুটা, এই দুই জ্ঞানের মধ্যে সহস্র বিভেদ সত্ত্বেও একটা সাদৃশ্য বুঝি, উভয়েই শাদা, উভয়েরই চারি চারি পা ও দুই দুই কাণ ইত্যাদি। কুকুর ও গোরু দুইই যেমন আমার ভিতরে, আমারই অংশ, সেইরূপ উহাদের বর্ণ, উহাদের আকৃতি, উহাদের সমুদয় লক্ষণই আমার ভিতরে, ও আমারই অংশ।

জ্ঞানসমূহের মধ্যে একটা বড় রহস্যময় সম্বাদ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। এই সম্মুখে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই কুকুরই আবার পার্শ্বে আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্শ্বে দেখিতেছি, এই দুইটি পৃথক্ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এটাও কুকুর দেখা, ওটাও কুকুর দেখা, এবং এই কুকুর দেখায় ও ওই কুকুর দেখায় অন্য কোন পার্থক্য অনুভব করিতেছি না। কেবল একটা মাত্র পার্থক্য অনুভব করিতেছি; সেই পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছি স্থানগত বা দেশগত ভেদ। জ্ঞান দুইটা প্রায় অনুরূপ, কেবল এই একটামাত্র ভেদবোধ জন্মিতেছে, এই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক; তাই দেশ, স্থান, বা অবস্থিতি তাহার সংজ্ঞা। তাই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে,

দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, অধে, দূরে, সমীপে, ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা আমরা বিভিন্ন জ্ঞানের একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি ; যেমন বর্ণবুদ্ধি, শ্রুতিবুদ্ধি, ঘ্রাণবুদ্ধি আমার অন্তর্গত, এই দেশবুদ্ধিও সেই হিসাবে আমার অন্তর্গত।

দেশের পর কাল। এক্ষণে যে কুকুর সম্মুখে দেখিতেছি, কল্য সেই কুকুর সেই স্থানে দেখিয়াছিলাম। এস্থলেও এই দুইটা কুকুরদর্শনরূপ জ্ঞানের মধ্যে অন্য কোন বিভেদ না দেখি, অন্ততঃ একটা বিভেদ দেখিতেছি, সেই বিভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক। সেই সংজ্ঞা কালগত বিভেদ। প্রথম জ্ঞানটা আর যে যে জ্ঞানের সহকারে আসিয়াছিল, দ্বিতীয়টা ঠিক্ সেই সেই জ্ঞানের সহকারে আসে নাই। প্রথম কুকুর দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে রামকে দেখিয়াছিলাম, হরিকে দেখিয়াছিলাম, নবীনকে দেখিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার কিন্তু গদাধর ও বনমালীকে দেখিতেছি। এই যে বিভেদ, ইহাই কালগত বিভেদ। দেশবুদ্ধির ন্যায় কালবুদ্ধিও আমার চৈতন্যের উপাধি, আমার আত্মার উপাদান বা অংশ। এবং এই কালবুদ্ধির বিশেষরূপ সূক্ষ্মতার অপর নাম স্মৃতি।

পাঁচ রকম বোধ আছে, পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। যথা বর্ণবোধ, আকৃতিবোধ, শ্রুতিবোধ, স্বাদবোধ, ঘ্রাণবোধ। তেমনি দেশবোধ ও কালবোধ। শেষ দুইটিকে অন্যান্য বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ ও ভিন্নজাতীয় স্থির করিয়া একটা বিকট রহস্যের সৃজন করিবার সম্যক কারণ দেখি না।

হাত পা মাথা বক্ষ উদর ইত্যাদির সমষ্টিতে শরীর। হাতও শরীর নহে, পাও শরীর নহে, একতঃ তাহারা সমগ্র শরীরের অংশমাত্র ; তবে সকলকে জড়াইয়া সকলের সমষ্টিতে শরীর। হাত পা হইতে পৃথক্, মাথা উদর হইতে পৃথক্, শ্বাসযন্ত্র হৃৎপিণ্ড হইতে পৃথক্, অথচ উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটার কাজ বন্ধ হইলে অনেক সময়ে অন্যের কাজ বন্ধ হয়, একটায় আঘাত লাগিলে অনেক সময়ে অন্যে আঘাত পায়। এইরূপ পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত অবয়ব-সমষ্টিকে শরীর বলা যায়। সেইরূপ দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ দেশ কাল ভয় ক্ষুধা লালসা প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞান ও অনুভূতি জড়াইয়া যে সমষ্টি হয়, তাহাই আমি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা এমন সম্বন্ধ দেখিতে পাই, যাহাতে একটার সহিত আর একটার মিল আছে, একটা হইতে আর একটা বাহির হইয়াছে, একটা হইতে আর একটা উৎপন্ন হইয়াছে। সাপ দেখিলাম, ভয় পাইলাম, পলায়নপর হইলাম, এস্থলে এই তিনটার কালগত সম্বন্ধ এইরূপ

সংজ্ঞাযুক্ত চৈতন্যের একটা অঙ্গ পঞ্চাশটা অনুভূতিকে এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়াইয়া রাখে যে, একটাকে ছাড়িয়া আর একটার উৎপত্তি হয় না। এইরূপ জ্ঞান ও অনুভূতির সম্বন্ধ বুঝি বলিয়াই, এইরূপ সম্বন্ধের বিষয়ে একটা জ্ঞান আছে বলিয়াই, সেই জ্ঞানের প্রবাহ ও অনুভূতির ধারার উল্লেখ করিতে পারিতেছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি ও অনুভূতিগুলি যে প্রবাহ মধ্যে এক একটি উর্ম্মি বা কণিকামাত্র। সংহতি বা যোগাকর্ষণে আবদ্ধ বিন্দু বিন্দু জলকণা সমষ্টীকৃত করিয়া যেমন জলস্রোত, পরস্পর গাঢ় সম্বন্ধে গ্রথিত ও আবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্য-কণা সমষ্টীকৃত করিয়া তেমনই আত্মার প্রবাহ। এইরূপেই আত্মার উৎপত্তি, ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থে আত্মা থাকিতে পারে কি না, জানি না।

এইখানে একটা উৎকট প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা। আমরা সচরাচর ভাষায় সুখ আমার, দুঃখ আমার, জ্ঞান আমার, স্মৃতি আমার, ইচ্ছা আমার ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিয়া এমন একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, যাহা সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা হইতে ভিন্ন; অথচ জ্ঞান স্মৃতি ইচ্ছা সুখ দুঃখ যাহার সম্পত্তি মাত্র। সাধারণ হিসাবে এই যে একটা কিছু, ইহারই নাম আত্মা। অর্থাৎ মনুষ্যে আত্মা বলিয়া যে পদার্থ আছে, সেই জ্ঞাতা, সেই ইচ্ছাশালী, সেই ভোগী; জ্ঞান, ইচ্ছা, ভোগ, তাহারই ক্রিয়া, অথবা আভরণ, অথবা অলঙ্কার-স্বরূপ। উভয় মতে প্রভেদ, কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। উপরে আমরা আত্মার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে আত্মার সহিত অনুভূতির সম্বন্ধ, কতকটা দেহের সহিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধের মত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমষ্টি করিয়াই দেহ। কিন্তু প্রচলিত মত অনুসারে আত্মার সহিত অনুভূতি, জ্ঞান, চেষ্টা, প্রভৃতির সম্বন্ধ, কতকটা দেহের সহিত বসনভূষণ অলঙ্কারের মত। বসনভূষণ অলঙ্কার সমুদয় ত্যাগ করিলেও যেমন দেহ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াও আত্মা বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

এক কথায় প্রশ্নটি এই, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, ভোগ থাকিলেই ভোগী থাকিবে। এই জ্ঞাতা ও এই ভোগী যে, সেই আত্মা। শুধু জ্ঞানসমষ্টি বা ভোগসমষ্টিকে আত্মা বলিলে, চলিবে না; জ্ঞান ও ভোগের অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা চাই।

জ্ঞান আছে, সুতরাং জ্ঞাতা আছে। প্রশ্নটা বড়ই দুরূহ। কিন্তু রাম নামে যেমন ভূত আপনার বিভীষিকাময়ী কায়া সঙ্কুচিত করিয়া লীন ও অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ যুক্তির মন্ত্রপূত দণ্ডস্পর্শে এই প্রশ্নের উৎকটতা লয় পায়।

জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, কে বলিল? আমাদের এইরূপ একটা সংস্কার বা ধারণা বা কল্পনা আছে বটে; কিন্তু সেই সংস্কার ও কল্পনার সত্যতা-কেই যেখানে বিচারের বিষয় করিয়া নামাইতেছি, তখন তাহার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ কি আছে? যাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহাকে সত্য অথবা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গোড়ায় ধরিলে চলিবে না।

ফলে আমরা যে একটা ভোক্তার ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব সচরাচর মানিয়া লই, সে কতকটা ভাষার কায়দা, আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের দৈনন্দিন কার-বার চালাইবার জন্য, আমাদের মানসিক শ্রমসংক্ষেপের জন্য, আমাদেরই একটা কল্পনা মাত্র। ভাষায় যত শব্দ বর্ত্তমান আছে, সকলেরই জন্য একটা পৃথক্ অস্তিত্ব নির্ম্মাণ করিতে হইলে যুক্তির চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। আকাশকুসুম কল্পনাতেই আছে।

'আমি গাছ দেখিতেছি' না বলিয়া যদি দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্য্য ও সত্য-নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা বলিতে হয়, 'আমার এমন একটা জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, যাহার সদৃশ জ্ঞান পূর্ব্বে পূর্ব্বেও জন্মিয়াছিল বলিয়া, আমার অনুভূতি ও স্মৃতি সাক্ষ্য দিতেছে, এবং যাহাকে আমি 'গাছ দেখা' এই সংজ্ঞা দিয়া থাকি'; তাহা হইলে দার্শনিকত্ব বজায় থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনযাত্রা তুমুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে সঙ্কেতে ও ইসারায় আমাকে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জীবনপথে চলিতে হইবে, সেখানে সঙ্কেতটা প্রয়োগের ব্যবহারের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছে কি না, এই খুঁটিনাটি আরম্ভ করিলে কার্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শত্রু সম্মুখীন হইলে ভোঁতা তরবারিও ব্যবহার করিতে হয়।

তবে দার্শনিক, শত্রুসংহার যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, ধারালো হাতিয়ার-নির্ম্মাণই যাঁহার ব্যবসায়, তিনি ইস্পাত লইয়া ও শাণ লইয়া খুঁটিনাটি করিতে ছাড়িবেন না। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের বিশুদ্ধি পরীক্ষার অবকাশ পায় না। কিন্তু রাসায়-নিক পরীক্ষকের হস্তে পরীক্ষাকালে বিশুদ্ধ জলেরও এমন শোচনীয় পরিণাম হয়, যাহাতে তাহার আর জলত্ব থাকে না। আমরা সংসারযাত্রায় অবলীলাক্রমে 'আমি' 'আমরা' প্রভৃতি উত্তমপুরুষ-বাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাই, দার্শনিক সম্মুখে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, 'অহো উত্তমপুরুষ, এত অহং অহং অহঙ্কার ত্যাগ কর; এত বাক্চাতুরী প্রগল্‌ভতা আমার সমক্ষে নহে।' তবে নৈয়ায়িকের বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রশংসার্হ হয় না।

চাতুরীমাত্র; বিকাশিত অবস্থায় জ্ঞানসমষ্টিরই একটা জিম্‌নাষ্টিক্, ব্যায়াম বা প্রকাণ্ড কারিগরি মাত্র।

এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিলে, পাঠকবর্গ বোধ করি, পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু আরও দুই একটা কথা আছে।

'আমি' শব্দের অর্থ কি উপরে বলিলাম। এই অর্থ বাহাল রাখিয়া 'আমি' শব্দের প্রয়োগ করিলে পাঠক ক্ষুব্ধ হইবেন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞানসমুদয়ের সাদৃশ্য ও ভেদ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এইটুকু দেখিতে না পাইলে আমার 'আমিত্ব জ্ঞান' বা আত্মার অহঙ্কার জন্মিত না। তবে এই দর্শনশক্তি যে সকলেরই সমান পরিমাণে আছে, এমন নহে। নিউ-টনের যেমন ছিল, আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের তাহা নাই; আবার সাধারণ সুস্থ মানুষের যেমন আছে, একজন বাতুলের বা একটা ইতর জীবের তেমন নাই। কতকটা সকলেরই আছে, অথবা কতকটা যাহার আছে, সেই 'আমি-জ্ঞান'-বিশিষ্ট চেতন জীব। এই সাদৃশ্য ও ভেদবুদ্ধির মাত্রা ও পরিমাণ লইয়া জ্ঞানের ও অহঙ্কারের ও আত্মার বিকাশ। এই মূল কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে।

বর্ণভেদ, শব্দভেদ, স্বাদভেদ প্রভৃতি ছাড়া আর দুইটা প্রকাণ্ড ভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, দেশভেদ ও কালভেদ। আমার আত্মার অন্তর্গত যে সকল খণ্ডে, আমার জ্ঞানসমষ্টির মধ্যে যে কয়েকটি খণ্ডজ্ঞানে, দেশভেদের উপলব্ধি করি, সেই খণ্ডগুলি জড়াইয়া আমার সুবিধামত একটা প্রকাণ্ড বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে একটা প্রকাণ্ড সংজ্ঞা দিয়াছি। এবং সেই প্রকাণ্ড বস্তুটাকে কোন মতে আমার আত্মার অবশিষ্টাংশ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া আলাহিদা ভাবে অনুভূতির বিষয় করিয়া লইয়াছি। এই প্রকাণ্ড বস্তুর প্রকাণ্ড সংজ্ঞা বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ।

আত্মার এই অংশটা ছাড়িয়া সুখ দুঃখ, ভয় প্রীতি, ইচ্ছা চেষ্টা, বুদ্ধি ভাবনা ইত্যাদি লইয়া যে অংশটা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সংজ্ঞা দিয়াছি মনোজগৎ বা অন্তর্জগৎ।

এই মনোজগতের খণ্ডগুলির মধ্যে কালগত ভেদ দেখা যায়, তবে ইহাদের দেশগত ভেদ বুঝিতে পারি না। সুতরাং এই লক্ষণ বা পরিচয় দ্বারা জড়জগৎ ও মনোজগতের সংজ্ঞা দিতে পারা যায়।

এই বাহ্যজগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানসমূহে আমরা দেশভেদ উপলব্ধি করিয়া থাকি,

ভেদ, আকৃতিভেদ, দূরত্বভেদ লইয়া 'গতি'। বাহ্যজগতের একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অংশের নাম আমার জড় শরীর। এই জড় শরীরের সহিত অবশিষ্ট জড় জগতের সম্বন্ধ ও স্পর্শে 'শক্তি'। শরীর হইতে বাহিরে অথবা বাহির হইতে শরীরে শক্তিসমাগমে, অন্তর্জগতে স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, শ্রবণ ও দর্শন। এবং এই স্বাদ ঘ্রাণ স্পর্শ শ্রবণ দর্শন হইতে অন্তর্জগতের অন্তর্গত অন্যান্য মনোবৃত্তি। শক্তির সহিত অবস্থিতি বা দূরতার সম্বন্ধে 'বল'। গতির কালগত ভেদে 'বেগ'। বেগের কালগত ভেদের সহিত বলের সম্বন্ধে জড় পদার্থের পরিমাণ, ইংরাজিতে যাহাকে 'mass' বা quantity of matter বলে। গতি এবং স্থিতি দ্বারা জড় জগতের খণ্ডগুলির সম্বন্ধনির্ণয় জড় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিষয়। এইগুলি সংজ্ঞামাত্র। ইহাদের যাথার্থ্যের প্রমাণ আনিবার দরকার নাই। *

বাহ্যজগৎ কতকগুলি খণ্ডজ্ঞানের সমষ্টি। সেই খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে নানাবিধ সাদৃশ্য সম্বন্ধ অনুভব করি। সেই অনুভব হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি। সাদৃশ্য নানাবিধ, সম্বন্ধ নানাবিধ। 'ক' ও 'খ' উভয়ে একটা সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে 'গ'; 'চ' ও 'ছ' উভয়ের মধ্যে আর একটি সম্বন্ধ আছে 'জ'; আবার 'গ' ও 'জ' এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে, সেটা 'হ'। এইরূপে সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ মিলাইয়া একটা নূতন সম্বন্ধ অনুভব করি; আবার তাহার সহিত আর একটা সম্বন্ধ মিলাইয়া আর একটা সম্বন্ধ অনুভব করি। এই নূতন নূতন সম্বন্ধ-অনুভবেই আত্মার বিকাশ বা অভিব্যক্তি; ইহাতেই জ্ঞানের ও চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি। এই নূতন নূতন সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাহাদের সংক্ষেপে সংজ্ঞা দিই। সেই সংজ্ঞাগুলি 'প্রাকৃতিক নিয়ম'। আমি সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারি বলিয়াই প্রাকৃতিক নিয়মের আমা হইতে উৎপত্তি। এই অনুভব না থাকিলে, প্রাকৃতিক নিয়ম হইত না, অথবা প্রকৃতিতে কোন নিয়ম দেখিতাম না। এই অনুভূতি যত তীক্ষ্ণ ও প্রবল হয়, ততই বাহ্য প্রকৃতিকে নিয়মানুগত দেখি। ফলে প্রকৃতিতে নিয়ম বর্ত্তমান আছে, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না; প্রকৃতিতে নিয়ম আমি দেখিতে পাই, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। এবং ইহাও স্বীকার্য্য, সম্প্রতি আমার চৈতন্যের যে অবস্থা, তাহাতে আমি প্রকৃতির খানিকটা নিয়মানুগত দেখি, আর খানিকটা অনিয়ত খাপ্-ছাড়া বোধ হয়। যে অবস্থায় নিয়মবন্ধের ভাগ বাড়িয়া আইসে, ও খাপ্-ছাড়ার ভাগ

---

* 'গতি' 'বেগ' 'বল' 'শক্তি' প্রভৃতি শব্দগুলি আধুনিক পদার্থবিদ্যা বা জড় বিজ্ঞান-

কমিয়া আইসে, সে অবস্থাকে আত্মার উন্নতি বা অভিব্যক্তি বলা যায়। স্থানান্তরে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

এইরূপ সাদৃশ্য অনুভবে বা নিয়ম স্বীকারে একটা লাভ আছে, দেখা যায়। যখন এই সাদৃশ্য অনুভবেই আত্মবোধ বা অহংকার, তখন এই সাদৃশ্যানুভূতির সূক্ষ্মতায় আত্মবিকাশ বুঝিতে হইবে। আমার মনের একটা কাজ অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের আদানপ্রদান। অন্তর্জগৎ বাহ্যজগৎ হইতে আপন পুষ্টিসাধন করিতেছে, আবার সময়ে সময়ে বাহ্যজগতের আক্রমণে পরাহত ও ক্ষীণ হইতেছে। উভয় জগতের আদানপ্রদান কার্য্যটার নাম মানসিক শ্রম। প্রকৃতিতে যতই নিয়মের আবিষ্কার করা যায়, যতই সঙ্কীর্ণ নিয়ম হইতে প্রশস্ততর নিয়মে আসা যায়, মানসিক শ্রমের ততই সংক্ষেপসাধন হয়। এবং এই মানসিক শ্রমসংক্ষেপেই বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের লেনা-দেনা শৃঙ্খলার সহিত ঘটিয়া থাকে। বক্তার বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যেমন প্রচলিত লিপিবিদ্যায় পোষায় না, আরও সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক short hand চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়; সেইরূপ প্রকৃতির বড় বড় জটিল সম্বন্ধগুলি যত সংক্ষিপ্ত অথচ প্রশস্ত সংজ্ঞার ভিতর ফেলিতে পারা যায়, ততই জীবনের চেষ্টা ফলবতী হইয়া থাকে। ফলে মানসিক শ্রমসংক্ষেপের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতিতে নিয়মের আবিষ্কার।

এই পর্য্যন্ত যে সকল জটিল কথার অবতারণা হইয়াছে, তাহার একবার সংক্ষেপে আলোচনা আবশ্যক। আমরা দুইটি স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিয়াছি, (১) জ্ঞান, অনুভূতি প্রভৃতির অস্তিত্ব; (২) তাহাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্যবোধের ও ভেদবোধের অস্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞানের বাহিরে এইরূপ কোন সাদৃশ্য বা ভেদ আছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই, দরকারও নাই। এই সাদৃশ্যবোধ ও ভেদবোধ দ্বারা অনুভূতিগুলিকে একটা বিশেষ প্রণালীমতে সাজাইয়া লই; এবং এইরূপে সজ্জিত সমষ্টিকে আত্মা অভিধান দিই। যাহাকে আত্মা বলি, তাহার প্রধান পরিচয়ই এই যে, সে অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত খণ্ডজ্ঞানগুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ চিনিয়া লইতে পারে, ও আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে। আত্মার এই সংজ্ঞা। অন্যান্য ভেদের মধ্যে দুইটা বিভেদের একটু বিশেষত্ব আছে—দেশভেদ ও কালভেদ। এই দেশগত ভেদ ও কালগত ভেদ অনুসারে আত্মা সমু-

দেখিতে পায়, তাহাকে বাহ্যজগৎ বা বহিঃপ্রকৃতি বা জড় প্রকৃতি নাম দিয়া, এবং অবশিষ্ট ভাগকে অন্তর্জগৎ অভিধান দিয়া, উভয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করে। বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের কতকগুলি সম্বন্ধ দেখা যায়। তাহাদের অনুভূতির সংজ্ঞা রূপ রস শব্দাদি। অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের কারবার একটা বিশেষ পদ্ধতির সহিত চালাইলে জীবনরক্ষা সুকর হয়। মানসিক শ্রমসংক্ষেপ সেই পদ্ধতি। এবং বাহ্যজগতে নিয়মের আবিষ্কারে মানসিক শ্রমের সংক্ষেপ। সেইজন্য আমরা বাহ্যজগৎ নিয়মানুযায়ী করিয়া লই।

আত্মা অবিনাশী কি ধ্বংসশীল, এক্ষণে কতকটা বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ এই বাক্যটার অর্থগ্রহের চেষ্টা করা যাক্। আত্মার ধ্বংস আছে বলিলে বুঝায় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে আত্মার আত্মত্ব লোপ হয়; অর্থাৎ, সেই ক্ষণের পূর্ব্বে আত্মা ছিল, তাহার পর আত্মা থাকে না। সেইরূপ, আত্মার ধ্বংস নাই বলিলে বুঝায়, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পূর্ব্বে দেহ ছিল, তদাশ্রয়ে আত্মা ছিল, সেই ক্ষণের পরে দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মা থাকিয়া যায়। যাঁহারা আত্মার ধ্বংস স্বীকার করেন ও যাঁহারা করেন না, এই উভয় পক্ষই কালরূপ একটা আত্মেতর সত্তা মানিয়া লয়েন; কালনামে একটা সত্তা অনাদি ও অনন্ত; আত্মা এক পক্ষের মতে তাহার কিয়দংশ, অন্যপক্ষের মতে তাহার সমগ্র ভাগ, ব্যাপিয়া রহিয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত যে অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কাল তাহার একটা বিভূতি বা উপাধি মাত্র। পাঁচটা ভেদবুদ্ধি লইয়া আত্মা; কালবুদ্ধি তন্মধ্যে একটা। আত্মা আপনার অন্তর্গত অনুভূতিগুলিকে প্রধানতঃ দুই রকমে সজ্জিত করিয়া নিরীক্ষণ করে বা চিনিয়া লয়; কাল সেই দুইএর মধ্যে অন্যতর সজ্জা। কাল আত্মার আত্মনিরীক্ষণের একটা প্রণালীমাত্র। কালবুদ্ধি না থাকিলে জ্ঞানগুলি এক রকমে পরস্পর জড়াইয়া যাইত, আর তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইত না, সুতরাং আত্মারও অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। এই হিসাবে ও এই অর্থে, আত্মা ছাড়িয়া কাল নাই, আত্মার ধ্বংস হইবে অমুক সময়ে, অথবা আত্মার ধ্বংস হইবে না কোন সময়ে, এরূপ বাক্যের অর্থ হয় না।

আত্মার অস্তিত্ব এই অর্থে স্বীকার্য্য; কিন্তু আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন অর্থশূন্য।

যাঁহারা জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা ও ভোগাতিরিক্ত ভোক্তা, এইরূপ কোন একটা অর্থে আত্মা শব্দের ব্যবহার করেন, এবং জ্ঞান আছে ও ভোগ আছে,

সুতরাং জ্ঞাতা ও ভোক্তা নিশ্চয়ই থাকিবে, এইরূপে সেই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী কতকটা বিপর্য্যস্ত। জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাতা আমাদের অনুমান বা কল্পনামাত্র, তাহা কোনরূপ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তবে যদি কেহ গায়ের জোরে বলেন, জ্ঞান ও ভোগের অতিরিক্ত ও জ্ঞাতা ও ভোক্তা একটা কিছু স্বতন্ত্র বর্ত্তমান আছে,-তাঁহাদের সেই উক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু প্রমাণ নাই। সেরূপ একটা কিছু থাকিতে পারে; তবে আমরা তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

সাংখ্যদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি নামধেয় দুইটা জ্ঞানাতীত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; তবে পুরুষের সহিত যখন প্রকৃতির এক-রূপ সাক্ষাৎকার, মিলন বা সংযোগ ঘটে, তখনই জ্ঞান অনুভূতি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। তখনই প্রকৃতি পুরুষের নিকট রূপরসগন্ধাদি লইয়া বাহ্যজগৎ-রূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় কয়েকটি গভীর চিন্তাপূর্ণ মনোহর প্রবন্ধে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে ঋণবদ্ধ করিয়াছেন। ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র ধীরে ধীরে এই সাংখ্যদর্শনোক্ত মহিমাময় তত্ত্বের নিকট ক্রমে উপস্থিত হইতেছে। সাংখ্যদর্শন দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন, ও তাহাদের সংযোগে জগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মধ্যে অনেকে দুইটি স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মূল সৎপদার্থ একটি; তবে একটিরই দুইটা মূর্ত্তি। একটি বক্র রেখার যেমন একপার্শ্ব কুব্জ ও অপর পার্শ্ব ন্যুব্জ, সেইরূপ সেই একমাত্র জ্ঞানাতীত বা অজ্ঞেয় সৎপদার্থের একটা পার্শ্ব অন্তর্জগৎ, অন্য পার্শ্ব জড়জগৎ। একদিক্ পুরুষ, অন্যদিক্ প্রকৃতি। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বোধ করি এই সংবাদের আধুনিক নেতা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অনুবর্ত্তী, এবং এইরূপ দ্বৈতবাদের প্রচারক। সাংখ্যমতের সহিত ইহার প্রভেদ আছে সত্য, এবং সে প্রভেদও নিতান্ত সামান্য নহে, স্বীকার করি। তবে সাংখ্যদর্শন যেমন পুরুষ হইতে প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন, ইহারাও তেমনি অন্ত-র্জগৎ হইতে জড়জগতের স্বাধীনতা মানিয়া থাকেন। কোন্ মত সমীচীন, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। জ্ঞানাতীত পুরুষ এবং প্রকৃতি, অথবা জ্ঞানাতীত অন্তর্জগৎ ও জড়জগৎ স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া জাগ-

একটা স্বতঃসিদ্ধ লইয়া চলে, তবে দুইটার প্রয়োজন কি? যদি একটা সত্তা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডটা কোন রকমে গড়িতে পারা যায়, তবে দুইটার আবশ্যক কি? মানবজাতির স্বীকৃত যুক্তিপ্রণালী এইরূপ ব্যবহারের বিরোধী।

হিন্দু মধ্যে বৈদান্তিক এবং পাশ্চাত্যগণ মধ্যে বার্কলি প্রভৃতি একটামাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জগৎব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। সেইটাই বোধ করি তাঁহাদের মতে 'আত্মা'। অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের মতে তাহা চিৎপদার্থ; mind stuff। এই প্রবন্ধে তাহা জ্ঞান বা অনুভূতি; ইহাকে চিৎপদার্থ বল, ক্ষতি নাই। এই চিৎপদার্থের সমষ্টিতে আত্মা। জড়জগৎ, সাংখ্যমতে যাহা প্রকৃতি, তাহা আত্মারই একটা অংশমাত্র। প্রকৃতিতে যে রূপরসাদি, সে আত্মারই একটা কারিগরি; প্রকৃতিতে যে নিয়মের প্রচার, তাহা আত্মারই খেলা। দুইটা ধরিলে যেমন সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয়, একটাতেও ঠিক্ সেইরূপই হয়। তবে একটা ছাড়িয়া দুইটা ধরিব কেন? হইতে পারে ইহা নাস্তিবাদ *; নামে অথবা দুর্নামে ভয় পাইবার প্রয়োজন দেখি না। সাংখ্যমতে দুই পদার্থ বিদ্যমান; প্রকৃতি ও পুরুষ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য। উভয়ের সম্মিলনবশে জ্ঞানের উৎপত্তি, রূপরসাদির উৎপত্তি, জগতের সৃষ্টি বা উদ্ভব। জ্ঞান রূপরসাদি, বা জগৎ স্বতঃপরীক্ষিত; ইহাকে বুঝিবার জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, নতুবা ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ, জ্ঞানাতীত, জ্ঞানের সীমার অতিক্রান্ত। প্রকৃতি ও পুরুষ, অথবা অজ্ঞেয় জড় ও অজ্ঞেয় আত্মা বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান প্রস্তাবানুসারে, জ্ঞানই সত্য পদার্থ; বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন, বিভক্ত, দেশ, কালে সজ্জিত, জ্ঞানই সত্য পদার্থ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সেই জ্ঞানের দুইটা ভাগ বা দুইটা সজ্জার সংজ্ঞা বা অভিধান মাত্র। এক ভাগের অভিধান আত্মা, অন্য ভাগের অভিধান জড়। জ্ঞানাতীত আত্মা ও জ্ঞানাতীত জড় জ্ঞানেরই খেলা, বা কল্পনা বা সৃষ্টি। আত্মার ধ্বংস আছে কি নাই, জড়ের ধ্বংস আছে কি নাই, এই প্রশ্ন অর্থশূন্য।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

---

* বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাধনায় তাঁহার সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীর উপসংহারে, মৎকর্ত্তৃক স্থানান্তরে প্রকাশিত এই মতকে নাস্তিবাদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সাধনা, চৈত্র।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম।

চৈতন্যের পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডীর গীত প্রচলিত ছিল; চৈতন্যভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে। সেই গীতে চণ্ডীর উপাখ্যান, বোধ হয়, অতি সংক্ষেপে কীর্ত্তিত ছিল। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই, সে সম্বন্ধে অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, মাধবাচার্য্য বিরচিত চণ্ডীর প্রতি সাহিত্য-জগতের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধ অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত চণ্ডীর উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে।

আমরা মাধবাচার্য্যের ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীর রচনাকাল নির্ণয় করিয়া, কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মুকুন্দের জন্মভূমি দামুন্যা ও মাধবের জন্মভূমি সপ্তগ্রাম, নিকটবর্ত্তী স্থান। উভয় কাব্যেরই বিষয় এক। ফুল্লরার বারমাস্যা হইতে খুল্লনার ছেলিরক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ণিত তাবৎ ঘটনাই প্রায় একরূপ। স্থানে স্থানে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়, এক বর্ণনার সঙ্গে অপরের বর্ণনার আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং, এক কবি যে অপরের নিকট ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুকুন্দের চণ্ডীরচনার সম্বন্ধে যত তর্ক কি মতভেদ থাকুক না কেন, তাহা সত্বেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে বলা যাইতে পারে, উভয় কাব্যই প্রায় সমসাময়িক। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী; আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীও মুকুন্দের চণ্ডীর কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। আভ্যন্তরীণ প্রমাণই আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট মনে করি। হস্তের কঙ্কণ দেখিতে যেমন আরশীর প্রয়োজন নাই, তেমনই এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্যও আমাদের অন্য কোনরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন করা অনাবশ্যক। মাধবের চণ্ডীর সুন্দর অংশগুলি, মুকুন্দ দ্বিগুণ সুন্দর করিয়া স্বীয় কাব্যে পরিগ্রহ করিয়াছেন। অনেক স্থলে শব্দে শব্দে মিলে, ছত্রে ছত্রে মিলে। কিন্তু মুকুন্দের পুস্তকে এমন অনেক অপূর্ব্ব সুন্দর স্থল আছে, যাহা মাধব স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার পুস্তকে সে সকলের কিছুমাত্র আভাষ নাই। অনুকৃত কাব্যের সুন্দর অংশগুলি অনুকরণকারী ছাড়ে না, চোর কি রত্নের থলিয়া হস্তে পাইয়া ছাড়িয়া যায়? দ্বিতীয়তঃ, মাধবের চণ্ডী সংক্ষিপ্ত, মুকুন্দের চণ্ডী বিস্তারিত; মাধবের

চণ্ডীর নিকট দাঁড় করাইলে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর সৌন্দর্য্য মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য সত্যই যদি মুকুন্দের পুস্তক পড়িয়া মাধব স্বীয় কাব্য লিখিতেন, তবে নিজের অপারগতা অনুভব করিয়া স্বগ্রন্থ লজ্জায় ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, সে কথা কাহারও নিকট বলিতে সাহসী হইতেন না। বিশেষ, উভয়ের বাড়ী সন্নিকট-বর্ত্তী। পুস্তক দুইখানা পড়িলে স্বতঃই প্রতীতি জন্মিবে যে, একখানা ভিত্তি, অপরখানা অট্টালিকা; এক জন অপরের স্কন্ধে পা থুইয়া স্বর্গের নক্ষত্র আহরণ করিতেছেন, অপর ভার বহিতেছেন মাত্র। যে স্থলে সভ্যতার রেখা প্রবেশ করিতে কালবিলম্ব হয়, সেই সব স্থলে প্রাচীন জিনিষ বেশি যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে, তাই চট্টগ্রামের জঙ্গল হইতে মাধবাচার্য্যের চণ্ডী এত কাল পরে পুনর্ব্বার দেখা দিয়াছে। (১) যদি কবিকঙ্কণ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেন, তবে তদ্দেশবাসীগণ তাঁহাকে ফেলিয়া কখনই মাধবাচার্য্যকে গ্রহণ করিত না। বস্তুতঃ, দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী রচিত হইবার অন্যূন ১৩।১৪ বৎসর পরে মুকুন্দরামের চণ্ডী সমাপ্ত হয়।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে একটি "আত্মবিবরণ" আছে। তাহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য"। সুতরাং পুস্তক সমাপ্ত করিয়া 'আত্মবিবরণ' লিখিয়াছেন। সেই বিবরণের আর এক স্থলে আছে,—"আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান, তার দোষ ক্ষমা কর, কর অবধান।" পুস্তক রচনান্তে উহা গায়কের দ্বারা গীত হইয়াছিল, তাহারা শুদ্ধ ভাবে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারে নাই, এইজন্য তিনি লজ্জিত হইয়া দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। পুস্তকসমাপ্তি ও চণ্ডীর পালা গান হইবার পরে, কোনও সময়ে কবি স্বীয় আত্মবিবরণটি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই 'আত্মবিবরণে' কবি সময়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধব গায় শারদা-চরিত।" ইহা ১৫০১ শক, অর্থাৎ ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ। পূর্ব্বোক্ত কারণানুসারে, উহা পুস্তকরচনার ২।১ বৎসর পরে লিখিত হইলে, ১৫৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চণ্ডীকাব্য সমাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যায়।

এখন কবিকঙ্কণচণ্ডীর সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ইহা একটু দুরূহ কার্য্য। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও তৎপরে কবির নিবাসভূমি দামু-

ন্যার অতিনিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামবাসী অম্বিকা বাবু (২) আমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্য কিছু জানিবার উপায় নাই, কিন্তু উভয়ের মতই ভ্রমসংকুল বলিয়া বোধ হইতেছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় "শকে রস রস বেদ শশঙ্ক গণিতা," কোনও হস্তলিখিত পুস্তকে পান নাই বলিয়া, প্রথমে উহা একবারে অগ্রাহ্য করিয়া, শেষে কি ভাবিয়া উহার অর্থ ১৪৯৯ শক (১৫৭৯ খৃঃ অব্দ) করিয়া, তাহার সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ সময় মানসিংহের রাজত্বের ১২। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া পড়ে। কবির লিখিত ভূমিকায় 'মানসিংহ' নামের উল্লেখ জন্য একটা কৈফিয়ৎ চাই, তজ্জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পুস্তকরচনার আরম্ভকাল, ইহার ১২। ১৩ বৎসর পরে পুস্তক সমাপ্ত হয়, তখন মানসিংহ বাঙ্গলায় নবাব ছিলেন, সেই সময় ভূমিকা লিখিত হয়। কিন্তু এ দিকে তিনি পূর্ব্বপৃষ্ঠায় বলিয়া গিয়াছেন যে, মানসিংহের সময় কবি অত্যাচারপীড়িত হইয়া, দামুন্যা ত্যাগ করিয়া আরড়ায় আগমন করেন, তৎপরে চণ্ডীকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন ;—অপর পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই তিনি ঐ কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। সুতরাং, ইহা নিতান্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইয়াছে। অম্বিকা বাবু দামুন্যায় কবির স্বহস্তলিখিত কাব্য দেখিয়া অনেক নূতন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। তিনি বলেন, মানসিংহের সময় চণ্ডীকাব্য রচিত হয় নাই, কারণ, সে সময় বাঙ্গলায় কোনও অত্যাচারের কথা ইতিহাসে নাই। তাঁহার মতে জাহাঙ্গীর কুলির সাময়িক অত্যাচারই কবির বর্ণিত বিষয়। কিন্তু তখন আর রঘুনাথ দেব আরড়ার রাজা ছিলেন না, অথচ রাজা রঘুনাথের আদেশে যে কবি চণ্ডী রচনা করেন, তাহা প্রতি পত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই দুই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে গিয়া অম্বিকা বাবু কল্পনা করিলেন যে, মানসিংহের কথা যে কবি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভ্রম,—উহা জাহাঙ্গীর কুলির রাজত্বকাল ; সে কালে ঐরূপ ভ্রম হওয়া কোনও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ সময় রঘুনাথ দেব বোধ হয়, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচিন্তা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার আদেশে কবি চণ্ডীকাব্যরচনায় নিযুক্ত হন।

ইহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক ; কবিকঙ্কণ যখন আরড়ায় আসেন, তখন বাঁকুড়া রায় (রঘুনাথের পিতা) জীবিত ছিলেন, তিনি কবিকঙ্কণকে শিশু রাজকুমার-

দিগের ও রঘুনাথদেবের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন; এ সময়ে যদি রঘুনাথ এত দূর বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকেন যে, রাজকার্য্য হইতে তাঁহার অবসর লওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে এরূপ শিশুটির জন্য বাঁকুড়া রায়ের কবিকঙ্কণকে নিযুক্ত করা অবশ্যই সম্ভব! অপিচ, এইমত পরিগ্রহ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কবিকঙ্গণ জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর অত্যাচারে গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া আরড়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বাঁকুড়া দেব ও তৎপুত্র রঘুনাথ দেব, উভয়ই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিত্ব কি মার্কিন্-কংগ্রেসের সভাপতিত্বের মত, আরড়ার রাজাদিগেরও ৫। ৭ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজ-পদপ্রাপ্তি স্বীকার না করিলে, এই অদ্ভুত মতের কথনই পোষকতা করা যায় না। কবিকঙ্কণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজদরবারের কথা কি জানিবেন, জাহাঙ্গীর কুলির স্থলে মানসিংহ লিখিয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ কল্পনা-গড়া কথা। আর স্বীকার করিলাম যেন কবিকঙ্কণ এ বিষয় ভুল করিয়াছেন, যেন বাঁকুড়া রায় ও রঘুনাথ রায় পিতাপুত্রে উভয়েই একত্রে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেন ৩০ বৎসর রাজকার্য্য করিবার পর অসমর্থ রঘুনাথের শিক্ষার জন্য যথার্থই বাঁকুড়াদেব ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় আরড়ায় কোন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, কবিকঙ্কণ কি তাহার একবারও উল্লেখ করিতেন না? অম্বিকা বাবু হয় ত বলিবেন যে, "রঘুনাথ দেবের সঙ্গে আর সেই সময়ের রাজার সঙ্গে কলহ ছিল।" কল্পনার পথ অবারিত। কিন্তু তৎবংশীয়েরা তবে এখন পর্য্যন্তও কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত চণ্ডী পূজা করিয়া থাকে কেন?

যাহা হউক, ন্যায়রত্ন মহাশয় ও অম্বিকা বাবু, উভয়েরই মত ভ্রমপূর্ণ; এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, তাঁহারা উভয়েই "শাক রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা" ছত্রটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় একবার উহা সমর্থন করিতে যাইয়াও দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা ঐ ছত্র উপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহি, বটতলা যে কোনও হস্তলিখিত পুস্তক হইতেই উহা গ্রহণ করিয়া থাকুক, উহা পরবর্ত্তী গায়কদিগের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ঐরূপ রচনা জাল করিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ২।৪ বৎসর পরে রচিত হইলে যে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, কি কোনও দ্রব্য বাসি হইয়া যায়, এ কথা তাহাদের মনেও উদিত হইত না। আমাদের দেশীয় লেখকগণ কোনও পুস্তক প্রাচীন করিতে ইচ্ছুক হইলে, একেবারে ব্যাস কি পরাশরের দোহাই দিতেন। কোনও গল্প প্রস্তুত করিতে

হইলে, বিক্রমাদিত্য কি কালিদাসের উপর তাহা চাপাইতেন। ২।৪ বর্ষের জন্য কি ২। ৪ শত বৎসরের জন্যও তাঁহারা সময়সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে প্রস্তুত হইতেন না।

সন তারিখের প্রতি যদি তাঁহারা মনোযোগী থাকিতেন, কি আধুনিক প্রত্ন-তত্ত্ববিৎগণের ন্যায় তাহা রচিবার কৌশল অবগত থাকিতেন, তবে আমাদের দেশের বড় বড় ঘটনাগুলি, যাহা মহা আখ্যায়িকাসমূহে বর্ণিত আছে, সেগুলি বিদেশীয় লেখকদিগের গবেষণার মহিমায় আজ কাল আধ্যাত্মিক বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত না। ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খৃঃ) আমরা অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক নহি ; ইহা গ্রহণ করিলে কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে সত্যগুলি নিকটবর্ত্তী হয়—দূরবর্ত্তী হয় না, তাহাই আমরা দেখাইতেছি।

বটতলার পুস্তকে আছে,—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ ;
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
হইল রাজা আমদ সরিফ।"

অক্ষয় বাবুর চণ্ডীতে—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ ;
রাজা মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিপ।"

কিন্তু এ দুইটি প্রকৃত পাঠ নহে। কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত পুস্তক হইতে নীলমণি বাবু যাহা উদ্ধৃত করিয়া রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়াছেন, তাহা এইরূপ ;—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাৎ প্রায় মামুদ সরিফ।"

এইরূপ পাঠ কবির স্বহস্তলিখিত বলিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং অম্বিকা বাবু, উভয়েই গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ দুঃখের বিষয়, কেহই তাহার প্রকৃত অর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। বটতলা ও অক্ষয় বাবুর চণ্ডীর পাঠ আমাদিগের নিকট প্রশস্ত বোধ হয় না। কারণ, মানসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারাও যদি ঐরূপ অত্যাচার হইত, তবে তজ্জন্য অবশ্যই তিনি আংশিক দায়ী। গৃহ-

না, সন্দেহ। বিশেষ, কবির আশ্রয়দাতা রাজার বাটীতে তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে পুস্তক আছে, তাহার পাঠ অমান্য করিবার আমাদের কোনও কারণ নাই; ন্যায়রত্ন মহাশয় ও অম্বিকা বাবু, উভয়েই ঐ পাঠেরই সমর্থন করিয়াছেন। সেই পাঠ অবলম্বন করিলেই কথা অতি সহজ হয়।

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মামুদ সরিপ।"

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, প্রথম পদে মানসিংহকে কবি ধন্যবাদ দিতেছেন, ও 'বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ' প্রভৃতি মনোহর অভিধানে বিশেষিত করিতেছেন; দ্বিতীয় পদের রাজাকে তিনি অধর্ম্মী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন,—সুতরাং এক ব্যক্তির প্রতি ঐরূপ বিরুদ্ধ উক্তি কখনই সম্ভবপর নহে। আমাদের মতে, কবি গ্রন্থারম্ভের ১২। ১৩ বৎসর পরে উহা সমাপ্ত করিয়া, গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ লিখিয়াছিলেন। উহা গ্রন্থের প্রথমে লিখিত হয় নাই। তাহা হইলে, দামুন্যায় কবির স্বহস্তলিখিত পুস্তকে উহা প্রথমেই লিখিত থাকিত। "এই গীতি হইল যেমতে" এ কথা দ্বারাও দেখা যায়, কবি গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া 'গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ' লিখিয়াছিলেন। তিনি যখন এই "গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ" লিখেন, তখন মানসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি যখন দামুন্যা ত্যাগ করিয়া আসেন ও চণ্ডী তাঁহাকে গীতি রচনা করিতে আদেশ করেন, তখন অন্য নবাব বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। তাই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া, গ্রন্থ কিরূপে হইল, তিনি তাহা বলিতেছেন, "এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও গৌড় বঙ্গ উৎকলের প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন, কিন্তু অধর্ম্মী (যবন) রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎ পাইয়া অশেষবিধ অত্যাচার করিতেছিল, আমরা সেই সময় পলাইয়া আসিতেছিলাম, তখন 'পথে চণ্ডী দিলা দরশন'।" এই গীতিরচনার আদেশ, কবি ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে পাইয়াছিলেন। পদ দ্বারাও তাহাই দেখা যায়, "শকে রস, রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা, কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।"

ইতিহাসেও জানা যাইতেছে যে, এই সময় হুসেনকুলি খাঁ ও তৎপরে মজফর খাঁর সময় বঙ্গদেশে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল। মোগল পাঠানের যুদ্ধ

করিতেছিল, এই অশান্তি নিবারণ করিতেই সর্ব্বশেষে মানসিংহ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আর সে দিকে আমরা দেখিয়াছি, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী সমাপ্ত করিয়াছিলেন; মুকুন্দ, মাধবের গীতি দামুন্যা হইতেই শুনিয়া আসিয়াছিলেন, কিংবা ঐ পুস্তক ১৫৭৭ খৃঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পরে রচিত হইলে, আরড়ার রাজভবনে প্রথম শুনিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যরচনায় ১০।১২ বৎসর ব্যয়িত হইতে পারে না, অম্বিকা বাবু এই আপত্তি করিয়াছেন; ইহা অন্যায় আপত্তি। কবিকঙ্কণচণ্ডী বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ও স্থায়ী সামগ্রী। এমন লেখক আছেন, যাঁহারা বিধিদত্তগুণে কথায় কথায় মুক্তা ছড়াইয়া যান, যাঁহাদের হুকুমে কলম চলে ও পদ মিলে। কবিকঙ্কণ ঐরূপ ক্ষণস্থায়ী কাব্য রচনা করেন নাই। "ডিভাইনা কমেডিয়া" লিখিতে ড্যাণ্টের ৭ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল; "প্যারাডাইস লষ্ট" লিখিতে মিল্টনের ৭।৮ বৎসর লাগিয়াছিল। উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী সামগ্রী প্রকৃতিও ধীরে ধীরে রচনা করিয়া থাকেন; যে ফুল এক দিনে ফোটে, তাহা এক দিনে শুকাইয়া যায়।

১৫৭৭ খৃঃ অব্দে তিনি আরড়ার পথে দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহার কিছু পরে পুস্তক আরম্ভ করিয়া ১৫৮৯ কি ইহারও কিঞ্চিৎ পরে পুস্তক রচনা শেষ করিয়াছিলেন।

কবি হইতে নবম পুরুষ এখনও জীবিত আছেন; তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁহার সন্তানাদি আছে কি না, অম্বিকা বাবু বলেন নাই। না থাকিলেও ১০ পুরুষের সময় পাওয়া যাইতেছে। অম্বিকা বাবুই বলিয়াছেন, ইহাদের ৪।৫ পুরুষের সংবাদ পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রত্যেকেই ৭০।৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন;—সুতরাং এই বংশীয়েরা দীর্ঘজীবী। ৩৫ বৎসর করিয়া ধরিলে ৩৫০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং, কবির জন্মকাল ১৫৪৪ খৃঃ অব্দ কি তৎসন্নিহিত সময়। ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে চণ্ডী রচনা আরম্ভ করিলে, উহা তাঁহার ৩৪ বর্ষ বয়সে প্রারব্ধ হইয়াছিল;—আমরা অবশ্য বলিতে বাধ্য, এই অনুমানের ৪।৫ বৎসর এদিক সেদিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

"সমাপ্ত হইলে গীত, জগজ্জন প্রায় প্রীত" ইত্যাদি একবার লিখিয়া পুনর্ব্বার "শকে রস রসবেদ শশাঙ্ক গণিতা" দ্বারা দ্বিতীয় সমাপ্তি-পত্রের অবতারণা করা সম্ভবপর নহে,—অম্বিকা বাবু লিখিয়াছেন,—উহা বটতলার চণ্ডীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া উড়াইয়া দেওয়ার

গ্রন্থসমাপ্তির পরে ভূমিকাস্বরূপ "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" অবতারণা করিয়া সন তারিখ উল্লেখ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। শেষের লেখকগণ গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটি পূর্ব্বে সংলগ্ন করিয়াছেন, কিন্তু সনের অংশ পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমরা মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের সময় সাধ্যানুসারে সিদ্ধান্ত করিলাম।

মাধবাচার্য্যের বাড়ী ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ সপ্তগ্রাম,—তিনি পরাশর নামক কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র, গানের দল করিয়া তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। মাধবাচার্য্য নিত্যানন্দের একজন পরিকর ছিলেন। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী তৎপ্রভু গদাধর দাসের তিরোধান উপলক্ষে যে উৎসব করিয়াছিলেন ও পঞ্চবিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে সন্তোষ দত্ত যে উৎসব করিয়াছিলেন, তাহার উভয়েই ইনি উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডী ব্যতীত তাঁহার রচিত "ভগবৎসার"ও একখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ। হরপ্রসাদ বাবু সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয় জানাইয়াছেন। ইহার অনেক কথাই তাঁহার চণ্ডীকাব্যের প্রথমে "আত্মবিবরণে" আমরা পাইয়াছি। পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যের বিষয় বিস্তারিত লিখিয়াছি। তাঁহার কাব্য কঙ্কালবৎ। কবিকঙ্কণ তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। কয়েকখানা কাষ্ঠের ন্যায় উপকরণ পড়িয়াছিল, কবিকঙ্কণ তাহা লতা পল্লব পুষ্পে সজ্জিত করিয়াছেন। দুএকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দেখাইব। মাধবের ফুল্লরা কৃষকরমণী,—অশিক্ষিতা, অবিনীতা ও নির্লজ্জা। ভগবতীর সঙ্গে তাহার যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তাহার উপর আমাদের শ্রদ্ধা হয় না; দেবীর লজ্জাহীন প্রত্যুত্তরও আমাদিগের বড় বিরক্তিকর বোধ হয়; জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, পসারা মস্তকে লইয়া যে ফুল্লরা পথে ঘাটে মাংস বিক্রয় করে, তাহার মুখে কি আমি সাধু কথা ও সংস্কৃত ভাষা শুনিতে উৎসুক? তাহা নহে। কিন্তু লজ্জা ও বিনয় রমণীর অলঙ্কার, ধনী কি কাঙ্গাল, কাহারও তাহা একচেটিয়া নহে। মাংসের চুপড়ি মাথায় করিয়া গৃহস্থবধূ তাহা দেখাইতে পারে। গহনার চুপড়ি কক্ষে করিয়াও ধনীর রমণী তাহা না দেখাইতে পারেন।

মুকুন্দ, মাধবের ফুল্লরাকে একবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। ফুল্লরা, দেবীকে দেখিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রন্ধনের ত্বরা ভুলিয়া গেল, সে ঈর্য্যাতুরা হইল। কে না হয়? কিন্তু মুখে মধুর ভাষা বলিয়া ও বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া আদর করিল, তাঁহাকে কিরূপে তাড়াইবে, ফুল্লরার সেই চিন্তা হইল, কিন্তু ঈর্য্যার কথা সে

দেবীকে পুরাণ শুনাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছে। দেবী তাহা শুনিলেন না, পতিভক্তি শিখাইতে অসমর্থ হইয়া ফুল্লরা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় গৃহের দারিদ্র্য বর্ণিত করিলেন। গৃহমধ্যস্থিত ভেরাণ্ডার থাম দেখাইলেন, কিছুতেই দেবী গৃহত্যাগে সম্মত হইলেন না। নির্লজ্জা মুখরার ন্যায় ফুল্লরা তাঁহাকে কোনও কটু বাক্য না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কালকেতুর নিকট গমন করিল। কিন্তু মাধবাচার্য্যের ফুল্লরা দেবীকে দর্শনমাত্রেই গালি দিতে আরম্ভ করিল, একবার শুধু বার মাসের দুঃখ বর্ণনা করিয়া দেবীকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তার পরই অতি কুরুচিপূর্ণ ভর্ৎসনা আরম্ভ করিল। দেবী আবার ততোধিক নির্লজ্জা, তিনি বলিলেন, "তোর স্বামী আমাকে পালঙ্কে বসাইয়া সুখী করিবে, আর তুই হাটে ঘাটে স্বেদসিক্ত দেহে মাংস বিক্রয় করিয়া বেড়াইবি।" তিনি কালকেতুর আরাধ্যা মাতা, পরক্ষণেই কালকেতু আসিলে তাহাকে 'পুত্র' সম্বোধন করিতেছেন; তাঁহার মুখে ঐরূপ কথা নিতান্তই ঘৃণাজনক। কবিকঙ্কণের ভগবতী শুধু একটি কথা ঐরূপ বলিয়াছিলেন, "এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।" কেমন সুন্দর কথা! সত্য সত্যই কালকেতু স্বীয় ধনুকের গুণে সুবর্ণগোধিকাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। সত্য কথা বলিয়া দেবী লজ্জার সীমা অতিক্রম করেন নাই, অথচ ফুল্লরার আশঙ্কা দ্বিগুণ করিতেছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ঐরূপ কৌশল আদ্যোপান্ত।

কি উপকরণ কবিকঙ্কণ কি ভাবে গঠন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে অনুকরণকারী বলিয়া তাঁহার গৌরবকে লঘুজ্ঞান করা হয় না, অপূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা হয়। মাধবাচার্য্য যে অস্থিপঞ্জর রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রতিভাশালী কবিকঙ্কণ মন্ত্রবলে তাহাতে মাধবাচার্য্যের জীবনীসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচার্য্যের কাব্য পাঠ করা আবশ্যক। কবিকঙ্কণকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারা কাব্য একবার পড়িবেন।

মাধবাচার্য্যের রচনা সর্ব্বত্রই সুন্দর, সরল ও সতেজ। কোনও অসাধারণ শক্তির বিকাশ আমরা তাহাতে দেখি না সত্য, কিন্তু বর্ণিত উপাখ্যান বেশ সুন্দর ও চিত্ত-আকর্ষক হইয়াছে। ফুল্লরার বারমাস্যা হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"ফুল্লরায় বলে রামা যদি দেও মন বার মাসের যত দুঃখ ফুল্লরা পায় মনে

মাধবীতে জন্ম মোর শুনহ যুবতী।
যত দুঃখে ব্যাধ ঘরে করিছে বসতি।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু যায় বনবাসে।
মৃগ না পাইলে বনে থাকি উপবাসে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শুন যত মোর দুঃখ,
কহিতে সে সব কথা বিদরে বুক।
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবরে,
ললাটের ঘর্ম্ম মোর পড়ে ভূমিপরে,
সবিনয় বাক্য মোর শুনলো সুন্দরী,
কোন সুখের লাগি হইবা ব্যাধের নারী।
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি,
ক্ষুধায় আকুল হয়ে লোটাই আমি ক্ষিতি,
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি চারিদিকে চাই
হেন সাধ করে মনে, অন্য বনে যাই।
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি
মাথা থুইতে স্থান নাই ঘরে আটু পানি।
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে,
মানের পত্র মাথে দিয়া বঞ্চি দুই জনে।
ভাদ্র মাসেতে কন্যা বিদ্যুৎ ঝঙ্কার,
হেন কালে যাই আমি সাথেতে পসার,
নয়নেতে জল দিয়া নদী হই পার,
বিষাদ ভাবিয়া স্মরি অর্কের কুমার।
আশ্বিন মাসেতে কন্যা জগৎ সুখময়,
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তাভয়।
বীণা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ গায় গীত,
অন্নের কারণে প্রভু সদাই চিন্তিত।" ইত্যাদি

মাধবাচার্য্যের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অনেকগুলি পদ আমরা পাইয়াছি, তাহা বেশ সুমিষ্ট, নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

যাইবারে ওহে শ্যাম কেবা দিবে বাধা,
দৈবে মরিব আমি অভাগিনী রাধা।
সঙ্গে করি নিয়া যাও হয়্যা যাব দাসী,
ঘর প্রবেশিতে নারি, না শুনিলে বাঁশি।
মথুরার নাগরীরা নানা রস জানে,
গেলে না আসিবে শ্যাম হেন লয় মনে।

(২)

জয় রাধা ঠাকুরাণী, প্রেমবিলাসিনী রাই
ও অঙ্গ বয়ান কত ছাঁদে,
রূপ হেরি মৃগ পাখী বিনাইয়া কাঁদে,
ঘামে তিতিল তনু মন্দ মন্দ ঝরে,
কোটী চাঁদ জিনিয়া রাধা মুখ শোভা করে।
কাঁচা কাঞ্চন তনু কতই পরিপাটি
শোভিত কেশের খোঁপা তাতে সোনার কাটী।
আবৃত শ্রীমুখ খানি কি কব তোমায়,
নীলগিরি পাছে যেন চাঁদ চলি যায়।
অলি লুকায় লাজে, পিক নাহি নাদে,
অঙ্গের সৌরভে অলি গগন কুছাঁদে।
ও বঁধু কানাইরে জীবন ধন মোর
যুগে যুগে না ছাড়িব চরণখান তোর।
জাতি দিলাম যৌবন দিলাম আর দিব কি।
যারে আছে সুধা প্রাণ তারে বল দি (?)
আজু মোর মন্দিরে আওত কানু কালা
কি করব চাঁদ পবন অলি কোকিলা,
কি করব আর মোরে কাম পঞ্চবাণ
আসি মোর দেহ গেহে করি সুসন্ধান;
ভেটল কমল নয়ান আজু প্রসন্ন বিধি
আনিয়া মিলাইল পরম গুণনিধি,
হাসি হাসি কহে কান,
যুড়ায়ে রাধার প্রাণ
ছাড়ে রাধা লোক ভয় মান
দ্বিজ মাধবে বলে, দেখ নয়ন কমলে
রাধা কৃষ্ণ নিকুঞ্জ পয়ান।

(৩)

বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।
তুয়া পন্থ নিরক্ষিতে, রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলী বাজায়।
নূপুর কিঙ্কিণী, কেয়ূর কুণ্ডল মণি
পরি ধনী করিল গমন।
প্রিয় সখি করে ধরি, নীল নিচোল পরি
দেখ গিয়া ঐ চাঁদ বদন।"

এলিফেণ্টা কেভস্।

বম্বের সমুদ্রতীরে গিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, কতকগুলি পাহাড় জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। ইহার ভিতর কতকগুলি নিতান্ত ছোট, অপরগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। দুই একটিতে গোলা গুলি রাখিবার জন্য ইংরেজেরা ম্যাগাজিন্ (Magazine) প্রস্তুত করিয়াছেন। এলিফেণ্টা (১) এই পার্ব্বত্য দ্বীপসমষ্টির মধ্যে অন্যতম।

এলিফেণ্টা বম্বে হইতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই দ্বীপে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি গজমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এই মূর্ত্তি হইতেই পোর্টুগিজেরা দ্বীপের নামকরণ করেন। মূর্ত্তিটি কিন্তু এক্ষণে এখানে নাই—বম্বে ভিক্টোরিয়া উদ্যানে নীত হইয়াছে। এলিফেণ্টা দ্বীপটি নিতান্ত ক্ষুদ্র—ইহার পরিধি ৫ মাইলের অধিক হইবে না। এখানে লোকের বসবাস বড় নাই। যে দুই এক ঘর আছে, তাহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা কোনওরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করে। কেভ্‌সের জন্যই এলিফেণ্টা বিখ্যাত। দেশ বিদেশ হইতে বিস্তর লোক এই কেভ্‌গুলি দেখিতে আইসেন। প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্‌স্ ভারতবর্ষে আসিয়া এই চমৎকার কেভ্‌গুলি না দেখিয়া স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। স্থানীয় লোকেরা এলিফেণ্টা দ্বীপকে ঘারাপুরী বা “উৎখাতনগর” বলিয়া থাকে।

বাঙ্গালীর ভাগ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইবার সুযোগ সচরাচর বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু কোনও সুযোগে যদি একবার বাহির হওয়া গেল, আর শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে এবং স্বল্প আয়াসে যদি কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোনও উপায় থাকে, তাহা প্রাণান্তেও ছাড়িয়া আসা যায় না। যখন এত দূর আসিয়াছি, তখন এলিফেণ্টা দেখিতেই হইবে।

যাহা হউক, আমরা ছোট দেখিয়া এক খানি ষ্টীমার ভাড়া করিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া, এপলো বন্দরে গিয়া আমাদের ষ্টীমারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টা দুই পরে ষ্টীমার প্রস্তুত হইল। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে উঠিলাম ; ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। তখন বেলা ১টা।

(১) "কেভ্" এই শব্দের ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ না পাওয়াতে, ইংরাজি কথাটিই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। “কেভ”কে পর্ব্বতগুহা বলা যাইতে পারে না; কারণ গুহা কিম্বা

একেবারে এলিফেণ্টায় না গিয়া, আমরা প্রথমে "প্রংস্ লাইট্ হাউস্" (Prong's Light-house) দেখিতে গেলাম। বম্বের উপকূলে যতগুলি লাইট্-হাউস্ আছে, তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণের ব্যয় ৬০,০০০ পাউণ্ড। লাইট্-হাউস্‌টি ১১ তালা ও ১৬৮ ফুট উচ্চ; জলমধ্যে অবস্থিত একটি পাহাড়ের উপর ইহা সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত—প্রথম পাথর দিয়া গাঁথা, তার পর আগা-গোড়া লৌহময়। সকলের উপর তলায় প্রকাণ্ড একটি কেরোসিন্ ল্যাম্প রহিয়াছে। রিফ্লেক্টরের (Reflector) সাহায্যে এই আলোর ঔজ্জ্বল্য এতদূর বর্দ্ধিত করা হয় যে, ১৮ মাইল দূর হইতেও ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

"প্রংস লাইট হাউস্" দেখিয়া এলিফেণ্টার দিকে রওনা হওয়া গেল। পথিমধ্যে দেখিলাম, কতকগুলি সি-গল্ (Sea-gull) সমুদ্রবক্ষে পরমানন্দে বিচরণ করিতেছে। সি-গল্ রাজহংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; দেখিতেও কতকটা সেইরূপ, কেবল আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। পাখিগুলি সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উঠিতেছে, নামিতেছে; যেন তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। আমাদের ষ্টীমারের দশাও ঐরূপ—ক্ষুদ্রকায় "এডন" ভয়ানক দুলিতেছে। বেচারা আরোহীদের আজ "দোলযাত্রা"—মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই। অবিশ্রান্ত দোলনে আমাদের একজন সঙ্গীর বমন হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে আর কাহারও কিছু হয় নাই। ৩॥০ টার সময় আমরা এলিফেণ্টায় পৌঁছিলাম।

কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান অতিক্রম করিয়া কেভ্‌সে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশে প্রত্যেক দর্শককে দু আনা মূল্য দিয়া এক এক খানি টিকেট কিনিতে হয়। এইরূপে যাহা আয় হয়, স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্ত রক্ষীবর্গের বেতনাদিতে তাহা ব্যয়িত হয়। একজন পেনসন্‌প্রাপ্ত ইয়ুরোপীয়ান সৈনিক রক্ষিবর্গের মধ্যে প্রধান।

একটি ছোট রকমের পাহাড় খুঁদিয়া, এই কেভ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কেভে সর্ব্ব সমেত ৫টি প্রকোষ্ঠ। মধ্যে একটি বড় হল ও চারিপার্শ্বে ৪টি ছোট কুঠারী। হলটি ৬০ হাত লম্বা, প্রশস্তও প্রায় ঐরূপই হইবে। কুঠারিগুলি লম্বে ৩৬ হাত ও প্রস্থে ১১ হাত। ২৬টি বড় ও ১৬টি ছোট থাম ছাদের ভার বহন করিতেছে। প্রায় সকল থামই স্থানে স্থানে ভগ্ন, কদাচিৎ দুএকটি ভাল অবস্থায় আছে। কোনটিরই ছাদ ও মেজে সমতল নহে; সুতরাং সব থামগুলি সমান

হলে তিনটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেয়ালের গায়ে খোঁদা রহিয়াছে। মধ্যেরটি "ত্রিমূর্ত্তি"—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তিন মুখ একত্র পাশাপাশি স্থাপিত। ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণ দিকে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও বামে "অর্দ্ধনারীশ্বর"—অর্দ্ধ-স্ত্রী অর্দ্ধ-পুরুষরূপী শিবদুর্গার একীভূত যুগলমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি ৫।৬ হাতের কম উচ্চ হইবে না। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণুর অন্যান্য ছোট ছোট মূর্ত্তি, ঐরাবতসহ ইন্দ্রের মূর্ত্তি, নন্দী ও মহাদেবের বাহন বৃষের মূর্ত্তি, ইত্যাদি বিস্তর রহিয়াছে।

পাশের ৪টি কুঠারিতে হরপার্ব্বতীর বিবাহদৃশ্য, মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তি, হরপার্ব্বতীর মস্তকে দেবগণ কর্ত্তৃক পুষ্পবৃষ্টি, গণপতির প্রতিমূর্ত্তি, দশানন কর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের প্রয়াস ও দুটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। এই বড় কেভ্ ছাড়া এলিফেণ্টা দ্বীপে আরও চারিটি ছোট ছোট কেভ্ আছে। তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

প্রত্যেক থাম, দেয়ালের গাত্রসংলগ্ন প্রত্যেক মূর্ত্তি, সমস্তই সেই পাহাড় খুঁদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই প্রকাণ্ড হল ও তৎপার্শ্বস্থ চারি বৃহদায়তন কক্ষ নানাবিধ নক্সা-কাটা থাম ও অসংখ্য মূর্ত্তি কঠিন প্রস্তর কর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত করা কত যে সময়, অর্থ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। অপিচ, যে সময় এই কেভ্গুলি নির্ম্মিত হয়, সে সময় এখনকার মত খননকার্য্যোপযোগী তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাদিও বড় ছিল না। নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও কিরূপে এরূপ মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আর শুধু যে এরূপ একটি কেভ্ই ভারতবর্ষে আছে, তাহা নয়। এলিফেণ্টা কেভ্সের ন্যায়—এমন কি, ইহা হইতে অনেক বড় বহুসংখ্যক কেভ্ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা ইলোরা, লেনা, কারলি, আর্জ্জাণ্টা (২) ইত্যাদি। ইলোরা কেভ্সের নাম কে না শুনিয়াছেন? কি কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য, কি বিস্তৃতি—সর্ব্ব বিষয়েই ইলোরা কেভস্ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সমধিক বিখ্যাত। আমার ভাগ্যে ইলোরা-দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই (৩)। কিন্তু কারলি ও লেনা কেভস্ আমি দেখিয়াছি। এই দুই কেভ্সের বিষয় বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। কি উদ্দেশ্যে কোন সময়ে কাহার দ্বারা এই

---

(২) কেভগুলির অধিকাংশই বম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত।

(৩) ইলোরা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পথ

সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পরস্পর হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত এই কেভ্-সমূহ যে একই ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, তাহা নিঃসংশয়িতচিত্তে বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দস্যুর হস্ত হইতে ধনরত্নাদির রক্ষার্থ, অথবা শত্রুহস্ত হইতে আত্মগোপন দ্বারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত, দুর্গরূপে এই পার্ব্বত্য ভবনগুলি নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত। এক একটি কেভ্ যেরূপ প্রকাণ্ড, তাহাতে রাজা রাজড়ারা এখানে কোনও কালে বাস করিতেন, এরূপ কল্পনা নিতান্ত অলীক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কোনও কোনও কেভে মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ ধরণের—অর্থাৎ মুখাবয়ব মঙ্গোলিয়ানদের মুখাবয়বের ন্যায় চেপ্টা। কতকগুলি কেভ্ ভারতের বৌদ্ধ রাজগণ দ্বারা নির্ম্মিত,—ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এই কেভ্গুলির নির্ম্মাণকালসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, এলিফেণ্টা কেভস্ খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে শিবভক্ত কোনও হিন্দু নৃপতির দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এলিফেণ্টা দ্বীপ বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দুদের নিকট তীর্থ বলিয়া বহুকাল অবধি সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। এখনও প্রতিদিন দলে দলে হিন্দুযাত্রী এখানে আসিয়া পূজা দেয় ও মানসাদি করিয়া থাকে। শুনা যায়, নৃশংস পর্টুগিজেরা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এই কেভ্গুলিকে কুসংস্কারের দুর্গ এবং আশ্রয়স্থান বিবেচনায়, ইহাদের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বড় কেভের প্রবেশদ্বারে একটি কামান স্থাপিত করিয়া কেভের ভিতরে ক্রমাগত গোলাবৃষ্টি করা হয়; গোলার আঘাতে কতকগুলি থাম ভাঙ্গিয়া পড়ে, কতক আংশিক ভগ্ন হয়। মূর্ত্তিগুলিরও স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। অত্যন্ত কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। উদার এবং সুসভ্য বৃটিশ্ গভর্মেণ্ট এই কেভগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে উঠিয়া বম্বে অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। এপলো বন্দরে (Apollo Bunder) সারি সারি গ্যাসল্যাম্প জ্বলিয়া উঠিল। সমুদ্রের মধ্যে অর্ণবপোতসমূহেও আলো জ্বলিতেছিল। তখনকার দৃশ্য বড়ই মনোহর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই আলো—বন্দরের আলো,

র্দ্দিকই আলোকময়। অন্ধকারে অন্য কোনও বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না—কেবল আমাদের ষ্টীমার বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে সেই মণ্ডলাকার আলোকমালা, আর মাথার উপরে নির্ম্মল আকাশে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি। জলস্পর্শ-শীতল নৈশ সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছিল; অপার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয় তখন পরিপূর্ণ। জনৈক পার্সি যুবক (ষ্টীমারের ইঞ্জিনিয়ার) আমাদের অনুরোধে বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। আমাদের একটি সঙ্গী গান ধরিলেন। নিস্তব্ধ সমুদ্রবক্ষে গান ও বাদ্য উভয়ই কর্ণে মধু বর্ষিতে লাগিল। এ দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিব না। স্বপ্নদৃষ্ট সৌন্দর্য্যের ন্যায় ইহার সুখস্মৃতি চিরদিন গত জীবনের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে।

অপরাধনিদান।

২

১। শীতাতপের বিভিন্নতায় য়ুরোপে অপরাধসংখ্যার বিভিন্নতা হয়, এবং এই জন্য ঋতুভেদেও অপরাধসংখ্যা বিভিন্ন হয়।

২। স্ত্রী-পুরুষভেদেও অপরাধের সংখ্যা ভিন্ন হয়।

৩। দারিদ্র্য অপরাধের নগণ্য কারণ।

শীতাতপের প্রভাব সমাজশাসনে হ্রাস করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মাধিক্য হইলেও, ভারতবর্ষে অপরাধের সংখ্যা সামান্য। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক অধিক; কারণ অষ্ট্রেলিয়ায় বিলাতী সমাজের রীতি নীতি প্রচলিত। চিল্কাহ্রদের নিকট হইতে একজন উড়িয়া কলিকাতায় চাকরি করিতে আসিলে সে স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না। কলিকাতাতেও উড়িয়ার সমাজ আছে, সে সেই সমাজের দ্বারা শাসিত হয়। সমাজ তাহার প্রত্যেক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করে, অপরাধ পাইলে শাসন করে। কিন্তু য়ুরোপে গ্রামে যেটুকু শাসন দেখা যায়, সহরে তাহার একাংশও দেখা যায় না। এ জন্য গ্রাম অপেক্ষা সহরে অপরাধের সংখ্যা অধিক হয়। ব্যবসায়ভেদেও অপরাধের সংখ্যার ইতরবিশেষ হয়। কৃষিজীবিগণ অপেক্ষাকৃত নিরীহ; যাহারা কলকারখানায় কর্ম্ম করে, তাহাদের মধ্যে অপরাধসংখ্যা অধিক হয়। ইংলণ্ডের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯০ জন শিল্পশ্রমজীবী—সেখানে অপরাধীদের মধ্যে শতকরা ৮২ জন শিল্পশ্রম-

অনেক সময় ক্ষেপণ করিতে পারে, এ জন্য তাহার কোমল প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচালন হয়; শ্রমজীবীর অবসর সামান্য, সে এ সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় পায় না। য়ুরোপে ব্যভিচার কত প্রবল, এই তালিকাটি দেখিলে বুঝা যাইবে। শীতাতপে ব্যভিচারের হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করা যায় না। কৃষিজীবী অপেক্ষা শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ব্যভিচার অধিক। তাই এ তালিকাটি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। বৎসরে যতগুলি সন্তান জন্মে, তাহার মধ্যে শতকরা কত জন ব্যভিচারসম্ভূত, এই তালিকায় দেখান হইল:—

১। লণ্ডন	৩.৭	৭। মিলান	৩৪.০
২। বার্লিন	১৪.৯৫	৮। ষ্টকহলম	৪০.৭
৩। সেণ্টপিটার্সবার্গ ...	১৮.৮	৯। প্রেগ	৪৬.৭
৪। টুরিন	১৮.৯	১০। লম্বার্গ	৫১.০
৫। মাড্রিড	২১.৮	১১। বিয়েনা	৫১.৭
৬। পারিস	২৬.৩৫		

কৃষিজীবীর অবসর অধিক থাকাতে, সে অল্প আমোদজনক কার্য্যে অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়া অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। শ্রমজীবীর অবসর সামান্য—এ জন্য অল্প সময়ে তীব্র আমোদে তাহার সাধ মিটাইয়া লইতে হয়—ফলে শ্রমজীবীর মধ্যে সুরাপানাদি দোষের আধিক্য বিষম। এ জন্য অপরাধের সংখ্যাও অনেক। ক্রোধে যেমন মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, গ্রীষ্মে ও মাদকসেবনে মস্তিষ্ক তেমনি উত্তেজিত হয়। উষ্ণ মস্তিষ্কে শান্তভাবে সকল কথার সম্যক্ আলোচনা করা যাইতে পারে না। এ জন্য গ্রীষ্মপ্রধান ও সুরাপায়ী দেশে নরহত্যা অপরাধের সংখ্যা এত অধিক। চৌর্য্যাদি অপরাধ শান্ত সমালোচনাসাপেক্ষ। শীতপ্রধান দেশে এ জন্য চৌর্য্যাদির প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর সংখ্যা অধিক, গ্রামের সংখ্যা অধিক, এবং সমাজশাসন কঠোর, এই ত্রিবিধ কারণে ভারতবর্ষে অপরাধের সংখ্যা এত অল্প। কিন্তু এ অল্পতা অধিক দিন থাকিবে, বোধ হয় না। সমাজ যতদিন অল্পপরিসর থাকে, ততদিন প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্য্যের উপর সকলের তীব্র দৃষ্টি থাকে। কিন্তু সমাজের আয়তন যত বৃদ্ধি পায়, শাসনের কঠোরতার তত হ্রাস হইয়া আসে। দেশীয় খৃষ্টীয় সমাজে বা ব্রাহ্মসমাজে অপরাধের অল্পতার কারণ, সমাজের অল্পপরিসরতা। হিন্দু সমাজের আয়তন যত বৃদ্ধি পাইতেছে,

ভূমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অপরিমেয়। এজন্য শস্যের দর বৃদ্ধি হইলেও খাজনার হার বৃদ্ধি হইয়া কৃষিকার্য্যের আয় আশানুরূপ হইতেছে না। যাহারা পূর্ব্বে অন্য কার্য্য করিত, তাহারাও বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আয় আরও কমিয়াছে, এখন বাধ্য হইয়া লোককে কলকারখানায় কার্য্য করিতে হইতেছে। ক্রমে কলকারখানা আরও বাড়িবে। মহকুমা, রেলওয়ে ষ্টেশন, কল-কারখানা ও বাণিজ্যের হাট বা বন্দর নিত্য নূতন স্থাপিত হইয়া দেশে সহরের সংখ্যা বাড়িতেছে, ক্রমে আরও বাড়িবে। শেষে একদিন আসিবে যে, যে ভারত আজ অপরাধতুলনায় পৃথিবীতে স্বর্গের সমান, সেই ভারতবর্ষ নরকের ন্যায় পাপপূর্ণ হইবে। ভারতে যত বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজ সৃষ্ট হইয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের শাসন কঠোরতর হইবে, ধনাগমতৃষ্ণা যত সংযত হইবে, নারীগণকে যত গৃহকার্য্য ও সন্তানপালনে আবদ্ধ রাখা যাইবে, ততই ভারতের বর্ত্তমান পবিত্রতা রক্ষা পাইবে। সমাজের ভিতরে সমাজ ভারতের জাতিভেদ। জাতিভেদের নিয়ম যত কঠোর হইবে, ততই অপরাধসংখ্যা অল্প হইবে। কিন্তু আদর্শ ও অবস্থানের পরিবর্ত্তন এত হইয়াছে যে, সংযম বা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম বা জাতিভেদ রক্ষা করিবার আশা আর নাই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমাজসৃষ্টির আশা আছে। এই সকল ধর্ম্মসমাজে নীতির পবিত্রতারক্ষার প্রয়াস যদি অধিক হয়, তবেই মঙ্গল ; নতুবা প্রভূত অমঙ্গল ঘটিবে।

অপরাধকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধনাপরাধ ও প্রাণাপরাধ ; অর্থাৎ বিত্ত সম্বন্ধে অপরাধ চৌর্য্যাদি, আর প্রাণ সম্বন্ধে অপরাধ আঘাত ইত্যাদি। গ্রীষ্মের প্রতাপ দ্বিতীয় প্রকার অপরাধের উপর অধিক, শীতের প্রতাপ প্রথম প্রকার অপরাধের উপর অধিক। ইতালী স্পেন প্রভৃতি দেশে যত নরহত্যা হয়, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে তত হয় না। আবার ইংলণ্ডে ফ্রান্সে চুরি ডাকাতি যত হয়, স্পেন ইতালীতে তত হয় না। অথচ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালী অপেক্ষা অধিক ধনশালী। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। এক বৎসরে এক লক্ষ লোকের মধ্যে কত জনের কোন অপরাধে বিচার হইয়াছিল,—

	নরহত্যা	চৌর্য্য
ইতালি	১৫·৪০	২২১
স্পেন	১১·৯১	৭৪

বিক্টোরিয়া (অষ্ট্রেলিয়া)	৩.২	... ...	৩৯৪.৫
বেল্‌জিয়ম্	৩.০২	... ...	১৪৩
ফ্রান্স	২.৭৩	... ...	১২১
গ্রেটব্রিটেন	২.৩৫	... ...	২৫৮.৫
ভারতবর্ষ	১.৩১	... ...	৬৪.৬

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে লোকে বাধ্য হইয়া আপন গৃহে সময়াতিপাত করে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ অধিক হয়, এজন্য শীতপ্রধান দেশে শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সহরে, গ্রামে, কারাগারের মধ্যেও শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে সর্ব্বপ্রকারের অপরাধসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে আত্মহত্যা যত অধিক হয়, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে কখনও তত হয় না। গ্রীষ্মে পাচকশক্তির হ্রাস হয়, শরীর অসুস্থ হয়, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তাই গ্রীষ্ম অপরাধের নিদান। অসুস্থতা যে অপরাধের একটি প্রধান কারণ, তাহা বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক নাই। (১) জল বায়ু (২) সমাজপ্রণালী ও ব্যবসায়, এবং শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি, অপরাধের বিভিন্ন নিদান। যেখানে গ্রীষ্ম প্রধান, যেখানে সমাজশাসন শিথিল, যেখানে শিল্পজীবির সংখ্যা অধিক, সেখানে অপরাধ অধিক। স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষে প্রাণাপরাধ অধিক করিয়া থাকে, কিন্তু চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী স্ত্রীলোকের সংখ্যা সামান্য নহে। যেখানে স্ত্রীলোকে চুরি না করে, সেখানেও স্ত্রীলোকে চোরকে সন্ধান দেয়, বা উৎসাহিত করে। বলের অভাবে স্ত্রীলোকে নরহত্যা করে না, এবং সন্তানপালনে প্রবৃত্ত থাকাতে নৃশংস অপরাধ তাহারা ঘৃণা করে। কিন্তু শিল্পকার্য্যে বা কলকারখানায় যে সকল স্ত্রীলোক কায করে, অনুশীলনের অভাবে তাহাদের নারীপ্রকৃতির কোমলতার হ্রাস হইয়া যায়। তাহারা নৃশংস অপরাধে পরাঙ্মুখ নহে। বয়সানুসারে অপরাধের অনুপাত কিরূপ, উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃপুরুষের নিকট লোক অপরাধপ্রবণতা কিরূপ লাভ করিয়া থাকে, চন্দ্রশেখর বাবু এ সব কথার আলোচনা করেন নাই।

ক্রে সাহেব বলেন, যাহারা শেষে কারাগারে আশ্রয় লাভ করে, তাহাদের এক শত জনের মধ্যে

৫৮	জন	১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে
১৪	”	১৫ ও ১৬ বৎসরের মধ্যে
৮	”	১৭ ও ১৯ ” ”

অপরাধ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ২০ বৎসরের পরে অপরাধপ্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইয়া ত্রিশ বৎসরে চরমসীমা লাভ করে। তাহার পর কমিতে থাকে। ইংলণ্ডের কয়েকটি দেশের তালিকা দেখা হইয়াছে যে, কয়েদীদের মধ্যে বয়সভেদে সংখ্যা এইরূপ ঃ—

					পুরুষ		স্ত্রীলোক
১২ বৎসরের	নীচে	...	১	...	০.২	...	০.০
১২ হইতে	১৬	...	২.৮	...	৩.১	...	১.১
১৬ হইতে	২১	...	১৬.১	...	১৭.৫	...	১০.৭
২১ হইতে	৩০	...	৩০.২	...	২৮.৪	...	৩১.৪
৩০ হইতে	৪০	...	২৪.৩	...	২৩.৯	...	২৮.৬
৪০ হইতে	৫০	...	১৪.৭	...	১৪.২	...	১৭.৫
৫০ হইতে	৬০	...	৬.৪	...	৬.৪	...	৬.৮
৬০ এর উপর		...	৫.৪	...	৬.২	...	৩.৮

অসৎপ্রবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিলম্বে উত্তেজিত হয়, এবং পূর্ব্বেই নিস্তেজ হইয়া থাকে। পুরুষের ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিষম সময়। এই সময়ে অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য, অতি সাবধানে তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন। স্ত্রীলোকের ২১ হইতে ৩০ বৎসর, পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়।

পূর্ব্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি সন্তানে উত্তরাধিকার করে। উইস্‌ম্যান্‌ ও গ্যাল্‌টন্‌ বলেন, পিতার স্বোপার্জ্জিত প্রকৃতি সন্তান পায় না, কিন্তু তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি সন্তান পাইয়া থাকে। এ কথা কত দূর সত্য, এখনও স্থির হয় নাই। রোমানিজ্‌ এ মতের প্রতিবাদ করিতেন। এ কথা সত্য হইলে, চোরের সন্তানের চোর হওয়া নিশ্চিত নহে। আলস্য, বিলাসপ্রিয়তা বা অভিমান, অনুকরণপ্রিয়তা এবং দৃঢ়তার অভাব, অনেক ধনাপরাধের কারণ। অপরাধীদিগকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে, ভাল হইবার ইচ্ছা তাহাদের অধিক দিন থাকে না,—কয়েক দিন থাকিয়া আবার উবিয়া যায়। ভাল খাইব বা ভাল পরিব, এ ইচ্ছাটি বেশ আছে। কিন্তু রীতিমত পরিশ্রম করিবার জন্য যে অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার আবশ্যক, তাহা নাই। একবার উদ্যম করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া অনেক দিন আলস্যে কাটাইতে, তাহারা ভালবাসে। সে উদ্যমের সময় তাহারা যথেষ্ট কার্য্যতৎপরতা দেখায়, তাহার পর আবার কিছুই থাকে না। ধারাবাহিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়

সাধনার ফল। বাল্যে এই শিক্ষা না হইলে, পরে আর হয় না। এই শিক্ষার অভাবে এবং অনুকরণপ্রিয়তার আধিক্যবশতঃ, চোরের সন্তান চোর হয়। বালকের অনুকরণপ্রিয়তা বানর অপেক্ষা অল্প নহে। অপরাধীর গৃহে ভাল আদর্শের অভাবে সন্তানও অপরাধপরায়ণ হয়। আগাছা যেমন ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, অসৎপ্রবৃত্তি তেমনি স্বাভাবিক। পুরুষানুক্রমে শিশু তাহা অধিকার করে। সরল শিশু, শান্ত শিশু, নির্দ্দোষ শিশু, এ সব মাতামহীর উপকথা। প্রত্যেক শিশু জন্মগত অপরাধী। অজ্ঞানতা সরলতারূপে, দুর্ব্বলতা শান্ত ভাবে, এবং সুবিধার অভাব বা শাসনের ভয় নির্দ্দোষিতারূপে প্রতীয়মান হয়। অথবা তথনও বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। সুদৃঢ়শাসনে সাবধানে শিশুকে পালন করিতে হয়, এক একটি অসৎপ্রবৃত্তির অঙ্কুর দেখিলে, তথনই তাহা পাথরচাপা দিয়া চাপিয়া ফেলিতে হয়, যেন আলো বা বাতাস না লাগে। পুরুষানুক্রমে যে পরিবারে এইরূপে শিশু লালিত পালিত হইয়াছে, সেই পরিবার শিষ্ট ও সুশীল হয়। এইরূপ শিক্ষার অভাবে অপরাধীর সন্তান অপরাধী হয়। এ শিক্ষা বিদ্যালয়ে ঘটে না। বিদ্যালয়ে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের অনুশীলন হয়, পরিবারে পিতামাতার নিকট কেবল শিশু এইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। উদ্যমবিহীন, অধ্যবসায়শূন্য, অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ অপরাধীর সন্তানের এ শিক্ষা দুর্লভ।

মানসিক দুর্ব্বলতার ন্যায় শারীরিক অসুস্থতা সন্তান উত্তরাধিকার করে। শারীরিক অসুস্থতা অপরাধের কারণ, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জার্ম্মেণী দেশে ১৭১৪ জন কয়েদীকে পরীক্ষা করিয়া সিচার্ডি সাহেব দেখিয়াছিলেন,—

শতকরা ১৬ জন মাতালের সন্তান
" ৬ জন পাগলের বংশে জন্মিয়াছে।
" ৪ জন আত্মহত্যাপরায়ণ বংশে জন্মিয়াছে।
" ১ জন অপস্মারগ্রস্ত পরিবারে জন্মিয়াছে।

অর্থাৎ, শতকরা ২৭ জনের পরিবারে কোনও-না-কোনও প্রকার শারীরিক বিকার ছিল—শারীরিক বিকার সিকিরও অধিক অপরাধের কারণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ডাক্তার কোরী বলেন, ফ্রান্সের সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদের অনেকে শারীরিক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত। ডাক্তার বার্জিলিও বলেন, ইটালীর অপরাধীদিগের শতকরা ৩২ জন পিতা মাতার নিকট অপরাধপরায়ণতা উত্তরাধিকার করে। কারাগারে কয়েদীদিগকে যেরূপ যত্ন ও সাবধানে প্রতিপালন করা হয়, গৃহে অনেকের ভাগ্যে সেরূপ যত্ন ঘটে না।

তথাপি সাধারণ মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা কারাগারের মৃত্যুসংখ্যা দেড় গুণেরও অধিক। অপরাধীদিগের শারীরিক বিকার ইহার একমাত্র কারণ। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে যত জনের নর-হত্যা-অপরাধে বিচার হইয়াছে, দেখা গিয়াছে,—তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩২ জন উন্মাদ। যে ২৯৯ জনের প্রতি দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৪৫ জন্কে অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেককে মানসিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত বলিয়া সামান্য দণ্ড দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ, শতকরা ৮২ জন নরঘাতককে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত দেখা গিয়াছে। মডেস্‌লি বলেন, পাগল না হইলে কেহ নর-হত্যা করে না।

ইংলণ্ডে শতকরা দশ জন লোকে আদৌ লিখিতে পড়িতে জানে না। কিন্তু জেলের কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন আদৌ লেখাপড়া জানে না। এবং শতকরা ৭০। ৭২ জন অতি সামান্য লেখাপড়া জানে। ইহাতে বুঝা যায় যে, অপরাধীদের অনেকে পিতা মাতার নিকট বা বিদ্যালয়ে কোনও শিক্ষা পায় নাই। অথবা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকিলেও, শারীরিক বা মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু, তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, অপরাধীদের অধিকাংশের কল্পনা, স্মৃতি ও বুদ্ধিশক্তি অতি সামান্য। এই মানসিক দুর্ব্বলতা, সন্তান পিতামাতার নিকট লাভ করে।

অপরাধ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, এ প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাউক ঃ—

১। শীত গ্রীষ্ম ও ঋতুভেদে এবং স্ত্রী ও পুরুষভেদে অপরাধের হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

২। ব্যবসায়, বয়স ও অবস্থানভেদে অপরাধের হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

৩। কলকারখানা, সমৃদ্ধি ও জনতার শ্রীবৃদ্ধিতে অপরাধের বৃদ্ধি হয়।

৪। সামাজিক শাসন বিচারালয়ের শাসন অপেক্ষা অপরাধনিবারণে অধিক সক্ষম।

৫। উপযুক্ত শিক্ষার প্রচার হইলে অপরাধের হ্রাস হয়।

কোনও দিন পৃথিবী অপরাধশূন্য হইবে না। অপরাধপ্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত। শিক্ষার গুণে, সামাজিক শাসনে ও রাজদণ্ডে, অপরাধসংখ্যার হ্রাস করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

বুধগ্রহ।

প্রসিদ্ধ ইটালীয় জ্যোতিষী স্কিয়াপেরিলি (Schiaparelli) মঙ্গলগ্রহের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন। অল্প দিন হইল, তিনি আবার বুধগ্রহ (Mercury) সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়া, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পর্য্যবেক্ষণ-কুশলতার অসামান্য উদাহরণ দিয়া, জ্যোতিষীমণ্ডলীকে আরো বিস্মিত করিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষীদিগের কূটযুক্তি, স্কিয়াপেরিলির আবিষ্কার অসত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে না পারিলে, ইহা একটি বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া, আবিষ্কারকের নাম যে জগতে চির-স্মরণীয় রাখিবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির মধ্যে, বুধই সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থিত এবং ইহার ব্যাসার্দ্ধ কেবলমাত্র ১৫০০ মাইল বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, বুধের আকার পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার ভারপরিমাণ বড় অল্প নয়, সমগ্র গ্রহটি পারদ দ্বারা গঠিত হইলে যে ভার হয়, বুধের প্রকৃত গুরুত্ব অবিকল তাহাই বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন ও সূর্য্যের সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত, উদয়াস্তকাল ভিন্ন অন্য সময়ে, বুধগ্রহের পর্য্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব দেখিয়া, এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে যত্নবান্ হন নাই।

অযত্নপ্রয়াসে, স্থূলযন্ত্রাদির সাহায্যে বুধমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহাতে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ স্থায়ী চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সূর্য্যের সান্নিধ্য প্রযুক্ত, আমাদের চন্দ্রের ন্যায়, ইহারও ক্ষয় বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্কিয়াপেরেলির আবিষ্কারের পূর্ব্বে, জ্যোতিষীগণ, বুধসম্বন্ধে এই সামান্য তত্ত্ব ভিন্ন, আর কিছুই জানিতেন না; এবং জানিবার চেষ্টাও করেন নাই। স্কিয়াপেরেলি গত সাত বৎসর অবিশ্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও গণনাদি দ্বারা দেখিয়াছেন,—বুধগ্রহ, পৃথিবীর ন্যায় ২৪ ঘণ্টায় স্বীয় অক্ষরেখায় পূর্ণ আবর্ত্তন করে না; সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিবার কালে, ইহারও একবারমাত্র অক্ষাবর্ত্তন হয়, এবং এজন্য, চন্দ্রের যেমন একার্দ্ধ চিরকালই পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে, বুধেরও সেই প্রকার একার্দ্ধমাত্র সূর্য্যকিরণে আলোকিত থাকে, এবং অপরার্দ্ধ, চিরকালের জন্য ঘোরতমসাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। মঙ্গলগ্রহে যে প্রকার কৃষ্ণচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, বুধের সর্ব্বাংশে সেই প্রকার অসংখ্য চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এই সকল চিহ্নের পরস্পর সংযোগস্থল, স্থূলতর বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, মঙ্গলের ন্যায় ইহাতেও এগুলি, নদ নদী ও সঙ্কীর্ণ সমুদ্রের চিহ্ন বলিয়া, জ্যোতিষীগণ অনুমান করিয়াছেন। বুধে বায়ুর অস্তিত্ব বহুকাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্কিয়াপেরেলি এখন রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র (Spectrascope) সাহায্যে, ইহাতে জলীয় বাষ্পের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন, এবং পর্য্যবেক্ষণকালে কয়েক বার স্পষ্ট মেঘ পর্য্যন্তও দেখিয়াছেন। বুধ-মণ্ডলস্থ চিহ্ন সকলের আকস্মিক অস্পষ্টতা, সম্ভবতঃ, আকাশে ভাসমান মেঘ দ্বারাই হইয়া থাকে, অনেকে এরূপ অনুমান করিতেছেন। স্কিয়াপেরেলি বলেন, বুধের উত্তরমেরুপ্রদেশে আকাশ সর্ব্বদাই ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকে, এবং ইহার ফলেই উত্তর-মেরু, অপর মেরু অপেক্ষা স্থূলতর বলিয়া বোধ হয়।

স্কিয়াপেরেলি, বুধগ্রহের অদ্ভুত গতির পরিচয় সাধারণে প্রচারিত করিলে, অনেকেই এই নবাবিষ্কার অমূলক বলিয়া, উড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থান হেতু,

নয় বুঝিয়া, আজকাল খ্যাতনামা জ্যোতিষীমাত্রেই, আবিষ্কারকের কথা সম্পূর্ণ সত্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

বুধ-মণ্ডলস্থ নানা পদার্থ ও ইহার গতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘকালব্যাপী নানা আলোচনা শেষ হইলে, ইহাতে জীব থাকিতে পারে কি না,—এই প্রশ্নটি লইয়া, কিছু দিন তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, এবং আধুনিক জ্যোতিষীগণের মধ্যে অনেকেই এই আন্দোলনে যোগ দান করিয়াছিলেন। নানা প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া, বায়ু জল ইত্যাদি জীবের বাসোপযোগী সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব দেখাইয়া, এক দল জ্যোতিষী বুধকে জীববাসের অনুকূল ঠাহরাইয়া, বুধকেও পৃথিবীর ন্যায়, জীবের আবাসভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু, আর এক শ্রেণীর জ্যোতিষী, বুধের একার্দ্ধ সকল সময়েই আতপ-তাপিত এবং অপরার্দ্ধ চিরান্ধকারাচ্ছন্ন ও তাপাভাবে চিরতুষারাবৃত, এইরূপ অনুমান করিয়া, ইহাতে অন্ততঃ আমাদের পরিজ্ঞাত কোন জীবই বাস করিতে পারে না বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষীগণ যাহাই বলুন, আজীবন নিদাঘমার্ত্তণ্ডতাপিত দেশে বাস করিয়া, এবং চিরকাল অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করিয়া, বুধ-গ্রহবাসী দুর্ভাগ্য প্রাণীদের জীবন, আমাদের হিসাবে যে নিতান্ত অপ্রীতিকর ও একঘেয়ে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বুধের কোনও অংশেই, পৃথিবীর ন্যায় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না; এমন কি, সূর্য্যের উদয়াস্ত অতি সংকীর্ণ স্থানে সামাবদ্ধ আছে। বুধের কক্ষ-পথের বক্রাধিক্য প্রযুক্ত, ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তস্থ ২৪° অংশ-পরিমিত স্থানে কেবল সময় সময় উদয়াস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সঙ্কীর্ণ স্থানের এক প্রান্তস্থ অধিবাসীগণ, ২৪°-অংশ-পরিমিত উচ্চে সূর্য্যদেবকে ধীরে ধীরে উঠিতে দেখিয়া থাকে, এবং দেড় মাস পরে একবার মাত্র সূর্য্যাস্ত প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু ইহার অপরপ্রান্তস্থ অধিবাসীগণ, এই সামান্য সৌভাগ্যটিও উপভোগ করিবার অবসর পায় না, প্রতি বৎসরে কয়েক দিনের জন্য দূরবর্ত্তী শৈল-শিখরে তরুণ তপনের স্থির ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়াই ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়।

তৈলবাষ্প।

তৈলবাষ্পের প্রকৃতি না জানায়, আমরা অনেক সময় মহা ক্ষতিগ্রস্ত হই। আমাদের দেশে অগ্নির উপদ্রবে, গ্রাম নগরী একবারে ভস্মীভূত হইবার, ইহাই একটি বিশিষ্ট কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল এ দেশে নয়, সভ্যতাভিমানী ও আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের লীলাভূমি আমেরিকা ও য়ুরোপের অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম নগর, এই একই কারণে, অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে; এবং এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা ইনস্যুরেন্স্ কোম্পানিদের যে কত অর্থনাশ হইতেছে, তাহার পরিমাণ করা যায় না। আমেরিকার কয়েকটি প্রসিদ্ধ ফায়ার ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সভাপতি এটকিন্সন্ সাহেব, সম্প্রতি কোম্পানির ক্ষতির কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার কার্য্যবিবরণীতে, তৈলবাষ্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা, ক্ষতির সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং যদি এই অজ্ঞতা অচিরাৎ বিদূরিত না হয় ও জনসাধারণে যদি এই বিষয়ে পূর্ব্ববৎ উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কার্য্য শীঘ্রই অচল হইয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ যত দূর কল্পনা করি, প্রকৃতপ্রস্তাবে তৈল-বাষ্প তত অনিষ্টোৎপাদক নয়। আমরা ইহার প্রকৃতি না জানায়, এবং ইহাতে যে অত্যল্প অনিষ্টকারিতা আছে, তাহা

গিয়া, একটি অল্পদোষযুক্ত পদার্থকে, মহানিষ্টের মূলকারণ করিয়া তুলি। তৈলবাষ্প যে অত্যন্ত দাহ্যগুণসম্পন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিলে, কেরোসিন স্পিরিট ইথরাদি দাহ্যগুণসম্পন্ন অপর পদার্থ অপেক্ষা, অধিক অনিষ্টকারী বলিতে পারি না। সাধারণতঃ তৈলসিক্ত পদার্থ বা তৈলপূর্ণ পাত্র উত্তপ্ত হইলে তৈলবাষ্প উৎপন্ন হয়, ইহা কিঞ্চিৎ উত্তাপ পাইলেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমস্ত তৈল অগ্নিময় করিয়া তোলে। অধিকাংশ স্থলে জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হয় জানিয়া, এই প্রকার অবস্থায়, অনেকেই প্রজ্জ্বলিত পদার্থে জল নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিপ্রশমনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু জলসেচনে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া, দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া, নিকটস্থ পদার্থ সকল অগ্নিময় করিয়া মহা বিপদের সূত্রপাত করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই প্রজ্জ্বলিত তৈলবাষ্পে জলসংযোগ করাই, বিপৎপাতের একমাত্র কারণ। জল দ্বারা তৈলজ অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া যদি নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ হইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টসংঘটনের কোনই কারণ থাকে না। হঠাৎ তৈল জ্বলিয়া অগ্নি উৎপন্ন হইলে, আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া, সাধারণতঃ সকলেই তাড়াতাড়ি প্রজ্জ্বলিত বাষ্পে জলসেক করেন, এবং জলসেকের পর অগ্নি বর্দ্ধিত তেজে জ্বলিতে দেখিয়া, তাঁহাদের অগ্নিনির্ব্বাণের প্রয়াসই যে তেজবৃদ্ধির কারণ, তাহা কেহ মনে করেন না। অপর কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এই ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হন। আমেরিকার কয়েকটি বৃহৎ কারখানায়, ঠিক পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রজ্জ্বলিত তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড নির্ব্বাপিত করিতে গিয়া, মহা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, বহু লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে রন্ধনশালা অগ্নি-উৎপত্তির একটি প্রধান স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিকাংশ স্থলেই তাপাধিক্যপ্রযুক্ত কটাহস্থ তৈলবাষ্প প্রজ্জ্বলিত হইয়া, অনর্থোৎপাদন করে, এবং অনেক সময়েই অগ্নিনির্ব্বাণার্থে জল নিক্ষেপ করা হয় বলিয়া, অগ্নি আরও প্রদীপ্ত হইয়া চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

প্রজ্জ্বলিত তৈল জলযুক্ত হইলে অগ্নির তেজ বর্দ্ধিত হয় কেন,—এই প্রশ্নের মীমাংসা বিষয়ে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বলেন, উত্তপ্ত তৈলে সংস্পৃষ্ট হইলে, জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় ও ইহা অন্যান্য বাষ্পের সহিত মিলিয়া ভারের অল্পতা নিবন্ধন, সবেগে উপরে উঠিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত তৈলবাষ্পও উর্দ্ধোত্থিত করিয়া চারি পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত করে।

অঙ্গুলি-তত্ত্ব।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শারীরিক যন্ত্রাদির, কালসহকারে কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধানে ফিজ্‌নার (Pfitzner) নামক জনৈক য়ুরোপীয় শরীরতত্ত্ববিদ্ অনেক দিন অবধি নিযুক্ত আছেন, এবং সম্প্রতি তাঁহার নানা অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল, সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। ফিজ্‌নার সাহেব বহুশতাব্দী পূর্ব্বের নরকঙ্কাল সকল উদ্ধার করিয়া, অধুনাতন কালের কঙ্কালের সহিত তুলনা করিয়া, অস্থিগঠন বা অস্থিস্থাপনের মূল বিষয়ের বিশেষ কোনও উপলব্ধি করেন নাই; কিন্তু পদের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবিষ্কৃত করিয়াছেন। অনেকেই অবগত আছেন, সাধারণতঃ আমাদের হস্তপদের অঙ্গুলি সকলের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলীচতুষ্টয়ে দুইটি করিয়া গ্রন্থি দেখা যায়, এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া গ্রন্থি থাকে; অর্থাৎ, অঙ্গুষ্ঠ চারিটি কেবল দুই খণ্ড পৃথক্ অস্থির সমষ্টিমাত্র, এবং অপর অঙ্গুলিগুলি প্রায়ই তিন খানি অস্থিসংযোগে গঠিত। কিন্তু আজকাল অনেক স্থলেই পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে,

পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই; ফিজ্‌নার ইহার আবিষ্কার করিয়া, এটিকে জীবদেহ-পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সাহেব বহুযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনটি আজও পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; অস্থি পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পূর্ব্বে তিন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, এবং কোনও কারণে প্রথম দুই অংশ সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফিজ্‌নার গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, জীবিত মনুষ্যের মধ্যে শতকরা ৩৬ জনের পদ, উক্ত প্রকার বিকৃতাঙ্গুলীযুক্ত দেখা যায়, এবং ইহা্র মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক।

ফিজ্‌নারের এই আবিষ্কার সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইলে, অনেকেই এটিকে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বলিতে স্বীকৃত হন নাই; আধুনিক সভ্যতার বিস্তারের সহিত পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই দিবসের অধিকাংশ সময় পাদুকা ব্যবহারের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, জুতার চাপে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অস্থি জমাট হইয়া যায় বলিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের এই যুক্তি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, ভ্রূণস্থ শিশু ও এক হইতে সাত বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাগণের মধ্যে, এবং পাদুকাব্যবহারে অনভ্যস্ত অর্দ্ধ-অসভ্য জাতির মধ্যেও ঠিক পূর্ব্বোক্ত হারে বিকৃতাঙ্গুলি প্রত্যক্ষ করিয়া, ফিজ্‌নার উল্লিখিত যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নয় দেখিয়া, ইহা কোনও জাতি-গত অভ্যাস বা ব্যবহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া, আবিষ্কারক বিবেচনা করেন না। তিনি বলেন, মনুষ্য অস্থির গঠনাদি স্বভাবতঃই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং এই বিকৃতাঙ্গুলি, সেই অবনতির সূচনামাত্র; কালসহকারে এই প্রকার নানা পরিবর্ত্তন হইতে হইতে, ভবিষ্যতে নরদেহ এ প্রকার বিকৃত অবস্থায় উপনীত হইবে যে, অধুনাতন কালের নরদেহ, সেই সুদূর ভবিষ্যতের মানব শরীরের সহিত তুলিত করিলে, ইহা একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় জীবকঙ্কাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফিজ্‌নার এ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিকৃতাঙ্গুলি মানব দেহের পরিবর্ত্তনের বাস্তবিকই প্রারম্ভ, অথবা ইহাই অবনতির শেষ ও চরমসীমা,—তাহার কোনও মীমাংসা করেন নাই। সাহেব আজও উপ-স্থিত বিষয়টির গবেষণায় বিরত হন নাই। অঙ্গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, জীবিতদেহেও গ্রন্থিপরীক্ষা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার দেখিয়া, তিনি নানা অসভ্য ও নবাভ্যুদিত জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে নানাবিধ প্রমাণের সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। যাহা হউক, ফিজ্‌নারের ভবিষ্যৎ বাণী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, এখন পাঠক তাহা বিবেচনা করুন।

প্রতিশোধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বাবুর নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাহার দিনে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি সে সম্ভোগ করিত, সভ্যতর দেশে স্বতঃপূজিত প্রতিভা-শালীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কথা। বাস্তবিক নিজের অকুতোভয়তা এবং সহৃদয়তা বলে বিশ্বনাথ দস্যু ব্যবসায়কেও লোকমনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার কত লোকহিত এখনও বাঙ্গলার গল্পে-গল্পে উল্লাসে কথিত হইয়া থাকে।

অথচ এই বিশে ডাকাত বঙ্গসমাজের অতি নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এ দেশে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিত, তখনকার "মানসুরে"ও ডাকাতের দল তাহার প্রমাণ। এই ঘোর অরাজকতা, আমাদের বোধ হয়, দুইটি কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথম নিম্নশ্রেণীর অতিদারিদ্র্য, দ্বিতীয় তাহাদের উপর উচ্চতর সম্প্রদায়ের অত্যাচার। এ অবস্থায় যে কোন সমাজে কাপুরুষতা এবং দারুণ প্রতিহিংসার ভাব অত্যাচরিতের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলায় ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। এমনও শুনা গিয়াছে, একটিমাত্র রৌপ্যচক্রের লোভে "মানসুরে" ব্রাহ্মণতনয়কে হত্যা করিয়া দেখিয়াছে, তাহার "গেঁটে"র সে ধন একটি ডবল পয়সা মাত্র, টাকা নহে; এবং তার পর সেই নিহত যজ্ঞোপবীতধারীর বুকে ডবল পয়সাটি রাখিয়া, ক্ষুণ্ণমনে সে চলিয়া গিয়াছে। এই গল্পের মূলে যদি সত্য থাকে, তবে তাহা সমাজ এবং মনুষ্যত্বের কতটা অধঃপাত সূচনা করে, ভাবিলে জ্ঞান থাকে না।

বাঙ্গলায় মানুষের সহিত মানুষের যখন এই অহিনকুল সম্বন্ধ, তখন বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিল। সে এক দিকে ডাকাইতির কাপুরুষতা, এবং নিরর্থক অত্যাচার সংযমিত করিয়া দিল, অন্যত্র সে সময়ে যাঁহারা সমাজের নেতা—ধনবান এবং তাঁহাদের আশ্রয়ছায়ায় বর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল—তাঁহাদের যমস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসুরের দল প্রায় অন্তর্হিত হইল। ডাকাইতেরা স্ত্রীলোক, বালক এবং গরিব লোকেদের প্রতি বীরোচিত ক্ষমা এবং দয়া প্রকাশ করিতে শিখিল। এ দিকে দেশের ধনকুবেরগণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের অগাধ ধনের একাংশ বিশ্বনাথ বাবুর অবশ্য প্রাপ্য। সহজে না দিলে, সে বলে লইবে। সেই জন্য বিশ্বনাথের চিঠি পাইয়া যাহারা তাহার দাবি অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিত, বাঙ্গলা মুল্লুকে এমন প্রতাপশালী ব্যক্তি সে কালে দুই চারি জনের বেশী ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথের অনুচরগণের মধ্যে মেঘা এবং বৈদ্যনাথের নামই সুপরিচিত। ইহাদের প্রত্যেকে এক একটা দিক্পাল বিশেষ, অর্থাৎ দিক রক্ষা করাই তাহাদের মুখ্য কাজ ছিল। সম্প্রতি আমরা বৈদ্যনাথের পরিচয় দিতে বসিয়াছি। নদীয়া জেলার যে দিক্টার চিত্র এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে অঙ্কিত হইতেছে, প্রধানতঃ

সেই বটচ্ছায়াসংলগ্ন জীর্ণ ইষ্টকালয়ে বৈদ্যনাথ মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিত —ঘটনার দিনও ছিল। পূর্ব্ব রাত্রে একটা বড় রকমের ডাকাইতি করিয়া সে সদলে শেষরাত্রে প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধানে চূর্ণীনদীতীরস্থ নিবিড় বনে আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে মুখের কালীচূণ এবং সিন্দূররাগ ধোয়া মোছার পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করিয়া ডাকাইত মহাশয়দিগকে দিকে দিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছে। নিতান্ত ভালমানুষটি সাজিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জনপথে বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় বৈদ্যনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা কোনরূপে নিবৃত্তি করিয়া সে নিদ্রা দিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে এক খানা সওয়ারি নৌকা তাহার দ্বীপ বেষ্টন করিয়া যায়। গবাক্ষপথে বৈদ্যনাথ দেখিল, নৌকায় ৫।৭ জন মানুষ, সকলেই দাঁড় বা লগী লইয়া শশব্যস্ত। নৌকার ভিতরকার পর্দ্দাটা একটু একটু দেখা যাইতেছিল। কাজেই বৈদ্যনাথ বুঝিল, দিব্য একটা শীকার আপনা হইতে সিংহের গুহামুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সে সময়ে বৈদ্যনাথ ছাড়া সেখানে দলের আর কেহ ছিল না। কথা ছিল, সে রাত্রে সে সেই আস্তানায় বিশ্রাম করিবে, এবং পর দিন দলের লোক সেখানে আসিয়া জুটিলে সকলকে লইয়া দলপতির উদ্দেশে কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইবে। অতএব বৈদ্যনাথ শুধু স্থির নেত্রে নৌকার লোকগুলাকে দেখিতে লাগিল। জালে পড়িয়া সিংহ যেমন পলায়নপর মুখের শীকারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি স্থাপন করে, গোপসন্তান বৈদ্যনাথ তেমনি চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা নদীখাতে ছুটিয়া চলিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন গোয়েন্দা আসিয়া বৈদ্যনাথের নিদ্রাভঙ্গ করিল। সে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, দেবীপুরের যে ধনশালিনী ব্রাহ্মণ বিধবার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, আজ তাহার কন্যা মাতার ত্যক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া নৌকাপথে শ্বশুরালয়ে চলিয়াছে। ইহাও গোয়েন্দা জানাইল যে, তাহার গন্তব্য স্থান প্রায় তিন দিনের পথ—চূর্ণী এবং গঙ্গাসঙ্গমের খুব কাছাকাছি।

বৈদ্যনাথ গোয়েন্দাটাকে খুব একচোট কড়কাইয়া লইল। কেন সে ঠিক্ সময়ে খবর দেয় নাই,—তা হলে কি এমন শীকার হাতছাড়া হয়? এই অনু-যোগ যে শব্দালঙ্কারপরিহিত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, এ কালের কোন অভিধানে তাহার উল্লেখ নাই। অতএব এ পক্ষ লেখক অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়কে তাহা পাঠরূপ অগ্নিপরীক্ষায় আর ফেলিবেন না। গোয়েন্দা বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া সর্দ্দারকে বুঝাইল যে, সকল দোষ সেই ব্রাহ্মণবালিকার।

"সে বড় সেয়ানা মেয়ে মানুষ, ধর্ম্মাবতার, যাওয়ার কথা কারু কাছে ভাঙ্গে নি। হঠাৎ আমি শোন্‌লাম। যেমন শোনা, তেমনি আসা। কিন্তু এত করেও মনিবের মন পাইনে।"

গোয়েন্দা আত্মনিবেদন করিতে করিতে কাঁদ-কাঁদ হইয়াছিল, কাজেই বৈদ্য-নাথ যখন মুরুব্বিআনা করিয়া বলিল, "আচ্ছা এক ছিলিম গাঁজা সাজ দেখি," তখন সে সহজেই ভাবিল, তাহার কসুর মাফ হইয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে সর্দ্দারের হুকুম তামিল করিয়া গোয়েন্দা অতঃপর বলিয়া উঠিল, "হুজুর, বারদিগর বান্দা এমন কসুর আর কর্‌বে না।" বৈদ্যনাথ কোনও উত্তর দিল না। সে কি একটা ভাবিতেছিল।

বিশ্বনাথের আদেশমত পর দিন বৈদ্যনাথের সদলবলে তাহার অনুসরণ করিবার কথা এবং সেই বন্দোবস্তই ঠিক্‌ঠাক্ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে সওয়ারি পাল্কীখানা একেবারে হাতছাড়া হয়। বিশেষ দেবীপুরের ব্রাহ্মণবিধ-বার বিস্তর অর্থ ছিল, বৈদ্যনাথ জানিত। দুই একবার লোভপরবশ হইয়া তাহার গৃহলুণ্ঠনের উদ্যোগও করিয়াছিল, কিন্তু দলপতির ভয়ে পারিয়া উঠে নাই। বিশ্বনাথের কাছে একবার এই কথা উঠিলে, সে বলিয়াছিল, "যদি বাপের ব্যাটা হোস্, মরদের সঙ্গে লড়ে টাকা আন্। অনাথা বিধবার টাকার উপর ফের লোভ কর্‌বি ত তুই আমার ত্যজ্য পুত্তুর।" কিন্তু উপস্থিত লোভ সংবরণ করা বৈদ্যনাথের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, অতি গোপনে এ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে, ধর্ম্মবাপ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

ক্রমশঃ।

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

চীন।

চীন।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে সেনাধ্যক্ষ পারিয়ন লিখিয়াছেন যে, চীনদেশে সহসা এক জন নেপোলিয়ন বা বিসমার্কের অভ্যুদয় আশ্চর্য্য নহে, এবং তাহা হইলে চীন জগতের ইতি-হাসে ঘোরতর পরিবর্ত্তনসাধনে সক্ষম হইবে। চীনের জনসংখ্যা সমস্ত য়ুরোপের জনসংখ্যার অপেক্ষা প্রায় দশ কোটী অধিক; সেখানে সেনাগণ মরণভীতিশূন্য, নির্ভীকহৃদয়; তাহাদের অস্ত্রাদি অত্যন্ত সুন্দর এবং ইংরাজ ও

জর্ম্মান সেনাপতিগণ তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে যত্নবান; সেখানকার নৌবলও প্রতি বৎসর অধিকবলশালী হইয়া উঠিতেছে। শীঘ্রই চীন যুদ্ধে বা আত্মরক্ষায় একটি প্রধানতম বল হইয়া দাঁড়াইবে। লর্ড উলসলিও এই মতের পৃষ্ঠপোষক। সত্য বটে, বহু শতাব্দী হইতে চাইনিসগণ যুদ্ধাদির কোনও চিহ্ন দেখায় নাই, এবং নিতান্ত শান্তভাবাপন্ন জাতির মত বাস করিতেছে, কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইতিমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের কোনও কারণ ঘটে নাই।

যদিও এ পর্য্যন্ত চীন সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি চীন সম্বন্ধে এখনও আমাদিগের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস অনেক। কারণ ঐ সকল পুস্তককারগণ অনেকেই চীন দেশের ভাষা জানেন না, এবং সেখানকার কার্য্যাদি তদ্দেশীয় ভাবে দর্শন না করিয়া য়ুরোপীয় কুসংস্কার ও মতামতের রঙ্গিন চশমার মধ্য দিয়া সে সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। চাইনিসদিগের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু চীনে পরিবারই জাতীয়তার মূল, এবং সেই প্রায় চল্লিশ কোটী লোক আপনাদিগকে একপরিবারস্থ বলিয়া মনে করে—সম্রাট সেই পরিবারের পিতৃতুল্য। আবার আমরা এই ভাবিয়া থাকি যে, চাইনিসদিগের সভ্যতা স্থির নিশ্চল, তাহার উন্নতি নাই। পরন্তু আমরা যদি এক জন চাইনিস গ্রন্থকারের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি, তবে রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং নৈতিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে চাইনিস সভ্যতার স্থির ভাবের কারণ অন্য প্রকার, তিন বা চার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আদর্শানুযায়ী উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই এই নিশ্চলতা।

অজ্ঞতার কারণ।

প্যারিসে চাইনিস প্রতিনিধির কর্ম্মচারী, জেনারল চেঙ-কি-টঙ সম্প্রতি একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে তিনি "চাইনিস কর্ত্তৃক চিত্রিত চাইনিস" (The Chinese Painted by Themselves) নামক পুস্তক রচনা করেন, এবং এখন ফরাসী ভাষায় "আমার স্বদেশ" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সেই পুস্তক হইতে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

গ্রন্থকার বলেন যে, প্রত্যেক চাইনিস পরিবার রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরস্পরের মঙ্গলসাধনেচ্ছু। সমাজনীতি ও রাজনীতি অভিন্ন ভাবে সম্বদ্ধ, এবং এই সকলের মধ্যে অন্য দেশের ন্যায় দলাদলির হাঙ্গাম নাই। মহাত্মা কনফুচে কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে আজও শাসনকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, এবং সেখানে সেই মানবের উৎকৃষ্টতম আদর্শ আপনার ও অন্যের উন্নতিসাধনে সমর্থ। নয়টি বিভাগের কর্ত্তা নয় জন রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রধানতঃ রাজ্যশাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্থানীয় কার্য্যের জন্য আঠারটি প্রদেশে আঠার জন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত আছেন। ইহা ভিন্ন এক শত বিরাশি কর্ম্মবিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য তত জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন। চীনে পার্লামেণ্ট নাই; কারণ একটা সভা কেমন করিয়া শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে, তাহা দর্শনপ্রিয় চাইনিসগণ সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের এগার শতাব্দী পূর্ব্বে স্থাপিত টাউ-চা-ইয়াঙ্ চীনের নিজস্ব সম্পত্তি। সেরূপ ব্যাপার পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার সভ্যসংখ্যা ছাপ্পান্ন, এবং তাহা ভিন্ন কার্য্যতত্ত্বাবধানের জন্য বার জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন। এই সভ্যেরা শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের কর্ত্তা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাঁরা জনসাধারণের মনোনীত নহেন, সেখানকার একাডেমির তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্য হইতে সম্রাট ইহাঁদিগকে মনোনীত করেন। পরীক্ষা সহজ নহে, এবং আবেদনকারীদিগের মধ্যে

রাজনীতি ও সমাজনীতি।

যাঁহাদিগের চরিত্র উন্নত ও নীতিপ্রবণ, তাঁহারাই এই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের হস্তে যে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তাহা তুলনায় অত্যন্ত অসাধারণ, অসীম; কিন্তু তাঁহাদিগের অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি এবং পক্ষপাতশূন্যতাও অসাধারণ। তাঁহারা সাধারণ এবং সম্রাট, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। সাধারণের অভিযোগে তাঁহারা মনোযোগ দেন, তাঁহারাই দুর্ভাগ্যদিগের আশা ও ভরসাস্থল, এবং তাঁহারাই ক্ষমতাবান দুষ্কর্ম্মপরায়ণের এবং অক্ষম কর্ম্মচারীর ভীতির কারণ।

পিতৃভক্তি ও পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি সম্মানই চীনে সামাজিক বন্ধনের প্রধান সূত্র। সেখানে পরিবারের প্রতি ভালবাসা লোকের প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। যে কেবল আপনার জন্য জীবন ধারণ করে, সে সেখানে সত্যসত্যই অদ্ভুত জীব বলিয়া পরিগণিত হয়। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের কার্য্যের জন্য দায়ী, এক জনের সম্মানে সকলের সম্মান, এক জনের অপরাধে সকলের শাস্তি। কারণ, চাইনিসদিগের বিশ্বাস যে, পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষার অভাব বলিয়াই লোকে কুকার্য্যে রত হয়। এই জন্য সেখানে অপরাধসংখ্যা নিতান্ত অল্প। হানকতি প্রদেশের অধিবাসী সংখ্যা ২০০০০০০, সেখানে ৩৪ বৎসরে একটি মাত্র খুন হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী ২৫০০০০০০ অধিবাসীর বাসস্থান চিলাই প্রদেশের রাজধানী চিলাইয়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মোট ১২টি মৃত্যুদণ্ড প্রচারিত হইয়াছিল—এইখানে বলা আবশ্যক, কেহ তিন বার চুরি করিলে চীনে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। শিশুহত্যা বা অবৈধপ্রণয়জাত শিশু চীনে বড় নাই।

সমাজবন্ধন।

চীনের জনসংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও অধিক, তথাপি তথায় শাসনাদি সমস্ত কার্য্যের জন্য মোটের উপর ৩০০০০ লোকের প্রয়োজন মাত্র। গণনাতীত কাল হইতে চীনে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত। সেখানে সকল প্রধান কার্য্য পরিবারের প্রধানদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক সহর এবং পল্লীগ্রামে এক একটি বিদ্যালয় থাকা চাই—গভর্মেণ্ট কেবল পাঠের প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। অশিক্ষিত লোক চীনে বড় নাই। কিন্তু সাধারণের নীতিশিক্ষা গৃহেই হইয়া থাকে। সাধারণ শিক্ষাতালিকা এইরূপ,—সম্রাটের প্রতি ভক্তি, পিতামাতার প্রতি সম্মান, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে একতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে সদ্ভাব, বন্ধুত্বের দৃঢ়তা। অল্প বয়সে বালকবালিকাদিগের বিবাহ হয়। চীনে গার্হস্থ্যশাসনক্ষম হওয়াই রমণীর ইপ্সিত বাসনা। রমণীরাই সন্তানগণের শিক্ষার প্রধান কার্য্যকারী, তাঁহারা পরিবারের সুখের জন্যই জীবনযাপন করেন, এবং পতি ভাল হইলে তাঁহার অপেক্ষা আর কেহই অধিক সুখী নহে।

স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি।

চীন ফ্রান্সের প্রায় বাইশ গুণ হইবে। সেখানকার সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ কৃষিকার্য্য। য়ুরোপে যেমন এক একটা বড় বড় কারখানায় বহুসংখ্যক লোক কার্য্যে রত, চীনে তাহা নাই। তাই সেখানে গ্রন্থকারের মতে প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে কলহও নাই। ধর্ম্মসংগ্রাম কখনও চীনের ইতিহাসপৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নাই। সেখানকার লোক সেরূপ প্রকৃতির নহে। বুদ্ধ, কনফুচে ও লেওটাস, এই তিন মহাত্মার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণগৌরবে বর্ত্তমান। ইহা ভিন্ন খৃষ্টিয়ান, মুসলমান ও ইহুদীদিগের প্রতিও কিছু মাত্র অত্যাচার নাই। সত্য বটে, সময় সময় দুই এক জন খৃষ্টিয়ান উৎপীড়িত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কারণ রাজনীতি। তাহারা দেশের সকল আইনাদি অবহেলা করে, তাই এই শাস্তিবিধান। ইহুদীরা খৃষ্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে চীনে বাস করিতেছে, এবং কর্ম্মক্ষম হইলে রাজকর্ম্মচারীও হইয়া থাকে।

বাণিজ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি।

কাহারও অধঃপতন হয় না। লোকে কেবল চাষবাস ও খালকাটায় টাকা দিয়া ব্যবসা করে। এখন চীনে খালের সংখ্যা করা কঠিন ব্যাপার। খৃষ্টের জন্মের ২৩০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খাল-কাটা চলিয়া আসিতেছে। চীনের ব্যবসায়ীগণ খুব সচ্চরিত্র ও অন্যায়ের বিরোধী। এ সম্বন্ধে এক জন ফরাসীর কথা গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিতেছেন। তিনি বলেন যে, একবার একটি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য এক জন চাইনিস কনট্রাক্টরের সহিত তাঁহার কনট্রাক্ট হয়; তিনি অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম দেন। কিন্তু সহসা তাঁহাকে বদলি হইতে হইল—চাইনিস স্বেচ্ছায় তাঁহার টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছিল।

জগতে প্রকৃত ইতিহাসহীন দেশের সংখ্যা অল্প নহে—যদি এইরূপ পুস্তকের রচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাহা প্রকৃতই সুখের বিষয়।

মরক্কো।

আর্ল অফ্ মিথ "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি" পত্রে লিখিতেছেন, "আমি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু মরক্কোর মত অসভ্য দেশ আর দেখি নাই। সেখানে আইনের পরিবর্ত্তে অবিচার রাজত্ব করে।" মৃত সম্রাট বিনা কারণে তাঁহার সিংহাসনারোহণে সাহায্যকারীকে চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাসে রাখিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। সামান্য সৈনিকেরাও অপরাধী ধরিলে পুরস্কার পায় বলিয়া বিনাপরাধে লোক ধরিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করে। অন্যের দুর্দ্দশায় সেখানে লোকের সুখ! আমরা নিম্নে সেখানকার কারাগারের অবস্থা ও অত্যাচার বর্ণিত করিব।

সেখানে অপরাধের তারতম্য জ্ঞান নাই, সকলেই সেই এক কর্দ্দমাক্ত নরকতুল্য গৃহে একত্র বাস করে; শীতগ্রীষ্মে সেই একই অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থা। তাহাদের মধ্যে অনেকে অমানুষ অপরাধে অপরাধী; কাহারও বা অপরাধ অর্থ। এইরূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার কামনায় পিশাচ রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে বিনাপরাধে এই নরকে নিক্ষেপ করে। কারাবাসীদিগের গলদেশে একপ্রকার লৌহনির্ম্মিত কলার (collar) থাকে, হয় ত সন্ধ্যার সময় এই কলারে শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া সকল কারাবাসীকে একত্র বন্ধন করা হয়। এক জন দাঁড়াইলে সকলকে দাঁড়াইতে হয়, এক জন বসিলে সকলকে বসিতে হয়, এবং এক জন শয়ন করিলে সকলকে শয়ন করিতে হয়। কি ভীষণ দৃশ্য! ইহা ভিন্ন অপরিষ্কার পয়ঃপ্রণালীগুলি যে কি নারকীয় দুর্গন্ধ বিস্তার করে, তাহা বর্ণনা করা কখনই সম্ভব নহে। কারাগারের তত্ত্বাবধান নাই, চিকিৎসার বন্দোবস্ত নাই, রোগীর কোনও প্রকার শুশ্রূষার সম্ভাবনা নাই। অনেকে ধর্ম্মার্থে কারাবাসীদিগের আহারীয়ের জন্য টাকা জমা দিয়া গিয়াছেন, যদি কোনও হতভাগ্য কারাবাসী দারিদ্র্যবশতঃ আপনার আহারীয় ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তবে সেই টাকা হইতে তাহাকে প্রত্যহ এক একখানি ক্ষুদ্র রুটি দেওয়া হয়। তাহাতে কেবল অনাহারযন্ত্রণা আরও বর্দ্ধিত করিবার জন্য জীবন দীর্ঘ করে।

কারাগার না নরক?

মরক্কোয় অপরাধীর শাস্তি ভীষণতম। এনজিরার বিদ্রোহের সর্দ্দারদিগের শাস্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ধৃত ব্যক্তিদিগের দক্ষিণ হস্তে প্রতি গাঁইটে তীক্ষ্ণধার খুর দিয়া হাড় পর্য্যন্ত মাংস কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যন্ত্রণা বর্দ্ধিত করিবার জন্য হস্ত পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া ক্ষতস্থানে লবণ ঘসা হইয়াছিল। তাহার পরে করতলে তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া বলপূর্ব্বক অঙ্গুলিগুলি সঙ্কুচিত করিয়া কাঁচা গোচর্ম্ম হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চামড়া শুকাইয়া যত সঙ্কুচিত হইতে লাগিল, ততই যন্ত্রণা

শাস্তির যন্ত্রণা।

বাড়িতে লাগিল। অনেকে যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, অনেকে উন্মত্ত হইয়াছিল, এবং যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদের বাহু পচিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল। মানব এত দূর নিষ্ঠুরও হইতে পারে?

অনেকের মতে খৃষ্টীয়ান জাতিরাই এই অত্যাচারের জন্য দায়ী। য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ঈর্ষ্যা, সন্দেহ এবং ভয় না থাকিয়া যদি সদ্ভাব থাকিত, তবে মরক্কোর মত বর্ব্বর অত্যাচারী রাজত্ব নিশ্চয়ই ধরণীর বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইত।

কাশ্মীরে প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি।

ন্যাশান্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি সভায় শ্রীমতী লোগান "কাশ্মীরে প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে গাম্ভীর্য্য বড় নাই, এবং স্থানে স্থানে ভারতবাসীর প্রতি লেখিকার ঘৃণাও সপ্রকাশ। তিনি যথাসম্ভব এই ভাব অপ্রকাশ রাখিয়াছেন, তথাপি সে নাসিকা-সঙ্কুচন স্থানে স্থানে স্বইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

কাশ্মীরের রাজস্বের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য ইংরাজ গভর্মেণ্ট বোম্বাইয়ের একাউণ্টাণ্ট জেনারেলকে পাঠাইয়াছিলেন, বিবি ছিলেন তাঁহার সহচরী।

আকবরের সময় হইতে কাশ্মীরের হস্তান্তরের সামান্য ইতিহাস দিয়া শ্রীমতী লোগান বলিতেছেন যে, বড় দুঃখের বিষয়, ৭৫ লক্ষ টাকার জন্য কাশ্মীর বিক্রীত হইয়াছিল। কাশ্মী-রের—ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সেখানকার উর্ব্বর ভূমি—যেখানে উভয় মহাদেশের বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে,—সেখানকার প্রায় অব্যবহৃত মণি, স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহ ও কয়লার খনি দেখিয়া, তাঁহার দুঃখ হইয়াছিল। বিক্রীত না হইলে আজ কাশ্মীর রুগ্ন ইংরাজ সৈনিকের রুগ্নাবাস হইতে পারিত, আর দেশীয়দিগকে হিংস্র জন্তুর মত দূর করিয়া দিয়া, বা বন্দুক এবং পদাঘাত, এই দুই মহান অস্ত্র ব্যবহার করিয়া তাহাদিগের "নেটিব" জন্ম সার্থক করাইয়া দিয়া, এখানে ইংরাজের একটি উপাদেয় উপনিবেশ উজ্জ্বলভাবে বৃটিশসিংহের অসীম, অপ্রতি-হত, অসাধারণ ক্ষমতা চিরদিন প্লীহা-যকৃৎ-দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতবাসীর নিকট ব্যক্ত করিত। হায় এই কাশ্মীর বিক্রীত হইয়াছিল!

কাশ্মীর কি হইতে পারিত।

লেখিকা বলেন, পথের কষ্ট যথেষ্ট। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের ট্রেণ যে কি জিনিস, তাহা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে এক ঘণ্টা সেই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। তাহার পর রাউলপিণ্ডী হইতে সে কষ্ট ব্যক্ত করা যায় না। এখনও পথের কাছে বড় বড় পাথর দেখা যায়, বরফের নদী বাহন হইয়া কোন্ দূরদেশ হইতে তাহাদিগকে বহিয়া আনিয়াছে! পথপার্শ্বে ফেনিল উচ্ছ্বাসে, অসীম আবেগে আকুল ঝিলাম নদী ছুটিতেছে। আরও উপরে তাহার পুরাতন প্রবাহের পরিত্যক্ত পথ আজও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে সেতুগুলি কি ভয়াবহ! কোথাও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যাইতে হয়; এক স্থানে অশ্বচালক বলিল যে, দুই মাস পূর্ব্বে তিন জন আরোহী সহিত একখানি এক্কা সেই সেতুর উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সহস্র ফিট নিম্নে গভীর গর্জ্জনে গর্ব্বাকুলগতি নদী ছুটিতেছে, হতভাগ্যদের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পথে।

কিছু দূর গিয়া বহমৌলা হইতে অশ্বারোহণ আরম্ভ; সেখানে উত্তাপ অসাধারণ, অসহ্য।

এখান হইতে উত্থান। সেই বন্ধুর ভূমির যে দিকে চাও, ঘনবিন্যস্ত ফারবৃক্ষশ্রেণী শাখার শাখায় বদ্ধ হইয়া কোথাও কোথাও পথ হইতে সূর্য্যকর যত্নে অপসৃত করিয়াছে। বেলা প্রায় চারিটা পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে হইল; সহসা ফার-তরুমালা সীমারেখায় আসিয়া দাঁড়াইল, আর সম্মুখে সেই সুরপুরের কল্পনাতীত কমনীয় ছবি,—সেই লোকবিশ্রুত ভূস্বর্গ কাশ্মীর! পণ্ডিতমণ্ডলী যাহাই বলুন, লেখিকার মতে ইহাই সেই চিরাভিলষিতদর্শন ইডেন উদ্যান। সম্মুখে নদীর তরঙ্গভঙ্গের মত প্রান্তর সমভাবে কতদূর বিস্তৃত! নিম্নস্থান ঘনশ্যামশ্যামমণ্ডিত এবং প্রত্যেক উচ্চ স্থান সকল বর্ণের কুসুমে মণ্ডিত,—সেই কুসুমবসনে কোথাও একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও নাই। সেই শ্যাম ভূমির উপর গলিতরজতধারার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ সুন্দর স্রোতস্বতী-সমূহ! চারি ধারে দেবদারুর বেষ্টন, সর্ব্বোচ্চে সেই গণনাতীত কালের মহিমাময় গিরি-সম্রাটের শ্বেত তুষারমণ্ডিত স্থির শির, কালের তরঙ্গমালা বৃথা তাহার শিলাময় সমুচ্চ শরীরে আপনার প্রভাবচিহ্ন স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে! সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অসম্ভব।

ইহার পরেই শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতে হয়—শ্রীনগর এখান হইতে ত্রিশ মাইল। প্রথম দশ মাইলের দৃশ্য বড় সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। এই শিলাখণ্ডের উন্নত মস্তকের নিম্নে সূর্য্য-রশ্মির প্রবেশাধিকার নাই, আবার এই পথের উপর সূর্য্যকর পূর্ণমহিমায় পথিকের উপর পতিত। কিন্তু হায়, এই স্বপ্নরাজ্য,—এই মায়াপুরী শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। দুই ধারে কেবল বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। কাশ্মীরে প্রজারা রাজস্ব মুদ্রায় না দিয়া শস্যে দিয়া থাকে। তাহার পর, কেবল জলাভূমি ও জলস্রোত। পথপার্শ্বে পল্লীগ্রাম গুলি ধূলিময়, এখনও শত শতাব্দীর অতীত অসভ্য আবর্জ্জনাময় দৃশ্য। এক স্থানে এক শত জন্তু সাঁতার দিতেছিল—জলস্রোত খুব বিস্তৃত। পথে উত্তাপ অসহ্য। কিন্তু ক্ষণকাল পরে আবার ঝিলামতীরে উপনীত হইতে হয়, এখানে ঝিলাম খুব বিস্তৃত। সেখান হইতে নৌকা-যোগে শ্রীনগর যাইতে হয়। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ—সেই টীন-মণ্ডিতচূড় মন্দির, আর তাহার উপর তুষারনিবারণের জন্য একটা ছাতার মত জিনিষ, সেই আস্ত আস্ত বৃক্ষ দিয়া নির্ম্মিত সাতটি সেতু—এই একঘেয়ে দৃশ্য। আর একটা জিনিসের উল্লেখ করিতে হয়। সেগুলি "নৌগৃহ"। নৌকার উপর চাটাইনির্ম্মিত অন্ধকারময় একটা ঘর; তাহার মধ্যে চাটাই দিয়া বিভক্ত। এক দিকে নৌচালকের পরিবার ও এক দিকে যিনি ভাড়া লয়েন,—তিনি, বাস করেন। আসবাব কিছু মাত্র নাই এবং আলোকের আবশ্যক হইলে চাটাইয়ের একাংশ সরাইতে হয়। সেই মুক্ত পথ দিয়া অনেক সময় রমণীর বস্ত্রপরিবর্ত্তন বা পুরুষের ক্ষৌরকার্য্য দৃষ্ট হয়, ইহাতে কাশ্মীরিদের সঙ্কোচ নাই।

অগ্রগতি।

এখন কথা হইল, লেখিকা প্রথমে কি দেখিতে যাইবেন। সকলেই বলিল, প্রথমে ঢাল হ্রদ দেখা উচিত। নাম শুনিয়া বড় আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইল না; যাহা হউক, নৌকারোহণে যাত্রা করা হইল। আর কোনও পরিশ্রম নাই—বাহকেরা বাহিয়া চলিল। কাশ্মীরে জলপথের অভাব নাই—যেখানে অভাব হইয়াছে, সেখানেই খাল কাটা হইয়াছে। ঐ শুন! সেতুর নিম্ন দিয়া যাইবার সময় মাঝিরা সমস্বরে কি চীৎকার করিতেছে।

ঢাল হ্রদ।

তাহার পর সেই হ্রদ। তাহার বর্ণনা অসম্ভব। এক এই হ্রদ দেখিলেই কাশ্মীরযাত্রা সার্থক বলিয়া মনে হয়। সেই বহুদূরবিস্তৃত স্বচ্ছ জলরাশি—কি স্বচ্ছ! স্থির স্রোতোহীন হ্রদবক্ষ,—নীল নভোমণ্ডল, বহুদূরস্থিত শৈলমালা ও জলতলে প্রতিবিম্বিত মেঘ সূর্য্য—সেখানে তেমনই রহিয়াছে! দলে দলে উজ্জ্বলকায় মৎস্য ঘুরিতেছে ফিরিতেছে উঠিতেছে নামিতেছে, কোথাও জলতল জলজ লতাদিতে পূর্ণ, আর উপরে ছোট ছোট পদ্মের মত এক প্রকার ফুল

ও হরিদ্রাবর্ণ ফুল। তাহার পর বৃহৎ পত্রের মধ্যে শ্বেত শতদল হ্রদের বিমল বিশুদ্ধ হাস্যের মত প্রস্ফুটিত। সে সৌন্দর্য্য না দেখিলে কেহ অনুভব করিতে পারিবে না। সমস্ত হ্রদের অর্দ্ধেক কেবল জল, আর অবশিষ্টাংশ ছোট ছোট দ্বীপে পূর্ণ—কোথাও একটি গো ও গোবৎস, কোথাও বা মরালমরালীরা মনোরম শয্যায় শয়ান। কোনটির উপর আবাদ হইতেছে। কাশ্মীরিরা দ্বীপ প্রস্তুত করে। ঘন জলজলতাদি একত্র বাঁধিয়া তাহার শিকড় কাটিয়া দ্বীপ প্রস্তুত করিলেই হইল,—তাহার পর একটা খোঁটা পুতিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই চলিতে পারে। যখন তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে, তখন সেটি দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আবাদ সহিত অপর একটি দ্বীপের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেই চলে।

অল্প জলে উইলো জন্মিয়াছে, ঐ ছোট ছেলেরা কর্দ্দমের মধ্যে খেলা করিতেছে, হংসগুলি মনের আনন্দে সাঁতার দিতেছে। সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িল—চারি ধারে শৈলমালা তাহার বিদায়-আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সরমে রক্তাভ। দূরে শ্বেত গিরিচূড়ার উপর সেই স্বর্ণাভ বর্ণ যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটি দ্বীপে গিয়া নৌকা লাগিল। সেই দৃশ্য মধ্যে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে বৃটিশ রমণী কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে কোনও কৌতুক-প্রিয় মুসলমানসুন্দরীর সন্তোষার্থ এই দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই একটি গ্রীষ্মাবাস ও তিনটি বৃক্ষ বক্ষে লইয়া দ্বীপ হাসিত, আর সুন্দরী তাঁহার প্রিয়তমের সহিত এই দৃশ্য দেখিতেন। এখনও গ্রীষ্মাবাসের ভিত্তির ভগ্নাবশেষ আছে,—আর বৃক্ষ তিনটিও বর্ত্তমান। কালের করাল করের কঠোর কীর্ত্তি! যদি ঐ জড় প্রস্তরখণ্ড কথা কহিতে পারিত, তবে হয় ত এই দ্বীপ কত অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা (!) বিস্মৃতপ্রেম ও ঘৃণার (!) কথা কহিত। সূর্য্য অস্তাচলে বিরামশয়নে,—নলিনী প্রভাতের স্বপ্নে মুদিতনয়ন, হংসকুল ফিরিয়া যাইতেছে। কাজেই সেই নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরতলে নৌকা বাহিয়া বিবিকে আবার আবাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

তাহার পর সহর-দর্শন। প্রধান বক্তব্য বিষয়, সেই সাতটি সেতু স্তূপাকার বৃক্ষকাণ্ডের থাম; দেখিয়া বোধ হয়, এক দিন দৈত্যশিশুরা খেলার ছলে উভয়তীরে কতকগুলি স্রোতে আনীত বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর খানকয়েক কাষ্ঠ ফেলিয়া গিয়াছে। নদীর তীর-ভূমি ত্রিতল বা চতুস্তল গৃহে পরিপূর্ণ,—কাষ্ঠনির্ম্মিত, কারুকার্য্যসুশোভিত, মলিন, জীর্ণ গৃহ। নদীবক্ষ হইতে দেখিতে সুন্দর। সহরে নামিলে সৌন্দর্য্য আর মনে থাকে না। বারা-

সহর।

ণসী বা নেপল্‌স্ বা লণ্ডন ও প্যারিসের সহরপ্রান্তেও এত দুর্গন্ধ ও ময়লা নাই। যদি ঝিলামনদী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সকল আবর্জ্জনা বহন না করিত, তবে না জানি আরও কি হইত! ছোট ছোট রাস্তা,—হস্ত প্রসারিত করিলে উভয় পার্শ্বের গৃহ স্পর্শ করা যায়। রাস্তার পাথর এমন অযত্নরক্ষিত যে, অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার যো নাই। আর দুই ধারে নর্দ্দামা ও ছোট ছোট দোকান;—বোধ হয় একটা দোকানে দশ টাকার জিনিস আছে। মূল্যবান দ্রব্যের ব্যবসা জন বার ধনী সওদাগরের এক-চেটিয়া। রাস্তায় এত কুকুর যে, ভয় হয়, একটা না একটা পদতলে পতিত হইবে। লেখিকা আপনাআপনি ভাবিলেন, এই সকল হতভাগা "নেটীব" এক দিনে মরিয়া যায় না কেন! শীতের তীব্রতা তাহাদিগের চিকিৎসক, গ্রীষ্মের মুক্ত বায়ুতে পরিশ্রম তাহাদিগের ধাত্রী, আর অল্পমূল্য খাদ্য ঔষধ অপেক্ষাও ভাল।

সহরে অনেকগুলি অদ্ভুত রকম মন্দির দেখা যায়। ভারতবর্ষে সচরাচর যেরূপ গম্বুজ দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা কিছু সোজা রকম গম্বুজ, আবার কোনও কোনটায় কাষ্ঠের ছাতার মত একটা জিনিস,—তুষারনিবারণের জন্য ইহা ব্যবহৃত। মন্দিরগুলা টিনে মোড়া; হয় ত তাহা

কেরোসিন তৈলের বাক্সের টিন, প্রথমে খুব উজ্জ্বল ছিল, কিছু দিন পরে কেমন যেন বিষাদ-মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শীলতাবিহীন চতুর্দ্দশবৎসরবয়স্ক বালক ও প্রায় একাদশবৎসরবয়স্কা বালিকারা উলঙ্গ হইয়া মরাল-দলের মত নদীতে সাঁতার দিতেছে;—ঘাটগুলি জনপূর্ণ। ইডেন উদ্যানের সেই নগ্নতারও অভাব নাই। যখন কোনও য়ুরোপীয় পুরুষ বা রমণী নৌকারোহণে যাইতেছেন, তখন বালিকারা জলমধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, নৌকা চলিয়া গেলেই তাহাদের তরল হাস্য দূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু কাশ্মীরের চিরপ্রসিদ্ধ সুন্দরীগণ কোথায়? এত দূর আসিয়া এই স্বপ্নরাজ্যে অপ্সরঃসদৃশী সুন্দরীদের সন্দর্শনাশায় সত্যসত্যই হৃদয় ব্যাকুল হইয়া ওঠে। কিন্তু যাঁহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই, তাঁহারা সুন্দরী নহেন; হয় ত জেনানার জীবন্ত যাতনাময় পাপ আবরণ, প্রকৃত সুন্দরীদিগকে বায়ু, সূর্য্যালোক ও মানব দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছে। সময় সময় গতিশীল নৌকামধ্য হইতে দুই একটি সুন্দর মুখ, দীপ্ত কৃষ্ণতার দীর্ঘ নেত্র, সুন্দর নয়নপল্লব, সুগঠিত নাসিকা, রক্তাভ গণ্ডস্থল ও লোহিত অধরোষ্ঠের ক্ষণস্থায়ী ছবি নয়নপথে পতিত হয়। কিন্তু হায়, সেই বিজড়িত বেণী, সেই এক অপরিষ্কার পশমী পোষাক। আসল কথা, কাশ্মীরিরা বড় দরিদ্র; এবং দারিদ্র্য ও সৌন্দর্য্য পরস্পরবিরোধী।

মন্দির ও মানব।

কাশ্মীরে রমণীদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়; এমন কি, দশ বৎসরের বালিকারাও ধান ভানিতেছে। তাহারা হাস্যপ্রফুল্লমুখ, ফটোগ্রাফ তোলাইতে বড় আমোদ পায়, আর তার পর হাতে একটি পয়সা দিলে সে আনন্দ দেখে কে! হয় কোলে, নয় পিঠে, নয় পার্শ্বে একটি শিশু,—পঁচিশ বৎসরেই তাহাদিগকে বৃদ্ধা দেখায়। জেনানার এখানে কঠোর প্রতাপ। এক জন বঙ্গরমণী বলিলেন যে, তিনি কলিকাতার মত এখানেও স্বাধীনভাবে থাকিতেন, কিন্তু লোকে তাঁহার স্বামীকে এত নিন্দা করিতে লাগিল যে, তিনি জেনানার নিভৃত অন্তরে আশ্রয় লইয়াছেন! কাশ্মীরে সন্তানবতী হওয়াই রমণীর সর্ব্বপ্রধান সুখ, আর তাহার অভাব মর্ম্মান্তিক যাতনা। পিত্রালয় ও স্বামীর আলয় ভিন্ন তাহারা আর কোথাও যায় না। আর লণ্ডনে এই সভা, সমিতি, বক্তৃতা, তর্ক, রাজনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা, ধাত্রীগিরী,—এই সকল কার্য্যে রমণীদের হাঁপ ছাড়িবার সময় থাকে না। কবে লণ্ডনের রমণীরা ভাবিবেন, আর কাজ জড়াইবার আবশ্যক নাই! তাহারা যদি নিতান্ত অলস হয়, ইংরাজরমণীরা অতি-রিক্ত কার্য্যতৎপর।

অক্টোবর মাসে বড় লাট কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তখন রাজস্বের অবস্থা মন্দ হইলেও তাঁহার অভ্যর্থনায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতে রাজার আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, তাহা হয় নাই। তবে তাঁহার আগমনের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল; রাস্তায় জল, গৃহে জল, সকলেই হতাশ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার আগমনের দিন সূর্য্য প্রভাতেই পূর্ণমহিমায় প্রকাশ পাইল। শ্বেত শৈলশিখর সেই তপনকিরণে সমুজ্জ্বল, আর বৃক্ষলতা নবপত্রে সুশোভিত। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় লাটের নৌকা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নদীর তীর লোকে পরিপূর্ণ, নানা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত বৃহৎনৌকা লাটপত্নী, লাট ও মহারাজাকে বহন করিয়া বৃহৎ জলচরের মত আসিতেছিল। সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। এক দিন লাটসাহেবের একটি সমিতিতে লেখিকা উপস্থিত ছিলেন, লাডকের বাদ্যকরদিগের ও নানা বীভৎস-মুখস-পরিহিত নৃত্যকারীদিগের নৃত্যই সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

লর্ড ল্যান্সডাউন।

রাজভ্রাতা অমরসিংহের সহিত লেখিকা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রথমে কথাবার্ত্তার বিষয় লইয়া বিপদ উপস্থিত হইল। পরে যখন জানিলেন যে, তিনি ফটোগ্রাফি জানেন, তখন

নানাকথা হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা কথোপকথনে ব্যস্ত, তখন লেখিকার পাঁচ বৎসর-বয়স্কা বালিকা প্রাসাদপ্রাঙ্গণে আসিয়া মাহুতকে নিয়া গজারোহণ করিয়াছে। রাজা তাহাকে কয়েকটি খেলানা দিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে ধন্যবাদপত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন। কাশ্মীরের লোকে সকলেই এমন প্রফুল্ল!

রাজভ্রাতা।

আজও প্রতি বৎসর তিনখানি করিয়া কাশ্মীরি শাল ইংলণ্ডের রাণীকে প্রেরিত হইয়া থাকে। অতি পুরাকালীন ফেসানের তন্তুতে তাহা প্রস্তুত হয়—তন্তুর গায় ময়লা কাগজের উপর লেখা থাকে, কোন্ সূতার পর কোন্ সূতা ব্যবহার করিতে হইবে। ভাল একখানি শাল প্রস্তুত করিতে তিন বৎসর সময়ও লাগে। সেখানে শালের মূল্য ১০ টাকা হইতে ১৬০০০ টাকা পর্য্যন্ত। কাশ্মীরে কার্পেটও হয়। ধাতব দ্রব্য ভাল, কিন্তু তাহার কারুকার্য্যের আদর্শ সেই পুরাতন একঘেয়ে রকমের।

শাল।

কাশ্মীরে ফল যথেষ্ট—দ্রাক্ষাক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, তাহা হইতে মদ্যও হয়। আর একটা কথা আছে, কাশ্মীরে ভূমিকম্প প্রায়ই হয়। আচার ব্যবহার সম্বন্ধে লেখিকা বড় কিছু বলেন নাই। শেষে বলিয়াছেন যে, ফিরিবার সময় নৌকার কষ্টের পর পথে আর বড় কষ্ট হয় নাই। কারণ, লাট সাহেবের শুভাগমনের সময় সমস্ত পথ ঘাট ভাল করা হইয়াছিল।

সমাজনীতি।

মহিলাসমাজ।

বর্ত্তমান সময়ে মহিলাদিগের বিষয়ক তর্কে এখন য়ুরোপীয় সমাজ পূর্ণ—সে প্রবাহ এখন এমন প্রবল বেগে প্রবাহিত যে, দূর বঙ্গদেশেও এখন তাহার দুই একটি তরঙ্গাঘাত দৃষ্ট হইতেছে। এই সকল তর্ক যে আমাদিগের পক্ষে উপকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, আমরা এখন নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, সমাজ কি আকারে গঠিত হইবে, তাহাই এখন বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। "হিউম্যানিটেরিয়ান" পত্রিকায় লেডী ভায়লেট গ্রেভিল "গৃহপ্রিয় রমণী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন; আমরা পাঠকদিগের কৌতূহল-নিবারণের জন্য এখানে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম।

লেখিকা বলেন, গৃহপ্রিয় রমণী এখন অতীতের মধ্যে পড়িয়াছেন। বাস্তবিক গার্হস্থ্য-জীবনও একরূপ শেষ হইয়াছে। কোনও উত্তেজক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকাই এখন রমণী-দিগের বাসনা,—তাহা তরুণীদিগের পক্ষে ভীষণ ফলপ্রদ, তরুণীহৃদয় সেই বাসনাবিষে বিষাক্ত। এখনকার রমণীদিগের আর সে গৃহ-প্রিয়তা নাই, আবার এখনকার রমণীরা রমণীর ধর্ম্ম ও সামাজিকবন্ধনের মূল বিবাহেও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকেন! ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন রমণীরা পুরুষের চরিত্র ও সমাজসংস্কারে সারথি বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু লেখিকা বলেন যে, বাস্তবিক চরিত্র-হীন, এবং পূর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবাপন্ন পুরুষকে বিবাহ করিতেই এখন রমণীর আনন্দ।

গার্হস্থ্য জীবন।

লেখিকা বলেন, অনিচ্ছাপ্রবৃত্ত জননীত্ব একটা কথার কথা। প্রকৃতপক্ষে এখন রমণীরা জননীত্ব ঘৃণা করেন, ইহা অপেক্ষা ভীষণ আর কি হইতে পারে? ইহার অর্থ,—এখন রমণীর রমণীত্ব, হৃদয়ের চিরপ্রসিদ্ধ কোমলতর বৃত্তির বিকাশ নাই। ধ্বংস-প্রবৃত্তিই ইহার আর এক নাম। সত্য হইলে বাস্তবিক এ অবস্থা

জননীজীবন।

বলিয়াছি, সত্য হইলে বাস্তবিক এ অবস্থা ভীষণ হইতেও ভীষণতম। এখন কর্ত্তব্য কি? লেখিকা বলেন, যদি সত্যসত্যই রমণীরা পবিত্রতা ও সম্মান ভালবাসেন, যদি তাঁহারা পুরুষের ভাগ্যগঠনকারিণী হইতে চাহেন, তবে উচ্চতর আদর্শের আবশ্যক। হীন অর্থপূজা পরিত্যাগ না করিলে কিছু করিতে পারিবেন না। ধনী অপেক্ষা মহৎহৃদয় ও পবিত্রতাপরায়ণের পূজা করাই শ্রেয়ঃ, বিবাহেও পার্থিব সামান্য বাবুয়ানী অপেক্ষা উচ্চতর উদ্দেশ্যই রমণীর লক্ষ্য হওয়া অভিপ্রেত। রমণীর সমবেত চেষ্টায় সমাজ হইতে হীনতার অন্ধকার দূর হউক, এবং গৃহ পবিত্রতার পুণ্যক্ষেত্র হইয়া চিরদীপ্ত সুখস্বচ্ছন্দের ক্রীড়াভূমি হউক। এই হীনতার স্থানে প্রেমের সমতা, ন্যায়ের সততা, এবং রমণীর স্বভাবজ কোমলতা মানবসমাজকে উন্নততর করিয়া তুলুক।

কর্ত্তব্য কি?

রহস্য।

বিদ্রূপ।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক এড্‌ওয়ার্ড এসকু সথার্ণের কার্য্যবিবরণীর সুলভ সংস্করণ সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। সথার্ণ তাঁহার কার্য্যগত রসিকতার (practical joking) জন্যই প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে দুই একটি নমুনা দিতেছি।

ডাক-বিভাগের সহিত পরিহাসপ্রিয়তা সথার্ণ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার খামের উপর নানাপ্রকার অদ্ভুত কথা ছাপান থাকিত। আর একটি প্রিয় রসিকতা এই ছিল যে, তিনি অতি দূরে কোথাও এক বন্ধুর ঠিকানায় একখানি পত্র দিতেন—ঠিকানা পেন্‌সিলে লিখিত হইত। বন্ধুকে লিখিয়া দিতেন, তিনি যেন ঐ ঠিকানা মুছিয়া আর একজন বন্ধুর ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানেও পূর্ব্ববৎ বন্দোবস্ত ছিল—এইরূপে দশ বার স্থান ঘুরিয়া পত্র আবার তাঁহার হাতে পড়িত। তখন তিনি পেন্‌সিলের লিখিত ঠিকানা মুছিয়া কালি দিয়া লণ্ডনে একজন লোকের নামে ঠিকানা লিখিয়া দিতেন, এবং নানা স্থানের মোহরাঙ্কিতকলেবর খামের মধ্যে এক মাস পূর্ব্বের তারিখ দিয়া একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতেন। কোথায় এক মাস পূর্ব্বে অভিলষিত আহার, আর কোথায় এক মাস পরে এই পত্রপ্রাপ্তি! লণ্ডনে একজন ভদ্রলোকের ঠিকানা লিখিত পত্রখানি ব্রাসেল্‌স্, গ্লাস্‌গো, ডবলিন্, ব্রাইটন্, কর্ক প্রভৃতি দশ বার স্থানে গেল কেমন করিয়া? পত্র পাইয়াই পত্রগ্রাহক এক দরখাস্ত ঝাড়িবেন, এবং অনুসন্ধানের সময় ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পোষ্টমাষ্টারগণ অবাক হইয়া হাঁ করিয়া থাকিবে, ইহাতে তাঁহার বড় আনন্দ বোধ হইত।

ডাক-বিভাগে।

তাঁহার বন্ধু নিউইয়র্কের মিষ্টার ফ্লোরেন্সের সহিত তিনি অনেক কার্য্যগত রসিকতার অবতারণা করিতেন। কখন বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন যে, ফ্লোরেন্‌স্ নানাজাতীয় কুক্কুর কিনিতে চাহেন; আর দলে দলে কুক্কুর বিক্রেতারা তাঁহাকে বিরক্ত করিত। কখন বা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফ্লোরেন্সের গৃহে শববাহীদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। এক দিন মিষ্টার ফ্লোরেন্স কয়েকটি বন্ধুকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যখন আহার ও আনন্দ চলিতেছে, তখন এক জন অতিথি আহারগৃহ হইতে উঠিয়া কি কার্য্যবশতঃ অন্য কক্ষে গেলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, এক জন বৃদ্ধ গৃহস্বামীর সাক্ষাৎপ্রার্থী,—দেখা না করিয়া সে কিছুতেই যাইবে না। মিষ্টার ফ্লোরেন্স গিয়া দেখিলেন, দ্বারে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছে। সে নিতান্ত বৃদ্ধ ও

বন্ধুর অতিথি।

থণ্ড। তিনি তাহাকে কক্ষমধ্যে আসিতে বলিলেন। আগন্তুক বৃদ্ধ বলিল যে, আমেরিকায় সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এবং তাহার পরিবারবর্গের এক জনও ইহসংসারে নাই; সে এখন ইংলণ্ডে গিয়া মরিবে, এই তাহার ইচ্ছা। সে কতকগুলি দ্রব্য বেচিতে আসিয়াছে, এবং যদি তিনি ঐগুলি লইয়া তাহাকে তিন শত ডলার দেন, তবে সে দেশে যাইতে পারে। জিনিসগুলি খুব ভাল দেখিয়া গৃহস্বামী দ্রব্যগুলি আগন্তুকের প্রার্থিত মূল্যে কিনিলেন। তাহার পর আহারগৃহে ফিরিয়া আসিয়া চাকরকে বলিলেন, ভিখারীকে বিদায় করিয়া দাও; চাকর বলিল, সে চলিয়া গিয়াছে।

দুই এক জন বন্ধু বলিলেন, হয় ত আগন্তুক জুয়াচোর, এবং সে কিছু চুরি করিল কি না দেখা উচিত। তখন গৃহস্বামীর মনে হইল, জিনিসগুলা ঠিক তাঁহার জিনিসের মত। ছুটিয়া তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন—হরি! হরি! সে তাঁহার জিনিস তাঁহারই নিকট বেচিয়া গিয়াছে। তখনই শোরগোল পড়িয়া গেল, এবং পুলিসে সংবাদ পাঠান হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক জন ভৃত্য বলিল, সে বৃদ্ধকে উপরে উঠিতে দেখিয়াছে। পুলিস ছুটিয়া উপরে গেল। বৃদ্ধ তখন একটি কক্ষে নিশ্চিন্ত মনে কতকগুলি ফটোগ্রাফ্ দেখিতে ব্যস্ত। সে প্রথমে পুলিসকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, পরে ধৃত হইয়া তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিল।

গৃহস্বামী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "চোর বেটাকে এখানে,—এই আহারগৃহে ধরিয়া লইয়া আইস।"

ভিক্ষুক গৃহে প্রবেশ করিলে সকলেই তাহার দিকে চাহিল। সথার্ণের চক্ষুর সেই বিশেষ ভাব কখনও লুকান যাইত না—সকলে অবাক হইল, চোর স্বয়ং সথার্ণ। সথার্ণও অতিথিদের এক জন; নিমন্ত্রণে আসিবার সময় কতকগুলি পোষাক লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং কক্ষান্তরে গিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশপরিবর্ত্তন করিয়া এই কীর্ত্তি করিয়াছেন!

একদিন সথার্ণ, তাঁহার বন্ধু টুলে এবং আর একজন বন্ধুর একটা নির্দ্দিষ্ট হোটেলে আসিবার কথা ছিল। সথার্ণ সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, সেই কক্ষে

হতভাগা বৃদ্ধ।

একজন খিট্‌খিটে-চেহারা বৃদ্ধ বসিয়া সেই হোটেলের প্রসিদ্ধ ষ্টিক্ খাইতেছিল, সম্মুখে এক বোতল মদ্য। সথার্ণের মাথায় কি খেয়াল চাপিল, তিনি দ্রুতগতি যাইয়া বৃদ্ধের পৃষ্ঠে সজোরে একটা ধাক্কা মারিলেন—হতভাগা টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, আহারীয় দ্রব্য ছড়াইয়া গেল, এবং মদের বোতল গড়াইয়া পড়িল। হস্ত বিস্তার করিয়া সথার্ণ নিতান্ত আহ্লাদিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আরে কেমন আছ? ক' বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। তুমি এখানে কোত্থেকে? বাড়ীর সব ভাল ত?" বৃদ্ধ চটিয়া লাল,—সে বলিল, "এ রকম উপহাসের মানেটা কি? তুমি কে হে? আমি—"

নিতান্ত দুঃখিত ভাব প্রকাশ করিয়া সথার্ণ বলিলেন, "মহাশয়, আমি দেখিতেছি একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু, কিন্তু এখন দেখিতেছি—একজন অপরিচিতকে সম্বোধন করিয়াছি,—সম্বোধন কেন,—মারিয়া বসিয়াছি। বাস্তবিক আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব।"

বৃদ্ধ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, এবং তিনি তাহার ভগ্ন-বোতল মদ্যের দাম দিতে চাহিলেও তাহা লইল না; একটা ভুল এমন হইয়াই থাকে বলিয়া আবার আহারীয় আনাইয়া আহার করিতে লাগিল। সথার্ণ বাহিরে আসিলেন। এমন সময় তৃতীয় বন্ধু আসিয়া তাঁহার বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; সথার্ণ বলিলেন, "কিছু আবশ্যক নাই। থাক্; আমার

ক্রম করা অসম্ভব। বন্ধু সম্মত হইলেন। সথার্ণ বলিলেন, "ঐ ঘরে একজন বৃদ্ধ বসিয়া আহার করিতেছে; আপনি সজোরে তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বলিবেন, 'আছ কেমন?' পরে যেন ভুল হইয়াছে—এমনই ভাব দেখাইয়া, খুব ক্ষমা চাহিবেন।"

বন্ধু কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে সথার্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হইল?" বন্ধু বলিলেন, "তার মদের বোতলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, বুড়া ভয়ানক চটিয়া উঠিয়াছিল; যা' হোক, মদের দাম দিয়া তাকে ঠাণ্ডা করিয়াছি। সে আবার খাইতে বসিয়াছে।"

এই সময় টুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সথার্ন বলিলেন, "তার কোনও দরকার নাই;—এখন তুমি যদি আমাকে একটা বাজি জিতাইয়া দাও।" টুলে বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?" তিনি বলিলেন, "ঐ ঘরে এক জন খিটখিটে ইংরাজের মত লোক বসিয়া খাইতেছে—আমি বলি যে, আমি বলিলে তুমি অনায়াসে গিয়া নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর মত তার পিঠে ধাক্কা দিয়া তাকে তার মদের বোতল আর খাবারের উপর ফেলিতে পারিবে। ইনি বলেন, তুমি তাহা পারিবে না। এই নিয়ে বাজি।" টুলে বলিলেন, "কি দায়! এ আর পারব না? তার পর খানিকটা ক্ষমা চাহিলেই হবে;—এই চল্লুম।" টুলে চলে গেলেন, অল্পক্ষণ পরেই কক্ষমধ্য হইতে গোলমালের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। ঝগড়া, চেঁচামেচিতে গৃহ পূর্ণ হইল, বৃদ্ধ রাগান্ধ হইয়া হোটেলওয়ালাকে তলব দিল। পথে হোটেলওয়ালাকে ধরিয়া সথার্ন বলিলেন, "দেখ, প্রসিদ্ধ মিষ্টার টুলে ঐ ঘরে গিয়াছেন, এবং বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় করিয়া তোমার পুরাতন খদ্দেরকে উপহাস করিয়াছেন।" সে চলিয়া গেল। সথার্ন বিলম্ব না করিয়া রাস্তায় আসিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া চলিয়া আসিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

তত্ত্ববোধিনী।—ভাদ্র। "শিণ্টো মত" শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের একটি ক্ষুদ্র রচনা। প্রবন্ধটি সাধারণ পাঠকের উপযোগী। "শিণ্টো মত" জাপানে প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "হরিদাস ঠাকুর" এখনও চলিতেছে। এবারকার তত্ত্ববোধিনীতে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বড় অভাব।

ভারতী।—ভাদ্র। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত" এই সংখ্যায় শেষ হইল বোধ হইতেছে। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়ের "তারা বাই" একটি ঐতিহাসিক রচনা। প্রবন্ধটিতে বিশেষত্ব কিছু নাই। "বজেট্—১৮৯৪।৯৫" একটি রাজনৈতিক আলোচনা। লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয় বেশ বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। "নিবৃত্তি" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি কবিতা। লেখক যে শব্দগুলি দ্বারা কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহাদের অর্থ অবগত আছি, সে জন্য অভিধান খুলিবার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু এই চিরপরিচিত শব্দগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি এমন একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সমগ্রটির অর্থবোধ করা দুরূহ,—এমন কি,—অসম্ভব ব্যাপার! শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "বদরিকাশ্রমে" তাঁহার ধারাবাহিক ভ্রমণবৃত্তান্তের অন্তর্গত একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। "অপেক্ষা" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি কবিতা। "চক্র" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উপন্যাস;—এবার ... প্রকাশিত হইয়াছে। সমাপ্ত না হইলে কিছু বলা যায় না। "চক্রের" ভাষা

ইত্যাদি গানের স্বরলিপি দিয়াছেন। গিরীশ বাবুর এত ভাল গান থাকিতে, স্বরলিপিকার এই অর্থশূন্য অসম্বদ্ধ গানটি বাছিয়া লইলেন কেন? এই সংখ্যায় "হত্যারহস্য" সমাপ্ত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়।

সাধনা।—ভাদ্র। "ভারতবর্ষে—বারাণসী" ফরাসী ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত; এখনও চলিতেছে। প্রবন্ধটি মনোরম, সুখপাঠ্য। এস্থলে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—"এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় দেখা আবশ্যক। কারণ, এই বারাণসী নগরী হিন্দুদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার একটি অতীব প্রাচীন কেন্দ্রস্থল। পূর্ব্বকালে, এখানকার ব্রাহ্মণেরা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; তখন বহুদূর হইতে লোক সকল ইহাঁদের প্রকটিত মতবাদ শিক্ষা করিতে আসিত। যে জ্যোতির্বিদ্যা অনন্তের ধ্যানে নিযুক্ত, এখানে সেই জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ আদর ছিল। আজ প্রাতে একটা পুরাতন মান-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা প্রস্তরনির্ম্মিত প্রহেলিকাময় বিবিধ যন্ত্রে পরিপূর্ণ—এবং উহাদের গাত্রে অসংখ্য রহস্যময় লেখা বিদ্যমান। এই সমস্ত যখন দেখিলাম, তখন যেন আমার আত্মা সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালে উপনীত হইল—যে সময়ে এই নগরী য়ুরোপীয়দিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল, এবং যে সময়ে এখানে এই পুরাতন প্রাচ্য বিজ্ঞানের অনুশীলন বিলক্ষণ চলিতেছিল—কৌতুহলাক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যের অয়ন-গতি গণনা করিতেছিলেন ও মেরুদেশের চতুর্দ্দিকস্থ তারকাবলীর আবর্ত্তন পরিমাণ করিতেছিলেন। এখন সংস্কৃত এখানে পণ্ডিতী ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুইডেনের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এখনও যেরূপ ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া থাকেন, সেইরূপ এখানকার পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন। বেনারসে এখনও বেদ পুরাণ উপনিষদ্ মহাকাব্য প্রভৃতির পুরাতন শ্লোক সকলের ভাষ্য ও টীকা প্রকটিত হইয়া থাকে। এই পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ য়ুরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের নিকট পরিচিত। ইংরাজেরা বেনারসকে ভারতবর্ষের অক্সফোর্ড বলিয়া থাকেন। এখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, মনে হয় যেন উহা অক্সফোর্ড হইতে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। এই সকল ছুঁচালো খিলান, এই সকল খাঁজওয়ালা চতুষ্কোণ চূড়া—এই সকল তোরণ—এই সকল কুলাঙ্গী—এই সকল সরু সরু লম্বা থাম দেখিলে মনে হয়, যেন 'ওরিয়েল' কিম্বা 'ম্যাগ্ড্যালেনে' প্রবেশ করিতেছি। কেবল এইমাত্র প্রভেদ,—অক্সফোর্ড বিদ্যামন্দিরের গ্রেনাইট প্রস্তরে বৃষ্টি ও কালপ্রভাবে স্থানে স্থানে চাক্‌লা উঠিয়া গিয়াছে—ম্লান আকাশের বিষণ্ণভাব যেন তাহাতে মুদ্রিত হইয়া আছে। পক্ষান্তরে, বেনারসের বিদ্যামন্দিরের প্রস্তর আলোক-কিরণে দীপ্যমান; অনতিতপ্ত সুখস্পর্শ বায়ুর বিলাসময় প্রভাব যেন উহার সর্ব্বাংশে অনুপ্রবিষ্ট। উত্তরদেশের বিচিত্রতাশূন্য অসীম প্রান্তর ও কম্পিতকায় সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জের সহিত এখানকার সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত তালজাতীয় বৃক্ষের যে প্রভেদ, এই উভয় মন্দিরের মধ্যেও সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। ছুঁচালো খিলানওয়ালা ঘরের মধ্যে তিন চারি দল ছাত্র অধ্যাপকের চারিদিকে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিয়া আছে। অক্সফোর্ডের পাঠশালা এখানকার পাঠশালার সদৃশ বটে, কিন্তু সেখানে যেরূপ সাহস-দীপ্ত উজ্জ্বল মুখ সকল দেখা যায়, এখানে তাহার পরিবর্ত্তে প্রাচ্য মুখ মৃদুমধুর, অপৌরুষিক—অতীব কোমল ও দেহ পাৎলা পাৎলা—আল্‌গা চাদরে আচ্ছাদিত দেখিতে পাওয়া যায়। গণিতের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। ছাত্রেরা শোভনভাবে শরীর ঈষৎ হেলাইয়া, মাটির দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ওষ্ঠসমীপে উঠাইয়া আমাকে অভিবাদন করিল। বীজগণিতের

মুখ, দীর্ঘ নেত্রপল্লব, শ্যামবর্ণ, সুবঙ্কিম ওষ্ঠ—এই সমস্ত মুখশ্রীতে একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও রমণীয় গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। আর একটু দূরে, বড় বড় ছেলেরা দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিতেছে। অধ্যাপকের টেবিলে দুইখানা গ্রন্থ রহিয়াছে। আমি গ্রন্থের নাম পড়িয়া দেখিলাম, ম্যান্‌সেলের দর্শন—স্পেন্‌সরের সামাজিক স্থিতিতত্ত্ব।" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বরলিপির" গানটি অতি সুমধুর। "অপমানের প্রতিকার" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাময়িক প্রবন্ধ। "স্তবগান" শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একটি কবিতা। লেখকের কল্পনা যেমন ওজস্বিনী, রচনা তদনুরূপ হয় নাই। "ঘাতপ্রতিঘাত" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের একটি নক্‌সা। আমাদের ভাল বোধ হইল না। "বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দার্শনিক প্রবন্ধ,—অধ্যয়ন ও অনুশীলনের উপযুক্ত। "অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। ইতিপূর্ব্বে সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্র বাবুর "বিনি পয়সায় ভোজের" ধরণে লিখিত,—কিন্তু রচনাটি সেরূপ সফল হয় নাই। "প্রাচীন জ্যোতিষ" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ; এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।—শ্রাবণ; প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি নূতন প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" হইতে একখানি ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হইবে শুনিয়া আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পর্ব্বতের মূষিকপ্রসব দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। উচ্চশ্রেণীর ত্রৈমাসিকের নিকটস্থ হওয়া দূরের কথা, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যা একখানি চতুর্থ শ্রেণীর পত্রের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়াছে। এ বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি? বিগত ১০ই ভাদ্র তারিখে এই পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, অথচ পত্রিকায় মুদ্রিত আছে; "শ্রাবণ, ১৩০১।" ১৩০১ সালে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু শ্রাবণ মাসে নহে। "শ্রাবণ" না লিখিয়া "ভাদ্র" লিখিলে এমন কি ক্ষতি হইত? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালার অনেক বড়লোক যোগ দিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি-এস, সি আই-ই, যে সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহার সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যে পত্রের সম্পাদক,—তথায় এরূপ ব্যবহার শোভা পায় না। মিথ্যা যতই সামান্য হউক, তাহা সর্ব্বথা ঘৃণার্হ। এই সংখ্যায় "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" নামক সম্পাদকের একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটি, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে একবার আল্‌বার্ট হলে প্রকাশ্য সভায় পঠিত হইয়াছিল। বোধ হইতেছে, সভায় পঠিত হইবার পূর্ব্বে, ইহা পুস্তিকাকারেও আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায়" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, আমরা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান হইতে "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" পুস্তিকা কিনিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি,—আমাদের পূর্ব্বশ্রুত ও পূর্ব্বপঠিত সেই প্রবন্ধটি "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায়" পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে,—কিন্তু এই পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বে যে ইহা আরও দুই অবতারে দুই আকারে ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশে প্রকটিত হইয়াছিল,—পত্রিকার কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। একি ব্যাপার? অনেক সময়ে লেখকগণের দোষে সম্পাদকগণকে এরূপ বিপদে পড়িতে হয় সত্য, কিন্তু এস্থলে যিনিই লেখক, তিনিই সম্পাদক। সম্পাদক জানিয়া শুনিয়া একবার পুস্তিকাকারে প্রকাশিত নিজের প্রবন্ধটি, স্বীকার না করিয়া কেমন করিয়া পত্রস্থ করিলেন? সম্পাদককে একজন সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক বলিয়া জানি,—তাঁহাকে এইরূপে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" চক্ষে ধূলা দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যিনি সম্পাদক হইয়া নিজে এমন কাজ করিতে পারেন,

তাঁহাকে আর কি বলিব? সাহিত্য পরিষদের "কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধান করিবেন," নিয়মাবলীতে এ কথা লিখিত আছে। তাঁহারাই বা কিরূপ তত্ত্বাবধান করিতেছেন? এরূপ সাহিত্যসভা এ দেশে নূতন। সুতরাং সভার কার্য্যনির্ব্বাহকগণের সমুচিত সাবধানতা আবশ্যক। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে,—সম্মুখস্থ পত্রিকা খানি দেখিয়া মনে হইতেছে,—সাহিত্য-পরিষদের সাবধানতা দূরে থাক, দায়িত্ববোধও বড় অল্প। যদি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহকগণের দায়িত্ববোধ থাকিত, তাহা হইলে 'বিশমোল্লায় এত গলদ' হইত না। মোটের উপর, পত্রিকা খানি বিশৃঙ্খলতা ও অক্ষমতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"র দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত।

সমীরণ।—একাদশ সংখ্যা। এই সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথমেই স্বর্গীয় কবি "বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অপ্রকাশিত কবিতা।" কিন্তু "প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!" ইত্যাদি গানটি অনেকের মুখস্থ আছে,—বহু পূর্ব্বে উহা "কল্পনায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক কিরূপে উক্ত গানটিকে "অপ্রকাশিত" বিশেষণে বিশেষিত করিলেন,—তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বর্ত্তমান সম্পাদকের যত্নে সমীরণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; এ সময়ে এরূপ অসাবধানতা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এই সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে,—"জীনৎমহল।" প্রবন্ধটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য। ইহার রচনাপ্রণালীর প্রশংসা করা যায় না,—কিন্তু বিষয়গৌরবে প্রবন্ধটি আদৃত হইবার যোগ্য। "কবিকুঞ্জে"র "অলকদাম" শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর একটি কবিতা;—কিন্তু ইহাতে এই সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠার লাঘব হইয়াছে মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।—শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের "বৌদ্ধ রমণী" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি এখনও শেষ হয় নাই।

পূর্ণিমা।—ভাদ্র। এ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলালের "হিমাচল—গহনাহ্রদ" উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই "ঘোনা" হ্রদের বিভ্রাটের কথা অবগত আছেন। লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে "ঘোনা" বা "গহনা"র ভৌগোলিক সংস্থান ও তত্রত্য প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বেশ চিত্তগ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন,—"যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার নাম গহনা। গহনা অতি ক্ষুদ্র পল্লী, অতি স্বল্পসংখ্যক কৃষিজীবীদিগের আবাসস্থান। এই গিরিকন্দরশায়ী নগণ্য গ্রাম সহসা মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া অক্ষয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে গহনায় কি হইতেছে জানিবার জন্য গঙ্গাতীরবাসী সকলেই উৎকণ্ঠিত, জানাইবার জন্য ইংরেজরাজ তথা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাইয়াছেন, তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এঞ্জিনীয়ারগণ নিয়োজিত হইয়াছেন, কেন এরূপ হইল নির্ণয় করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, আর কখন কি হয় তাহার আলোকালেখ্য অঙ্কনোদ্দেশে একদল ফোটাগ্রাফার মোতায়েন হইয়াছে। গহনা কোথায় এক কথায় বলা সুকঠিন। * * * ভাগীরথীর প্রকৃত উৎপত্তিস্থান হরিদ্বার হইতে ন্যূনাধিক একশত ক্রোশ উত্তরে চিরতুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গনিশেষে। এই শৃঙ্গবরের লৌকিক নাম বান্দরপুচ্ছ। বান্দরপুচ্ছ হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা মন্দাকিনীকে বক্রপথানুবর্ত্তিনী হইতে বাধ্য করিয়াছে। এই সুদীর্ঘ পথ কিন্তু সুরধুনীকে একাকিনী আসিতে হয় নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী কত যে আসিয়া সুরতরঙ্গিণীর পূতবারিতে নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। অধিকন্তু হরিদ্বার হইতে ত্রিশ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে দেবপ্রয়াগ নামক পবিত্র তীর্থস্থানে বাম দিক হইতে প্রসন্নসলিলা অলকনন্দা আসিয়া জাহ্নবীজীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। অলকনন্দারও অতুল গৌরব। যে যে স্থানে এক একটি পবিত্র নদীর অলকনন্দার সহিত সংযোগ

হইয়াছে, সেই সেই স্থান এক একটি প্রয়াগ বলিয়া বিখ্যাত। এইরূপ পাঁচটি প্রয়াগে অলকনন্দার তীরভূমি সুশোভিত ও পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই প্রয়াগপঞ্চের নাম যথাক্রমে বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ ও (পূর্ব্বোল্লিখিত) দেবপ্রয়াগ, পাঁচটি প্রয়াগ আছে বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে পাঁচটির অধিক নদী অলকনন্দায় আসিয়া মিশে নাই। বস্তুতঃ বামে ও দক্ষিণে ছোট বড় কতই যে নির্ঝরিণী ঝর ঝর রবে নগেন্দ্রকন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া, শিলাস্তূপে নৃত্য করিতে করিতে, অলকনন্দাকে সাদর আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ নয়। ইহাদের অন্যতমের নাম "বিরহী" গঙ্গা। এই ক্ষীণা স্রোতস্বতী ত্রিশূল নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত, ও বিরহী নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নিম্নে অলকনন্দায় সংমিলিত। ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ২০ মাইল এবং যে ভূখণ্ড হইতে বৃষ্টিধারা আসিয়া ইহাকে পরিপোষণ করে তাহার বিস্তার অন্যূন ৯ মাইল, অর্থাৎ প্রায় দ্বিশত বর্গ মাইল ভূমির বৃষ্টিজল বিরহী গঙ্গার নিকট হইতে অলকনন্দা করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিরহীগঙ্গা-দোহিত এই ভূখণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে পর্ব্বত প্রাকার, পশ্চিমে অলকনন্দা, পূর্ব্ব সীমায় ত্রিশূল শৃঙ্গ এবং উত্তরে প্রায় তত্তুল্য উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণ সীমা তত উচ্চ নয়। পূর্ব্ব ও উত্তরের পর্ব্বত বেষ্টের উপরিভাগ চির-হিমানীমণ্ডিত;—গ্রীষ্ম ঋতুতে নিম্নাংশের বরফ কিঞ্চিৎ গলিয়া যায়,—শীতসমাগমে আবার সে টুকু পূর্ব্ববৎ হইয়া দাঁড়ায়। বিরহী গঙ্গার উভয়তটস্থ পর্ব্বতাঙ্গের ঢাল অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও স্থানে প্রাচীরবৎ লম্বভাবে অবস্থিত। এই সকল স্থানে স্রোতস্বিনী অতি গভীর অথচ অপ্রশস্ত শিলাময় সংকীর্ণ পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাতে নাচিতে নাচিতে প্রবাহিত। এই প্রকার গিরিসঙ্কটকে ইংরাজী ভাষায় Gorge বলে। * * * অলকনন্দা ও বিরহী গঙ্গার সঙ্গম স্থান হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বে শেষোক্ত নদীর উত্তর তটে এই ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম পশ্চিমোত্তরপ্রদেশীয় রাজপুরুষদিগের শৈত্যাবাস নাইনীতাল হইতে প্রায় ৭০ ক্রোশ উত্তরে ও হরিদ্বার হইতে ৮০ ক্রোশ। উত্তরাখণ্ড পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ তীর্থ কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম ইহা হইতে অধিক দূরে নয়। * * * গহনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটি সুগভীর ও অতিসংকীর্ণ গিরিসঙ্কট বা Gorge ছিল। ইহারই উত্তরে ময়স্থান নামক এক উচ্চ পর্ব্বতচূড়া করাল বেশে দণ্ডায়মান। কত সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণা বিরহী গঙ্গা ময়স্থানের গর্ব্বিত চরণপ্রান্তে কাতরকণ্ঠে বিনীত নিবেদন করিয়াছে, 'প্রভো, একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমাকে একটু পথ দেও, নতুবা প্রস্তরপেষণে মারা যাই যে।' হায় ময়স্থান সে কথায় তুমি কর্ণপাত কর নাই। * * * কিন্তু আজ তোমার কি দশা? সেই কৃপাভিখারিণী বিরহী গঙ্গা অচিরে তোমার শব দেহকে উল্লঙ্ঘন করিবে। * * আজ ২২শে ভাদ্র, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী তিথি। গহনার প্রবীণ অধিবাসিগণ একত্রে বসিয়া পুনরায় বর্ষা পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না, * * * সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছে; * * * সহসা ও কি? শত বজ্রনিনাদের ন্যায় কিসের শব্দ ও? ঐ যা, ময়স্থানচূড়া ত আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না! এ দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রামের দিকে,—কোন্ দিকে নয়?—প্রধাবিত হইতেছে! তন্মুহূর্ত্তেই গ্রামবাসিগণ যে যেখানে পারিল ছুটিতে লাগিল, * * * আকাশমণ্ডল ধূলিধূসরিত হইল, কেহই আর কিছু ভাল দেখিতে পায় না, * * বড় বড় শিলাখণ্ড নিম্নে পতিত হইয়া অপর পারে ঊর্দ্ধমুখে ভীমবেগে ছুটিতে লাগিল, এই ভাবে অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনরায় কুম্ভকারচক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরহী বক্ষে আসিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল—পতন, উত্থান পুনঃপতনে পর্ব্বতস্কন্ধশোভী কত শত বনস্পতি যে উৎপাটিত ও ভূপতিত হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

ওদিকে বিরহী গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছে, মৎস্যগণ নির্জল শিলাতলে কিয়ৎক্ষণ ধড়ফড় করিয়া মরিয়া যাইতেছে। তিন দিন এই ভাবে মহাপ্রলয়ের অভিনয় চলিতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব ধূষর মেঘান্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইয়াছিল, তিন দিন পরে সকলে দেখিল, ময়স্থানের উচ্চ চূড়া পুরাণপ্রসিদ্ধ মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় বিরহী গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, আর তাহার মৃতদেহ নদীর এক তট হইতে তটান্তর পর্য্যন্ত প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ, পূর্ব্বকথিত গিরিসঙ্কট হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত এবং নদীর তলদেশ হইতে আট শত হস্ত ঊর্দ্ধ স্খলিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা স্তূপরূপে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অভিনব ভীমকলেবর স্তূপের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে চান কি? ভারত সাম্রাজ্যের ২৮ কোটী ৭০ লক্ষ অধিবাসী যদি প্রত্যেকেই বাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে প্রত্যহ স্তূপাঙ্গ হইতে এক মণ মৃত্তিকা বা প্রস্তর তুলিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে ৩ মাস সময়ে সমস্ত স্তূপ নিঃশেষিত হইতে পারে। সম্মুখে এই বিকটমূর্ত্তি বিপুল স্তূপ পথ বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছে, এখন গরীব বিরহী গঙ্গা যায় কোথায়? ইহাকে তখনই ঠেলিয়া ফেলা ত তাহার সাধ্য নয়। তাই গত বৎসরের সেই দিন হইতে একাল পর্য্যন্ত বিরহী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া ফুলিতেছে, আঁর গন্তব্য পথ রুদ্ধ হওয়ায় অলকনন্দার রাজস্ব বকেয়া ফেলিয়া নিজের তহবিলটি হ্রদে পরিণত করিতেছে। এই নিবিড় বর্ষায় হ্রদের জল হু হু বাড়িয়া যাইতেছে, আর অলকনন্দা তথা গঙ্গাতীরবাসিগণ প্রাণ লইয়া অতি দূরে পলায়ন করিতেছে। যাহারা স্বেচ্ছায় না যাইতেছে, সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে জবরদস্তিতে তুলিয়া দিতেছেন। নদীদ্বয়ের উভয় তটে যত দূর পর্য্যন্ত জল উঠিবার সম্ভাবনা, তত উচ্চে স্থানে স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, আর ঢোল বাজাইয়া প্রজাগণকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে কেহই যেন কখনও স্তম্ভসমূহের নীচে না যায়। এদিকে নূতন বাঁধের পশ্চাতে, ৪ শত হস্তের অধিক গভীর, বাঁধ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৩ মাইল দীর্ঘ ও স্থলবিশেষে প্রায় দেড় মাইল প্রশস্ত একটি হ্রদ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, বাঁধটি পশ্চাৎস্থিত জলের ভারে ভাঙ্গিয়া যাইবে—না, যত পর্য্যন্ত হ্রদের জলে উচ্ছ্বসিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকিবে।" সংবাদপত্রে পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সমস্যার পূরণ হইয়াছে,—অবশেষে বাঁধই ভাঙ্গিয়াছে।

সমালোচনা।

ঐক্যতানিক স্বরসংগ্রহ—শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত। স্বরলিপি সঙ্গীতের উন্নতির একটি অবলম্বন। ইহার সাহায্যে চেষ্টা করিলে সকলেই সঙ্গীতের সুখ উপভোগ করিতে পারেন, অভিমানী ওস্তাদদিগের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। স্বরলিপি ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গীতকে নিকটস্থ করিয়া তোলে, অর্থাৎ সকলেই দূরদেশের সঙ্গীত হইলেও স্বরলিপি দেখিয়া ঘরে বসিয়া তথাকার সঙ্গীতমাধুরী উপভোগ করিতে পারেন। এই হেতু সঙ্গীতের স্বরলিপিপ্রকাশ আমাদের বাঞ্ছনীয় ও আদরণীয়।—দক্ষিণা বাবু কনশার্টের গৎ ও থিয়েটারের গীতসমূহের স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; কতিপয় গান বাজাইয়া দেখিয়াছি মন্দ শুনিতে নয়। কিন্তু তিনি স্বরলিপির যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তত সুবিধাজনক নহে। দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি তেমন সরল নহে। কিন্তু (গীতসূত্রসারের) বিন্দুমাত্রিক পদ্ধতি না লইয়া যে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা খুব সঙ্গত হইয়াছে; কারণ, বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপি দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির অপেক্ষা কিছু

জটিল বলিয়া বোধ হয়। ইহা ইউরোপীয় 'সলফাটনিক' স্বরলিপিরই বাঙ্গালা অনুবাদ মাত্র। দেখিয়াছি, এই ইউরোপীয় 'সলফাটনিক' পদ্ধতিটি সকল পদ্ধতির অপেক্ষা অস্পষ্ট ও জটিল। যে স্বরলিপি যত স্পষ্ট হইবে, ততই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং তাহাকেই সঙ্গীত লিখিবার জন্য গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা উচিত। এখন পাঠকদিগের সম্মুখে স্বরলিপি-সমূহের মর্ম্মের আভাস দিতেছি ;—তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, কোন্ স্বরলিপি সরল, উৎকৃষ্ট ও স্পষ্ট।

দেখুন, দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে অর্দ্ধমাত্রিক সুরের মাথায় একটি চন্দ্রবিন্দু, বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপিতে অর্দ্ধমাত্রিক সুরের পার্শ্বে একটি বিন্দু, কসিমাত্রিক স্বরলিপিতেও অর্দ্ধমাত্রিক সুরের পার্শ্বে একটি বিন্দু, এবং আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে অর্দ্ধমাত্রিক সুরের পার্শ্বে বিসর্গের ন্যায় দ্বিবিন্দু ব্যবহৃত হয়।

সুরের অর্দ্ধমাত্রিকত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এই যে বিন্দুচিহ্ন, ইহা সকল স্বরলিপির মধ্যেই ন্যূনাধিকপরিমাণে কোন-না-কোনও রূপে প্রবেশ করিয়াছে; ইউরোপীয় সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে এই বিন্দু পার্শ্বে থাকিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুরের বা মাত্রার অর্দ্ধ মাত্রা প্রকাশ করে, 'সলফাটনিক' রে পার্শ্বে থাকিয়া সুরের অর্দ্ধমাত্রিকত্ব প্রকাশ করে; কসিমাত্রিক স্বরলিপিতেও ইহা সুরের পার্শ্বে থাকিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রিকত্ব সূচিত করে; দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে ইহা চন্দ্রবিন্দুরূপে সুরের মাথায় চড়িয়া এবং আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের পার্শ্বে ইহা দ্বিবিন্দু হইয়া অর্দ্ধমাত্রিকত্ব প্রকাশ করে।

অর্দ্ধমাত্রাব্যঞ্জক এই বিন্দুচিহ্নের মূল উৎপত্তিস্থান অনেকে ইউরোপীয় স্বরলিপিকে মনে করিতে পারেন—নানাকারণে দেখিয়াছি, মনে হওয়াও সম্ভব; কিন্তু তাহা বাস্তবিক নয়। যেহেতু পূর্ব্বে আমাদের দেশে সঙ্গীতের এই বিন্দু অর্দ্ধমাত্রাসূচক ছিল।—মনে হয়, আমাদের দেশ হইতেই অন্য দেশে ইহার প্রচলন সম্ভব।

অর্দ্ধমাত্রা—অর্দ্ধমাত্রিকত্ব বুঝাইবার জন্য সাংখ্যস্বরলিপিতে অস্পষ্ট চিহ্ন এই বিন্দুর [illegible]হার নাই; তাহাতে স্পষ্ট করিয়া সুরের পার্শ্বে অর্দ্ধমাত্রা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এই স্বর[illegible]পিতে অর্দ্ধমাত্রা প্রকৃত অর্দ্ধমাত্রিক চিহ্নের দ্বারাই ব্যক্ত হয়। এই প্রকৃত ভাবের দরুনই [illegible]াংখ্যস্বরলিপি স্পষ্ট, সরল ও স্বাভাবিক; ইহাতেই তাহার বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ। বৃথা [illegible]াক্যবল প্রকাশ করিয়া তাহার উৎকৃষ্টতা রক্ষা করিতেছি না। সত্যের ন্যায় তাহা যেমন সরল, তেমনি গুরুগম্ভীর।—এই স্বরলিপির প্রাণকে প্রকৃত সরল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

পুনশ্চ, আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব; দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিপিতে দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তকের সুরে তাহার মাথায় একটি বিন্দু, বিন্দুমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের পার্শ্বে ঈশাণ কোণে ১ চিহ্ন, আবার মাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের মাথায় রেফ-চিহ্ন, এবং কসিমাত্রিক স্বরলিপিতে সুরের মাথায় একটি কসিচিহ্ন থাকে; কিন্তু সাংখ্যস্বরলিপিতে দ্বিতীয় উচ্চসপ্তকের সুর বুঝাইবার জন্য সুরের মাথায় ২ চিহ্ন থাকে। এখন বুঝিয়া দেখুন, সাংখ্যস্বরলিপি কিরূপ স্পষ্ট। এই স্পষ্টতার স্বপক্ষে আরও দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এই স্পষ্টতাতেই—প্রকৃতরূপপ্রকাশেই ইহার সারল্য মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছে। আর বাক্যবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সাংখ্যস্বরলিপি বিচার করিয়া না দেখিয়া দুর্ব্বোধ্য মনে করেন, অথবা তাহা দেখিয়াও যদি কোনও গোলে পড়িয়া থাকেন, সেই কারণে লোকের অনুরোধবশতঃ এবং কর্ত্তব্য ও সত্যের অনুরোধে এত কথা বুঝাইয়া বলিতে হইল, আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধুচ্ছন্দার সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে ঋষিসমাজে বিজ্ঞানের অবস্থা।

২

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধাংশে বৈদিকযুগে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ও নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গের অনুশীলনের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর "ছন্দস্" শাস্ত্রের কথা। মধুচ্ছন্দাদি ঋষিদের সময়ে "ছন্দস্" শাস্ত্রের যে বিশিষ্ট অনুশীলন ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবার যত্ন না করিয়া, পাঠকবৃন্দকে ঋগ্বেদের "ছন্দ" গুলি দেখিতে অনুরোধ করি। ঋগ্বেদের প্রথম অবস্থায় প্রধান প্রধান ছন্দ সাত প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত, কিন্তু ঋক্‌রচনকারী ঋষিরা সেই সাত হইতে ভাঙ্গিয়া অন্যান্য প্রকার বিবিধ নূতন ছন্দের গঠন করেন। ইহা যে ছন্দস্ শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট অনুশীলনেরই ফল, তাহা বলা বাহুল্য।

"জ্যোতিষ" ষষ্ঠ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্য কয়েকটি বিজ্ঞান বেদের ভাষা অবলম্বন করিয়া নির্ম্মিত; বেদাঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছিল। ঋষিরা যজ্ঞকালনির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষের ব্যবহার করিতেন; সেই কারণে ঋষিসমাজে জ্যোতিষের সবিশেষ অনুশীলন প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরকে মধুচ্ছন্দার আনুমানিক সময় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই সময়ে জ্যোতিষের অনুশীলন এদেশে কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে কুতূহলী পাঠক মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঋগ্বেদের ভূমিকা পাঠ করিবেন। এখানে সে কথার সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব এবং নিষ্প্রয়োজন। বেণ্টলীর গণনা অনুসারে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪২৬ অব্দে এতদ্দেশীয় ঋষি জ্যোতিষীগণ কৃত্তিকা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাতের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়েই নক্ষত্রগণনায় কৃত্তিকা আদি বা প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অনুরাধার পূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্র, এই সময়ে "রাধা" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্য দিয়া বিষুব রেখা পতিত হওয়ায়,—এবং বিষুব রেখা দ্বারা ঐ নক্ষত্র দুই সমান ভাগে খণ্ডিত হওয়ায়, ঋষিরা উহার দ্বিশাখা বা "বিশাখা" এই নূতন নামকরণ করেন। আরও জানা যায়, ঠিক ঐ সময়ে ঋষি জ্যোতিষীরা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছিলেন, যাহা তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কেহ

কখনও দেখিতে পায় নাই। ন্যূনাধিক ষোড়শ মাসের মধ্যে (খৃঃ পূর্ব্ব ১৪২৫ অব্দের ১৯এ আগষ্ট হইতে খৃঃ পূর্ব্ব ১৪২৪ অব্দের ১৯এ এপ্রেলের মধ্যে) চন্দ্রের সহিত বুধগ্রহের রোহিণী নক্ষত্রে, শুক্রগ্রহের মঘা নক্ষত্রে, মঙ্গলগ্রহের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে, এবং বৃহস্পতিগ্রহের পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে, সমসূত্রপাত ঘটিয়াছিল; কিন্তু শনিগ্রহ তৎকালে চন্দ্রের ভ্রমণপথের দূরবর্ত্তী থাকায়, তাহার সহিত তাদৃশ সমসূত্রপাত ঘটে নাই। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্বীরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষিত ঘটনা হইতে এক লৌকিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে যে, সোম (চন্দ্র) দক্ষ প্রজাপতির ২৭ কন্যাকে (২৭ নক্ষত্রকে) বিবাহ করিলে, সোমের ঔরসে উল্লিখিত চারি নক্ষত্র হইতে উপরি-উক্ত চারিটি গ্রহের জন্ম হয়, তজ্জন্য বুধের নামান্তর "রৌহিণেয়", শুক্রের নামান্তর "মঘাভূ", মঙ্গলের নামান্তর "আষাঢ়াভব", এবং বৃহস্পতির নামান্তর "পূর্ব্বফল্গুনীভব"। ইহার কিছু পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়; এবং জ্যোতির্বীরা তখন দেখিয়া রাখেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে রহিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশিষ্ট আলোচনা চলিতেছিল। মধুচ্ছন্দার বহুপূর্ব্বে ঋষি জ্যোতির্বীগণ ভ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং এক এক ভাগে চন্দ্র এক এক দিন অবস্থিতি করেন, ইহা গণনা করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ দিন গত হয়, দেখিতে পায়। এই পর্য্যবেক্ষণ মাসগণনার মূল। কিন্তু অচল তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, ৩০ দিনে নয়, ২৭ দিনে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, ইহাই ভ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ। ঋষিদের অনেক পূর্ব্বে দ্বাদশ চান্দ্র মাসে এক সম্বৎসর হয়, এবং সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু মধুচ্ছন্দার সময়ে তাদৃশ দ্বাদশ মাসে যে সম্বৎসর হয় না, ইহা সূর্য্যের গতি-পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছিল; তজ্জন্য তৎকালের ঋষিরা এক ত্রয়োদশ "অধি" মাসের গণনা আরম্ভ করেন। যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে বলিয়া আপাততঃ দেখা যাইত, এইরূপে সেখানেও নিয়মের রাজত্ব বিস্তৃত হইল। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে ঋষিরা রাত্রিকালে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে নভোমণ্ডলে জ্যোতিষ্কগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। জ্যোতিষ্কগণ যে অচল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিতেছে, এই জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয়ে তৎকালে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

জ্যোতিষের আলোচনাতেই প্রধানতঃ তাঁহারা এই সত্যে উপনীত হয়েন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় কার্য্যই অটল নিয়মের অধীন।

পূর্ব্বকাল অপেক্ষা আমাদের সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্তর সমুন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের যে মূল তত্ব, অর্থাৎ বিশ্বসংসার অচল ও অটল নিয়মের অধীন,—এই তত্ব আমরাও যেমন জানি, মধুচ্ছন্দাও তেমনি জানিতেন। বেদপাঠীগণের নিকট এই কথাটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। যাহাকে আমরা ইহ যুগে Scientific Spirit বলি, তাহা উল্লিখিত মূলতত্বেরই অঙ্গীকার মাত্র, এবং সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষিগণের হৃদয়ে সেই বৈজ্ঞানিক ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত নিউটন বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানার্ণবের বেলাভূমিতে উপলখণ্ড মাত্র;—জ্ঞানার্ণব পার হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে তিনি প্রবেশ করিতেই পারেন নাই! যিনি যতই জ্ঞানী হউন না কেন, তাঁহাকে এই কথা স্বীকার করিতে হয়। এক জন বা দশটি বৈজ্ঞানিক তত্ব অবগত আছে, আর এক জন বা এক শত; তাহাতে তাহাদের বৈজ্ঞানিক ভাবের বিশেষ ইতরবিশেষ ঘটে না। বৈজ্ঞানিক তত্ব অপেক্ষা মনের বৈজ্ঞানিক ভাবই শিক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বৈজ্ঞানিক বিশেষ বিশেষ তত্বের পরিগ্রহ সন্দিগ্ধ বা ভ্রান্ত হওয়া সম্ভব; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাব চিরকালই সমান। সংসার নিয়মের অধীন, তাহার ব্যতিক্রম নাই—এ কথা মধুচ্ছন্দার সময়েও যেমন সত্য, আজিও তেমন। ইহাকেই আমি বলি বৈজ্ঞানিক ভাব। মধুচ্ছন্দা যদি এই বৈজ্ঞানিক ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে তাঁহাকে এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

মধুচ্ছন্দা এই ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কি?

বিশ্বামিত্রের কৃত্রিমপুত্র দেবরাত,—যিনি সম্বন্ধে মধুচ্ছন্দার ভ্রাতা,—তিনি বলিতেছেন—

> অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহচিদ্দিবেয়ুঃ।
> অদব্ধানি বরুণস্য "ব্রতানি" বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি॥ ১।২৪।১০

ইহা স্পষ্টই জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনপ্রসূত বৈজ্ঞানিক ভাব। নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র দিবাভাগে অদৃশ্য থাকিয়া রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা যদৃচ্ছাক্রমে উদিত বা অস্তমিত হয় না—বরুণের অদব্ধ ব্রতের অনুসরণ করিয়াই আবির্ভূত

ও তিরোহিত হয়। ব্রত=Law বা নিয়ম। অদব্ধ=অপরিবর্ত্তনীয়, অচল-অটল। দেবরাত বলিতেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় অচল অটল নিয়মের অধীন ; বৈদিক ভাষায় অদব্ধব্রতের অধীন। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একটা বড় গুরুতর কথা বলেন, তাহা এই যে, "বরুণ" নামক সেই অদব্ধব্রতের একজন ব্যবস্থাপক আছেন! তাহার পর মধুচ্ছন্দার পিতা কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর ;

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন ঃ—

> ন তা মিনংতি মায়িনো ন ধীরা ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি।
> ন রোদসী অদ্রুহা বেদ্যাভির্ ন পর্ব্বতা নিনমে তস্থিবাংসঃ॥—৩।৫৬।১

দেবতাদের যে সকল "ব্রত",—যাহা সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—(প্রথমা)—যাহা অচল অটল (ধ্রুবাণি)—যাহার বিপরীতাচরণ অসম্ভব (অদ্রুহা)—কুশল শিল্পীগণই হউক (মায়িনঃ)—অগাধ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণই হউক (ধীরাঃ) কেহই "নতা মিনংতি" অর্থাৎ সে সকল ব্রতের হিংসা বা বিনাশ করিতে পারে না। দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে, বিদ্যা দ্বারা (বেদ্যাভিঃ) তাহাদের অন্যথাসাধন করিতে পারে। সেই সকল চিরস্থায়ী নিয়ম (তস্থিবাংসঃ) "পর্ব্বতা ইব ন নিনমে" অর্থাৎ পর্ব্বতের ন্যায় অবনত হইবার নহে!!!

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মধুচ্ছন্দার গুরু এবং মধুচ্ছন্দার সহাধ্যায়ী বিশ্বসংসারকে অচল অটল নিয়মের সর্ব্বতোভাবে অধীন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আমরা বিশেষ করিয়া এ স্থলে বিশ্বামিত্র ও দেবরাতের বেদ হইতে উদাহরণ দিলাম ; কেন না, ঐ দুই ঋষির বিদ্যাবুদ্ধির সহিত মধুচ্ছন্দার বিদ্যাবুদ্ধির ঐক্যবিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। ফলতঃ, প্রণিধানপূর্ব্বক ঋগ্বেদ পাঠ করিলে জানা যায় যে, অনেক ঋষিই ঐরূপ বৈজ্ঞানিক ভাব অতি উজ্জ্বল ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

একজন ঋষি বলিতেছেন,—

> সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
> ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধিশ্রিতঃ॥ ১০।৮৫।১

অবিচলিত নিয়মের (সত্য) দ্বারাই পৃথিবী আকাশের মধ্যে "উত্তভিত" হইয়া রহিয়াছেন, অবিচলিত নিয়মের (ঋত) দ্বারাই আদিত্যগণ ঊর্দ্ধদেশে স্থায়ী রহিয়াছেন। *

---

* এই ঋকের সমগ্র তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে জানা আবশ্যক, তৎকালীন জ্যোতিষশাস্ত্রের

আর একজন ঋষি বলিতেছেন,—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।—১০।১৯০।১

তপস্ = জ্যোতি, যেমন তমস্ = অন্ধকার। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার জ্যোতিকে বেদে বলে, "তপস্"; "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তাহাতে ঋষির তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে পণ্ডিতেরা ঋত এবং সত্য বলেন, সেই জগন্নির্ব্বাহক অক্ষয় অচল অটল নিয়ম সকল ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার জ্যোতিঃ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঋষি তাহার পর বলিতেছেন যে, এই অচল অটল নিয়ম হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সাধিত হইয়াছে।

আর একজন ঋষি বলেন,—

অস্তভ্নাৎ দ্যামসুরো বিশ্ববেদা অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।
আসীদদ্ বিশ্বা ভুবনানি সম্রাট্ বিশ্বেত্তানি বরুণস্য "ব্রতানি" ॥—৮।৪২।১

মার্টিন হোগ সাহেব অসুর শব্দে বুঝেন, Living God; ইহা ঠিক। সেই জীবন্ত, সর্ব্বজ্ঞ (বিশ্ববেদাঃ) পরমেশ্বরের যে সকল সৃষ্টির কার্য্য, তাহা কতকগুলি "ব্রত" বা নিয়ম। তিনিই ব্রতের ব্যবস্থাপক ও ধারক; তাই তাঁহার প্রসিদ্ধ বৈদিক উপাধি "ধৃতব্রত"।

যে দেবরাতের কথা বলা হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—

বেদমাসো "ধৃতব্রতঃ" দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা যো উপজায়তে ॥ ১।২৫।৮

তৎকালের জ্যোতিষীগণ সময়ের চান্দ্র ও সৌরমানের পঞ্চসংবৎসরময় যুগের সমীকরণের জন্য একটি অধিমাস বা অধিক মাসের গণনা করিতেন। ইহা জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলনের ফল। ঈশ্বর বৎসরে বারমাসেরই নিয়ম করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর এক অধিমাসেরও নিয়ম করিয়াছেন। যাহা আপাততঃ নিয়মবহির্ভূত বলিয়া মনে হয়, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাহাও অবশেষে নিয়মের অধীন বলিয়া বুঝা যায়; ইহাই ঋষির তাৎপর্য্য অর্থ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর

মতে ভূমি বা পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয়। তাহার ঊর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, তাহারও ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহারও ঊর্দ্ধে নক্ষত্র। সূর্য্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধ স্থানের নাম দ্যুলোক; "সোম"দেব (চন্দ্র) সেই দ্যুলোকে বাস করেন। সূর্য্য = "আদিত্য,"—আবার দ্বাদশ মাসে এক সূর্য্যই দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কল্পিত হয়েন। মূলের "আদিত্যগণ" শব্দে সূর্য্যকেই বুঝিতে হইবে। দেবতাগণ সূর্য্যের উপরে বাস করেন, মনুষ্যেরা ভূমির উপর বাস করে। কিন্তু ভূমি ও সূর্য্য কাহার পর ভর দিয়া রহিয়াছে? ঋষি বলিতেছেন, ভূমি "সত্যে"র উপর ও সূর্য্য "ঋতে"র উপর। র্থাৎ, উভয়েই "নিয়মের" প্রভাবে আকাশে স্বীয় স্বীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

জগন্নির্ব্বাহক সমুদায় নিয়মই অবগত আছেন; কেন না, তিনিই তাহাদের ব্যবস্থাপক।

ইহাতে দেখা যায়, তৎকালীন ঋষিসমাজে বৈজ্ঞানিক ভাবের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান জড়িত ছিল। তাঁহারা সংসারকে অচল ও অটল নিয়মের অধীন বলিয়া জানিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল নিয়ম ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিতেন।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, তৎকালে বৈজ্ঞানিক ভাবের এত দূর বৃদ্ধি বা এত দূর অতিবৃদ্ধি যে, কেহ কেহ সংসারে কেবল অটল নিয়মের একাধিপত্যদর্শনে এখনকার নাস্তিকদের ন্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়েই সন্দিহান হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ ঋষি সমসাময়িক নাস্তিকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—

যংস্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরং উতেমাহু নৈষো অস্তীত্যেনং।—২। ১২। ৫

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, "ঈশ্বর কোথায়?" আবার কেহ কেহ বলে, "তিনি নাই!" এক্ষণে পাঠকবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, মধুচ্ছন্দার যুগ অজ্ঞান বা অন্ধবিশ্বাসের যুগ ছিল না। মনুষ্যগণ তখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও তৎ-প্রসূত তর্কবিতর্কে ব্যাপৃত ছিল। সংসারে নিয়মের একাধিপত্য দেখিয়া অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানিতে চাহিত না। কিন্তু ঈদৃশ নাস্তিকের সংখ্যা তৎ-কালে বিরলই ছিল। ঈশ্বর কোথায়? নাস্তিকেরা এই প্রশ্ন করিলে ঋষিরা বলিতেন, কেন ঐ দেখ তিনি "ঋতে"! সংসারের অবিচলিত নিয়মেই তাঁহারা ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহারা "ঋত-ধামন্" এই নাম প্রদান করেন। "ঋতধামন্" ঈশ্বরের এইরূপ সংজ্ঞা আর কোনও দেশের ভাষায় আছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি। যাহা ঋত, তাহাই ঈশ্বরের ধাম বা জ্যোতিঃ। ঈশ্বর প্রকাশিত একমাত্র "ঋতে"। অবশেষে "ঋত" ঈশ্বরেরই নামস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছিল। "ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম" বলিয়া অনেকে ঋতের ব্যাখ্যা করিল। মধুচ্ছন্দার বেদে এই ঋতের জ্যোতিঃ কিরূপ প্রতিফলিত, তাহা আমরা বারান্তরে দেখিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মহম্মদীয় নরক।

২

মুল্লামহম্মদ বকির মজলিসি প্রণীত হায়াত আল্ কুলুব নামক পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থে "বিরাজ" অর্থাৎ মহম্মদের স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে কৌতুকাবহ ঘটনা বর্ণিত আছে। কথিত আছে, জিবরাইল, মেকাইল এবং ইস্রাফিল, এই দেবদূতত্রয় মহম্মদের নিকট "বুরাক" নামক সুবিখ্যাত পশু আনয়ন করেন। "বুরাক" গর্দ্দভ অপেক্ষা অল্প উচ্চ, কিন্তু উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, ইহার দেহের গঠন বৃষের ন্যায় কিন্তু মুখ মনুষ্য-মুখের অনুরূপ; তাহার চক্ষু মরকত-নির্ম্মিত এবং বক্ষ মুক্তাবিভূষিত। বুরাক সাধারণ পশুর ন্যায় নহে; পরমেশ্বরের আদেশ পাইলে সে এক নিশ্বাসে স্বর্গমর্ত্ত ঘুরিয়া আসিতে পারিত। মহম্মদ এই অশ্বে আরোহণ করিলে একজন দেবদূত বুরাকের বল্গা ধরিলেন, অপর এক জন রেকাব ধরিলেন, তৃতীয় ব্যক্তি মহম্মদের বিশৃঙ্খল বেশবাস সুসজ্জিত করিয়া দিলেন।

মহম্মদ উর্দ্ধপ্রদেশে চলিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে এক বিকট কোলাহলশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। জিবরাইল বলিলেন, ইহা সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-পাতের শব্দ, এই প্রস্তরখণ্ড সত্তর বৎসর পূর্ব্বে নরকের তীর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই মিরাজের রাত্রে তাহা নরকের তলদেশ স্পর্শ করিল।

অনেক দূর গমনের পর মহম্মদের সহিত একটি বিকটমূর্ত্তি অপদেবতার সাক্ষাৎ হইল;—তাহার কুৎসিত মুখভঙ্গী ক্রোধোদ্দীপ্ত। জিবরাইল মহম্মদকে জ্ঞাত করিলেন, এ ব্যক্তি নরকের ভাণ্ডারী, যে দিন হইতে সে এই কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার মুখভঙ্গী এইরূপ অপ্রসন্ন। তাহার প
এক দল লোকের সহিত মহম্মদের সাক্ষাৎ হইল, ইহাদের সকলের মুখই উ
ন্যায়, যমদূতেরা তাহাদের শরীর হইতে মাংস কাটিয়া তাহাদিগের মুখে নি
করিতেছে; বিস্মিত মহম্মদ জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা
জিবরাইল বলিলেন, ইহারা জীবিতাবস্থায় বিশ্বাসীদিগের খুঁত ধরিত,
দশা ঘটিয়াছে।" আর এক স্থানে দেখিলেন, কতকগুলি লোক প্র
স্ব বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে; জিজ্ঞাসায় মহম্মদ জানিতে পারিলেন
ষ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে "নমাজি খুকতান" অর্থাৎ নৈশ প্রার্থনা না

দের এই দুরবস্থা। অনেকের উদরের পরিধি এমন সুবিস্তীর্ণ ও গুরুভার যে, তাহারা উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই, যমদূতেরা সকাল সন্ধ্যা দুবেলা তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে; ইহারা কুসীদজীবী। অন্য কতকগুলি লোকের মুখে যমদূতেরা অগ্নি প্রবেশ করাইয়া দিতেছে, সেই অগ্নি তাহাদের মলদ্বারপথে বাহির হইয়া আসিতেছে; মহম্মদ শুনিলেন, ইঁহারা নাবালকের সম্পত্তি অবৈধরূপে গ্রাস করিয়া এইরূপ বিপদে পড়িয়াছে।

স্বর্গগমনের পথে নরকের ভিতর মহম্মদ এই প্রকার নানাশ্রেণীর প্রতারক ও প্রবঞ্চকের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা সাধারণের কোনও হিতকর কার্য্যের জন্য বা দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাথের সাহায্যের নিমিত্ত চাঁদা আদায় করিয়া তদ্দ্বারা স্ব স্ব উদরের মঙ্গলানুষ্ঠানে রত থাকে, তাহাদের প্রতি মহম্মদ কিরূপ দণ্ডবিধান লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

ইমামতাকি নামক কোরাণের এক ভাষ্যকার আরও লিখিয়াছেন, মহম্মদের জামাতা আলি তাঁহার স্ত্রী ফাতিমার সহিত এক দিন মহম্মদকে দেখিতে গিয়াছিলেন; গিয়া দেখিলেন, প্যাগম্বর নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন; তাঁহার কাতরতাদর্শনে আলি ব্যাকুল হইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তদুত্তরে মহম্মদ বলিলেন, "আমি যে দিন স্বর্গে নীত হইয়াছিলাম, সেই দিন পথপ্রান্তে কতকগুলি স্ত্রীলোককে অতি কঠোর দণ্ডভোগ করিতে দেখিয়াছি, তাহাদের যন্ত্রণায় আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। আমি দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক কেশবদ্ধ অবস্থায় বিলম্বিত রহিয়াছে, এবং তাহার বিদারিত মস্তকের অভ্যন্তর হইতে মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িতেছে। আর এক জন স্ত্রীলোকের জিহ্বা টানিয়া াহা রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহাতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, এবং যমদূতেরা তাহার নালীতে অত্যুষ্ণ জল ঢালিয়া দিতেছে; এক জন স্ত্রীলোক তাহার নিজ র মাংস কুরিয়া খাইতেছে, তাহার পদতলে জ্বলন্ত অগ্নির রক্তলোহিত । আর একটি স্ত্রীলোক এক স্থানে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে, শ্চিক তাহাকে অবিরত দংশন করিতেছে। একটি অন্ধ, বধির ও মূক য় বস্ত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহার মস্তিষ্ক গলিত হইয়া নাসারন্ধ্র- ইতেছে ও গলিত কুষ্ঠে তাহার সর্ব্বশরীর খসিয়া পড়িবার উপক্রম ময় অস্ত্রে একটি স্ত্রীলোকের দেহ খণ্ডিত হইতেছে, অন্য এক জ

দগ্ধহস্তে নিজের অন্ত্র ভক্ষণ করিতেছে। এক জনের মস্তক শূকরের ন্যায় ও দেহ গর্দ্দভের তুল্য, সে সহস্র প্রকার দণ্ড ভোগ করিতেছে। এক জনের মুখ কুক্কুরের ন্যায়, যমদূতেরা উত্তপ্ত লৌহকুঠার দ্বারা তাহার মস্তক ও সর্ব্বশরীরে আঘাত করিয়াছিল।"—ফাতিমা পিতাকে এই সকল স্ত্রীলোকের অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে স্ত্রীলোক কেশবদ্ধ অবস্থায় ঝুলিতেছিল, সে কখনও তাহার মস্তক বস্ত্রাবৃত করে নাই; যাহার জিহ্বা আবদ্ধ ছিল, সে তাহার স্বামীকে কঠোর বাক্যে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছে; যে রমণী তাহার নিজ দেহমাংস ভক্ষণ করিতেছিল, সে তাহার স্বামীকে দাম্পত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল; যাহার সর্ব্বশরীর অগ্নিময় বস্ত্রে বিজড়িত, সে ব্যভিচারিণী; যে হতভাগিনীর দেহ অগ্নিময় অস্ত্রে খণ্ডিত হইতেছে, সে ইহলোকে হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা মনুষ্যহৃদয়ে ইন্দ্রিয়লালসা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল; যে দগ্ধহস্তে নিজের অন্ত্র আহার করিতেছিল, সে ইহলোকে রমণীদিগকে মুগ্ধ করিয়া পরপুরুষের সেবায় নিযুক্ত করিত; যাহার মস্তক শূকরের ন্যায়, সে মিথ্যাবাদিনী এবং সর্ব্বপ্রকার অপবাদের রচয়িত্রী; যাহার মুখ কুকুরের মত, সে গায়িকাবৃত্তির অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। একে একে সমস্ত স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার কারণ বলিয়া মহম্মদ উপসংহারে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে উপদেশ দিলেন, "যে হতভাগিনী তাহার স্বামীর ক্রোধোৎপাদনের কারণস্বরূপ হয়, তাহার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ; কিন্তু যে রমণী স্বামীকে প্রীত রাখিতে পারেন, তিনি অতীব সৌভাগ্যবতী।"

অনুতাপ করিলে নরকে দণ্ডের অনেক লাঘব হইয়া থাকে। আব্দাল্লা ইরমাসুদ বলেন, মহম্মদের মতে যে সকল ব্যক্তির চক্ষু হইতে অনুতাপাশ্রু নির্গত হইয়া গণ্ডদেশে প্রবাহিত হয়, সেই সকল অশ্রুবিন্দু এক একটি মক্ষিকার মস্তক অপেক্ষা বৃহত্তর না হইলেও পরমেশ্বর তাহাদিগকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করেন; কিন্তু তথাপি নরকে নারকীর সংখ্যা অল্প নহে, আব্দাল্লা ইব্রামের এ সম্বন্ধে মহম্মদবাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আল্লা নারকীদিগকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলে, যমদূত তাঁহাকে তাহাদের সংখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তদুত্তরে তিনি প্রকাশ করিবেন যে, জনসংখ্যার হাজার-করা নয় শত নিরনব্বই জন এই শ্রেণীর অন্তর্গত।"

নরকের অবস্থান সম্বন্ধে এখনও কোনও মত স্থির হয় নাই, তথাপি ইহা

তেছে; তাহার প্রথম তল মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণী এবং জীনদিগের দ্বারা অধ্যু-ষিত, দ্বিতীয় তল নিশ্বাসরুদ্ধকারী বায়ুমণ্ডলে পরিপূর্ণ, সেই দূষিতবায়ুসংস্পর্শে আদমবংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয় তল অগ্নিময় প্রস্তরে পরিব্যাপ্ত, জালাল বলেন, এই সকল প্রস্তরে প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। চতুর্থে নরকের গন্ধক স্তূপীকৃত রহিয়াছে। পঞ্চম নাগবংশের বিচরণস্থান, ষষ্ঠ বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ, এই অপার্থিব বৃশ্চিকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে এক একটি অশ্বতরের ন্যায় এবং তাহা-দের লাঙ্গুল সুবৃহৎ বল্লমের মত। পৃথিবীর শেষতলে স্বয়ং সয়তান তাহার সঙ্গীগণের সহিত বিচরণ করিতেছে। কাহারো কাহারো মতে নরক এই সপ্তম তলে অবস্থিত; আবার কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর নিম্নস্থ, চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগরসমূহের পরপারে ইহা অবস্থিত—কিন্তু এই সকল সাগরের সংখ্যা আজও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

যাহা হউক, নরকের অবস্থান কোথায়, তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে নিরূপিত না হইলেও, নরকের রক্ষীবর্গের পরিচয়প্রাপ্তিসম্বন্ধে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। এই রক্ষীগণ সংখ্যায় ঊনিশটি, এবং ইহাদের সকলের দেহই অগ্নিময়। ইহাদের প্রকৃতি অতি ভয়ানক এবং ব্যবহার অত্যন্ত কঠোর। পাপীগণ তাহা-দিগকে ডাকিয়া সবিনয়ে বলে, "তোমাদিগের প্রভুকে ডাকিয়া বল, তিনি যেন আমাদের এই যন্ত্রণা একদিনের জন্যও প্রশমিত করেন।" এই সকল রক্ষীর সর্দ্দারের নাম মালিক। পাপীর দল মালিককে ডাকিয়া বলে, "মালিক! তোমার প্রভু দেখিতেছি আমাদিগকে একেবারেই মারিয়া ফেলিবেন।" মালিক উত্তর করেন, "আর বড় বেশী দিন নয়, দশ হাজার বৎসর কোন রকমে সহিয়া থাক।" বাইদাউই বলেন, নারকীগণ মালিকের পূর্ণ নাম উচ্চারণ করিতেও ভরসা করে না, তাহাদিগকে মালি বলিয়া ডাকে।

আরব্য-উপন্যাসের পাঠক মাত্রেই "জীন"দিগের সহিত সুপরিচিত। কোন কোন লেখকের মতে জীনেরা আদমের জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল; কেহ কেহ বলেন, ইহারা আদম ও ইভের সন্তান, উক্ত দম্পতি স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইবার পর ইহাদের জন্ম হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে ইহারা মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত। ইহাদের অনেকেই পরোপকারী, উদারপ্রকৃতি এবং শান্তস্বভাব, কিন্তু অনেকেই নিতান্ত দুর্বৃত্ত, এবং কপটহৃদয়, নিষ্ঠুর মানবের ন্যায়ই ভয়ানক। যে সকল জিন অসৎস্বভাব, তাহাদের সাধারণ

মনুষ্যদেহ যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং দেবদূতদিগের দেহ আলোক হইতে উৎপন্ন, জীনদের দেহও সেইরূপ নির্ধূম অগ্নি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে মহাসাগর পরিব্যাপ্ত, তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া কাফ পর্ব্বত অবস্থিত; এই পর্ব্বত জীনদিগের বাসস্থান, কিন্তু ইহারা এই দৃশ্যমান পৃথিবীর মধ্যেও নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের উচ্চপদগৌরবের কথা চিন্তা করিলে কিন্তু ইহাদের এই পার্থিব বাসস্থানের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা না। কারণ, পৃথিবীতে সমাধিক্ষেত্র, পরিত্যক্ত নির্জ্জন ভগ্ন অট্টালিকা, অন্ধকারময় কূপ, দুর্গন্ধদূষিত নর্দ্দমা এবং পচা পুষ্করিণীই বাসোপযোগী স্থান বলিয়া ইহাদের দ্বারা বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহাদের দেহ বায়বীয়, ইহারা উভচর এবং বহুরূপী। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব বস্তুর মধ্যে লৌহই ইহাদের নিকট আতঙ্কজনক পদার্থ। জীনেরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আফ্রিৎরাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান; কথিত আছে, একটি আফ্রিৎ রাজর্ষি সলোমানের জন্য বাল্কিসের সিংহাসন ও সাবার রাজ্ঞীকে বহন করিয়া আনিয়াছিল।

জীনদিগের মধ্যে যাহারা মহৎপ্রকৃতি, তাহাদিগের নাম পরী; পক্ষ আছে বলিয়াই ইহারা ঐ নামে অভিহিত; কিন্তু পরী বলিতে সাধারণতঃ স্ত্রী জীনদিগকেই বুঝায়; ইহারা মানব অপেক্ষা দীর্ঘজীবী, কিন্তু পুনরুত্থানদিনে কেহই জীবিত থাকিবে না। উল্কাপাতে ইহাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়, মৃত্যু হইলে ইহাদের রক্ত—যাহা অগ্নির রূপান্তরমাত্র, শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, এবং দেহ ভস্মরূপে পরিণত হয়।

ইবলিস্ অর্থাৎ সয়তানের কায়েম মোকাম কোথায়, এ সম্বন্ধে এখনও নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক চলিতেছে, কিন্তু কিছু স্থির হয় নাই। কাহারো কাহারো মতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তবর্ত্তী সাগরে তাহার বাসস্থান। কেহ কেহ বলেন, সিজ্জিনেই তিনি বাস করিয়া থাকেন। কথিত আছে, আব্রাহাম লোষ্ট্রনিক্ষেপে সয়তানকে বিদূরিত করেন; কারণ সয়তান তাঁহার ইস্মাইলের বলিদানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছিল; এই জন্য সয়তানের আর এক নাম "রাজিম" অর্থাৎ লোষ্ট্রাহত। এই ঘটনার স্মরণার্থ এখন পর্য্যন্তও মুসলমানযাত্রীগণ মক্কায় উপস্থিত হইয়া মিনা নামক উপত্যকায় লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। সয়তানের আর এক নাম মারিদ অর্থাৎ বিদ্রোহী। তাহার পাঁচ পুত্র, পাঁচ জনই ধনুর্দ্ধর এবং স্বনাম-প্রসিদ্ধ। এক জনের নাম তীর, তিনি

ষ্ঠানকে সুগম করিয়া তুলেন; তৃতীয় দাসিম্, ইনি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্ত উপস্থিত করেন; চতুর্থ সুৎ, ইনি মিথ্যার জনক; পঞ্চম পুত্র জালাম্বর, ব্যবসায়কার্য্যে যত কিছু বিপদ, ইহাঁর কৃপাতেই তাহা সংঘটিত হয়। এতদ্ভিন্ন সয়তানের কতকগুলি অবৈধ পুত্র কন্যাও আছে, নির্ধূম অগ্নি হইতে উৎপন্ন কোনও কামিনীর গর্ভে তাহাদের জন্ম। এই কন্যাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধানার নাম ঘুল। কুত্রব নামক পুত্রটি নরমাংসভোজী, সয়তানের আর এক পুত্র ঘাদ্দার মানুষ লইয়া ঘুরাইয়া মারে, শিকারী বিড়াল ইন্দুর লইয়া যেরূপ ব্যবহার করে, মনুষ্যের সহিত এই সয়তানপুত্রের ব্যবহারও তদ্রূপ। সয়তানের ভাল্লান নামক পুত্রটি অষ্ট্রীচ্ পক্ষীতে সওয়ার হইয়া কোথায় কোন জাহাজ ডুবিল, তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়ায়; কারণ, সেই সকল জাহাজের বিপন্ন আরোহীদিগের মাংস তাহার পরমরুচিকর খাদ্য। সয়তানের অন্যতম পুত্র শিক, পথিকদিগের পথভ্রান্তি উৎপাদন করে; নিস্নাস নামক আর এক পুত্রের মুখ বক্ষঃস্থলে এবং মেষের ন্যায় তাহার একটি লাঙ্গূল আছে।

সুবিখ্যাত ফার্দ্দুসী-বিরচিত সানামা নামক গ্রন্থে অপদেবতাদিগের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত আছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকার একটি কবিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়, একবার মারদাস নামক আরবদেশীয় এক রাজা সয়তানের কুচক্রে একটি গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। মারদাসের মৃত্যুর পর যিনি সিংহাসন লাভ করেন, তাঁহার নাম জাঢ়াক; নীরো প্রভৃতি পৃথিবীর নিষ্ঠুরপ্রকৃতি নরপতিদিগের মধ্যে জাঢ়াক এক জন। এক দিন সয়তান পাচকের বেশে জাঢ়াকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার পাচককার্য্যে নিযুক্ত হইল। উক্ত গ্রন্থকারের অনুমান যে, এই ছদ্মবেশী সয়তানই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে নরমাংসভোজনে মনুষ্যের প্রবৃত্তি জন্মায়; জাঢ়াক এই অভিনব খাদ্য দ্রব্য আস্বাদন করিয়া এতই প্রীত হইলেন যে, তাঁহার পাচকের নিকট কল্পতরু হইয়া বসিলেন, এবং তাহাকে তাঁহার নিকট যথেচ্ছ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পাচকরূপী সয়তান তখন কৃত্রিম বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিল, "মহারাজ বিয়াদবি মাপ করিবেন, যদি অনুমতি হয় ত আপনার সুচারু স্কন্ধদ্বয়ে একবার চুম্বন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।" সয়তান কিছু ডিপ্লোমাটিষ্ট—আজ নহে চিরকালই এইরূপ—তাহার মনোবাঞ্ছা যে কি, তাহা রাজা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারেন নাই, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার প্রার্থনায়

ভীষণদর্শন, কৃষ্ণকায় অজগর সর্পের আবির্ভাব হইল। বিস্তর চেষ্টাসত্ত্বেও সর্প-দ্বয় যখন স্কন্ধ হইতে অপসৃত কি নিঃসৃত হইল না, এমন কি, মস্তক কাটিয়া ফেলিলেও পুনর্ব্বার মস্তক গজাইয়া উঠিল, তখন সয়তান রাজাকে পরামর্শ দিল যে, প্রত্যহ যদি ইহাদিগকে জীবন্ত নরমস্তক ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা রাজার কোনও প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। উক্ত ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠের মত এই যে, পৃথিবী নির্ম্মনুষ্য করিবার অভিপ্রায়েই সয়তান এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

বাল্মীকি বা ভার্জ্জিল হইতে দান্তে মিলটন্ মাইকেল, পূর্ব্বাপর সকল শ্রেষ্ঠ কবিই নরকবর্ণনায় আপনাদিগের কল্পনাশক্তিকে অসংযতভাবে নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি সাদীর 'বোস্তান' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, উপাসনাই স্বর্গরাজ্যের দ্বারের চাবি, মনুষ্যের নয়নসমক্ষে ইহা দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাদী বলিয়াছেন, "যদি তোমার পথ তোমাকে ঈশ্বরের দিকে না লইয়া অন্য দিকে (নরকে) লইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার উপাসনারূপ গালিচা (সেই) অগ্নিমধ্যেও তোমার জন্য বিস্তৃত রহিবে।" ইহ-জীবন ও নরকের মধ্যে যে পথ, তাহা কত সত্বর অতিক্রম করিতে পারা যায়, সাদীর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে ;—একজন পাপী কোনও উচ্চ স্তম্ভাগ্রভাগ হইতে হঠাৎ পড়িয়া যায়, পতনমুহূর্ত্তেই সে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিল। তাহার পুত্র পিতার মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল; অনন্তর একদিন সে স্বপ্নে তাহার পিতার সাক্ষাৎ-লাভে সমর্থ হইল। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে পিতা উত্তর করিলেন, "আমি নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, কিরূপে তাহা বলিতে পারি না, তবে স্তম্ভাগ্র হইতে পতনমাত্রেই দেখিলাম, আমি স্বর্গে উপ-স্থিত হইয়াছি।"

পারস্যভাষায় লিখিত "গোলেস্তাঁ" নামক সুপ্রসিদ্ধ কেতাবে একটি উপা-খ্যান আছে,—একজন ধার্ম্মিক লোক স্বপ্নে দেখিলেন, এক রাজা স্বর্গে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, আর একজন সাধু ব্যক্তি নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন ; ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি ? রাজা বিলাসী, বিবিধকুক্রিয়াসক্ত এবং অধার্ম্মিক,—তাহার ঊর্দ্ধ-গতি হইয়া এরূপ ধার্ম্মিকের অধোগতি হইবার অর্থ কি ?" তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হইতে

তিনি স্বর্গের অধিকারী, কিন্তু এই ধার্ম্মিক সাধু রাজসহবাসে পাপসঞ্চয় পূর্ব্বক নরকগামী হইয়াছেন।”

পারস্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি জামীর “বাহারিস্তা” নামক কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে, একদিন দুই কবি এক টেবিলের কাছে বসিয়া তদুপরিস্থ অত্যুষ্ণ “পালুদা” (জল, দুগ্ধ, মধু এবং ময়দা সংযোগে প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ) শীতল হইবার আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একজন অন্যকে বলিলেন, “এই যে আমাদের খানা, ইহা অপেক্ষাও উত্তপ্ত জল ও ঘসাক্ কল্য নরকে তোমাকে পান করিতে হইবে।” বন্ধুবরের এই শুভাশীর্ব্বাদ শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন, তবে নরকে গিয়া তুমি তোমার একটি বায়েৎ শুনাইও, তাহা হইলে তুমি নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও উদ্ধার করিতে পারিবে। অনন্তর তিনি গানের সুরে বলিলেন, যদি তুমি স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া শৈত্যগুণসম্পন্ন একটি অসম্পূর্ণ কবিতাও রচনা কর, তাহা হইলে নরকাগ্নির সমস্ত উত্তাপ বিদূরিত হইবে, এবং অত্যুষ্ণ জলরাশি তুষারশীতলতা প্রাপ্ত হইবে।

পারস্যভাষায় লিখিত “দেবিস্তাঁ” নামক আর এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে; ইহার প্রণেতা কে, এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত মতদ্বৈধ আছে, অনেকের মতে কাশ্মীরের সেখ মহম্মদ মসীন ইহার রচয়িতা। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্যভাষাবিৎ সুবিখ্যাত সার্ উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থে যত গভীর জ্ঞানোপদেশ, যত কৌতুকাবহ কাহিনী, যেরূপ মধুর কবিত্ব, অদ্ভুত রচনাকৌশল ও রহস্য এবং যেমন পরনিন্দা ও অশ্লীলতা একাধারে বিদ্যমান আছে, তেমন আর কুত্রাপি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তার মতে পাঁচটি প্রধান ধর্ম্ম পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছে, এই পাঁচটি যথাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম, পারস্যপ্রচলিত ধর্ম্ম, হিব্রু ও খৃষ্টীয় এবং মুসলমান-ধর্ম্ম। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “নরক সম্বন্ধে মুসলমান দার্শনিক, আরবীয় হাকিম কিম্বা পারস্য জিরাকের মত কি ?” এবং এই প্রশ্নের নিজেই সদুত্তর দিয়া বলিয়াছেন, “ইহা নিতান্তই যৎসামান্য।” মতান্তরে প্রকাশ, নরকের সপ্তদ্বার মনুষ্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গমাত্র, সেই সকল অঙ্গের সহায়তায় পাপানুষ্ঠান হয় বলিয়া নরকের সপ্তদ্বার কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য একজন পারস্য কবি কহিয়াছেন, “তোমার দেহে সপ্তদ্বার বিদ্যমান বটে,

সেই সকল কুলুপের চাবি তোমার হস্তে, সাবধান, দ্বার খুলিয়া তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিও না।"

মুসলমান-ধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; এই সকল সম্প্রদায় নরকসম্বন্ধে একমত নহে। আবদাল্লা ইব্ন মামুদ বলেন যে, মহম্মদ একদিন একটি সরল রেখা টানিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "ইহাই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার পথ," তাহার পর, অনেকগুলি বক্র রেখা টানিয়া বুঝাইলেন, এই সকল পথে প্রতারক সয়তান গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আবদাল্লা ইব্ন অমর বলেন, মহম্মদ বলিয়াছেন, ইস্রায়েলগণ দ্বিসপ্ততি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কিন্তু মুসলমানগণ ত্রিসপ্ততি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে, এবং একটি সৌভাগ্যবান্ সম্প্রদায় ভিন্ন আর সকলগুলিকেই নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। কোন সম্প্রদায় এরূপ সৌভাগ্যশালী, মহম্মদের শিষ্যগণ তাহা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "আমি ও আমার সহচরগণ যে সম্প্রদারভুক্ত।" আর এক সময় মহম্মদের অনুচরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মুক্তি সূর্য্য কাহাদের উপর কিরণ বর্ষণ করিবে?"—তাহাতে মহম্মদ উত্তর করিলেন, "সুন্নীদিগের উপর।"

"ওয়ারিদিয়া"তে লিখিত আছে, নরকসম্বন্ধে ইহাই সাধারণতঃ বিশ্বাস যে, যাহারা একবার নরকাগ্নিতে প্রবেশ করিবে, তাহারা আর কখন তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে না, কিন্তু "মুমিন" অর্থাৎ বিশ্বাসীগণকে কখন সে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে না। কিন্তু "যাবাইয়া"তে ইহাও ব্যক্ত যে, বিশ্বাসীগণ অতি গভীর পাপে লিপ্ত হইয়া যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুতপ্ত না হয়, তবে নরকে তাহাদিগের বাস চিরস্থায়ী। "খাতাবিয়া"তে প্রকাশ, নরক সর্ব্বপ্রকার পার্থিব দুঃখ ক্লেশ ও যাতনার অবিচ্ছিন্ন ভোগমাত্র। "যাহামিয়া"তে জানিতে পারা যায়, নরকের অগ্নির চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তিবলে ইহা সমস্ত প্রাণীকে টানিয়া লয়।

হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওয়াশিল ইব্ন আতা নামক একজন সংস্কারক আবির্ভূত হন, তিনি এই ধর্ম্মের অনেক গোঁড়ামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটি নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন; এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ "ফরাজী" নামে খ্যাত। মহম্মদীয় ধর্ম্মে ইহারা স্বাধীনমতবাদী, এইজন্য অনেক গোঁড়া মুসলমান ইহাদিগকে নাস্তিক বলিতেও পশ্চাৎপদ নহে। ইহারা সওয়াল কবরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; তুলাদণ্ডসম্বন্ধে ইঁহাদিগের মত এই যে, লঘুত্ব বা গুরুত্ব অনুসারে কর্ম্মফলের কোনও সম্বন্ধ নাই; কারণ কর্ম্ম নিতান্তই দৈবাধীন এবং

তুলাদণ্ডের আধারে সূক্ষ্ম বিচারের নিদর্শন সূচিত হইতেছে মাত্র। সেতু সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, ইহা বিশ্বাসীর হৃদয়ে যৎপরোনাস্তি ভয় এবং উদ্বেগের সঞ্চার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ ভয় বা উদ্বেগের কোনও কারণ নাই। ইহাদের মতে সয়তানের অর্থ অনিয়ন্ত্রিত মনুষ্যহৃদয়। অসৎপ্রকৃতি মুসলমানও নরক-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবে না, তবে কাফের অপেক্ষা তাহাদের দণ্ড কিঞ্চিৎ লঘু, এই মাত্র। ফরাজীগণ বিশ্বাস করেন, কোরাণ দেহের অবস্থান্তর। ইহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, কোরাণ কখন পুরুষ দেহে, কখন স্ত্রীদেহে, কখন বা পশুদেহে পরিণত হয়।

আলঘাজালি নামক জনৈক পারস্য ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "সওয়াল কবর" কত দূর সত্য, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পারস্যের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার এক মৃত অশ্বরক্ষকের মুখগহ্বর শুষ্ক শস্যে পূর্ণ করিয়া তাহাকে সমাহিত করেন, কয়েক দিন পরে তাহার সমাধি উন্মুক্ত করিয়া দেখা হইল, তাহার মুখবিবরে শস্যগুলি এক অবস্থাতেই রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিলেন, "ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, এই ব্যক্তি কবরের মধ্যে কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেয় নাই।"

এই মন্তব্যের উত্তরে আল্‌ঘাজালি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহারা মৃতের আর্ত্তনাদ শুনিতে পায় না বলিয়া আশ্চর্য্য হয়, তাহাদের বিস্ময়ের কোনও কারণই নাই। দেবদূত জেবরাইল যখন মহম্মদের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তখন তাহা মহম্মদ ব্যতীত অন্য কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। মৃত্যুর পর যে পৃথিবীর সকল লোকই সমাহিত হয়, এমন নহে; অনেক জাতির মধ্যেই দাহপ্রথা প্রচলিত আছে, কোন কোন জাতি মৃতদেহ মাংসাশী পশু পক্ষীর হস্তে সমর্পণ করে, কেহ বা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের "সওয়াল কবর" কিরূপে সম্পন্ন হয়, এই ঐতিহাসিক মহাশয় সে সম্বন্ধেও মতপ্রকাশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার মতে, এই সকল ব্যক্তির দেহের কোন-না-কোন অংশ ধ্বংস হইতে রক্ষা পায় এবং পরমেশ্বরের অদ্ভুত ক্ষমতাবলে তাহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে। তান্নিম সম্বন্ধে আল্‌-ঘাজালি লিখিয়াছেন, মনুষ্যের দ্বারা যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, তান্নিমের সংখ্যা তাহার সমান; মহাসর্প হইতে ক্ষুদ্র বৃশ্চিক—সমস্তই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, পার্থিবচক্ষে এই সকল ভীষণ প্রাণী দৃষ্টিগোচর করা অসম্ভব। মনুষ্যগণের সহিত দেবদূতের যে প্রভেদ, সাধারণ নাগবংশের সহিত তান্নি-

মেরও সেই প্রভেদ, এবং তাহাদের দংশনজ্বালা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবনীয়।

উপসংহারে আলঘাজালি বলিয়াছেন, যাহারা এই সকল অকাট্য যুক্তি এবং সুবিশ্বাস্য উক্তি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেই সকল ব্যক্তি পরমেশ্বরের অদ্ভুত ক্ষমতা ও অমানুষিক কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিস্তর মাথা ঘামাইলেও আমাদের সাধ্য নাই যে, সেই সকল তথ্য অবগত হই। অতএব তাঁহার উপদেশ এই যে, নরকের বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা প্রভৃতি অবগত হইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া আমরা যাহাতে সেই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, যেন তাহারই উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকি; এক জন সুলতান তাঁহার কোনও দাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এক অন্ধকারপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "আজ তুই এই অবস্থাতেই এখানে পড়িয়া থাক্, কাল আসিয়া তোর কান কাটিয়া দিয়া যাইব।" কূপমধ্যে পড়িয়া সেই রাজভৃত্য মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল,—"মহারাজ এই গুরুতর ব্যাপার কোন্ অস্ত্রে সম্পন্ন করিবেন, ছুরিকায়, তরবারীতে অথবা ক্ষুরসহযোগে, খবরটা একবার জানিতে পারিলে হইত!" আল্‌ঘাজালীর মতে, আমাদের নরকের খবর লইতে ব্যস্ত হওয়াও অনেকটা সেইরূপ; অতএব উক্ত ঐতিহাসিকবরের যুক্তি ও উপদেশানুসারে, বর্ত্তমানে আমরা এই আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইতেছি।

কুরুক্ষেত্র।*

সমালোচনা।

১

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যরচনার ও আলোচনার বহুবিধ সুফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাব্যরচনায় কবির যশোলাভ অর্থাগম অমঙ্গলশান্তি হয়; কাব্য-আলোচনায় কাব্যামোদীর মধুর উপদেশ, লোকচরিতজ্ঞান এবং সদ্যঃ পরানির্বৃতি সাধিত হয়। সদ্যঃ পরা নির্বৃতি? সে কি পদার্থ? সে একটা অভূতপূর্ব্ব অনশ্বর অত্যদ্ভুত সুখের পরাকাষ্ঠা, একটা বিমল অপার্থিব ভূমানন্দ। সৎকাব্য আলোচনার শ্রেষ্ঠতম সুফল এই ভূমানন্দলাভ—এই সুখের অমৃতধারায় অভিষেক। যে কাব্যে যে পরিমাণে এই ফল সিদ্ধ হয়, সেই কাব্য

* কুরুক্ষেত্র (কাব্য)। কবিবর শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

সেই পরিমাণে সৎ। ব্রহ্মনির্ব্বাণে যে আত্যন্তিক অতীন্দ্রিয় অনুপম সুখরসের প্রসঙ্গ শুনা যায়, বোধ হয়, ঐ পরা নির্বৃতি সেই জাতীয়। আর এই পরা নির্বৃতি সাধনের হেতু বলিয়াই বুঝি কবির এত গৌরব, এত মহিমা! তাই

সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য জগৎ নশ্বর
কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর,

সেই জন্যই কবির এত উচ্চাসন,

যে কালতরঙ্গ
:
উর্দ্ধতম গ্রহ তারা করে তিরোধান,
যায় সেই কাল বহি, লহরী খেলিয়া
কবির চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম।

কুরুক্ষেত্রের কবি অমর কবি, তাঁহার আসন অতি উচ্চ। কুরুক্ষেত্র কাব্য ঐ পরানির্বৃতির প্রকৃষ্ট সাধন, অতএব অ-মৃত কাব্য।

কুরুক্ষেত্র কাব্য প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডবের রণক্ষেত্র সেই ঐতিহাসিক ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ লইয়া বিরচিত। এ কাব্যের অঙ্কুর, কবির রৈবতক কাব্যে। ইহার উপাখ্যানভাগ কতক অংশে ঐ রৈবতকের সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরি-ত্রের উন্মেষ রৈবতকে। উভয় কাব্যেই নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেবের অতিমানুষ কীর্ত্তিকথা গীত হইয়াছে। 'রৈবতকের ভিত্তিভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগুলীলা, কুরুক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি তাঁহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা।' অর্থাৎ, রৈবতকে ভগবানের আদ্যচরিত এবং এই কুরুক্ষেত্রে ভগবানের মধ্যচরিত বর্ণিত হই-য়াছে। লীলাময়ের উত্তরচরিত—প্রভাসক্ষেত্রে যাহার পূর্ণবিকাশ—কবে বর্ণিত দেখিব? রৈবতক পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক এই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মহাগীতির উত্তর তান শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। কবি তাহার মনস্কামনা আংশিক পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু বাসুদেবের 'অক্ষয় কীর্ত্তির গান অমৃত সমান' এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কবি প্রতিভার এই ঋণ পরিশোধ করুন। তাঁহার কাছেই শিখিয়াছি

যার যত উচ্চশক্তি তত উচ্চতর
কার্য্য তার, দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর। *

কবি ভাস্কর, আলোকবিকীরণে আপন উচ্চশক্তির সার্থকতা করুন। প্রতি-ভার গুরু ঋণভার আর বহন করেন কেন?

শুনিতেছি, কবি ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্য-

---

* সেক্ষপীয়রেও এই মর্ম্মের একটা কথা আছে,

লীলা ভিত্তি করিয়া প্রভাসকাব্য রচনার সূচনা করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী পাঠকের শুভাদৃষ্ট বটে। 'প্রভাস' সম্পূর্ণ হইলে, রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস মিলিয়া—তিনে এক হইয়া, বাঙ্গালায় এক অপূর্ব্ব কাব্যমন্দির সৃষ্ট হইবে, কালস্রোত তরঙ্গভঙ্গে ইহার পদমূল চুম্বন করিয়া অনন্তের মুখে বহিয়া যাইবে। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী নামের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই কাব্যত্রিক অনশ্বর দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া নরনারায়ণের কীর্ত্তিকথা জাতীয়হৃদয়ে জাগরূক রাখিবে।

রৈবতক কুরুক্ষেত্রের যথাযোগ্য আদর হইবার সময় এখনও আসে নাই। বোধ হয়, অত্যল্প বাঙ্গালীই এই সকল কাব্য প্রকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বহুদিন পূর্ব্বে কাব্যের খসড়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, সুরচিত হইলে ঐ কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতস্থানীয় হইবে। এ কথার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে ব্যাসদেবের মহাভারতে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইত, এ যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এই রৈবতক কুরুক্ষেত্র কাব্যে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। কথাটা একটু বুঝিয়া দেখা যাউক।

সকল জাতির একটা জাতীয় আদর্শ আছে। জাতির জনসাধারণ সেই জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পায়। গ্রীক জাতির আদর্শ ছিল, অ্যাকিলিস্ বা য়ুলিশিস্। অ্যাকিলিসের মত বীর বা য়ুলিশিসের মত ধীর হইতে পারিলে গ্রীক, জাতীয় আদর্শের সম্মুখীন হইত। এইরূপ খৃষ্টীয়ানের আদর্শ যিশু; মুসলমানের আদর্শ মহম্মদ, ইত্যাদি। এই আদর্শ থাকে বলিয়াই জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই আদর্শের সমীপস্থ হইবার প্রয়াসই জাতীয় জীবনের সার্থকতা। আর এই আদর্শ যে জাতির যত উৎকৃষ্ট, সেই জাতি সভ্যতার তত উচ্চস্তরে সমারূঢ়।

প্রাচীন হিন্দুজাতির এই আদর্শ ছিলেন, নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। সে আদর্শ কত উৎকৃষ্ট, ভীষ্মের মত সর্ব্বগুণধাম রাজর্ষি ও ব্যাসের মত সর্ব্বজ্ঞানাধার ব্রহ্মর্ষি যাহার অনুসরণ করিতেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, এরূপ উচ্চ আদর্শ আর কোনও জাতির নাই; এ আদর্শের তুলনায় অন্য সকল আদর্শ খাট হইয়া পড়ে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়। একাধারে শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র।

এই মহাদর্শ নয়নের সম্মুখে ছিল বলিয়াই, প্রাচীন হিন্দুজাতি উন্নতির উচ্চ-

শিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিল। সুসম্পূর্ণ আদর্শের অনুকরণেই হিন্দুজাতি ধর্ম্মে, জ্ঞানে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শীলতায়, দাক্ষিণ্যে, সভ্যজগতের অগ্রণী হইয়াছিল। আর এই আদর্শের লক্ষ্য হারাইয়াই সেই উন্নততম হিন্দুজাতি আজ অধোগতির চরমসীমায় উপনীত হইতেছে। এই মহাদর্শ দৃষ্টি হইতে অপসারিত হওয়াতেই আজ আমরা ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন, উত্তমহীন, নগণ্য অর্দ্ধবর্ব্বর হেয় জাতিতে অবনত হইয়াছি।

এ আদর্শ কেন হারাইলাম? কেন এ ত্রিদিবের আলোক আমাদের জাতীয়-হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল?

আদর্শকে চিরস্থায়ী করিয়া জাতিসাধারণ্যে প্রচারের জন্য জাতীয় লোকায়ত কাব্যগ্রন্থের আবশ্যক। ভাস্কর যেরূপ প্রস্তরে কাটিয়া আকৃতির স্থায়িত্ব সাধন করে, কবি সেইরূপ অক্ষরে লিখিয়া প্রকৃতির স্থায়িত্ব বিধান করেন। এইরূপে মহাপুরুষের আদর্শচরিত্র তাঁহার দেহের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া সুকবির কাব্যে অনন্তকালের জন্য অবিনশ্বর হইয়া থাকে। এইরূপে আদর্শ চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু লোককে আদর্শের অনুগামী করিতে হইলে আদর্শ কেবল চিরস্থায়ী হইলে হইবে না, আদর্শ প্রচারিত হওয়া চাই। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য লোকায়ত কাব্যের প্রয়োজন। যে কাব্য সকলেই পড়ে, যাহা সাধারণের সম্পত্তি, যাহা দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত হয়, এরূপ কাব্য চাই। মহাভারত ঐরূপই কাব্য। সুকবিপ্রণীত লোকায়ত ঐ গ্রন্থ, গ্রীসে ইলিয়দ বা আরবে কোরাণের মত ভারতের জাতিসাধারণের সম্পত্তি ছিল। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকথা গীত হইয়া ভারতীয় জনগণকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া মহাদর্শের অনুগামী করিত। তাহাতেই জাতীয় উন্নতি সাধিত হইত।

কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে জাতির বিকৃতির সহিত জাতীয় আদর্শ বিকৃত হইতে লাগিল। বায়সের আদর্শ দাঁড়কাক, সরীসৃপের আদর্শ অজগর। অধঃপতিত হিন্দু সেই প্রেমময়, জ্ঞানময়, নীতিময়, ধর্ম্মময় ঐতিহাসিক দেবনরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে বসাইল,—এক কাল্পনিক কপট শঠ লম্পট ভীরু কামুক মিথ্যুককে। সঙ্গে সঙ্গে বেদব্যাসের মহাকাব্য প্রক্ষিপ্ত সঙ্কুল হইল। আদর্শের সহিত আদর্শপ্রচারক গ্রন্থের সামঞ্জস্য চাই। মহাভারতের স্বচ্ছ স্রোতে ক্ষুদ্র কবির পঙ্কিল সলিল আসিয়া মিশিল। হিন্দুজাতি জাতীয় আদর্শ হারাইল। ধ্রুবতারাভ্রষ্ট বিপন্ন তরণীর ন্যায় হিন্দুজাতি আদর্শভ্রষ্ট হইয়া সংকট অবস্থাপন্ন হইল।

বাস্তবিক এখনকার প্রচলিত মহাভারতের আলোচনা করিলে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। এই কি সেই কৃষ্ণ, যাঁহার অবতারত্ব খ্যাপনের জন্য ব্যাস লক্ষ লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহার পদরেণু শিরে ধারণ করিবার জন্য ভীষ্ম শরশয্যার সুতীব্র যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়াছিলেন? তাহা নহে। আমাদের সে জাতীয় নিধি, আমরা অনেক দিন হারাইয়াছি। হারাইয়া মণিহারা ফণীর মত নিষ্প্রভ হইয়া আছি।

কিন্তু বাঙ্গালীর সৌভাগ্য, রৈবতক কুরুক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। বোধ হয়, নবীন বাবুর কল্যাণে আমরা সেই হারানিধি আবার ফিরিয়া পাইলাম। বোধ হয়, সেই মলিন আদর্শ আবার আমাদের হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিল। এই বুঝি সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক কৃষ্ণচরিত্র। এখন আমরা বুঝিলাম, কেন ভারত এক দিন কৃষ্ণনামে মাতিয়াছিল, কেন গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি, কেন মুখে মুখে নাম। কেন আসিন্ধুহিমাচল কৃষ্ণপূজা। কেন ভীষ্মের মত রাজর্ষি, ব্যাসের ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে আদর্শ করিয়াছিলেন। কেন শুকমুখগলিত তাঁহার কথামৃত আস্বাদন করিবার জন্য হিন্দু জনসাধারণ লালায়িত হইত।

বঙ্কিম বাবুর কল্যাণে কৃষ্ণচরিত্রের আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন নবীন বাবুর কাব্য কৃষ্ণভক্তিপ্রচারকার্য্যে মহাভারতের স্থানীয় হউক। তর্কযুক্তি গবেষণায় বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, কিন্তু হৃদয় ভিজে না। ভক্তিগ্রন্থ কুরুক্ষেত্র রৈবতকে বাঙ্গালীর মরুহৃদয় অভিষিক্ত হইয়া তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হউক। আবার আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে। আবার আমরা উচ্চাদর্শের অনুসরণ করিয়া গরীয়ান্ মহীয়ান্ হইব। আবার হিন্দুজাতি—এই পরাধীন পদদলিত হেয় ঘৃণ্য নগণ্য হিন্দুজাতি, জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। সেই শুভদিনে, জাতীয় জীবনের সেই স্ফূর্ত্তির দিনে, জাতীয় আদর্শের সেই সুসম্পূর্ণতার দিনে, আমরা কুরুক্ষেত্র রৈবতকের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিব; যথাযোগ্য আদর করিতে শিখিব। তখন আমরা বুঝিব যে, কুরুক্ষেত্র রৈবতক বাস্তবিকই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত পূর্ণাদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া আর্য্যজাতির যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, দেশ কাল ও পাত্রভেদে, কুরুক্ষেত্র রৈবতকও সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। সেই দিন আর কত দূরে? ঈশ্বর সেই শুভদিন শীঘ্র আনিয়া দিন। ক্রমশঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

ইতিহাসসমালোচন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, শেষ পেশওয়া বাজীরাও, মালকম সাহেবের হস্তে মহারাষ্ট্র রাজ্য অর্পণ করিয়া তীর্থবাসের মানসে পুণা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, কাপ্তেন জেম্‌স্ গ্র্যাণ্ট ডফ্ সাহেব মহোদয়ের চেষ্টায় (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে) মহারাষ্ট্রীয় জাতির এক নাতিসংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইংরাজী ভাষায় রচিত হয়। এই ইতিহাস বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও কথঞ্চিৎ আস্থা পূর্ব্বক লিখিত হইলেও, ইহা মহারাষ্ট্রবিজয়ী ইংরাজ ঐতিহাসিকের দ্বারা রচিত হওয়ায়, সম্পূর্ণ দোষশূন্য ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। বিশেষ মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে, ইহাতে নানাপ্রকার ত্রুটি ও ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। লেখকের নিরবচ্ছিন্ন অনভিজ্ঞতা বা ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ, এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিবিধ অসত্য ও অসম্ভব সিদ্ধান্তসমূহ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবাস রাজ্যের নায়েব দেওয়ান, রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে মহো (১৮৬৭ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম ডফ্-প্রণীত ইতিহাসের উল্লিখিত দোষসমূহ সংক্ষেপে প্রদর্শন ক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। তৎপরে স্বর্গীয় বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লুণ্‌কর "নিবন্ধমালা"য় শিত "ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে স্বদেশীয়গণের রচিত ইতিহাসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা ও ইতিহাসরচনার উপকরণসংগ্রহ করিবার জন্য স্বদেশীয় কৃতবিদ্যগণকে অনু করেন। শুভক্ষণে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায়, তৎপাঠে অনেকেই ইতিহাসের আ চনায় অনুরাগী ও উপকরণসংগ্রহে মনোযোগী হইলেন। ইহার অল্পকাল পরেই, শাস্ত্রী মহে

মহারাষ্ট্রে ইতিহাসালোচনা।

দয় ও তাঁহার কয়েকজন কৃতবিদ্য বন্ধুর (১) উদ্যোগে "কাব্যেতিহা সংগ্রহ" নামক এক মাসিকপত্র (১৮৭৮ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন বখর (২) ও ঐতিহাসিক কাগজপত্রসমূহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল (৩)। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় ৩০।৩৫ খানি সুবৃহৎ বখর, নানাবিধ বংশতালিকা ও প্রায় ৬।৭ শত চিঠিপত্র, নানাবিধ টীকাটিপ্পনীসহ প্রকাশিত হইয়া, মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসরচনার পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। কাব্যেতিহাসসংগ্রহে প্রকাশিত উপকরণাদি অবলম্বনে স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসপ্রণয়নে এ পর্য্যন্ত যদিও কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই, তথাপি "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটির" সাহায্যে ও উৎসাহে, মহারাষ্ট্রদেশের বিখ্যাত ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর ও রাজনৈতিক পুরুষগণের অনেকগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ও হইতেছে। অদ্য এই সকল গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান না করিয়া, আমরা মহারাষ্ট্র ঐতিহাসিক আন্দোলনের মূল,—রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে মহোদয়ের প্রবন্ধের পরিচয় দিব।

---

(১) জনার্দ্দন বালাজী মোডক বি, এ, এবং কাশীনাথ নারায়ণ সানে বি, এ, এবং আমাদের রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে প্রভৃতি।

(২) ঘটনাবিশেষের ঐতিহাসিক বিবরণকে "বখর" বলে। জীবনচরিত ও ইতিহাস বুঝাইতেও বখর-শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার মিচেল বলেন,—The Maratha country abounds with Bakhars, or narratives of particular historical events, written in prose." J. R. A. S. (Bombay) 1840.

রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে (Late Asst. Guardian and Tutor to H. H. The Nawab of Jawrah; Guardian and Tutor and Councillor to H. H. of Dewas Junior Branch and Late Dewan of Manwral Katiawar.) এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় ও উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ইনি দেবাস রাজ্যের নায়েব দেওয়ান (৪)। ইহাঁর সাহিত্যানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। ইনি শেক্‌স্‌পীয়র কৃত "টেম্পেষ্ট" নাটকের মারাঠী অনুবাদ," "ঘাশীরাম কোতয়াল—সমালোচন" (৫) "মহারাষ্ট্র ইতিহাস সমালোচন" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও ইহাঁর কয়েকটি ব্যাখ্যান আছে। পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রতি ইহাঁর বাল্যকাল হইতেই বিশেষ অনুরাগ। "মালব প্রদেশে প্রাপ্ত তিনটি তাম্রশাসন সম্বন্ধে বিচার" ও "মুসলমান শাসনকালে মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা" প্রভৃতি সুলিখিত প্রবন্ধ তাঁহার এই অনুরাগের পরিচায়ক। ইহাঁর রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, মধুর অথচ সসার। মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ নানাবিধ প্রাচীন বখর, বংশতালিকা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া, "বিবিধজ্ঞানবিস্তার" ও "কাব্যেতিহাসসংগ্রহ" পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। এইরূপে রাও বাহাদুর কীর্ত্তনে মাতৃভাষার সেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মহারাষ্ট্র সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয়।

বলিয়াছি, রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে প্রণীত "মহারাষ্ট্র ইতিহাসের সমালোচনা" (A Review of Captain James Duff's History of the Marathas.) বা মহারাষ্ট্রীয়গণের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ" প্রবন্ধই মহারাষ্ট্রে ঐতিহাসিক আন্দোলনের মূলীভূত কারণ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মাননীয় কীর্ত্তনে যখন পুণা কলেজের জুনিয়ার ষ্টুডেণ্ট্ ছিলেন, সেই সময় "পুণা ইয়ং মেন্‌স্ এসোসিয়েশন্" নামক এক ছাত্রসভায় সর্ব্বপ্রথম এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেদিন স্বর্গীয় কৃষ্ণশাস্ত্রী চিপ্‌লুণ্‌কর (নিবন্ধমালা-প্রণেতা ৺ বিষ্ণু শাস্ত্রী মহোদয়ের পিতা) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সেই ছাত্রসভার ও প্রবন্ধপাঠকের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন; এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে খ্যাতনামা শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই উক্ত প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করেন ও লেখককে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে বলেন। পরে উহা "ইন্দুপ্রকাশ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লেখক সংশোধিত ও বহুলরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

সমালোচ্য গ্রন্থের বিবরণ।

এই সংস্করণে নূতন ছয়টি পরিশিষ্ট সংযোজিত হওয়ায়, ইহার আকার পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্টে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশে যে সকল রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক মহাশয় এই বিবরণ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রণীত "History of the Deccan down

পরিশিষ্ট।

(৪) ইহাঁর ভ্রাতা রাও বাহাদুর বিনায়ক জনার্দ্দন কীর্ত্তনে মহোদয়, বরদা (মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ "বড়োদা" বা "বড়োদেঁ") রাজ্যের নায়েব দেওয়ান। ইনি "মাধব রাও পেশওয়ে" ও "জয়পাল" নামক দুই খানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন।

(৫) "ঘাশীরাম কোতয়াল" মিশনারী-যুগে রচিত একটি উপন্যাস। ইহাতে জনৈক মিশনারী ভক্ত কর্ত্তৃক হিন্দুজাতি, হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু নীতির সর্ব্বপ্রকার হীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাও বাহাদুরের সমালোচনায় হিন্দুপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে।

to the Mohomedan conquest." নামক গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব স্বীয় ইতিহাসরচনার জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৃতীয় পরিশিষ্টে তাহার নির্দ্দেশ ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিশিষ্টে "মহারাষ্ট্র দেশে আর্য্যগণের উপনিবেশস্থাপনের কাল" নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে (৬)। পঞ্চম পরিশিষ্টে "মারাঠা জাতির উৎপত্তি" আলোচিত হইয়াছে। শেষ বা ষষ্ঠ পরিশিষ্টে লেখক মহাশয় দিল্লীর সম্রাট শেষ শাহ আলমের রচিত একটি কবিতার মহারাষ্ট্রীয় পদ্যানুবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই সংস্করণে মহাত্মা শিবাজী, তাঁহার ভবানী নামক তরবারি ও বাঘ-নখ, সাতারার কেল্লা ও রায়গড় দুর্গের উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং অল্পের মধ্যে যে বইখানি বেশ ভাল হইয়াছে, তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারা যায়।

মারাঠা (মহারাষ্ট্রীয়) জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক গ্রাণ্ট ডফ্ প্রণীত ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে ডফ্ সাহেবের ইতিহাসকে masterly work

ডফ্ কোন্ শ্রেণীর ঐতিহাসিক ?

অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লেখকের বিবেচনায় উহা প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস ত নহেই, উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবারও সম্পূর্ণ যোগ্য কি না সন্দেহ। কারণ, তিনি বলেন, "ডফ্ সাহেবের গ্রন্থ যে গভীর গবেষণাপূর্ণ ও আশানুরূপ হইয়াছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। সাহেব মহোদয় যেরূপ প্রচুর উপকরণ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (৭) তাঁহার গ্রন্থ তদনুরূপ হয় নাই। যাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রচিত 'শিবাজীর বখর,' 'পুণার বখর,' 'পেশওয়েগণের বখর,' 'খারড়ার যুদ্ধের বখর' ও পাণিপতের যুদ্ধ সম্বন্ধে পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওকে মহ্লাররাও হোলকার-প্রেরিত চিঠিপত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়ে, স্বদেশপ্রেম ও ধর্ম্মানুরাগজনিত যে একপ্রকার মনঃপ্রাণমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে, সাহেব মহোদয়ের গ্রন্থে তাহা হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থে সকল বিষয় যথোপযুক্তরূপে আলোচিতও

---

(৬) ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতানুসরণ করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির সময় মহারাষ্ট্র দেশ অনার্য্যনিবাস ছিল; খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর পর এই দেশে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এ মত আমাদের সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রথম বর্ষের সাধনার ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(৭) গ্রাণ্ট ডফ্ বলেন, "(I had) access to the mass of papers, found in the apartments of the Peishwa's palaces. The records of Satara Govt. were under my own immediate charge. Besides 'these' important papers, records of temples and private repositaries were searched at my request; family legends, imperial and royal deeds, public and private correspondence and state papers in possession of the descendants of men once high in authority; law suits and law decisions and Mss. of every description in Persian and Mahratta, which had any reference to my subject, were procured from all quarters, cost what they might. Upwards of one hundred of these Mss., some of them histories at as voluminous as my whole work, were purposely translated for it."—preface pp. VI, VII (Duff's History).

হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কোনও হিন্দুর পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ডাঃ মিচেল এক স্থলে বলিয়াছেন, "The literature of the Maratha people may fairly be denominated a living literature."—(I. R. H. S. Bombay) দুঃখের বিষয়, গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যে দেশে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন, সপ্তশতীকার কবিবৎসল সুকবি শালিবাহন, দ্বিতীয়ব্যাসসদৃশ 'বৃহৎকথা'-প্রণেতা গুণাঢ্য, প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকার বররুচি, মহাকবি ভবভূতি, মহারাষ্ট্রচূড়ামণি রাজশেখর, 'কোবিদগর্ব্বপর্ব্বতপবি' মুগ্ধবোধ ব্যাকরণাদি বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা বোপদেব, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য 'মিতাক্ষরা'-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর, জ্যোতির্ব্বেত্তা ভাস্করাচার্য্য ও তদীয় বংশধরগণ, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-প্রণেতা মন্ত্রিচূড়ামণি 'হরিভক্তিপরায়ণ' হেমাদ্রি, আদি মহারাষ্ট্রকবি বিবেকসিন্ধু-নামক অদ্বৈতবাদপ্রতিপাদক গ্রন্থের প্রণেতা ব্রহ্মজ্ঞানী মুকুন্দরাজ, (১১৯১ খৃঃ) মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থচিন্তামণি-প্রণেতা 'সর্ব্বজ্ঞভূপ' সোমেশ্বর (১১৩৮ খৃঃ) ধারাধিপতি ভোজ, অপরার্ক, সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র কবি, ভগবদ্গীতার টীকাকার জ্ঞানেশ্বর (১২৯০), 'ভাবার্থরামায়ণ'-প্রণেতা একনাথ স্বামী (১৫৬০ খৃঃ), ভক্ত কবি তুকারাম, শিবজীর দীক্ষাগুরু সমর্থ রামদাস স্বামী, শ্রীধর, বামন পণ্ডিত, মুক্তেশ্বর, মহীপতি, ও কবিশ্রেষ্ঠ ময়ূরপন্থ প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবি, পণ্ডিত ও ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ এবং মহারাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া দেশের গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছেন; সে দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রাণ্টডফ্ সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। এ বিষয়ে অন্ততঃ সামান্য উল্লেখ না থাকিলে কোনও 'মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস' সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।" রাও বাহাদুর কীর্ত্তনে অতি সংক্ষেপে ২১৪ জন মাত্র কবি ও পণ্ডিতের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সে বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত যে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া কোনও ফল নাই। সময়ান্তরে আমরা এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিব। যাহা হউক, লেখক তার পর বলিতেছেন,—

দ্বিতীয় দোষ।

মহারাষ্ট্র কবি ও গ্রন্থকারগণ।

"আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে গিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং কোন্ সময়ে ও কিরূপে মহারাষ্ট্র দেশ তাঁহাদের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ রাজবংশ এই দেশে রাজত্ব করেন, এবং তত্তৎবংশীয়গণের মধ্যেই বা এখন কে কে অবশিষ্ট আছেন, ইত্যাদি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। এমন কি, অধুনাতন কালের সুপ্রসিদ্ধ 'ভোঁস্‌লে,' 'পওয়ার' (Puar বা প্রমার), 'মহাড়ীক্,' ও 'শির্কে' (সাল্কে বা চালুক্য) প্রভৃতি পঞ্চকুল, ছত্রিশকুল, ও ছিয়ানব্বই কুলের মারাঠাগণ কে? ইহাঁরা কোথা হইতে আসিলেন? ইহাঁদের মধ্যে কোন্ কোন্ বংশ বা পরিবার পূর্ব্বদেশের রাজবংশ হইতে আগমন করিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছেন, ইত্যাদি অনায়স-লভ্য ও অত্যাবশ্যক বিবরণও তাঁহার গ্রন্থে সম্যক্ প্রদত্ত হয় নাই। আমাদের গ্রন্থকার ডফ সাহেব (Satara) সাতারার ছত্রপতির দরবারে এজেণ্ট ছিলেন। সাতারার বংশমর্য্যাদাভিমানী নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই এ সকল বিষয়ের বহুল আন্দোলন ও আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কথার বিচার করিলে, এ বিষয়ে সাহেব মহোদয়ের মৌনাবলম্বন অতিশয় বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। সাহেব মহোদয় যদি ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে, আমাদের বিস্ময়ের কিছুমাত্র কারণ

অপরাপর দোষ।

থাকিত না। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস যে, 'বিরাট্ পুরুষের বাহু ও পদযুগল হইতে ইতর জাতি ও তাঁহার বদন হইতে স্বজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ স্বজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে পারেন না। কিন্তু রাজপুত ও মারাঠাগণ এ বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় উদাসীন নহেন। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে বর্ত্তমান সময়ের অল্পবয়স্ক অমুক রাও বা অমুক সিংহ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক পুরুষের নামাবলীবিশিষ্ট সুদীর্ঘ বংশতালিকাভিমানী ও এই সকল সুদীর্ঘ বংশতালিকার রচয়িতা ভাটগণের ভক্ত ও প্রতিপালক শত শত "ক্ষত্রিয়কর্ম্মাবলম্বী" পরিবার এখনও এ দেশে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইহাঁদের প্রদত্ত বংশতালিকাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান পূর্ব্বক (মহাত্মা কর্ণেল্ টড্ ও উইল্‌ফোর্ড সাহেবের ন্যায়) তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করা ডফ্ সাহেবের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইত বলিয়া বোধ হয় না।

"এতদ্‌ভিন্ন এই গ্রন্থে যে সকল মহাপুরুষ বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা একেই অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার উপর আবার অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ। কারণ, যে সকল ঘটনাবলীর উপর তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সাহেব মহোদয়ের গ্রন্থে অনেক স্থলেই তৎসমস্ত এককালেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। (৮) এই সকল ত্রুটি নিবন্ধন, গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থের History of the Marathas নামের পরিবর্ত্তে Account of the war in Maharastra এইরূপ নামকরণ করিলে অধিকতর সমীচীন হইত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

চরিত্রের অসম্পূর্ণতা।

"ডফ্-প্রণীত ইতিহাসের এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছি বলিয়া যে আমরা তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনওরূপ অসম্মান বা অনাদরের ভাব হৃদয়ে পোষণ করি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এই গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহাকে যে সকল অলঙ্ঘ্যনীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আমাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণের ইতিহাসসঙ্কলনবিষয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই প্রথম উদ্যমে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা এক রকম ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইবার পর প্রায় ৬৫ বৎসর অতীত হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত অপর কেহ এই বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। বলা বাহুল্য, ইহা সাহেব মহোদয়ের বিদ্যাবত্তা ও পরিশ্রমের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এই গ্রন্থের জন্য তাঁহাকে অসুস্থশরীরেও যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য মহারাষ্ট্রদেশ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।"

ডফের স্বপক্ষে।

ইহার পর লেখক মহাশয় গ্রাণ্ট ডফের এতৎসম্পর্কীয় একখানি পত্র Bombay Saturday Review হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে ভারতের সর্ব্বত্র 'এজেণ্ট' নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থের রচনাকালে আমাকে প্রত্যহ অনবরত ১২।১৪ ঘণ্টা অপরাপর শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইত। এই সময় আমি অতি যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছিলাম। অবশেষে এই পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পালাজ্বরের ন্যায় প্রতি পঞ্চম দিবসে

---

(৮) মহাত্মা শিবাজীর জীবনের এইরূপ দুই তিনটি ঘটনা আমরা বিগত ৪র্থ বর্ষের

আমাকে আক্রমণ করিত, এবং ছয় ঘণ্টা হইতে (সময়ে সময়ে) ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহার অবসান হইত না। এই সময়েও আমি মাথায় জলপটী বাঁধিয়া কাজ করিতাম। এই কারণে এই গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ কিঞ্চিৎ অযত্নসহকারে লিখিত হইয়াছে। পীড়ার কিঞ্চিৎ অবসান হইলে আমি সময়ে সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কাজ করিতাম। এইরূপ অত্যাচারের জন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়ায় আমি স্বদেশে (ইংলণ্ডে) পলায়ন করিতে বাধ্য হইলাম। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ লিখিত ও প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে পর, মিঃ মরে (Murray) বলিলেন,—'এই পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি।' আমি বলিলাম, 'ইহাতে মরাঠা জাতির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা History of the Marathas নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য।' তিনি বলিলেন, 'মরাঠাগণের বিষয় কে জানে?' আমি বলিলাম, 'সেই জন্যই ত এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।' তিনি বলিলেন, 'কিন্তু তাহাদের বিষয় জানিতেই বা কাহার ইচ্ছা আছে? এই গ্রন্থের নাম যদি 'মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ইংরাজগণের অভ্যুদয়' অথবা এই রকম একটা কিছু রাখা যায় তাহা হইলে চলিতে পারে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণের ইতিহাস!—উহা কখনই কেহ কিনিবে না।' আমি যদিও মিঃ মরের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলাম, তথাপি সে জন্য কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হই নাই। পরিশেষে স্যার্ জেম্‌স্ ম্যাকিণ্টসের চেষ্টায় Longman and Co. ইহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পরে কোন্ দেশে কত পুস্তক বিক্রীত হইতে পারে, তাহার অনুমানকরণকালে উক্ত কোম্পানী ভারতবর্ষের জন্য অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক রাখিলেন দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, 'ভারতের লোকে বই পড়ে—কিন্তু পয়সা খরচ করিয়া কিনিতে চায় না; তাহারা অপরের নিকট হইতে চাহিয়া পড়ে।' যাহা হউক, প্রকাশকগণ লাভ লোক্‌সানের দায়ী হইয়া স্বীয় ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিলেন। এই ইতিহাস সংকলন করিতে আমার বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। কোর্ট-অব্-ডাইরেক্‌টার্‌স্‌গণ এই পুস্তকের ৪০ কাপি মাত্র গ্রহণ করিলেন। অন্য পুস্তক হইলেও তাঁহারা ৪০ কাপিই গ্রহণ করিতেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মৎপ্রণীত 'মহারাষ্ট্র ইতিহাস' একবার খুলিয়াও দেখেন নাই। যদিও আমি গবর্মেণ্টের জন্য এই সকল বহুমূল্য উপকরণ (ঐতিহাসিক কাগজপত্র) সংগ্রহ করিলাম এবং আমার বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট মানচিত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিলাম, কিন্তু তাঁহারা ইহার (মানচিত্রের) প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন না। তাঁহারা কখনই আমায় জিজ্ঞাসা করেন নাই, এবং আমিও কখনও তাঁহাদিগকে বলি নাই যে, এই সকল কার্য্যে আমার সপ্তদশ সহস্রাধিক মুদ্রা নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহারের জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি।" (৯)

ডফের পত্র।

মরে ও ডফ্।

ডফের প্রতি অবিচার।

"গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের এই পত্র পাঠ করিয়া আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উদিত হয়। সাহেব মহোদয় এত অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার ইতিহাসের জন্য ভারতের নানা স্থান হইতে যে

---

(৯) ডফ্ সাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিত এই পত্র, তদীয় ইতিহাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় সমস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পত্রে সাহেব মহোদয়ের কষ্ট পরিশ্রম সহিষ্ণুতা ও অদম্য উৎসাহের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবাসিগণ আর কতদিন

সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায়? তাঁহার গ্রন্থের পাদটীকাগুলি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎসংগৃহীত উপকরণের মধ্যে কতকগুলি তিনি Bombay Literary Societyতে রাখিয়াছেন। সনন্দপত্রাদি যাঁহাদের নিকট হইতে আনীত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে অবশ্যই সে গুলি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, অনুমান করা যাইতে পারে। পেশওয়ার প্রাসাদে যে সকল বহুমূল্য কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল, সে গুলি কোথায়, তাহা গবর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত অবগত হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বখর গ্রাণ্ট ডফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সে গুলি কি হইল? আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কারকুনের বিশ্বাস যে, সে গুলি দগ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। আমাদের সুবিজ্ঞ বন্ধু স্বর্গীয় দাজী সাহেব সরঞ্জামে (ইনাম-কমিটির এক জন কর্ম্মচারী) বলেন যে, তিনি ডফ সাহেবের ও দক্ষিণের কমিশনারের এতৎসংক্রান্ত যে কয়েকখানি চিঠিপত্র দেখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, ডফ্ সাহেবের ইতিহাস রচিত হইলে পর, তৎসংগৃহীত ঐতিহাসিক কাগজপত্রগুলির অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এরূপ হইতে পারে যে, যে সকল কাগজপত্রে বা বখরে বিশ্বাসযোগ্য কোনও কথা পাওয়া যায় নাই, (১০) হয় ত সেই গুলিই নষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ কাগজপত্রও নষ্ট করা উচিত নহে।"

উপকরণ সযত্নে রক্ষিত।

অবশিষ্ট গুলির পরিণাম।

তৎপরে লেখক মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয়ের বিবরণ প্রদান করিয়া বলেন,—

"মহাত্মা শিবাজীর পিতা শাহাজীর বিবরণ গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থে সমুচিত প্রদত্ত হয় নাই। * * শিবাজীর জীবনী তাঁহার ইতিহাসে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। শিবাজীর চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। আমাদের বিবেচনায়, এ বিষয়ে ডফ্ সাহেবের একটি এই ত্রুটি হইয়াছে যে, শিবাজীর জীবনী সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের লিখিত বিবরণের উপর তাঁহার যতটা নির্ভর করা উচিত ছিল, তিনি ততটা করেন নাই। এমন কি, মহারাষ্ট্রীয়গণের লিখিত ইতিহাসের প্রতি যতটা মনোযোগ প্রদান করা উচিত ছিল, তিনি ততটাও করেন নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, তদীয় গ্রন্থে তিনি মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের কথার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক স্থলে শিবাজীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন; এবং তৎসম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণের কথা বড় গ্রাহ্য করেন নাই, দেখা যায়। আফজুল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের বর্ণনানুসারে তিনি শিবাজীর প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু তৎসম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণ যাহা বলেন, তাহার বিচার করা তাঁহার উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, গ্রাণ্ট ডফ্ তাহা করেন নাই।

ডফের অবিচার।

"মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণ স্বদেশীয় নৃপতি অথবা বীরপুরুষগণের ইতিহাসলিখনকালে কখনই পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করেন না। সেরূপ করা তাঁহাদের অভ্যাসই নয়। এই নিমিত্ত তাঁহাদের রচিত বখরে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিবার উদাহরণ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এই সকল বখরে শিবাজীর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, শিবাজী

মহারাষ্ট্রীয় লেখকের স্বভাব।

(১০) গ্রাণ্ট ডফ্ বলেন,—"The mass of meterials which were selected from a still larger mass read over without discovering a single fact on which we can depend"—Preface XV (Fourth edition.)

হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত প্রকৃত ও অতিশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। মারাঠাগণ এখনও তাঁহাকে অতিশয় প্রীতি ও ভক্তির সহিত 'ঈশ্বরাবতার' জ্ঞানে পূজা করে। তিনি প্রকৃতই সেইরূপ উদারচরিত ও ধার্ম্মিক না হইলে, কখনই সাধারণের এইরূপ প্রীতি ও স্তুতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না।"

তৎচিত্রিত শিবাজী।

রাও বাহাদুর কীর্ত্তনে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণের স্বভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদের সকল পাঠক হয় ত সম্মত হইবেন না। এই নিমিত্ত আমরা এতৎসম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিকের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মারাঠাগণের ইতিহাসলেখকগণ (কেহ কেহ বোধ হয় তাঁহাদিগকে 'ঐতিহাসিক' সংজ্ঞা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন) অতি সরল ও আড়ম্বরশূন্য ভাষায় তাঁহাদের ইতিহাস লিখিয়াছেন। শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ভাষা বা উদ্দাম কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, তাঁহারা বর্ণনীয় বিষয়গুলি যথোপযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কুত্রাপি প্রতিকূল ঘটনার অনুকূল ভাবে বর্ণনা করিবার (মল্হার রাও হোলকার পেশওয়াকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত) চেষ্টা করা হয় নাই। জয় পরাজয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পরাজয়ের বিবরণ যেমন সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, বিজয়ের বিবরণও সেইরূপ প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাসমূহের বর্ণনা দ্বারা অতিবিস্তৃত করা হয় নাই। তাঁহারা পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে বা মিথ্যা কথা দ্বারা পাঠককে মতিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কালনির্ণয়সম্বন্ধে এবং ঐতিহাসিকোচিত মন্তব্যপ্রকাশে তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।" (১১)—স্কট্ ওয়েরিং সাহেব প্রণীত "মহারাষ্ট্র-ইতিহাস" (ভূমিকা) ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ওয়েরিং-এর মত।

রাও বাহাদুর কীর্ত্তনের গ্রন্থ হইতে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের সম্বন্ধে আরও কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে উক্তি এই,—

"উৎকৃষ্ট ইতিহাসের লক্ষণ সম্বন্ধে এখনও অনেক মতভেদ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি মত এই যে, কোনও ঘটনা সম্বন্ধে ইতিহাসলেখকের স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহা ঘটিয়াছে, সরল ভাবে তাহার অবিকল বর্ণনা করিয়াই নীরব থাকা উচিত। যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা আমাদের বখরগুলি পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। সৈন্যগণ গমনকালে কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিল? সেখানে বসিবার আসনগুলি কে পাতিয়াছিল? কে তাম্বুলাদি বিতরণ করিয়াছিল? তাহাদিগের নাম পর্য্যন্ত (অধিকাংশ) বখরে লিখিত থাকে। (বলা বাহুল্য, এই সকল বখর ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দ্বারা লিখিত।) কিন্তু এই সকল

মহারাষ্ট্রীয় বখরের স্বরূপ-বর্ণন।

(১১) Their historians (some will deny them the name) write in plain simple and unaffected style, content to relate passing events in apposite terms, without seeking turgid imagery or inflated phraseology. [Excepting to the letter addressed to the Peshwa, by the great Malhar Rao Holkar,] no attempt is made to make the worse appear the better reason. Victory and defeat are briefly related ; if they pass over the latter too hastily, they do not dwell upon the former with unnecessary minuteness. They do not endeavour to bias or mislead the judgment, but are certainly greatly deficient in Chronology and in historical reflections."—E. Scott Waring's "History of the Marathas," (1810) Preface. pp. 10.

বখরলেখকগণ যে গ্রন্থ রচনাকালে বিশেষ চিন্তা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়গুলি মনে মনে গুছাইয়া লইয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাহা ঘটিয়াছে, কথায় কথায় তাহাই সরল ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের গ্রন্থে কোনরূপ রচনাচাতুর্য্য বা চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায় না। এই সকল গ্রন্থের ভাষা অতি সরল—শব্দযোজনার পারিপাট্যশূন্য। বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত—স্থানে স্থানে এত সংক্ষিপ্ত যে, প্রায় পূর্ব্বাপরসম্বন্ধবিহীন বলিয়া মনে হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে অতিদীর্ঘ বাক্যাবলীও দৃষ্ট হয় ;—দীর্ঘ বাক্যগুলি অনেক স্থলেই ব্যাকরণদুষ্ট। স্থানে স্থানে অযত্ন-প্রযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্যে অর্থবোধ করাও কিয়ৎপরিমাণে দুর্ঘট হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই যে, এই সকল গ্রন্থ সামান্যবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন কারকুন (কেরাণী) শ্রেণীর লেখকগণের দ্বারা লিখিত। এই সরলস্বভাব লেখকগণের রচিত গ্রন্থে ফারসি ভাষার বাহুল্য ও মুসলমানগণের অনুকরণে স্বজাতিকে 'গনীম্' (শত্রু) নামে অভিহিত হইতেও দেখা যায়। আমাদের বখরকারগণের ব্যাকরণদুষ্ট দীর্ঘ বাক্যাবলীরচনার পদ্ধতিও মুসলমানগণের অনুকরণের ফল। কারণ, তাঁহাদের রচনায় এরূপ দোষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"অধিকাংশ বখরের প্রারম্ভ সংস্কৃত পুরাণাদির ভূমিকার অনুকরণে লিখিত, অর্থাৎ মুনিগণের প্রশ্নানুসারে সৌতির পুরাণকথাবর্ণনের অনুকরণে, এই সকল বখরের প্রারম্ভে 'অমুক অমুককে অমুক ঘটনা বিবৃত করিতে আদেশ করায় তিনি বলিতে লাগিলেন যে,—' এইরূপ মর্ম্মের প্রস্তাবনা দেখা যায়। আবার কোনও কোনও বখরে প্রশ্নকর্ত্তা বা লেখকের কোনও উল্লেখ না করিয়া, পত্রলিখনপদ্ধতির অনুকরণে কেবলমাত্র 'নিবেদন এই যে,—' এইরূপ লিখিত থাকে। 'তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল,' লিখিতে হইলে, এই বখরকারগণ প্রথমতঃ 'বিতপসীল' এই কথাটি লিখিয়া, জমা খরচ লিখিবার পদ্ধতির অনুকরণে সেই পাঁচ জনের নাম লিখিয়া, শেষে নীচে একটি রেখা টানিয়া 'একুনে ৫ পাঁচ পুত্র' এইরূপ লিখিয়া থাকেন। কোনও কোনও বখর সাতারার রাজপরিবারের আদেশক্রমে তাঁহাদের কারকুণগণ কর্ত্তৃক প্রাচীন ঐতিহাসিক (সরকারী) কাগজপত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল বখরের প্রমাণিকতা খুব বেশী। কোনও কোনও বখর মুসলমানগণের লিখিত 'তওয়ারিখ' (ইতিহাস) অবলম্বনেও রচিত হইয়াছে, দেখা যায়। এই সকল বখরের উপর সহজে নির্ভর করা যায় না। সে যাহা হউক, পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সকল বখর স্থানে স্থানে বিরাম চিহ্নাদি প্রদান করিয়া মুদ্রিত করিতে পারিলে, দেশের অনেক উপকার হইবে।"

এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার প্রায় ২০ বৎসর পরে, এই সকল বখর প্রকাশের জন্য "কাব্যেতিহাস সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়।

সময়ান্তরে, রাও বাহাদুর কীর্ত্তনের মহারাষ্ট্র-ইতিহাস সম্বন্ধে অবশিষ্ট বক্তব্য পাঠকগণের গোচর করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীসখারাম গণেশদেউস্কর।

নালাপাণি।

"নালাপাণি" নামটি শুনিলে সহজেই ইহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। "নালা" অর্থ পয়ঃপ্রণালী আর "পাণি" অর্থ জল, এই দুইটি শব্দ একত্র করিয়া অর্থ-

যায় না, তাহা বোধ করি অধ্যাত্মবাদীগণও অসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন। বাস্তবিকও নালাপাণির অন্য কোনও অর্থ নাই।

হিমালয় পর্ব্বতের একটি নিম্ন পাহাড় হইতে এই নির্ঝরটি বাহির হইয়াছে। এই ঝরণার জল এমন পরিষ্কার ও সুস্বাদু যে, তাহার সহিত কলিকাতার কলের জলেরও তুলনা হইতে পারে না; এতদ্ভিন্ন এ জলের এমন একটি গুণ আছে, যে জন্য দরিদ্র লোক বিশেষ কৃতজ্ঞ না হইলেও, অলস ধনী ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত জীবন্মৃত ব্যক্তিগণ স্বর্গের সুধার সহিত এই জলের তুলনা না করিয়া থাকিতে পারে না। এ জল অসম্ভব ক্ষুধা বৃদ্ধি করে; যে দিনান্তে একবারও উদর পরিতৃপ্ত করিবার সম্বল সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হওয়া কষ্টকর, বরং ক্ষুধা হ্রাস করিবার কোনও উপায় থাকিলে তাহার উপকার হয়। কিন্তু যে সকল ধনীসন্তান পিতৃপিতামহের উপার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া দিবারাত্রি বিলাসসাগরে ডুবিয়া আছেন, এবং প্রতিদিন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মুখে নিজ কথার পুনরুক্তি শুনিতে শুনিতে তাকিয়ার উপর ভর দিয়া অলস মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করেন এবং দিবাবসানে স্ফীতোদরের সুবিস্তীর্ণ পরিধিতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলেন "আজ ক্ষিদেটা বড় মন্দা হে"—নালাপাণির জল তাঁহাদের সেই ক্ষুধাহীনতা রোগের মহৌষধ; ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন নাই, এক এক গণ্ডূষ তুলিয়া খাইলেই হইল, উদরাগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা কার্য্যকর হয় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত খাদ্য জীর্ণ হইয়া যায়; অম্ল রোগেরও এই জল অব্যর্থ ঔষধ।

যে স্থান হইতে এই ঝরণা বাহির হইয়াছে, সেই পাহাড়ের নামও নালাপাণি, এবং গ্রামের নামও নালাপাণি হইয়াছে। গ্রাম বলিলে পাহাড়ে গ্রামের যাহা অর্থ তাহাই বুঝিতে হইবে, সেই আট দশ বিঘা জমীর উপর দশ পনের ঘর অধিবাসী; নালাপাণির অধিবাসী সংখ্যা খুব বেশী হইলেও পঁচিশ ঘরের অধিক হইবে না; ইহাদের অধিকাংশই নেপালী গুরখা।

এই নালাপাণিতে দুই খানি দোকান আছে; এক খানিতে আটা, ডাইল, লবণ, ঘৃত, লঙ্কা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়, আর একখানিতে সদাশয় ইংরাজ গবর্মেণ্টের সযত্নরক্ষিত, গৌরববাহিনী, বিপুল-অর্থ-প্রদায়িনী সুরা বিক্রয় হয়। পর্ব্বতের মধ্যে ২৫।৩০ ঘর গৃহস্থের জন্য পুণ্যসলিলা নালা-

য়াছে, তাহারই গাত্রসংলগ্ন মদ্যালয়। যে দিন এই সুন্দর স্থানে, এমন পরিষ্কার, সুস্বাদু, সুপেয় নির্ম্মল জলের উৎস-সন্নিকটে এই মদের দোকান দেখিয়াছিলাম, সেই দিন পানদোষনিবারণের জন্য উৎসর্গীকৃতজীবন, লোলচর্ম্ম, পক্ককেশ, ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ ইভান্স সাহেবের সৌম্য মূর্ত্তি আমার নয়নসমক্ষে উদিত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে তাঁহার জলদগম্ভীর কথাগুলির প্রতিধ্বনি যেন শুনিতে লাগিলাম। বহুদূরবর্ত্তী, হিমাচলক্রোড়স্থিত দেরাদূনের মিশন স্কুলের প্রকাণ্ড হল কম্পিত করিয়া বৃদ্ধ পরম-উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে যে হৃদয়স্পর্শী কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, এতদিন পরে আজও যেন তাহা কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে ; বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "দারু মৎ পিয়ো, খোদা গঙ্গাজীমে দারু নেহি ঢাল দিয়া, ইয়ে বহুৎ মিঠা পানি ঢাল দিয়া, গঙ্গাজীকো পানি ছোড়কে কাহে দারু পিতে হো!"—হায়, পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের এ কথা বুঝাইতে গিয়াছ, তাহারা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত বর্ব্বর, নতুবা তোমার এই মধুর উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না কেন? এখনো ত দ্বিগুণ উৎসাহে মদ্য বিক্রয় হইতেছে। মানুষ যখন দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়, তখন বুঝি দেবতাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। পশুত্বের নিকট দেবশক্তিও ব্যর্থ?

দেরাদূন হইতে এক মাইল উত্তরপূর্ব্বে লালাপাণির পাহাড়। দেরাদূনের মধ্য দিয়া দুইটি "নহর" (পয়ঃপ্রণালী) বহিয়া যাইতেছে। মসুরী পাহাড়ের পাদদেশে রাজপুর নামে একটি স্থান আছে, রাজপুরের একটা প্রকাণ্ড ঝরণাকে বাঁধিয়া রাজপুর হইতে দেরাদূনের রাস্তার পাশ দিয়া একেবারে নগরের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। নগরের বাহির হইতেই তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ কর্ণপুর নামক স্থান দিয়া ও অন্য ভাগ বাজারের পাশ দিয়া, প্রবাহিত করা হইয়াছে। এই দুইটি নহরের জলেই সহরের সমস্ত কাজ চলে, এতদ্ভিন্ন এই নহরের সঙ্গে প্রত্যেক বাড়ীর যোগ আছে, কিছু পয়সা খরচ করিলে আধ ঘণ্টা হউক বা এক ঘণ্টা হউক, যে যতখানি দরকার মনে করে, বাগানের কি অন্য কোনও ব্যবহারের জন্য ততখানি জল পাইতে পারে। এই জল যথারীতি যোগাইবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, এবং তাহাদের আফিসও আছে। পূর্ব্বে এই নহরের জলই লোকে পান করিত, কিন্তু এ জলের একটি মহৎ দোষ আছে। এই জল পান করিলে লোকের গলা ফুলিয়া যায়, এই জন্য যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা লোক জনের দ্বারা দূরস্থ অন্য

আবিষ্কৃত হইলে, কিছু দিন পর্য্যন্ত লোক নগরের মধ্যে আনাইয়া লইত, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য হওয়াতে সকলে আনাইতে পারিত না; পরে মিউনিসিপালিটী মাটীর নীচে পাইপ বসাইয়া এই জল নগরের মধ্যে আনিয়াছেন, এবং দেরাদূনের প্রশস্ত Parade groundর দুই প্রান্তে দুইটি ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাদের গায়ে নল বসাইয়াছেন। সকলে সেই নলের মুখ হইতে বিনা পয়সায় নালাপাণির জল লইয়া যায়; নালাপাণির জল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই।

কিন্তু এই জল ভিন্ন আরও কতকগুলি কারণে নালাপাণি প্রসিদ্ধ। নালাপাণিতে এক জন সন্ন্যাসীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে; এই সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসীর দল হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নপ্রকৃতি, ইনি আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী। আর্য্য ধর্ম্মের অর্থ—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারিত ধর্ম্ম; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অনেক শিক্ষিত লোক এই ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী বা সাধু শ্রেণীর মধ্যে যে এ ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছে, আমার এরূপ জ্ঞান ছিল না। বিশেষতঃ, নানা কারণে সন্ন্যাসীদিগের উদার মত একটু বিস্ময়-উৎপাদক, তাই এই সন্ন্যাসীবরকে আমার বহুদিন হইতে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এত দিন সে আশা পূর্ণ হয় নাই। শুনিয়াছি, ইনি খুব পণ্ডিত এবং দর্শনশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী; ইনি মধ্যে মধ্যে দেরাদূন আর্য্যসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত হন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাপি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হই নাই; কারণ, তিনি কোন্ দিন আসিবেন, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয় থাকিত না।

সুতরাং সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বিশেষ প্রবল হওয়াতে, এক দিন অপরাহ্নে আমি আমার জনৈক দীর্ঘকালপ্রবাসী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া নালাপাণি-দর্শনে যাত্রা করিলাম। নালাপাণির পথে একটু অগ্রসর হইতেই একটি শুষ্ক নদী পার হইতে হইল;—এই নদীর নাম নাম রিচপানা, এই নদীর ধারে চুন প্রস্তুতের আড্ডা; এই নদীর মধ্যে এবং আশে পাশে অনেক "চূনাপাথর" পাওয়া যায়, শীতের সময় সেই সকল পাথর কুড়াইয়া একত্র করে, তাহার পর বড় বড় গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে স্তরে স্তরে কাঠ ও ঐ পাথর সাজাইয়া রাখে, শেষে তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেয়; সমস্ত পুড়িয়া গেলে, গর্ত্ত হইতে সেগুলি তুলিলে দেখা যায়, পাথরগুলি অতি সুন্দর পরিষ্কার চূণে পরি-

ক্ষেত্র। এই শ্মশানভূমির পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এ ক্ষেত্রে আমি অনেকবার আসিয়াছি ; কত দিন সন্ধ্যার সময় ইহার নীরব গম্ভীর ভাব দেখিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কত কথা চিন্তা করিয়াছি, তুই একবার আমার আত্মীয় বন্ধুগণের স্নেহ ও প্রীতির অবলম্বন স্ত্রী ও পুত্র কন্যার অন্তিমকার্য্য শেষ করিতে আসিয়া, ইহকাল ও পরকালের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শোকসন্তপ্ত মনে অশ্রু মুছিয়াছি। নিকটেই আমার একজন পরম আত্মীয়ের প্রিয়তমার সমাধিমন্দির, এই ক্ষুদ্র সমাধিপার্শ্বে বসিয়া কত দিন তাঁহার স্বভাবের পবিত্রতা, তাঁহার আশ্চর্য্য সরলতা, এবং রমণীহৃদয়ের মধুরতার কথা চিন্তা করিয়া, তাঁহার অভাবে হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি ; বহুদূরবর্ত্তী এই বিদেশে, প্রবাসের গভীর অভাবের মধ্যে কতদিন তাঁহার আদর ও যত্নে মাতার করুণা ও ভগিনীর স্নেহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল! আজ তাঁহার ক্ষুদ্র বালকবালিকাগুলি নিরাশ্রয়, তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর হৃদয় শোকাকুলিত ; এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ভারের কথা ভাবিয়া আমার অসীম দুঃখও ভুলিয়া যাই। যে দিন 'নালাপানি' দেখিতে যাই, তাহার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে আমার এক জন আত্মীয়াকে এই সমাধির নিকটেই দগ্ধ করিয়া গিয়াছি, চিতার অঙ্গার তখন পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে দেখিলাম, তাহাতেই তাঁহার ইহজীবনের স্মৃতি বিজড়িত ছিল, সংসারে আর কেহ নাই যে, তাঁহার জন্য এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করে। একবার চিতার নিকট নিঃশব্দে দাঁড়াইলাম, পরলোকগত আত্মার জন্য আর একবার, বুঝি শেষ বার, ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিলাম, তাহার পর পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এই স্থান হইতেই পাহাড়ে উঠিতে হয়। পাহাড় খুব উচ্চ নহে ; অল্প দূর উঠিয়াই সেই মুদীখানা দোকান, আর উদারপ্রকৃতি খৃষ্টান ইংরাজরাজের সমুন্নত মহিমা-ধ্বজা সেই শৌণ্ডিকালয়। সকল জিনিষ ক্রয়বিক্রয়েরই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু "কোম্পানী বাহাদুরের অনুমতিক্রমে খুচরা আফিং গাঁজা মদ প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছি" এই সাইনবোর্ড-যুক্ত ছোট দোকানে খরিদদারের সময় অসময় নাই। নিতান্ত যখন দেখিবে খরিদদার নাই, তখনও অন্ততঃ দুই চারিজন উমেদার শিক্ষানবিশী করিতেছে, দেখিতে পাইবে। আজ রবিবার অপরাহ্ন, গুরখা পল্টনের শিপাহীগণ আজ বিশ্রাম পাইয়াছে, তাই আজ এ দোকান খুব সরগরম দেখা গেল। যখন আমরা সেই দোকানের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সেখানে খুব হাসি তামাসা চলিতেছিল, বলা

বাহুল্য, সুরাদেবীরও উপাসনা চলিতেছিল; তবে তাহা দেখিবার ইচ্ছা ছিল না, প্রবৃত্তিও হয় নাই। পাশেই নালাপাণি—আমরা সেই নালাপাণির জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করিতে লাগিলাম। হতভাগ্যেরা যখন হৃদয়ের শোণিত এবং প্রাণের বিনিময়ে উপার্জ্জিত অর্থে গরল পান করিতেছিল, তখন আমরা ভগবানের করুণাধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছিলাম। এমন স্বচ্ছ সুস্বাদু জলধারা—বিধাতার করুণাধারা ভিন্ন তাহাকে আর কিছু বলিয়াই তৃপ্তি হয় না। স্থানের সৌন্দর্য্য, তাহার উপর এমন মধুর গম্ভীর সন্ধ্যাকাল; চতুর্দ্দিকে শ্যামল লতাপল্লব, তাহার মধ্যে এই নির্ঝরিণীর আনন্দোচ্ছ্বাস; সঙ্গী বন্ধুর প্রাণ ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল, তিনি আমাকে সেখানে বসিয়াই একটি গান গাহিতে বলিলেন। কি গান গাহিব, এমন স্থানে আসিয়া আর কোন গান মনে আসে? প্রাণের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়, আমাদের হৃদয়ের গভীর আনন্দ ব্যক্ত করিবার উপযোগী সঙ্গীত সহজেই মনে পড়িল, দুই বন্ধুতে সেই নির্ঝরের পাশে দীর্ঘবাহু শালবৃক্ষের মূলদেশে উপবেশন করিয়া মুক্ত প্রাণে গাহিতে লাগিলাম :—

"তাঁহারি আনন্দ ধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা কয়ে।
যে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃতধারা পুরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্যে কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরসপানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে
দহে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে রয়ে।"

গানের শেষে মনে হইল, এই নির্ঝরপার্শ্বে, শৈল-অন্তরালবর্ত্তী এই তরুচ্ছায়ায়, প্রকৃতির এই রমণীয় নিভৃত কুঞ্জে, প্রকৃতির কবি পূজনীয় রবীন্দ্র নাথকে বসাইয়া যদি তাঁহার মুখে এই গানটি শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকের এই পবিত্র সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর বলিয়া বোধ হইত, এই সঙ্গীতশ্রবণে হয় ত তাহার যথার্থ উপভোগ হইত। এবং হৃদয়ের পিপাসাও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত। চক্ষু দ্বারা সর্ব্বদা সকল সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, কিন্তু কর্ণে যদি মধুর ভাষায় সেই সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম ধ্বনিত হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সৌন্দর্য্যের যিনি কারণ, তাঁহার বিকাশ অনুভব করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হয়। যখনই যে সুন্দর স্থানে গিয়াছি, কবিবরের রচিত সেই সকল স্থানের রমণীয় দৃশ্যবৎ সুন্দর গান গাহিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা গলায় শক্ত হৃদয়ে কি তেমন করিয়া গাহিতে

পারা যায়?—পারি নাই, তাই সেই দূর প্রবাসে, নির্জ্জন অরণ্য, মেঘমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, উপলসঙ্কুল খরতোয়া পার্ব্বত্য প্রবাহিণী, প্রকৃতির প্রমোদ উদ্যান, সকল সুন্দর স্থানেই কবিবরের অভাব বড় গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছি। আমার পরম পূজনীয় পিতৃস্থানীয় আত্মীয় প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেরাদুনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তখন একদিন এই সুরম্য স্থান দেখিয়া তিনি এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়াছিলেন,—"বড়ই ইচ্ছা করে, আমার যারা আপনার জন আছে, সকলকে ডেকে এনে এই সুন্দর ছবিখানি দেখাই—এ স্থানটি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!" দেরাদুনে অবস্থান-কালে তিনি অনেক সময়ই বলিতেন,—"কে যেন কোনও এক সুন্দর দেশ হতে এই রমণীয় সহরটা চুরী করে এনে এই পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রেখে গেছে।"

ঝরণা দেখা শেষ হইলে, সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। জানিতে পারিলাম, তাহা আরও উপরে; বিলম্ব না করিয়া সেই আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হওয়া গেল; আমাদিগকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী অতি সমাদরে আমাদিগকে তাঁহার আশ্রমপ্রাঙ্গণে আহ্বান করিলেন। দেখিলাম, তিনি তখন তিন চারিটি বালককে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেছিলেন। বালক কয়টি শরীর দুলাইয়া তাড়াতাড়ি ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতেছিল। আমাদের দেশে পূজার সময় পুরোহিত ঠাকুরেরা যেমন চণ্ডী পাঠ করে, তাহার এক বর্ণও বুঝিবার যো নাই, ইহাদের এ আবৃত্তিও তদ্রূপ। আমরা বাহিরে জুতা রাখিয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম; তিন চারি খানি সুন্দর পরিষ্কার ঘর, উঠানটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। চারিদিকে অনেকগুলি গাছ, ফলভরে বৃক্ষগুলি অবনত, সতেজ পত্রে স্নিগ্ধতা ক্ষরিত হইতেছে। তপোবনপ্রাঙ্গণে একটি বিল্বতরু, একটি রুদ্রাক্ষের গাছ অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটি সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গী-গণের যত্নে তপোবনের ন্যায় শোভান্বিত হইয়াছে, তাহার স্নিগ্ধ ভাব দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। সন্ন্যাসী যে কঠোরপ্রকৃতি দার্শনিক নহেন, সেই শুষ্ক যোগসাধনার মধ্যেও কবিহৃদয় বর্ত্তমান, তাহা তাঁহার স্থাননির্ব্বাচনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্থানটি এমন সুন্দর যে, সেখানে দাঁড়াইলে সমস্ত দেরাদুন সহরটি বেশ পরিস্ফুটরূপে দেখা যায়, একখানি চিত্রের ন্যায় সুশোভন ও নয়ন-

দূনের সৌম্য শান্ত শোভা নিরীক্ষণ করিলাম, আলো ও ছায়ার মধুর মিলনে গিরিউপত্যকা-বিরাজিত, হরিৎপত্রবৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা-পূর্ণ দেরাদূন সহর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে যেন বিশ্রাম করিতেছে, এবং সান্ধ্যতপনের লোহিত প্রভা তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছে; মধ্যাহ্নের অস্ফুট কলরব যেন ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই শোভা দেখিয়া তপোবনের তরুচ্ছায়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ধনীর অট্টালিকায় উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের হস্তী অশ্ব গৃহসজ্জা প্রভৃতি দেখাইয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্বেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে; আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকটও সেই মানব রীতির ব্যবহারবিষয়ে ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না। তিনি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার তপোবনের প্রত্যেক বৃক্ষ আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন, কোন্ বৃক্ষটি কোন্ বৎসর রোপিত হইয়াছিল, এমন কি, কোনটি কবে ফলবান হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগবানের কৃপার কথা বলিতে লাগিলেন, অবশেষে বিগলিতহৃদয়ে বলিলেন, "আরে বাবা দীনদয়াল কঠিন প্রস্তরসে অমৃতধারা বাহার কর দিয়া।"—তাঁহার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তাহা মরুময়, পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন! ভগবানের নামে সহজে তাহা গলিতে চাহে না।

সমস্ত দেখা শেষ হইলে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমরা একটি বাঁধান গাছের তলে আসিয়া বসিলাম। সন্ন্যাসীর কয়েকজন শিষ্যও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ পল্টনের ছুটী, কেহ মদের দোকানে বসিয়া সুরাদেবীর সেবা করিতেছে, কেহ বা সপ্তাহান্তে আজ সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া এক সপ্তাহের জন্য প্রাণের ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে; পুণ্যকথা শুনিতে শুনিতে এই সকল সিংহবিক্রম উদ্ধত সৈনিকপুরুষের হৃদয়ও মেষের ন্যায় শান্ত ভাব অবলম্বন করে।

সন্ন্যাসী অনেক শাস্ত্র-কথা বলিলেন; হরিশ্চন্দ্রের কথা, জন্মদুঃখিনী পুণ্যবতী জানকীর পবিত্র কাহিনী, নল দময়ন্তীর দুর্দ্দশার বিবরণ প্রভৃতি পৌরাণিক বৃত্তান্তও বিবৃত করিতে লাগিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে হয় ত তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, আমরা যখন লেখা-পড়া-জানা লোক, তখন আমাদের এ সকল কথা জানাই খুব সম্ভব, তাই গল্পের শেষে আমাদিগের দিকে চাহিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "ইহারা [illegible]

এই সকল পুরাণকথা বলিলে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে ইহাদের অনেক জ্ঞান হয়, ইহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, এবং এই সকল কথা শুনিতে ইহাদিগের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক।"—যাহা হউক, এ সকল কথা সমাপ্ত হইলে তিনি আমাদের নিকট দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলেন, এবং "মায়াবাদ" "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" "অবতারবাদ" "জন্মান্তরবাদ" প্রভৃতি বিষয় বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, লোকটি বেশ তার্কিক; ইঁহার আর একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, ইনি শাস্ত্রকে দূরে রাখিয়া তর্ক করেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা প্রথমেই শাস্ত্র চাপিয়া ধরেন, এবং তর্কে পরাস্ত হইলে শাস্ত্রের উপর আপনার অপদস্থ পাণ্ডিত্যাভিমান স্তূপাকার করিয়া মুক্তকচ্ছে যে সকল বাপান্ত ও অভিশাপান্ত প্রয়োগ করেন, তাহা শাস্ত্রের উক্তি বলিয়া অতি অল্প লোকেরই ভ্রম হয়। এই জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট সেই সনাতন প্রথার ব্যভিচার দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিত ও মূর্খ পণ্ডিতের পার্থক্য বুঝিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল। ইনি বেদ অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইহাই বিশ্বাস,—সন্ন্যাসী বলিলেন, তর্কক্ষেত্রে যাহা অভ্রান্ত, তাহাকে আনিয়া ফেলিলে স্বাধীন তর্কের পথ সহসাই রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ভ্রম ও সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; যাহা প্রাণের বস্তু, বিশ্বাসের নির্ভর, তর্কের যুদ্ধে তাহাকে বর্ম্মরূপে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ যদি সেই বর্ম্ম ভেদ করিয়া অস্ত্রের আঘাত লাগে, তবে তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ইহাঁর মুখেই আমি প্রথমে শুনিলাম,

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

এই শ্লোকটি পরে বোধ হয়, পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবুর প্রাণে বিশেষরূপে বাজিয়াছিল। সে কালের পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে এরূপ স্বাধীন মতের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, তাই বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে সেকেলে পণ্ডিতদিগের আক্রোশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, সেই জন্যই বোধ হয় কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দুত্বের সীমা হইতে নির্ব্বাসন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকটিও প্রাচীন পণ্ডিতদিগের রচনা, ইহা হইতেই আমরা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উদারতা, যুক্তির প্রতি গভীর ভক্তি এবং কর্ত্তব্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের আধুনিক চেলাদিগের ভণ্ডামী ও অশ্রদ্ধেয় বাক্যকৌশলের পরিচয় পাই। কিছু দিন পূর্ব্বে "সাধনায়" উক্ত পত্রিকার জনৈক

জীতে একটি গল্প আছে যে, কিল্‌কেনির বিড়ালেরা এমন যুদ্ধ করিত যে, যুদ্ধাবসানে তাহাদের লেজগুলি ভিন্ন আর কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। কিন্তু প্রাচীন শূন্যবাদীদিগের তর্কযুদ্ধে লেজ দূরের কথা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই উড়িয়া যাইত। এ কথা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে যতখানি না খাটুক, আধুনিক পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে খাটে বটে! আমার এক জন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু অনেক সময়ই বলিয়া থাকেন, "উদরে কিঞ্চিৎ গব্যরস (অর্থাৎ ইংরাজী বিদ্যা) না পড়িলে স্বাধীন যুক্তির দ্বার মুক্ত হয় না;" আমার বর্ত্তমান সন্ন্যাসী ঠাকুর কিন্তু এক জন honourable exception, যাহা হউক, সন্ন্যাসী মহাশয়ের স্বাধীন মত কিরূপ, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেশকালপাত্রভেদে আইনের যেমন নজীর গঠিত হয়, সেইরূপ এখন শাস্ত্রাদিসম্মত বিধিরও "রদ বদল" করা উচিত কি না। সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া বিশেষ তেজের সহিত বলিয়াছিলেন, "আল্‌বৎ!" অবশেষে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া যেন একটু বিষণ্ণভাবে রলিলেন, "আরে বাবা, বহুৎ রদ্ বদল হো গেয়া; আভি হিন্দু লোগোঁনে হরওয়াক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য সমাজ মে চালায় লেতেঁ হি।"—তাঁহার কথার ভাবে এই বুঝিলাম, রদ বদল চাই, তবে এখন যেরূপ ভাবে তাহা হইতেছে, সেরূপ প্রার্থনীয় নহে; জানি না, আমাদের বঙ্গের চূড়ামণি ও বাপান্তবাগীশ এবং কলিকাতার সপ্তাহিকপত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাস পরাশর মহাশয়দিগের এ সম্বন্ধে বক্তব্য কি?

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া আমরা সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া উঠিলাম। সন্ন্যাসী আমাকে দুই তিনটা অপক্ক রুদ্রাক্ষ আনিয়া দিলেন, এবং বন্ধুকে একটি সুপক্ক বৃহৎ "পেঁপে" উপহার দান করিলেন; আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সেই পুণ্য তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইলাম।

পথে আসিতে আসিতে সঙ্গী বন্ধুকে বলিলাম, দেরাদূনের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিবার, তাহা সমস্তই দেখা শেষ হইল, বোধ হয়, আর কিছু দেখিতে বাকি থাকিল না; বন্ধু আমার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত অল্প হাসিয়া বলিলেন, তিনি আমাদের বাসস্থানের অতি নিকটেই এমন কিছু দর্শনযোগ্য বস্তু দেখাইতে পারেন, যাহা আমি সে প্রদেশে দেখিবার আশা করি না। আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া সেরূপ কোনও বস্তুর আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারিলাম না,

আর অধিক বেলা নাই দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। শীঘ্রই পূর্ব্বকথিত শ্মশানের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সম্মুখদিকে আসিলেই আমরা বাসায় উপস্থিত হইতে পারি, কিন্তু সে দিকে না আসিয়া বন্ধুটি আমাকে দক্ষিণ পাশের একটি জঙ্গলময় পথে লইয়া চলিলেন। কিছু দূর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আমরা "রিচপানা" নদীর তীরে আসিয়া পড়িলাম। সেখান হইতে একটু নীচে নদীর অপর পারে সহর দেখা যাইতেছে, যেন প্রতিমুহূর্ত্তে অন্ধকারের শান্তিময় ক্রোড়ে দেরাদুন ঢাকিয়া যাইতেছে। নদীতীরে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র বনের আড়ালে অল্পপরিসর একটু স্থান লৌহ রেলিংএ পরিবেষ্টিত, তাহার মধ্যে দুইটি চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ বিরাজিত। না জানি কোন মহাত্মার নশ্বর দেহের ধ্বংসাবশেষ এই রমণীয় নির্জ্জন প্রদেশে জীবনের অবসানে পরম শান্তি উপভোগ করিতেছে! কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষুদ্র লৌহকবাট ঠেলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম; তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্তম্ভের গাত্রের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, স্তম্ভদ্বয়ের গাত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সুস্পষ্ট ইংরাজী অক্ষরে কি লেখা আছে। অন্ধকার হইয়াছিল, তথাপি বিশেষ যত্ন করিয়া লেখাগুলি পড়িয়া দেখিলাম; দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের পশ্চিম পার্শ্বে লিখিত আছে;—

To the Memory of
Major General Sir ROBERT ROLLO GILLISPIE K. C. B.
Lieutenant O'HARA, 6th N. J.
Lieutenant GOSLING, LIGHT BATTALION
Ensign FOTHERGILL, 17th N. J.
Ensign ELLIS, Pioneers.
Killed on the 31st October 1814.
Captain CAMPBELL, 6th N. J, Lieut. LUXFORD,
Horse Artillery,
Lieutenant HARRINGTON, H. M. 53 Regt.
Lieutenant CUNNINGHAM, 13th N. J.
Killed on the 27th November,
And of the non-commissioned officers and men
Who fell at the Assault.

কোন্ কোন্ সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়াছিল, এই স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে তাহাদিগের তালিকা আছে; তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

This is inscribed
As a tribute of Respect for our adversary
Bulbudder
Commander of the Fort
And his brave Gurkha's
Who were afterwards
While in the Service of RANJIT SING
Shot down in their Ranks to the last men.
By Afgan Artillery.

পশ্চিম পার্শ্বে;—

On the highest point
Of the hill above this Tomb
Stood the Fort of Kalunga;
After two assaults
On the 31st October and 27th November,
It was captured by the British troops
On the 30th November 1814,
And Completely razed to the Ground.

সমস্ত পাঠ করিয়া আমি অবাক্। এই শান্তিপূর্ণ বিজন প্রদেশে, এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে, আমার মানস নয়নে একটি শোচনীয় ঐতিহাসিক দৃশ্য উন্মুক্ত হইল; শত শত বীরের হৃদয়শোণিতে কর্দ্দমিত কোলাহলপূর্ণ সংগ্রামক্ষেত্রে আমি দণ্ডায়মান! বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থানে অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিয়াছিল, বজ্রানল বক্ষে ধারণ করিয়া মৃত্যুস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল!—আজ সমস্ত নীরব, শুধু এই দুইটি স্তম্ভ এবং কয়েকটি অক্ষর নীরব ভাষায় আগন্তুক পথিকের নিকট সেই ধ্বংসকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে এই ঘটনাসম্বন্ধে এক-বর্ণ পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইল না; Talboys Wheeler সাহেব তাঁহার ইতিহাসে অনেক কথা লিখিয়াছেন,—এ যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনিও বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই; শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বিদ্যালয়পাঠ্য ভারত-ইতিহাসে কলুঙ্গার নামমাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু এই কলুঙ্গার যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরাক্রান্ত গুর্খা সৈন্যের অসাধারণ সাহস, অবিচলিত বীরত্ব এবং গভীর কর্ত্তব্যের বিকাশস্থল; হল্‌দীঘাট ও থর্ম্মাপলীর ন্যায় বীরত্বের ইহাও এক মহা-তীর্থ, কিন্তু ইতিহাস এখানে মূক!

শ্রীজলধর সেন।

প্রতিশোধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের হিরণ্ময় কিরণরাশি খড়িয়া নদী-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। পশ্চিমের আকাশে মেঘের উপর মেঘস্তর রবি-করসম্পাতে অপূর্ব্ব বর্ণরাজি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময়ে জগতির ঘাটে এক শুষ্কমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ মহাব্যস্তভাবে আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মণের চরণযুগলে কর্দ্দমের বিশেষ অভাব না থাকিলেও, অনেকগুলি কাঁটার ছড় সোজা পথে তাঁহার দ্রুত আগমন সূচিত করিতেছিল। ঠাকুরের বস্ত্র এবং উত্তরীয় অনেকদিন রজকগৃহ দর্শন করে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দেহলগ্ন উপবীত গাছটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না; অতএব পুঁটুলি মাত্র সম্বল ব্রাহ্মণ ঠাকুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া পাটুনিকে দেখিতে না পাওয়ায় যে শাপসম্পাতের কিছুই বাকী রাখিলেন না, তাহা বলা বাহুল্য। পাটুনীর বাস্তবিক দোষও যথেষ্ট ছিল। সে ডোঙ্গা খানি পর্য্যন্ত অপর পারে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া অনেক কষ্টে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই নদীটি পার হইতে পারিলেই ভালোয় ভালোয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছিতে পারেন। নহিলে দস্যুসঙ্কুল দেশে সন্ধ্যার পর কোনও যাত্রীর পরিত্রাণ নাই। ঠাকুর দিনদেবকে পাটে বসিতে দেখিয়া নিজেও সেই নদীতীরে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের ঘন ঘন দুর্গা-নাম, এবং নাসারন্ধ্রের দীর্ঘশ্বাসগুলি সান্ধ্য সমীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

এমন সময়ে একখানা সওয়ারি নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, মা দুর্গা এ যাত্রা রক্ষা করিলেন। নৌকার ভিতর একটি বাবু গুড়গুড়িতে ধূমপান করিতেছিলেন। ঠাকুর দুই হাতে পৈতা জড়াইয়া তীর হইতে উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে নদী পার করিয়া দেওয়া হোক্!

ব্রাহ্মণের তখনকার আকার প্রকার কতকটা হাস্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝিমাল্লাদের কেহ কেহ হাসিয়া বলিল, "ব্রিটলে বামুনের রকম দেখ। খেয়ার নৌকো পেলে আর কি!"

করিলেন, "অত তাড়াতাড়ি ওপারে যেতে ব্যস্ত কেন ঠাকুর? বসুন, তামাক ইচ্ছা করুন।"

মাল্লাদের এক জন ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল পূরিয়া ঠাকুরের হাতে দিল। এতক্ষণ ঠাকুরের মুহূর্ত্তমাত্র শত বৎসর বোধ হইতেছিল, কিন্তু তাম্রকূটের সুরভি ধূম তাঁহাকে বলিয়া দিল, বাবুটো আমীর গোছের বটে। চাইলে কোন্ দু চার টাকা না দেবে! কাজেই কোমরের পুঁটুলিটি একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি তামাকু সেবনে মন দিলেন।

ততক্ষণ নৌকারোহী, সেই শুষ্কমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক দেখিয়া লইতেছিলেন। তামাক খাওয়ার সময় ঠাকুরের কথা কহার অবসর ছিল না। অতএব ধূমপান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নৌকারোহীও কিছু বলিলেন না।

হুঁকা ছাড়িয়া ঠাকুর বলিলেন, "বাবু মশায়কে খুব আমীর বলে বিবেচনা হয়। আমরা আপনাদিকে সতত আশীর্ব্বাদ করে থাকি। কন্যাদায়ে পড়ে কথঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েচে, এখনও বিস্তর বাকী। কিন্তু বিশে ডাকাতের ভয়ে যা কিছু পেয়েছি, তাই নিয়ে আমায় বাড়ী ফির্‌তে হয়েচে। আজ সন্ধ্যার আগে পৌছিতে না পারলে, ব্যাটার কোন লোকের হাতে প্রাণ যাবে! এই যে পাটনীটে দিন থাক্‌তে ওপারে নৌকো বেঁধে পালিয়েচে, সে হয় ত বিশে ডাকাতেরই লোক। কি তার মতলব আছে, কে জানে!"

বাবুটির আরক্ত চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, বিশে ডাকাত তোমার মত কন্যাভারগ্রস্তের টাকা নিয়েছে, কখন এমন শুনেচো কি?"

ঠাকুর। আর বাবা, সে ব্যাটার আবার সে সব বোধ আছে। জাত বাগ্দী, বামুনের মর্য্যাদা সে বুঝবে কি? সেদিন শুনলাম, ত্রিবেণীর তর্কপঞ্চাননের উপর ভারি জুলুম করেচে। ভদ্রলোক সেজে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, "দেবতা, কৃপণের ধনে কার্ অধিকার?" তর্কপঞ্চানন কি অত ছাই জানেন, তিনি শাস্তর আউড়ে দিলেন। আর যাবে কোথা! ব্যাটা বলে কি, তস্করেরও যদি অধিকার, তবে মশায়ের মত কৃপণের ধনে আমার অধিকার আছে। তর্কপঞ্চানন কি করেন, সুড় সুড় করে পাঁচটি হাজার টাকা গুণে দিলেন!

নৌকারোহী উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন, "দেবতা, তর্কপঞ্চানন কোম্পানির বেতন খান, তিনি আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিসে? অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু কখন একটি কাঙ্গালী ভোজন করান না। আর বিশে ডাকাত মূর্খ বাগ্দীর ছেলে হলেও কত অপৈতকের পৈতা দিয়ে থাকে, কত কন্যাদায়গ্রস্তের মেয়ের

বিয়ে দিয়ে দিয়েচে, কত অনাথা বিধবার ভরণপোষণ করে, তা তুমি জান না ঠাকুর!"

ঠাকুর। কথায় বলে, গোরু মেরে বামুনকে দান। অমন দানের মুখেও ছাই, আর যে বামুনের ছেলে অমন ডাকাতির টাকা গ্রহণ করে, তার মুখেও ছাই! বল্‌বো কি মশাইগো, এম্‌নি দিন কাল পড়েচে যে, টাকার জোরে ডাকাত বিশে বাগ্দীও বিশ্বনাথ বাবু হয়ে দাঁড়াল। কোম্পানি বাহাদুর হুকুম দিয়েচেন, যে তাকে ধরিয়ে দিতে পার্‌বে, সে দশহাজার টাকা পুরস্কার পাবে। কিন্তু ব্যাটার কেমন জোর কপাল, আর ফিচলিমি বুদ্ধি, কেউ তাকে ধরিয়ে দিতে চায় না।

শ্রোতা বলিলেন, "ঠাকুর, বিশে ডাকাতকে অত গাল দিলে, সে শুন্‌লে তোমার কি ভাল হবে?"

ঠাকুর চকিত দৃষ্টিতে নৌকার ভিতর বাহির একবার দেখিয়া লইলেন। মাঝিমাল্লারা বাহিরে বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। ঠাকুরের এতক্ষণে সন্দেহ হইল, এই লোকগুলো যদি বিশে ডাকাতের সংসৃষ্ট হয়! তাঁহার শুষ্কমুখ আরও শুকাইয়া উঠিল। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবু, লোকে অসাক্ষাতে রাজার মাকে ডান বলে। আমি সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার নিন্দায় কি এসে যায়? আমি আপনাকে কথার কথা একটা বল্‌ছিলাম, আর কি। বুঝলেন কি না?"

নৌকারোহী হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, যাকে গাল দিলে, সে তোমার সামনে বসে! আমিই বিশে ডাকাত! কি আছে তোমার পুঁটুলিতে?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে মুহূর্ত্তে সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও ব্রাহ্মণ ঠাকুর অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। বিশ্বনাথের মূর্ত্তিতে ভীতিব্যঞ্জক কিছুই ছিল না। তাহার নাতিদীর্ঘ কৃষ্ণদেহে লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছিল। আকর্ণায়ত চক্ষু যুগলে অনন্যসাধারণ একটা জ্যোতি থাকিলেও তাহা কঠোরতামাত্রশূন্য। দেখিলে মনে হয় না, এই ব্যক্তি হীন তস্করমাত্র। ব্রাহ্মণ প্রথম দর্শনে তাহাকে একজন সদ্বংশজাত এবং জমীদার গোছের লোক ভাবিয়াছিলেন, দস্যুদলের নায়ক বিশ্বনাথ বাগ্দী বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যে বলিলেন, "বাবু,

কথা তোমার কাছে লুকাই নাই। দয়া করে আমায় যদি পার করে দাও, প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ করে যাই!"

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, "দেবতা, এখনও আপনকার বিশ্বাস হয় নি যে, সত্যসত্যই আমি বিশে ডাকাত। বুঝতেই পারবেন, কেড়েকুড়ে নেওয়া আমার ব্যবসা। আপনাকে পার করে দেব বটে, কিন্তু পুঁটুলিটি নৌকোয় রেখে যেতে হয়েচে ঠাকুর। এতদিন ডাকাতিই করেছি, পাটুনিগিরি কখন করি নি! পুঁটুলিটি খেয়ার কড়ি বলে দিয়ে যান।"

ব্রাহ্মণ নিরুপায়—লোকটা তবে বিশে ডাকাতই বটে। যথাসর্ব্বস্ব যায় যাক্, প্রাণটা বাঁচিলে আবার ভিক্ষা মিলিবে। ঠাকুর পুঁটুলিটি খুলিয়া বিশ্বনাথের সম্মুখে রাখিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, গরিব বামুনের যা কিছু আছে, নাও। না জেনে তোমায় অনেক কটু কথা বলেচি। কিছু মনে করো না। এখন আমায় পার করে দাও।"

বিশ্বনাথ। ঠাকুর, কতগুলি টাকা সংগ্রহ করেছ। কন্যাদায়ে উদ্ধার হতে কত টাকা তোমার চাই?

ঠাকুর। শ দুই টাকা পেয়েছিলাম বাবা, আরও শ দুইয়ের যোগাড় কর্‌তে পার্‌লে তবে এ যাত্রা উদ্ধার হতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? তুমি হুকুম করে দাও বাবা, আমি পার হয়ে যাই।

বিশ্ব। ঠাকুর, অত ব্যস্ত হবেন না। আজ রাত্রে দয়া করে এই নৌকায় বাস করুন। প্রাতে বাড়ী যাবেন। অধম বাগ্দীর দান নিতে যদি ঘৃণা না করেন, পাঁচশ টাকা কাল প্রণামী দেব।

ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইলেন। বলিলেন, "তুমি বিশ্বনাথ বাবুই বটে। শাপভ্রষ্ট হয়ে বাগ্দীকুলে জন্মেছ। দস্যুব্যবসায়ী হলেও তোমার মত মহৎ এ কালে দেখা যায় না। বাবা, কত লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে আজ তিন মাস ধরে দু শ টাকা সংগ্রহ করেছি, আর একেবারে তুমি পাঁচ শ টাকা আপনা থেকে দিতে রাজি হলে! কিন্তু অত টাকার আমার দরকার নেই বাবা। যদি দয়া কর্‌লে, তবে গরিব ব্রাহ্মণের পুঁটুলিটি ফিরিয়ে দাও, আর তোমার লোক দাও আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল। "বুঝেছি ঠাকুর, ডাকাতকে যে এতটা বাড়ালে, সে কেবল পাপের টাকাটা না নেবার জন্যে। আচ্ছা, আমার ডাকাতির টাকা

নেই। আমি একখানি চিঠি দিচ্চি। আপনি নিজে না যান, কাউকে দিয়ে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেই রাজবাড়ী থেকে পাঁচ শ টাকা আস্‌বে।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মাল্লা-বেশধারী কেহ একজন প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। বিশ্বনাথ বাক্স খুলিয়া মসীপাত্র এবং লেখনী সংগ্রহ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। এমন সময়ে অপর পার হইতে কেহ শিস দিল। মাঝি হাঁকিল, "বৈদ্য-নাথের লোক।"

"আচ্ছা, নৌকো পারে নাও," বলিয়া বিশ্বনাথ চিঠি লিখিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে বলিল, "ঠাকুর, ছেলেবেলায় পাঠশালায় দিনকতক লিখেছিলাম, তাই চিঠিখানা, পত্তরখানা লিখ্‌তে পারি। কিন্তু ভাল পারিনে। তা মা কালীর প্রসাদে এতেই কাজ চলে যাচ্চে।"

নৌকা ভিড়িতে না ভিড়িতে চিঠি লেখা সম্পূর্ণ হইল। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণের হাতে পত্র দিয়া তাহার পদধূলি লইল, এবং বিনীতভাবে বলিল, "ঠাকুর, অপ-রাধ নেবেন না। নিজের অনেক বড়াই করেছি, কিছু মনে কর্‌বেন না। এ অধম বাগ্দীকে যখন ইচ্ছা মনে কর্‌বেন, প্রসাদ খেয়ে আস্‌ব। গরিব দুঃখীকে বলে দেবেন, দরকার হলে আমার কাছে যেন আসে। আমি সবারই মিত্র— কেবল জুলুমবাজের শত্রু। কোম্পানি বাহাদুর শুন্‌চি আমার মাথাটা নেবার জন্যে হুলিয়া করেচে, কিন্তু মা কালী জানেন, বিশে বাগ্দী হতে কোম্পানির কোন ক্ষতি আজ পর্য্যন্ত হয় নি। কিন্তু সাহেব গুলো কি না বেনের জাত, বড়মানুষের টাকাগুলো গরিবের ঘরে যায়, এটা ওরা সইতে পারচে না। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করে যেও, বিশে যেন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা কর্‌তে কর্‌তে মর্‌তে পারে।"

ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে কতকটা নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলি-লেন, "বাবা, লোকে বলে বিশ্বনাথ বাবু, আমি বলি, রাজা বিশ্বনাথ। মা কালী তোমার প্রতি প্রসন্ন, তোমার আবার ভয় কি?"

ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রত্নতত্ত্ব।

ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী।

ডাক্তার অপার্ট ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগের সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এত নূতন ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় আছে যে, তাহা পাঠ করিয়াই মনে হয়, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্‌স প্রভৃতি মহোদয়দিগের "এসিয়াটিক সোসাইটী" সংস্থাপনের সুফল সত্য সত্যই ফলিতেছে। ভারতের অধিবাসীদিগের সহিত প্রাচীন আর্য্যজাতির একটা সম্বন্ধের প্রশ্ন এখন উঠিতেছে—এত দিন পরে এই আর্য্যশাখার সহিত আর্য্যজাতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কথাটা আবার বিস্মৃত অতীতের অন্ধকারগর্ভ হইতে নব বেশভূষায় সুসজ্জিত একটা নূতন প্রশ্নের মত করিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে উপনীত করা হইল কেন? কেন—ইহার মীমাংসা সহজ নহে—তবে অধ্যাপক সাইমের মত প্রকাশের পর হইতে সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। অধ্যাপকের মত আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে নিতান্ত এক দিক টানা হইয়াছে। তবে অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যাভিমান আছে, এবং বিজিত ইতিহাস-হীন জাতির উপর জেতার অধিকারও তাঁহার সহায়—কাজেই সব শোভা পায়।

সংপ্রতি "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে উক্ত পুস্তকের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। জানি না, কেন এই সমালোচনার অভিনয় যবনিকার অন্ধকার অন্তরালে সম্পাদিত হইয়াছে;—লেখকের পূর্ণ নাম নাই; তাহা ভিন্ন, বর্ণ নামক যে দ্রব্যটার সম্বন্ধে ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে বিরোধ প্রবল, তাহার উপর লেখকের ঝোঁক দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে, লেখকের জাতিনির্ণয় দুরূহ সাধন নহে। যাহা হউক, প্রবন্ধটিতে শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট আছে—আমরা গ্রন্থকার ও সমালোচকের মতামত, পাঠকের বিচারের জন্য এখানে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

যাঁহারা এই হতভাগ্য উষ্ণপ্রধান দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও এই হতভাগ্য জাতির বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী উল্লেখ-যোগ্য। জোন্‌স প্রভৃতি "এসিয়াটিক সোসাইটী"র সংস্থাপক-সমূহ ও জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ। প্রথমোক্তদিগের কার্য্যে বিঘ্ন দুইটি—তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, প্রায় চারি সহস্র বৎসর হইতে মানবসৃষ্টির আরম্ভ—এই বিশ্বাস যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে; কিন্তু এই বিশ্বাসবলে টড প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচ সাহসের সহিত ভারতের ইতিহাসের তারিখ সংশোধন করিয়াছেন। আর এক অসুবিধা, তখন মানবের জাতিগত দৈহিক পার্থক্য সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস এত সম্পূর্ণ ছিল না। জর্ম্মাণ পণ্ডিতদিগের অসুবিধা, ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত পরিচয়াভাব। বর্ত্তমান লেখকের এই সকল অসুবিধা নাই—অধিকন্তু, তিনি ইংরাজ ও জর্ম্মাণ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছেন।

সুবিধা ও অসুবিধা।

জাতিগত দৈহিক পার্থক্য প্রধানতঃ দুই লক্ষণে ধরা যায়—বর্ণ ও মস্তকের গঠন। ইহাদিগের উপর কালের প্রতাপ নিতান্ত অপ্রতিহত ও অসীম নহে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বের নর-মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে স্থানে ঐ মস্তক পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানের

বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মস্তকের গঠনও সেইরূপ। বর্ণ সম্বন্ধে কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতে হয়। দেখা যায় যে, উষ্ণপ্রধান দেশে লোক কৃষ্ণ ও শীতপ্রধান দেশে লোক শ্বেতকায় হয়; কিন্তু যদি কিছু তারতম্য-বিশিষ্ট-বর্ণযুক্ত তিন জন শ্বেতকায়কে বহু দিন কোনও উষ্ণপ্রধান দেশে রাখা যায়, তবে তাহারা অবশ্যই কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া আসিবে; কিন্তু সেই কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যেও সেই তারতম্যটুকু বজায় থাকে। আরও একটু বিশেষত্ব এই যে, সন্তানগণের বর্ণ সেই আদিম জাতীয় বর্ণের দিকে অগ্রসর হয়। মিশরের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চিত্রিত অনেক চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়গণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ চিত্রিত আছে—আজও সেই বর্ণবৈচিত্র্যের বিচার করিয়া সেই সকল জাতীয়দিগকে পৃথক করা যায়। প্রাচীন গ্রন্থে যে জাতির যে বর্ণ বর্ণিত আছে, আজও তাহাই।

জাতিগত দৈহিক পার্থক্য।

সার উইলিয়ম জোন্সের মত অবলম্বন করিয়া, পণ্ডিত বপ সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য দেখান। তখন স্থির হয় যে, আর্য্যগণ কতক পশ্চিমে ও কতক পূর্ব্বে গমন করেন। সুতরাং সেই মতানুসারে বিজিত বলহীন বঙ্গবাসী ও তাহার শাসনকর্ত্তা শ্বেতকায় ইংরাজ ও তাহার ভীতির কারণ পিশাচ-প্রবৃত্তিপরায়ণ ইংরাজ সৈনিক একই বংশসম্ভূত। রাজনৈতিক হিসাবে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান, ইহাতে যে কেবল বিজিতই একটা অতৃপ্ত আশার স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আপনাকে জেতার সহিত একজাতীয় বলিয়া মনে করিয়া হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে একটা তৃপ্তি ও গর্ব্ব অনুভব করিত, এমন নহে; জেতাও আপনাকে বিজিতের স্বজাতীয় জানিয়া, আপনার গর্ব্বিত উচ্চাসন হইতে তাহার প্রতি একটু করুণাময় কোপহীন কৃপাকটাক্ষপাত করিতে পারিত, এবং যে সহানুভূতি ইংরাজ যত্নের সহিত আপনার হৃদয় হইতে দূর করে, তাহা থাকিলে, বিজিতের শাসনকার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। সমালোচক বলেন যে, জাতিগত দৈহিক পার্থক্য চাইনিস ও কাফ্রির মধ্যে যত প্রবল, ইংরাজ ও দেশীয়ের মধ্যেও তত প্রবল, তবেই আশমান জমীন তফাৎ।

ভাষা।

ডাক্তার অপার্ট বলিয়াছেন, গড দ্রাবিড়ীয়দিগের মধ্যে দৈহিক প্রভেদ সাধারণতঃ খুব অধিক বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, স্থান, ব্যবসায় এবং পারিবারিক ও রাজনৈতিক-জীবনের পার্থক্য, কালে এই প্রভেদ আনিয়াছে। একই মহাজাতি য়ুরোপ ও এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরাও সেই জাতি হইতে সমুদ্ভূত, এবং তাহাদিগকে ফিনিস্-উগরিয়ন বা তুরাণীয়ও বলিয়া থাকে। এই ফিনিস্-উগরিয়ন ও তুরাণীয়ের অর্থ গ্রন্থকার কি করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া কিছু কষ্টকর। তুরাণীয় কথাটার খুব নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে কি না সন্দেহ, এবং ফিনিস্দিগের সম্বন্ধে আবার সেই জাতিগত দৈহিক পার্থক্যের প্রশ্ন আসিয়া ব্যাপারটা কিছু জটিল করিয়া তোলে; কোনও জাতির সহিত কোনও জাতির সাদৃশ্য দেখান বড় সহজ নহে, তবে এমন অনেক স্থানে হয়, সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। গ্রন্থকার একস্থানে (২৮৪ পৃষ্ঠা) বলিতেছেন যে, ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের অধিকাংশই পুরাতন একেডিয়ান ও সালডিয়ানগণ যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতীয়। কথাটার ঠিক মীমাংসা হয় না। তবে যখন তিনি হাঙ্গেরিয়ান, ফিনস্ প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের একত্ব নিরূপিত করিতেছেন, তখন তিনি—সমালোচকের মতে—জাতিগত দৈহিক পার্থক্যের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন।

জাতি।

হয় যে, ঐ বিবরণ, হয়, মনু মৃতাবশিষ্টদিগের বংশধরগণের নিকট অবগত হইয়াছিলেন,— নয়, অন্য প্রকারে অবগত হইয়াছিলেন; কারণ, ঐ সময় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করে নাই, মনুও আসেন নাই। এই কথায় তিনটি কথা আসিয়া পড়ে। প্রথম—অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে, মনুর বন্যা ও বাইবেলের বন্যা এক নহে; দ্বিতীয়—সানডিয়ার বন্যা ও বাইবেল-কথিত বন্যার মধ্যেও প্রায় ৪০ সহস্র বৎসরের ব্যবধান বোধ হয়; তৃতীয়—আর্য্যগণ তখনও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই।—এই কথাটি আরও ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়—কারণ কবে যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক কোনও মীমাংসাই এখন পাওয়া যায় না। মনুষ্যজাতির প্রাচীনত্বের সীমা নির্দ্ধারণ করা প্রায় দুরূহ ব্যাপার। কাজেই এ মীমাংসাও বড় সহজ নহে—বড় সহজ নহে কেন—অসম্ভবই বলিতে হইবে। ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, গ্রন্থকারের হৃদয় হইতে বহু যুগের প্রচলিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস মুছিয়া যায় নাই, এবং তিনি ঠিক ইতিহাসও অবলম্বন করেন নাই। এই স্থানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ইতিহাসাতীত কালের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক স্থানে অনুমানের উপর নির্ভর না করিলে চলে না।

মহাবন্যা।

গ্রন্থকার আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগকে ভরত নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং বলেন যে, তাহাদিগের নাম হইতেই দেশের নাম ভরতবর্ষ ও ক্রমে ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মতে, এই ভরতগণ পর্ব্বতবাসী জাতি ছিল এবং ভর ধাতু হইতে তিনি তাহাদিগের উৎপত্তি নির্দ্ধারিত করেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে এই ভরতগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং দুই নামে অভিহিত হইত—কুরুপাঞ্চাল এবং কৌরব ও পাণ্ডব। এবং মনে হয় যে, এই দুই বিভাগ কখনই পরস্পরের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করে নাই। ইহাদের মধ্যে বিরোধভাব প্রবল ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তির অন্য বিবরণ এদেশে প্রচলিত ছিল এবং বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত আছে।

ভারতবর্ষ।

খুঁটিনাটি করিয়া ধরিতে গেলে ভারতবর্ষের অনেক জাতির মধ্যে দৈহিক একতা নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, দ্রাবিড়ীয় পার্ব্বত্যজাতি ভাল করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের অনেক জাতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা কঠিন নহে। তিনি বলেন, বর্ত্তমান চণ্ডালগণ পূর্ব্বের চণ্ডাল হইতে ভিন্ন নহে, আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ইহারা পরাভূত হয় এবং গণ্ডগণও ইহাদিগের একজাতীয়। পরিশেষে তিনি স্বীকার করিয়াছেন,—তাঁহার অনুমানে যথেষ্ট ভ্রমের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার পুস্তকপাঠের পর যদি কেহ নবসভ্যতালোকপ্রাপ্তদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য সম্মান প্রাচীন জাতিদিগকে দিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি শ্রম সার্থক বিবেচনা করিবেন। তাহা হইলেই যথেষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের সম্বন্ধে গ্রন্থকার এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে, এ কথা বোধ হয় সাহসের সহিত সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করা যায় যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এতদুভয় কালের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নিকট এই গ্রন্থ মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হইবে, এবং ইহা এইরূপ জাতীয় অধ্যয়নের নবপ্রভাত সূচিত করিয়াছে।

জাতীয় একতা।

এখন জড়জগৎ ছাড়িয়া ভারতবর্ষীয়দিগের গর্ব্বের বস্তু-চিন্ময় জগতে প্রবেশ করি। গ্রন্থকার প্রথমেই আর্য্য ও অনার্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের আলোচনা করিয়াছেন। পরে তিনি বলিতেছেন যে, বৈদিক প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা হইতে আর্য্যগণ অজ্ঞেয় অনন্ত অশরীরী পরমেশ্বরের উপাসনায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অশরীরী কল্পনা সাধারণের ক্ষমতাতীত হওয়ায়,

ক্রমে পালন ও ধ্বংসের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে উপনীত হইতে হয়। ক্রমে অন্য এক মহাশক্তির স্থায়িত্বে লোকে বিশ্বাসবান হইয়া পড়ে এবং ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্ত্রীশক্তির আবির্ভাব ভারতখণ্ডে ব্যাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে শালগ্রামই ইহার বিশেষ চিহ্ন, কিন্তু ক্রমে বিষ্ণুর কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থকারের মত। গ্রন্থকারের মত যে, এই স্ত্রীশক্তির উপাসনা প্রথম তুরাণীয়দিগের মধ্যেই উদ্ভূত। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে পাই যে, প্রাচীন রসিয়ানগণ ও পলিনেশীয়ানগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই স্ত্রীশক্তির উপাসক।

ত্রিমূর্ত্তি।

গ্রন্থকার বলেন যে, অনার্য্যদিগের বিশ্বাস আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর যথার্থ প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিল, এবং অনার্য্যদিগের আরাধ্য প্রেত নৃপদেবতা হইতে ক্রমে ব্রহ্মা—শিবমূর্ত্তিতে ভূতনাথ—অন্য যে শক্তি বিষ্ণুতে লিপ্ত ছিল, তাহা উমায় আনীত। এই উমা শব্দ লইয়া কিছু তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মা দেবগণের পক্ষে কোনও যুদ্ধে জয় লাভ করেন—দেবগণ আপনাদিগের এই জয়লাভে উল্লাস প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা যক্ষরূপ ধারণ করেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত অগ্নি প্রভৃতি ইহাঁর পরিচয় অবগত হইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়েন, এবং সেই অজ্ঞেয় শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করেন। ইন্দ্র অগ্রসর হইলে সেই অজ্ঞেয় শক্তি সহসা অদৃশ্য হইলেন। তখন সেই ঈথর রাজ্যে ইন্দ্র এক জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরী রমণীর সাক্ষাৎ পাইলেন; তিনিই বলিলেন যে, ঐ অজ্ঞেয় শক্তি ব্রহ্মা—সেই রমণী উমা হৈমবতী।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে উমাজ্ঞান—কেবল নারীমুর্ত্তিতে জ্ঞান (বিদ্যা উমারূপিণী) সায়ণাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, উমাই জ্ঞান; সেই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা অসীমকে অবগত হইতে পারি। স্লাভোনিক ভাষায় উমো ধাতুর ঠিক এই অর্থ। স্লাভোনিক ভাষা হইতে ঐ কথা সংস্কৃতে প্রচলিত হইয়া ঐ জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সংস্কৃত জীবন স্লাভোনিক ভাষায় ব্যবহৃত। সেখানেও জীবন অর্থে জীবনের দেবী বুঝায়। সমালোচক—কেন জানি না—বলেন যে, উমা ও বাচ একই কথা। প্রাচীন সাহিত্যামোদী অবগত আছেন, কুমারসম্ভব গ্রন্থে কালিদাস উমার উৎপত্তির অন্য এক বিবরণ দিয়াছেন। তাহা কবির কল্পনাসৃষ্ট বলিলেও, সমালোচকের মতের কোনও কারণ দেখি না। তবে অম্বিকা সম্বন্ধে সমালোচক বলেন যে, ইতিহাসকালাতীত কালে যখন আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়গণ একত্র হইয়াছিলেন, তখন একের বাচ ও অন্যের অমা একত্র হইয়া অম্বিকা সৃষ্ট হয়।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের দেবতারাজত্বে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিপাদিত করা দুরূহ নহে। দেবীগণ দেবগণের স্ত্রীসর্ত্তেই কিছু ক্ষমতাবান; ক্ষমতায় তাঁহারা দেবগণের অপেক্ষা হীন। দুই মহাদেশে দৃষ্টিপাত করি—মিনার্ভা ও জুনোও প্রধান দেবগণের বাসনার অধীন; বেদে দেখা যায়, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতির পত্নীগণ কখন ক্ষমতায় প্রাধান্য লাভ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। অনার্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীশক্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল, এবং ক্রমে ক্রমে আর্য্যগণ তাহা গ্রহণ করেন এবং হিমাচল হইতে কুমারীকা পর্য্যন্ত অনেক স্থানের দেবালয়েই এখন কালী, শক্তি প্রভৃতিরূপে দেবীপূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে—দুর্গোৎসবের অষ্টমীর দিন শক্তির পূজা বিশেষ ভাবেই হইয়া থাকে।

স্ত্রীশক্তি।

আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগের দেশে আবাস স্থাপন করেন, এবং সেই

পবন জেতার হৃদয় হইতে বিজয়গর্ব্ব ও বিজিতের হৃদয় হইতে অপমান শীতল করিয়া আনিয়াছিল এবং সে সময় জাতিগত ও বিদ্যাগত গর্ব্ব এত অধিক স্থায়ীও ছিল না; সুতরাং ধর্ম্মের পুণ্যপ্রয়াগ মহাতীর্থে এই দুই মত-স্রোতস্বতীর সুখসম্মিলন সহজেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বর্ত্তমান গ্রন্থের মত একখানি গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা এত সংক্ষেপে করা সম্ভব নহে। আমরা কেবল গ্রন্থকারের (এবং সমালোচকের) কতকগুলি মতামত ও স্থানে স্থানে আমাদিগের ধারণা এখানে নিবিষ্ট করিলাম। সমালোচকবিশেষ বা পাঠকবিশেষের নিকট এই গ্রন্থ আদরণীয় না হইলেও ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় যে যথেষ্ট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

দার্দিস্থান।

ডাক্তার লিটনার দার্দিস্থান সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দার্দদিগের সম্বন্ধে অনেকটা অবগত হওয়া যায়। তাহাদিগের সরল আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত রহস্য এই পুস্তকে সংগৃহীত আছে।

খেলা ও শীকার।

কাশ্মীরের উত্তরে পোলো খেলার প্রতাপ অপ্রতিহত অসীম। নাড়কীরা ও বালটীরা এই ক্রীড়া বড় ভাল বাসে—গিলগিটীরাও ইহাতে অপটু নহে। গ্রামের পার্শ্বেই প্রায় গ্রামের সদৃশ বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি—কোনও বিশেষ আনন্দ বা ছুটীর সময় সকলে একত্র হইয়া সেইখানে ক্রীড়ামত্ত হয়—সে ক্রীড়ার মধ্যে একটা বিশেষ সজীবতা ও উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। ডাক্তার বলেন যে, যে দিবস তিনি অ্যাসটরে গিয়াছিলেন, সেই দিবসেই একজন অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত পোলো-খেলোয়াড়ের চৈতন্য সম্পাদন করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণশিক্ষায় ইহারা মনোযোগ দিয়া থাকে, এবং শরসন্ধানশিক্ষায় সবিশেষ মনোযোগ দেয়। শীতকালে শীকার করা খুব সাধারণ। তবে অ্যাসটরে প্রধান তিনটি পর্ব্বতে কোনও শীকার নিহত হইলে নবাব তাহা পাইয়া থাকেন, শীকারী কেবল শীকারের মস্তক, পদ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকে। গিলগীটে যে যাহা শীকার করে, সে তাহা লয়,—তাহাদের কিন্তু নবাবকে তাহার কিছু না কিছু দিতে হয়। কোথায় শীকার আছে তাহার সন্ধান লইবার জন্য পূর্ব্বেই লোক নিযুক্ত হয়, তাহারা সন্ধান পাইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে সংবাদ পাঠাইয়া দেয়—সংবাদ পাইলে গ্রামস্থ ব্যক্তিরা বাদ্যকর প্রভৃতি লইয়া শীকারে গমন করে। বাদ্যকর ও শীকারীরা—যেখানে শীকার থাকে—তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়—প্রভাত হইলে বাদ্য আরম্ভ হয়—বিকট বাদ্যে বিরক্ত, বিড়ম্বিত ও ভীত হতভাগ্য পশু বাহির হইয়া আইসে, এবং শীকারীর অব্যর্থ সন্ধানে সেইখানে আপনার পশুজন্ম সার্থক করে।

বন্দুককে গিলগিটীরা "তারমাক" ও অ্যাষ্টরীরা "তামাক" বলে। সেখানে প্রচলিত বন্দুকগুলি অগ্নি সংযোগ করিয়া ছাড়িতে হয়—সেই মান্ধাতার আমলের বন্দুক! গিলগিটীরা প্রায় বন্দুক প্রস্তুত করিয়া লয়। পাথরের উপর শিশা মুড়িয়া তাহার গুলি প্রস্তুত করে। অল্পদূর ছুড়িতে হইলে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হান্‌জা ও নাগরের লোকেরা বন্দুকের সহিত কাঠের ডাণ্ডা লাগাইয়া লয়। তাহাদের বন্দুক ছোট ও হাল্কা এবং ইহাতে মহারাজার সৈন্যদের বন্দুকের গুলি অপেক্ষা ছোট ছোট গুলি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহারা অব্যর্থলক্ষ্য। বন্দুক ছুড়িতে বালবৃদ্ধ সকলেই খুব সুনিপুণ।

লেখক একদিন গিলগিটবাসী সকল দার্দদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের

ছিল। বহু কষ্টে বাদ্যকর আনা হইয়াছিল—লেখক নিমন্ত্রিতদিগকে নৃত্যগীত আরম্ভ করিতে বলিলেন। প্রথমে তাহারা এক এক জন করিয়া নাচিতে লাগিল, এবং দেহকম্পনে সঙ্গীতের সহিত তাল রাখিতে লাগিল। ধীরে ধীরে এক হস্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়া তাহারা নাচিতে লাগিল, এবং বাম পদই তাড়নাকার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তাহার পর বার জন একত্রে সামরিক নৃত্য করিতে উঠিল—দুই পাশে ছয় জন ছয়জন করিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল—যেমন করিয়া তরবারি ঘুরায়, তেমনই করিয়া হাত ঘুরাইতে লাগিল। এইরূপ নৃত্যে তাহারা সত্যসত্যই তরবারি ব্যবহার করে, তবে এখানে তাহা আনে নাই। কখন বৃত্তাকারে, কখন সারি বাঁধিয়া, তাহারা নাচিতে লাগিল, এবং সে তাড়নে অশোক মুকুলিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাহাতে এত ধূলি-কণা উড়িয়াছিল যে, লেখক সেই নৃত্যভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমোদ প্রমোদ।

অ্যাষ্টরীরা ও চিনাসীরা খুব মদ্যপ্রিয়। তাহারা ব্যবহারের জন্য মদ্য প্রস্তুত করে। পাঁচ বা ছয় সের শস্য জলে সিদ্ধ করিয়া কাপড় দিয়া ঢাঁকিয়া লওয়া হয়। তাহার পর সেই সিদ্ধ শস্যের সহিত লাডক হইতে আনীত প্যাপস নামক দ্রব্য মিশাইয়া তাহা মৃৎপাত্রে রাখা হয়; পরিমাণ মত জল দিয়া পাত্রের মুখ চামড়া দিয়া বাঁধা হইলে তাহা গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতাপে ও শীতকালে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে রাখা হয়। বার দিন পরেই মদ্য প্রস্তুত হয়। সময় সময় দুই তিন বার জল দিয়া আর এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে তদ্দেশীয়গণ "মো" বলে। গিলগিটীরাও বড় মদ্যপ্রিয়;—নাগরে দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়।

মো।

দারিণবাসীরা মৃতব্যক্তির সমাধিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া দ্রাক্ষা, সুপারী প্রভৃতি ভক্ষণ করে। দার্দগণ অনেক সময় খাদ্য দ্রব্য মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখে। তাহারা ভিন্ন আর কেহই সে সকলের সন্ধান পায় না। যখন মহারাজার সেনাগণ গিলগিট আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আহারীয় অভাবে তাহারা যৎপরোনাস্তি যাতনা পাইয়াছিল, অথচ তাহাদিগের নিকটেই খাদ্য দ্রব্য প্রোথিত ছিল, তাহারা সন্ধান পায় নাই। সন্তান জন্মিলে পিতা মাতা কিছু খাদ্য এইরূপে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে, এবং সেই সন্তানের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে তাহা বাহির করিয়া বিতরণ করে। খাদ্য দ্রব্যের সহিত ঘৃতও প্রোথিত করা হয়—অবশ্যই এতদিনে ঘি লোহিতবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া যায়, কিন্তু তদ্দেশবাসীরা মনে করে যে, তাহাতে সুন্দর ও সুন্দরীর সৌভাগ্য সূচিত হয়। যে দেশে যেমন আচার।

আহারীয়।

সমালোচনা।

হ্যামলেট ও ডনকুইক্সোট।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়া যদি সূক্ষ্ম আলোচনার অনুবীক্ষণের সাহায্যে সাহিত্য-সন্দর্শনে সক্ষম হওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, সাহিত্যের মধ্যে চিরদিনই দুইটা বিপরীত-গামী স্রোত পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত না হইয়া আপন আপন গন্তব্যপথে চলিতেছে; আনন্দ ও বিষাদের এই দুই স্রোত চিরকাল সাহিত্যক্ষেত্রের শ্যামল বক্ষের উপর বহিতেছে। এক হইতে আনন্দান্ত ও অন্য হইতে বিষাদান্ত পুস্তকের সৃষ্টি। হ্যামলেট ও ডন-কুইকসোট এই দুই স্রোতের পরিচায়ক; প্রথমোক্ত, পাঠকের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বিষাদার্ত্তের ব্যথিত ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস উত্থিত করে, শেষোক্ত নিতান্ত গম্ভীর কঠোর দার্শনিকের

অধরপ্রান্তেও হাস্যরেখা অঙ্কিত করিয়া যায়। প্রসিদ্ধ রুস ঔপন্যাসিক আইভান তুরগিনিফ রসিয়ান ভাষায় এই দুই পুস্তকের যে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, আগষ্ট সংখ্যা "ফর্ট-নাইটলী রিভিউ" পত্রে কুমারী মিলম্যান তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন; প্রবন্ধটি আশাতীত সুন্দর এবং অসীম পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচায়ক; সেই জন্য তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা রসিয়ান সমালোচকের মতামত পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

প্রকাশ।

হ্যামলেটের প্রথম সংস্করণ ও ডনকুইক্‌সোটের প্রথম ভাগ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। যে দুইখানি পুস্তকে মানবচরিত্রের দুই সম্পূর্ণ বিপরীত অংশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে দুই খানি একই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। আনন্দ অপেক্ষা বিষাদে জটিলতা অবশ্য অধিক, তাই হ্যামলেটে কবি জটিলতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, এবং ডনকুইক্‌সোটে গ্রন্থকার সরল স্বচ্ছ সুন্দর রচনাপ্রণালীর জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু জগতে মনুষ্যমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে হয় হ্যামলেট, নয় ডনকুইক্‌সোট। লেখক দুঃখ করিয়াছেন যে, রুসিয়ান ভাষায় ডনকুইক্‌সোট গ্রন্থের ভাল অনুবাদ নাই। আর তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল কুইক্‌সোট অপেক্ষা হ্যামলেটের সংখ্যাই অধিক।

আদর্শ।

প্রত্যেক মনুষ্যই যথাসম্ভব একটা আদর্শের অনুসরণ করে, বা করিতে চেষ্টা করে। কেহ কেহ সেই আদর্শটা একেবারে মনের মধ্যে যেমন পায়, অমনই গ্রহণ করে, কেহ বা তাহা বিশ্লেষণ করিতে চাহে। আদর্শটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি—স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, অথবা আপনি ও আপনা ভিন্ন কিছু; কেহ আপনাকেই সর্ব্বস্ব ভাবে, কেহ আপনা অপেক্ষা আর কিছু মহৎ বা উচ্চকে সর্ব্বস্ব ভাবে।

ডনকুইক্‌সোট।

প্রথম ভাগের কুইক্‌সোটের ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় ভাগে দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অদ্ভুত মানবের মধ্যে একটা সহৃদয়তা আছে, সে আপনাকে লইয়া ব্যস্ত নহে, সে অন্যের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। সে ক্ষমতানুসারে ন্যায়পরতা ও সত্যের রাজ্য স্থাপন করিতে ও একটা আদর্শের অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসরণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অনেকে বলিবেন যে, এই আদর্শ তাহার বিকৃত কল্পনায় সৃষ্ট। সত্য—কিন্তু সেই পবিত্রতার জন্য তাহা নিশ্চয়ই উন্মুক্ত আদর্শ। তাহার হৃদয়ে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। সে মানবজাতির অপকার দূরীকরণ ও উপকার সংসাধনে বদ্ধপরিকর, তাই সে সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। শান্তিপ্রিয়, মহৎহৃদয়, সরল কুইক্‌সোট সেই জন্য শিক্ষার উপযোগী। সে আদর্শের দাস,—সেই আলোকে তাহার চিত্র সমুজ্জ্বল।

হ্যামলেট।

হ্যামলেটের চরিত্রের প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় আত্মদর্শন, তাহার পর আত্মসর্ব্বস্বতা, তাহার পর বিশ্বাসের শিথিলতা। তিনি কেবল আপনার জন্যই এই মুক্ত বিশাল জগতে বাস করেন। সকলকে, জগতকে অবিশ্বাস করিয়া, ক্রমে হ্যামলেট আপনাকেও অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন, তিনি আপনার মধ্যে আপনাকে লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, এবং আপনার চরিত্রের দৌর্ব্বল্যও তাঁহার অবিদিত নহে। তিনি আপনাতে বিশ্বাস করেন না, তবুও তিনি গর্ব্বিত; তিনি জীবনের কি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না, তবুও জীবন তাঁহার প্রিয়; দুঃখ তাঁহার নিকট জনজীবনকে প্রিয় করিয়া তুলিতেছিল। অবশ্য এইখানে বলিয়া রাখি, হ্যামলেটের যাতনায় উন্মাদকতা ছিল, সে দুঃখের তুলনায় কুইক্‌সোটের দুঃখ যাতনা কিছুই নহে।

দুইটি চরিত্রে প্রভেদ যথেষ্ট। ডনকুইক্‌সোট হাস্যের অবতার, হ্যামলেট মূর্ত্তিমান বিষাদ।

নাই। তবুও হ্যামলেটকে ভালবাসিতে পারি না, কারণ তিনি কাহাকেও ভালবাসেন নাই।

প্রভেদ।

এই সকল প্রভেদ। রাজপুত্র হ্যামলেট নিহত পিতার প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও তাহা পারিলেন না; (অবশ্য, কাব্য-হিসাবে ইহা চরিত্রের মাধুরী অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছে) আর হতভাগ্য দরিদ্র, বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন কুইক্‌সোট স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া পরহিতসাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য, সকল সময় তাহার উদ্দেশ্যের অনুরূপ ফল ফলে নাই, তাহাতে তাহার দোষ নাই—জগতে কয় জন উদ্দেশ্যের অনুরূপ কর্ম্মফল পাইয়া থাকে?

সাধারণ লোকের সহিত এই দুই চরিত্রের সম্বন্ধ—হ্যামলেটে পোলোনিয়াস্ চরিত্রে ও ডনকুইক্‌সোটে স্যান্‌কোপাঞ্চা চরিত্রে প্রকটিত হইয়াছে। কর্ম্মঠ, বৃদ্ধ, সুস্থহৃদয় পোলোনিয়াস

পোলোনিয়াস ও স্যান্‌কোপাঞ্চা।

হ্যামলেটকে অনেকটা শিশুর মত দেখেন, হ্যামলেট রাজপুত্র না হইলে হয় ত তিনি তাহাও পারিতেন না। তিনি হ্যামলেটের উপর বিশ্বাসসংস্থাপনে সক্ষম নহেন, এবং তাঁহার নির্বুদ্ধিতাকে প্রেমের বিকার হইতে উৎপন্ন মনে করেন। যাহাদের আপন জীবনের কোনও স্থির লক্ষ্য নাই, তাহারা অন্যকে চালিত করিতে পারে না, তাই সাধারণ লোকেরা হ্যামলেটকে ভালবাসিতে পারে না। আবার স্যান্‌কোপাঞ্চা কুইক্‌সোটের উন্মত্ততা এবং তাহার সহিত গমনে বিপদ জানিয়াও, তিনবার আপনার জন্মস্থান, প্রাণপ্রিয় পত্নী ও দুহিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করে। যাহারা প্রথমে উপহাস সহ্য করিয়াও আপন গন্তব্য পথে গমন করে, সাধারণ জনগণ তাহাকেই ভালবাসে। তাই ডনকুইকসোট সাধারণের প্রিয়।

ডনকুইকসোট সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার কল্পনাসৃষ্ট ডালসিনিয়াকে ভালবাসে; সে তাহারই কল্পনার সৃষ্টি। সে বহির্জগতের ডালসিনিয়াকে ভালবাসে না। ডালসিনিয়া অন্তর্জগতে। সে প্রেমে স্বার্থপরতা নাই, ইন্দ্রিয়বিকার নাই। তাই বলিয়াছি, সে আদর্শের দাস। সেকস্‌পীয়র

ভালবাসা।

জানিতেন যে, হ্যামলেটের ন্যায় স্বার্থপর ও অবিশ্বাসী মানবের হৃদয়ে প্রেম থাকিতে পারে না, তাই অভাগিনী ওফিলিয়া মধ্যাহ্ন তপনতাপদগ্ধ যূথিকার মত শুকাইয়া গেল। হ্যামলেট কি ভাল বাসিতে পারিতেন? তিনি আপনিই এক স্থানে ওফিলিয়াকে বলিয়াছেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি নাই"—I loved you not!

হ্যামলেট ভালর অস্তিত্বে সন্দিহান, কিন্তু মন্দের অস্তিত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান; কারণ তিনি সর্ব্বদা তাহার সহিত সংগ্রামরত। তাই দেখিতে পাই, জগতে হ্যামলেটের মত লোকেরা বুদ্ধিমান ও বিবেচক হইলেও ভাল কাজ করিতে পারে না। আর অল্পবুদ্ধি কুইক্‌সোটেরা কার্য্যসংসাধনে সর্ব্বদাই সমর্থ। তবে কি সত্যে বিশ্বাসবান হইবার জন্য মানব উন্মত্ততার

বুদ্ধি।

আশ্রয় লইবে? অন্য উপায় কি বাস্তবিকই নাই? তাহা নহে; কারণ এই উভয়ের সামঞ্জস্যই জীবিতের উপযুক্ত। হ্যামলেটের এই বিশ্বব্যাপিনী প্রিয়তার কারণ এখনকার লোকের বিষাদের দিকে ঝোঁক।

উত্তরপ্রদেশীয় কবি আপনার মধ্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হ্যামলেটের চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কারণ, উত্তরদেশীয়গণ সর্ব্বদাই চিন্তারত, বিষাদাবনত। আবার দক্ষিণদেশীয়ের হৃদয়োত্থিত স্বাভাবিক সুবিমল উচ্চ হাস্য ডনকুইক্‌সোটের প্রত্যেক ছত্রে প্রতিফলিত। দুইখানি দুইপ্রকার। এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, সেক্‌সপীয়রের ক্ষমতা কুইক-

উত্তর ও দক্ষিণ।

সোট-রচয়িতার ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক! কিন্তু তাঁহারও অসামান্য অসাধারণ অসীম প্রতিভা ছিল। সেকসপীয়র স্বর্গ মর্ত্ত সকল স্থান হইতে

রই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সামগ্রী হইতে রচনার বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার রচনায় যদি উন্মাদক কিছু না থাকে, তবে তাহাতে মহা কার্য্যের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র অভাব নাই। তাহাও পাঠককে মুগ্ধ করিতে সক্ষম। আর দুই গ্রন্থকারই এক সময়ের এবং একই দিবসে (২৬শে এপ্রিল ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ) উভয়ের মৃত্যু হয়, লোকে তাহা অবগত আছে। উভয়ের রচনাতেই মধ্যযুগের বর্ব্বর নৃশংসতার ছবি পড়িয়াছে।

সরলতা ও স্বার্থত্যাগের জন্য ডনকুইকসোট প্রসিদ্ধ, আর জটিলতা ও স্বার্থপরতা হ্যামলেটের মজ্জাগত রোগ। কুইকসোট প্রচলিত আচার ব্যবহার ও রাজারাজড়াদিগের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট, তবুও সে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী। হ্যামলেট উচ্চ, কোমল। হ্যামলেট সময় সময় কাপুরুষ এবং নৃশংস-হত্যার সহিত তাঁহার নাম লিপ্ত, কিন্তু কুইকসোট কেবল পরের জন্য সব দিয়াছে। কুইকসোট কথন অধীর নহে,—শান্ত, ধৈর্য্যপরায়ণ। হ্যামলেট অধীর, সহিষ্ণুতাবিহীন। প্রভেদ অনেক। ডনকুইকসোট-গণ দেশ আবিষ্কার করে, হ্যামলেট-গণ তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। মানব-চরিত্রের মধ্যে এই দুই ভাবই প্রচ্ছন্নভাবে প্রবহমান, এই দুই প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই মানবের কর্ত্তব্য, তাহা করাই সকলের উচিত।

চরিত্র-সমালোচনা।

নানাবিধ।

ভূতের গল্প।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসের মূল ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। আমরা জগতের সীমাবদ্ধ যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়া, কোনও বিষয়ই আজকাল আর কেবল মানিয়া লইতে চাহি না। সকল তত্ত্বকেই আজকাল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সাক্ষ্য-সাবুদ সমেত লোকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হয়; নহিলে বিজ্ঞান-গর্ব্বিত শিক্ষিতাভিমানীর মস্তিষ্কে স্থান পাইবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। কিন্তু,

> "There are more things in heaven and earth, Horatio,
> Than are dreamt of in your philosophy."

এখনকার লোকে ভূতের কথায় সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ভূতও ছাড়িবার পাত্র নহেন। মাঝে-মাঝে অবিশ্বাসীর জাগ্রত নয়ন সমক্ষে আপনার অস্তিত্ব বিলক্ষণ জাহির করিয়া যান। এইরূপ ভূতযোনির আবির্ভাবের কথা মানুষ চিরদিন শুনিয়া আসিতেছে। আর, বিজ্ঞানবাদী যাহাই বলুন, মানুষের মনের ভিতর এই বিষয়ের একটা স্বাভাবিক ভিত্তিও আছে। কবিগুরু সেক্সপীয়র তাঁহার কয়েকখানি নাটক এই ভিত্তিভূমির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন। অধুনাতন কাব্যোপন্যাসেও মাঝে মাঝে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক-নবেল, কাব্য-কল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলে, ইতিহাসেও ইহার অভাব নাই। শুনা যায়, সিজারের মৃত্যুকালে

ভূতে বিশ্বাস।

> "The graves stood tenantless and the sheeted dead
> Did squeak and gibber in the Roman streets."

আর, কিছু দিন হইল, সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই কলিকাতায় সহস্র লোকের সমক্ষে এক অসহায়া বালিকার প্রতি যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠক বোধ হয় আজিও বিস্মৃত হন নাই।

ভূমিকার বাড়াবাড়ি না করিয়া, আমরা আগষ্ট মাসের "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী" হইতে একটা

অদ্ভুত কাহিনী পাঠকদের গোচর করিতেছি। লেখক, (ডাক্তার রসেল) তাঁহার এক বন্ধুর বিষয়ে বলিতেছেন ;—

"প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, আমার বন্ধু হাইলাণ্ড প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক রাত্রি তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুর বাটীতে বিশ্রাম করিবার মানস করিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হওয়াতে, তিনি যথাকালে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া গৃহস্বামী অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিতে দিলেন। তার পর তিনি আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, বন্ধু নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী আর একটা গৃহ দেখাইয়া দিলেন। ঐ গৃহে বহু পূর্ব্বে একটা ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছিল। গৃহস্বামী সে সব কথার উত্থাপন না করিয়া কেবল বলিয়া দিলেন—'মাথার উপর ঘড়িটা বড় টক্ টক্ করে ; আপনার নিদ্রার সুবিধা হইবে না। কিন্তু উপায় নাই। অদ্য রজনী কষ্টে স্রষ্টে ঐখানেই যাপন করুন।'

ভূতের ঘরে বাসা।

"ঘড়িটার বিষম শব্দের সহিত বারোটা বাজিয়া গেল। বন্ধু পোষাক ছাড়িয়া শয়ন করিলেন। দিবসের শ্রান্তিবশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কে যেন অতি শীতল ক্ষুদ্র হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ স্পর্শ করিয়া গেল। তিনি ডাকিলেন—'কে তুমি ?' কোনও উত্তর নাই। ঘরে উজ্জল আলোক জ্বলিতেছে। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন মনে হইল, বুঝি নিদ্রিতাবস্থায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময় মশারীবন্ধনের লম্বমান সূত্রগাছটি তাঁহার মুখে আসিয়া লাগিয়া থাকিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহা হইবার সম্ভাবনা নাই। হয় ত নেংটী ইঁদুর তাঁহার মুখের উপর দিয়া সোজা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া থাকিবে। কিন্তু স্পর্শটা যে নিতান্ত শীতল ও সলিলবৎ।

ভূতের স্পর্শ।

"তখন ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয়ই অপরগৃহশায়ী কোনও যুবকের practical joke ; সেই ঘরের দরজায় গিয়া দেখিলেন, উহা বাহির হইতে রুদ্ধ। ঘরে কি ফিস্‌ফিস্ শব্দ হইতেছে, মনে হইল, কে হাসিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'আমার নিদ্রায় ব্যাঘাত করিবে না, প্রতিজ্ঞা কর ; নতুবা অদ্য রাত্রে তোমাদের আর বাহির হইবার উপায় রাখিব না।' কাহারও সাড়াশব্দ নাই। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি যে সকল ভারি ভারি জিনিষ ছিল, টানিয়া আনিয়া দরজার গায়ে জমা করিয়া রাখিলেন। পুনর্ব্বার শুইয়া আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। শব্দের মধ্যে কেবল ঘড়ীর টক্ টক্। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। আবার সেই স্পর্শ!—পাঁচটি অঙ্গুলী অতি স্পষ্টরূপে কে তাঁহার মুখের দক্ষিণ হইতে বামভাগে বুলাইয়া দিয়া গেল।

আবার আবির্ভাব!

"ক্রোধে ও বিস্ময়ে তিনি শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। রাত্রি সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে ; এই নিষ্ঠুর আমোদের জন্য এ পর্য্যন্ত কাহারও জাগিয়া থাকা সম্ভব নহে। তবুও ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন। অবশেষে, শ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া তিনি কেবল একটি গাউন্ মাত্র গায়ে জড়াইয়া, বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘরে গিয়া একটা সোফার উপর শয়ন করিলেন। অকস্মাৎ একটা বিকট আর্ত্তনাদে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলেন, উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি বাতায়নপথ বাহিয়া তাঁহার বিছানার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু এবারকার এই চীৎকারটা লৌকিক ক্রিয়া নহে। গৃহের সুন্দরী পরিচারিকা সকালবেলা জানালা খুলিতে আসিয়া

"তখন বেলা সাতটা। তথাপি বন্ধুবর বর্ত্তমান শয্যা ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত নদীতটে একটা আফিস-গৃহের আশ্রয় লইলেন। তিনি না ঘুমাইয়া ছাড়িবেন না।

"এদিকে গৃহস্বামী ভূতের ঘরে তাঁহার দর্শন না পাইয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। অনেক অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান মিলিল ;—বন্ধু রাত্রির কাহিনী সমস্ত বিবৃত করিলেন। গৃহস্বামী তখন তাঁহাকে কয়েক বৎসরের জন্য রহস্যগোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া নিম্নলিখিত ইতিহাস শুনাইলেন,—

"প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। এখানকার আরল্ মুইবেনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা আপন পরিবারের নষ্ট ঐশ্বর্য্য পূরণ করিবার মানসে, এক সম্পত্তিশালিনী যুবতীর সহিত পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। আরল্ আসিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু জননীর মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হেলেন-নাম্নী তাঁহার এক সুন্দরী জ্ঞাতিকন্যা তাঁহারই আশ্রয়ে পালিত হইতেছিল। পুত্রের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তিনি নিজে যত জানেন, হেলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক অবগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তিনি রহস্যের সন্ধানে রহিলেন। একদিন কয়েকখানা চিঠি তাঁহার হস্তগত হইল। পত্রগুলির শিরোনামায়,—'আমার একমাত্র প্রিয়তম প্রেয়সী হেলেন,' আর সহির স্থলে 'তোমার চিরপ্রেমাধীন আঙ্গস্' পাঠ করিয়া, জানিবার কিছুই বাকী রহিল না।

ভূতের গোড়া।

"কাউণ্টেস্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"সর্ব্বনাশী! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিস্! তুই এখনই আমার বাটী হইতে দূর হইয়া যা'?"

"হেলেন,—ম্রিয়মাণা অথচ গর্ব্বিতা—কহিল, 'প্রাণ থাকিতে নহে! যতদিন আঙ্গস্ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে এই গৃহের অধিকারিণী না করেন, আমি ইহা পরিত্যাগ করিব না। তাঁহার নিকট এই প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি। ঈশ্বরের চক্ষে তিনিই আমার স্বামী; আর আমিই তাঁহার পত্নী।'

"বৃদ্ধার প্রাণ আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন,—'ছুঁড়ীর ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া উহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ্। উহাকে বিউলির কুমারী-মঠে পাঠাইয়া দিব।'

"অসহায়া হেলেন পলায়নের উদ্দেশে একটা দরজা খুলিতে যাইতেছিল। বুড়ী রাক্ষসীর ন্যায় একটা তরবারি লইয়া তাহার মণিবন্ধে এরূপ আঘাত করিল যে, উহা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে অভাগিনীর দেহবন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিল। আঙ্গস্ও প্রত্যাগমনকালে তরণীসহ জলমগ্ন হইয়া প্রিয়তমার অনুগমন করিলেন।"

প্রেমিক যুগলের পরিণাম কি হৃদয়ভেদী!

ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসন্।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যন্ত্রণাময় জীবন-সংগ্রামের সময়ে, দর্শন-বিজ্ঞানের বিকট বিভীষিকাময় কালে, কবিতা রচনা করিয়া টেনিসনের যেরূপ যশোলাভ হইয়াছে, তেমন বুঝি আর কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। ক্ষুদ্র দ্বীপের নিভৃত-নিবাস-নিবাসী, দীর্ঘকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু, সরলস্বভাব কবির বীণাঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া,

কার্য্যব্যবসায়ী, কর্ম্মপূজক ইংরাজ তাহার হৃদয়ের হৃদয় হইতে টেনিসনকে যে পূজা দিয়াছে, তেমন পূজা সে বুঝি আর কাহাকেও দেয় নাই; পাউণ্ডপূজক ইংরাজের কঠিনতার কঠোর আবরণাবৃত হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে তবে এত কোমলতা, এত গুণগ্রাহিতা, এত সৌন্দর্য্যবোধ, এত মাধুরীর স্বপ্ন লুকাইয়াছিল! টেনিসনের কবিতা সঞ্জীবনমন্ত্রের মত তাহাদের সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল। টেনিসনের কবিতার এই অতিরিক্ত, অসম্ভব আদর কেন?

কবিতা সময়ের উপর নির্ভর করে। যখন কোনও দেশব্যাপী আনন্দোৎসবে দেশবাসীগণের হৃদয় আনন্দময় থাকে, সেই সময়ে রচিত সকল কবিতার মধ্যে আনন্দের এক অন্তঃসলিল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। চসার ইংলণ্ডের "কবিপিতা" বলিয়া গণ্য হয়েন। যে সময় তাঁহার কবিতা সকল লিখিত হইয়াছিল, সে সময় ইংলণ্ডবাসীগণ কয়েকটি প্রধান যুদ্ধে জয় লাভ করে; সেই কারণে, তখন তদ্দেশীয়দিগের হৃদয় আনন্দপূর্ণ ছিল। এবং সেই দেশব্যাপী আনন্দ-তরঙ্গের শেষ অভিঘাত চসারের কবিতায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার কবিতায় উত্তেজক কিছুই নাই; তাহা স্নিগ্ধ মধুর—নিস্তব্ধ, নির্ম্মল, অমল ধবল নৈশ চন্দ্রকিরণের মত। চসারের পর, তাঁহারই কবিতার ধরণে ইংলণ্ডে কবিতা রচিত হইতে লাগিল। পোপ, গোল্ডস্মিথ্ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাহার পর, য়ুরোপের রাজনৈতিক আকাশে এক প্রবল প্রলয়-ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গেল। ফ্রান্স সেই বিপ্লবের জননী—ফ্রান্সেই তাহার উৎপত্তি, ফ্রান্সেই তাহার লয়।

সত্য বটে, ফরাসী-বিপ্লব ফ্রান্সে উৎপন্ন হইয়া ফ্রান্সেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে বিপ্লব কেবল ফ্রান্সকে বিপর্য্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। য়ুরোপের অন্য দুই এক ভাগেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। যে বিপ্লবতরঙ্গে ফ্রান্সের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক, সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটি আঘাত যে পার্শ্ববর্ত্তী ইংলণ্ডেও পড়িবে না, ইহা সম্ভব নহে। সেলী ও বায়রণ, এই দুইজন কবিই প্রকৃতপক্ষে ফরাসী-বিপ্লবের কবি। তাঁহাদিগের কবিতায় স্নিগ্ধমধুর ভাবের পরিবর্ত্তে এক উন্মাদক, জ্বালাময়, অগ্নিময় ভাব দৃষ্ট হয়। তাহা অগ্নিশিখার মত; কিন্তু তাহার সেই উন্মাদক ভাব আপাততঃ ভীষণ উন্মাদক হইলেও বহুক্ষণস্থায়ী নহে। এই শ্রেণীর কবিদিগকে বায়রণের পদানুসরণকারী কবি বলা যায়। চসারের ধরণের ও বায়রণের ধরণের

কবি গ্রে, এই দুই শ্রেণীর কবিতার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আদি শ্রেণীর কবিতা শান্ত, স্থিরনীর গম্ভীর হ্রদের মত; তাহা শান্ত, কিন্তু তাহার গভীরতা অধিক; আর বায়রণ শ্রেণীর কবিতা খরস্রোতস্বতী নদীর মত, তাহার গভীরতা অধিক নহে, কিন্তু তাহার প্রবাহবেগ বড় ভীষণ; সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যায়।

ক্রমে ইংলণ্ডে বায়রণের আদর এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, সকল যুবক-কবিই বায়রণের অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। বায়রণের বিশেষরূপ 'জামার কলার' যুবক মহলে ব্যবহৃত হইতে লাগিল—এমন কি, বায়রণ অল্প খঞ্জ ছিলেন বলিয়া, কোনও কোনও যুবকও সেইরূপ খঞ্জ ভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উন্মাদক ভাব না থাকিলে কবিতার আদর হইত না, লোকে তাহা পাঠ করিত না। কিন্তু মানবহৃদয় পরিবর্ত্তনপ্রিয়; কালে লোকে সেইরূপ কবিতার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বের সেই আদি শ্রেণীর কবিদিগের কবিতার আদর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কাজেই সেইরূপ কবিতার, সেইরূপ সরল শান্ত, মধুর কবিতার পুনরায় প্রচলন আবশ্যক হইল। টেনিসনই প্রথম তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল সেই জন্যই তাঁহার আদর এত অধিক হয় নাই। তাঁহার আরও কতকগুলি প্রধান গুণ ছিল। তাঁহার কবিতা কেবল শান্ত, মধুর নহে, পরন্তু তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য সংযত ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি মানব-হৃদয়ের প্রেমাদি উন্মাদকারী বৃত্তি সকলকেও শান্ত পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন, সূর্য্যকিরণকে চন্দ্রকিরণে পরিণত করিয়াছেন। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাঁহার এনক-আর্ডেনে (Enoch Arden) এনক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া যখন সুখতপ্ত গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ডপার্শ্বে তাহার পত্নীর নবপতি ও তাহার পরিবার-বর্গকে দেখিতে পাইল, তখন সে যাহা বলিল, তাহাতে হাহুতাশ বা উচ্চরোদন নাই, তাহা শান্ত ও পবিত্র, এবং তাহাতে ঈশ্বরে কবির দৃঢ়বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। সে বলিল ঃ—

"এ যে অসহ্য যন্ত্রণা! কেন আমাকে তাহারা সেই নিভৃত দ্বীপ হইতে এখানে আনিয়াছিল? হে সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বর, সেই জনহীন দ্বীপে তুমি আমার হৃদয়ে বল দান করিয়াছিলে, আরও কিছুক্ষণের জন্য আমাকে বল দাও, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে বল দাও, যেন আমি তাহাকে (পত্নী অ্যানিকে) এ কথা বলিয়া না ফেলি। যেন কখনও তাহাকে এ কথা না জানিতে দিই। আমাকে সাহায্য কর, আমি যেন তাহার শান্তিতে বাধা না দি। আমার

আমি আত্মপ্রকাশ করিব না। পিতা হইয়া সন্তানের মুখচুম্বন আমার ভাগ্যে নাই। ঐ বালিকার সহিত তাহার জননীর এত প্রকৃতিগত সাদৃশ্য, আর ঐ বালক,—সে ত আমারই পুত্র!"

ইহাতে হাহুতাশ বা উচ্চরোদন নাই বটে, কিন্তু ইহার এই কোমল করুণ ভাবে ও বাক্যবিন্যাসে মানব-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সহানুভূতি ও দুঃখ জাগাইয়া তুলে। প্রেমরাজ্যে কবিদিগের বিশেষ অধিকার, তাহার শত ভাব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কবিগণ শত চিত্র অঙ্কিত করেন, কিন্তু টেনিসনের মত প্রেমকে পবিত্রতম, নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি করিয়া বুঝি আর কোনও কবিই গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

তাহার পর টেনিসনের গভীর অথচ যথাসম্ভব সরলভাব এবং সরল ভাষা। টেনিসনের সকল কবিতাতে ভাব যত গভীর হউক না কেন, ভাষা নিতান্ত সরল। তাঁহার বাক্যবিন্যাস অত্যন্ত সুন্দর। এক একটি কথায় তিনি সময় সময় হৃদয়ের সকল ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। তাঁহার আপনার ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার রচনায় সময় সময় "All the charm of all the Muses often flowering in a lonely word." দেখিতে পাই। তাঁহার বাক্যগুলি অনেক স্থানে ভাবের প্রতিধ্বনির মত শুনায়; তাঁহার শব্দগুলি এমন করিয়া সাজান যে, অর্থ ভিন্নও তাঁহার কবিতার দুই একটি ছত্র যেন স্মরণে আবদ্ধ থাকে। টেনিসন অনেক সময় প্রচলিত কঠিন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সহজ সরল পুরাতন বাক্য ব্যবহার করিতেন। মধুসূদনও তাঁহার কাব্যে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। পুনঃপরিণীতা পত্নীর নব স্বামীর গৃহসংলগ্ন উদ্যান হইতে এনকের পলায়ন, তিনি কেমন স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

"সেই জন্য,—পাছে পদতলস্থ কঙ্কর হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই ভয়ে, চোরের মত ধীরে ধীরে এনক ফিরিল, এবং পাছে মূর্চ্ছিত হইলে ভূমিতলে পতিত হইয়া তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, সেই ভয়ে, প্রাচীর স্পর্শ করিয়া চলিতে লাগিল। দ্বারের নিকট আসিয়া তাহা মুক্ত করিল, লোকে যেমন করিয়া নিঃশব্দে রোগীর কক্ষদ্বার রুদ্ধ করে, তেমনই করিয়া তাহা রুদ্ধ করিল, এবং বাহিরে আসিয়া পড়িল।"

এই বাক্যবিন্যাসেই টেনিসনের ক্ষমতা। ইহাতে অন্য কোনও ইংরাজ কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন।

চরিত্র ও চিত্র-অঙ্কণে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা এই যে, তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রে ও চিত্রে কোনও অংশই পরিত্যক্ত হয় না। ইহা তাঁহার প্রত্যেক বর্ণনীয় বিষয়েই আমরা দেখিতে পাই। তিনি বর্ণনীয় বিষয়ের সকল খুঁটিনাটিগুলি দেখিতে

পান ; সেইজন্যই তাঁহার বর্ণনা এত সুন্দর। তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে বর্ণনীয় বিষয় যেন সত্য সত্যই জীবন্ত হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, নয়নের সম্মুখে যেন সত্য সত্যই তাহার ছবি ভাসিতে থাকে, পাঠক একেবারে কবির বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। বাস্তবিক, সেই সুখময় শৈশবের অবিস্মৃত উজ্জ্বল স্মৃতির মত সেই সকল বর্ণনা পাঠকের হৃদয়ে অনপনেয় হইয়া থাকে।

টেনিসনের কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমগুলির সহিত জগতের বাস্তব সত্যের বড় সম্পর্ক নাই। মারম্যান, (The Merman) মারমেড (The Mermaid) লোটস-ইটার্‌স (The Ltos-Eaters) প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। জগতের বাস্তব সত্যের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কবিতা প্রায় হৃদয়স্পর্শী হয় না ; কিন্তু এই সকল কবিতায় টেনিসন তাঁহার রচনাকৌশল ও ভাষাবিন্যাসের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। "মারমেড" কবিতার প্রথম শ্লোকটি এইরূপ :—

"Who would be
A mermaid fair,
Singing alone,
Combing her hair
Under the Sea,
In a golden curl
With a comb of pearl,
On a throne ?"

এমন সৃষ্টিছাড়া বিষয়ের কবিতাকেও টেনিসনের মধুর শব্দবিন্যাসপ্রণালী সৌন্দর্য্যসজীব করিয়া তুলিয়াছে। টেনিসনের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব, এই সকল কবিতাতেও দৃষ্ট হয়। এই সকল কবিতায় উত্তেজনার কিছু নাই, ভাষা ও ভাব পাশাপাশি মৃদু মৃদু বহিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় তিনি মানবহৃদয়ের প্রেমাদি প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে প্রচণ্ড আবেগহীন স্নিগ্ধমধুর প্রবৃত্তি করিয়া তুলিয়াছেন। টেনিসনের লেখনীর সম্মুখে তাঁহার কল্পনারচিত মানবগণের হৃদয়ে ইহারা এক এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে মাত্র, বা আপনার কোমলতার কমনীয় আবরণান্তরালে আপনাকে পাঠকের দৃষ্টিপথের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করে। হৃদয়ের অন্য সকল সাধারণ প্রবৃত্তির মধ্য হইতে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিতে হয়। কবিও তাঁহার রচনার বিষয়ের জন্য আবশ্যক বৃত্তিটিকে কেবল একটু বিশেষভাবে বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন। "এনক আর্ডেন," "ডোরা" প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এই সকল কবিতায় সেই সকল উন্মাদকরী বৃত্তি, স্নিগ্ধ মধুরভাবে

ভাব দিয়াছিল, টেনিসন তাহা বিচ্যুত করিয়া ইহাদিগকে মৃদু, স্নিগ্ধ মধুর প্রভায় প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়গুলিই টেনিসনের গৌরবস্তম্ভের সর্ব্বোচ্চ সোপান, এইগুলিতে তিনি ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল তর্ক য়ুরোপীয় সমাজ আলোড়িত করিতেছে, সেই সকলের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

য়ুরোপে মানবগণ হয় কার্য্য, নয় আমোদ, এই উভয়ের একের পশ্চাতে ধাবিত; সেখানে অন্য কোনও কার্য্যরতদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ম্যাথু আর্ণল্ড সেখানকার লোকের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সেখানে উচ্চশ্রেণীস্থ ধনীগণ প্রায় বর্ব্বর; মধ্যশ্রেণীর মানবগণ সর্ব্বদা কেবল অর্থের পশ্চাতে ধাবিত; তাহারা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স ভিন্ন আর কিছু ভাবিবার বড় সময় পায় না; সাধারণ শ্রেণী অসভ্য এবং অজ্ঞ। টেনিসন বুঝিয়াছিলেন, কোনও জাতিতে এইরূপ ভাব বড়ই ভীষণ ও হেয়, তাই তিনি মানবগণকে নীতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বন্ধুর শোকে রচিত In Memoriam গ্রন্থই তাঁহার এতদ্বিষয়ক প্রধান রচনা। তাহা ভিন্ন তাঁহার শেষ বয়সের অনেক কবিতাই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। সে সকল এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, জগৎ এক সর্ব্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তিনি সেই জন্য বলিয়াছেন ঃ—

"I curse not nature, no, nor death ;
For nothing is that errs from law."

তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসবান ছিলেন, এবং মানবগণকেও তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসবান করিয়া ধর্ম্মপথে আনিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক বিপ্লবের সময়, তাহাও য়ুরোপে তাঁহার এত আদরের এক কারণ।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত টেনিসনের জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল যে, সুখস্রোতে গা ঢালিব না, কেবল সুখ লইয়া ব্যস্ত হইব না, কিন্তু মহৎজীবন যাপন করিব। এই সকল গুণে টেনিসনের সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার কবিতা স্থানে স্থানে সামান্য দোষে দুষ্ট হইলেও, ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার আদর এত অধিক।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাধনার" সম্পাদকতা পরিত্যাগ ও 'যোগ্যতর হস্তে সম্পাদকীয় কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া', অবসর গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—"কিন্তু একথা গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না, যে, যে পরিমাণ জনাদর প্রাপ্ত হইলে বহুব্যয়সাধ্য 'সাধনা' স্বচ্ছন্দে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিত, তাহা 'সাধনার' অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাতে হয় ত আমাদের অক্ষমতা অথবা দুর্ভাগ্য অথবা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।" সাহিত্য হিসাবে "সাধনা" সফল হইয়াছে; বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চ্চার অত্যন্ত দুরবস্থা না হইলে, "বহুব্যয়সাধ্য" "সাধনার" আকার প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইত না। সুধীন্দ্র বাবু তিন বৎসর দক্ষতার সহিত "সাধনার" সম্পাদকতা করিয়া বিদায় লইলেন,—আমরা তাঁহার যত্নে এই তিন বৎসর সাহিত্যক্ষেত্রে যে আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দি। তিনি "সাধনার" সফলতায় অপ্রত্যয় বটে, কিন্তু আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, তাঁহার "সাধনা" সিদ্ধ হইয়াছে। এবারকার "সাধনার" সর্ব্বপ্রথমে, "মেঘ ও রৌদ্র" নামক একটি গল্প। গল্পটির সহজকরুণ উপসংহারভাগ পড়িয়া চোখের পাতা আপনি ভিজিয়া আসে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ফরাসী ও ইংরাজ" প্রবন্ধটি পাঠ্যযোগ্য। "অন্তর্যামী" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা। "মেয়েলি ছড়া" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীর সভায় পঠিত হইয়াছিল,—কিন্তু রচয়িতা "সাধনায়" তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত মনে করি। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য,—আমরা গত মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার সমালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি, এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। "মেয়েলি ছড়া",—ছেলে ভুলাইবার জন্য বঙ্গগৃহলক্ষ্মীদের মুখে যে সব অদ্ভুত অথচ সরল ও সুমিষ্ট ছড়া শুনা যায়, তাহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা। সমালোচনাটি রবীন্দ্র বাবুর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ। ভাবগুলি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় প্রবাহিণীর ন্যায় ভাষার কঠিন উপলখণ্ডের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি রচনার ঝঙ্কারে পরিণত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে, সমালোচনার কিছু বাহুল্য হইয়াছে। এই সকল ছড়ায় যে কোনও বিশেষ দার্শনিক বা নৈতিক তত্ত্ব নিহিত নাই, সে কথা না বলিলেও চলিত। এই ছড়াগুলি যে রমণীদের স্বপ্নরাজ্য হইতে সংগৃহীত, [illegible]
বুদ্ধিমাত্রেরই বোধগম্য। ছেলেদের কথার ন্যায় ভাঙ্গা-চোরা ও উদ্দেশ্যরহিত [illegible]
আর্য্যসমাজের কোনও প্রাচীন সত্য সংমিশ্রিত আছে, ইহা ভাবিবার লে[illegible]
বাঙ্গালীর মধ্যেও বোধ করি নিতান্ত বিরল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রবীন্দ্র বা[illegible]
অনুমোদন করি। ছেলেদের কাছে আমাদের দেশের মা সরস্বতী নিতান্ত [illegible]
অত্যাচারে ও আবদারে বালকেরা নিতান্ত শীর্ণ। পড়াশুনার মধ্যে যে [illegible]
কূটবুদ্ধি নৈয়ায়িকও তাহা বালকদের বুঝাইয়া দিতে পারেন কি ন[illegible]
মান অবস্থায় কেহ যদি বালকদিগের জন্য আমোদজনক দু এক[illegible]
স্বপ্নরাজ্যের কাহিনী রচনা করেন, তিনি বঙ্গীয় বালকবালিকা[illegible]
কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। বঙ্গভাষায় Fairy taleএর সৃষ্টি হ[illegible]
পক্কতার স্রোত কথঞ্চিৎপরিমাণে নিবারিত হইবে। শ্রীযুক্ত [illegible]
বর্ষে" এখনও চলিতেছে। [illegible]যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বর্গ[illegible]

না। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের "নিজাম আলীর দর্পচূর্ণ" একটি অতি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ" একটি উপকারী ও শিক্ষাপ্রদ রচনা।

ভারতী। আশ্বিন। এবারকার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "আকবরসাহের হিন্দুপ্রীতি"—দ্বিতীয় প্রস্তাব; এখনও সমাপ্ত হয় নাই। সদারঙের খেয়াল—স্বাক্ষরিত "গোলাপি কাণ্ডারি" বেশ হইয়াছে। স্থানে স্থানে জেঠামি কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, লেখকের রচনায় মুন্সিয়ানা আছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত" এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। "ভুল" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি সেন্টিমেন্টাল কবিতা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "চক্র" এবারও আছে, বোধ হয়, এখানি বড় উপন্যাস হইবে। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "সৌরপ্রতিকরণ" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "সমুদ্রলঙ্ঘন" একটি কষ্টকল্পিত রসিকতা—সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া, কোনও অজ্ঞাত লেখক ছদ্মবেশে এই বানর-সংবাদ রচনা করিয়াছেন। আমরা ইহার প্রশংসা করিতে অক্ষম। "মুদ্রাবিপ্লব ও ভারত গবর্ণমেণ্ট" একটি রাজনৈতিক রচনা। নামেই প্রবন্ধের বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। "বদরিনাথ" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত; বেশ হইয়াছে।

সমীরণ। দ্বাদশ সংখ্যা। এবারকার প্রথমে "প্রাইভেট টিউটারের দুঃস্বপ্ন" নামক একটি গল্প;—'গল্প' না বলিয়া 'নক্সা' বলিলে বোধ করি আরও সঙ্গত হয়। রচনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। ভাষা ও রচনায় বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। গল্পাংশের অনুপাতে স্থলবিশেষে বর্ণনা অতিরিক্ত ও খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি প্রশংসনীয়। মোটের উপর, লেখকের রচনা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। "ধর্ম্ম-সাধনা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" এবারও প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা। "শিশুপালন" প্রবন্ধে ভাল করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা উচিত। "শ্রীমা"-স্বাক্ষরিত "শুভযাত্রিক" কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিল না। মূক ও বধির বিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ আছে, ইহার উদ্যোগীগণও প্রশংসার্হ, এবং উক্ত বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক মূক বধিরদের শিক্ষাদানপ্রণালী শিক্ষা করিতে বিলাত যাত্রা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার বিলাত-গমন উপলক্ষে, "ভারতমাতা" "বঙ্গলক্ষ্মী" "বঙ্গবালা" প্রভৃতিকে কবিতায় জড় না করিলে চলিবে না, এ কেমন কথা? প্রত্যেক বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিতা লিখিতে ...তার অপব্যবহার হয় মাত্র। বিষয়নির্ব্বাচনের উপর অনেক নির্ভর করে।

ভ্রমসংশোধন।

...ক সাহিত্যে" বঙ্গীয় "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার" সমালোচনায় আমরা ...পত্রিকায় প্রকাশিত "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধটি আলবার্ট হলের ...কিন্তু সম্পাদক তাহার উল্লেখ করেন নাই। পরে দেখিলাম, সম্পা- ...খ করেন নাই বটে, কিন্তু "সাময়িক প্রসঙ্গে" এ কথা স্বীকার ...নক্রমে তাহা দেখি নাই। সুতরাং এই অনবধানের জন্য আমরা ... প্রবন্ধটি বক্তৃতার পূর্ব্বে যে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া- ...র কোনও কারণ নাই—অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য ...পাদক।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত "নূতন তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। * উমেশ বাবু যে একখণ্ড নূতন তাম্রশাসনের বিবরণ প্রথমেই বাঙ্গলা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের দ্বারা যে সকল তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে, সে সকল ইংরেজী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উমেশ বাবু সেই প্রাচীন প্রথা পরিহার করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের সহিত তাম্রফলকের একখণ্ড "লিথো" কিম্বা "ফটোজিংকোগ্রাফ" প্রকাশিত হইলে, প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। কারণ, আমাদের বিবেচনায়, উমেশ বাবুর উদ্ধৃত পাঠের স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। প্রবন্ধের সহিত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি গ্রথিত থাকিলে, আমরা তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে পারিতাম; কিন্তু এক্ষণে আমাদিগকে সম্পূর্নরূপে উমেশ বাবুর উদ্ধৃত পাঠে নির্ভর করিতে হইবে।

উমেশ বাবুর মতে এই তাম্রফলক ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। আমাদের বিবেচনায়, ইহা দেবোত্তরের সনন্দ। সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের এক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। অন্যান্য তাম্রশাসন দেখিলেই উমেশ বাবু ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন, কিন্তু "নারায়ণ ভট্টারক" অর্থাৎ নারায়ণ দেবতাকে "বেণীসংহার"-প্রণেতা ভট্টনারায়ণ বলিয়া অবধারণ করিবার জন্য তিনি এরূপ অধিক মাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালের জন্যও সেই সকল বিষয় তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণদিগকে যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মোত্তর আখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মোত্তরের সনন্দগুলি সর্ব্বত্রই এক প্রণালীতে লিখিত। যথা—গোত্র, প্রবর, বেদ ও তদন্তর্গত শাখা দ্বারা পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক পিতা, পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া, গ্রহীতার নাম লিখিত হইত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকখণ্ড তাম্রশাসনের সেই সেই অংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অন্যান্য রাজ্যের অধিপতিবর্গের তাম্রশাসন পাঠ করিবার পূর্ব্বে, বাঙ্গলার প্রাচীন সনন্দগুলির আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

---

* সাধনা; ১৩০১ বঙ্গাব্দ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

বাঙ্গলার সেনরাজগণের ক্ষোদিত লিপিসমূহের মধ্যে তিনখানি ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। দুইখানি মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন। অন্য একখণ্ড কেশবসেনদেবের সনন্দ। লক্ষ্মণসেনের তপনদীঘির তাম্রশাসনে লিখিত আছে ঃ—

"হুতাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মর্কণ্ডদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভারদ্বাজসগোত্রায় ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরায় সামবেদকৌথুমিশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরথমহাদানাচার্য্যশ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথমহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।" *

"ভগবান শ্রীমৎনারায়ণ দেবতার উদ্দেশে মাতাপিতা এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য" মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব সনন্দের লিখিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের সুন্দরবনের তাম্রশাসনেও এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে গ্রহীতার পরিচয়স্থলে লিখিত আছে যে, "জগদ্ধর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, নারায়ণধর দেবশর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহধর দেবশর্ম্মার পুত্র, গার্গ-গোত্রজ, অঙ্গিরা-বৃহস্পতি-শিনি-গর্গ-ভরদ্বাজ-প্রবর, 'ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শান্ত-শাবিক' শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে, মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যযশোবৃদ্ধিকামনায় বিধিবদুদকপূর্ব্বক, ভগবান শ্রীমৎনারায়ণ দেবতার উদ্দেশে" ভূমিদান করিলাম।

মহারাজ কেশবসেনের তাম্রশাসনেও প্রায় ঐরূপ বর্ণনা দেখা যায়। ঘটনাক্রমে সম্প্রতি প্রাচীন ত্রিপুরাপতিগণের প্রদত্ত অনেকগুলি বাঙ্গলা তাম্রশাসন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সে সমস্তই ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। সেই সকল তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "৺বিষ্ণুপ্রীতে" অমুক ব্রাহ্মণকে এত দ্রোণ ভূমি দান করিলাম। সুতরাং ইহা পরিষ্কাররূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃতে "ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য," বাঙ্গলায় "৺বিষ্ণুপ্রীতে" শব্দ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রীতে শব্দের আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, নারায়ণ কিম্বা অন্য দেবতার নামে ভূমি উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করাই প্রথা ছিল।

পালবংশীয় নরপতিবর্গের অনেকগুলি ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানিমাত্র ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। "এসিয়াটিক রিসার্চ" নামক সাময়িক পত্রিকার প্রথম খণ্ডে, মহারাজ দেবপালদেবের যে তাম্রশাসনের অনুবাদ

* J. A. B. B. XLIV. p. 12.

ও বিবরণ সার চার্লস উইলকিন্‌স কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে জানা যায় যে, ভট্টবিশ্বরথের পৌত্র, ভট্টবৃহদ্রথের পুত্র, ঔপমানব্যগোত্র * ঋগ্বেদ আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ভট্টবিষ্ণুরথকে কুমিলার অন্তর্গত মিসিকগ্রাম দান করা হইয়াছিল।

বিজ্ঞবর হরন্‌লী সাহেব আমাগাছির তাম্রফলকের যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, মহারাজ নরপালের পুত্র মহারাজ বিগ্রহপালদেব বেদান্তউপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র শাণ্ডিল্যগোত্র সামবেদকৌথুমি-শাখাধ্যায়ী, ব্রহ্মচারী (খোভূত) দেবশর্ম্মাকে "ভগবন্ত (বু) দ্ধ ভট্টারক উদ্দিশ্য" ভূমি দান করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত তাম্রশাসনে আমরা নারায়ণভট্টারকের পরিবর্ত্তে "বুদ্ধভট্টারক" শব্দ পাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে ভট্টারক-শব্দের আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, তাম্রশাসন কিম্বা প্রস্তরলিপিসমূহে কেবল রাজা ও দেবতার নামের সহিতই ইহার সংযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা শত ক্ষোদিত লিপি হইতে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। ক্ষোদিত লিপিসমূহে ব্রাহ্মণদিগের নামের সহিত ভট্ট, আচার্য্য, উপাধ্যায় কিম্বা মহামহোপাধ্যায় পদ সংযুক্ত রহিয়াছে। "ভগবান" ও "ভট্টারক" পদ কোনও ব্রাহ্মণের নামের সহিত সংযুক্ত থাকার একটি উদাহরণ, উত্তর ভারতে উমেশ বাবু তাম্রশাসন কিম্বা শিলালিপি হইতে দেখাইতে পারিবেন না। †

ব্রহ্মোত্তরের সনন্দগ্রহীতার যেরূপ বর্ণনা করিবার প্রথা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল, বাঙ্গলার পাল ও সেন রাজগণের পাঁচ খণ্ড তাম্রশাসন হইতে তাহা প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য প্রদেশের অধিপতিবর্গের তাম্রশাসন হইতেও এরূপ বর্ণনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বাহুল্যবিবেচনায় আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

উমেশ বাবুর প্রকাশিত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

---

* ঔপমানব্য বাৎস্যগোত্রের শাখা। (C. I. I. III. 199.)

† উমেশ বাবু টানিয়া বুনিয়া দুইটি উদাহরণ দক্ষিণাপথ হইতে আমাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিতে পারেন। কয়েকজন জৈন গুরুর নামের সহিত "ভট্টারক" ও "ভট্টারকমুনি" শব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। লাটদেশীয় পাশুপত সম্প্রদায়ের আদিগুরুকে শিবাবতার বলিয়া „ভট্টারক" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নামের সহিত "ভগবান"-শব্দ সংযুক্ত নাই।

"মতমস্তু ভবতাং।

"মহাসামন্তাধিপতিশ্রীনারায়ণবর্ম্মণা দূতকযুবরাজশ্রীত্রিভুবনপালমুখেন বয়মেবম্ বিজ্ঞাপিতাঃ যথাঽস্মাভির্ম্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলিং কারিতস্তত্র প্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নুন্ননারায়ণভট্টারকায় তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদমূলসমেতায় পূজোপস্থানাদিকর্ম্মণে চতুরোগ্রামান্ অত্রত্যহট্টিকাতলবাটকসমেতান্ দদাতু দেব ইতি।"

"ততোঽস্মাভিস্তদীয়বিজ্ঞপ্ত্যা এতে উপরিলিখিতকাশ্চত্বারো গ্রামাস্তলবাটকহট্টিকাসমেতাঃ স্বসীমাপর্য্যন্তাঃ সোদ্দেশাঃ সদশাপচারাঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যাঃ। পরিহৃতসর্ব্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং তথৈব প্রতিষ্ঠাপিতাঃ।"

মূলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ইহার এইরূপ অনুবাদ করিলাম।

"তোমরা অবগত হও।

"মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মা কর্তৃক দূতস্বরূপ যুবরাজ ত্রিভুবনপালের মুখে আমরা (ধর্ম্মপাল) এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছি যে, 'আমা (নারায়ণ বর্ম্মা) কর্তৃক মাতা পিতা ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য শুভস্থলীতে একটি দেবকুল (দেউল) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাতে স্থাপিত ভগবান্ নুন্ননারায়ণ ভট্টারক (দেবতা) কে তাঁহার প্রতিপালক (পরিচর্য্যাকারক) লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ও দেবপূজক প্রভৃতি পরিচারকের সহিত পূজা ও উপাসনাদি কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য তথাকার হাট বাট খাল ইত্যাদির সহিত চারিখানা গ্রাম, মহারাজ দান করুন।'

"সেই হেতু আমার (ধর্ম্মপাল) দ্বারা তাঁহার (নারায়ণবর্ম্মার) বিজ্ঞাপন অনুসারে উপরের লিখিত স্বসীমান্তর্গত চারি খানা গ্রাম হাট বাট খাল ইত্যাদি ও সর্ব্বপ্রকার ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত, আমাদের গ্রহণীর কর প্রভৃতি রহিত করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন পরিহার পূর্ব্বক, চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ে' * সেইরূপ প্রদত্ত হইল।"

ইহা দ্বারা তাম্রশাসনের মর্ম্ম আমরা এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি নারায়ণবর্ম্মা শুভস্থলী নামক স্থানে এক দেবকুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "নুন্ননারায়ণ" নামক এক (বিষ্ণু) দেবতা স্থাপন করেন। তিনি সেই দেবতার সেবা পূজা প্রভৃতির নির্ব্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য, লাটদেশীয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত সামন্ত নরপতি নারায়ণ বর্ম্মা, যুবরাজ ত্রিভুবন পালের দ্বারা, দেবতার সেবা পূজার ব্যয় এবং পূজক প্রভৃতির জীবিকানির্ব্বাহের জন্য, চারি খানা গ্রাম নিষ্কর প্রদান করিবার কারণ ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ,

* প্রায় সকল দানপত্রেই "ভূমিচ্ছিদ্র" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার বুলার ইহার অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন—"কৃষিযোগ্যা ভূঃ"।

অন্যান্য তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সামন্ত নরপতিবর্গের এরূপ নিষ্করভূমিপ্রদানের অধিকার ছিল না ; এজন্য নারায়ণবর্ম্মা ধর্ম্মপালের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল নারায়ণবর্ম্মার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উমেশ বাবু লিখিয়াছেন :—

"তাম্রশাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা বাঙ্গলাদেশে * শুভস্থলী নামক স্থানে রাজা ধর্ম্মপালের মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মা এক দেবকুল বা দেউল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার লাটদেশীয় কতকগুলি দ্বিজের উপর ন্যস্ত করেন, এবং ভট্টনারায়ণ উক্ত দ্বিজগণের স্থানে অতিথিস্বরূপ আগমন করেন। লেখার ভঙ্গীতে উক্ত লাটদেশীয় দ্বিজেরা বিশেষ গণ্য মান্য ও পূজ্য লোক ছিলেন বোধ হয় ; কেন না অভ্যাগত ভট্টনারায়ণ "তৎপ্রতিপালক লাট দ্বিজ দেবার্চ্চকাদি" পাদমূল সমেত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "পাদমূলসমেত" শব্দে উক্ত ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণের গুরুশ্রেণীর লোক ছিলেন বিবেচনা করিতে হইবে।"

উল্লিখিত ব্যাখ্যা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অসমীচীন বোধ হইতেছে ; কারণ,—

দেবকুলে একটি দেবতা থাকা আবশ্যক ; নচেৎ দেবকুল হইতে পারে না। দেবতা স্থাপিত না হইলে দেবার্চ্চকের প্রয়োজন কি ? দেবতা না থাকিলে পূজা উপাসনাদি কাহার হইবে ? মাতাপিতা এবং নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য কেবল একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলে চলে না, তাহাতে দেবতাস্থাপন করা চাই।

নারায়ণভট্টারক যদি নারায়ণভট্ট হয়েন, তাহা হইলে, "তত্র (অর্থাৎ সেই দেবালয়ে) প্রতিষ্ঠাপিত ভগবন্নন্নারায়ণভট্টারকায়" এই সমস্ত অর্থাৎ সমাসযুক্ত সুদীর্ঘ পদের সম্পূর্ণ অর্থ উমেশ বাবু কি স্থির করেন, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। যদি ভট্টনারায়ণ কবিকে ভূমিদান করা হইয়াছিল বলা হয়, তাহা হইলে "পূজোপস্থানাদিকর্ম্মণে" শব্দ ব্যবহার করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?

"পাদমূলসমেত" কথার অর্থ উমেশ বাবু কি করেন ? আমাদের বিবেচনায়, সেই নারায়ণ দেবতার পূজক প্রভৃতি পরিচারকবর্গকেই "পাদমূল" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ দেবতার সেবা পূজার ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে, সেইরূপ সেই চারি খানা গ্রামের উপস্বত্ব দ্বারা দেবপূজক প্রভৃতি পরিচারকবর্গেরও জীবিকানির্ব্বাহ হইবে। পরিচারকবর্গ-

কেও সেই দেবতার এক একটি অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নিকৃষ্ট অঙ্গবোধে "পাদমূল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

নারায়ণভট্ট-নামক ব্যক্তিকে যদি চারি খানা গ্রাম দান করা হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মোত্তরের সনন্দের নিয়মানুসারে, নারায়ণভট্টের পিতা, পিতামহের নাম এবং গোত্রপ্রবরাদি অবশ্যই তাম্রশাসনে লিখিত হইত।

দেবল ব্রাহ্মণ হইতে অভ্যাগত নারায়ণ ভট্টকে উমেশ বাবু নিকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ সেই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই তিনি কেবল রাজা, দেবতা ও তপঃপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত স্বামিত্ব-বোধক উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার উক্তিসমূহ পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে। কি আশ্চর্য্য, সেই দেবল ব্রাহ্মণদিগের শিষ্যশ্রেণীর লোক নারায়ণ "ভগবান" ও "ভট্টারক" বলিয়া বর্ণিত হইলেন!

বেণীসংহারনাটক-রচয়িতা ভট্টনারায়ণ মহারাজ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক হইতে পারেন? তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু উমেশ বাবু যে তাঁহাকে তাম্রশাসনের লিখিত "নারায়ণ ভট্টারক" নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইতেছে। উমেশ বাবু বলিয়াছেন যে, "পঞ্চালরাজ ভট্টনারায়ণের গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিলেন না, এজন্য তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের নিকট গমন করিলেন।" পাটলীপুত্র নগরে ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। তিনি এক লম্ফে কান্যকুব্জ হইতে একবারে পুণ্ড্র-বর্দ্ধনে উপনীত হইলেন; তত্রত্য সামন্ত নরপতি নারায়ণ বর্ম্মা বেণীসংহারের অভিনয়দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে চারি খানা গ্রাম দান করিবার সঙ্কল্প করিয়া, যুবরাজ ত্রিভুবনপালের দ্বারা ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বেণীসংহার লইয়া যে ভট্টনারায়ণ ধর্ম্মপালের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখই হইল না। অথচ উমেশ বাবু বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্বদেশে বেণীসংহারের সমাদর না হওয়াতে, ভট্টনারায়ণ সেই গ্রন্থ লইয়া, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের নিকট আসিয়াছিলেন। উমেশ বাবুর লেখা অনুসারে, ভট্টনারায়ণ স্বকৃত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ চারি খানা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাম্রশাসনে তাঁহাকে "কবি" বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই,—তাহাতে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তাম্রশাসনের লিখিত নারায়ণ ভট্টারক কথনই বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্টনারায়ণ হইতে পারেন না।

পালবংশীয় নরপতি মহারাজাধিরাজ নারায়ণপালদেবের এইরূপ এক খণ্ড দেবোত্তরের সনন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ নারায়ণপালদেব কাশপোত নামক স্থানে স্বয়ং "সহস্রায়তন" (ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের মতে সহস্র দেবমন্দির) নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "ভগবতঃ শিবভট্টারক (শিবদেবতাকে) কে" প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, পরিষদ (অর্থাৎ পরিচারক) পাশুপত আচার্য্যকে নিযুক্ত করিয়া, সেই দেবতার "পূজা-বলিচরুসত্র" ইত্যাদি নির্ব্বাহের জন্য, মুকুতিকা গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ভ্রমাত্মক অনুবাদ দেখিয়া উমেশ বাবু "ভগবতঃ শিবভট্টারক" কে শিবভট্ট-নামক ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় উপরিলিখিত অংশের অনুবাদ করিয়াছেন,—

"Narayan-pala-Deva himself has established thousands of temples and where he has placed the honorable Siva Bhatta and Pasupati Acharya."

পুরাতত্ত্ববিভাগে মিত্র মহোদয় বঙ্গীয় লেখকদিগের পথপ্রদর্শক। তাঁহার জীবিতাবস্থায় আমরা বিবিধ প্রবন্ধে তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করি নাই; কিন্তু এখন তিনি স্বর্গগত, এক্ষণে তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের কথা উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর কার্য্য। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তৎকৃত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের অনুবাদ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। "ভগবতঃ শিবভট্টারককে" Honorable Siva Bhatta লেখা সঙ্গত কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও অনুবাদ, তিনি প্রথমতঃ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর, তাহা তাঁহার Indo-Aryans গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পশ্চাৎ পুনর্ব্বার আমাদিগকে নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

আমরা উমেশ বাবুকে "সিয়াদোনীর শিলালিপি" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত শিলালিপিতে "শ্রীবিষ্ণুভট্টারক," "শ্রীনারায়ণভট্টারক," "বামনস্বামীদেব" এবং "চক্রস্বামীদেব" প্রভৃতি দেবতাকে ভূমি দান করা হইয়াছে। উক্ত শিলালিপির অনুবাদক ডাক্তর কিল্‌হরণ তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"From the above abstract it will appear that most of the donations recorded here were made in favour of the god Vishnu, under the name of *Vishnu-bhattaraka, Narayana-bhattaraka,* Vamanasvamideva and Chakrasvamideva."—*Fpigraphia Indica ;* Vol. I. p. 168.

"সিউকি" (হিয়োণসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত) গ্রন্থপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হিয়োণসাঙের ভারতভ্রমণের অল্পকাল পূর্ব্বে নেপালে অংশুবর্ম্মণ নামে এক নরপতি ছিলেন। * উক্ত নরপতির নামাঙ্কিত কতকগুলি ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েক খণ্ড শিলালিপির আরম্ভে এইরূপ বর্ণনা আছে,—"ভগবৎপশুপতিভট্টারকপাদানুগৃহীতো বপ্পপাদানুধ্যাতঃ অংশুবর্ম্মা-কুশলী।" আমাদের স্বদেশীয় পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র "ভগবতঃ শিবভট্টারক" শব্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন—Honorable Siva Bhatta. আর বিদেশী পণ্ডিত ডাক্তার ভুলার উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ করিয়াছেন,—

"The illustrious Amsuvarman, who has been favoured by the feet of *the divine Lord Pasupati* and meditates on the feet of Bappa.—*Inscriptions from Nepal.* pp. 7, 8, 9, 10,)

১১৯ খৃষ্টাব্দে শিবদেব নামক নরপতি নেপাল শাসন করিয়াছিলেন। কাট-মুণ্ডের অন্তর্গত লগনতোল নামক স্থানস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরগাত্রে উক্ত শিব-দেবের যে ক্ষোদিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম তিনটি পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"ওঁ স্বস্তি শ্রীকৈলাসকূটভবনাৎ লক্ষ্মীলতালম্বনকল্পপাদপো ভগবৎপশুপতিভট্টারকপাদানু-গৃহীতো বপ্পপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীশিবদেবকুশলী।"

ডাক্তার ভুলার ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"Om. Hail ! From the famous palace (called) Kailaskuta ! The supreme Lord and great king of kings illustrious Sivadeva, who resembles a tree of Paradise to which the creeper, Fortune, clings, who has received favour from the feet of *the lord, the divine Pasupati,* and meditates on the feet of Bappa,"—*Inscriptions from Nepal.* pp. 13, 14.

উচ্ছকল্প মহারাজ সর্ব্বনাথের ১৯৩ (গুপ্ত) অব্দের তাম্রশাসনে "প্রতিষ্ঠা-পিত" দেবতার "বলি, চরু, সত্র, গন্ধ, ধূপ, মাল্য, দীপ" প্রভৃতি দান জন্য ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে "ভট্টারক" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। †

মগধাধিপতি মহারাজাধিরাজ (দ্বিতীয়) জীবিত গুপ্তের "দেওবরণার্কের" ক্ষোদিত লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহারাজ বালাদিত্য বরুণিকা নামক

---

* Beal's Si-yu-ki. Vol. II. p. 81.

† Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 127.

গ্রাম বরুণবাসী নামক দেবতাকে দান করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই দেবতার নাম "ভগব-শ্রীবরুণবাসী ভট্টারক" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। *

তাম্রশাসন কিম্বা শিলালিপিতে যেস্থানে কোনও নামের পূর্ব্বে "ভগবান" এবং অন্তে "ভট্টারক" শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই নামটি যে কোনও দেবতার নাম হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহের আলোচনা করিলে, উমেশ বাবু অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আপাততঃ এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

উমেশ বাবু ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের "লাটদ্বিজ" পদের "লাট" শব্দ লইয়া কিছু গণ্ডগোল করিয়াছেন। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমরা বিবিধ ক্ষোদিত লিপিতে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ দর্শন করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ দুই একটির কথা উল্লেখ করিব।

চেদীরাজ্ঞী অহ্লণদেবীর ভেরাঘাঠের ক্ষোদিত লিপিতে "লাটবংশীয় পাশুপততপস্বী রুদ্ররাশির নাম গ্রথিত রহিয়াছে। † (লাটান্বয় পাশুপত-তপস্বী শ্রীরুদ্ররাশি—। ৩১ শ্লোক।)

বিরিঞ্চিপুরের নিকটবর্ত্তী এক দেবমন্দিরের ক্ষোদিত লিপিতে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। ‡

লাটদেশীয় ব্রাহ্মণেরা যে তদানীন্তন আর্য্য-সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। §

উমেশ বাবুর মতে লাটদেশ কান্যকুব্জের নামান্তর এবং প্রাচীন পঞ্চালের একাংশ। আমাদের বিবেচনায়, উমেশ বাবুর এই মত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের মতের সমর্থক প্রমাণ প্রদর্শনের পূর্ব্বে, এ সম্বন্ধে উমেশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিব।

উমেশ বাবু কুলাচার্য্যদিগের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আদিশূরের সময়ে "বিশিষ্টবিপ্রনিলয় কোলাঞ্চদেশ" হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কান্যকুব্জ ও কোলাঞ্চ অভিন্নদেশ। কিন্তু কোলাঞ্চ যে লাটদেশের অন্য নাম, উমেশ বাবু তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

---

* Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 216.
† Epigraphia Indica Vol. II. p. 13.
‡ South-Indian Inscription. Vol. I. pp. 82, 84.
§ Epigraphia Indica Vol. I. p. 156.

মন্দসরের শিলালিপির কথা উমেশ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত শিলালিপির প্রতিকৃতি (Photo-Lith.), প্রতিলিপি ও অনুবাদ ফ্লিট্ সাহেব প্রথমতঃ Indian Antiquary পত্রিকার পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. III গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠা হইতে ৮৮ পৃষ্ঠায় উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

উক্ত শিলালিপির ত্রয়োদশ পংক্তিতে লিখিত আছে,—

চতুঃসমুদ্রান্তবিলোলমেখলাং সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীং কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি॥

চতুঃসমুদ্রের প্রান্তরেখা যাহার চঞ্চল মেখলা, সুমেরু ও কৈলাস পর্ব্বত যাহার বৃহৎ পয়োধর, বিকসিত বনকুসুম যাহার হাস্য, তাদৃশ সুন্দরীরূপা বসুন্ধরাকে কুমারগুপ্ত যৎকালে শাসন করিতেছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই কুমারগুপ্ত কে? ফ্লিট সাহেব কুমারগুপ্তকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং স্কন্দগুপ্তের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ফ্লিট সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, ভূগর্ভ হইতে একটি মুদ্রা প্রকাশিত হইয়া তাঁহার যুক্তিতর্কের কিয়দংশ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গিয়াছে। * উক্ত মুদ্রা অবলম্বন করিয়া গুপ্তবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী লিখিত হইল।

মহারাজা শ্রীগুপ্ত।
|
মহারাজা শ্রীঘটোৎকচ।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত, মহাদেবী কুমার দেবী।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্ত, মহাদেবী দত্ত দেবী।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়), মহাদেবী ধ্রুবদেবী।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত, মহারাণী অনন্তদেবী।
|
মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত। — মহারাজাধিরাজ পুরগুপ্ত, মহাদেবী শ্রীবৎসাদেবী।
|
মহারাজাধিরাজ নরসিংহ গুপ্ত, মহাদেবী শ্রীমতী দেবী।
|
মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্ত (দ্বিতীয়)

ফ্লিট সাহেব, মন্দসরের শিলালিপিতে ৪৯৩ মালবসম্বৎ প্রাপ্ত হইয়া টমাস, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত অগ্রাহ্য করিয়া, গুপ্তরাজগণের যে সময়াবধারণ করিয়াছিলেন, মন্দসরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তকে দ্বিতীয়

* Journal Asiatic Society, Bengal. Vol, LVIII. part I. p. 89

কুমারগুপ্ত অবধারণ করিলে, ফ্লিট সাহেব কিরূপে যে তাহার যুক্তি তর্ক স্থির রাখিবেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এস্থলে সে তর্ক উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন। মন্দসরের শিলালিপিতে লিখিত কুমারগুপ্ত, প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, যিনিই হউন না কেন, তাঁহার শাসনকালে "লাট" (আমাদের বিবেচনায় লাঢ়) দেশ হইতে এক দল পট্টবস্ত্রবয়নকারী তন্তুবার দশপুর নগরে গিয়া বাস করেন। উক্ত তন্তুবায়গণ সুচিক্কণ ও সুবিচিত্র পট্টবস্ত্র বয়নে সুনিপুণ ছিলেন। তাহারা সেই দশপুর (মন্দসর) নগরে এক সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত তন্তুবারগণের আদি নিবাসভূমিতে ফ্লিট সাহেব "লাটবিষয়" পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা শিলালিপির প্রতিকৃতির ঐ স্থানটি পাঠ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি (Photo-leth, 3rd Line) অক্ষর এরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ফ্লিট সাহেব যে স্থলে "লাট" পাঠ করিয়াছেন, আমরা সে স্থলে লাঢ় পাঠ করিলে, কোনও আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, এবং আমাদের মতে সেই শ্লোকটি এইরূপ পাঠ করিতে হইবে,—

"কুসুমভরানততরুবরদেবকুলসভাবিহাররমণীয়াৎ।
লাঢ়বিষয়ান্নগাবৃতশৈলাজ্জগতি প্রথিতশিল্পা॥

লাঢ় দেশ কুসুমভারাবনত তরুরাজি দ্বারা বিশোভিত, তথায় বহুতর দেবকুল, সভা ও (বৌদ্ধ) বিহার ছিল, তথাকার পর্ব্বত সকল তরুগুল্মে আবৃত ছিল।

উমেশ বাবু বলেন, এই বর্ণনা কান্যকুব্জ দেশের পক্ষেও খাটে; তিনি বিশ্বকোষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চীনপরিব্রাজক হিয়োনসাঙের লিখিত কান্যকুব্জের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বকোষপ্রণেতা হিয়োনসাঙের বর্ণনার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। যাহা হউক, কান্যকুব্জের বর্ণনায় হিয়োনসাঙ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে,

Not far to the south of the stone *Vihara* is a temple of Sun-Deva. Not far to the south of this is a temple of Mahesara. The two temples are built of a blue stone of great lustre, and are ornamented with various elegant sculptures. (Si-Yu-Ki. Vol. I. p. 223.)

হিয়োনসাঙের বর্ণনা অনুসারে কান্যকুব্জ নগরে একটি সূর্য্যমন্দির ছিল। তদনুসারে উমেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, "লাটদেশীয় তন্তুবায়েরা কনোজের নীলপ্রস্তরনির্ম্মিত সূর্য্যমন্দিরের অনুকরণ করিয়াই দশপুরের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কেবল সূর্য্যমন্দির দর্শন করিয়াই যদি লাট (লাঢ়) দেশ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা মুলতানকেই লাট (লাঢ়) দেশ স্থির করিতে

ছিল, * কিন্তু মূলতানের সূর্য্যমন্দিরের ন্যায় এরূপ উৎকৃষ্ট প্রাচীন মন্দির অন্য কোনও স্থানে ছিল না। পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ মূলতানের সূর্য্যমন্দিরের ও সূর্য্যদেবের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

There is a temple dedicated to the Sun, very magnificient and profusely decorated. The image of the Sun-deva is cast in yellow gold and ornamented with rare gems. Its devine insight is mysteriously manifested and its spiritual power made plain to all. Women play their music, light their torches, offer their flowers and perfumes to honour it. This custom has been continued from the very fast. (Si-Yu-Ki. Vol. II. p. 274.)

প্রাচীন মুসলমান ভ্রমণকারী এবং ইতিহাস ও ভূগোল বিবরণের লেখকগণও উক্ত সূর্য্যমন্দিরের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। † মহম্মদ বিনকাসিম এই সূর্য্যদেবের গলদেশে গোমাংসহার বিলম্বিত করিয়াছিলেন।

হিয়োনসাঙের সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, দেউল, সভাগৃহ ও বৌদ্ধবিহার ছিল। ইহা দ্বারা কান্যকুব্জ ও লাঢ় দেশ অভিন্ন হইতে পারে না।

"লাঢ়বিষয়ান্ নগাবৃত শৈলাৎ" এই বর্ণনা কোনও রূপেই কান্যকুব্জের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই তরুগুল্মসমাচ্ছাদিত শৈলাকীর্ণ লাঢ়দেশ কোথায়, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

---

* ইন্দ্রপুরের (বুলান্দ সহরের অধীন ইন্দোর) সূর্য্যমন্দির, তমসানদীর তীরস্থিত (মধ্যভারতের অন্তর্গত) আশ্রমাকর সূর্য্যমন্দির, গোয়ালিয়ারের সূর্য্যমন্দির, মগধের অন্তর্গত দেববরুণার্কের (সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত) সূর্য্যমন্দিরের ক্ষোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সর্ব্বত্রই সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রস্তরক্ষোদিত সূর্য্যমূর্ত্তি, সূর্য্যধ্বজ, ও সূর্য্যরথ, বিবিধ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিবিধ রাজ্যের নরপতিগণ ক্ষোদিত লিপিসমূহে "পরমাদিত্যভক্ত" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এমন অবস্থায় কান্যকুব্জের সূর্য্যমন্দিরের অনুকরণ করিয়া দশপুরের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ অবধারণ, উমেশ বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল সূর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কোণার্কের সূর্য্যমন্দির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু তাহা ১১৬৩ শকাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া, উমেশ বাবুর প্রকাশিত মতের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিলাম না।

† ভূগোলবেত্তা ইবন হাকুল ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন:—There is an idol in the place held in great venaration by the Hindus and people from distant parts undertake a yearly pilgrimage to its temple and there expend vast sums of money. * * The idol has a human shape, and is seated with its bent in a quadrangular posture, on a pedestal made of brick and mortar. Its whole body is covered with a red skin-like Morocco leather, but its eyes

উমেশ বাবু লিখিয়াছেন যে,

"কুমারগুপ্ত কান্যকুব্জের একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট। তন্তুবায়েরা যখন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে আমরা এদেশে (দশপুরে) আসিয়াছিলাম, তখন কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, তাহারা কুমারগুপ্তের রাজ্যের প্রজা ছিল? তাহাতে লাট দেশ কি কান্যকুব্জের অন্তর্গত হইতেছে না?"

বিজ্ঞবর টমাস, কনিংহাম, স্মিথ ও ফ্লিট সাহেব বিশেষ ভাবে গুপ্তবংশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই গুপ্তরাজগণকে একমাত্র কান্যকুব্জের রাজা বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। গুপ্তরাজগণের রাজধানীর স্থিতিস্থল নির্ণয় করিবার জন্য স্মিথ সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত ক্ষোদিত লিপি ও আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া স্মিথ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাটলিপুত্র নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। * ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, But, I am still of opinion that Pataliputra has the best claim to be considered the Gupta capital. প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রিন্সেপ সাহেব প্রাচীন মুদ্রার শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া গুপ্তরাজগণের মুদ্রাকে কনোজ শাখার (Konuj series) অন্তর্গত নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তদনুসারে একটি ঐতিহাসিক ভ্রম সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন,

---

এল মাসাদি ইবন হাকুলের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিয়াছেন:—"In it is the idol also known by the name of Multan. The inhabitants of the Sind and India perform pilgrimages to it from the most distant places: they carry money, precious stones, ale-wood, and all sorts of perfumes there to fulfil their vows. (Elleot's India. By Dowson. Vol. I. p. 23.)

মোরোক্কোদেশীয় বিখ্যাত ভূগোলবেত্তা এল ইদ্রিশী, খৃষ্টানদের একাদশ শতাব্দীতে লিখিয়াছেন:—"There is an idol here, which is highly venerated by the Indian, who came on pilgrimages to visit it from the most distant parts of the country, and make offerings of valuables, ornaments, and immense quantities of perfumes. * * * It is in the human form with four sides, and is sitting upon a seat made of bricks and plaster. It is entirely covered wiih a skin like red morocco, so that the eyes only are visible. * * * The eyes are formed of precious stones and upon its head there is a gold crown set with jewels. * * The temple of this idol is situated in the middle of Multan, * * There is no idol in India or Sind woich is more highly venerated. (Elliot's India. By Dawson. Vol. I. p. 82.)

* Smith's Gold coins of the Imperial Gupta Dynasty. (J. A. S. B. LIII. I. 161.) Smith's The coinage of the Early or Imperial Gupta Dynasty of Northern India. (J. R. A. S. XXI. 56.)

The Guptas had no more to do with Kanauj than they had to do with Mathura or Gaya, or any other big city in their empire; but errors die hard, and I suppose that, because Prinsep used an incautious phrase fifty years ago, people will still fifty years hence, insist on speaking of 'the Guptas of Kanauj.

সমুদ্রগুপ্তের লাট প্রস্তরলিপি এবং মন্দসারের শিলালিপি পাঠে অনুমিত হয় যে, যে লাঢ়দেশ হইতে তন্তুবায়গণ দশপুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই লাঢ়দেশ এবং দশপুর, উভয়ই গুপ্তসম্রাটগণের সামন্ত নরপতির দণ্ডাধীন ছিল। এই লাঢ় কিম্বা লাটদেশের সহিত কান্যকুব্জের কোন সংশ্রব নাই।

বাঙ্গলাদেশের পশ্চিমাংশ অদ্যাপি আমাদের নিকট রাঢ়দেশ বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে। পালিগ্রন্থ সমূহে রাঢ়কে লাঢ় বা লাল লেখা হইয়াছে।* শকাব্দের দশম শতাব্দীর চোলরাজ "কো-পরকেশী বর্ম্মণ" নামান্তর "রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলির পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত লিপিতেও বঙ্গের পার্শ্বস্থিত উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে উত্তর রাঢ়কে "উত্তিরি লাঢ়" এবং দক্ষিণ রাঢ়কে "তক্কন লাঢ়" লেখা হইয়াছে। হিয়ানসাঙের বর্ণনা অনুসারে রাঢ়দেশের উত্তরাংশ কচ্ছ গৌড়ের, মধ্যভাগ করণ স্থবর্ণের এবং দক্ষিণাংশ তাম্রলিপ্তরাজ্যের অধীন হইতেছে। ইহাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধবিহার, সভাগৃহ ও দেবমন্দির হিয়োনসাঙ দর্শন করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য লেখকদিগের একটা রোগ আছে, তাঁহারা "লাঢ়" শব্দ পাইলেই তাহাকে গুর্জ্জরের অন্তর্গত লাট দেশ স্থির করিয়া বসেন। প্রাচীন মুসলমান লেখকগণ গুর্জ্জরের অন্তর্গত লাটদেশকে "লারদেশ" লিখিয়াছেন, এবং এই লারদেশ যে অনহিলবাড়াপত্তনের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। † কুমারপালের "বদ নগর" প্রশস্তিতে ইহাকে "লার" লেখা হইয়াছে। উক্ত প্রশস্তির অনুবাদক ভূলার টীকায় সেই লারকে "লাট" স্থির করিয়াছেন। ‡ যাহা হউক, গুজরাটের দক্ষিণ ও মধ্যভাগের প্রাচীন নাম লাটদেশ এবং আমাদের রাঢ়দেশের প্রাকৃত বা "পালি" নাম লাঢ়দেশ। আমাদের বিশ্বাস, কুমারগুপ্তের শাসনকালে লাঢ় বা রাঢ়দেশীয় পট্টবস্ত্রবয়নকারী একদল তন্তুবায় দশপুরে গমন করিয়াছিলেন। রাঢ়দেশীয় পট্টবস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়গণ প্রাচীনকাল হইতে জগতে যে আত্মপ্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,

* টর্ণার প্রকাশিত মহাবংশ,—ভূমিকা ৯৩ পৃষ্ঠা ও মূলগ্রন্থ ৪৩ পৃষ্ঠা।

অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। উমেশ বাবু কি প্রাচীন রোমক-দিগের লিখিত কটদ্বীপের (কাঁটোয়ার) নামও অবগত নহেন? অদ্যাপি মুর্শিদা-বাদের চেলির কাপড় জগতে অপরিচিত নহে। মন্দসারের শিলালিপিতে লিখিত "লাঢ়" দেশ যে পশ্চিমদেশীয় "লাট" নহে, উক্ত শিলালিপিতেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত শিলালিপির সপ্তদশ পংক্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত রহিয়াছে,—

"বিস্তীর্ণতুঙ্গশিখরং শিখরিপ্রকাশং অভ্যুদ্গতেন্দ্বমলরশ্মিকলাপগৌরম্।
যদ্ভাতি পশ্চিমপুরস্য নিবিষ্টকান্তচূড়ামণিপ্রতিসমন্নয়নাভিরামং॥

তন্তুবায়গণের নির্ম্মিত সূর্য্যমন্দির পশ্চিমদেশীয় দশপুর নগরের চূড়ামণি-স্বরূপ হইয়াছিল¶। দশপুর নগরের বহুদূর পশ্চিমে লাটদেশ অবস্থিত এবং বহুদূর পূর্ব্বে লাঢ় (রাঢ়) দেশ অবস্থিত, সুতরাং পূর্ব্বদেশীয় তন্তুবায়গণই দশ-পুরকে পশ্চিমদেশীয় নগরী বলিতে পারেন। উমেশ বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি কান্যকুব্জই লাটদেশ হইত, তাহা হইলে এস্থলে "পশ্চিমপুরস্য" না লিখিয়া দশপুরকে দক্ষিণদেশীয় নগরী বলা হইত। কারণ, কান্যকুব্জের দক্ষিণ দিকে দশপুর অবস্থিত।

উমেশ বাবুর মতে, কান্যকুব্জ ও লাট, উভয়ই প্রাচীন পঞ্চালের অন্তর্গত। উমেশ বাবু অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে "লাটানুপ্রাস" নামক শব্দালঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারশাস্ত্র দ্বারাই তাঁহার মত খণ্ডিত হইতেছে। "রীতি-বিবেচনায়" প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেনঃ—

বৈদর্ভী চাথ পাঞ্চালী গৌড়ীয়াবন্তিকী তথা।
লাটীয়া মাগধী চেতি ষোঢ়ারীতি।—

মতান্তরে (সাহিত্যদর্শন, নবম পরিচ্ছেদ)

বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা॥

* * * *

গৌড়ী উদ্ধরবন্ধা স্যাৎ বৈদর্ভী ললিতক্রমা।
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেন লাটী তু মৃদুভিঃ পদৈঃ॥

পঞ্চাল ও লাট যে স্বতন্ত্র দেশ, ইহা অলঙ্কারশাস্ত্র দ্বারাও নির্ণীত হইতেছে।

বিবিধ তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির আলোচনায় অনুমিত হয় যে, আধুনিক গুজরাট দেশ প্রাচীনকালে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর ভাগ গুর্জ্জর, মধ্য

¶ হিয়োন সাঙের ভারতভ্রমণের বহুকাল পূর্ব্বে যে রাঢ়দেশে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত

ও দক্ষিণাংশ লাটদেশ। উদয়পুর প্রশস্তি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মালবরাজ (প্রথম) বাকপতি গুর্জ্জর ও লাট রাজগণের সম্মিলিত সৈন্য জয় করিয়াছিলেন। * উক্ত প্রশস্তিতে ইহাও লিখিত আছে যে, প্রথম বাকপতির বৃদ্ধ প্রপৌত্র এবং দ্বিতীয় বাকপতির পৌত্র, নবসাহসাঙ্ক বা সিন্ধুরাজের পুত্র ভোজরাজ, গুর্জ্জর, লাট এবং অন্যান্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতে লিখিত আছে যে, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন উত্তরদিকস্থ গান্ধার এবং হূণরাজ্য জয় করেন এবং দক্ষিণদিকস্থ মালব, গুর্জ্জর ও লাটদেশে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা পঞ্চাল ও লাট পৃথক দেশ নির্ণীত হইতেছে। চেদীপতি কেয়ূরবর্ষের বিজয়বৃত্তান্ত, ঝব্বলপুরের অন্তর্গত বিল্লারির শিলালিপিতে অতি আশ্চর্য্য ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে ভারতের উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় অবস্থিত পাঁচটি দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গৌড়ী গাঢ়মনোমনোরথকরঃ কর্ণাটকান্তাকুচ-
ক্রীড়াশৈলতটীবিহারহরিণো লাটীললাটাঙ্কদঃ।
কাশ্মীরীবিহিতস্মরব্যতিকরস্তস্মাৎকলিঙ্গাঙ্গনা-
সদ্গানব্যসনী সনীতিনয়নঃ কেয়ূরবর্ষোভবৎ॥

Epigraphia Indica Vol. I, p. 256.

উক্ত শ্লোকের লিখিত গৌড় ও কলিঙ্গ ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত, কর্ণাট দক্ষিণ দেশ, কাশ্মীর উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত, কেবলমাত্র লাট পশ্চিম সাগরের তীরস্থিত দেশ।

লাট যে পঞ্চালের অন্তর্গত কিম্বা কান্যকুব্জের অন্য নাম নহে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উমেশ বাবু কিছুমাত্র উপস্থিত করিতে পারেন নাই, এবং পারিবেনও না।

উমেশ বাবুর প্রকাশিত নূতন তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালদেবের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া কয়েকটি শ্লোক লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা দুইটি শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত করিব।

যেহভুবন্ পৃথুরামরাঘবনলপ্রায়া ধরিত্রীভুজ-
স্তান্বেকত্রদিদৃক্ষুণেব নিচতান্ সর্ব্বান্ সমং বেধসা।
ধ্বস্তাশেষনরেন্দ্রমানমহিমা শ্রীধর্ম্মপালঃ কলৌ
লোলশ্রীকরিণীনিবন্ধনমহাস্তম্ভঃ সমুত্তম্ভিতঃ॥

পৃথু, ভৃগুরাম, রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি যে সকল নরপতি ছিলেন, বিধাতা সেই সকলকে একত্র সমাবেশিত দেখিবার জন্যই যেন সমস্ত নরপতিগণের সম্মান এবং পরাক্রমধ্বংসকারী

* Epigraphia Indica, Vol. I, p. 235.

এবং চঞ্চলা লক্ষ্মীরূপা করিণীর বন্ধনের নিমিত্ত কলিকালে শ্রীধর্ম্মপাল-রূপ মহাস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমাণঃ।*
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জঃ সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ যেন॥

উমেশ বাবু উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—

"অর্থাৎ ধর্ম্মপাল রাজা কান্যকুব্জের অধিপতিকে স্বীয় অভিষেকোদককুম্ভ প্রদান করেন। কনোজরাজ শত্রু দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল সেই শত্রুগণকে তাড়াইয়া কনোজরাজকে পৈতৃক সিংহাসন প্রদান করিলে, পঞ্চাল বৃদ্ধেরা হৃষ্ট হইয়াছিল এবং ভোজ মৎস্যাদি জনপদের রাজারা যাহারা কনোজের শাসনাধীন ছিল পুনরায় কনোজরাজের বশ্যতা অঙ্গীকার করিল।"

উমেশ বাবুর ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হইতেছে, কিন্তু মূল শ্লোক সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ, "সাধুসঙ্গীর্য্যমাণঃ" শব্দের অর্থ বটব্যাল মহাশয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গীর্য্যমানঃ বিশেষণ পদটির বিশেষ্য কে? তাহার স্থির করা কঠিন। শ্লোকে প্রথমান্ত দুইটি বিশেষ্য আছে। একটি উদকুম্ভঃ, দ্বিতীয়টি কন্যকুব্জ। কুম্ভকে সাধুবাদ প্রদান করা সঙ্গত বোধ হয় না। হৃতরাজ্য কন্যকুব্জপতি পিতৃসিংহাসনে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিত হইলে (অধিষ্ঠাপয়িতা ধর্ম্মপালকে সাধুবাদ না দিয়া) কন্যকুব্জপতিকে সাধুবাদ প্রদান করা সঙ্গত বোধ হইতেছে না। "দত্তঃ" পদেরই বা বিশেষ্য কে? কন্যকুব্জের বিশেষণ যদি উদকুম্ভ ও দত্ত হয়, তাহা হইলে, ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে "দত্তঃ" পদটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। উদকুম্ভঃ, দত্তঃ এবং শ্রীকন্যকুব্জঃ, এই তিনটি প্রথমান্ত পদ, সুতরাং একটি বিশেষ্য এবং দুইটিকে বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, উমেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"নারায়ণপালের তাম্রশাসনে উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক বার্ত্তার টীকাস্বরূপ শ্লোক দেখা যায়,—

জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীন্ উপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানত বামনায়॥

তিন জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উত্তরোত্তর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু

---

* সাধুসঙ্গীর্য্যমানের পাঠান্তর "সাধুরুদ্গীর্য্যমানঃ।"

এ পর্য্যন্ত ইহার অর্থ সম্যক স্পষ্টীকৃত হয় নাই। প্রথমতঃ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শ্লোককে আক্রমণ করিয়া তর্জ্জমা করেন। যথা—

Having conquered Indra Raja and other kings, he (Dharma Pala) earned the glorious Sri (goddess of fortune) whom he presented as a sacrifice, to the father of weath, Vamana, the weilder of the descus.—(*Iudo-Aryans*. vol. II. p. 270.)

এই ব্যাখ্যা অসমীচীন বিবেচনায় ডাক্তর হুনজ্ (হুলট্স ?) * অনুবাদ করিয়াছেন ঃ—

This mighty one again give the soverignty, which he had acquared by defeating Indra Raja and other enemies, to the begging Chakrayudha who resembled a dwarf in bowing —just as formerly Bali had given the soverignty (of the three worlds) which he had acquired by defeating Indra and his other enemies (the gods) to the begging Chrkrayudha (visnu) who had descended to earth as a Dwarf. (Indian Antiquary. XV. p. 307.)

ডাক্তার হুলজের পর গটিঞ্জের অধ্যাপক কিল্‌হরণ † সাহেব দেখাইয়া দেন যে, শ্লোকে যে "মহোদয়শ্রী" শব্দ আছে, তাহাতে কান্যকুব্জের রাজত্ব বুঝিতে হইবে। মহোদয় শব্দ কান্যকুব্জের নামান্তর মাত্র, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ‡ অধ্যাপক কিল্‌হরণের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর, সন্দেহ নাই।" (সাধনা, ১৩০১, জ্যৈষ্ঠ—৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা।)

আমরা নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের উদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি ঃ—

বলি যেরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া বিপুল লক্ষ্মীলাভ করিয়া বিনীত (ভিক্ষুক) চক্রধারী (বিষ্ণু) বামনকে তাহা দান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরাক্রমশালী (ধর্ম্মপাল) ও ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় করিয়া মহোদয় (কান্যকুব্জ) রাজশ্রী উদ্ধার পূর্ব্বক অবনতমস্তক (যাচক) চক্রায়ুধকে তাহা দান করিয়াছিলেন।

১২৮৮ বঙ্গাব্দে ক্ষোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া আমরা কনোজপতিগণের

---

* E. Hultysch, Ph. D.

† Professor F. Kielhorn, Ph. D. C. I. E. Gottingen.

‡ উমেশ বাবুর চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে (প্রাচীন তাম্রশাসনের সাহায্যে) আমরা কান্যকুব্জ ও মহোদয় অভিন্ন নগর অবধারণ করিয়াছি। (বান্ধব, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ৫৩৪ পৃষ্ঠা।) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ক্লিট সাহেব কান্যকুব্জ ও মহোদয় দুইটি স্বতন্ত্র নগর অবধারণ করেন। (Indian Antiquary. Vol. XV. pp. 105 &) ডাক্তার মিত্র মহোদয় বিশেষ দক্ষতার সহিত ক্লিট সাহেবের উক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছিলেন। (Proceedings of the Asiatic so-

যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। * ইহাতে "চক্রায়ুধ" নামে কোনও নরপতির উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, রামভদ্র দেবের পুত্র ভোজদেব ও চক্রায়ুধ অভিন্ন নরপতি। ইন্দ্ররাজ অবশ্যই রাষ্ট্রকূটাপতি হইবেন। উমেশ বাবুও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটা রাজবংশের ইতিহাস বিশেষরূপ আলোচনা না করিয়া তিনি এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কারণ রাষ্ট্রকূটা রাজবংশের বংশাবলীতে আমরা তিন জন "ইন্দ্ররাজ" প্রাপ্ত হইতেছি। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় ইন্দ্ররাজ ধর্ম্মপাল কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার মীমাংসা করিব। পশ্চিম ভারতে যেরূপ রাষ্ট্রকূটা বংশীয়-গণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন, পূর্ব্ব ভারতে পালবংশীয়গণ তদ্রূপ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাষ্ট্রকুটাবংশের ৭৪৪ শকাব্দের ১২ বৈশাখের একখানি তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, "গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি কর্ক্করাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" †

রাষ্ট্রকুটা ও পাল রাজবংশ পরস্পর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মহা-রাজাধিরাজ দেবপাল দেবের তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্ম-পালের ঔরসে ও রাষ্ট্রকুটা রাজকন্যা রন্নাদেবীর গর্ভে দেবপাল জন্মগ্রহণ করেন। ‡ পালবংশীয় ষষ্ঠ নরপতি রাজ্যপাল দেব রাষ্ট্রকুটার রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

---

* শ্রীপ্রবলস্যদুহিতুঃ ক্ষৌণিপতিজা রাষ্ট্রকুটাতিলকস্য রন্না দেব্যাঃ (মুঙ্গেরের তাম্রশাসন, নবম শ্লোক।)

† ১। দেবশক্তি দেব। (৬৭৯ শকাব্দ)
   |
২। বৎসরাজ দেব। (৭০২) শকাব্দ)
   |
৩। নাগভট্ট দেব। (৭২৫ শকাব্দ)
   |
৪। রামভদ্র দেব। (৭৪৮ শকাব্দ)
   |
৫। ভোজদেব (চক্রায়ুধ ?) (৭৭১ শকাব্দ) (৭৮৪, ৭৯৮, ৮০৪ শকাব্দ।)
   |
৬। মহেন্দ্রপাল, নির্ভয়নাস্ত্র বা মহীশ পাল। (৮২৫ শকাব্দ, ৮২৯ শকাব্দ)
   |
৭। ভোজদেব। ৮। বিনায়কপাল। ৯। ক্ষিতিপাল, মহীপাল বা হেরম্বপাল।
১০। দেবপাল। (৮৭০ শকাব্দ)।

উমেশ বাবুর আবিষ্কৃত নূতন তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালের মাতার নাম "দেদ্দদেবী"। কিন্তু আমাদের বোধ হয় দেদ্দদেবী না হইয়া "দদ্দদেবী" হইবে। লাটদেশাধিপতি "দদ্দ" রাজকুল হইতে ইহার উদ্ভব, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তার নাম দদ্দ। তাঁহার পৌত্রের নাম দদ্দ। তদনুসারে এক পুরুষ অন্তর প্রত্যেক রাজার নাম দদ্দ রাখা হইত। এইরূপ দদ্দ নাম অন্য কোনও রাজবংশে দৃষ্ট হয় না। প্রাচীনকালে অনেক রাজবংশে ভগিনীর নামের সহিত একটি আকার মাত্র সংযুক্ত করিয়া, ভ্রাতা ভগিনীর এক নাম রাখিবার প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল। অনেকগুলি ক্ষোদিত লিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয়, এই সূত্রেই লাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ক্ষোদিত লিপির সাহায্যে পাল ও সেন রাজগণের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ হওয়ার পর এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, যদ্দ্বারা আমাদের মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং পুনর্ব্বার এ বিষয়ে আমাদিগকে লেখনী ধারণ করিতে হইবে। অদ্য একটি সংশোধিত বংশাবলী মাত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

উমেশ বাবু লিখিয়াছেন, "জয়চ্চন্দ্র † মহম্মদ ঘোরীর সময় কনোজের রাজা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন কনোজাধিপতি রাষ্ট্রকূটা বা রাঠোরবংশীয় ছিলেন।" রাজপুতনার ভট্টকবিদিগের পদানুসরণ পূর্ব্বক কোনও কোনও সাহেব এই মত প্রচার করিয়াছেন। ভট্টকবিদিগের গ্রন্থগুলি কিরূপ অপ্রামাণ্য, তাহা মিবাররাজামাত্য "মহামহোপাধ্যায়" পণ্ডিত "কবিরাজ" শ্যামল দাস প্রদর্শন করিয়াছেন। জয়চন্দ্র ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল সনন্দে ইহাঁদিগকে "গাহড়বাল" (বা ঘড়ওয়ার ক্ষত্রিয়) বংশজ লেখা হইয়াছে। সুতরাং আমরা ভট্টকবিবর্গকে বিশ্বাস করিতে পারি না। উমেশ বাবু স্বয়ং পরিচয় দিতেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ; আমরা যদি কয়েকজন লেখক "জবরদস্তি" করিয়া বলি— তিনি কায়স্থ, তাহা হইলে কাহার কথা বিশ্বাস্য হইবে? পণ্ডিতপ্রবর মেক্সমূলর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেও ব্রাহ্মণ লিখিয়াছিলেন!

লের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি, রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কর্কারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

† তাম্রশাসন "জয়চন্দ্র"।

সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধিপতি পাল রাজবংশ।

১। মহারাজ গোপাল দেব।
রাজ্ঞী বাণীশ্বরী দেবী (বল্লভীর রাজকন্যা)।
রাজ্ঞী দদ্দ দেবী (লাঢ়দেশীয় রাজকন্যা ?)

২। মহারাজ ধর্ম্মপাল। রাজ্ঞী রন্না দেবী। — বাক্‌পাল।

যুবরাজ ত্রিভুবনপাল দেব। ৩। মহারাজ দেবপাল দেব। — জয়পাল।

যুবরাজ রাজ্যপাল। ৪। মহারাজ বিগ্রহপাল বা সুরপাল দেব।
রাজ্ঞী লজ্জাদেবী (চেদীর রাজকন্যা)।

৫। মহারাজ নারায়ণ পাল। ৬। মহারাজ রাজ্যপাল দেব।
রাজ্ঞী ভাগ্যদেবী (রাষ্ট্রকুটার রাজকন্যা)

৭। মহারাজ——পাল।

৮। মহারাজ বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়)।

৯। মহারাজ মহীপাল দেব (প্রথম)।

১০। মহারাজ নয়পাল দেব।
(চেদীপতি কর্ণদেবের সমসাময়িক)।*

১১। মহারাজ বিগ্রহপাল (তৃতীয়)।

১২। মহারাজ মহীপাল (দ্বিতীয়)।
(চেলরাজ দ্বারা বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন।)
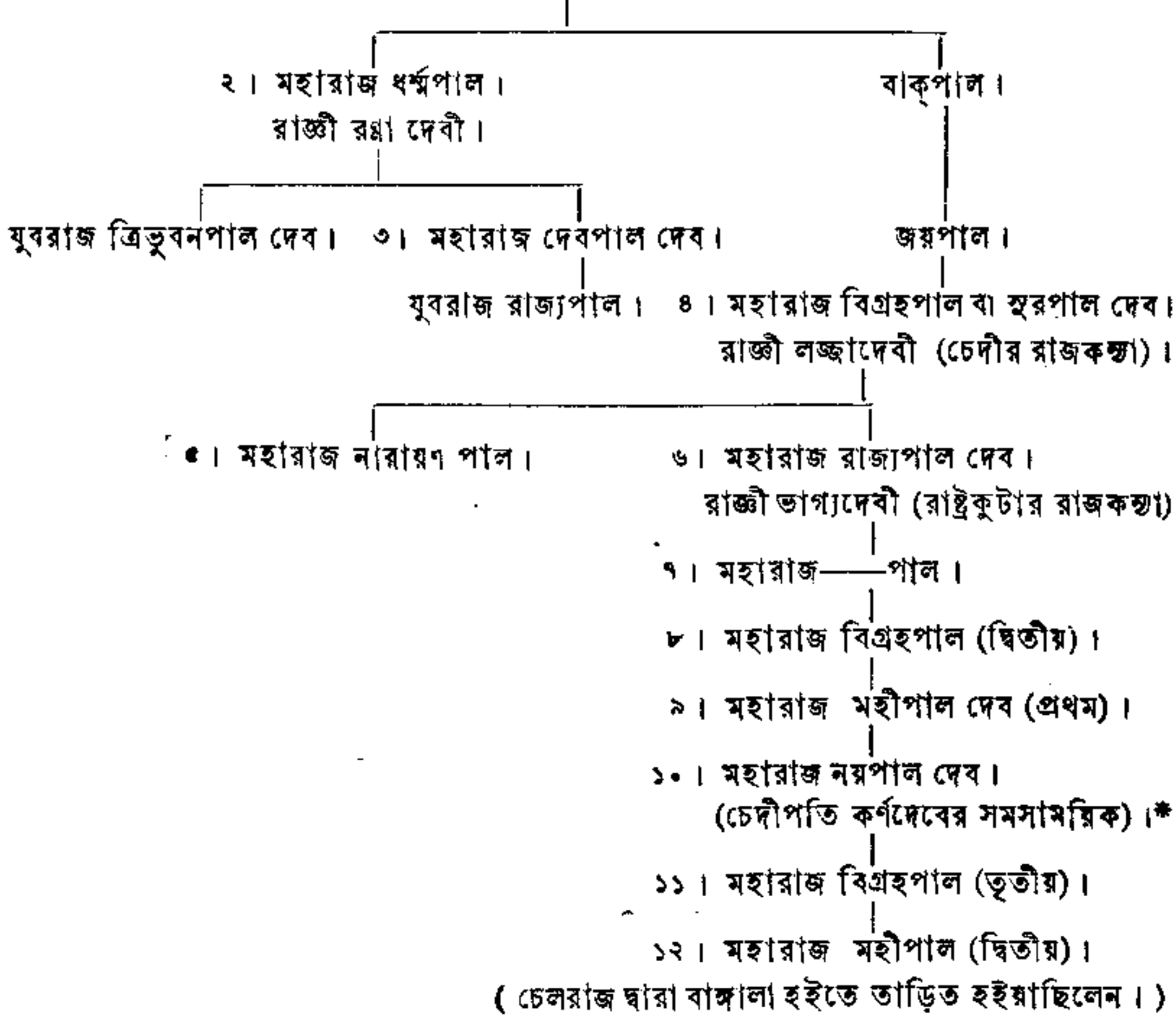
সেনরাজবংশ।

১। মহারাজ বিজয় সেন।
(বিজয়সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথবাসী ছিলেন, তিনিই বঙ্গে সেনবংশের স্থাপয়িতা।)

২। মহারাজ বল্লাল সেন।

৩। মহারাজ লক্ষণ সেন।

(বখতিয়ার খিলজী দ্বারা নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হইয়া বঙ্গে আশ্রয় লয়েন, তদীয় পুত্র মাধব ও কেশবসেন ও পৌত্র দনুজমাধব বা বেদানুজমাধব পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় এই কর্ণদেবকে "king of karnya (probably kanuj) লিখিয়াছেন। আমরা "ভারতী"তে দেখাইয়াছি যে, শরৎবাবু যাঁহাকে নেপালপতি জ্যোতিবর্ম্মা লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম অংশুবর্ম্মা। তদ্দৃষ্টে শরৎবাবু আত্মভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। (Indian Pandits in the Land of snow. p. 47.) এ স্থলে আমরা শরৎবাবুকে একটি কথা বলিব,—কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলে মহত্ত্ব নষ্ট হয় না।

ছুটি খাঁর মহাভারত।

"পরাগলী মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁও মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তখন সেই মহাভারতের দু এক পাতা মাত্র পাইয়াছিলাম। সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও আমি, বহু অনুসন্ধান করিয়া, ছুটি খাঁর আদেশে রচিত মহাভারতের সমস্ত অশ্বমেধ পর্ব্বটি পাইয়াছি। যে পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহার হস্তলিপি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের। অশ্বমেধ পর্ব্ব ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশও ছুটি খাঁর আদেশে অনুবাদিত হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না; বিশেষতঃ, পরাগল খাঁর আদেশে রচিত সমস্ত মহাভারত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার প্রিয়পুত্র ছুটি খাঁ আবার মহাভারতের অনুবাদ করাইলেন কেন, সেও একটি গুরুতর প্রশ্ন।

"পরাগলী মহাভারত" প্রবন্ধে আমার কয়েকটি গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল। আমি লিখিয়াছিলাম, পরাগল খাঁর খুল্লতাত নসরৎ সাহার আদেশে, মহাভারত অনুবাদিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ লিখিবার সময় পরাগলী মহাভারত আমার নিকটে ছিল না, সুতরাং স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, সেই নসরৎ সাহা পরাগল খাঁর খুল্লতাত নহেন, তিনি হুসেন সাহার বিখ্যাত পুত্র নসরৎ সাহা—গৌড়ের পরবর্ত্তী সম্রাট। আর একটি ভুল—আমি লিখিয়াছিলাম, শ্রীসুর নন্দী ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীসুরনন্দী নহেন, শ্রীকর নন্দী; প্রাচীন হস্তলিপিতে 'ক' আর 'সু' প্রায় একইরূপ দেখায়, সেই জন্যই এই ভুলটি হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকর নন্দী ছুটি খানের নিবাসভূমি পরাগলপুরের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন—

নসরত সাহা তাত (১) অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হয় ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত্ত সুন্দরে॥

(১) নসরৎ সাহা মগদিগকে দমন করিতে চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাই চট্টগ্রাম-বাসীগণ হুসেন সাহা অপেক্ষা নসরৎ সাহাকে অধিক চিনিতেন।

চারলোল (?) গিরি তার পৈতৃক বসতি॥ বিধি এ নির্ম্মিল তাকে কি কহিব অতি॥
ফণী নামে নদী এ বেষ্টিত চারিধার। পূর্ব্ব দিগে মহাগিরি পার নাহি তার॥

ছুটিখাঁর মহাভারত।

রাজসভার রীতি অনুসারে, বহু উপমা ও অতিরঞ্জিতপ্রশংসাপূর্ণ ছুটি খাঁর একটি স্তুতিগান আছে। যথা,—

"লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবীবিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত সভা খণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
কপট নাহিক যে তাঁর প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥
তাহার যত গুণ শুনিয়া নরপতি। (১)
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেতে তাঁর বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটিখান॥
লস্করি বিষয় পাইয়া মহামতী।
সাম দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
* * * * (২)
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশ ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারোক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥

ছুটিখাঁর মহাভারত।

আমরা পরাগলী-মহাভারতের প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অন্য কোনও পরিচয় পাই নাই; এই শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়াছি। যদি অনুসন্ধানে ইহাঁদের কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে পরে বিদিত করিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নসরৎ খাঁর আদেশে আদৌ মহাভারত অনুবাদিত হয় (৩)। বোধ হয়, সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ মহাভারত অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। এই সব মহাভারত পড়িতে পড়িতে কাশীদাসের উপর শ্রদ্ধা ও আস্থার ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কাশীদাসী মহাভারত ঐ গুলির প্রতিবিম্ব বলিয়া বোধ হয়; কিম্বা উভয় পক্ষই কথকদিগের রচনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন। যেরূপেই হউক, কাশীদাসের অনু-

(১) হুসেন সাহা।

(২) এই স্থলে ত্রিপুর নৃপতির সহিত ছুটি খাঁর সন্ধিবিগ্রহাদি বর্ণিত আছে, ঐতিহাসিক সেই বিবরণে কতদূর আস্থাবান হইবেন, বলিতে পারি না। এই স্থানে সেই অংশ অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

(৩) "শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
করাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিধান"॥—পরাগলী মহাভারত।

বাদের মৌলিকত্ব কোনও ক্রমেই থাকিতেছে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নসরৎ সাহার আদেশে রচিত মহাভারত, পরাগলী ও ছুটি খাঁর মহাভারতের পূর্ব্ব-বর্ত্তী। উহা অবশ্যই পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত ছিল। হইতে পারে, তাহা হইতেই এক দিকে পরাগলী ও ছুটি খাঁর মহাভারত, এবং অপর দিকে কাশীদাসের মহা-ভারত, এই ত্রিধারার উৎপত্তি হইয়াছে। এই সব মহাভারতের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর একখানি মহাভারত প্রচলিত ছিল, সেইখানিই আদি গ্রন্থ, তাহা সঞ্জয়ের কৃত। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমরা পরে প্রবন্ধ লিখিব।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী এক প্রবন্ধে লিখিয়াছি, বঙ্গীয় কবিগণের কয়েকটি নির্দ্ধা-রিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় ছিল ; তাহাই উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের কাব্য-প্রতিভা বিকাশ পাইয়াছে ; এই দাস জাতির কবিগণ স্বাধীন ক্ষেত্রে বায়রণ কি শেলির মত নব ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পদ-চিহ্নিত পথ দেখিয়া পদচারণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, ইহাঁরা সকলেই পূর্ব্ব-বর্ত্তী মহাজনগণের শরণাপন্ন ও ঋণে আবদ্ধ। ইংলণ্ডীয় কবিগণের ন্যায় ইহাঁ-দের ব্যক্তিগত কবিত্ব আমাদিগকে বিস্মিত করে না। এক এক খানা কাব্যের রচনায় অসংখ্য হস্তের চিহ্ন দেখিতে পাই, তাই কাহার গলে কবিকণ্ঠশোভী যশঃপুষ্পহার প্রদান করিব, এই প্রশ্ন মনে হইয়া ইতস্ততঃ করিতে হয়। কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী কবির পদানুসরণেই দাসত্বের একমাত্র পরিচয় নহে। সংস্কৃত এই সব প্রাচীন বঙ্গীয় কবির প্রতিভাকে দৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ;— রূপবর্ণনা পড়িতে গেলেই পক্ক বিম্বের সহিত ওষ্ঠের, দাড়িম্ব-বীজের সহিত দন্তের, উৎপলের সহিত অক্ষির, ও বেণীর সহিত ফণীর তুলনার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয় ; প্রাচীন সময়ের সহিত দূরত্ব নিবন্ধন রুচির অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাই পূর্ব্বোক্ত উপমাগুলি কর্ণে সহ্য করিতে পারিলেও, লম্বোদর, নাভি সুগভীর ও আজানুলম্বিত বাহু, নিতান্তই বিস্বাদ বোধ হয়। ক্বচিৎ প্রতিভাবান কবি স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির বলে এই অনুকরণপ্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। যথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কালকেতুর রূপবর্ণনায়—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, কাঁপে যেন রতিপতি
সবার লোচন সুখ হেতু॥
নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপ গুণ শীল বাড়া, বাড়ে যেন হাতিকড়া
যেন শ্যাম চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাঁটী
কর-যোড়া লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্র-নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥
দুই চক্ষু যিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলিভাঁটা

কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান রাঙ্গাধুতি, মস্তকে জালের দড়ী
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল॥
সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়,
যে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণীধরে
ডরে কেহ নিকটে না রয়॥
ইত্যাদি।

এই বর্ণনার নিকট কাশীদাসের মহাভারতে

"দেখ দ্বিজ, মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয় শ্রুতি॥"

কবিত্বে দাঁড়ায় না। ইহা মনোহর, কিন্তু কবিত্বের গতি শৃঙ্খলাবদ্ধ;—বঙ্গীয় মহাভারত যদি সংস্কৃতের ঠিক অনুবাদ হইত, তবে এ সব বলিতাম না। প্রাচীন মহাভারত গুলি পড়িতে পড়িতে এইরূপ নানা কথাই মনে হইয়াছে; কাশীদাস ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত-রচকদিগের ভাষায় কত দূর সাদৃশ্য, তাহা দেখাইবার জন্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যযাতির পতন।

অষ্টক বোলেন্ত তুমি কোন মহাজন।
পরিচয় দিয়া কহ জানাইশ আপন॥
অগ্নিপ্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখি ত সাক্ষাৎ।
কোন পাপে অধর্ম্মে হইল স্বর্গপাত॥

*　*　*　*

যযাতি আমার নাম কহি শুন তোক।
নহুস নৃপতি সুত পুরুর জনক।
করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কহে।
নরকেত বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয়॥
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাই কথা সকল।
পুণ্য ক্ষয় হইয়া মুই পড়িল ভূমিতল॥"

সঞ্জয়-কৃত ভারত; আদিপর্ব্ব।

অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥
রাজা বলে নাম আমি ধরে যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুসে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান জনের করিলাম অমান্য।
সেই হেতু হইল আমার ক্ষীণ পুণ্য॥

কাশীদাস; আদিপর্ব্ব।

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার আলাপ।

সুদেষ্ণা এ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আমি পারি॥
নারী-সবে তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমতে পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে॥
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন।
আপন কণ্টক আমি আপনি করিব।
মৃত্যু এ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব॥
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেন মত দেখি আমি তোহ্মারে ধারণ॥

পরাগলি-ভারত; বিরাটপর্ব্ব।

রাণী বলে সৈরিন্ধ্রী তোমার রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালিটিতে নারী আঁখি॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে॥
বল করি ধরিতে রাখিবে কোনজন॥
তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে।
আমি উদাসীন হব রাখি তোমা ঘরে॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর লক্ষণে॥

কাশীদাস-ভারত; বিরাটপর্ব্ব।

বৃষকেতু ও যুবনাশ্বসংবাদ।

আকর্ণ পুরিয়া ধনু টঙ্কার করিল।
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল॥
অতি শিশু দেখি তুহ্মি বীর অবতার।
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার॥
কাহার পুত্র তুহ্মি কিবা তোমার নাম।
কোন দেশে বসতি কিবা মনস্কাম॥
কি লাগিয়া নেও ঘোড়া কারণ কিবা তার।
কি নিমিত্ত কর মোর সৈন্যের সংহার॥

*   *   *   *

রাজার বচন শুনি হাসে কুমার।
পরিচয় লও অহে নৃপতি আহ্মার॥
যাহার উদয়ে হয় তিমির নাশ।
যাহার উদয়ে হয় জগৎ প্রকাশ॥
মোর পিতামহ সেই জন দিবাকর।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্রণী।
যার বলে দুর্য্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী॥
তাহার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক।
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোক॥

ছুটিখাঁনের মহাভারত; অশ্বমেধপর্ব্ব।

বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেহ আগে তোমরা দুজন॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জানে এ জগতে।
জনম হইল মোর কুন্তীর গর্ভেতে॥
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির যজ্ঞ হেতু॥

কাশীদাস-মহাভারত; অশ্বমেধ পর্ব্ব।

আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইতেছে; নতুবা এরূপ অসংখ্য স্থলে ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য আছে,—আমি বাছিয়া উঠাই নাই। এক জৈমিনিসংহিতা দেখিয়া সব গুলি সংকলিত, এই যুক্তি দ্বারা এই সাদৃশ্যের একটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; কিন্তু সে যুগের অনুবাদ শব্দে শব্দে হইত না—ভাষাগত এত দূর ঐক্য স্বাবলম্বিত অনুবাদে হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।

কবিকঙ্কণ অনুকরণকারী হইলেও গঠনকারী; কাশীদাস শুধু অনুকরণকারী। তাঁহার গুণ, তিনি ভাষাটি একটু সহজ ও মার্জ্জিত করিয়াছেন। ললিতশব্দগ্রন্থনে নিপুণতা হেতু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, সঞ্জয় ও শ্রীকর নন্দী তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। এই জঙ্গলপূর্ণ নিকেতনে অশ্রয় গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা আর জীবনধারণ করিতে পারিলেন না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে নব শক্তি লাভ করিয়া কাশীদাস এখন তাঁহাদিগকে তাড়াইতেছেন। অগত্যা, ঐ সব কবিদিগকে শেষ কেল্লা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে আশ্রয় লইতে হইবে।

কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব্বে ৪৫০০ শ্লোক। ছুটি খানের মহাভারতে উক্ত পর্ব্ব ৩০০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ভাষা সম্বন্ধে সঞ্জয়, পরাগলী ভারত, ও ছুটিখাঁর

রূপান্তর, এই কয়েক খানা পুঁথি পাঠ করিলে কাহারও সে বিষয়ে কণিকা-মাত্রও সন্দেহ থাকিবে না।

রচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য নাই। ভারতের প্রসঙ্গ যে ভাবে যিনি বর্ণনা করুন, বিষয়ের গুণে, বিশেষতঃ হিন্দুর নিকট, তাহা অমৃতবর্ষী। প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয় সেই প্রাচীন কাহিনীতে বিগলিত হয়। বিষয়ের গৌরবে সমালোচনার প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়। কিন্তু তথাপি শ্রীকর নন্দীর সরল ও অনাড়ম্বর বর্ণনার প্রশংসা, সমালোচক পৃথক ভাবে করিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অনুসৃত পথ অতিক্রম করিয়া, স্বভাবদত্ত গুণে তাঁহারও দু একটি স্বকীয় উপমা বাহির হইয়াছে; যথা,—

"পৌষ মাসে রজনী যেন পড়য়ে নীহার।
হেন মতে বাণ দোহে বর্ষয় অপার॥"

স্থলে স্থলে স্বভাববর্ণনায় স্বভাবের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। গুণ না থাকিলে এত কাল ইহা আদর পাইবে কেন? ৪০০ বৎসর এই বিপ্লবপূর্ণ পর-পীড়িত হিন্দু ক্ষেত্রে যাহার জীবন লুপ্ত হয় নাই, সমালোচক দয়া করিয়া সেই পুস্তককে তাঁহার সম্মার্জ্জনীর ভয় নাও দেখাইতে পারেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অনুকরণে ইউরোপেও পুস্তক লিখিত হইয়া থাকে। মারলো, গেটে এবং ইদানীং রেনল্ডসও একই ফষ্ট লিখিয়াছেন। কেইডম্যানের মানবের পতন এবং ভার্জ্জিল ও ডাণ্টের নরকবর্ণনার দৃষ্টান্তে মিল্টন প্যারাডাইস লষ্ট লিখিয়াছেন। এস্‌কাইলের জগৎপ্রসিদ্ধ প্রমিথিউস লইয়া শেলি পুনরায় কিছু নাড়া চাড়া করিয়াছেন। অনুবাদিত গ্রন্থ সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক বেশি; চ্যাপমান পোপের পরে, ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী ইলিয়াডের পদ্যানুবাদের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যত অধিক, এরূপ আর কোথাও নহে। ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গীয় কবিগণ কয়েকটি নির্দ্ধারিত বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা নিযুক্ত রাখিয়া নিরুদ্ধগতি হইয়াছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, শনিঠাকুর, মনসা, প্রায় সমস্ত বঙ্গীয় কবিকে সেবক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রসাদে বঙ্গে কবিতার স্রোত প্রবাহিত ছিল; এবং তাঁহাদেরই অত্যাচারে সেই স্রোত স্বাধীন পথ অবলম্বন করিতে পারে নাই। তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র, না নিন্দার ভাজন?

এই প্রথা সম্পূর্ণ দোষাবহ নহে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে স্বাধীন প্রতিভার স্ফূর্ত্তি না থাকিলেও, ক্রমান্বয়ে অধ্যবসায়শীল কবিগণ একই বিষয়ে হস্তক্ষেপ

করাতে, চিত্রগুলি পরিস্ফুট ও সুন্দর হইয়াছে। একজনের পথ অন্য জন অনুসরণ করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী চেষ্টার আরও একটু বিকাশ করিয়াছেন। ছুটিখাঁর মহাভারতের পর, কাশীদাসে সেই বিকাশ আছে। কিন্তু মাধবাচার্য্যের পর কবিকঙ্কণে যত দূর, তত দূর নহে। তাহা হইতে অনেক ন্যূন।

আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী, ষষ্ঠীবর গঙ্গাদাস, রামেশ্বর নন্দী, কাশীদাস প্রভৃতি সমস্ত মহাভারত-লেথকই জৈমিনি-সংহিতা দেখিয়া অনুবাদ সংকলন করিয়াছেন। বঙ্গের মৃদু-সমীর-স্পর্শ-সুখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন?

যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী, জৈমিনি তাঁহাদের অগ্রণী। তাঁহারই শিষ্য ভট্টপদ রাজা সুধন্বার সময়ে বৌদ্ধ কুল বিজয় করেন। শঙ্কর ইঁহাদের পরবর্ত্তী। জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন। মহাভারত শাস্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভবসাগর পার হইবার একমাত্র সেতু। কিন্তু ব্যাসের বিরাটার্ণব সন্তরণ করা সহজ নহে। তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদিগের ত্রাণ করিলেন। জৈমিনি ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভে :—

"জৈমিনি ভারত, সুত তবে পড়ে মেঘদূত
নৈষধে কুমারসম্ভবে।"

ইদানীং কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু প্রতাপ রায় ও বঙ্গবাসীর কার্য্যাধ্যক্ষগণ, ব্যাস ঋষিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এত উদ্যোগ ও অর্থব্যয় সত্বেও, জৈমিনি-সংহিতার পাঠক ভাগই সমধিক। কারণ, কাশীদাস জৈমিনির প্রতিবিম্ব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ।

অদ্ভুত বালুকা।

পর্য্যটকগণ সুবিধা পাইলে, ভ্রমণবৃত্তান্তে দুই একটা আজগুবি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ছাড়েন না,—এই জন্যই জনৈক ফরাশী পর্য্যটক লিখিয়াছেন, ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইলে, লেথকের একটু কবি-সুলভ কল্পনা থাকা আবশ্যক, এবং সঙ্গে সঙ্গে গলিভারের

সহিত আত্মীয়তার লক্ষণও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা চাই। ফরাসী লেখকের কথাটা সত্য হইলেও, সম্প্রতি ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রকাশিত একটি আজগুবি বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বেটস্, বার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত পর্য্যটকগণের লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তে, প্রশান্তমহাসাগরস্থ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপমালায়, একপ্রকার সঙ্গীতশীল বালুকার বিবরণ লিখিত আছে। এই বিবরণ পড়িয়া, ক্যারিংটন, বোষ্টন, ডাক্তার আলেক্সিন্ প্রভৃতি কয়েকজন মার্কিন পণ্ডিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্যাণ্ডউইচে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং পর্য্যটকগণের মধ্যে কেহই এই বালুকার অত্যাশ্চর্য্য গুণের কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই বা বৈজ্ঞানিক প্রথা-মতে কারণানুসন্ধানের কোনও চেষ্টা করেন নাই দেখিয়া, ইঁহাদের আবিষ্কারেচ্ছা অত্যন্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রমণ ও পরীক্ষাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, ক্যারিংটন সম্প্রতি সঙ্গীতশীল বালুকার একটি চিত্তাকর্ষক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ভ্রমণকারী সাহেব বলেন, কেবল সমুদ্রের অনতিদূরবর্ত্তী ভূভাগে এই অদ্ভুত বালুকার স্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদ্রের জল হইতে দুই শত হাত ব্যবধানে এই জাতীয় বালুকা বড় দেখা যায় না। এই বালুকাস্তূপগুলি আকারে নিতান্ত ছোট নয়, অনেকেই উচ্চতায় পঞ্চাশ হাতের ঊর্দ্ধ হইবে, আবার ইহাদের উপরিভাগ ক্রমনিম্ন হওয়ায়, এক একটি স্তূপ অনেকস্থান অধিকার করিয়া থাকে। এই সকল বালুকাস্তূপ হইতে স্বভাবতঃই একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতে থাকে, দূর হইতে ইহা অদূরধ্বনিত পিয়ানোর নিম্নসপ্তকের স্বরগুলির মত মধুর ও গম্ভীর শুনায়; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে, এই ধ্বনি ক্রমেই কতকগুলি বেসুরো স্বরের সম্মিলনজাত শব্দের ন্যায় অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। ক্যারিংটন সাহেব বলেন, নিকট হইতে শুনিলে, এই বালুকানিঃসৃত শব্দ কতকটা কুকুরের ডাকের ন্যায় বোধ হয়; এজন্য সাহেবটি ইহাকে 'বার্কিং স্যাণ্ড' (Barking Sand) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কোনও প্রকারে বালুকা আন্দোলিত হইলেই এই শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ, ইহার উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইলে বা স্তূপের উপরিস্থ বালুকারাশি স্থানভ্রষ্ট করিয়া নিম্নে গড়াইয়া দিলে, শব্দ অত্যন্ত প্রবলতর হইয়া উঠে; এমন কি, শব্দজাত কম্পনে নিকটবর্ত্তী দর্শকের হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত, রৌদ্রতাপের বৃদ্ধি হইলে, শব্দও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ক্যারিংটন সাহেব বলেন, রৌদ্রাতিশয্যবশতঃ বালুকা নীরস হইয়া স্তূপাগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অধিক পরিমাণে নিম্নে পড়িতে আরম্ভ হয় বলিয়া, শব্দ প্রবল হয়। ভ্রমণকারী সাহেবেরা যে দিন বালুকা পরীক্ষার্থে স্যাণ্ডউইচে প্রথম উপস্থিত হন, সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ও চারি পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বালুকাস্তর সম্পূর্ণ নীরস ছিল বলিয়া, ইহার প্রবল ধ্বনি বহুদূর হইতে শ্রুত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী হইলে এই শব্দ দ্বারা ইঁহাদের অশ্ব সকল এত চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সাহেবেরা বহু যত্নে অশ্বগুলি সংযত করিতে পারিয়াছিলেন। স্থানান্তরে নীত হইলে, বালুকার এই অদ্ভুত শব্দগুণের বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না; একটি থলির মধ্যে ইহা আবদ্ধ রাখিয়া নাড়া চাড়া করিলে, এই অদ্ভুত শব্দ অতিস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

স্যাণ্ডউইচের আদিম অসভ্য অধিবাসীগণ এই বালুকার শব্দ ভীষণ অমঙ্গলসূচক লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করে। বালুকাই যে শব্দোৎপত্তির কারণ, ইহারা তাহা আদৌ স্বীকার করে না। ইহারা বলে, বিজনপ্রান্তরস্থ উপদেবতাগণ মনুষ্যের নানা দুষ্কৃতি দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া, এই শব্দ সাহায্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে, এই বালুকাক্ষেত্রে

পর্য্যটকগণ অদ্ভুত সঙ্গীতশীল বালুকাক্ষেত্রের পরিদর্শনাদি শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, ইহার আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং কয়েকটি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আবশ্যক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, বালুকাজাত শব্দের প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনুসন্ধানরত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে দুই একটি যুক্তি দেখাইয়া ব্যাপারটির মীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে একমাত্র ক্যারিংটন ও ডাক্তার জুলিয়েনের সমবেত চেষ্টার ফলই আধুনিক পণ্ডিত সমাজে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

শেষোক্ত সিদ্ধান্তীদ্বয় বলেন, সিক্তবালুকাস্থ জল যখন তাপসাহায্যে বাষ্পীভূত হইতে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত বাষ্পই আকাশে বিক্ষিপ্ত হয় না, ইহার কিয়দংশ স্বভাবতঃই বালুকাকণাগুলির চতুর্দ্দিকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক কণাটি এই প্রকারে বাষ্পাচ্ছাদিত হওয়ায়, স্তূপমধ্যে থাকিয়াও ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে,—মধ্যে বাষ্পের ব্যবধান থাকিয়া যায়। যদি এই সকল বালুকাকণা কোনও প্রকার অতি অল্প মাত্রও চাপ পায়, তাহা হইলে তৎসংলগ্ন বাষ্প ক্রমে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া, বালুকাকণাগুলিকে চঞ্চল স্প্রিঙ্গের উপরিস্থ পদার্থের ন্যায়, আন্দোলিত করিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকদ্বয় বলেন, বালুকাকণার এই প্রকার আন্দোলনজাত বায়ুকম্পন দ্বারাই, ইহা হইতে অত্যদ্ভুত শব্দ নির্গত হইতে থাকে। সিক্ত বালুকা শুষ্ক হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার সময় বা বালুকারাশিতে পদসঞ্চালনকালে, কণা সকল সহজেই আন্দোলিত হইয়া শব্দ প্রবলতর করিয়া তোলে। বালুকামাত্রেই সুস্বরবিশিষ্ট হয় না কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাঁরা বলেন, এই গুণটি বালুকার বাহ্যিক আকার ও তাহার রাসায়নিক প্রকৃতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত, কেবলমাত্র ধূলি বা অপরপদার্থবিহীন পরিষ্কার বালুকা হইতেই শব্দ নির্গত হইতে দেখা যায়।

তাপহীন আলোক।

প্রকৃতির জড় ও অন্ধ শক্তিগুলিকে আয়ত্তাধীন রাখিয়া ব্যবহারোপযোগী করা, আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের একটি মহৎ উদ্দেশ্য—বোধ হয়, বর্ত্তমান যুগে এই উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতার জন্যই আজ জগতে বিজ্ঞানের এত আদর। সম্প্রতি ল্যাংলে নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক, জোনাকি পোকার তাপহীন উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া, তাপহীন সুলভ আলোক উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। প্রকৃতি দেবী যে উপায়ে জোনাকিকে উজ্জ্বল করেন, সে উপায়ই বা কি, এবং সে শক্তিই বা কি—ল্যাংলে, এখন সেই ঘোর রহস্যের উদ্ভেদ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। উপস্থিত চেষ্টা সফল হইলে, ল্যাংলে ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যদি সেই তাপ-হীন আলোক-উৎপাদন, আধুনিক আলোক-উৎপাদনের অপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য হয়, তবেই তাঁহার অশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা জগতের কাযে লাগিবে।

আমরা এখন যে উপায়ে আলোক-উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা বিজ্ঞানবিদ্‌গণের চক্ষে বড়ই ক্ষতিকর ও অযথাশক্তিসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। এখনকার আলোকের সহিত তাপ অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে; গৃহ ও রাজপথাদি আলোকিত করিবার জন্য আমরা যে আলোকের উৎপাদন করি, তাহাতে তাপের কোনও আবশ্যক নাই, ইহা আমাদের কোনও কাযে লাগে না,—অনর্থক আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। এই জন্যই ল্যাংলে

নিয়োজিত করিয়া, এখন যাহাতে সুলভ উপায়ে তাপহীন আলোক উৎপন্ন হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সাহেবটি নানা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ক্ষুদ্র বাতির আলোক হইতে, অত্যুজ্জ্বল তাড়িতালোক প্রভৃতি সকল প্রকার আলোকেই তাপবিকীরণ হইয়া থাকে, এবং এই কারণে কার্য্যশক্তির (Energy) অনেক অপচয় হয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, সাধারণ বাতিতে আলোকজননার্থ প্রযুক্ত শক্তির শত-করা ৯৯ ভাগের অপব্যয় হয়, এবং কেবলমাত্র শত-করা এক ভাগ আলোকে পরিণত হয়। সুতরাং, যদি সমগ্র প্রযুক্ত শক্তিকে আলোকশক্তিতে পরিণত করিবার সদুপায় পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে, তাহার সাহায্যে আমরা অনায়াসেই অদ্যকার একটি বাতিতে একশত গুণ উজ্জ্বল আলোকপ্রাপ্তির আশা করিতে পারিতাম। *

বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক জানেন, আলোক ও বিক্ষিপ্ত তাপ (Rediant heat) উভয়েই একই তাপশক্তির দুইটি রূপান্তরমাত্র,—কাজেই তাপশক্তি ব্যতিরেকে আলোক উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যে তাপশক্তিটুকু আলোকে পরিণত হয়, তাহাকে অপচয় বলিতে পারা যায় না। তবে তাপশক্তিকে আলোকে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট উষ্ণতার (Temperature) উৎপাদনার্থে যে অদৃশ্য বিক্ষিপ্ত তাপ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া অন্তর্হিত হয়, তাহা অবশ্যই শক্তির ঘোরতর অপব্যবহার বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের পরিজ্ঞাত উপায়ের আলোক উৎপাদন করিতে গেলে, শক্তির এই অপব্যবহার অপরিহার্য্য। উষ্ণতাসহযোগে, সর্ব্বব্যাপী ইথর নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের কম্পন আরম্ভ হইলে, তাপশক্তি আলোকরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই উষ্ণতার একটি সীমা আছে, যে কোনও উপায়ে তাপকে এই উষ্ণতার সীমান্তর্গত করিতে পারিলেই, আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে, নচেৎ তাহা তাপই থাকিয়া যায়। তাপকে উষ্ণতার এই সীমাবর্ত্তী করিবার দুইটি বিভিন্ন উপায় দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম,—ক্রমে উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া তাপকে সীমার সন্নিহিত করা ; এবং দ্বিতীয়,—উষ্ণতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় না আনিয়া ইহাকে এককালে সীমায় উপনীত করা। আমরা সাধারণ উপায়ে আলোক-উৎপাদনকালে অযথাশক্তিসাপেক্ষ প্রথমোক্ত উপায়টিই অবলম্বন করিয়া থাকি। দ্বিতীয় উপায় অনুসারে আলোকজননপদ্ধতি আমরা জানি না। পিয়ানোর চাবি টিপিলেই, অত্যুচ্চ সুরও যেমন যথেচ্ছ বাজাইতে পারা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী নিম্ন সুরগুলি একে একে বাজাইবার আবশ্যক হয় না, তাপকে নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতার সীমাবর্ত্তী করিবার এই প্রকার একটি কোনও উপায় আবিষ্কৃত না হইলে আর আলোকজননজনিত তাপশক্তির অপব্যবহারের প্রতিকার হইবার কোনও আশা নাই।

জোনাকি কীট প্রভৃতি কয়েক জাতীয় জীব ও অন্যান্য পদার্থের স্বভাবতঃ আলোক বিতরণ করিবার ক্ষমতা আছে। অতি সূক্ষ্ম তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, ইহাদের উজ্জ্বলাংশে তাপের কোনও চিহ্নই অনুভূত হয় না, কাজেই ইহাতে তাপশক্তির অপব্যবহার হয় না। এই জন্যই ল্যাংলে সাহেব বলিতেছেন,—যে উপায়ে এই সকল পদার্থ জ্যোতিষ্মান, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাপহীন আলোক উৎপাদিত হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, তাপ দ্বারা কোনও পদার্থ, সাধারণ জোনাকির ন্যায় উজ্জ্বলআলোক-সম্পন্ন করিতে হইলে, পদার্থটিকে অন্যূন, ফারণহিটের ২০০০ ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণ করিতে হয়, অথচ কীটশরীরে কোনও উত্তাপ দৃষ্ট হয় না। এই সকল কারণে অনুমান করা যায়,

সম্ভবতঃ আলোকজননের পূর্ব্ববর্ণিত দ্বিতীয় উপায়টি দ্বারাই এই জাতীয় আলোকের উৎপত্তি হইতেছে। যাহাই হউক, এইটিই সম্ভবপর ভাবিয়া, সাহেব আজও নানাবিধ অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু জোনাকি ও অপর পদার্থের তাপহীন আলোকের প্রকৃত কারণ অদ্যাপি ঘোরতমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই রহস্যের উদ্ভেদ না হইলে, উপস্থিত প্রশ্নটির মীমাংসা করা বড়ই দুরূহ।

নবাবিষ্কৃত বাষ্প।

ভারতের অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ সমগ্র জগৎ পাঁচটি ভূত পদার্থে রচিত, এই মত প্রচার করিয়াছিলেন;—কিন্তু বৈদেশিক জড়বিদ্যার বহুল বিস্তার হওয়ায়, আজকাল পঞ্চভূতের অস্তিত্ব কেবল মাত্র পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে স্পষ্টই দেখা যায়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, ভূত-পদবাচ্যই নয়; ইহারা কতকগুলি ভূতের সমষ্টিজাত আকার মাত্র। এ ত গেল ভারতের অতি প্রাচীন ভূতের কথা,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক ভূতের সংখ্যারও স্থিরতা নাই; রসায়ন-শাস্ত্রের উন্নতি ও বিশ্লেষণোপযোগী নানাবিধ যন্ত্রাদি রচনার সহিত ভূতসংখ্যারও ক্রমিক বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে—কাজেই বৈজ্ঞানিক উন্নতির খর স্রোতে এই সংখ্যা যে ভবিষ্যতে অটল থাকিবে, তাহা বলা যায় না; হয় ত কোনও ভবিষ্যৎ রসায়নবিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, কোনও ছদ্মবেশী ভূত অভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া, সংখ্যা হ্রাস হইতে হইতে আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষের পঞ্চভূতে মিলাইতে পারে। মৌলিক পদার্থ সংখ্যার এই পরিবর্ত্তনের সহিত যৌগিক পদার্থেরও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সে যাহা হউক, সম্প্রতি কয়েক জন ইংরাজ রসায়নবিৎ একটি অপরিজ্ঞাত বাষ্পের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন; বাষ্পটি, ভূত ও যৌগিক এই উভয়ের মধ্যে কাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই। পদার্থটি হটাৎ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র্যালে কতকগুলি বাষ্পের গুরুত্বনিরূপণকালে, বায়ুজ নাইট্রোজেন্ বাষ্পের গুরুত্ব, অন্য উপায়ে সংগৃহীত নাইট্রোজেন্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইতে দেখিয়া, বায়ুজ নাইট্রোজেনে নিশ্চয়ই অপর একটি অপরিজ্ঞাত বাষ্প সংমিশ্রিত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। র্যালে অপরিজ্ঞাত বাষ্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সামান্য সন্ধান পাইয়া, কিছুদিন ধরিয়া বায়ু লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং বায়ুতে নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ বর্ত্তমান আছে কি না, তাহার নির্ণয়ে, প্রথমে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। নানা চেষ্টার পর অবশেষে তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা বায়ুবিশিষ্ট করিয়া, এবং বিশ্লেষণলব্ধ নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ স্থানান্তরিত করিয়া, র্যালে সর্ব্বপ্রথমে এই বাষ্পসংগ্রহে কৃতকার্য্য হন, এবং রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র সাহায্যে (Spectroscope) পরীক্ষা করিয়া, ইহাতে পরিজ্ঞাত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের কোনও চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া, ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন বাষ্প বলিয়া প্রচার করেন। আজও এই বাষ্পের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। আবিষ্কারক লর্ড র্যালে এবং অধ্যাপক র্যামজে, উভয়েই ইহার প্রকৃতিনির্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। হাইড্রোজেন্ অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব প্রায় কুড়িগুণ অধিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, ইহার বর্ণছত্রে (Spectrum) একটি মাত্র নীল রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা নাইট্রোজেনের বর্ণছত্রস্থ নীল রেখা অপেক্ষা অনেক গাঢ় বর্ণবিশিষ্ট ও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল।

মহাত্মা রামমোহন রায়কে বাড়াইতে গিয়া, তাঁহার জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অপর একজন নিরপরাধী মৃত ব্যক্তির নামে কলঙ্ক দিয়াছেন। বোধ হয়, অনবধানতাবশতঃ, অথবা ভ্রান্তিমূলক কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করাতে, এইরূপ ঘটিয়াছে।

উক্ত জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হয়। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যূষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করিত ; এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত। এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য্য কিছুতেই পরাভব মানিল না। কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সদুপদেশে তাহারা ভুলিবার লোক ছিল না। বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈর্য্যশীল দেখিয়া উৎপাত আরো বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা আপনি সকলই থামিয়া গেল।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরি-উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়। রায় বংশের সহিত বটব্যাল বংশের দলাদলির অনেক কথা। সে সমুদায় এখানে লেখা অনাবশ্যক। উভয় বংশই খানাকুল কৃষ্ণনগরের আদিম নিবাসী নহেন। প্রথম্, বটব্যাল বংশের আদিপুরুষ খানাকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ বর্দ্ধমান রাজসরকারে চাকুরি করিয়া, এবং অন্যান্য উপায়ে ধনশালী হয়েন, এবং সমাজে তৎকালোচিত সৎকার্য্যাদি দ্বারা প্রচুর মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করেন। ঐ সময়ে রায় বংশের আদিপুরুষ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। ক্রমে তাঁহারা বংশপরম্পরায় উন্নত হইয়া দেশে মান সম্ভ্রম স্থাপনের জন্য যত্নবান হয়েন, এবং কৃষ্ণনগর অঞ্চলে একটি দলের সৃষ্টি করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায়, বর্দ্ধমান রাজসংসারে ইজারা ইত্যাদিতে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েন। রামজয় বটব্যাল তৎকালে রাজসংসারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায়, ঐ টাকা আদায়ের তদ্বিরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ঐ টাকা আদায়ের যত্ন করায়, এবং ইজারা হইতে

অপহৃত করায়, রামজয়ের উপর রায় বংশের ক্রোধ জন্মে। এই সময়েই প্রথমে রায় ও বটব্যাল বংশের মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হয়। বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া শুনা যায়। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হয় নাই।

রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলীর বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে, তাহার কতক কতক নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে। নিম্নে একটি ফয়শালার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"২৪১ নং। ৪৯ কানুন। জেলা হুগলীর জজ্ শ্রীযুক্ত ওকিলী সাহেব। ১৮১৮। ১৫ এপ্রেল। বাদী রামজয় বটব্যাল। প্রতিবাদী রাম মোহন রায়। বাদীর আরজি এই যে প্রতিবাদী রাম মোহন রায় ১২২১ শালে লাটমজকুর পত্তনী তালুক খরিদ করিয়া ১২২২ শালের ২০ এ অগ্রহায়ণ তারিখে তালুকদার রাম মোহন রায় ও উহার নায়েব জগন্নাথ মজুমদার একশতের অধিক লাটিয়াল লোক লইয়া দলাদলীর আখেজে দাঙ্গা হাঙ্গামা দ্বারায় রামনগর গ্রামের ৭৯/২।০ বিঘার মধ্যে ৫২৮১০ জমির ধান্য ফশল ও মৌজে বিন্নক গ্রামে ১০/১৩ দাইনামগ্রামে ৮।৩ বাগানের আম্র ইত্যাদি ১৭৫টা গাছ কাটিয়া ৭০॥ বিঘা জমী হইতে বেদখল ও আবাদী ধান্য ফশল লুট তরাজ করে। একারণ ২০৯২৲ টাকার দাবিতে নালীশ।"

এই মকদ্দমায় জজ্ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রি পাইয়াছিলেন। *

ইহার উপর টীকা টীপ্পনি করা আমরা অনাবশ্যক বোধ করি। কেন না, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে খর্ব্ব করা আমার অভিপ্রায় নহে। তিনি যে সকল গ্রাম্য কলহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রামের লোক এখনও বিস্মৃত হয় নাই; কিন্তু সে সকল কথা এক্ষণে প্রচার করায় কাহারও কোনও ফল নাই। তাঁহার সৎকার্য্য ও সদভিপ্রায় সকলই আমাদের স্মরণীয় হওয়া উচিত। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক মহাশয় যদি অনর্থক ৺রামজয় বটব্যালের উপর কলঙ্ক দিয়া তাঁহাকে বাড়াইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে, এই প্রতিবাদ আবশ্যক হইত না। গ্রন্থকার মহাশয় যদি রামজয়কে চিনিতেন, তাহা হইলে, যেরূপ অমর্য্যাদার সহিত তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঘটিত না। আর প্রকৃতপক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

---

* এই বিবরণ ও ফয়শলার নকল রামজয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বটব্যাল আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আগ্রায় তিন দিন।

২৭শে ফেব্রুয়ারি। দিল্লী হইতে প্রত্যূষে রওনা হইয়া বেলা ১টার সময় আমরা টুণ্ডলা ষ্টেশনে পৌছিলাম ; এই স্থানে গাড়ী বদলাইতে হয়। আমরা দিল্লীর গাড়ী হইতে নামিয়া আগ্রার গাড়ীতে উঠিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গাড়ী ছাড়িল।

বেলা প্রায় ২॥ টার সময় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণপ্রদীপ্ত, পৃথিবীতে অতুলনীয় তাজমহল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা অনিমিষ নয়নে মুগ্ধহৃদয়ে দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে গাড়ী যমুনা পার হইয়া আগ্রা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমরা সকলে নামিলাম। কয়েকটি বন্ধু আমাদিগকে অতি সমাদরে নির্দ্দিষ্ট বাসায় লইয়া গেলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা জুম্মা মসজিদ্ দেখিতে যাই। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না। তবে ইহাও প্রকাণ্ড, এবং আগা-গোড়া লাল পাথর দিয়া বাঁধান। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের ন্যায় ইহারও তিনটি বৃহৎ গম্বুজ এবং সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন আছে। ভিতরটাও দেখিতে অনেকটা সেইরূপ।

পরদিন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া ফতেপুর শিক্‌রি দেখিতে যাই। ইহা আগ্রা হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রায় ১২টার সময় তথায় পৌছি। এইখানেই প্রথমে আকবরের প্রাসাদ ছিল, কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর এবং নিকটে কোনও নদী নাই বলিয়া, আকবর সাহ এ স্থান ত্যাগ করিয়া আগ্রায় আসিয়া বাস করেন। দিল্লীর ন্যায় এখানেও অনেক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, কিন্তু প্রাসাদমধ্যবর্ত্তী অট্টালিকা গুলি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের নাম 'বোলান্দর দরওয়াজা'। ইহা অতিশয় উচ্চ (প্রায় ১৩০ ফুট বা ৮৬ হাত) এবং আকবর সাহের প্রাসাদের উপযুক্ত। হণ্টার সাহেব ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকাণ্ড গির্জাঘরের দরজার ন্যায় খিলান-করা দরজা, দরজার উপরে ও পাশে দেয়ালে আরবি লেখা, সকলের উপরে নাতিবৃহৎ তিনটি গম্বুজ এবং দরজার উপরে আরও ছোট ছোট ১৩টি গম্বুজ শোভা পাইতেছে। দ্বার পার হইয়া একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া

দিকে সেখ সলিম চুস্তির (আকবরের পীর) শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত একটি স-গম্বুজ মাঝারি ধরণের সমাধিমন্দির। চুস্তি সাহেবকে আকবর সাহ গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং ইঁহার নামানুসারেই যুবরাজ সেলিমের নাম রাখিয়াছিলেন। তাই আকবর নিজ প্রাসাদের মধ্যে এমন সুন্দর সমাধি নির্ম্মিত করাইয়া, মৃত পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সমাধির পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে। ইহার পর আমরা আকবরের উষ্ট্রশালা ও অশ্বশালা প্রভৃতি দেখিলাম। পরে বীরবলের ভবনে প্রবেশ করিলাম, ইহা এক্ষণে ডাকবাঙ্গালা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বাহিরের ও ভিতরের দেওয়ালে নানা প্রকার কারুকার্য্য ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহা অনেকটা হিন্দুদিগের গৃহের ন্যায় নির্ম্মিত, কেবল দুইটি গম্বুজ আছে। কালের মাহাত্ম্যে বাদসাহের মন্ত্রীর ভবন এক্ষণে সাহেবদিগের ডাকবাঙ্গলায় পরিণত! বীরবলের ভবনের পর আর একটি গৃহ আছে, এটিতে নাকি আকবরের খ্রীষ্টান স্ত্রী "মেরিয়ান বেগম" বাস করিতেন। এই গৃহে এখন 'আর্কিয়লজিক্যাল সোসাইটীর' আফিসের আড্ডা। তার পর পাঁচমহল। এই পঞ্চতল গৃহটির প্রত্যেক তল ক্রমান্বয়ে নানা প্রকার খোদকারী-করা থামের উপর স্থাপিত। রাজপুত্র ও রাজকন্যাদিগের বায়ুসেবনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। পাঁচমহল হইতে কিছু দূরে লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত দেওয়ান-ই-খাস; এটি দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে অনেক হীন; এবং মাঝখানে একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে,—সেইখানে বসিয়া আকবর দরবার করিতেন। ইহার একটু দূরে দেওয়ান-ই-আম,—দেখিতে তত ভাল নয়। এই সমস্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, আকবর সৌন্দর্য্য এবং বাহ্য পারিপাট্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। দেওয়ান-ই-খাসের পাশে আঁখ-মিচৌলি, ইহা কি জন্য ব্যবহৃত হইত, তাহা ভাল বুঝা যায় না। তবে এখানকার "পাণ্ডারা" বলিল যে, আকবর সাহ এই স্থানে বেগম সাহেবদের সহিত "লুকাচুরি" খেলিতেন। কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বিলাস-বিরাগী আকবর যে সাম্রাজ্যের গঠন ও দৃঢ়ীকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি যে লুকোচুরি খেলায় তৃপ্তিলাভ করিতেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। দেওয়ান-ই-খাসের সম্মুখে একটি বড় অঙ্গন, এবং এই অঙ্গনে "পঁচিশি" খেলিবার ছক। তার পর হামাম (পাথর দিয়া বাঁধান একটি বড় জলাশয়) এবং তাহার তিন পার্শ্বে বেশবিন্যাসের সারি সারি ঘর। তার পর বাদসাহের শয়ন-

সামান্য প্রকোষ্ঠ আকবরের শয়নকক্ষ-রূপে ব্যবহৃত হইত। অবশেষে "যোধা-বাই"র মহলে প্রবেশ করি। ইনি মুসলমানের গৃহে থাকিয়াও হিন্দুর আচার ব্যবহার অনেকটা রক্ষা করিয়া চলিতেন। বাস্তবিক দেখিলেও বোধ হয় যে, এটি একটি স্বতন্ত্র কোনও হিন্দুর গৃহ। গৃহটি দ্বিতল চকবন্দী, এবং প্রধান ঘর-গুলি অষ্টকোণবিশিষ্ট। ঘরগুলি আমাদের চক্ষে ভাল বোধ হইল না। তবে অন্যান্য গৃহ অপেক্ষা ইহা প্রশস্ত এবং অধিক পরিমাণে বায়ু চলাচলের উপ-যোগী বটে। অবশেষে আমরা কতিপয় সামান্য গৃহ দেখিয়া, সন্ধ্যার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

২৮ শে ফেব্রুয়ারি, প্রাতঃকালে সেকেন্দ্রাবাদে আকবরের সমাধিগৃহ দেখিতে যাই। ইহা আকবরের পিতা হুমায়ুন বাদসার সমাধির ন্যায় প্রকাণ্ড। চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুবিন্যস্ত উদ্যান এবং স্থানে স্থানে ফোয়ারা। ইহার ফটকও দেখিতে পরিপাটী। আকবর, মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার সমাধিনির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, এবং জাহাঙ্গিরের সময় সমাধিনির্ম্মাণ শেষ হয়। নীরেট লাল পাথরে, হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের সম্মিলনে, এই সমাধিভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। উপরিভাগ শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত। ইহার উপরে বড় গম্বুজ আদৌ নাই, কিন্তু গম্বুজের স্থানে জগদ্বিখ্যাত কহিনূর স্থাপিত হইয়া সম্রাট-সমাধির শোভা সম-ধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিল। কহিনূর পরে সাজাহান তুলিয়া লইয়া ময়ূরসিংহাসনে বসান। ভিতরে দেওয়াল এবং ছাত অতি সুন্দররূপে চিত্রিত ছিল, কিন্তু এখন মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ যখন ভারতবর্ষ দেখিতে আসেন, তখন একটি স্থান মেরামত করিয়া পূর্ব্ববৎ করা হইয়াছিল। এই সমাধির মধ্যস্থলে অন্ধকারময় একটি কক্ষে বাদসাহের সমাধি রহিয়াছে। গভ-র্মেণ্ট হইতে সমাধি আবৃত করিবার জন্য বহুমূল্য সুবর্ণকারুকার্য্যখচিত যে বস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা কোন পাপিষ্ঠ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্থান এত অন্ধকার যে, দিবসেও প্রদীপের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই দেখা যায় না। আকবরের সমাধিগৃহের নিকট আর একটি গৃহ ক্ষুদ্র আছে; তথায়, যোধা বাই আকবরের মৃত্যুর পর নির্জ্জন-বাস করিয়াছিলেন। আকবরের সমাধি দেখিয়া আমরা প্রায় ৯॥ টার সময় বাসায় ফিরি।

আবার বেলা ১১ টায় সময় তাড়াতাড়ি তাজমহল দেখিতে বাহির হই।

প্রবেশদ্বার হইতে নিজ তাজ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি উৎস এক লাইনে স্থাপিত; এবং ইহার মধ্যস্থলে শ্বেত পাথর দিয়া বাঁধান একটি কুণ্ড, এবং এই কুণ্ডের মধ্যে পদ্মের ন্যায় আকৃতি পাঁচটি উৎস রহিয়াছে। উৎসের সারির দুই পার্শ্বে লাল পাথরে বাঁধান দুইটি পথ, এবং পথের দুই পার্শ্বে নানা বর্ণের গোলাপ, চন্দন, লবঙ্গ ও অন্যান্য সুন্দর ফুল গাছ, ও বিলাতি ঝাউ গাছ রোপিত রহিয়াছে। বাগানের পরে তাজ। আমরা জুতা খুলিয়া একটা সিঁড়ি দিয়া তাজে উঠিলাম। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত অঙ্গন, এবং মাঝখানে সেই অমল ধবল বৃহৎ সৌধ। অঙ্গনের চতুষ্কোণে চারিটি বৃহৎ শ্বেতস্তম্ভ। উত্তর দিকে যমুনা কলকল রবে তাজের পদপ্রক্ষালন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অবশেষে আমরা সমাধির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঠিক মাঝখানে বড় গম্বুজের নীচে পাথরের জাফ্রি দ্বারা বেষ্টিত মম্‌তাজমহলের সমাধি; তাহার পার্শ্বে সাহাজাহান বাদসার সমাধি। শুভ্র প্রস্তরের গাত্রে নানাবিধ প্রস্তরের সন্নিবেশে অঙ্কিত লতাপাতার প্রতিরূপগুলি দেখিতে অতি চমৎকার। এই স্থানে কথা কহিলে বা শব্দ করিলে, তাহার দশগুণ গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। এই জন্য তাজের প্রতিধ্বনি জগদ্বিখ্যাত। তাজের আরও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠই কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ, এবং সাজাহানের মার্জ্জিত শিল্পরুচির পরিচায়ক। কি দেয়ালে, কি ছাদে, কি মেঝেয়, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে; আগাগোড়া নিখুঁত শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। উপরের বড় গম্বুজের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্রাকার আরও চারিটি গম্বুজ আছে, এবং চারিদিকে বৃহৎ খিলানকরা দ্বার আছে। আমরা তাজমহল বেশ করিয়া দেখিয়া একটি স্তম্ভে আরোহণ করিলাম; অবশেষে স্তম্ভ হইতে নামিয়া বাগানের মধ্যে সমস্ত স্থানে বেড়াইয়া তাজমহল হইতে বাহির হইলাম।

এবার যমুনা পার হইয়া রামবাগ বা আরামবাগ নামক একটি প্রাচীন উদ্যান দেখিতে যাই। উদ্যানটি যমুনাপুলিনে অবস্থিত; এবং যদিও ইহার সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়াছে, তবুও দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়। আরামবাগ দেখা শেষ হইলে, এৎ-মৎ-উদ্দৌলার সমাধিগৃহ দেখি। এই স্থানে নূরজাহানের পিতা মাতা নিদ্রা যাইতেছেন। এটি নূরজাহানের ইচ্ছানুসারে জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহারও একদিকে যমুনা এবং অন্য দিকে সুন্দর উদ্যান; দূর হইতে দেখিলে সমাধিমন্দিরটি যেন একখানি ছবি বলিয়া বোধ হয়। ইহাতেও স্থাপ-

কোনও অংশে তুলিত বা সমকক্ষ হইতে পারে না। ইহার গম্বুজটি অনেকটা হিন্দুদের গম্বুজের ন্যায়, চারি কোণে চারিটি নাতিবৃহৎ স্তম্ভ থাকায় ইহার শোভা-বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সব দেখিতে, সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় ইৎ-মৎউদ্দোলার সমাধিগৃহ ত্যাগ করিয়া আমরা আবার তাজমহলে আসিলাম। তখন বেশ রাত্রি হইয়াছিল, শুক্লচতুর্দ্দশীর চন্দ্র নির্ম্মল আকাশ হইতে কিরণমালা বিস্তার করিয়া রাত্রির শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল যমুনার মৃদু কল্লোলধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছিল। আমরা চন্দ্রালোকে তাজ দেখিবার নিমিত্ত অতি কষ্টে প্রবেশদ্বারের শিখরদেশে আরোহণ করিলাম। অতি কষ্টে—কারণ তাজমহল ও অন্যান্য বড় বড় সমাধির প্রবেশদ্বারের উপরে উঠা বড় সহজ কথা নয়, এক একটি গোলকধাঁধাঁ বিশেষ। কিন্তু সেখান হইতে ভাল করিয়া দেখিতে না পাওয়ায়, আবার নামিয়া অন্য দিকে গিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাজমহলের এই দৃশ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। চন্দ্রালোকবিভাষিত তাজের শোভা যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। শ্বেত সৌধের উপর শুভ্র জ্যোৎস্না পড়াতে, তাজ আকাশপটের সহিত মিলাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাজকে তখন কোনও পার্থিব বস্তু বলিয়া বোধ হইল না—যেন কি স্বর্গীয় পদার্থ ধীরে ধীরে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সেই স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। অথচ নীচের দিকে ছায়া পড়াতে বোধ হইতেছিল, যেন ভূমি স্পর্শ করে নাই, মলিন পৃথিবীর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে রহিয়াছে। যাঁহারা চন্দ্রালোকে তাজ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন। আমাদের দক্ষিণে "সুবিমলজল যমুনা," সম্মুখে চন্দ্রের শুভ্রকিরণস্নাত অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সেই আধার, এবং বামে "সঙ্গত-তরুগণ-পরিবৃত-কুঞ্জবন,"—তাহা হইতে সুমিষ্ট সৌরভ আসিতেছে; এই সক-লের মধুর সংমিশ্রণে একরূপ অপূর্ব্ব কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা মুগ্ধ হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। অবশেষে অধিক রাত্রি হওয়ায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া ধীরে ধীরে তাজের উদ্যানসীমা অতিক্রম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন ফোর্টের পাশ যোগাড় করিয়া ফোর্ট দেখিতে গেলাম। আগ্রার কেল্লার ফটক ও প্রাচীর দিল্লীর কেল্লার ন্যায়, তবে আগ্রার দুর্গ বেশী মজ-বুত বলিয়া বোধ হইল। আমরা কেল্লায় প্রবেশ করিয়া বৃটিশ সৈন্য-নিবাস

স্থায় চারিদিকে ঘেরা এবং আগাগোড়া শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে অনেক পরিমাণে হীন। ইহার বাহিরে এক ধারে মীনা-বাজার, এইখানেই খোসরোজের উৎসব হইত। কিন্তু এখানে কোনও গৃহাদি নাই। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে দেওয়ান-ই-আম। অনেকটা দিল্লীরই মত, তবে ইহাতে বর্ণনার উপযুক্ত বিশেষ কিছুই নাই। বাদসাহেরা মাঝে মাঝে এখান হইতে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির যুদ্ধ দেখিতেন। ইহার নিকট মচ্ছিভবন এবং চিতোর ফটক। পূর্ব্বদিকে কতকগুলি কক্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিলেই দেওয়ান-ই-খাস। দিল্লীর অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, অনেকটা হিন্দুদিগের স্থাপত্যপ্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত। সম্মুখে খোলা ছাদ, তাহার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পার্শ্বে দুইটি কৃষ্ণ ও শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত বেদী বা আসন আছে। পূর্ব্বদিকের কৃষ্ণ বেদীতে স্বয়ং আকবর বসিতেন; সম্মুখস্থ শ্বেত-বেদীতে উপবিষ্ট মন্ত্রী বীরবলের সহিত যমুনার শোভা দর্শন করিতে করিতে কথোপকথন করিতেন। এখন কৃষ্ণ বেদী দুই-চির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। তথাকার পাণ্ডা বলিল, দিল্লী দখল করিয়া জাঠ সুরয্মল দর্পসহকারে পাদুকা সহিত ঐ বেদীতে উঠিয়াছিলেন, সেই জন্য উহা অভিমানে ফাটিয়া গিয়াছে; এবং কতকগুলি লাল দাগ রক্তের চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। কথাটি কত দূর সত্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। দ্বিতল হইতে নামিয়া খাসমহল (বাদসার বসিবার ঘর) সমন-বুরুজ (বোধ হয় এখানে বেগম থাকি-তেন), অঙ্গুরিবাগ (একটি নাতিবৃহৎ উদ্যান, ইহার পথগুলি লাল পাথর দিয়া বাঁধান এবং স্থানে স্থানে উৎস আছে) ইত্যাদি দেখি। অঙ্গুরিবাগের উত্তরে শিশমহল অর্থাৎ স্নানগৃহ;—ভিতরে অতি সুন্দর কাজ করা। লতা পাতা ইত্যাদি নানাপ্রকার চিত্রের মধ্যে কাচ বসান থাকায়, ইহার সৌন্দর্য্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন অনেক স্থান হইতে কাচ স্খলিত হইয়া গিয়াছে, এবং চিত্রগুলিও মলিন হইয়াছে। শিশমহল হইতে বাহিরে আসিয়া কিছু দূরে একটি কক্ষে রেলিং দ্বারা বেষ্টিত দারুময় বৃহদাকার এক জোড়া কপাট দেখিতে পাইলাম। ইহাই সোমনাথের দ্বারের কপাট ভাবিয়া লর্ড এলেনবরা আফগানিস্থান হইতে আনাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই ইহাকে সোমনাথের কপাট বলিয়া স্বীকার করেন না।

অঙ্গুরিবাগ হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণ দিকে গেলে, জাহাঙ্গীরি মহলে উপস্থিত হওয়া যায়। জাহাঙ্গীরি মহলের অধিকাংশ হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত।

প্রত্যক থামের উপরে হিন্দু ব্রাকেট রহিয়াছে, এবং ব্রাকেটের নীচে পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি দুইটি বিভিন্নজাতীয় পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তির উপর স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্তম্ভশ্রেণীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে একটি অঙ্গন এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বিস্তীর্ণ কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহগুলি যে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা অবধারিত করা কঠিন। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে আরও অনেকগুলি লাল পাথরের কক্ষ আছে; সেগুলি দেখিয়া বোধ হইল যে, জাহাঙ্গীর বেগমদিগের সহিত এই সকল কক্ষে বাস করিতেন।

এই সমস্ত দেখিয়া বেলা এগারটার সময় আমরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বিকালে আগ্রা কলেজের অধ্যাপকগণ আমাদিগের সহিত দেখা করিয়া আপ্যায়িত করিলেন, এবং অবশেষে আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাত্রি ১২টার সময় আগ্রা ত্যাগ করিলাম।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

কবিতার ভবিষ্যৎ।

আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যসেবকগণ কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। একদল বলেন যে, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত কবিতার হ্রাস হইতেছে। দর্শনের কঠোরতম আঘাতে, বিজ্ঞানের ভীতিভয় ভীষণ ভ্রুকুটীতে, কবির কল্পনাসৃষ্ট দুহিতা ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। কিছু কাল পরে এই জীবনসংগ্রামময় গদ্যপ্রবণ জগতে পূর্ব্বরচিত কবিতা সকল মিশরের বহুদূরবিস্তৃত বিশাল মরুভূমির বক্ষে বিস্ময়োৎপাদক সঙ্গীহীন পিরামিডের মত বোধ হইবে। মেকলে প্রভৃতিও এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁহারা বলেন যে, কবিতার সহিত সভ্যতার এইরূপ অহিনকুল সম্বন্ধ। আর একদল বলেন যে, কবিতা চিরদিন যেমন আছে, চিরদিন তেমনই থাকিবে। এই দুই মতের কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক।

স্তামত।

কবিতা কি, তাহা বলিবার আবশ্যক দেখি না। তবে কবিতার কার্য্য কি? কবিতা মানবহৃদয়ের নিভৃততম নিকেতন হইতে সুখসুপ্ত ভাব সকল জাগাইয়া তুলে। চিত্রকর নানা বর্ণে চিত্র সম্পন্ন করিয়া যাহা করেন, কবি ভাষায় তাহাই করেন। তবে সভ্যতার সহিত কবিতার এ বিবাদ কিরূপে সম্ভবে? লীলাময়ী প্রকৃতির কোমল পথে যে অসীম কবিতা নিমগ্ন, সভ্যতাস্রোত তাহা কি বিধৌত করিতে পারিয়াছে? প্রকৃতি কবিতাময়ী। যে দিন কবিতা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন হইবে, সে দিন বিশাল

সভ্যতা ও কবিতা।

বিশ্বের বিজন পথে মানব কোথায় থাকিবে? যে দিন আদিম মানব নগ্ন সরলতায় বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে আপনার চারি দিকে চাহিয়াছিল, সে দিন তরুশাখায় বিহগগণ তাহার কর্ণে যে সুস্বরলহরী বর্ষণ করিয়াছিল, আজও তাহারা তাহাই করিতেছে, আজও বসন্তপবনস্পর্শে লতার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কুসুম তেমনই বিকশিত হইতেছে; আজও সেই বহু পুরাতন চিরনূতন শিশুর ওষ্ঠাধরে পবিত্র হাস্য কুসুমরাশির মত ফুটিয়া উঠিতেছে; আজও জননীর স্নেহ তেমনই অপরিমেয়, আজও প্রেম তেমনই মোহময়, মধুর, মধুর হইতেও মধুরতর। তবে কোন দূরদর্শী বলিতে সাহস করিবেন যে, সভ্যতার উন্নতির সহিত কবিতার উৎস প্রবাহহীন হইয়া আসিতেছে?

আগষ্ট মাসের "গ্রেট থট্‌স" পত্রিকায়, মিষ্টার রিচার্ডলি গেলিয়েন, কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও শেষোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বর্ত্তমান সময়।

"আজ কাল একটা বিরক্তিজনক মিথ্যা মত প্রায়ই আলোচিত হয় যে, নাটকের মত কবিতার ভাণ্ডারও এখন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দেবশক্তির মত কবিতার যুগ এখন অতীত। যে যুগে কাউস্লিপ বা প্রিমরোজ ফুল বিকশিত হইত, সে যুগ এখন অতীত হইয়াছে, ইহা বলাও যেরূপ অসম্ভব, কবিতার যুগ অতীত হইয়াছে বলাও সেইরূপ অসম্ভব; কারণ, কুসুমের মত কবিতাও প্রকৃতির চিরস্থায়ী যৌবনের অংশ। যেরূপ কবিতা ইতিপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এখনও সেইরূপ কবিতা রচিত হইতে পারে। যদি, কিছুকাল ধরিয়া সেরূপ কবিতা রচিত না হয়, তবেই যে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে,—এমন নহে। যদি কেহ বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কোনও ভবিষ্যৎ মহাকবির আবির্ভাবের সূচনা দেখা যায় না, তবে এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, বর্ত্তমান সময়ে কবিতার সৃজনী এবং ধারণা, এই উভয় শক্তিই কবিদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত দেখিতে পাই। আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল, কোন্ মহাকবি প্রথম হইতেই মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন? শেলী বা কিট্‌সের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, টেনিসন, ম্যাথু আর্ণল্ড বা ব্রাউনিং, ইহাঁরাও কি প্রথমে প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অবশ্য কতকগুলি পাঠক তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সমসাময়িক সমালোচকগণ হীনপ্রতিভাশালী বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যতদিন কোনও কবি আপনার ভাস্বর প্রতিভার উজ্জ্বল কিরণে সাহিত্যগগন আলোকিত করিতে না পারেন, ততদিন তিনি সামান্য কবি বলিয়াই গণ্য হয়েন। একটু সহৃদয়তা ও অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি লইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এখনও অনেক উৎকৃষ্ট কবির প্রতিভা ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে, এবং এখনও অনেক সহৃদয়তাবিহীন সমালোচক সুতীব্র সমালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে মুকুলেই নিষ্পেষিত করিতে যত্নবান। (এইখানে লেখক অনেকগুলি উদীয়মান নবকবির নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।) তাহার পর লেখক বলিতেছেন, যদি কখন সাহিত্য-কাননে অনেকগুলি সুরভি পুষ্পের আশা থাকে, তবে বর্ত্তমান সময়ের উপর সে আশা স্থাপন করিলে অন্যায় হইবে না। এতগুলি সুন্দর মুকুলের পর বসন্ত কিরূপ মধুময় হইবে—আশা করা যায়; তাহা পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। তবে অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহা কেহ জানে না। যদি বর্ত্তমান নবকবিদিগের মধ্যে কেহই তেমন বড় কবি হইতে না পারেন, তাহা ... কেবল তাঁহাদিগের দোষান্বেষণ না করিয়া বোধ হয়

ষ্টিভেন্‌সনের প্রথম পুস্তক।

ষ্টিভেন্‌সন্।

মিষ্টার রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন্ বর্ত্তমান ইংরাজী-লেখকদিগের মধ্যে একজন বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু বালকদিগের জন্য রচিত তাঁহার "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" (Treasure Island) পুস্তক তাঁহাকে যেরূপ লোকপ্রিয় ও যশস্বী করিয়াছে, সাধারণতঃ কোনও একখানি পুস্তকের রচনা, গ্রন্থকারকে সেরূপ লোকপ্রিয় ও যশস্বী করিতে পারে না। আগষ্ট মাসের "আইড্লার" পত্রে তিনি উক্ত পুস্তকের উৎপত্তির বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিবরণ কিঞ্চিৎ কৌতুকজনক ; আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

প্রথম পুস্তক।

লেখক বলিতেছেন যে, বাস্তবিক এই গ্রন্থ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নহে ; কারণ, তিনি কেবল মাত্র উপন্যাস রচনা করেন না। কিন্তু এ কথাও তিনি অবগত আছেন যে, সাধারণ পাঠক-মণ্ডলী তাঁহাকে উপন্যাসলেখকই বলেন, এবং তাঁহার অন্যান্য রচনা কতকটা ঘৃণার সহিত দর্শন করেন। তাঁহার প্রথম পুস্তকের কথা লিখিতে হইলে তাঁহার প্রথম উপন্যাসের কথাই লিখিতে হয়—কারণ, সেই সাধারণ পাঠক-মণ্ডলীই সে বিবরণের পাঠক। উপন্যাসরচনা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা লেখক স্বীকার করেন ; আমরা তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

উপন্যাস রচনা ও নৈতিক সহিষ্ণুতা।

পরিশ্রম, শক্তি, অবসর ও কাগজ ইত্যাদি থাকিলে, সকলেই ভাল হউক আর মন্দ হউক, একটা ছোট গল্প লিখিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া, সকলেই,—ভাল দূরে থাক,—একখানা মন্দ উপন্যাসও লিখিতে পারে না। উপন্যাসের দৈর্ঘ্যই তাহার কারণ। অভ্যস্ত উপন্যাসলেখক কিছু কাল ধরিয়া উপন্যাস রচনা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে পারেন—কিন্তু নবব্রতী তাহা পারেন না। অতীত সাফল্যের উত্তেজক সাহায্য না পাইলে, মানব বিফল সাহিত্যগত কর্ম্মে একটা নিরূপিত সময়ের অধিক ব্যয় করিতে পারে না—মানবস্বভাব তাহার বিরোধী। আশার দাঁড়াইবার স্থান চাই। নবব্রতী প্রবল প্রতিকূল পবনের সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম নহেন। যে সময় প্রতিভা আপনি জ্বলিয়া উঠে, বাক্যের পর বাক্য সঙ্গত ভাবে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ই নবব্রতীর রচনারম্ভের প্রকৃত সময়। গ্রন্থারম্ভের পর শেষ পর্য্যন্ত কি একটা অসহ আকুলতা ! আর সেই দীর্ঘকাল ধরিয়া লেখককে প্রতিভাজ্যোতিঃ জাগাইয়া রাখিতে হইবে—একই প্রকার রচনাপ্রণালীর অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে ; আর সেই দীর্ঘকাল তাঁহার কল্পনাসৃষ্ট চরিত্র সকলকে প্রাণময় ও সঙ্গত রাখিতে হইবে ! লেখক বলেন যে, সে সময় তিনি বড় বড় উপন্যাস মানবের সাধ্যাতীত অদ্ভুত কীর্ত্তি ভাবিয়া, ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। কারণ, তাহাতে যথেষ্ট সাহস এবং নৈতিক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

পুস্তকের উৎপত্তি।

ইতিপূর্ব্বে দশ বারো বার চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থকার অকৃতকার্য্য ও কতকটা হতাশও হইয়াছিলেন। একদিন তিনি একটা খেলো রঙ্গের বাক্সের সাহায্যে কতকগুলা ছবি আঁকিয়া একটি বালকের জন্য চিত্রশালা প্রস্তুত করিতেছিলেন ; তিনি একটি দ্বীপের মানচিত্র অঙ্কিত করিলেন—সেখানি তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। সেই ক্ষুদ্র মানচিত্রে অঙ্কিত বন্দরগুলি তাঁহার কাছে সনেট অপেক্ষাও মিষ্ট বোধ হইল। অজ্ঞাতে এইখানে তাঁহার পুস্তকের উৎপত্তি হইল। এই উৎপত্তির বিবরণ খুব আশ্চর্য্য বটে। সেই মানচিত্রের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল, যেন কল্পিত কাননমধ্যে তিনি ভবিষ্যৎ গ্রন্থের চরিত্র সকল প্রত্যক্ষ করিলেন—সেই ক্ষুদ্র স্থানে যেন তাম্রবর্ণবদন, তীক্ষ্ণধার-তরবারিহস্ত মানবগণ, রত্নান্বেষণ ও যুদ্ধ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সম্মুখেই কাগজ ছিল,

তিনি পরিচ্ছেদের তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তখনই মনে হইল, হায়! কতবার এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করাই সার হইয়াছে, কার্য্য আর অগ্রসর হয় নাই। বর্ত্তমান পুস্তকে সাফল্যের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল। গ্রন্থ বালকদিগের জন্য রচিত হইবে, তাজেই ইহাতে চরিত্রবিশ্লেষণ বা রচনাচাতুরীর আবশ্যক নাই, এবং গল্প বালকদিগের কেমন লাগিবে, তাহা পরীক্ষা করা সহজ ; কারণ, এই বালকটিকে শুনাইলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ক্রমে ক্রমে পুস্তকের অনেকটা শেষ হইয়া গেল। সেই সময় তাঁহার বন্ধু ডাক্তার জ্যাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সময় পুস্তকের খসড়া লইয়া গেলেন ; কারণ, গল্পটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তিনিও "ইয়ং ফোকস্" পত্রের জন্য নূতন লেখক জোগাড় করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

প্রুফ আসিতে লাগিল, এমন সময়—সর্ব্বনাশ!—সহসা লেখকের রচনার উৎস শুষ্ক হইয়া গেল! তখন লেখকের বয়স একত্রিশ বৎসর, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও একখানি পুস্তক সমাপ্ত করিতে না পারায়, তাঁহার পিতা প্রকাশকের নিকট হইতে অর্থ দিয়া তাহা ফিরাইয়া লইয়াছিলেন—এই পুস্তকের দশা যদি সেইরূপ হয়, তাহা হইলেই কলঙ্ক ষোল আনা পূর্ণ হয়—গ্রন্থকার হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় শীতযাপনের জন্য তিনি ডেভস যাত্রা করেন। সেখানে একদিন হতাশ গ্রন্থকার আবার যন্ত্রণাময় হৃদয় লইয়া লিখিবার চেষ্টা করিতে বসিলেন। দেখিলেন, প্রতিভা সদয়! নির্ঝরমুক্ত বারিধারার মত রচনা চলিতে লাগিল, প্রতি দিন এক এক পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইতে লাগিল। তখনই রচিত অংশ পরিষ্কার করিয়া নকল করা হইয়া গেল, এবং সাহিত্য-জগতে ষ্টিভেন্সনের অমর কীর্ত্তি রচিত হইল।

পুস্তকসমাপ্তি।

গ্রন্থের নামকরণেও গোল পড়িয়াছিল। গ্রন্থকার ইহার "The Sea cook" নাম দিয়াছিলেন। শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া এই যোগ্যতর নামকরণ করেন। তিনি বলেন যে, পো, ডিফো, আর্ভিং প্রভৃতির রচনা হইতে তিনি অবশ্য সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান সহায় ও গ্রন্থের উৎপত্তির প্রথম হেতু,—সেই ক্ষুদ্র মানচিত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক অনেক স্থলে সেই মানচিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবরণ একটু আশ্চর্য্য বটে!

শেষ।

সমালোচনা।

কার্লাইল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পুর্ব্বে ইংলণ্ডের সাহিত্য-কাননে বসন্তপবনস্পর্শে কুসুমরাশির মত অনেকগুলি সাহিত্যসেবকের অসাধারণ প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ইংলণ্ডের সাহিত্যকানন এখনও সৌরভময়। কিন্তু মৃত্যুর শীতল স্পর্শে একে একে তাঁহাদিগের অনেককেই সেই অজ্ঞাত অসীম-রহস্যের দেশে লইয়া গিয়াছে, কার্লাইল তাঁহাদিগেরই অন্যতম। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কার্লাইলের প্রধান গ্রন্থ সকল সমাজ ও জাতির উপর কিরূপ প্রভাবসংস্থাপনে সফল হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার সময় বোধ হয় উপস্থিত হইয়াছে। "ফোরাম" পত্রে বিখ্যাত লেখক মিষ্টার ফ্রেডরিক হ্যারিসন সেই বিচার করিয়াছেন; তাহাতে তিনি কার্লাইলের গ্রন্থ সকলের

কার্লাইল।

গ্রন্থ সকলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একশ্রেণীস্থ গ্রন্থ সকল এরূপ বর্দ্ধনশীল স্থায়িত্বগুণসম্পন্ন যে, গণনাতীত কালের বিস্মৃতির বিনাশক বিষম প্রবাহও মানবহৃদয় হইতে তাহাদিগের প্রভাব বিধৌত করিতে পারে না। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ সকল কিছুকাল বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, কিন্তু পরিশেষে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং কেবল তাহার ঐতিহাসিকদিগের নিকট সেই সকল বহুকালের ধূলিমণ্ডিত পুস্তক মূল্যবান বলিয়া গণ্য হয়। কার্লাইলের গ্রন্থ সকলকে সহসা এতদুভয়ের কোনও শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা আশঙ্কাজনক; কিন্তু সহজেই মনে হয় যে, তাঁহার গ্রন্থসকল শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত, প্রথমোক্ত নহে। যে সকল গ্রন্থের মধ্যে চির-নূতন চিন্তা, ফলপ্রসূ ভাব নিহিত থাকে, সেই সকল গ্রন্থই বহুকালস্থায়ী হয়—কার্লাইলের গ্রন্থে এই সকল তেমন নাই। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিরচিত এই সকল মহাগ্রন্থ আজও সাধারণ পাঠকের নিকট জীবিত, এবং এখনও কিছু দিন সে সকল আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে; অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে লোকে ঐ সকল পুস্তক যেমন বিস্ময় ও আনন্দের সহিত পাঠ করিত, এখন আর তেমন করে না। বর্ত্তমান সময়ের পাঠকদিগের উপর কর্লাইলের গ্রন্থের আর তেমন অসীম প্রভাব দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থের স্থায়িত্ব।

প্রধান গ্রন্থ কি, এ বিচারের মীমাংসা সহজ বোধ হয় না। কারণ, লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কাজেই সকল গ্রন্থকারেরই সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ কি, তাহার মীমাংসা একরূপ অসম্ভব। তবে কতকগুলি প্রধান পুস্তক স্থির করা দুরূহ নহে। কঠোর দার্শনিকের সেই স্তূপাকার রচনার মধ্য হইতে পাঁচখানি গ্রন্থকে লেখক উচ্চস্থান দিয়াছেন। সে পাঁচখানি—"Sartor Resartus," "French Revolution," "Hero-worship," "Past and Present," "Cromwell." তিনি বলেন, "চারটিস্‌ম" প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ না করাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু কারণ নাই; কারণ ঐ সকল গ্রন্থ, রচনাকালে, অবতারের মহাবাক্যের মত সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর এখন এই অর্দ্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার অণুবীক্ষণের নিম্নে সে সকল স্থাপন করিলে দেখিতে পাই যে, সে সকল অতিশয়োক্তিপূর্ণ ও ভ্রান্তিবহুল। সে সকল গ্রন্থে কার্য্যগত উপায় উদ্ভাবনের নিতান্ত অভাব অনুভূত হয়। তাঁহার রচনার মধ্যে "ক্রমওয়েল" অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। এই মহাবীরের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ইংরাজগণের ভ্রান্ত ধারণা ছিল। দুই শতাব্দী ধরিয়া ক্রমওয়েলের নিন্দাবাদে সাহিত্য পূর্ণ, সে খরবাহী নিন্দাস্রোতে ইতিহাসপত্রবদ্ধ সত্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই অসামান্য সাহিত্যসেবকের গ্রন্থপ্রকাশের পরেই স্রোত ফিরিয়া গেল—তখনই অপবাদের ঘনকৃষ্ণ কাদম্বিনীজাল বিদূরিত হইল, এবং ইংরাজগণ ক্রমওয়েলের মহত্ত্ব অনুভব করিতে শিখিয়া তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইল।

প্রধান গ্রন্থ কি কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানে স্থানে কার্লাইল ভ্রান্তমত প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার "ফরাসীবিপ্লব" গ্রন্থ আজও অত্যন্ত আদৃত, এবং বোধ হয় তাঁহার অন্য কোনও গ্রন্থই সাধারণ পাঠকগণ এত পাঠ করে না; কিন্তু ইতিহাসে যে সূক্ষ্মবিচার, উদার সহৃদয়তা, তীক্ষ্ণ অন্বেষণ এবং স্থির মতই প্রাণস্বরূপ হইয়া তাহাকে জীবিত রাখে, এই গ্রন্থে তাহার অনেক অভাব অনুভূত হয়। ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার বর্ণবৈচিত্র্য, চিত্রবৈচিত্র্য, আকুল আবেগ, প্রবল-প্রবাহ প্রায় অন্য পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এ গ্রন্থ মধ্যে যে সকল ভ্রান্তমত ও অন্যায় উপসংহার আছে, তাহার সম্যক আলোচনা করিতে হইলে বিপ্লবসাহিত্যে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে হয়।

তাঁহার গ্রন্থ সকলের মধ্যে "বর্ত্তমান এবং অতীতই" বর্ত্তমান মানব সমাজের চিন্তার উপর

বিশেষ প্রভাবসংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে। কার্লাইল একজন প্রকৃত এবং মহৎ সাহিত্যসেবক; তিনি মানব এবং জড়জগৎ সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছেন, এবং ভাবিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থ মধ্যে নিহিত করিয়া ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। অসাধারণ প্রতিভা এবং মহচ্চিন্তার অধীশ্বর কোনও সাহিত্যসেবক আপনার রচনা দ্বারা যাহা করিতে পারেন, কার্লাইল তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বোধ হয় সফল হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন; সেই জন্য তিনি বহুকাল আদৃত এবং সম্মানিত হইবেন, এবং এখনও কিছুদিন পাঠকগণ আদরের সহিত তাঁহার গ্রন্থ সকল পাঠ করিবে। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার রচনাপ্রণালী এরূপ করিয়াছিলেন যে, ইংরাজী যাহাদিগের মাতৃভাষা, অথবা যাহারা ইংরাজীকে মাতৃভাষার মত করিয়া শিক্ষা করে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে বুঝিতে সমর্থ হইবে না—এবং সেই ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞদিগের মধ্যেও অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহার রচনা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার ভাষা তাঁহারই নিজস্ব সম্পত্তি, কাজেই হিউম, গিবন, স্কট, বায়রণ, ডিকেন্স এবং মেকলে, রাস্কিন বা স্পেনসারের ভাগ্যে যে যশোলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা চিরদিন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান থাকিবে, এবং যেখানেই ইংরাজী ভাষা কথিত বা শ্রুত হয়, সেখানেই এখনও বহুদিন ধরিয়া তাঁহার কতকগুলি উপাসক, তাঁহার গ্রন্থ সকল হইতে অমৃত আস্বাদন করিয়া, তাঁহাকে যশস্বী করিবে ও আপনারাও ধন্য হইবে।

সাহিত্যসেবক।

মেকলে।

মেকলের অসীম অসাধারণ গৌরব আজও ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার প্রতিভা বাদ দিলে চলে না। তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য, রচনার পারিপাট্য, শব্দবিন্যাসের মাধুর্য্য পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। তাঁহার ইতিহাস ও অমর প্রবন্ধগুলি কতদিন কালকে অবহেলা করিয়া, অক্ষুণ্ণ গৌরবে বর্ত্তমান রহিবে, তাহা স্থির করা দুরূহ—তাঁহার সুললিত কবিতা কতকাল বাল্যস্মৃতির সহিত বিজড়িত থাকিবে, তাহা বলা যায় না। সেপ্টেম্বর সংখ্যা "ফোরম" পত্রে মিষ্টার ফ্রেডরিক হ্যারিসন, সাহিত্যে মেকলের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইতিহাসসম্বন্ধীয় বিচারের সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মেকলে।

মেকলে খাঁটি 'জনবুল'। ঐতিহাসিকের পক্ষে যতদূর উদার হৃদয় আবশ্যক, বিজাতীয়দিগের সম্বন্ধে মেকলের তাহাতে কিছু কার্পণ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রবন্ধ গুলিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখক কথাটা অন্য দিক দিয়া ধরিয়াছেন। বিজাতীয়দিগের সম্বন্ধে মেকলে যে কিছু কঠোর, তাহা তাঁহার অন্ধ উপাসক ছাড়া আর কেহ অস্বীকার করিবে না। লেখক বলেন যে, তিনি মেকলের প্রশংসা করেন, কিন্তু তাহা বলিয়া ঐতিহাসিক বা সাহিত্যশিল্পী হিসাবে মেকলেকে অত্যুচ্চ স্থান দিতে তিনি সম্মত নহেন। মেকলের মত সংবাদপত্রলেখক ও সমালোচক দুর্লভ। তাঁহার রচনাপারিপাট্যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ অনেক বিষয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয়। পুস্তকরচনার পূর্ব্বে ছড়া ও গানরচয়িতাদিগের দ্বারা যেরূপ কার্য্য হইত, মেকলের রচনায় সেইরূপ কার্য্য হয়। আজকালকার সংবাদপত্রে যে রচনার ধারা ফিরিয়াছে এবং রচনা সকল সাধারণতঃ পরিষ্কার, সরল ও ধারাল হয়, মেকলের প্রভাব তাহার অন্যতম কারণ। তাঁহার মত সরলভাষী হইতে পারিলে লাভ আছে; কিন্তু ইতিহাস অর্থে তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহা বোধ হয় ভ্রান্ত বিশ্বাস।

স্থান।

মেকলে ইতিহাসকে রোমান্সে পরিণত করিতে চাহিতেন, তাই তাঁহার ইতিহাস বিশ্বাস-

যোগ্য দলিলাদি হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপন্যাস মাত্র। অবশ্য ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে, লোকে ইহা পাঠ করিতে ভালবাসে, এরূপ পুস্তক খুব আদৃত, এবং পাঠকবিশেষের পক্ষে ইহার শিক্ষাও কম আবশ্যক নহে; কিন্তু ইহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না। ইহাতে মতের উদারতা বিসর্জ্জিত হয় এবং মানব সমাজের ক্রমসূত্রতা ছিন্ন হয়। ইহা সংক্ষিপ্ত সময়ের আংশিক চিত্রমাত্র, ইহাতে বাহ্যভাবই প্রকাশিত হয়। কেবল মাত্র অনাবশ্যক খুঁটিনাটি ও হাস্যজনক মানব চরিত্র বর্ণিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কার্য্য সকলের গভীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয় না। ইতিহাস মানবজাতির সম্পূর্ণ বা আংশিক অভিব্যক্তির বর্ণনা; বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। মেকলে বলিয়াছেন যে, কবিতা ও দর্শনের মিশ্রণেই ইতিহাস উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাঁহার ইতিহাসে তিনি কবিতার স্থানে শব্দবিন্যাস এবং দর্শনের স্থানে কিম্বদন্তী ব্যবহার করিয়াছেন।

ইতিহাস ও রোমান্স।

বর্ণনাতেই মেকলের বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশিত এবং বর্ণনাতে অল্পসংখ্যক ঐতিহাসিক ও উপন্যাস লেখকই তাঁহার সমকক্ষ। অনেক স্থলে স্কট বা ভিক্টর হুগোও বর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই বর্ণনাশক্তিই তাঁহাকে সাধারণ পাঠকগণের নিকট এত প্রিয় করিয়াছে। যদি অনেক সামান্য ঐতিহাসিক অপেক্ষা মেকলের রচনায় দার্শনিকতা অল্প হয়, তথাপি তাঁহার রচনানৈপুণ্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিকদিগের সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অসামান্য বর্ণনাশক্তি সকল সময় মহৎ বিষয় বা চরিত্রবর্ণনায় ব্যয়িত হয় নাই। তাঁহার ইতিহাসের নায়ক তৃতীয় উইলিয়ম অপেক্ষা মনমাউথ বা দ্বিতীয় চার্লস্ অধিক উজ্জ্বল ভাবে পাঠকের স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকে। তিনি অনেক সামান্য বা হীনচিত্র যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, মহৎ বা জাতীয় গৌরবের চিত্রগুলি সেইরূপ ভাবে চিত্রিত করিলে, তাঁহার নিকট ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞতার ঋণ আরও বাড়িয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

বর্ণনা।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

জাপানে ভারতবাসী।

জাপান প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রতীচ্য সভ্যতার ফল। এসিয়ার বিশালবক্ষ আজও জাপানকে আপনার বলিয়া মনে করে, কিন্তু বর্ত্তমান জাপান এই প্রাচ্য কর্দ্দম প্রতীচ্য ছাঁচে ঢালিয়া নির্ম্মিত। বারি-বক্ষে ক্ষুদ্র দ্বীপ;—সেখানে অধিবাসীরা আপনাদিগের অসাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং কতক অদ্ভুত ধারণার জন্য বিখ্যাত ছিল—তাই ভ্রমণকারীরা দুই চার দিন সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপান আপনার মধ্যে আপনি বল সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই বল চীনের সহিত যুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। রক্ষণশীল চীন এতদিন প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাতি হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিল—কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে যেরূপ ফলের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে জাপানের ভাগ্যে সেই সম্মানলাভ আশ্চর্য্য নহে।

জাপান।

শ্রীমন্ত সম্পৎরাও গাইকোয়াড় জাপানে গিয়াছিলেন। তিনি জাপান সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন" পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এক জন ভারতবাসী জাপান ভ্রমণ করিয়া কি কি মত ব্যক্ত করিয়াছেন ও জাপান তাঁহার কেমন লাগিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা উক্ত প্রবন্ধের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে জাপানে সর্ব্ব বিষয়ে যেরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—জাপানযাত্রীর মনে সহজেই এই চিন্তা উদিত হয় যে, জাপান ও চীনের মধ্যে কি প্রভেদ! এক জন কঠোরতর রক্ষণশীল, অপরএক জন মহা পরিবর্ত্তনশীল। জাহাজ ইয়োকোহামায় আসিলে ভিন্ন ভিন্ন হোটেলের এজেন্টগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহারা অত্যন্ত ভদ্র। প্রায় ভূমি পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া সেলাম করিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে, এবং যাত্রী তাহার কথায় কর্ণপাত করিতে অস্বীকৃত হইলেও, সেইরূপ অভিবাদনের পর বিদায় লয়। যে যাত্রী তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হয়েন, সে তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদির ভার লয়। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া হোটেলে যাইতে পারেন। পথেই জাপানের নিজস্ব সম্পত্তি "জিনরিক্স" গাড়ীর সহিত পরিচয় হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী, দুই পাশে দুইটা বংশখণ্ড লাগান থাকে,—এবং সেই সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত বংশদ্বয় কিছু দূরে অন্য এক খণ্ড বংশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া একটা চতুষ্কোণ ক্ষেত্র সৃষ্ট করে—সেই সম্মুখের বংশে শরীর বাধাইয়া মানব-বাহক গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যায়।

জাপানে।

জাপানে সকল দ্রব্যই একটু বিশেষ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন এবং নয়নানন্দদায়ক। পুরুষ ও রমণীর বেশ প্রায় একরূপ। কেবল রমণীগণ পৃষ্ঠদেশে বস্ত্রমণ্ডিত এক প্রকার উপাধানের মত জিনিস বহন করে,এই বস্ত্রখণ্ড খুব মূল্যবান। দুইটি ফিতা দিয়া তাহা সেই সুন্দরীর শরীরে সাবধানে আবদ্ধ করা হয়। সুন্দর ও সুন্দরীর বেশ প্রায় একইরূপ, খুব ঢিলা রকমের। মোজার ব্যবহার খুবই প্রচলিত ; জুতা অনেকটা খড়মের মত। কাষ্ঠ বা খড়ের নির্ম্মিত তলভাগ দুইটি বন্ধনী দিয়া পদের সহিত আবদ্ধ করা হয়। ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য সকল অঙ্গুলি হইতে পৃথক রাখা যায়। জাপানীদিগের মস্তকাবরণের বড় স্থিরতা নাই, কেহ বা মস্তক অনাবৃত রাখে, কেহ বা ইংরাজী টুপি পরে, কেহ বা এক প্রকার জাপানী টুপি ব্যবহার করে। রমণীগণ কোনও প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করে না ; তাহাদিগের নিবিড়কৃষ্ণ কেশজাল সহজেই পরিদৃষ্ট হয়, জাপানী রমণীরা কেশবিন্যাসে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। জাপানীরা দীর্ঘকায় নহে ; তাহাদিগের বর্ণ হরিদ্রাভ ; তাহার উপর সুগঠিত নাসিকা সম্বন্ধে তাহাদের ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়, গণ্ডস্থলের উন্নত অস্থিও মুখকে কতকটা শ্রীহীন করে, সন্দেহ নাই।

বেশভূষা।

ধূমপান জাপানে অত্যন্ত প্রচলিত—সেখানে রমণীগণও নিঃসঙ্কোচে ধূমপান করেন ; তাহাতে শীলতার হানি হয় না। কারণ সেখানে তাহা রমণীর অল্পসহিষ্ণু স্নায়ুর পক্ষেও সহনীয়। পাইপগুলি খুব ছোট ছোট,—এই সকল পাইপ এবং পাইপাধার এমন সুন্দর যে, অলঙ্কাররূপে কোমরবন্ধের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধূমপান।

যে সকল বন্দরে সন্ধিপত্রানুসারে সকল জাতীয়গণ আসিতে পারে, সেখান হইতে ২৫ মাইলের অধিক দেশাভ্যন্তরে গমন করিতে হইলেই, গভর্মেণ্টের নিকট পাস লইতে হয়। সেই পাসপোর্ট যে কেবল কর্ম্মচারীগণকেই দেখাইতে হয়, এমন নহে ; যে গৃহে আশ্রয় লইতে হয়, সেই গৃহের গৃহস্বামীকেও দেখান আবশ্যক। ইয়োকোহামায় ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জাহাজ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়, কাজেই সেখানে কতকটা য়ুরোপীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। লেখক যখন বন্দর হইতে গমন করেন, তখন রাস্তার দৃশ্য বড় সুন্দর দেখিয়াছিলেন—উপভোগ্য বস্তুর অভাব নাই। তখন সাগরশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছিল—জাপানী কাগজ-নির্ম্মিত ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলোক নয়নের কি তৃপ্তিদায়ক! সেই বর্ণবৈচিত্র্য যেন কোনও মহোৎসব সূচিত করিতে-

ইয়োকোহামায়।

ছিল! জাপানীরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—প্রাণে তাহাদিগের অসীম আনন্দ! তাহাদিগের গৃহ আশ্চর্য্য পরিষ্কার। গৃহপ্রবেশের সময় তাহারা পাদুকা ত্যাগ করে। মুসলমানেরা নমাজের সময় যেমন করিয়া উপবেশন করে, তাহারা সাধারণতঃ সেইরূপ ভাবে উপবেশন করে। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন সকলেরই নিজ নিজ স্নানাগার আছে—যাহাদিগের নাই, তাহারা বাধ্য হইয়া কোনও সাধারণ স্নানাগারের আশ্রয় লয়। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় পদার্থের প্রভাবে জাপানে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ উৎপন্ন হইয়াছে—সে সকলের গন্ধক প্রভৃতি মিশ্রিত জল স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর। জাপানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে।

নিকো হইতে ফিরিয়া ইয়োকোহামায় আসিয়া আমাদের ভ্রমণকারীকে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, এবং অনেক বিষয়ে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছিল। নিকোয় তিনি যে হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই হোটেলের কর্ত্তাকে ইয়োকোহামায় একটা ভাল হোটেলের নাম করিতে বলেন। এই পর্য্যন্ত খবর লইয়া তিনি ইয়োকোহামায় উপনীত হইলেন। জিন্‌রিকস সেই হোটেলে উপনীত হইল, কিন্তু তাহা অতিথিতে পরিপূর্ণ—কাজেই হোটেলওয়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অন্য হোটেলের আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। জিন্‌রিকস্‌-ওয়ালাকে বিদায় দিয়া তিনি উপরে উঠিলেন। ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে বলা হইল, এবং চটি জুতা আনিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর, গৃহপরিচারিকা তাঁহার কক্ষ দেখাইয়া দিল।—পরিচারিকার ভ্রূ কামান এবং দন্ত কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত—জাপানে বিবাহিতা রমণীগণ এইরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই অবাক হইতে হয়—খাট, চেয়ার, বা মুখ প্রক্ষালনের সরঞ্জাম কিছুই নাই—ঘরটি পরিষ্কার, বড়গোছ; একখানা টুলের উপর একটা কেরোসিন তেলের ল্যাম্প জ্বলিতেছে, এবং এক কোণে একটা অগ্নিপাত্রে অগ্নি রক্ষিত—ধীরে ধীরে জ্বলিবে বলিয়া তাহা ভস্মাচ্ছাদিত; কিন্তু সেই ভস্মরাশি নানা চিত্রাঙ্কিত করিয়া অগ্নির উপর প্রক্ষিপ্ত;—দেখিতে বড় সুন্দর! পিকদানের প্রতিনিধিস্বরূপ এক খণ্ড বংশ টেবিলের উপর স্থাপিত। ঘরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তিনটি চর্ম্মমণ্ডিত গোলাকার উপাধানও দেখা গেল। হর্ম্ম্যতল কোমল ম্যাটিং মণ্ডিত এবং প্রাচীরে বস্ত্র ঝুলাইবার সরঞ্জাম ছিল। তিনি তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন,—তিনি শয্যা চাহেন। সেও বুঝাইতে চাহে যে, সে তাঁহার পাসপোর্ট দেখিতে চাহে। কিন্তু কেহ কাহারও ভাষা বুঝিলেন না। পার্শ্বের কক্ষে একটি বালক ছিল, সে কিছু কিছু ইংরাজি বুঝিত; সে অভিধানের সাহায্যে তাঁহাকে কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ঠিক কথাটা বুঝাইতে পারিল না। পরিশেষে বহু কষ্টে কথাটা কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইল—তিনি পাসপোর্ট খানি দিলেন, পরিচারিকা তাহা লইয়া চলিয়া গেল। সুখের বিষয়, হোটেলে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ছিল; তাহার সুমধুর রবে পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং শয্যা রচনা করিয়া দিল। আলো সহিত টুলখানি এক কোণে রাখিয়া সে হর্ম্ম্যতলে উপর্যুপরি তিনটি লেপ পাতিল, এবং একটি বালিশ দিয়া একখানা পরিষ্কার চাদর পাতিল, বালিশের জন্য বোধ হয় তুলার পরিবর্ত্তে বিচালী ব্যবহৃত হয়, কারণ নড়িলে চড়িলে বড় শব্দ হয়। তাহার পর যদি আবশ্যক হয় বলিয়া শয্যাপ্রান্তে একটি লেপও রাখিয়া গেল। সবুজ একটা মশারি টাঙ্গান হইলে, রাত্রির ব্যবহারের জন্য একটা ঢিলা জাপানি পোষাক আনিয়া দিল। প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর হাত মুখ ধুইবার জন্য তাঁহাকে নিম্ন তলে লইয়া যাওয়া হইল—তাহার পর তিনি স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একটি বালক পথ প্রদর্শন পূর্ব্ব তাঁহাকে একটা সাধারণ স্নানাগারে লইয়া গেল। সেই অনভ্যস্ত জাপনী পোষাকে তাঁহাকে দেখিয়া যে পথে জাপানীরা হাস্য সংবরণে সমর্থ হয় নাই, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য

নাই। দ্বারদেশে উপযুক্ত অর্থ দিয়া তিনি প্রবেশ করিলেন; তখনও অধিক লোক আসে নাই, এক জন মাত্র স্নানে ব্যস্ত; কিন্তু একটু সঙ্কোচ অনুভব করিতে হইল; সেই স্নানাগারে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্নান করে, এবং মধ্যে যে আবরণ টুকু আছে, তাহা প্রায় কিছুই নহে! কাজেই অনভ্যস্ত কিছু সঙ্কোচ বোধ করে। ইয়ুরোপে বা ভারতবর্ষে ইহা নূতন—কিন্তু জাপানীরা ইহাতে অভ্যস্ত, কাজেই তাহাদিগের নিকট এ ব্যবস্থা সঙ্কোচজনক মনে হয় না।

লেখক জলের উষ্ণতা পরীক্ষার জন্য সাবধানে জলে হাত দিলেন, হাত প্রায় পুড়িয়া উঠিল, জল অত্যুষ্ণ; অপর ব্যক্তির সঙ্কেতানুসারে তিনি প্রাচীরে আঘাত করিলেন। আরও জল আসিল, কিন্তু কি হইবে, ইহা আরও উষ্ণ। কাজেই সেই ব্যক্তি কি করে, তাহা দেখিতে লাগিলেন; ততক্ষণ জল অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া আসিল। জাপানীরা প্রথমে গাত্রে অত্যুষ্ণ জল ছিটাইয়া দেয়, এবং গাত্রমার্জ্জন করিবার পর ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিয়া স্নান শেষ করে। জল অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে, ভারতবাসীর কষ্টসহিষ্ণু দেহ তাহাতে নিমজ্জিত হইল। এক বিপদ যাইতে না যাইতে আর এক বিপদ উপস্থিত, আহার সম্পন্ন হইবে কিরূপে? কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে জাপানীরা মত ছোট রকমের ছুঁচলো বাঁশের কাঠী ব্যবহার করে, সেগুলি কারুকার্য্যে সুশোভিত, সুন্দর; কিন্তু জাপানীরাই তাহা ব্যবহার করিতে পারে। শেষ হাতই ব্যবহার করিতে হইল, কারণ আর উপায় নাই!

টোকিয়ো জাপানের রাজধানী, ইয়কোহামা হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূর। রেলে প্রায় এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিলে টোকিয়োয় যাওয়া যায়। পথে একজন জাপানী নৌকর্ম্মচারীর সহিত লেখকের পরিচয় হয়। কথাবার্ত্তা অবশ্য ইংরাজীতেই হইয়াছিল। তিনি লেখককে কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইতে সম্মত হয়েন, এবং অন্যগুলি দেখাইবার সুবিধা অসুবিধার কথাও বুঝাইয়া দেন। ট্রেন আসিয়া টোকিয়োয় দাঁড়াইল; যাত্রীদিগের জুতা হইতে এমন শব্দ হইতেছিল! লেখক হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হোটেলে কতকটা য়ুরোপীয় ধরণে সজ্জিত, কিন্তু পরিচারকগণ আশ্চর্য্যরূপ নম্র ও বাধ্য। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, লেখক জিন্‌রিক্‌স ভাড়া করিয়া সহরদর্শনে বাহির হইলেন। জাপানের সম্রাট মিকাডোর প্রাসাদ দেখিলেন, চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর এবং বাহিরে গড়কাটা, তাহার উপর সেতু আছে। তবে প্রাসাদের অভ্যন্তর-দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ তাহার জন্য আবার আলাহিদা পাশের বন্দোবস্ত। জাপানীরা সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞান করে এবং সম্রাট সেই সম্মানিত সূর্য্যের বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। জাপানী রাজবংশে গত ২০০০ বৎসরের মধ্যে ছেদ নাই। কাজেই বংশ খুব পুরাতন বলিতে হইবে। টোকিয়োয় অনেকগুলি মন্দির আছে—সেগুলির কাষ্ঠের উপর কমনীয় কারুকার্য্য এবং বিস্ময়কর বর্ণবৈচিত্র্য বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর। একটি মন্দিরে অতি পুরাতন বেশ এবং তরবারি সযত্নে সংরক্ষিত আছে। তরবারিগুলি এত বড় যে, মানবের ব্যবহারোপযোগী বলিয়া বিশ্বাস হয় না—তাহা দৈত্যেরই উপযুক্ত। ইহা ভিন্ন টোকিয়োর যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, উদ্যান ও পশুশালা আছে।

টোকিও।

দেখিয়া মনে হয়, জাপানীরা অত্যন্ত নাট্যশালাপ্রিয়; কারণ তাহাদিগের নাট্যশালাগুলি দিবারাত্রি খোলা থাকে। প্রবেশের জন্য টিকিটের মূল্য সামান্য; কিন্তু সেখানে নাট্যশালায় বাহ্য দৃশ্যের বৈচিত্র্য নাই। এক জন অল্প-ইংরাজি-অভিজ্ঞ জাপানীকে লইয়া লেখক একটি নাট্যশালায় গমন করেন। ম্যাটিং করা উচ্চ মঞ্চে বসিতে হইল—পরে কিছু ভাড়া দিয়া দুইটি গদি আনাইয়া লওয়া হইল। নাট্যশালা তখন পরিপূর্ণ—তাঁহাদিগের আসন নাট্য মঞ্চের সম্মুখেই সংস্থাপিত, কাজেই দেখিবার অত্যন্ত

নাট্যশালা।

করে—তাহাদিগের এই পথকে "কুসুমময় পথ" বলা হয়। আগমনসময়ে তাহারা নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহে, এবং চৌর্য্যবৃত্তি, আনন্দ, ভীতি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে। তিনি যে নাট্যাভিনয় দর্শন করেন, তাহা দস্যুবৃত্তিমূলক—দুই দল দস্যু পথে পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া অভ্যস্ত চাতুরীর সহিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু চাতুরীতে উভয় দলই অভ্যস্ত, বিলম্ব হইতে লাগিল এবং তাহারা ধৃত হইল। গল্পাংশ লেখক তাঁহার সহযাত্রী জাপানীর নিকট হইতে জানিয়া লয়েন, তবে তিনি বলেন যে, অভিনেতৃগণের অঙ্গভঙ্গী বেশ ভাবব্যঞ্জক। দৃশ্য খুব সামান্য, এক খানা বোর্ডের উভয় দিকে অঙ্কিত, এক জন লোক তাহা উন্টাইয়া দেয়। বাদ্য কিছুই নহে, রঙ্গমঞ্চের নিম্নে বসিয়া দুই জন লোক দুই খণ্ড কাষ্ঠ হইতে এক প্রকার উৎকট বাদ্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল মাত্র। নাট্যশালায় অসহ্য গরম বলিয়া লেখক শীঘ্রই চলিয়া আসেন। পথিকদিগকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে এক স্থানে একটা পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়া হয়—তাহারা দেখিতে পায়, কি নাটক অভিনীত হইতেছে, এবং তাহাদিগের কোনও বন্ধু বা পরিচিত সেখানে আছে কি না। তাহারা খুব চেঁচাইয়া ডাকাডাকি করিলেও অভিনেতৃগণ বিরক্ত হয় না। জাপানে রমণীরা অভিনয় করে না।

লেখক একবার বাজার দেখিতে গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় বাজারের মত সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নাই—তবে বাজারের মধ্যে সব দোকানেই এক দ্রব্যের একই দাম, বাহিরে অবশ্য দরদস্তুরীর দুরন্ত উৎপাত আছে।

হিন্দুর পক্ষে বারাণসী যেমন পবিত্র তীর্থ, জাপানীদের পক্ষে নিকো সেইরূপ। টোকিয়ো হইতে সেখানে যাইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। সেখানে যাইতে হইলে পাসপোর্ট আবশ্যক।

নিকো।

ষ্টেশনে টিকিট কিনিবার পূর্ব্বেই লেখককে তাহা দেখাইতে হইয়াছিল। লেখক গাড়ীর বন্দোবস্ত দেখিবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গাড়ী এবং আরোহী উভয়ই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লণ্ডনের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী কখনই এমন পরিষ্কার নহে। স্ত্রী পুরুষ একই কামরায় ভ্রমণ করে, বিদেশীয়কে দেখিয়া রমণীদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহারা জাপানী ভাষায় তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু হায়! তিনি ত জাপানী ভাষা জানেন না! কেহ কেহ নানা দ্রব্য দেখাইয়া তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার বিকৃত বিজাতীয়, উচ্চারণে হাস্য সম্বরণ করিতে কষ্ট পাইতেছিল। রেলপথের দুই দিক্‌কর দৃশ্য বড় সুন্দর—দৃষ্টিকে একবার ছুটি দাও, কেবল সবুজের খেলা—শস্য ক্ষেত্র ও ঝোপ, উচ্চ প্রান্তরে সবুজের তরঙ্গ বহিতেছে, আর জলসেচনের জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে খাল কাটা। ট্রেন ষ্টেশনে আসিলেই আহারীয় বিক্রেতারা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা প্রধানতঃ ভাত ও মৎস্য আনে। এখানে বলিয়া রাখি, জাপানীরা বড় মৎস্যপ্রিয়।

নিকোয় ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল—হোটেলের লোক ষ্টেশনেই ছিল, জিন্‌রিক্‌স ভাড়া করিয়া লেখক হোটেলের অভিমুখে চলিলেন। হোটেলটি নিতান্ত নিকটে নহে। প্রথমে একটি পর্ব্বতারোহণ করিতে হইল, পরে একটি কাষ্ঠের সেতু পার হইয়া খানিকটা বালুকাময় জমী, জিন্‌রিকস-ওয়ালার অতিরিক্ত পরিশ্রম আশঙ্কা করিয়া লেখক পদব্রজে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। হোটেলটি ছোট এবং তাহার গঠনপ্রণালী ও বিশেষ প্রশংসার্হ নহে। সম্মুখে একটি ছোট উদ্যান—একটু দূরে সবুজ বৃক্ষলতামণ্ডিত একটি গণ্ডশৈল এবং তাহারই পদতলে

গ্রাম।

একটি কলবাহিনী স্বচ্ছ সুন্দর স্রোতস্বতী। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়; সে দিন সেই ক্ষুদ্র নিকো—একখানি গ্রাম মাত্র, আর ভাল

পুস্তকে কয় জন মাদ্রাজীর নাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। পর দিবস প্রভাতে লেখক গ্রাম দেখিতে বাহির হয়েন, সেখানকার দৃশ্য মনোরম, মুগ্ধকর। জাপানীরা বলিয়া থাকে যে, "নিকো দেখিবার পূর্ব্বে চমৎকার কথা ব্যবহার করিও না"—তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। একটি সুন্দর উপত্যকার শ্যামল শান্ত বিজন বক্ষে নিকো সংস্থাপিত—নিকট দিয়া একটি স্রোতস্বতী স্বচ্ছ বারিরাশি বহন করিয়া চলিয়াছে। এখানে আসিবার সময় যে নদীর একটি সেতু পার হইয়া আসিতে হয়, তাহারই পার্শ্বে আর একটি সেতু আছে, সেটি সম্রাট দিগের ব্যবহার্য্য। এই সেতু বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত, দুই তীরে দুইখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর ইহা সংস্থাপিত এবং লোহিতবর্ণে চিত্রিত;—সম্রাট ভিন্ন আর কেহ ইহার উপর দিয়া গতায়াত করিতে পারে না।

সকল দেশেই দেখা যায় যে, লোকে ধর্ম্মকর্ম্মে যত অর্থ ব্যয় করে, অন্য কোনও বিষয়েই তত ব্যয় করিতে সম্মত হয় না; তাই সর্ব্ব দেশেই দেবমন্দির সকল অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ। নিকোর ধর্ম্মমন্দিরনির্ম্মাণেও বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরে জাপানী স্থপতি, চিত্রকর ও সূত্রধরের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। সেখান হইতে ইয়োকোহামায় প্রত্যাগমন করিয়া, জাপানের সৌন্দর্য্যময় সুখস্মৃতি সঙ্গে লইয়া, আমাদের স্বদেশী ভ্রমণকারী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পচন।

এ নশ্বর মর জগতে সকল বস্তু নিতান্ত অস্থায়ী। মরণশীলতা প্রত্যেক দৃশ্য পদার্থের এক বিশেষ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জড়, উদ্ভিদ ও জন্তু রাজ্য সকলের উপরেই মহা মরণের একছত্র অখণ্ড প্রভুত্ব নির্ব্বিশেষে বিস্তারিত। জন্মিলেই মরণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনও জীব মরিলে পর, তাহার কি পরিবর্ত্তন হয়? আমরা অবশ্য এখানে দার্শনিকের আধ্যাত্মিক কূট প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি না। অথবা স্বনামখ্যাত, রামপ্রসাদের "বল দেখি ভাই কি হয় মলে" এই জটিল প্রশ্নোত্তরের বিচার করিবার ইচ্ছাও করি নাই। মরিলে পর কি হয়—আমাদের এই প্রশ্নের সহিত আধ্যাত্মিক বা অধ্যাত্মরাজ্যের কোনও সম্পর্কই নাই। বরং সম্পর্ক যদি কিছু থাকে, তাহা নিতান্তই বিপরীত দিকের। আমরা নিতান্ত স্থূলদর্শী পৃথিবীর লোকের ন্যায় পৃথিবীর উপর বসিয়াই আমাদের এই স্থূল দেহ মৃত্যুর পর কি পরিবর্ত্তন লাভ করে, এবং কিরূপে সে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, স্থূল জ্ঞান দ্বারা তাহারই আলোচনা করিব। কেবল আমাদের স্থূল দেহ নহে; অগণ্য পশু পক্ষীর বিশেষ বিশেষ প্রকারের দেহপিঞ্জর, অগণ্য উদ্ভিদ ও তরু-লতা গুল্মের ধরাশায়ী কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র ফুল ফল মরণাধীন

যদিও প্রত্যেক দৃশ্য পদার্থ মরণশীল, অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল, আদৌ মূল রূঢ় পদার্থ সকল অবিনাশী) তাহাই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং প্রথম হইতেই পাঠকদিগকে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা সেই অতীন্দ্রিয়, অদৃশ্য, বায়বীয় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যের সহিত কোনও সম্পর্কই রাখিব না। বিশেষ, আমরা যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, আমাদের প্রবন্ধশীর্ষস্থ প্রস্তাবের আলোচনা করিব, সে বিজ্ঞান নিতান্ত বিশুদ্ধ, ও সম্পূর্ণ ভাবেই জড়বিজ্ঞান। এক্ষণে জড়বিজ্ঞান, উদ্ভিদ ও জন্তুর মৃত্যুর পর উহাদের স্থূল জড়দেহ যে রূপান্তর লাভ করে, তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

আমরা নিয়তই দেখি, পত্র, পুষ্প, বা ফল বৃক্ষশাখা হইতে ভূপতিত হইয়া, পচিয়া অল্পকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সুপক্ব ফল দুদিনের পরে আপনিই পচিতে থাকে; সময় থাকিতে উদরসাৎ না করিলে অচিরে মিষ্টতার পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে ঔদ্ভিদিক অস্তিত্বের অবসান করে। জন্তুশরীর মরিবার পর, অগ্নিসংকার না করিলে, শীঘ্রই পচিয়া বিকৃত হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যে তাহার জান্তব বিকাশের কোনও চিহ্নই থাকে না। রাশি রাশি তৃণ শষ্প শুষ্ক হইয়া কোথায় কিরূপে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইতেছে, আমরা অনেক সময়ে তাহার অনুসন্ধানই রাখি না। এ বিচিত্র বিস্ময়োদ্দীপক বিশ্বসংসারে পরিবর্ত্তন এক মহা নিয়ম। স্থানকালপাত্রনির্বি-শেষে পরিবর্ত্তন-চক্র নিঃশব্দে কিন্তু অব্যাহত বেগে অহর্নিশি ঘুরিতেছে। জীবন-স্রোতের বিরাম নাই। এক বৃক্ষ যাইতেছে, অন্য বৃক্ষ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এক জীবের মৃত্যু হইলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য জীবের উত্থান হই-তেছে। খরবাহী জীবন-স্রোত খরবেগে অগণিত কাল হইতে ভূপৃষ্ঠে বহিয়া যাইতেছে। জীবরাজ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জন্তুরাজ্য সেই জীবন-স্রোতে অনু-প্রাণিত হইয়া অনাদিকাল হইতে অসংখ্য অগণ্য প্রকারের জীবন-বিকাশ করিতেছে। কিন্তু যদি আমরা মনে রাখি যে, আমাদের এ ভূপৃষ্ঠ অসীম আয়-তনের নহে, ইহার উৎপাদিকা শক্তি অশেষ নহে, এবং ইহার ভাণ্ডারও অক্ষয় নয়; অথচ এক অনন্ত জীবনপ্রবাহ অবিরাম গতিতে উদ্ভিদ ও জন্তু পরিবারের মধ্য দিয়া আজ কত বৎসর ধরিয়া; ছুটিতেছে, আজ কত অগণ্য অসংখ্য উদ্ভিদ, অসংখ্য জন্তু জন্মিতেছে আজ কত কাল ধরিয়া; তাহা হইলে একবার ভাবিতে হয় যে, অনন্ত অগণ্য জীব-প্রসূ হইয়াও এ ধরা কিরূপে এখনও অক্ষুণ্ণ শক্তিতে জীব-প্রসবিনী হইতেছে। আমরা জানি, খুব আওল জমীতেও

উপর্য্যুপরি কয়েকবার চাষ করিলে উহা অনুর্ব্বরা হয়,—এমন কি, কৃত্রিম উপায়ে সার না দিলে, সে জমি শস্যপ্রসবে নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়ে। অথচ আমাদের পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিবার জন্য, অথবা নানা আরণ্য ফল মূল তৃণ, গুল্ম, তরুলতা দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য, কেহই অবিশ্রান্ত সার প্রদান করিতেছে না। পৃথিবীর এ সার কোথা হইতে আসে? অবশ্য আমাদের খাদ্যোপযোগী ফল মূল ও শস্যের তুলনায় আণ্য বৃক্ষলতা অশেষ পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে জন্মে, যাহা হইতে আবার অনেক নিকৃষ্ট জীব স্বস্ব জীবন ধারণ করে। এ বিপুল অরণ্যানীর উৎপাদন করিবার জন্য কে কোথা হইতে ক্রমাগত পৃথিবীপৃষ্ঠকে সারযুক্ত করিতেছে? আর আমরা জানি, যে কতিপয় রূঢ় পদার্থ লইয়া পৃথিবীর জীবদেহ পরিগঠিত, তাহারা অমিত পরিমাণের বা অফুরন্ত নহে। যে অগণ্য অগণ্য বৎসর ধরিয়া ধরিত্রী জীব-প্রসবিনী হইয়া আসিতেছে, এবং যে অশেষ প্রকারের অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইতেছে, নিশ্চয়ই কোনও কালে সেই সকল পরিমিত রূঢ় পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু আজও তাহা হয় নাই। কেবল তাহাই নহে; অক্ষুণ্ণভাবে ও অপ্রতিহত বেগে জীব-বিকাশ আজও তেমনি চলিতেছে, এবং আরো কত কাল চলিবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? রূঢ় পদার্থনিচয়ের ঈদৃশ অফুরন্ত হইবারই বা কারণ কি? পাঠক! আসুন, বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলেন, আমরা তাহাই দেখি।

Matter is indestructible. সুতরাং কোনও একটি জীবের (এ প্রবন্ধে 'জীব' শব্দ উদ্ভিদ ও জন্তু, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইল) মৃত্যু হইলে তাহার দেহনিহিত অসংখ্য রূঢ় পদার্থ নিশ্চয়ই কোনও রূপে বিমুক্ত হইয়া পড়ে। মৃতদেহ সমাহিতই কর, অথবা অগ্নিসাৎ কর, তন্নিহিত আদিম পদার্থগুলি, যাহাদের সমবায়ে ও রাসায়নিক সংযোগে উহা পরিগঠিত, তাহারা নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত হইয়া যায় না। যে অবস্থার ভিতর দিয়া যাক্ না কেন, রূঢ় পদার্থনিচয় কেবল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, কখনই বিনষ্ট হয় না। ইহারা অবিনাশী, অক্ষয় অমর বলিয়াই, এ পৃথিবীর মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, এক অনন্ত জীবনপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। "Perpeatulity of life," মৌলিক পদার্থনিচয়ের এই এক বিশেষ ধর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

মৃতদেহের চরম সৎকার নিয়ম জাতিভেদ ও দেশভেদে স্বতন্ত্র হইলেও, প্রকৃতির মধ্যে এক সার্ব্বভৌমিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, মরিলেই জীবদেহ

ধীরে ধীরে পচিয়া নিঃশেষিত ও অস্তিত্বশূন্য হইবে। জীবন্তদেহ যেমন মৃত্যুর অধীন, সেইরূপ মৃতদেহ পচনের অধীন। জন্মিলেই মরণ যেমন প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম, সেইরূপ মরিলেই পচন, ইহাও এক অনিবার্য্য নিয়ম। পচন দ্বারাই সমুদয় যৌগিক জান্তবদেহ রূঢ়পদার্থে পরিণত হইয়া প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে, এবং সেই জন্যই অনন্ত জীব-প্রবাহ ভূপৃষ্ঠে সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু পচনকার্য্য কিরূপে সমাহিত হয়? আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চতুস্পার্শ্বস্থ নানাবিধ জন্তু ও উদ্ভিদের পরিণাম সম্বন্ধে যেরূপ পরিদর্শন করি, তাহাতে সহজেই মনে করি যে, কোনও পদার্থের অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্মের ন্যায় পচনশীলতাও তাহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম। জীবন শেষ হইলে, জীবদেহ আপনিই পচিবে। কেন না, পচাই তাহার ধর্ম্ম। কিন্তু এ সংসারের অনেক প্রাকৃতিক তথ্য যেমন আমাদের সহজ প্রতীতির ঠিক বিপরীত, পচনসম্বন্ধে আমাদের সহজ ধারণাও সেইরূপ প্রকৃত তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। পচন কোনও পদার্থবিশেষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। যদি একটা মৃতদেহকে, মরিবার অব্যবহিত পরেই এমন এক পাত্র মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, যাহার মধ্য হইতে সমস্ত বায়ু নিষ্কাশিত করা হইয়াছে, এবং যাহাতে পুনরায় বায়ু প্রবেশেরও কোনও পথ নাই, সেইরূপ পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া উক্ত মৃতদেহ অনন্তকাল অবিকৃত থাকিতে পারে, উহা কখনই পচিবে না। কিম্বা যদি উহাকে সম্পূর্ণরূপে বরফের মধ্যে সমাহিত করা হয়, তাহা হইলেও উহা বিকৃত হইবে না, পচিবে না। দূরদেশ হইতে মাংস, মৎস্য বা সুপক্ক ফল মূল পাঠাইবার সময় বরফ দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া পাঠাইলে যে উহারা পচে না, পাঠকেরা বোধ হয় তাহা বিলক্ষণ জানেন। সুতরাং যদি বিশেষ অবস্থার মধ্যে মৃত জীবদেহ না পচে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পচন জীবশরীরের স্বাভাবিক অথবা বিশেষ ও অনিবার্য্য ধর্ম্ম নহে। তবে, এ বিশাল প্রকৃতি যুড়িয়া অবিশ্রান্ত যে পচনকার্য্য চলিতেছে, তাহার কারণ কি? কিসের জন্য অথবা কাহা কর্ত্তৃক অনন্ত অগণ্য জীবশরীর পচিয়া পুনর্ব্বার মূল রূঢ় পদার্থে পরিণত হইতেছে?

উত্তর।—আনুবীক্ষণিক, অনন্তগুণে ক্ষুদ্র কতকগুলি উদ্ভিদণুই সর্ব্ববিধ যৌগিক জীবদেহকে পচাইয়া রূঢ় পদার্থে পরিণত করিতেছে। চক্ষুর অগোচর কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু-বংশই, এই বিশাল প্রকৃতি ব্যাপিয়া যে এক মহা পচন-যজ্ঞ সাধিত হইতেছে, তাহার একমাত্র হোতা। অগণ্য, অমিত

অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণু মৃত জীবশরীরে অধিষ্ঠান করিয়া নিঃশব্দে সেই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছে। পাঠক! নিশ্চয়ই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব কখনই স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, তাহার ন্যায় জ্ঞান-গরিমা, পদ-মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন মনুষ্যের দিব্যকান্তি, সুদর্শন, অহমিকাধার দেহ, সেই উন্নত ও সংস্কৃত শোণিতপুষ্ট মেদ, মাংস অস্থি পঞ্জর, অতি সামান্যতম ও নগণ্য উদ্ভিজ্জাণুর পচন-মহাযজ্ঞের যজ্ঞ-ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

যে অগণ্য উদ্ভিজ্জাণু পচন-যজ্ঞের হোতা, তাহাদিগের সাধারণ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা "ব্যাকটেরিয়া"। * ইহারা মৃত জৈবিক পদার্থ হইতে আপনাদের শরীরপোষণোপযোগী খাদ্যসংগ্রহ করিতে গিয়া, জটিল যৌগিক জীবদেহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। বিশ্লেষণকালে নানাবিধ রূঢ় পদার্থ এবং সরল যৌগিক পদার্থ বিমুক্ত হয়। উহাদের মধ্যে কতকগুলি খনিজ, আর কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ থাকে। খনিজ পদার্থ পৃথিবীর মৃত্তিকার সহিত মিলিয়া যায়, এবং বায়বীয় পদার্থ বায়ুসহ মিলিয়া থাকে, কিম্বা কোন খনিজ পদার্থের সহিত মিশিয়া পৃথিবীর উপরেই থাকে। সুতরাং যে রূঢ় পদার্থ লইয়া যৌগিক জীব শরীর গঠিত হয়, শরীর পতিত হইলে, সেই রূঢ় পদার্থ সকল অক্ষুণ্ণভাবে পুনরায় পরিমুক্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই প্রকৃতির ভাণ্ডার অক্ষয়, এই জন্যই অগণ্য জীব উদ্ভিদ ও জন্তু জন্মিলেও মূল পদার্থের শেষ হয় না। ভূপৃষ্ঠ হইতে নানা খনিজ পদার্থ সার রূপে লইয়া এবং বায়ু হইতে নানা বায়বীয় পদার্থ লইয়া বৃক্ষশরীর, পত্র, ফুল, ফল পরিগঠিত ও পরিপুষ্ট হইল। বৃক্ষ মরিয়া গেলে উহারা সকলেই পচিয়া অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া, পৃথিবীকে খনিজ পদার্থ ফিরাইয়া দিল, বায়ুতে বায়বীয় পদার্থ প্রত্যর্পণ করিল। তাই পৃথিবী সারশূন্য হয় না, তাই পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি, অগণ্য বৎসর ধরিয়া কত অগণ্য উদ্ভিদ প্রসব করিয়াও এক বিন্দু হ্রাস হয় না। তাই অবিচ্ছেদে, অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ ভাবে জীব-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে।

উদ্ভিজ্জাণু যে পচনের একমাত্র কারণ, ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিকেরা নানা মতবাদ প্রচারিত করিয়া পচন-সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন। তন্মধ্যে যে যে মতবাদ উদ্ভিজ্জাণু-মতবাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে

---

* পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের "ভারতীতে" লেখকের উক্ত-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।—লেখক।

প্রচলিত ছিল, তাহা সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত লীবিগ ও বার্জ্জোলিয়সের মতবাদ। বাস্তবিক লীবিগ বা বার্জ্জোলিয়স সে মতবাদের প্রবর্ত্তক নহেন। উহা অনেক প্রাচীন কাল হইতেই চলিত ছিল। তবে তৎকালে পণ্ডিতবর লীবিগ উহা পুনর্জ্জীবিত করেন। এই জন্য উহা লীবিগের মতবাদ বলিয়াই বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলে সুপরিচিত ছিল, এবং সর্ব্বত্র মানিত হইত। এই মতবাদানুসের বায়ুর অম্লজানই নাইট্রোজেন-সম্বলিত জৈবিক পদার্থের যৌগিকাণুর (molecules) বিশ্লেষণসাধনের প্রথম কারণ। পরে যৌগিকাণবিক শক্তি (molecular motions) ক্রমে ক্রমে এক যৌগিকাণু হইতে অপর যৌগিকাণুতে বিস্তারিত হইয়া, সমুদায় যৌগিক পদার্থকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, রূঢ় পদার্থে পরিণত করে। বার্জ্জোলিয়সের মতবাদ লীবিগের মত হইতে একটু স্বতন্ত্র। বার্জ্জোলিয়স বলিতেন, জীবশরীরে যে য়্যাল্‌বিউমেন্ বা নাইট্রোজেন্ সম্বলিত পদার্থ থাকে, তাহারই অন্তর্নিহিত এমন এক গূঢ় শক্তি আছে, যাহা দ্বারা আপনাআপনিই উক্ত জীব দেহ বিকৃত হইতে থাকে। তিনি এইরূপ শক্তিকে উক্ত পদার্থের catalyctic force অর্থাৎ বিনাশী শক্তি আখ্যা প্রদান করিতেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পচন সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করা হয়, তখন বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছিলেন যে, মৃত জীবদেহকে নির্বাত পাত্র মধ্যে স্থাপিত করিয়া অথবা বায়ু প্রবেশরহিত পাত্রমধ্যে পুরিয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাপ প্রদান করিয়া রাখিলে, উহা কিছুতেই বিকৃত হয় না। কিন্তু উহাতে কোনও মতে পুনঃর্ব্বার বায়ু প্রবেশ করিতে দিলে, কিম্বা উক্ত মৃতদেহ অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করিলে, দেহ পচিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই অনুমিত হইত যে, বায়ুর অক্‌সিজেন্‌ই মূল পদার্থের বিকৃতিকরণের একমাত্র কারণ।

সর্ব্বপ্রথমে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর উদ্ভিজ্জাণু-মতবাদের অবতারণা করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নানাবিধ ফার্মেণ্টেশনের মধ্যে জৈবিক পদার্থের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া, উদ্ভিজ্জাণুরাই নানা ফার্মেণ্টেশনের কারণ, ইহা নির্দ্দেশ করেন। মৃত উদ্ভিদ ও জন্তুদেহের পচনও একরূপ ফার্মেণ্টেশন। অন্য ফার্মেণ্টেশনের মূল নীতি ওয়া, পচন-ফার্মেণ্টেশনের মূল নীতিও তাই। বিশেষ পার্থক্য এই যে, জন্তুশরীরের নানাবিধ জটিল যৌগিক পদার্থ মুক্ত হইবার কালে গন্ধক ও ফস্ফরস প্রভৃতি কতিপয় দুর্গন্ধময় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাই পচা জন্তুশরীর হইতে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ উঠে। পচন-ফার্মেণ্টেশন এই

বিশেষ প্রকারের দুর্গন্ধের জন্য অন্যবিধ ফার্মেণ্টেশন হইতে সচরাচর পৃথক করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও মৃতজীবদেহ-পচন প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার ফার্মেণ্টেশন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের উদ্ভিজ্জাণু পৃথিবীর সমুদয় মৃত জৈবিক পদার্থের পচন-কার্য্য সম্পন্ন করে। এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণু,—যাহারা অম্লজান ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে ; অপর প্রকার,—যাহারা অম্লজানের সাহায্য ব্যতীত জীবনধারণ করিতে সক্ষম নহে। শেষোক্ত প্রকারের উদ্ভিজ্জাণুরা মৃত পদার্থের উপরিভাগে জন্মে, এবং প্রথমোক্ত প্রকারের উদ্ভিজ্জাণু অভ্যন্তরদেশে জন্মে। বলিতে গেলে, যেন দুই বিভিন্ন বংশের উদ্ভিজ্জাণু পচন-কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আপনাদের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছে। যে উদ্ভিজ্জাণু বংশ অম্লজন ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে, তাহা মৃত পদার্থের অভ্যন্তর-দেশ আক্রমণ করিয়া নানা জটিল যৌগিক পদার্থ হইতে সরল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দেয়। আর যে বংশ অম্লজান ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারে না, তাহা সরল যৌগিক পদার্থদিগকে ভাঙ্গিয়া রূঢ় পদার্থে পরিণত করে। পাঠকদিগের সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, আমাদের এই দেহ, যদিও শোণিত, মেদ, অস্থি, পেশী, মাংস, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, শিরা প্রভৃতি নানারূপ জটিল পদার্থের সমবায়ে পরিগঠিত, কিন্তু মূলতঃ কেবল ছয়টি রূঢ় পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে ছয়টি রূঢ় পদার্থ এই—অঙ্গারক, যবসক্ষারজান, অম্লজান, উদজান, গন্ধক ও ফস্ফরস্। উল্লিখিত দ্বিবিধ উদ্ভিজ্জাণুর সমবেত কার্য্য দ্বারা জীবদেহের কেবল ঐ ছয় প্রকার রূঢ় পদার্থে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

এখানে একটি বিষয় বিশদ করা আবশ্যক। আমরা যত দূর দেখিলাম, তাহাতে অনেকের মনে হইতে পারে যে, অম্লজান-বাষ্প পচনকার্য্যের কোনও সহায়তাই করে না। বাস্তবিক তাহা নহে। তবে ইহা সত্য যে, অম্লজান সাক্ষাৎ ভাবে পচনকার্য্যের কোনও সাহায্যই করে না। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে যথেষ্টই করিয়া থাকে। কারণ,—যে উদ্ভিজ্জাণুরা উপরিভাগে থাকিয়া সরল যৌগিক পদার্থদিগকে রূঢ় পদার্থে পরিণত করে, তাহারা অম্লজান ব্যতিরেকে আদৌ জীবনধারণ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের জন্ম অম্লজান নিতান্ত আব-শ্যক।-আদৌ যখন উক্ত উদ্ভিজ্জাণুদ্বয়ে কোনও যৌগিক পদার্থ হইতে অঙ্গারক,

সকলের কেহ কেহ বায়ুর অম্লজান সংস্পর্শে অম্লাঙ্গারক বাষ্প, জলীয় বাষ্প কেহ বা য়্যামোনিয়া বাষ্প (য়্যামোনিয়া অম্লজান থাকে না) প্রভৃতি রূপে প্রস্তুত হয়। প্রকৃতির মধ্যে এরূপ সরল নানা যৌগিক পদার্থের যে অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, —তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং অম্লজান বাষ্প পরোক্ষভাবে পচন-কার্য্যের যে বহুল সহায়তা করে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। তবে অম্লজান সাক্ষাৎভাবে পচনকার্য্যের কোনও সহায়তা করে না।

পচনতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে আমরা দেখিতেছি যে, এ পৃথিবীতে একটি জীবের মৃত্যু হইলে, অনতিবিলম্বে সেই জীবদেহে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অগণ্য নূতন জীব বা জীবাণুর আবির্ভাব হয়। ইহারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া সরিয়া গেলে, ইহাদের দেহাবশেষ ধ্বংস করিবার জন্য আবার নূতন জীবাণু তাহার স্থল অধিকার করে। এইরূপে অনেক ধ্বংস হইয়া যাইবার পর যখন আর কোনরূপ জৈবিক পদার্থ না থাকে, তখন সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার জীবাণু তিরোহিত হয়। অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি সামান্য পরিমাণও যবক্ষারজান সংযুক্ত জৈবিক পদার্থের অবশেষ থাকে, উদ্ভিজ্জাণুর শেষ হয় না। এইসকল উদ্ভিজ্জাণু বায়ুর সহিত অমিত পরিমাণে মিশিয়া আছে। জীবদেহের মৃত্যু হইলেই—আপনাদের আহারীয় সংগ্রহের জন্য তদুপরি পতিত হইয়া তন্মধ্যে অধিষ্ঠান করে ও ক্রমসঃ বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহারা অত্যধিক তাপ বা শৈত্যে মরিয়া যায়। সুপক্ক ফল, মাংস বা মৎস্য বরফের মধ্যে রাখিয়া দূরদেশে পাঠাইলেও যে পচে না, তাহার কারণ এই যে, বরফের শৈত্যের মধ্যে উক্ত উদ্ভিজ্জাইরা বাঁচিতে পারে না। সুতরাং জিনিষগুলিও নষ্ট হয় না। এই জন্যই তুষরাচ্ছন্নমেরুপ্রদেশের তুষারাভ্যন্তর হইতে অনেক প্রাচীন কালের জন্তুদেহও সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থায় বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে। অত্যধিক উত্তাপের মধ্যে উক্ত উদ্ভিজ্জাণুরা বাঁচে না; সেই জন্যই বেশী উত্তাপের মধ্যেও জান্তব পদার্থ বিকৃত হয় না। আর আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই, যে বলিয়া আসিয়াছে যে, বায়ুশূন্য পাত্রমধ্যেও মৃতদেহ পচে না, তাহারও কারণ এই যে, পাত্রবায়ু শূন্য হওয়াতে, কোন উদ্ভিজ্জাণু-বীজ আর তাহার মধ্যে থাকে না। তাই উহা পচিতেও পারে না।

উপসংহার করিবার-পূর্ব্বে পাঠক আসুন, আমরা একবার চিন্তা করি যে, যদি এই উদ্ভিজ্জণুপৃথিবীর মৃত জৈবিক পদার্থনিচয়কে পচাইয়া আদিম

অবস্থা হইত! প্রথমতঃ, নানা উদ্ভিদ ও জন্তু জন্মিয়া এবং মরিয়া পৃথিবীর এমন এক অবস্থা ঘটাইতে পারিত, যখনমৌলিক পদার্থাভাবে জীববিকাশ অসম্ভব হইত। দ্বিতীয়ত, এই ধনধান্য ভরা, পরম রমণীয় পৃথিবী এক নির্বিশেষ শ্মশানভূমি হইয়া থাকিত। অগণ্য শুষ্ক বৃক্ষ, লতা, পত্র, ফুল, ফল, অগণ্য মৃত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পাশাপাশি পড়িয়া থাকিত। সম্পূর্ণ অবিকৃত অসংখ্য মৃত উদ্ভিদ ও জন্তুদেহ সমুদয় ভূপৃষ্ঠে ছাইয়া রাখিত। হয় ত তাহাদের জন্য এমন একবিন্দু স্থান থাকিত না, যেখানে একটি তৃণও জন্মিতে পারে। তৃতীয়তঃ, পৃথিবী সত্বর উৎপাদিকা-শক্তি-বিহীন হইয়া পড়িত। উপযুক্ত, সারেভাবে বৃক্ষ-লতা তৃণ জন্মিত না, ফল পুষ্প প্রসূত হইত না। সুতরাং জন্তু-জগৎ—উদ্ভিদ ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতেও সমর্থ হইত না। পৃথিবী জীব জন্তুশূন্য হইত। থাকিত কেবল এক ভীষণ দৃশ্য! এ পৃথিবীর পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া শবের উপর শব, মৃতদেহের পার্শ্বে মৃতদেহ; মনুষ্য, পশু, তরু লতা উপর্য্যুপরি, পাশাপাশি, পর্ব্বতাকার স্তূপসদৃশ; শ্মশান অপেক্ষাও ভয়ানক মহা শ্মশান। কেবল ভূপৃষ্ঠ নহে; সাগর-সারিৎসিন্ধু, হ্রদ, নদনদী, সরোবর—সমুদয় জলাশয় জলজ অশেষ প্রকার উদ্ভিজ্জ ও জন্তুর সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইত। অশেষ প্রকারের জলজ জন্তু ও উদ্ভিদ মরিয়া জলরাশিকে পূর্ণ ফলিয়া ফলিত। হয় ত মহাসাগরবক্ষ—অগণ্যমৃত জীবদেহে সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণ হইয়া যাইত।

শ্রীপতিচরণ রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। এই সংখ্যার প্রথমে, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, "রূপ সনাতন" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, রূপ ও সনাতন তাঁহাদের অপরিচিত নহেন। এই দুই বৈষ্ণব ভ্রাতার বৈরাগ্যকাহিনী বঙ্গ-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। ইহাঁদের বৈরাগ্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বৈষ্ণব সমাজের গৌরবের বস্তু। রূপ ও সনাতনের সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে যে সকল উক্তি ও কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন, "পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রূপ সনাতন অর্থলোভে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ও যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অতি শোচনীয় ঘটনা। * * এমন এক দিন আসিল, যখন দুই ভ্রাতা আপনাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। * * দুই ভ্রাতা অবশেষে রাজপ্রসাদ হারাইয়াছিলেন। * * রূপ দণ্ডভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, সনাতন কারারুদ্ধ হইলেন। * * আভাসে জানা যায়, (রাজা) রূপকে প্রজাপীড়ক অত্যাচারী দস্যু বলিয়া জানিতে পারেন—* * সনাতনের কি দোষ ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। এই পর্য্যন্ত লিখিত আছে, রূপ পলায়ন করিবার পর তিনি হঠাৎ পীড়ার ভান করিয়া রাজবাটীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিলেন। হুসেন সাহ বৈদ্য পাঠাইয়া জানিলেন, পীড়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহাতে আভাসে সনাতন যে মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী ছিলেন, তাহা জানা যায়। হুসেন সাহ * * তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। * * বৈষ্ণবেরা বিবেচনা করেন যে, কেবল বৈরাগ্যবশতই রূপ সনাতন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহা প্রকৃত বিবেচনা হয় না। * * ভগ্নাঃ কুবের্ভাগবতা ভবন্তি—রূপ সনাতন ইহারই উদাহরণ। জীবনের এই শেষ দশায় তাঁহারা ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" এই অভিনব বিরুদ্ধ মতবাদ পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। "জ্যোতি" নামক নবপ্রকাশিত মাসিকের সমালোচ-নায় তাহার প্রকাশ্য পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। উমেশ বাবু প্রমাণপ্রয়োগসহকারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্য প্রতিবাদ না হইলে,—তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও আপত্তি দেখা যায় না। উপসংহারে উমেশ বাবু বলিতেছেন, "ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনে অনুকরণীয় কিছুই নাই। তাঁহারা উভয়েই জীবনযাত্রার পথহারা পথিক। উভয়েরই গতি সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ কামের সেবাই জীব-নের সরল পন্থা ; তাহার এক দিকে পাপের পঙ্ক, অন্য দিকে বৈরাগ্যের মরু। তাঁহাদের জীবনের এক ভাগ সেই পঙ্কে, অপর ভাগ সেই মরুতে যাপিত হয়। তবে যদিও তাঁহারা আমাদের অনুকরণের যোগ্য না হয়েন, তত্রাচ আমাদের শিক্ষার স্থান বটেন। লোভপুরতন্ত্র হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কি বিষময় ফল ফলে, মনুষ্য কিরূপে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হয়,

তাহা এই দুই ভ্রাতার জীবনে দেখা যায়।" "সুখী" কার্য্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রীর একটি কবিতা। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "বৌদ্ধ-সঙ্ঘ" একটি উপাদেয় প্রবন্ধ। লেখক এবার 'ভিক্ষুণী সঙ্ঘের' বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি"—দশম প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর "স্ত্রীশিক্ষা-বিবরণ"—তৃতীয় প্রস্তাব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, এই সংখ্যায় "বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেনেজ বিলের" বিস্তৃত সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাভাবিক ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, গবেষণা এবং বঙ্গীয় গ্রাম ও গ্রামবাসীগণের অবস্থায় বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়; আমরা এই প্রবন্ধের প্রতি বেঙ্গল গভর্মেণ্ট ও তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির "বঙ্গের আদিকবি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর" প্রবন্ধের প্রথমাংশ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ" সম্পাদক লিখিয়াছেন। ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার জন্য নব্যভারত সম্পাদক যে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে অনবরত পরিশ্রম করিতেছেন, সে জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহার এই ছাব্বিশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিস্তৃত রিপোর্ট মাসিকের উপযুক্ত নহে। মাসিক পত্রের উপযোগী করিয়া রচনা করিলে, এতদ্দ্বারা অনেক অধিক কাজ হইতে পারিত। ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত হতভাগ্যগণের দুর্দ্দশার কথায় চক্ষে জল আসে—সংক্ষেপে বলিতে পারিলে, এই প্রবন্ধ অনেক পাঠককে আকর্ষণ করিতে পারিত। যাহা হউক, সাধু উদ্দেশ্য ও সহৃদয়তার জন্য নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ। দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। প্রথমেই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর লিখিত "আগমনী।" ইহাতে লেখক দুর্গার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "জম্বু ও মণিচোরার সুড়ঙ্গ" একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত। রচনার বিষয় কৌতুকাবহ,—লেখকের লিপিকৌশলের অভাব না থাকিলে প্রবন্ধটি আরও মনোরম হইত। "গৌরী" শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্তের একখানি উপন্যাস। যে পাঁচ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি আমরা সাগ্রহে ইহার শেষ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। "উদাসীন যোগীবেশে সাজারে আমার" একটি কবিতা। এইরূপ একটি কবিতা আমরা বাল্যকালে "প্রতিবিম্ব" নামক একখানি কাগজে পড়িয়াছিলাম, বোধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যে এইরূপ ব্যাপার ঘটে;—"প্রতিবিম্ব"ও নিকটে নাই,—তাই এই কবিতার লেখককে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—ইহা কখনও "প্রতিবিম্ব" নামক কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি? সমীরণের আয়ুর্ব্বেদশাখায় সাধারণের উপযোগী করিয়া আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করিলে, বোধ করি, আরও ভাল হয়।

জন্মভূমি। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইনের "দুই বন্ধু" গল্পটি এবার বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষের "কাটোঙার ইতিবৃত্ত" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত সেক্সপীয়রের "টাইমন্ অব্ এথেন্সের" গল্পভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা একটি সুখপাঠ্য গল্প। "উদ্বোধন" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রক্ষিতের একটি গল্প,—বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না. শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির "মায়ের আগমন" পুনরুত্থানকারী হিন্দুদের উপযোগী একটি আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ—ইহাতে পাঠকগণ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন। এবারকার জন্মভূমিতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বড় অভাব।

পুরোহিত। দ্বিতীয় ভাগ; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "কোম্পানীর জমীদারী" এবারকার পুরোহিতের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে। এই সংখ্যায় "প্রদীপের" দুইটি ক্ষুদ্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। দুটির একটিতেও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই সমালোচনার শেষে সম্পাদক ফুটনোটে লিখিয়াছেন,—"অনেকের ধারণা, অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকারী। একথার কি মূল আছে না আছে, আমরা অবগত নহি। তবে রবীন্দ্রনাথের অস্ফুট দোষ ("অস্ফুট" দোষ ব্যাপারটা কি?—সম্পাদক) যত বেশী, অক্ষয়কুমারে তাহার ক্বচিৎ লেশমাত্র আছে। তাঁহার অনেক কবিতাই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা বহুলাংশে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। জন্মভূমিতে এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের প্রায় মতৈক্য আছে।" "সং-স্বাক্ষরকারী মহাশয় সঙ্কোচের ধার ধারেন না,—তাই এই অদ্ভুত ফুটনোটটি অসঙ্কোচে পত্রস্থ করিয়াছেন। প্রদীপ-প্রণেতা এইটুকু পড়িয়া বলিবেন,—"ভগবান আমাকে এমন বন্ধুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন।"

দাসী। অক্টোবর। "কোঁকড়া কালচুল" একটি গল্প। ভিক্টর হুগোর একটি ঔপন্যাসিক চরিত্রের বাঙ্গলা পরিণাম। বিষয় ভাল, কিন্তু লেখক ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের বৈচিত্র্য" শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের রচনা। "বিবিধ প্রসঙ্গ" বেশ হইয়াছে। এবারকার দাসীতে "কোরিয়ার" একটি ক্ষুদ্র বিবরণ আছে।

সখা ও সাথী। প্রথমেই শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর "বাবা বুঝি এল" ইতি-শীর্ষক একটি কবিতা;—এই কবিতার সঙ্গে একখানি লিথো ছবি। ছবিখানি বেশ হইয়াছে। "সাজি গোজ" প্রবন্ধে নানা বর্ব্বর জাতির বেশভূষার বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "রঙ্গনাথজীর মন্দির" একটি ছোট গল্প। গল্পটি ভাল হয় নাই। "গল্প নয়" একটি বাঘের গল্প,—সচিত্র। ছেলেদের বেশ লাগিবে। এবারকার সখা ও সাথী অনেকগুলি চিত্রে সুশোভিত হইয়াছে,—কিন্তু চিত্রের সংখ্যার দিকে অত দৃষ্টি না দিয়া উৎকর্ষের বিষয়ে অবহিত হইলে ভাল হয়। প্রবন্ধনির্ব্বাচনের ত্রুটী সংশোধিত না হইলে সাথীর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়েও অবহিত হইবেন।

চৈতন্যের দেহত্যাগ।

(১)

নিশীথের শুভ্র মেঘাসনে
পূর্ণশশী শোভিছে গগনে ;
কিরণ-বসন-পরা
শোভে সুপ্ত বসুন্ধরা
বসন্তের কুসুম-শয়নে।

(২)

শব্দহীন, স্তব্ধ চারি ধার,—
চিত্রে যেন সমুদ্র অপার!
শুধু দূরে কদাচিৎ
কম্পিত হ'তেছে গীত
উচ্চকণ্ঠে নৈশ পাপিয়ার।

(৩)

গভীর, গম্ভীর সব ঠাঁই ;
সৌন্দর্য্যের আদি অন্ত নাই ;—
নয়ন নিমেষহীন,
আত্মহারা, উদাসীন,
শূন্যমনে ফিরিছে নিমাই।

(৪)

গন্ধামোদে মুগ্ধ অতিশয়
স্বপ্নভরা শান্ত সে নিলয় ;—
যুগ যুগান্তের কথা,
অযুত বিস্মৃত ব্যথা
উচ্ছ্বসিয়া উঠে সমুদয়!

(৫)

কি নির্ঝর অন্তরে উথলে,—
গোরা শুধু ভাসে আঁখিজলে ;
হৃদয় বীণাতে তাঁর
কি সঙ্গীত অনিবার,—
মুখে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' শুধু বলে।

(৬)

সমুখে বিশাল শোভে হ্রদ,
হেরে গোরা ভাবে গদগদ ;—
যেন কালিন্দীর নীর
অচল, স্তম্ভিত, স্থির ;
তাহে দিব্য নীল কোকনদ।

(৭)

তদুপরি স্থাপি' দু'চরণ
নাচে কালা বৃন্দাবন-ধন ;
অধরে মুরলী-খেলা,
গলে দোলে বনমালা,
কটিতটে পীত আবরণ।

(৮)

"হা কৃষ্ণ! কপট, সুচতুর!
দয়া তবে হ'ল কি নিঠুর!
এতদিন পরে, হায়,
এই সেই যমুনায়
দেখা আসি দিলে কি ঠাকুর!"

(৯)

প্রাণপদ্ম উঠিল বিকশি'
আজন্মের ঘুচিল তামসী ;—
যেন কোন্ মন্ত্র বলে
ঝাঁপিয়া পড়িলা জলে ;—
অস্ত গেলা নদিয়ার শশী।

প্রতিশোধ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলে বৈদ্যনাথের লোক নৌকায় আসিল। লোকটা বৈদ্যনাথের সেই গোয়েন্দা, সমস্ত রাত্রি এবং দিন চলিয়া আসিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আর কখন তাহাকে সম্বাদ বহন করিয়া দূরান্তরে যাইতে হয় নাই। পথকষ্টে এবং সময়ে পৌঁছিতে না পারিলে কপালে কি আছে ভাবিয়া সে মনে মনে "কসম" লইয়াছিল, আর কখন এমন ঝকমারি করিবে না। সমস্ত পথ সে বৈদ্যনাথের মুখের কথাগুলি মুখস্থ করিতে করিতে আসিয়াছিল। অতএব বিশ্বনাথের সম্মুখে নীত হইবামাত্র গোয়েন্দা হানিফ সেখ পড়া পাখীর মত বলিয়া চলিল যে, অমুক দিন অমুক জায়গায় ডাকাইতি করার পর বৈদ্যনাথ বাবুর ভারী অসুখ করিয়াছে। সম্প্রতি দু এক দিন চলিতে ফিরিতে সে অসমর্থ। যদি ভাল থাকে, তিন দিন পরে আসিয়া দলপতির সঙ্গে দেখা করিবে। ইত্যাদি।

সহজেই বিশ্বনাথ বুঝিল লোকটা নির্জ্জলা মিছা বলিতেছে। প্রথমতঃ কিছু না বলিয়া সে তীক্ষ্ণ-কটাক্ষে সেখজীর আপাদ মস্তক দেখিয়া লইল। আত্ম-সম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল, "সেখের পো, আইন আদালতে মিছে চলে, আমার যে কাজ, তাতে চলে না। আসল কথাটা কি বল শুনি। তোমার দোষ কি? ব্যাটা ভেমো গোয়ালা যা শিখিয়ে দিয়েচে, তাই তুমি বল্‌চো বই-ত নয়। আঁটকুড়োর পুতের বিশ্বাস, বুদ্ধিতে সে একটা মুচ্ছুদ্দি, কিন্তু তার মত বোকা ভূভারতে নেই। কোন্ দিন কি বিপদে পড়ে, তাকে নিয়ে আমার এই ভাবনা। লোভিষ্টি ব্যাটা বুঝি কোন লোভে পড়েচে—তাই অসুখের ওছিলা? ঠিক্ ঠিক্ বল শুনি।"

হানিফ সেখ ঠিক্ ঠিক্ই বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বৈদ্যনাথের দীর্ঘ গুম্ফ এবং আরক্ত চক্ষু যুগল তাহার মনে পড়িয়া গেল। তার উপর বৈদ্যনাথ আসিবার সময় বলিয়াছিল, "খবরদার, আসল কথা সর্দ্দার টের না পায়," সে কথা হানিফ একবারও ভোলে নাই। সে দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল, "না হুজুর, মিছে কথা কেন হবে? ভারি ব্যামো, এবার রক্ষা পান কি না। আপনি

"কই হ্যায়রে" বলিয়া বিশ্বনাথ হাঁকিল। শান্ত সিংহ সহসা উত্যক্ত হইয়া যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে, এ তেমনি তীব্র ক্রোধব্যঞ্জক স্বর। শুনিয়া নৌকা সহিত আরোহীবর্গ কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যা তিমিরে নদীহৃদয় কম্পিত করিয়া সে পরুষ কণ্ঠ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। মাঝি মাল্লারা নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে না করিতে নদীতীরে শত সশস্ত্র দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি যুগপৎ সারি দিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ ধরিত্রী যেন দ্বিধাবিভিন্ন হইয়া নিশাচর প্রেতগণকে দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন।

দলপতি বলিল, "এই মিথ্যাবাদিটেকে একবার কেউ সিধা করে আন্‌ত। পঞ্চাশ পয়জার গুণে মার্‌বি। তাতেও যদি সত্যি না বলে, ওর মাথাটা খড়ের জলে কেটে ফেলে দে।"

কিন্তু তাহার দরকার হইল না। হানিফ দলপতির বিকট কণ্ঠ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল, হুকুম শুনিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। তার পর সকল কথা খুলিয়া বলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুনিয়া বিশ্বনাথ মেঘাকে কাছে ডাকিলেন। দস্যুতায় মেঘা তাহার দক্ষিণ হস্ত, কিন্তু মুসলমান বলিয়া সে একটু তফাৎ তফাৎ থাকিত। দলপতির হুহুঙ্কারে আর সকলেরই আসন টলিয়াছিল—কেবল মেঘার টলে নাই। সে কাপড় মুড়ি দিয়া তখন মাঝির কাছে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল।

বিশ্বনাথ বলিল, "মেঘু, বদে ব্যাটার আক্কেলের কথাগুলো শুন্‌লি ত? সামান্যি টাকায় যার এত লোভ, আমার মনে হয়, কিছুই তার অসাধ্যি নেই। আমার মাঝে মাঝে এমনও ভাবনা হয় যে ভোর বাঙ্গালা মুল্লুকের লোক কোম্পানির হুলিয়ায় ভুলে আমার অনিষ্ট কর্‌তে রাজি হবে না, কিন্তু ঐ গোয়ালাটা লোভ সামলাতে পারবে না। ধর্ম্মবাপ বলে সে আমায় রেয়াৎ করবে না।"

মেঘা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। বিশ্বনাথ আবার বলিল, "এখন্ হাঁস্‌চিস্, কিন্তু আমি বল্‌চি বদে থেকে আমার দলের এক দিন সর্ব্বনাশ হবে। মনোহরপুরের সেই অনাথা ব্রাহ্মণবিধবার টাকার ওপর ব্যাটার অনেক দিন থেকে নজর, কেবল আমার ভয়ে এত দিন পেরে ওঠেনি। এখন নাকি বিধবাটা মরে-গেছে, আর তার মেয়ে টাকা কড়ি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, লোভিষ্টিটে [illegible] এত যার লোভ, তার কখন কোন ধর্ম্ম-

জ্ঞান নেই। কিন্তু আমি তার ফন্দী খাট্‌তে দেব না মেঘু। তোকে বল্‌চি, বিশে যদি বাপের ছেলে হয়, বদে ব্যাটার এ ফন্দী অবিশ্যি ফেঁসে যাবে। আমি এখনই চল্লাম। তুই আমার রণ্‌পা * ছুখানা এনে দে। বিশ কোশ রাস্তা বইত নয়। এখনও সন্ধ্যার আমল। দেড় প্রহর রাতে আমি পৌঁছে যাব।"

মেঘা বলিল, "যেতে দাও। তার পর কোন শাস্তি দিও। টাকাগুলো না হয় বামুনের মেয়েকে ফিরে দিও। কুড়ি কোশ তুমি দেড় পহরের ভেতর মারবে বটে, কিন্তু একলা গিয়ে যদিই কোন বিপদে পড় ? তা ছাড়া আজ্‌কের উদ্যোগ সব পণ্ড হবে।"

বিশ্বনাথ হাসিল। "মেঘু, তোরা যখন কেউ ছিলিনে, তখন প্রথম বয়সে এক দিন এক তরওয়ালে পাঁচ শ লোকের মোহড়া নিয়ে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে ফিরে ছিলাম। তখন এত কল কৌশল জান্‌তাম না—লোকের বল, টাকার বল, নামের বল ছিল না। আর আজ্ একটা অনাথা বামুনের মেয়েকে একা বাঁচাতে গিয়ে বিপদে পড়ব ? না মেঘু, আমি যাবই যাব। আমি বেঁচে থাক্‌তে দলের লোকে এমন অধর্ম্ম কর্‌লে, মাকালী অপ্রসন্ন হবেন। আমি কোথায় চল্লাম, কাউকে বলিস্ নে। আমার রণ্‌পা জোড়া এনে দে। আজ্‌কের অন্য কাজ তুই কর্!"

মেঘা দলপতিকে ভাল করিয়া চিনিত। দেখিল, কথা বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ বারম্বার দন্ততলে অধরোষ্ঠ স্থাপিত করিল। তাহার ললাটতটে চিন্তা-রেখা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুতে অসাধারণ জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল। মেঘা আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

তখন মেঘাকে কিছু দূর সঙ্গে লইয়া গিয়া, সময়োচিত উপদেশ দিয়া, সশস্ত্র বৈদ্যনাথ যুগল বংশখণ্ডে লাফাইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে প্রথম রাত্রিটা সরলার একরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন, মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্নানাহারের জন্য মাঝি মাল্লারা গোবরডাঙ্গার হাটের নীচে নৌকা বাঁধিল। হাটের দিন নহে, তেমন গোল-মাল ছিল না। দুই চারি জন মাত্র দোকানী সেখানে সচরাচর বাস করে। জলখাবার কিনিবার জন্য বদন এক দোকানে গেল। মুদী ভগবান মদক তখন চসমাচক্ষে অবহিত মনে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল। অশোক বনে চেড়ীরা মা জানকীকে যে সব কষ্ট দিয়াছিল, ভগবান রামায়ণের সেই স্থানটা পড়িতেছিল, এবং পড়িতে পড়িতে ভাবভরে অশ্রুপাত করিতেছিল। তাহার গলায় তুলসীর ঘনবিন্যস্ত মালা, ললাটে এবং বক্ষে হরিনামের ছাপ।

* রণ্‌পা—ডাকাইতদের দ্রুত গমন জন্য লাঠি বিশেষ। লাঠির মূলদেশে পা রাখিবার স্থান থাকে।

বদন বাগ্দী দেখিল, দোকানী সব জিনিস রাখে, আর তার গলার স্বরে পড়া শুনিতেও বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি, সে হাঁকিল, "দু পয়সার মুড়ি মুড়কি দাও গো দোকানী মোশাই। তার পর পড়ো।"

ভগবান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, একটু অপেক্ষা কর। কিন্তু বদনের ক্ষুধার জ্বালার উপর তাড়াতাড়ি ছিল। সে বলিল, "অনেক দূর যেতে হবে গো দোকানী মোশাই, তাতে মেয়ে ছেলের সওয়ারি নৌকো। একটু শীগ্গির অবদান কর।"

মদক চসমা খুলিয়া চক্ষু মুছিল। বদনের কাছে পয়সা লইল বটে, কিন্তু ডবল দামের জিনিস দিল। তার পর সুধাইল, "কোথায় যাবে, কোথা হইতে আসিতেছ?"

ডাকাতির ভয় বদনের মনে জাগিতেছিল। মুদীটের হরিনামের ছাপ আর রামায়ণ পাঠে তার উপর একটু ভক্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া কিছু সন্দেহ হইল। বিশেষ বদন শুনিয়াছিল, অনেক ডাকাইত ছদ্মবেশে পথিকদের কাছে সম্বাদ সংগ্রহ করে। বদন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দোকানীর দিকে চাহিল, এবং ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল।

বুঝিয়া ভগবান হাসিল। বলিল, "সন্দেহ হয়, উত্তর দিও না। কিন্তু সাবধান, ডাকাতের গোয়েন্দা তোমাদের পাছু নিয়েচে। পালাও, আর দেরি করো না।"

বদন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নৌকায় গেল, এবং মাঝি মাল্লা ও অনুচরদের খবর দিল। তাহাতে সেই সাত জন পুরুষের অতি অনুচ্চ কণ্ঠে যে পরামর্শ চলিতেছিল, সহজেই তাহা সরলার শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতেছিল। বরং সেই সপ্ত-মন্ত্রীর মন্ত্রণা মধ্যে মতভেদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, সপ্তকণ্ঠের যুগপৎ ফুস্ ফুস্ রব যখন মিলিত হইতেছিল, তখন সরলা আশঙ্কা করিতেছিল, হাটের নীচে বুঝি হাট জমিয়া যায়।

সরলা বদনকে ডাকিয়া তিরস্কার করিল, কেন প্রথমে তাহাকে সম্বাদ না দিয়া সাতটা ভূতে হট্টগোল করিতেছে? তখন দিদি ঠাকুরাণীর আদেশ মতে বদন সম্বাদদাতাকে ডাকিতে গেল।

ভগবান বলিল, "বাপু, আমার দোকানে তুমি যদি একটু থাক, আমি তোমার নৌকায় যেতে পারি। আমার কেউ নেই, কেবল একটা মা-মরা ন' বছরের মেয়ে। তা সেটা কোথা খেল্তে গিয়েচে। সে যদি এখন আসে, আমায় না দেখে কেঁদে গোল করবে। বলো তোর বাপ মরেনি।" হাসিয়া ভগবান সওয়ারি নৌকার উদ্দেশে ধাবিত হইল।

ভগবান মদকের সঙ্গে সরলার যে কথাবার্ত্তা হইল, এখানে তাহার কোন কথা আমরা বলিব না। তার পর সকলে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইল বটে, কিন্তু আহার বড় কিছু হইল না। অবিলম্বে নৌকা গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

ক্রমশঃ।

মুসলমানের জ্যোতিষ।

প্রথম প্রস্তাব।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, মুসলমানদের মধ্যেও জ্যোতিষ প্রচলিত আছে। তাঁহারা ইহাকে সচরাচর "নুজুম্" বলিয়া থাকেন। জ্যোতিষ বলিলে বঙ্গভাষায় যেমন astrology এবং astronomy উভয়ই বুঝায়, মুসলমানেরাও "নুজুম্" বলিলে সচরাচর সেইরূপ বুঝেন। নুজুম্ জ্যোতিষের প্রতিবাক্য বলা যাইতে পারে।

নুজুম্ একটি আর্‌বী শব্দ। ইহা নজ্‌ম্ শব্দের বহুবচন। নজ্‌ম্ অর্থে আর্‌বীতে নক্ষত্র। এই ত গেল নুজুমের প্রকৃত অর্থ।

সচরাচর নুজুম্ বলিলে উভয় প্রকার জ্যোতিষই বুঝায়। কিন্তু আর্‌বী পণ্ডিতেরা astronomyর জন্য প্রায়ই "হয়েৎ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেই জন্য ক্রমে ক্রমে নুজুমের অর্থ কেবলমাত্র astrology এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ প্রবন্ধে নুজুম্ অথবা জ্যোতিষ কেবল astrology অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

মহম্মদের জন্মের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আরব প্রভৃতি দেশে নুজুম্ প্রচলিত ছিল।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জ্যোতিষ মুসলমান ধর্ম্মের একেবারে বিরুদ্ধ। ইহা কত দূর সত্য, দেখা যাউক।

সকলেই জানেন যে, কোরাণ ও হদিস্ ইসলাম ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুস্তক। হদিস্ লইয়া মৌলবিদের মধ্যে বড়ই গোলমাল। সংক্ষেপে হদিসের অর্থ—ইংরাজি পুস্তক হইতে,—আর্‌বী অপেক্ষা সহজে, বুঝিতে পারা যায়;—

"Haji Khalifa defines the science of tradition (হদিস্) to be the means of discriminating knowledge of the sayings of the Prophet, together with his actions and circumstances and divides it into two parts,—(1) the science of the reporting of tradition—which treats of the conditions under which a tradition is considered as reaching back to the Prophet, and (2) the science of the understanding of tradition—which treats of the meaning of a particular tradition as ascertained by its language by reference to the fixed principles of Muslim law or by the analogy of known circumstances relating to the Prophet."—Vide Journal of the American Oriental Society vol. VII, page 61.

(১) সহি বুখারি, (২) সহি মুস্‌লিম্, (৩) স্থনান্—ই—আবুদাউদ্ এবং (৪) স্থনান্—ই—নসই, প্রধান গ্রন্থ।

আর এক খানি অতি প্রসিদ্ধ আর্‌বী পুস্তক আছে। ইহাতে ইতিহাস, হদিস্ প্রভৃতি অনেক বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির নাম,—অত্ তবরি।

এখানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ। বড় বড় ২০ ভাগে শেষ হইয়াছে। লেখকের নাম আবু জাফর মহম্মদ ইবন্-ই-জরির।

আমরা যাহা বলিলে নাম বুঝি, সে অর্থে অবশ্য এ সমস্তটা তাঁহার নাম নহে। তাঁহার নাম "মহম্মদ"। আবু জাফর অর্থে জাফরের পিতা; ইব্‌ন-ই-জরির অর্থে জরিরের পুত্র। স্বতরাং সমস্ত নামটার মানে—"মহম্মদ,—যিনি জাফরের পিতা এবং জরিরের পুত্র।" এই প্রকারে আট ঘাট বাঁধিয়া নাম লিখিলে, লোকটি কে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। মারজি এবং পার্শীদের মধ্যেও পিতার নামের সহিত নিজের নাম বলিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যথা, হরি বালকৃষ্ণ, অর্থাৎ বালকৃষ্ণের পুত্র হরি; শাপুরজি ইদলজি, অর্থাৎ ইদল্‌জির পুত্র শাপুরজি।

প্রথম কথা, কি প্রকারে নুজুমের উৎপত্তি হইল? প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অত্ তবরির ৩য় ভাগ ১৬৫ পৃষ্ঠার মতে, উমর বলিয়াছেন যে, তিনি ঈশার কাছে শুনিয়াছেন এবং ঈশাকে তাঁহার খুল্লতাত অবৈদুল্লা,—যিনি মহম্মদের জামাতা হজরত আলির পৌত্র ছিলেন,—বলিয়াছেন;—

"যখন ঈশ্বর হজরত্ আদমকে (Adam) স্বর্গ হইতে নামাইয়া আবু-কুবৈস্ পর্ব্বতের উপর উঠাইলেন, এবং তাঁহার দেখিবার জন্য পৃথিবী এত উচ্চ করিলেন যে, আদম সমস্ত দেখিতে পাইলেন, তখন ঈশ্বর আদমকে আদেশ করিলেন 'এ সমস্ত তোমারই জন্য।' আদম নিবেদন করিলেন, 'হে ঈশ্বর, কত বস্তু পৃথিবীতে আছে, আমি কেমন করিয়া জানিব।' তখন ঈশ্বর তাহার জন্য নক্ষত্র হইতে জানিবার উপায় ("নুজুম") স্থির করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, যদি অমুক অমুক দিনে, অমুক অমুক নক্ষত্র, তুমি এই এই রকম দেখ, তাহা হইলে এইরূপ জানিও, এবং যদি তুমি অন্যরূপ দেখ, তাহা হইলে অন্য প্রকার (ঘটনা) বুঝিবে।"

এইরূপে আদম "নুজুম" দ্বারা সমস্ত জানিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমে বার্দ্ধক্যবশতঃ নক্ষত্র দেখিয়া হিসাব করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর

লেন। আদম তাঁহার মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত ঐ দর্পণ দ্বারা সমস্ত অজ্ঞাত ব্যাপারাদি (ঘয়েব্) জানিয়া লইতেন।

আদমের মৃত্যুর পরে "ফকৃতুস্" নামক শয়তান, দর্পণ খানি ভাঙ্গিয়া তাহার উপর জাবর্দ্ নামে নগর স্থাপন করিল। কিছুকাল পরে সুলেমান-বিন্ দাউদ শয়তানের নিকট হইতে ভগ্ন খণ্ড গুলি আনাইয়া চর্ম্মের দ্বারা বাঁধিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইলেন। তিনি তদ্দ্বারা সমস্ত অজ্ঞাত বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পরে, শয়তান পুনরায় ভগ্ন দর্পণ লইয়া গেল, কিন্তু তাহার একখণ্ড পড়িয়া রহিল। ইহা "বনি ইস্রাইল"এর (ইহুদি ও খৃষ্টান) অধিকারে রহিল। ক্রমে প্রসিদ্ধ পাদ্রি রাসুল্ জালুতের হস্তগত হইল। তিনি সরওয়ান্-ইবন্-ই-মহম্মদ নামক মুসলমান বাদসাহকে দিলেন।

ইনি এই দর্পণখণ্ড ঘসিয়া অপর একখানি দর্পণের উপর রাখিতেন। এইরূপে অজ্ঞাত ঘটনাদি অবগত হইতেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, দর্পণ তাঁহাকে কেবল মন্দ সংবাদই দিত। তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইবে, তিনি ইহাই দেখিতে পাইতেন। সেই জন্য রাগ করিয়া দর্পণ খণ্ড ফেলিয়া দিলেন, এবং যিনি দিয়াছিলেন, তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

তাঁহার একজন পরিচারিকা ঐ দর্পণ খণ্ড কুড়াইয়া যত্নে রাখিল।

বাদসাহ দর্পণে যাহা দেখিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা ঘটিল; অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল।

ইনি "বনি উমইয়া" বংশের শেষ বাদসাহ ছিলেন। ইঁহার পরে বনি অব্বাস্ বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

এই নূতন রাজবংশের দ্বিতীয় বাদসাহ মন্সুর্, পুনরায় দর্পণখণ্ড আনাইয়া পূর্ব্বমত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এ দর্পণের উপর তাঁহার এত বিশ্বাস ছিল যে, উহা দ্বারা তাঁহার শত্রু মহম্মদ বিন অবহুল্লার গতিবিধি জানিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য, নিজের দূরদেশীয় সুবাদারকে আদেশ দিতেন, এবং বলিয়া দিতেন যে, এখন সে অমুক স্থানে আছে।

এই নুজুমের মূল। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নুজুমের উৎপত্তি, ইস্লাম গ্রন্থ মতে, ঈশ্বরাদেশ হইতে।

(১) সেহর্, (২) কাহানত্, (৩) নুজুম্, (৪) রমল্, এবং (৫) জফর্।

সেহর্ অর্থে কেবল জ্যোতিষ বুঝায় না, বরং ভেল্কী, বশীকরণবিদ্যা ইত্যাদি বুঝায়। কোনও দ্রব্য হারাইয়া গেলেও সেহরের দ্বারা খুঁজিয়া লওয়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি "সেহরের" দ্বারা জানিয়া কহে, তাহাকে সাহির্ কহে।

কোরাণে সেহরের কথা আছে। "গোসর্গে" (সুরতুল্ বকর) ঈশ্বর বলিতেছেন ঃ—

"শয়তানেরা কাফের, (অবিশ্বাসী) তাহারা মনুষ্যকে ভেল্কী শিক্ষা দেয়, এবং যাহা হারূত ও মারূত স্বর্গ হইতে পাইয়াছেন, অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কলহ করাইবার মন্ত্র।"

কহানৎ অর্থে শয়তানের সাহায্যে ভূত ও ভবিষ্যতৎ বলা। সহিবুখারিতে আবুহুরেরা বলিয়াছেন ঃ—

"যখন ঈশ্বর স্বর্গ হইতে কোন আদেশ করেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী দূত তাঁহার নিম্নের দূতকে বলেন, এবং তিনি পুনরায় তাঁহার নিম্নের দূতকে বলেন, এবং তিনি পুনরায় তাঁহার নিম্নের দূতকে বলেন। এইরূপে ঈশ্বরাদেশ পরিচালিত হয়। শয়তানরা বড়ই দুষ্ট। তাহারাও সংবাদ পাইবার জন্য গোয়েন্দা লাগাইয়া রাখে। এমন কি, ঠিক যেমন একের পর এক স্বর্গীয় দূত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আছেন, ইহারাও সেই প্রকারে একের পরে এক শয়তান বসাইয়া রাখে। যখন এক স্বর্গীয় দূত অন্য দূতকে ঈশ্বরাদেশ বলেন, তখন ইহারা চুরি করিয়া শুনিয়া, শয়তানপরম্পরায় সংবাদ প্রেরণ করে।"

শয়তান বশীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে অজ্ঞাত ঘটনা বলার নাম "কহানত্"। এই জন্যই ইহার আর এক নাম "ইলম্-ই-সিফলি," অর্থাৎ "ভূতের বিদ্যা"। যে ব্যক্তি কহানৎ দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যৎ বলে, তাহাকে "কাহিন্" কহে। কাহিন্ একটি সত্যের সহিত এক শত মিথ্যা মিশাইয়া লোককে বলিয়া থাকে।

শয়তানরা স্বর্গের সংবাদ চুরি করে বলিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া থাকেন। কোরানে এক স্থানে ঈশ্বর বলিতেছেন ঃ—

"যদিও আমি স্বর্গ উত্তমরূপে রক্ষা করি, তথাপি শয়তানেরা স্বর্গ হইতে

ইহাই বোধ হয় ইসলাম ধর্ম্ম মতে "তারা খসার" ব্যাখ্যা। আমাদেরও বজ্রের অর্থ প্রায় এইরূপ।

বশীভূত শয়তানকে মুয়াক্কিল্ কহে। অনেকের বোধ হয় মনে আছে যে, প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, কলিকাতায় হোসেন খাঁ নামক একজন ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছিল, এবং অনেক রকম ভেল্কী দেখাইয়া পিশাচসিদ্ধ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

নুজুম্ বলিলে সচরাচর সকল প্রকার জ্যোতিষই (astrology) বুঝায়। জ্যোতিষীকে মুনজ্জিম্ অথবা নুজুমী কহে।

কোরানে হারুত্ মারুতের বিষয় এবং শয়তানের স্বর্গ হইতে সংবাদ চুরির বর্ণনা ভিন্ন আর জ্যোতিষের কথা নাই। কয়েক স্থানে "নুজুম" শব্দ অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অর্থ জ্যোতিষ নহে; কেবল নক্ষত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহম্মদের সময়ে, অজ্ঞাত বিষয় জানিবার সকল প্রকার উপায়কেই "নুজুম" বলিত, অর্থাৎ নুজুম ও সেহ্র্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ছিল না।

প্রসিদ্ধ আবুদাউদ ইবন-ই-মাজা ও মুস্নদ-ই-আহমদের মতে, মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ইবন-ই অব্বাস্ বলিয়াছেন যে, তিনি মহম্মদের মুখে শুনিয়াছেন :—

"যিনি নুজুম হইতে এক বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, তিনি সেহরের এক শাখা শিক্ষা করিলেন।"

উল্লিখিত হদিসে, প্রসিদ্ধ লেখক রজিন এই হদিসটি যোগ করিয়াছেন :—

"মুনজ্জিম্ হয় কাহিন, এবং কাহিনকে সাহির কহে, এবং সাহির হয় কাফের।"

এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালেও নুজুম বলিলে কহানৎ, সেহর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্যোতিষই বুঝাইত। এখনও সচরাচর তাহাই বুঝায়; যদিও পণ্ডিতেরা নুজুম বলিলে, জ্যোতিষের এক অংশ মাত্র বুঝেন।

হদিসে নুজুমের বিরুদ্ধে আরও অনেক বচন আছে। বচনগুলি ক্রমে ক্রমে লেখা যাইতেছে।

মুসলমান পণ্ডিতগণের নুজুমের বিপক্ষে মত দিবার প্রধানতঃ দুইটি কারণ :—

১ম। ইসলাম ধর্ম্ম মতে কেবল একমাত্র ঈশ্বরই ভবিষ্যৎ (ঘয়েব) বলিতে

২য়। গণনা ঠিক হয় না।

এহিয়া উল্ উলুম্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ আছে। হজরত্ সুলেমান্ এক দিন অশ্ব ক্রয় করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। অপরাহ্ণের নমাজ পড়িতে মনে ছিল না। ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল। তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি ঘোড়া গুলিকে মারিয়া ফেলিলেন। (ইনিই কি ইংরাজের Solomon the wise ?) শাস্ত্রমতে উপযুক্ত সময়ে নমাজ না পড়াতে পাছে পাপ হয়, এইজন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে আকাশ ফিরিয়া আইসে। মুসলমানের বিশ্বাস যে, পৃথিবী এক স্থানেই আছে, এবং আকাশ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, আকাশে সূর্য্য প্রভৃতি যেন গাঁথা আছে। ঈশ্বরের আদেশানুসারে, আকাশ, হজরত সুলেমানের নমাজ পড়িবার জন্য ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যকে পাইয়া, সুলেমান নির্ব্বিঘ্নে নমাজ সমাপ্ত করিলেন।

আকাশ ফিরিয়া আসাতে নক্ষত্রাদিতে সব গোলমাল হইয়া গেল, সুতরাং নুজুম অর্থাৎ নক্ষত্রাদির গণনায় যে বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? হজরত সুলেমানের সময়ে এই বিভ্রাট ঘটে। মহম্মদ তাহার প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে নুজুমীরা বলিয়াছিলেন যে, পেগম্বর শীঘ্রই দেখা দিবেন। তাহাই হইল। কেবল যে গণকেরা যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহাই হইল, এমন নহে; বরং স্বয়ং মহম্মদ অনেক সময়ে বলিয়াছেন, "দৈববাণী হইয়াছিল যে পেগম্বর আসিতেছেন, আমিই সেই পেগম্বর।"

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, সুলেমানের সময়ে আকাশবিভ্রাটে নুজুমের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই; এবং স্বয়ং মহম্মদ এ কথা প্রকারান্তরে মানিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, সুলেমানের সময়ের আকাশবিভ্রাটে গণনার যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, পেগম্বরের জন্মোপলক্ষে, ঈশ্বর তাহা দোরস্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্য মহম্মদের আবির্ভাবগণনা ঠিক হইয়াছিল, এবং মহম্মদও তাহা সত্য বলিয়া মানিয়াছিলেন।

কিন্তু আর এক আকাশবিভ্রাট ঘটে; ইহা মহম্মদের সময়ে। সেই জন্য নুজুম মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

এবারও বিভ্রাটের কারণ নমাজ। এক দিন মহম্মদ, তাঁহার জামাতা হজ-

যে, অপরাহ্ণ নমাজের সময় অতিবাহিত হইয়া যায় ; কিন্তু কি করেন, একে শ্বশুর, তাহে পেগম্বর, সুতরাং তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাও মহাপাপ। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। নমাজভঙ্গও পাপ, মহম্মদের নিদ্রাভঙ্গও পাপ। হজরত আলি এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। হজরত সুলেমানের সময়ের বিভ্রাটেও সূর্য্যদেবের বোধ হয় আক্কেল্ হয় নাই ; এবারও তিনি হজরত আলির নমাজের প্রতীক্ষা না করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। হজরত আলি, পাপ হইল ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পেগম্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জামাতাকে প্রবোধ দিলেন, এবং আকাশকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ ফিরিলেন, এবং হজরত আলি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শ্বশুরকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং প্রসন্নচিত্তে নমাজ পড়িলেন।

আরব্য, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশের সম্রাটেরা প্রায় সকলেই মুনজ্জিম কাছে রাখিতেন। রমল্ পাঁচ সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক পুরাতন। ইদ্রিস্ নামক নবি, যিনি আদম (Adam) এবং নুহের (Noah) মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, ইহার আবিষ্কার করেন। ইহা জলপ্লাবনের (Deluge) পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়। রমল একটি আর্ব্বী শব্দ। ইহার অর্থ বালুকা। ইদরিস বালুকার উপর গণনা করিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ বলিতেন বলিয়া, এই শাস্ত্রের নাম রমল্ হইয়াছে। রমলের গণনা দাঁড়ি এবং বিন্দু দ্বারা হয়, যথা — ÷ ⩧ ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি রমল গণনা করে, তাহাকে রম্মাল্ কহে। ভারতবর্ষে রমল খুব প্রচলিত। প্রত্যেক নগরেই দুই চারি জন রম্মাল দেখিতে পাওয়া যায়।

জফর, আর্ব্বী অথবা অন্য কোনও ভাষার অক্ষর দ্বারা এক প্রকার গণনা। স্বয়ং মহম্মদের জামাতা হজরত আলি ইহার আবিষ্কার করেন। টুনিস্, এবং মক্কার পশ্চিমের সমস্ত মুসলমান দেশে জফর প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও জফর বিশেষ প্রচলিত। জফরের প্রধান গ্রন্থকার মহি-উদ্-দিন্ ইবন্-ই-অরবি উন্দলুসির (স্পেনবাসী) নাম মুসলমান জ্যোতিষীমাত্রেই অবগত আছেন।

জ্যোতিষবিষয়ে দুই একটা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, কোরাণের মতে, যে নুজুমে বিশ্বাস করে, সে কাফের।

হদিসে জ্যোতিষের বিষয়ে অনেক কথা আছে। প্রধান গুটিকতক মত

এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যোতিষের অনুকূল ও প্রতিকূল, উভয় প্রকার মতই হদিসে পাওয়া যায়।

সহি মুসলিমের মতে, মহম্মদের শ্যালক মুয়াবিয়া বলিয়াছেন, "আমরা অজ্ঞতাবশতঃ কাহিনের কাছে গিয়া থাকি।" পেগম্বর উত্তর করিলেন, "ওখানে যাইও না।" মুয়াবিয়া কহিলেন, "আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দাঁড়ি ও বিন্দু দিয়া রমল করে।" মহম্মদ উত্তর করিলেন, "এক জন নবি ছিলেন (ইদ্‌রিস্) যিনি রমলের জন্য ঐ প্রকার দাঁড়ি টানিতেন ; যে তাঁহার মত দাঁড়ি টানে, সে ঠিক বলে।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদ কহানত মন্দ বলিলেন, কিন্তু রমলের সমর্থন করিলেন।

কিন্তু সুনান্-ই-আবুদাউদ্ বলেন যে, কবিসা বলিয়াছেন যে, তিনি পেগম্বরের নিকট শুনিয়াছেন,—রমল পৌত্তলিকের কার্য্য।

সহি বুখারি ও সহি মুসলিমে আছে যে, মহম্মদ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী আয়েশাকে বলিয়াছিলেন, কাহিনেরা অপদার্থ, যদি এক শতের মধ্যে একটা সত্য হইয়া পড়ে, উহা শয়তানের চুরি-করা সংবাদ।

সহি মুসলিমের মতে মহম্মদ বলিয়াছেন যে, যদি কেহ কোনও দ্রব্য হারাইলে "অর্‌রাফ" অর্থাৎ "জানের" বাড়ি যায়, তাহা হইলে তাহার চল্লিশ দিনের নমাজ পণ্ড হয়। মুসলমান প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ পড়ে, সুতরাং চল্লিশ দিনের নমাজ মাটি হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে ; অর্থাৎ দুই শত নমাজ জরিবানা।

সুনান্-ই-আবু দাউদ্ এবং মুস্‌নদ্-ই-আহমদের মতে, যে কাহিনের বাড়ী যায়, এবং বলে যে, কহানত সত্য, সে আর মুসলমান থাকে না, অর্থাৎ কাফের হইয়া যায়।

হদিসের মধ্যে যে গুলিকে ঈশ্বরাদেশ জ্ঞান করা হয়, তাহাকে বলে হদিস্-ই-কুদ্‌সি। সহি বুখারি এবং সহি মুসলিমে এই হদিস্-ই-কুদ্‌সিটি আছে ;—

"ঈশ্বর বলেন যে, মনুষ্য দুই প্রকার ;—ধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক। যে বলে ; ঈশ্বরেচ্ছায় বৃষ্টি হইল, সে ধার্ম্মিক ; এবং যে বলে যে,—অমুক নক্ষত্র উদয় হইয়াছে বলিয়া বৃষ্টি হইল, সে (কাফের) অধার্ম্মিক।"

আছে যে, যদি পাঁচ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তথাপি তাহারা সাধু হয় না। পাঁচ বৎসরের পরে বৃষ্টি হইলে বলিবে যে, অমুক নক্ষত্রের দরুন বৃষ্টি হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—সেহর অর্থে ভেল্কী, বশীকরণবিদ্যা ইত্যাদি বুঝায়। ক্রমে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসিদ্ধমোহন মিত্র।

কলুঙ্গার যুদ্ধ।

(আরম্ভ)

গত কার্ত্তিকের সাহিত্যে 'নালাপাণি' সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ কথা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, এবং সেই প্রবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করিয়াছি যে, গত শতাব্দীর প্রথমে এখানে এক ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাস-প্রণেতৃগণ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চ সিংহাসনের প্রতি বর্ত্তমান লেখকের লোভ না থাকিলেও, এই প্রবন্ধে সেই যুদ্ধ ব্যাপারের একটি বিবরণ প্রকাশ করা, বোধ করি, বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কি কারণে ইংরেজদিগের সহিত গুর্‌খা জাতির বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করা অনাবশ্যক; কারণ যাঁহাদের অবগতির জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, তাঁহারা নেপালের ইতিহাস এবং নেপাল-যুদ্ধের বিবরণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, সারণ, গোরক্ষপুর এবং বেরিলী জেলার উত্তর সীমান্ত প্রদেশে, এবং শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী রক্ষণাধীন রাজ্যসমূহে, গুর্‌খাগণ প্রায় সর্ব্বদাই অত্যাচার করিত; এই সকল অত্যাচারনিবারণই গুর্‌খা যুদ্ধের উদ্দেশ্য; ইহাই মুখ্য কারণ, তবে গৌণ কারণও যে কিছু ছিল না, এমন নহে।

অনেকেই কলিকাতা সহরে নেপালী গুর্‌খা দেখিয়াছেন। ইংরাজদিগের কয়েকটি গুর্‌খা রেজিমেণ্টও আছে। ইহারা বলিষ্ঠ, খর্ব্বাকার, স্থূলদেহ এবং অত্যন্ত কার্য্যকুশল; অসভ্য হইলেও ইহারা সত্য ও বীরত্বের সম্মান রক্ষা করিতে জানে। এমন বিশ্বস্ত বন্ধু, অথবা প্রবল শত্রু, অন্য জাতির মধ্যে কদাচ

ইহাদের জাতীয় অস্ত্র ; খুক্‌রীর গঠন ছোরার ন্যায় ; দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও খুক্‌রীগুলি এমন তীক্ষ্ণধার, এবং খুকরীধারী এমন ক্ষিপ্রহস্ত যে, চক্ষুর নিমেষেই, এক আঘাতে তাহারা শত্রুশিরঃ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে ধনুর্ব্বাণেরও প্রচলন ছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও গুরখা জাতির মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইবার সময়ে, নেপালের সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার ছিল ; সৈন্যগণ য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত হইতেছিল, এবং তাহাদের নায়কগণও "কর্ণেল," "মেজর" "ক্যাপ্‌টেন্" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

গুর্‌খা-যুদ্ধের অব্যবহিত কারণ অনেক পাঠকের অজ্ঞাত থাকিতে পারে, অতএব এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে, হঠাৎ একদল গুর্‌খা সৈন্য ইংরেজদিগের ভুতোয়ালের থানা আক্রমণ করে, এই দলের অধিনায়কের নাম মানরাজ ফৌজদার। থানার ১৮ জন কনেষ্টবল হত এবং ছয় জন আহত হয়। থানার দারোগাকেও ফৌজদারের সম্মুখে নৃশংসরূপে নিহত করা হয়।

উদ্ধত এবং অশিক্ষিত গুর্‌খা-সৈন্যগণের দ্বারা এরূপ হত্যাকাণ্ড হওয়া নূতন কিম্বা আশ্চর্য্য নহে। কোষে তরবারি বদ্ধ রাখিয়া ধীরভাবে ডাল-রুটীর শ্রাদ্ধ করা আমাদের চক্ষে অতি আরামজনক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এই যুদ্ধপ্রিয় জাতি এরূপ নির্ব্বিরোধ জীবন বহন করা অতি বিড়ম্বনাপূর্ণ বলিয়া মনে করে ; শুধু গুর্‌খা বলিয়া নহে, পঞ্জাব রাজ্যের পতনের ইহাই প্রধান কারণ। যতদিন একচক্ষু, রাজনীতিকুশল পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি দুর্দ্দান্ত খালসা সৈন্যগণকে প্রশমিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর কেহ তাহাদের উপযুক্ত নেতা ছিল না ; এ দিকে অবিরাম শান্তি উপভোগে তাহাদের যুদ্ধ-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছিল— শতদ্রু পার হইয়া তাহারা ইংরেজের ধনধান্যপূর্ণ লোহিত সীমা আক্রমণ করিল। অবিলম্বে নেতৃহীন বিশাল খালসা-বাহিনী বায়ুপ্রবাহে তৃণের ন্যায় উড়িয়া গেল, পঞ্জাবের সৌধ-চূড়ায় বৃটিশ-পতাকা উড্ডীন হইল।

ইতিহাসে এক ব্যাপারই অনেক বার পুনরাবৃত্ত হয়। অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ড ভীষণ ও রোমাঞ্চকর বটে, মেকলে সাহেবও ক্লাইবের জীবনীতে তাহার সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু

য়াছে; নেপালরাজ পৃথ্বিনারায়ণের ভ্রাতা, স্বরূপ রতন এক বার কীর্ত্তিপুর নামক গ্রাম আক্রমণ করেন। গ্রামবাসীগণ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কিছু দিন আত্মরক্ষা করে; অবশেষে তাহারা স্বরূপ রতনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়; কিন্তু স্বরূপরতনকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, তিনি তাহাদের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু স্বরূপরতন অবশেষে প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না; গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের প্রাণ-দণ্ডের বিধান হইল, এবং গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেরই নাসিকা ও জিহ্বা কর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এই কর্ত্তিত জিহ্বা ও নাসিকা দ্বারা গ্রামের লোকসংখ্যা স্থির করা হইয়াছিল, এবং এই বীর-গৌরব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, গ্রামের পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তন করিয়া, "নাসকাটাপুর" এই নাম প্রদত্ত হইল। ভুতোয়ালের থানা ধ্বংসের কাহিনী বা দারোগার হত্যাকাণ্ড, এই প্রকার পৈশাচিক ব্যাপারের সহিত তুলনায় অতি সামান্য।

ভুতোয়ালের থানা বিধ্বস্ত হইলে, ইংরেজগণ ইহার প্রতিবিধানে সহসা অগ্রসর না হওয়ায়, ইহারা আর একটি থানা আক্রমণ করিয়া, আরও অনেক-গুলি লোককে নিহত করিল। এ সময় ইংরাজগণ এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে উৎসুক হইলেও, বর্ষাকাল আসিয়া পড়ায় তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন উপা-য়ই অবলম্বন করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, এ সমস্ত কথা উত্থাপন করিয়া, ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ময়রা, নেপালরাজকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তদুত্তরে নেপালরাজ বৃটিশ-সিংহকে এমন উদ্ধত উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল।

দানাপুর, বারাণসী, মিরট ও লুধিয়ানা হইতে চারি দল সৈন্য সজ্জিত হইল; মেজর জেনারল জিলেস্পাই মিরট হইতে সজ্জিত সৈন্য দলের অধিনায়ক হইলেন। প্রথমে এই দলে সর্ব্বসমেত ৩৫১৩ জন সৈন্য ও ১৮টি কামান ছিল, কিন্তু অবশেষে এই দলের আরও বলবৃদ্ধি হইয়াছিল।

স্থির হইল, জিলেস্পাই-এর সৈন্যশ্রেণী প্রথমে শিভালিক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক দেরাদূনে উপস্থিত হইবে, তাহার পর বিরোধীগণের বল ও অবস্থা অনু-সারে, হয় শ্রীনগরে অমরসিংহের থানার বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হইবে, নয় লুধিয়ানা হইতে জেনারেল অক্টরলোনী যে সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইতে-ছিলেন, সেই দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া নাহানে অমরসিংহের পুত্র রণজয় -সিংহকে আক্রমণ করিতে হইবে।

এ দিকে রাজপ্রতিনিধি তদানীন্তন দিল্লীর রেসিডেন্ট মেটকাফ সাহেবকে গড়োয়ালের নির্ব্বাসিত রাজা সুদর্শন সার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুমতি করিলেন; তদনুসারে রেসিডেন্টের সহকারী ফ্রেসার সাহেব হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া দেরাদূনে তৃতীয় সৈন্যদলে (মিরটের দলে) যোগ দিলেন। এই দল সাহারানপুর হইতে বাহির হইয়া মোহনপাশের ভিতর দিয়া দেরাদূনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময় পথ এতই কদর্য্য ছিল যে, থিরির সহৃদয় জমীদারগণ বিশেষ সাহায্য না করিলে বৃটীশ সৈন্যগণকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে ইংরেজগণ এইরূপ অনেকবারই আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন, অনেক যুদ্ধে গবর্মেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন, দেশীয় রাজগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সাহায্য করেন, এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারা সকল অসুবিধা সহ্য করেন, কিন্তু কৃতজ্ঞ গবর্মেণ্ট এজন্য অনেক দিন হইতেই দেশীয়দিগকে রাজভক্তিহীন বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, ২৪শে অক্টোবর ইহারা দেরাদূনে উপস্থিত হইল। শীতকাল। প্রকৃতিদেবী তখন হিমালয়ের পাষাণ দেহে স্তরে স্তরে তুষাররাশি ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রচণ্ড শীতে এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের অভাবে সৈন্যদলের বিশেষ কষ্ট হইতেছিল—কিন্তু এই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকা ভিন্ন তাহাদের উপায় ছিল না। এই সময়ে রাজপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বে,—দেরাদূনের ঠিক উত্তর পূর্ব্বে ৩৷৹ মাইলের মধ্যে নালাপাণির পাহাড়ের উপর অমরসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বলভদ্র সিংহ সামান্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল। তাহার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না; এই দুর্গের প্রতি বৃটীশ সেনানায়কের দৃষ্টি পতিত হইল।

কিন্তু এই দুর্গ জয় করা সহজ নহে। দুর্গ যে অজেয় এবং দুর্ভেদ্য, তাহা নহে; কিন্তু এই দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া—বিশেষতঃ সেই শীতকালে,—ভয়ানক, দুঃসাধ্য ব্যাপার। পাহাড় এমন সোজা যে, তাহার গাত্র বহিয়া অতি কষ্টে পথ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে পথে এককালে অধিক লোক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার উপর দুর্গপ্রান্ত হইতে নিম্নের সমতল ভূমি পর্য্যন্ত ভয়ানক জঙ্গল এবং কণ্টকের অরণ্য,—ইহারা দুর্গবাসীর প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যখন দেখিয়াছি, সে সময় সেখানে দুর্গম অরণ্য ছিল না, এবং

বার আর কিছুই নাই। এমন কি, দুর্গের ভগ্নাবশেষও আর দেখিতে পাওয়া যায় না, সেগুলি কালক্রমে পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং নিবিড় জঙ্গলে তাহা সমাচ্ছন্ন; তাহা দেখিয়া কে বলিতে পারে, এক দিন এই শৈল-শিখরে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল? যতই ক্ষুদ্র হউক, যে কয়টি স্বাধীনতা-প্রিয় মানব-প্রাণ এখানে আপনাদিগের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিয়াছিল, জগতের বীরত্বের ইতিহাসে তাহাদের নাম সন্নিবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু সে কাহিনী এখন স্বপ্নপ্রায়,—গৌরবের সেই শ্মশান এখন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন! হায়, মানব-গৌরব, দুই দিনেই তাহা এইরূপে অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়।

এই স্থানে দুর্গ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। দুর্গ বলিলে অনেকের মনে কলিকাতার কিম্বা দিল্লী ও আগ্রার দুর্ভেদ্য, সুকৌশলনির্ম্মিত, সমুন্নত দুর্গশ্রেণীর কথা উদিত হইবে। নালাপাণি, বা ইতিহাসে যাহাকে কলুঙ্গা বলে, সে স্থানে যে দুর্গ স্থাপিত ছিল, তাহাকে এ হিসাবে "দুর্গ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। দুর্গ বলিলে পাঠকের মানস-পটে যে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে—নালাপাণিতে তাহার কিছুই ছিল না। হিমালয়ের অগণ্য প্রস্তরখণ্ড চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড শালবৃক্ষসমূহ যুগাতীত কাল হইতে অটলভাবে সমুন্নত মস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ড এবং এই শালবৃক্ষশ্রেণী, এই উভয়-উপাদানে এই দুর্গ নির্ম্মিত। শালবৃক্ষের বেষ্টনী—আর তাহার পার্শ্বে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে বীর বলভদ্র সিংহ ইংরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন।

২৪শে অক্টোবর জিলেস্পাইর সৈন্যদল দেরাদূনে পৌঁছে; তিনি সে সময় স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সৈন্য পরিচালনের ভার কর্ণেল মৌলি সাহেবের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। শীত ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং খাদ্য-দ্রব্যও বিশেষ সহজপ্রাপ্য ছিল না—সুতরাং শীতে সৈন্যগণকে অবসন্ন না করিয়া, প্রথম উদ্যমেই তিনি যুদ্ধ ব্যাপার শেষ করিবেন, স্থির করিলেন;—বিশেষতঃ, একটি অসভ্য, পার্ব্বত্য-পল্লীর ভূস্বামীকে পরাস্ত করিবার জন্য এতখানি আয়োজন, সেই সৈনিক পুরুষের নিকট কিঞ্চিৎ বাহুল্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অতএব সেই রাত্রেই কর্ণেল সাহেব বলভদ্রের নিকট দূত প্রেরণ করি-

সে আত্মসমর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল নাই, তোপমুখে তাহার আরণ্যদুর্গ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কর্ণেল মৌলি পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতেই এই দুর্গ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, সামান্য ভয়প্রদর্শনমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

কিন্তু সেই অসভ্য দুর্গস্বামী অটল ছিল, স্বাধীনতার অমৃতময় রসে তাহার বীরজীবন পুষ্ট হইয়াছে, মৃত্যুভয়ে সে ভীত হইল না; ইংরেজ-বীরের সদর্প ভ্রূভঙ্গি উপেক্ষা করিল। নিয়মিত সময়ে দূত প্রত্যাগমন করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, বলভদ্র সিং ঘোর অবজ্ঞাভরে পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং বলিয়া দিয়াছে, ইচ্ছা হইলে ইংরাজ-সেনাপতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, সে জন্য সে ভীত বা পশ্চাৎপদ নহে। সেই সামান্য দুর্গের সামান্য অধিস্বামী বৃটিশ-সিংহকে এমন কথা বলিবে, ইহা কাহারও মনে হয় নাই; বিশেষতঃ, দেরাদূনেই যে গুর্থাদিগের সহিত ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ বাধিতে পারে, জিলেস্পাইর এ কথা একবারও মনে হয় নাই, সেই জন্য তিনি ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

বলভদ্র সিংহের অবজ্ঞাপূর্ণ উত্তর পাইয়া কর্ণেল মৌলি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; জিলেস্পাইএর অপেক্ষা না করিয়া পরদিন প্রভাতেই তিনি সমস্ত পথ ঘাট স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলেন, এবং তাহার পর হস্তীপৃষ্ঠে কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন কামান রাখিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, এবং "ফায়ার" করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দুই চারি বার কামান গর্জ্জন শুনিয়াই পার্ব্বত্য মূষিকগণ ইংরাজের অমোঘ শক্তি বুঝিতে পারিবে, এবং পার্ব্বত্য বিবরে প্রবেশ করিবে, প্রকৃত যুদ্ধ বিগ্রহের আবশ্যক হইবে না। পূর্ব্ব হইতেই কর্ণেল সাহেবের এ ধারণা ছিল; কিন্তু দুর্গবাসীগণ ভয়ের অতি সামান্য চিহ্নও প্রকাশ করিল না। গম্ভীর তোপধ্বনি নিস্তব্ধ গিরি-উপত্যকায় পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল, দুই একটি বৃক্ষপত্র কম্পিত হইল, তরুশাখাসীন পক্ষিকুল এই অনভ্যস্ত শব্দে ভীত হইয়া উচ্চতর প্রদেশের অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইল। একখানি প্রস্তরখণ্ডও স্বস্থানচ্যুত হইল না, কামান-নিক্ষিপ্ত গোলা দুর্গপ্রান্তস্থ শালব্যূহের সামান্য অংশও ভেদ করিতে পারিল না। কর্ণেল সাহেব এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ সাহরানপুরে জিলেস্পাই সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন; পর দিন ২৬শে অক্টোবর প্রাতঃকালে জিলেস্পাই

জিলেস্পাই সাহেব একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া আসিলেন; অনন্তর দুর্গ-আক্রমণের বন্দোবস্ত হইল। এই বন্দোবস্তে আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। নালাপাণি দুর্গের সম্মুখে প্রায় পাঁচশত গজ দূরে একটা সমভূমির উপর কামান-শ্রেণী সজ্জিত করা হইল, এবং সৈন্যদল চারি ভাগে বিভক্ত হইল; কর্ণেল কার্পেণ্টার, কাপ্তেন-ফাষ্ট, মেজর কেলি এবং কাপ্তেন ক্যাম্বেল্—এই চারি-জন সেনানায়কের অধীনে চতুর্দ্দিকে সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইল; এই চারি দলে সৈন্যসংখ্যা আট শত; এতদ্ভিন্ন মেজর লড্‌লর অধীনে ৯৩৫ জন "রিজার্ভ" রহিল। স্থির হইল, এই চারি দল সৈন্য চারি দিক হইতে একই সময়ে নালা-পাণি আক্রমণ করিবে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষ কোন দিক রক্ষা করিবে বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধি দ্বারা অন্যের বুদ্ধি আয়ত্ত করিতে যাওয়া, বিশেষতঃ আয়ত্ত করিয়াছি, এই সিদ্ধান্তে "লঙ্কাভাগ" করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। উপ-স্থিত ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছিল; কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত অনুধাবন করিলে জিলেস্পাই সাহেব বুঝিতে পারিতেন, এই কয় দিনের যুদ্ধায়োজনের মধ্যেও বলভদ্র সিংহ যে নির্ভীক ও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাহার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে, এবং দুর্গ আক্রমণ তিনি যেরূপ সহজ মনে করিয়াছিলেন, ইহা সেরূপ সহজ নহে; পথ দুরারোহ, কণ্টকারণ্যে সমাকীর্ণ; তাহার উপর দুই এক স্থানে প্রস্তরশ্রেণী এরূপ সুকৌশলে সজ্জিত ছিল যে, তাহার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, কিন্তু পদসঞ্চারমাত্রই তাহা গড়াইতে গড়াইতে বহু নিম্নে পতিত হয়। সৈন্যদলের সুশিক্ষিত পদচালনা, অসীম সাহস ও বল, এবং অব্যর্থ অস্ত্রকৌশল কোনও ক্রমেই সে পতন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। উদ্ধত বীর জিলেস্পাই হয় ত এত কথা বিবেচনার অবসর পান নাই; পাইলে সহসা চারিদিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিয়া মুহূর্ত্তে তাহা জয় করিবার আশা তাঁহার নিকট অসম্ভব বোধ হইত, হয় ত এই ভ্রমের জন্য অকালে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইত না।

এদিকে বলভদ্র সিংহের দুর্গ এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সিঁড়ি ব্যতীত ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না; চারি দিকে দুর্ভেদ্য পর্ব্বত যেন তাহার পাষাণ দেহ বৃদ্ধি করিয়া এই কয়টি স্বাধীনতাপ্রিয় মানবকে অক্ষয় কবচের ন্যায় রক্ষা করিতেছিল। এক দিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল বটে, কিন্তু সেই দিক সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ; গগনস্পর্শী বিরাট শৈলশৃঙ্গ সে দিকে সরলভাবে

উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান; মনুষ্যনির্ম্মিত অগ্নেয়াস্ত্র তাহা বিদীর্ণ করিতে সক্ষম নহে, মনুষ্যের দুর্দ্দম স্পৃহা এবং দাম্ভিক বল দর্প তাহাতে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়।

জিলেস্পাই সাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, এবং কামান ছুড়িতে আদেশ করিলেন। কামানে ক্রমাগত অগ্নি উদ্গীরণ হইতে লাগিল; জ্বলন্ত, অগ্নিময় গোলকসমূহ মুহুর্মুহু বলভদ্র সিংহের দুর্গপ্রান্তে আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী এবং তাহার গাত্রস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের একখানিও স্থানচ্যুত কিম্বা ভিন্ন হইল না, দুই এক খানির কোনও কোনও অংশ ভাঙ্গিল মাত্র।

কামান ব্যর্থ দেখিয়া জিলেস্পাই সাহেব একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আক্রমণ করিবার জন্য সঙ্কেত তোপধ্বনি করিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দল, হয় সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনিতে পায় নাই, নয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সেই শব্দ শুনিয়া তাহারা সঙ্কেতধ্বনি বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং তাহারা অগ্রসর হইল না। কেবল কর্ণেল কার্পেণ্টারের সৈন্যদল ও রিজার্ভ ফৌজ বেলা নয়টার সময় অগ্রসর হইল। এতক্ষণ ইংরাজ সৈন্য যে স্থান হইতে গোলা বর্ষণ করিতেছিল, সে স্থান এত দুর্গম বা দুরারোহ ছিল না; কিন্তু এইবার তাহাদের অধিকতর ভয়ানক পথে অগ্রসর হইতে হইল। জিলেস্পাই এবার কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেন যে, এই কার্য্য তিনি পূর্ব্বে যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, ইহা তত সহজ নহে, আজ যুদ্ধ জয় করিতে অনেক সাহসী বীরের প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে; তাহাও উত্তম, বলভদ্রের পার্ব্বত্য অধিকার আজ হস্তগত করিতেই হইবে, তাহার দুর্গে বৃটীশকেতন উড়াইতে না পারিলে বৃটীশ নামের গৌরব বিনষ্ট হইবে,—সাহস ও উৎসাহের সহিত জিলেস্পাই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত সৈন্যগণ সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বীর দর্পে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু বিপদের উপর বিপদ, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দুর্গ হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল, এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে সৈন্যগণ মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু পশ্চাৎপদ হইল না। যিনি তাহাদের অধিনায়ক,—ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না, সৈন্যগণও সেইরূপে শিক্ষিত হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা

নিশ্চল হইল বটে, কিন্তু পশ্চাৎপদ হইল না। সেনাপতি নিষ্কাশিত অসি হস্তে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দলে দলে ইংরাজ সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল; কিন্তু হতাবশিষ্ট দল হটিল না, সমান বীরদর্পে দুর্গপ্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইল।

সিঁড়ি ভিন্ন দুর্গে উঠিবার উপায় নাই। সঙ্গের সিঁড়ি তখনও পশ্চাতে। অল্প ক্ষণ পরে লেপ্টেনান্ট এলিস সিঁড়ি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং সিঁড়ি বাহিয়া তিনিই সর্ব্বাগ্রে উপরে উঠিলেন। কিন্তু উপরে উঠিয়া তাঁহাকে আর দুর্গের ভিতরে অগ্রসর হইতে হইল না; বিপক্ষের বন্দুকের গুলি তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার প্রাণহীন দেহ দুর্গমূলে পতিত হইল। যাহারা দুর্গপ্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহারা একটু হটিয়া আসিল।

কিন্তু জিলেস্পাই সাহেব "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মূলমন্ত্র যে ধারণ পূর্ব্বক এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, লেফ্‌টেনান্ট এলিসের দেহ তখনও তাঁহার সম্মুখে, দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়শোণিত তখনও শীতল হয় নাই; সেই চিরনিদ্রিত বীরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য একবার প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর আহত সিংহের ন্যায় আবার অগ্রসর হইলেন। প্রতিহিংসার যে অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র গিরি-দুর্গকে দগ্ধ না করিয়া যেন তাহা নির্ব্বাপিত হইবে-না।

জিলেস্পাই দুর্গের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুর্গ হইতে অধিকতর বেগে গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল; সাহসী সৈন্যগণের অগ্রসর হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দণ্ডায়মান হইয়া বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে যদি কার্য্যোদ্ধার হইত, তাহা হইলে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিত। কিন্তু প্রাণ দান করিয়াও সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত ইংরাজ সেনা ক্ষীণ হইতে লাগিল, হত ও আহত সৈনিকের স্তূপে সে স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল, জয়লক্ষ্মী আজ ইংরাজের প্রতি অপ্রসন্ন।

কিন্তু জিলেস্পাই আজ দুর্জ্জয় পণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। ক্রন্দাগত

মৃত্যু, এই উভয় কাম্যের অন্যতরটির জন্য কৃতসংকল্প। তিনি পুনর্ব্বার তরবারী হস্তে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া সকলের অগ্রে চলিতে লাগিলেন; সহসা একটি জ্বলন্ত গোলা আসিয়া তাঁহার বক্ষে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রিজার্ভ দলের অধিকাংশ সৈন্যই জীবন বিসর্জ্জন করিল; ইংরাজ সৈন্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া দেরাদূনে প্রত্যাগমন করিল। অসহিষ্ণু জিলেস্পাই তাঁহার অবিবেচনার প্রতিফল পাইলেন; বহুসংখ্যক নির্ভীক বীর অকারণে তাহাদের হৃদয়শোণিতে এই পাষাণময় গিরিতল অভিষিক্ত করিল।

সে দিনের মত যুদ্ধ বন্ধ হইল। কর্ণেল মৌলি "সিনিয়ার অফিসার", সুতরাং তিনিই সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার এই দুর্গজয়ে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র। অতএব দলপুষ্টি না করিয়া আর এ কাজে হস্তক্ষেপ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। Battering train এবং আরও অধিকসংখ্যক সৈন্যের জন্য তিনি দেরা হইতে দিল্লীতে পত্র লিখিলেন এবং তাহাদের অপেক্ষা বসিয়া রহিলেন; এই ভাবে এক মাস কাটিয়া গেল। এ দিকে বলভদ্রও বুঝিয়াছিলেন, সিংহ প্রতিশোধকামনায় সুযোগের অপেক্ষা করির্তেছে; তিনিও দুর্গের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতে ও রসদ সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন।

শ্রীজলধর সেন।

৺ কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

গত মার্চ্চ মাসের "ন্যাশনাল মেগাজিনে" * কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গীতি সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের নাম না জানেন, পূর্ব্ব বঙ্গে এমন লোক বিরল; কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় নখাগ্রে গণনা করা যায়।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাকে চিনে। এ দেশে এমন শিশু নাই, যাহারা মাতৃ-

---

* "[illegible]

স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে রাই-উন্মাদিনী কি স্বপ্নবিলাসের দুই একটি দিব্য গীতি শ্রবণ করে নাই। সেই সব সংগীত প্রেমপীযূষপূর্ণ; গাইতে গাইতে গায়কের চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চক্ষে অশ্রু বহে। কলিকাতা অঞ্চলে যখন গোবিন্দ অধিকারী অনুপ্রাসের লীলা দেখাইয়া শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয় প্রেমের বন্যায় পূর্ব্ববঙ্গ ভাসাইতেছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর শব্দচাতুর্য্য, গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তিমাধুর্য্যের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত। যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে, কৃষ্ণকমলের ন্যায় মধুবর্ষী পদকর্ত্তা আর দ্বিতীয় নাই।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী বৈদ্যবংশে জাত; বাড়ী নদীয়া জেলা, কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন, ভাজনঘাট গ্রাম; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গই তাঁহার কার্য্যভূমি ছিল; পূর্ব্ববঙ্গেই তাঁহার অপূর্ব্ব স্বপ্নময় "স্বপ্নবিলাস", প্রেমের অমৃত-উৎস "দিব্যোন্মাদ" (রাই উন্মাদিনী) ও প্রেম-লীলা-বৈচিত্র্যপূর্ণ "বিচিত্রবিলাস," প্রেমের এই ত্রিধারার সঞ্চার হইয়াছিল। আজ ৮।১০ বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি গোস্বামী মহাশয়ের নামে ভক্তগণের চক্ষু সলিলার্দ্র হয়। তাঁহার জীবন ও মরণ সম্বন্ধে কত অপূর্ব্ব কাহিনীই এ দেশে প্রচারিত আছে। আজও পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণকমলময়।

স্বপ্নবিলাস তাঁহার কবিত্বের প্রথম কীর্ত্তি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নহে। কবি, প্রচলিত রুচি অনুসারে অনুপ্রাস যোজনা করিতে একটু ব্যস্ত ছিলেন। শব্দের মসৃণতা ও পরিপাট্যে বিশেষ লক্ষ্য থাকাতে, স্বপ্নবিলাস ভাবের হিসাবে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শব্দের দিকে দৃষ্টি রাখিলে প্রকৃত কবির প্রতিভা বাধা পায়। তাই স্বপ্নবিলাস সম্পূর্ণ বিকশিত কাব্য হয় নাই; ইহা একটি অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কাব্যপ্রসূন। যে ভাব অতি মনোজ্ঞ ভাবে চিত্ত অধিকার করিতেছে, "স্বপ্নবিলাসে" তাহার সূচনা;—স্থলে স্থলে চিত্রগুলি র‍্যাফেল কি মাইকেল এঞ্জিলোর অঙ্কনযোগ্য হইয়াছে, কিন্তু সেই চিত্রগুলি এক পৃষ্ঠায় যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, পর পৃষ্ঠায় তাহা রক্ষিত হয় নাই। যেন কি বিকশিত হইতে গিয়া অবিকশিত অবস্থাতেই লীন হইয়া যাইতেছে, বেহাগের মত কি এক অপূর্ব্ব রাগিণী গীত হইতেছিল, কি কারণে তাহা নীরব হইয়া গিয়াছে। অনু-

তথাপি স্বপ্নবিলাস আমাদের আদরের বস্তু। ল্যালিগ্রো ও ইলপেন্‌সিরেসো যেরূপ প্যারাডাইস-লষ্টের সূচনা, ভিনাস-এডোনিস যেরূপ রোমিও-জুলিয়েটের সূচনা, স্বপ্নবিলাস কাব্য তেমনি রাই-উন্মাদিনীর সূচনা; কিন্তু শুধু ভাবী কাব্যের সূচনা বলিয়াই স্বপ্নবিলাসের আদর নহে। স্থানে স্থানে ইহার ভাব অতি মনোজ্ঞ। রাধা তমাল দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রম করিলেন; স্ফুরিত কদম্বের ন্যায় তদ্দর্শনে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, গদ্‌গদ কণ্ঠে সখীদিগকে ডাকিয়া গাইলেন,—

ওই দেখ চরণে চরণ থুয়ে
ও যে ভুবনমোহন বেশে দাঁড়াইয়ে।
আমার যে অঙ্গ হ'ল ভারি
আমি যে আর চলতে নারি।

বিদ্যাপতির যে গানটি রাম বসু ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন—সেই তমালের ডালে বাঁধিয়া রাখিবার কথা,--সখীগণ যেন মৃতদেহ না পুড়াইয়া ফেলে, কি যমুনাজলে বিসর্জ্জন না করে। কৃষ্ণকমলও স্বপ্নবিলাসে সেই গানটি বীণায় পুনরায় নিজ সুর বাঁধিয়া আলাপচারি করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণকমল শুধু অনুকরণকারী নহেন, প্রাচীন ভাবটি তিনি হাতে লইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন; তাহা এইরূপঃ—

"দেহ দাহন কোর না দহন দাহে
ভাসাও না কেহ যমুনাপ্রবাহে,
—সখীরে আমার শ্যাম-বিরহে পোড়া তনু,
———আমার শ্রীকৃষ্ণবিলাসের দেহ,
সব সহচরী, বাহু দুটি ধরি বাঁধিও তমাল-ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি আসে গো আমার পরাণ হরি,
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ-সমীর পরশে শরীর জুড়াইব সেই কালে,
বঁধু আসিয়ে সই, যদি সুধায় রাই কই?
তোরা দেখাস্‌ ওই, তোমার রাধা বাঁধা তমালে ওই,
হ'ল প্রেমময়ীর প্রেমের সহমরণ।"—স্বপ্নবিলাস।

ইহা গেল পুরাতন ভাব, কিন্তু

"মৃত তনু দেখিলে নয়নে আমার প্রাণবল্লভ গো,
পাছে সতীপতি শিবের মত হয়ে বঁধু উনমত্ত,
বহিয়ে বা ফিরে বনে বনে, তাই মনে ভাবি গো,
যে অঙ্গে চন্দনার্পণে, কত ভয় বাসি মনে
সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে!"—স্বপ্নবিলাস।

তথাপি ক্ষণতরে সে শ্যাম প্রেমে সন্দিগ্ধা নহে। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় অবিশ্বাস আসিতে পারে না। যখন তুমি ভালবাসিয়া ভালবাসার বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট স্বার্থের সীমাবন্ধনীর মধ্যে বিহার করিতে আদেশ কর, তখন তোমার আত্মসুখ খুঁজিয়া বেড়াও মাত্র। লালসার ভালবাসায় সুখ নাই, লালসা হইতে হিংসা দ্বেষ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি, প্রকৃত ভালবাসা পৃথিবীর সার সামগ্রী, তাহা কষ্টের কারণ হইতে পারে না। রাধার মরণেও সুখ। রাধা অবিশ্বাস-বাণ-বিদ্ধ হইয়া মরিতেছে না; সে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে একবারও নিরাশ হয় নাই। বরং নিজে মরিলে বঁধু পাগল হইবেন,—মৃতের ভারে কোমলাঙ্গে ব্যথা হইবে, রাধার মরণকালে সেই ভাবনা।

স্বপ্নবিলাসের গানগুলি অনুপ্রাস-দোষে দুষ্ট হইলেও ভাবে সুন্দর, আমরা আর একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

"আহা মরি! সহচরি কেন এ কিশোরীর
সুশর্ব্বরী প্রভাত হল,
ছিলেম নিদ্রাবেশে, দেখলেম স্বপ্নাবেশে
বঁধু অভাগিনীর বাসে এসেছিল।
হাসি হাসি আসি বসিয়া শিয়রে,
'উঠহ প্রেয়সি' বলে উচ্চৈঃস্বরে,
বঁধু যুগল করে, ধরি মম করে,
যেন সুধাকরে সুধা বরিষণ করে,
নিদ্রা কেন হ'ল ভঙ্গ, করি আমার সুখভঙ্গ,
ভঙ্গ হ'ল সখা সঙ্গ, সে ত্রিভঙ্গ কোথায় গেল?"

কৃষ্ণকমলের অপূর্ব্ব প্রেম অনুপ্রাসের বাধায় বাধ্য রহিল না। রাই-উন্মাদিনীতে ভাব ভাষার নিগড় ছিঁড়িয়াছে, এখানে কবির প্রতিভা মুক্ত, রচনা সরস। ভাষায় কৃত্রিম ভূষণ নাই, কিন্তু নগ্ন সৌন্দর্য্যের আধিক্য।

শুনিয়াছি, গোস্বামী মহাশয় স্বীয় আরাধ্য দেবতা হইতে রাই-উন্মাদিনী পালা দান পাইয়াছিলেন। এই কাব্যের সরসতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

রাই-উন্মাদিনীতে অনুপ্রাস কিছু আছে,—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক; কবির শ্রুতি যখন মধুর রসের কথায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত, তখন অনুপ্রাস স্বভাবে উদয় হয়; এ অনুপ্রাস চেষ্টা-সিদ্ধ নহে। রাধিকা মেঘদর্শনে মুগ্ধা, কৃষ্ণভ্রমে বলিতেছেন,—

দাঁড়াও হে দুখিনীর বঁধু তিলেক দাঁড়াও।
যে যার শরণ লয়, নিঠুর বঁধু, বঁধু, তারে কি বধিতে হয়?
এথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে,
তবে যেইও সেথাকে———
যদি মনে মন রত, না হয় মনের মত,
কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে।
তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে
না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে।
বঁধু যথা যে না থাকে,
তথা তাকে আর কোথা কে—ধোরে বেঁধে কবে রেখে থাকে।"

আমি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ খানি ভাল করিয়া পড়িয়াছি। রাই-উন্মাদিনীর আশ্চর্য্য মূর্চ্ছাময় প্রেমের ভ্রান্তিময় স্বপ্নবৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে মনে হইল, যেন কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ খণ্ডে যাঁহাকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে ছবির ইঙ্গিত মাত্রে রেখাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, রাই-উন্মাদিনীতে সেই চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। চটক পর্ব্বত দেখিয়া চৈতন্যের গোবর্দ্ধনভ্রান্তি, কুসুমবন দেখিয়া বৃন্দাবনভ্রান্তি, কৃষ্ণভ্রমে "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর"—সেই চৈতন্য-জীবন এক দিব্য ভ্রান্তির ছায়া। রাই-উন্মাদিনীর রাধিকাও তাই। মেঘদর্শনে তাঁহার করুণাত্মক বিলাপ পাঠ করুন, পরিত্যক্ত বৃন্দাবনপল্লী ও নিধুবন দেখিয়া রাধিকা স্বীয় প্রাণের অত্যুচ্ছ্বাসে জড়কে জীবন দিতেছেন, তাঁহার বিলাপাত্মক গীতিধারায় পাষাণ দ্রব হইতেছে, মলয়ে নিশ্বাস বহিতেছে। এই উদার সহানুভূতি-পরায়ণ জড় জগতে দণ্ডায়মানা, প্রেমে আত্মবিহ্বলা, উন্মাদিনী রাধিকাকে দর্শন করুন। আমি ইংরাজি সংস্কৃত কোনও গ্রন্থে এরূপ প্রেমের বিমুগ্ধ ছবি আর দেখি নাই। এই সাহসিক উক্তির জন্য সাহিত্যজগতে আমার দণ্ড হইলেও, নিজের মত অকাতরে ঘোষণা করিব।

যেমন রাধিকা, তেমনই চন্দ্রা। ঈর্ষাপরায়ণা চন্দ্রা শ্রীমতী রাধিকাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। কিন্তু কৃষ্ণবিরহে যখন সমবেত সখীবৃন্দের মধ্যে রাধিকা মূর্চ্ছিতা, তখন চন্দ্রা আসিয়া একবার সেই দুঃখপূর্ণ ছবি দেখিল; দেখিয়া বলিল,—

"হায় একি বিপদ হেরি বিপিনে,
এ সব কনক পুতলি, পড়িয়াছে ঢলি,

গজোৎখাতে যেন কমলকানন
মহাবাতে যেন হেম রম্ভাবন"—ইত্যাদি।

চন্দ্রা ইহার পূর্ব্বে রাধিকাকে ভাল করিয়া দেখে নাই—ঈর্ষ্যায় তাই বলিল,

"আহা এতই রূপের রূপসী—
আমি নয়ন ভরে দেখি নাই সরল ভাবে,
ধনীর নিদান দশায় এতই রূপ,
না জানি ছিল ধনীর সুখের দশায় কত রূপ ;—
যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা কৈত,
শ্যাম-গরবিণী গরব কৈরে গো,
তখন এই না মুখে মুখের কতই জানি শোভা হৈত।
তা নৈলে এমন হবে বা কেন গো—
বঁধু থেকে আমার গো বক্ষঃস্থলে
অমনি কেঁদে উঠত রাধা বলে।
হায় গো অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি,
—চরণ-কমল হোতে সুকোমল গো কমলিনীর—
আল্‌তা পরাতো বঁধু কতই বাখানি।
—এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে
—ধনী বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে,
হেন বাঞ্ছা হতো তখন পাতিয়ে দেই হিয়ে।

রাধিকা যখন কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধা, চন্দ্রা মনশ্চক্ষে তখনকারই চিত্র কল্পনা করিতেছে। অন্য সময়ে রাধিকাকে সুন্দরী বলে নাই। রাধিকা সুন্দরী ;—কিন্তু জুলিয়েট, এণ্ড্রমেকী, ডিডো, কে সুন্দরী নহে? এ উদ্যানে ত সুন্দরের ছড়াছড়ি। পথে হাটে সুন্দরী। কিন্তু রাধিকার মত সুন্দরী কে? কৃষ্ণ-প্রেমে রাধিকা সুন্দরী, তাই তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া চন্দ্রা পাগলিনী, আর কত শত বৈষ্ণব কবি সেই সৌন্দর্য্যের একটি লহরী মাত্র বর্ণনা করিতে চেষ্টিত। এ সৌন্দর্য্য নিত্য, অবিনাশী। চন্দ্রা বাহিরের রূপ পূজা করিতেছে না, গুণীই গুণ চিনে, চন্দ্রাও রাধিকার মত রূপসী হইতে চেষ্টিতা, তাই সেই রূপ তাহার চক্ষে এত লাগিয়াছিল।

আর মৃতপ্রায় রাধিকা—শ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে শায়িতা, অর্দ্ধাঙ্গ জলে নিমজ্জিত ; সহচরীগণ "রাই মোল, রাই মোল" বলিয়া কাঁদিতেছে। এ রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি কত প্রেম, সমালোচনার তুলাদণ্ডে তাহার ওজন হয় না, চন্দ্রা দাসখৎ দেখাইয়া কৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবে বলিতেছে, রাধিকা সভয়ে

বেঁধ না তার কোমল করে, ভৎ'সনা কোর না তারে ;
মনে যেন নাহি পায় দুখ।
যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্র মুখ মলিন হবে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।

মনে করিও না, কৃষ্ণকমলকে আমি তাঁহার প্রাপ্যের অতিরিক্ত দিতেছি, অথবা সহসা যশঃকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার শ্মশানের শান্তিভঙ্গ করিতেছি। বিচিত্রবিলাসের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "বোধ হয় ইহাতে (স্বপ্নবিলাস ও রাই-উন্মাদিনী দ্বারা) সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি ?" বৃত্রসংহার কাব্যের লেখকই হউন, আর পলাশীর যুদ্ধের লেখকই হউন, কৃষ্ণকমলের যশঃসৌভাগ্যে ইহাঁরা সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত হইতে পারেন। রাই-উন্মাদিনীর গান বেশি উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহারা এই পুস্তক পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া পুস্তক সংগ্রহ করিবেন। যে কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ; আমি অতিশয় যত্ন করিয়াও পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের জন্য একখানা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

বিরহিণী রাধিকা কানন দেখিয়া যে বিলাপগীতি গাইয়াছেন, তাহাও অতি চমৎকার। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বলা উচিত যে, এই সমস্ত গানই রাগ রাগিণীতে গীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণকমল একজন অসামান্য সংগীতবিদ্যা-বিশারদ গায়ক ছিলেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

প্রতিশোধ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সরলার নৌকা পরিহারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। গ্রাম সেখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র। নদীতীর হইতে মৃণ্ময় গৃহগুলির মাঝে একটি ইষ্টকালয়ের চীলের ঘর এবং দুইটি শিবমন্দিরের উন্নত চূড়া দেখা যাইতেছিল। গ্রামপ্রান্তে দীঘির উচ্চ পাড়ে নিবিড় বটগাছের বিস্তৃত শাখা

দেরি মাত্র না করিয়া সরলা গ্রামাভিমুখে চলিল। অনুচরদের সঙ্গে পূর্ব্বেই পরামর্শ স্থির হইয়াছিল, ঘাটে নৌকার চিহ্ন মাত্র রাখা হইবে না। ইহাতে মাঝি মাল্লাদেরও লাভ; কাজেই তাহারা সম্মত হইয়াছিল, "ছই" খুলিয়া নৌকাখানি ঘাট হইতে দূরে জলমগ্ন করিয়া রাখিবে। শ্রবণশক্তির অপ্রাখর্য্য গুণে আকালের মা ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই। গুণে, কেন না আগে হইতে শুনিতে বুঝিতে পারিলে বুড়ী পথে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল বাধাইত।

অতএব জিনিস পত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া সরলাকে প্রস্তুত হইতে দেখিয়া বুড়ী জঠরজ্বালা ভুলিয়া গেল। সমস্ত পথ সে "সলিকে" বুঝাইতে বুঝাইতে আসিতেছিল যে, মুড়িমুড়কি খেয়ে দিন কাটানর দিন কাল তাহার গিয়াছে। তাহার বয়সে সময়ে ছুটো ভাত নহিলে "মহাপ্রাণী" কদিন টিকিবে? তা সে ভাত শাক ভাতই হোক্, কি নুন ভাতই হোক! অসহ্য হইলে সরলা একবার কেবল বলিয়াছিল—"আয়ি বুড়ি, বুড়ো হয়ে তুই একেবারে বায়াত্তরে গিয়েছিস্—ছি! পুরুষগুলো শুনে ভাব্‌বে, সব মেয়ে বুঝি তোরই মতন পেটুক!"

ঘাটে নৌকা লাগিলে বুড়ী নাতিনীকে লইয়া একটু রঙ্গ রসে প্রবৃত্ত হইল। সে ভাবিয়াছিল, এই তাহাদের গন্তব্য স্থান—খবর পাইলে নাতজামাই পালকী বেহারা সঙ্গে-নিজে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বুড়ী বলিল, "সলি, তোর পালকীর সঙ্গে আমি ত ভাই! ছুটে যেতে পারব না। আমার হয়ে নাতজামাই না হয় যাবে। কিন্তু বর পেয়ে আয়ি বুড়ীকে ভুলে থাকিস্‌নে যেন। এক মুঠো ভাতের যোগাড় করে রাখিস্!"

কিন্তু বুড়ীর আশা ভরসার মূল সহসা শুকাইয়া উঠিল। তাহার পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্বেও বদন নাতজামাইকে খবর দিতে গেল না। সরলা দ্রুতপদে এবং হাঁটিয়া শ্বশুরবাড়ী চলিল দেখিয়া সে তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। দুঃখিত হইয়া বলিল—"এমন অলক্ষণ করো না। ভাদ্দর মাসে বেরিয়েচো, তার ওপর এমন বেহায়ার মতন গেলে লোকনিন্দার সীমা থাক্‌বে না। ছিরকালের জন্মে নাতজামাইয়ের বিষনয়নে পড়্‌বে!" কিছুতে বুড়ী ছাড়ে না দেখিয়া সরলা বুড়ীর কাণে কাণে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল, "ডাকাত পাছু নিয়েচে, দেরি করিস্‌নে!"

বুড়ী তখন আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। দুই চারি পা চলিতে না চলিতে সে সভয়ে একবার চারিদিক দেখিয়া লইতেছিল এবং দূরে কোন কিছু

নৌকার ব্যবস্থা করিতে মাঝি মাল্লা এবং পাইকদের যে সময় গেল, তাহার মধ্যেই আয়ি বুড়ী সরলাকে লইয়া গ্রামে পৌঁছিল। সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে না হইবে, পথে সরলা বুড়ীকে শিখাইতে শিখাইতে গিয়াছিল। ভগবান মদক বলিয়া দিয়াছিল, "মা, পরিহারের বিক্রম সিংহের আশ্রয় নিও, কোন ভয় থাকিবে না।" কিন্তু কিছুতে বুড়ী সে নাম মনে রাখিতে পারিতেছিল না।

গ্রামে প্রবেশ করিতে না করিতে এক দল স্ত্রীলোকের সঙ্গে সরলাদের দেখা হইল। আকালের মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বলি, মা ঠাকুরুণরা আপনারা বল্‌তে পার, 'এই গাঁয়ে কে' সিংহী বাবু আছে? তার নামটিও যেন বাঘ, বাঘ, বুড়ো মানুষ ছাই মনে থাকে না!"

অনেক গুলি যুবতী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সরলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"বাবু বিক্রম সিং তাঁর নাম।" সে মুখশ্রী এবং সুকণ্ঠে একটা মোহিনী ছিল। বুড়ীর কথা শুনিয়া যিনি হাস্য করেন নাই, তিনি বলিলেন, "চল মা, আমাদের বাড়ী চল!" সরলা দেখিল, তিনি বিধবা, কক্ষে পূর্ণ পিত্তল কুম্ভ। কে এক জন বলিয়া দিল, "ইহারই বাপের নাম বিক্রম সিং।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কন্যার মুখে শরণাগতা ব্রাহ্মণকন্যার বি াদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বিক্রম সিং ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। চাকরী করিতে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গলা দেশে বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার আর্দ্র বায়ু এবং মৃত্তিকায় আজিও এই রাজপুতবংশকে তেমন কাবু করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নিজের গোলাবাড়ী হইতে পুত্রদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু খবর আসিল, দুই প্রহরের পর শীকারে গিয়া এখনও তাহারা ফিরিয়া আসে নাই। শুনিয়া বিক্রম সিং হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বহুৎ রোজ সে হাম্ ভি শীকার নেহি খেলা, আজ্ রাতকো মালুম হোগা, বুড্‌ঢা বিক্রম সিং একেলে আভি কেতনা শীকার খেল্‌নে শক্‌তা হায়।"

কন্যা মীরা বলিল, "বাবুজি, শীকার খেল্‌তে গিয়ে মাঝে মাঝে তারা রাত্রে আসে না। যদিই আসে, সেও অনেক রাত্রে। তাদের কাছে লোক পাঠাও। যদিই ডাকাত আসে।" মীরা হিন্দী বেশ বুঝিতেন বটে, কিন্তু ভাল বলিতে

বিক্রম হাসিয়া উঠিলেন। সরলাকে কাছে ডাকাইয়া নিজে সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিলেন, পশ্চাদ্গামী ডাকাতেরা বিশ্বনাথের দলের লোক। ইহাতে তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ডাকাত-গুলো বিশে বাগদীর দলেরই বটে; কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, দলপতি এর কিছু জানে না। তাকে আমি যতদূর জানি, সে এক জন প্রকৃত বীরপুরুষ। অনাথ স্ত্রীলোককে কাপুরুষের মত আক্রমণ কর্‌বার লোক সে নয়।" তখন বিক্রম নিজের সঙ্গে প্রথম বয়সে বিশ্বনাথের যে ভাবে এক দিন সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহার গল্প করিলেন। এইরূপ ঃ—

তাহেরপুরের মল্লিক বাবুদের বাড়ী বিক্রম সিং তখন জমাদার। বিশ্বনাথ এক দিন চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, বাবুরা তাহার নিকট তিন দিনের মধ্যে দুই হাজার টাকা না পাঠাইলে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবে। আমলা মুৎসুদ্দিরা বাবুদের পরামর্শ দিলেন, টাকাটা দেওয়াই শ্রেয়ঃ, নহিলে বিশ্বনাথ সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে। বিক্রম সিং ইহা সহিতে পারিল না। বাবু-দিগকে জানাইল, বিশে ডাকাতের কাছে টাকা পাঠাইবার আগে তাহাকে চাকরী হইতে জবাব দেওয়া হোক্। শেষে বাবুরা তাহার কথায় টাকা পাঠা-ইতে নিরস্ত হইলেন। দুই দিনের ভিতর বিক্রম ডাকাইত তাড়াইবার যথোপ-যুক্ত ব্যবস্থা করিল। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার সময় খবর আসিল, বিশ্বনাথ ভৈরব নদীর অপর তীরে সদলবলে ছাউনি করিয়াছে।

নিঃশব্দে বিনা অস্ত্র সম্বলে বিক্রম সিং নদী পার হইয়া ডাকাইত-শিবিরে দর্শন দিল। দুই জন খেলোয়াড় বিশ্বনাথের ছাউনি-সম্মুখে "ঘাটি" রক্ষা করি-তেছিল—চন্দ্রালোকে তাহাদের ঘূর্ণ্যমাণ অসিফলক জ্বলিতেছিল। বিক্রম তাহাদের কথার উত্তর দেয় না দেখিয়া, তাহারা তাহাকে সর্দ্দারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল।

বিশ্বনাথ চক্ষু ভরিয়া বিক্রমের দীর্ঘমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। বলিল, "দেখার জিনিস বটে। কি চাও তুমি?"

বিক্রম বলিল, "আমি বাবুদের নিমক খাই। কি সাহসে তুমি তাঁহা-দিগকে চিঠি লিখিয়াছিলে? কি সাহসে এখানে আসিয়া ছাউনি করেছ? আমি নিরস্ত্র, সাধ্য থাকে আমার সঙ্গে আগে লড়, তার পর মনিববাড়ী-মুখো হইও।"

এ বাঙ্গলা দেশে এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ বিশেকে বলে নি। কিন্তু শুধু কথায় হবে না। একটু কাজে দেখাও দেখি। আকাশে ঐ টিটি পাখী ডাক্‌চে। এই নাও ধেনুক আর বাঁটুল। তীর চাও ত, তাও দিতে পারি; পাখীটেকে পেড়ে আন ত দেখি।”

বাস্তবিক তখন স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকতলে, বিশ্বনাথের শিবিরের মাথার উপর টিট্টিভ পক্ষী ডাকিয়া যাইতেছিল। এই পাখীর ডাকটা তেমন শুভসূচক নহে বলিয়া একটু আগে বিশ্বনাথ তাহাকে একবার লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই। বিক্রম সিং ধনুক এবং বাঁটুল লইল—বলিল, ঐ পাখী-গুলো অনেক দূরে দূরে উড়ে বটে, কিন্তু তীরের বোধ হয় দরকার হবে না।” এই সময়ে পাখীটা আবার ছাউনি শীর্ষে ঘুরিয়া আসিল। নিমিষে বিক্রম উহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শরাসনে টঙ্কার দিল। মৃত পক্ষী বিশ্বনাথের পদতলে আসিয়া পড়িল। সেই হইতে আর কখনও বিশ্বনাথ তাহেরপুর অঞ্চলে কোনও উদ্যম করে নাই।

এই কথার পর বিক্রম কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বেটী, আজ আমার সুপ্রভাত, তাই ব্রাহ্মণকন্যার পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়েচে। তুই যথাসাধ্য ওঁর সৎকার কর্। ওঁর লোক জনকে সিধা পাঠিয়ে দে। কোন ভাবনা করিস্ নে। চাকরদের বলে দিস্, আমার সানা * আর তরওয়ালখানা ঠিক্ করে রাখে। যদিই শীকার খেল্‌তে হয়।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মীরা রাজপুত্‌নী বাপের বড় আদরের মেয়ে—কেন না, সে আজন্ম দুঃখিনী। সূতিকাগৃহে জননী সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে স্বামী-হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তার পর অনেক কষ্টে মানুষ করিয়া পিতা দ্বাদশ বর্ষে সুপাত্রে তাহার পরিণয় বিধান করিলেন বটে, কিন্তু অদৃষ্টে সহিল না। ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে মীরা বিধবা হইল। বিক্রম সিং পূর্ব্বে চাকরী করিতেন। এই সর্ব্বনাশের পর তাহা ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন।

বিক্রম তৎপূর্ব্বেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার

---

* সানা—বর্ম্ম বিশেষ। উহার সঙ্গে নানা অস্ত্র সংযুক্ত থাকে। শুনিতে পাই, বিষ্ণুপুর

একটি পুত্র সন্তান হইল। তার পর আট বৎসরের মধ্যে চারি পুত্র উপহার দিয়া দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীও তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিমাতার জীবিতকালে মীরা ভাইগুলিকে সস্নেহে লালন পালন করিত। তাঁহার অবর্ত্তমানে, তাহাদের সকল ভার তাহার উপর পড়িল।

কন্যার কল্যাণে বিক্রম প্রৌঢ় বয়সে সন্তানপালনের ক্লেশ ও উদ্বেগ হইতে অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু চারিটি ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার পৈতৃক জমীদারী অতি সামান্য—পরিহার এবং তাহার সন্নিহিত মল্লিকপুর নামে গ্রাম। দুই খানি গ্রামের বার্ষিক আয় হাজার টাকার বেশী নহে। কিন্তু বিস্তর জমী অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াছিল। কর্ত্তারা সকলেই পুরাতন মনিব সরকারে চাকরী করিতেন, নিজ জোতগুলি পর্য্যন্ত ভাগে দেওয়া হইত। কর্ম্মত্যাগের কিছু কাল পরে, ধনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিক্রম স্বয়ং খাসে চাস সুরু করিলেন। কয় বৎসরের ভিতর পতিত জমী আবাদ হইয়া গেল।

যে গোলাবাড়ীতে তাঁহার ছেলেরা সচরাচর থাকিত, তাহা বিক্রম সিংহের নিজের কৃত। বিস্তর শস্য সেখানে সঞ্চিত হইয়াছিল। ইদানীং বিক্রম বিস্তৃত ভাবে মহাজনীও করিতেন। পীতাম্বর, দিগম্বর এবং যোগাম্বর, এ সকলের তত্ত্বাবধারণ করিত। কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ম্বর এখনও বালক। সে গ্রামের পাঠশালায় পড়িত, সন্ধ্যার পর বাপের কাছে "ভজন" শিখিত।

মীরা বলিত, "বাবুজী, পীতু, দিগুর বিয়ে আর না দিলে চলে না, যোগুর বিয়ে না হয় দু বছর পরে দিও। পাড়ার বাড়ী বাড়ী বউদের দেখে আমার সাধ হয়, আমার ভাইদের বউ এলে সাধ আহ্লাদ করি।" বুড়া হাসিত। "বেটী, বাঙ্গলা মুল্লুকে থেকে থেকে তোরও মেজাজ্ বাঙ্গালীর মতন হয়েচে। এখন লেড়কাগুলোর বিয়ে দিয়ে শেষে ওদের আখের খাব। আরও পাঁচ দশ বছর যেতে দে বেটী।" ইহাতেও মীরা জেদ করিলে, পিতা সাশ্রুনয়নে বলিতেন, "মা, বাবুদের কথা শুনে বার বছর বয়সে তোর সাদি দিলাম। কি তাতে ভাল হলো বল্? আমার মনে হয়, কেন তোকে অত কম বয়সে বিয়ে দিয়ে চিরদুঃখিনী করেছি।"

বড় আদরের মেয়ে বলিয়া মীরা অতিশয় পিতৃভক্ত হইলেও দু এক বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইতে বাধ্য হইত। বিক্রম ছেলেদের খবর দিয়া আনাইবার

বুঝিল, ডাকাইতরা সত্য সত্য আসিলে, বৃদ্ধের ভূতপূর্ব্ব বাহুবলগৌরবে কুলাইয়া উঠিবে না। অতএব মীরা ভাইদের ডাকিতে লোক পাঠাইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৃহস্থালীর সকল কাজ সারিয়া মীরা সরলার কাছে আসিয়া বসিল। বিক্রম সিংহের তখন অর্দ্ধ রাত্রি এবং সরলার আয়ি বুড়ি তাহার নিকটে শুইয়া নাসিকাগর্জ্জনে বৃহৎ অট্টালিকার নিশীথ-নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

সরলা তখনও শয়ন করে নাই। মীরার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া শেষে আপনার পরিণাম চিন্তা করিতেছিল। আগে যে সব কথা আদৌ মনে হয় নাই, তখন তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার বোধ হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, ডাকাইতের হাত থেকে যদিই রক্ষা পাই, তার পর কপালে কি আছে, কে জানে? স্বামী-গৃহে যাইবার আগে একবার তাঁহার কাছে খবর পাঠাইয়া অনুমতি চাহিলে বুঝি ভাল হইত। শ্বশুরালয় কিরূপ, সপত্নীরা কে কেমন লোক, কে কে সেখানে বাস করেন, এ সকলের কোনও সম্বাদ সরলা কখন রাখে নাই। যদি গিয়া দেখে,—স্বামী প্রবাসে গিয়াছেন, এবং সপত্নীরা কণ্টক ভাবিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন কোথায় দাঁড়াইবে? আর, স্বামী গৃহে থাকিলেই যে সহসা তাহাকে আশ্রয় দিবেন, তাই বা কে বলিল? এর আগে এ সব নিরাশার কথা ঘুণাক্ষরেও সরলার মনে উদয় হয় নাই; কেন না, পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে সে জানিত না, সত্য সত্যই মানুষের সংসারটা শ্বাপদজন্তসঙ্কুল ঘোর অরণ্যের মত।

এই ভাবনার তন্ময়তাবশতঃ সরলা মীরাকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। মীরা হাসিয়া বলিল, "বোন্, এখনও তুমি শোও নাই! ভাবনা কি, তোমার শ্বশুরবাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়। কালই সোয়ামীর কাছে পাঠিয়ে দেব।"

সরলা লজ্জিত হইল। অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা নয় দিদি, আমি ভাবচি কি যে, আমি এসে আজ বুঝি তোমার খাটুনি আরও বেড়েচে। রোজ সংসারের এত কাজ তুমি কি করে কর? ধন্যি তুমি দিদি।"

মীরা হাসিল। "বোন্, কাজই আমার সব। তুমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ, সুবচুনী করুন, অনেকগুলি ছেলে পুলে হোক্, সোণার সংসার পাতিয়ে তুমি সারা দিন কাজে কর্ম্মে নাইতে খেতে অবসর না পাও। আমি ভাই কাজকেই বিয়ে

কর্‌তে কর্‌তেই যেন মরি। যেন বাপ ভাইদের সাম্‌নে পুড়তে পুড়তে ছাই হ'য়ে যাই।"

মীরার সেই হাসিটুকুর ভিতর একটা করুণার আর্দ্র ভাব ছিল ; সে হাসি এবং কথা স্বরসংযুক্ত কবিতার মত শ্রোতার প্রাণ আকুল করিয়া যেন বলিতে-ছিল—এ নারী জন্মের কোনও সাধ আমার পূরিল না।

চোকের জল মুছিয়া সরলা বলিল, "দিদি, মারও আমার বেশী বয়েস হয় নি, তোমার চেয়ে তিনি কিছু বড় ছিলেন। তিনি বল্‌তেন, 'পুড়লো মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।' তোমরা বিপদ কাটিয়ে উঠ্‌লে, তবু তোমা-দের এখনও ভাবনা। আমি ত সমুদ্দুরে ভাস্‌চি, মা দুর্গার মনে কি আছে, কে জানে।"

মীরা সস্নেহে বালিকার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "সরলা, আপনাকে যে রক্ষা করতে জানে না, স্বয়ং ভগবানও তাকে রক্ষা করেন না। এ মেয়ে-জন্মের প্রধান ভূষণ লজ্জা আর কলঙ্কের ভয়। যার তা আছে, তার কোনও ভয় নেই। বিধবা মীরার কথা কটি মনে রেখো বোন। আজ বিশ বছর এই মন্তর জপ করে কাটাচ্চি।"

এই সময়ে সহসা গ্রামপ্রান্তে বিকট চীৎকার শুনা গেল। সরলা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মীরা স্থির ভাবে বলিল, "এ ডাকাতের কুল্‌কুলি *। ডাকাত এসে পড়ল, কিন্তু ভাইদের এখনও দেখা নেই। বুড়ো বাপকে বাঁচান আজ ভার হবে।"

এই বলিয়া মীরা গৃহান্তর হইতে দুই খানি শাণিত-তরবারি লইয়া আসিল। সরলা বলিল,—"তুমি এ হাতিয়ার নিয়ে কি কর্‌বে দিদি? ভাইরে এলেও যা হোক্।"

সে বিপদের মুহূর্ত্তেও মীরা পূর্ব্ববৎ হাসিল। "তখুনি তোমায় বলেচি বোন, নিজের রক্ষার ভার নিজের হাতে। আমরা রাজপুত্রের মেয়ে। তুমি কি শোন নি, ম্লেচ্ছদের হাত থেকে চিতোরে সতীরা কি করে উদ্ধার হত?"

সরলা আসন্ন বিপদভয়ে এবং ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "হিন্দুর মেয়ে সবাই মরতে জানে দিদি। তোমার কথায় আমার পাঁচ হাত বুক হলো।"

* কুলকুলি—ডাকাইতেরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ "হারে রে রে" ইত্যাকার

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরিহারের রাজপুত্র বাবুদের বাড়ীতে কখনও ডাকাইতি হয় নাই বটে, কিন্তু তখনকার দিনে হইবার কোনও আটক ছিল না। মীরা বুঝিয়াছিল, এতদিন দলপতি খাতির করিয়া আসিলেও, তাহার দলস্থ লুব্ধেরা সবলার পলায়ন ওছি-লায় আজিকার রাত্রে সম্ভবতঃ পিতার ধন গৌরব যশ পরীক্ষা করিতে ছাড়িবে না। অতএব মীরার আদেশে পাইক দু জন সশস্ত্র এবং সজাগ রহিল। বাহি-রের ছাদের উপরে তাহারা লোষ্ট্ররাশি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল। বন্দুক সব শীকারে চলিয়া গিয়াছিল। যে দুইটা জীর্ণ মরিচা-পড়া অস্ত্রাগারে পাওয়া গেল, তাহা তাহারা সাফ্ ও প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

কুল্‌কুলির কোলাহল উঠিতে না উঠিতে বৃদ্ধ বিক্রম সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভৃত্যেরা তাঁহার বর্ম্ম এবং অস্ত্রাদি যথাস্থানে ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিল, সজ্জিত হইতে দেরি মাত্র হইল না। অতএব মীরা পিতার শয়নকক্ষে আসি-বার পূর্ব্বেই তিনি সদর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পাইকেরা তখন ভাল করিয়া দ্বাররক্ষার উপায় বিধান করিতেছিল।

দেখিয়া বিক্রম সিংহ চটিয়া আগুণ হইলেন। বলিলেন্, "তোরা কি মনে করিস্, আমি জেনানার মত দরওয়াজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করবু? খুলে দে। তোরা দু জনে ছুট্টে গিয়ে দুধার থেকে দেখে আয়, শালে ডাকু লোক কোনও রাইয়তের ওপর জুলুম কর্‌চে কি না।"

কিন্তু পাইকেরা বাহির হইতে না হইতে ডাকাতের দল তীব্রবেগে সম্মুখে আসিয়া পড়িল। চক্ষের নিমেষে সুশিক্ষিত সেনাবৎ তাহারা দলপতির নির্দ্দিষ্ট আপন আপন স্থান অধিকার করিল। ঘাটি-রক্ষকদ্বয় দ্বারসম্মুখবর্ত্তী সমস্ত স্থানটুকু চকিতে পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছিল। মেঘকক্ষে সৌদামিনীবৎ তাহাদের হস্তধৃত তীক্ষ্ণধার অসিফলক সর্ব্বত্র চমকিতেছিল। সে অস্ত্রসঞ্চা-লননিপুণতা দেখিতে দেখিতে বিক্রম সিংহ উল্লসিত হইলেন। স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাহবা খেলোয়াড়!"

যে চারি জন ডাকাইত দরওয়াজার মধ্যে প্রবেশের জন্য ছিল, বৈদ্যনাথ তাহাদের সর্ব্বাগ্রে। সে বিশ্বনাথের মুখে অনেকবার বিক্রম সিংহের প্রশংসা শুনিয়াছিল। উন্মুক্ত প্রবেশদ্বারপথে বর্ম্মাবৃত বৃদ্ধকে দেখিয়া বৈদ্যনাথ প্রমাদ গণিতেছিল। সহসা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া

ডাকাইতি কর্‌তে আসি নি। একটা মেয়ে মানুষ টাকা কড়ি নিয়ে পালিয়ে এসে আপনকার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে। তাকে বাড়ী থেকে বার্ করে দিন্। আমরা তাকে পেলেই চলে যাব।”

বিক্রম সিংহ হাসিলেন। সে হাস্য ঘৃণায় বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। বলিলেন, “আমি ভেবেছিলাম তোরা বিশ্বনাথের লোক। সেটা ভুল। বীরের দলে বীর থাকে। তোরা নীচ মানমুরে মাত্র। একটা স্ত্রীলোক এসে তোদের ভয়ে আমার আশ্রয় নিয়েচে। তোরা ভেবেছিস্, লুটতরাজের ভয়ে বুড়ো বিক্রম সিং আশ্রিতকে তোদের হাতে ছেড়ে দেবে। ধিক্! বিক্রম সিংহের বংশে ছোট একটা মেয়ে অবশেষ থাক্‌তে তা হবে না। আর যদি মরদ বাচ্ছা হোস্, একে একে আমার সঙ্গে লড়্।”

তখন বিক্রম সিংহ সেই সঞ্চালিত অসির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘাটির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘাটিরক্ষকদ্বয় মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্র ক্রীড়া বন্ধ করিল। কিন্তু বৈদ্যনাথের তীব্র তিরস্কারে আবার পূর্ব্ববৎ তাহারা খেলিয়া ফিরিতে লাগিল।

এই অবকাশে বৈদ্যনাথের ইঙ্গিতে দুই জন ডাকাইত দ্বারমুখে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু পলকে প্রতিহত হইয়া পিছু হটিয়া আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মীরা পিতার প্রত্যেক গতি লক্ষ্য করিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইতেছিল। বিপদে নির্ভী-কতা বশতঃ অনেক সময় তিনি চারি দিক না সামলাইয়া কাজ করিয়া থাকেন, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। বিক্রম সিং মুক্তদ্বাররক্ষার কোনও উপায় বিধান না করিয়া সহসা পথে অবতীর্ণ হওয়ায় মীরা প্রমাদ গণিল, এবং অবিলম্বে নিজে পাইক দুজনকে পার্শ্বে রাখিয়া অসি হস্তে দ্বাররোধ করিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে পাইকদ্বয়কে দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু শাণিতঅসিধারিণী, মুক্ত-কেশা, গৌরাঙ্গিনী মীরা, দেবীমূর্ত্তিবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছিল। দেখিয়া বেগগামী ডাকাইত দুইটার গতিরোধ হইল। তাহারা বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে পাইকদের হস্তনিক্ষিপ্ত সড়কীদ্বয় যুগপৎ তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। উভয়েই বেগে পিছু হটিয়া আসিল। একজন গুরুতর আহত হইয়াছিল, সে ঘাটির পথে পড়িয়া গেল।

লেগেছে।”* বিক্রম সিংহের দিকে ফিরিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, “ভেবে-ছিলাম তুমি বড় বীর, কিন্তু বাড়ীর ভেতর লোক লুকিয়ে রেখে সবাই অমন বীরত্ব করতে পারে। আজ আমি তোমার বাড়ী ডাকাতি কর্‌তে আসিনি, তাই বেশী লোক সঙ্গে নেই। আচ্ছা, আজ্ এই পর্য্যন্ত। আর এক দিন দেখা যাবে।” বিক্রমও ডাকাইতটার পতনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ধ্রুব জানিতেন, তাঁহার বিনা আদেশে বাটীর কেহ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না। অতএব বৈদ্যনাথের মত তিনিও বিত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া দ্বার-পথে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে ধৃতাস্ত্র আলুলায়িতকুন্তলা কন্যামূর্ত্তি,—অন্ধ-কারে ভৃত্যদ্বয়কে দেখা যাইতেছিল না। বৃদ্ধ বিক্রম হাসিয়া উঠিলেন। পশ্চাতে ফিরিয়া বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, “এই তোরা জওয়ান? একটা বালি-কার অস্ত্রের সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌লি নে?” মীরা পিতাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্দর পথে পলাইল। বৈদ্যনাথ অনতিপরে বিক্রম সিংহের পাছে পাছে আসিয়াছিল,—সে ইহা দেখিতে পাইল।

তখন সেই দরওয়াজার নীচে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ঘাটি-রক্ষকদের ডাকিয়া বলিল, “তোরা খুব হুঁসিয়ার থাক্, আর সব্বাইকে ভেতরে পাঠিয়ে দে।” ছয় জন তখন বেগে আসিয়া চারি দিক হইতে বিক্রম সিংকে আক্রমণ করিল। পাইক দুই জন প্রভুকে রক্ষা করিতে গেল বটে, কিন্তু আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইল। তখন তাহারা অন্দর পথে পলায়ন করিল।

একাকী বিক্রম সিং সেই বৃষতুল্য বলবান ছয় জন জওয়ানের সঙ্গে লড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত অস্ত্রচালনার কৌশলে প্রায় প্রতিক্ষেপে শত্রুরা আহত হইলেও, দুই দণ্ডের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর বুঝা গেল, ক্রমে তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। ডাকাইতদের মশালে বাটী আলোকাকীর্ণ হইয়াছিল,—মীরা এবং সরলা অন্দরের দ্বারপথে থাকিয়া সকলই দেখিতে-ছিল। পিতার সে সঙ্কটাবস্থা বুঝিতে পারিয়া মীরা সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “বোন্, মরিবার সময় উপস্থিত। লজ্জা কিসের? বাবুজীকে দেখে লজ্জায় পালিয়ে গেলাম, তাই এ বিপদ ঘটল। আর লজ্জার সময় নেই। আমি বাবুজীকে বাঁচাবার চেষ্টা দেখব। তুমি যেন ডাকাতের হাতে না পড়,—আশীর্ব্বাদ করি, মরতে পারবে।”

* মাছি লেগেছে—ডাকাইতদের সঙ্কেতবাক্য। ইহাতে বুঝায় আমরা আর নিরাপদ

ততক্ষণে বিক্রম সিং অতিরিক্ত শ্রম জন্য অবসন্ন হইতেছিলেন,—মীরা পশ্চাতে আসিতে না আসিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন কন্যা সকল ভুলিয়া পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

সরলার এক হস্তে তরবারি, অন্য হস্তে ক্ষুদ্র বেতের পেটরায় নিজের সর্ব্বস্ব। সেই পেটরা ডাকাতদের সম্মুখে রাখিয়া সরলা বলিল,—"আমার যা কিছু আছে, সব তোমরা নাও। কিন্তু আমায় ছুঁয়ো না। যিনি আজ আশ্রয় দিয়ে বাপের কাজ করেচেন, তাঁর একটু সেবা করতে দাও। তোমাদের যদি মা বোন থাকে, তা মনে কর। আমায় ছুঁয়ো না।"

এই মুহূর্ত্তে দূরে অশ্বপদধ্বনিবৎ কিসের শব্দ শোনা গেল। ডাকাইতেরা সভয়ে শুনিল, রণপায় কেহ অতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

ফড়নবীসের "আত্মচরিত"।

"বল্লালো নাম মন্ত্রী শমদমবিমলো নীতিমান্ দীনপালো
'নানা' নাম্না প্রসিদ্ধো জগতি জনহিতঃ সত্যবাগ্‌দাতৃবর্য্যঃ।
কারাগারাহিতারী রণবিজিতরিপুর্ব্রাতলব্ধাতিমানান্
বীরান্ সম্মানয়ন্ সন্ ক্ষিতিবলয়মলং লীলয়াপালয়ৎ সঃ॥"—শিবকাব্যম্।

পাশ্চাত্য দেশে অনেক বড় বড় লোক "আত্ম-জীবন-চরিত" (Autobiography) লিখিয়া গিয়াছেন। কাহারও কাহারও বা স্বলিখিত "দৈনিক বিবরণ" (Diary) হইতে তাঁহাদের জীবনী রচিত হইয়াছে। এই জীবনীগুলিও কিয়দংশে তাঁহাদের "স্বচরিত কথন" রূপে পরিগণিত হইতে পারে। প্রাচীন কালেও পাশ্চাত্য দেশসমূহে "আত্মচরিত" লিখিবার প্রথা ছিল, দেখা যায়। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে এ প্রথা প্রচলিত ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনী ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের "আত্মচরিত" লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা সবিশেষ অবগত নহি। আহ্লাদের বিষয়, সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্ররাজ-মন্ত্রী "নানা ফড়নবীসে"র একটি স্বহস্তলিখিত "আত্মচরিত" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা মোগল বাদসাহগণের অনুকরণের ফল কি না, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। যাহা হউক, অদ্য আমরা মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এই অমূল্য রত্ন, বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব, সংকল্প করিয়াছি।

মহারাষ্ট্র-চূড়ামণি নানা ফড়নবীসের আত্মচরিতের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিবার পূর্ব্বে তাঁহার

নাম,—"বালাজী (বল্লাল) জনার্দ্দন ভানু"। কিরূপে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়, তাহা পাঠকগণ তাঁহার আত্মচরিত হইতে জানিতে পারিবেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ও তিনি মহারাষ্ট্র রাজ্যের ফড়নবীসের-("ডিপুটী হিসাব-তদারককর্ত্তা"র) পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি পরিশেষে স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে পেশওয়েগণের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানা ফড়্‌নবীসের পরিচয় দিতে হইলে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরের মহারাষ্ট্র রাজনৈতিক জগতের সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা করিতে হয়। এই ২৫ বৎসর কাল তিনি অসাধারণ দক্ষতার সহিত মহারাষ্ট্র রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ পেশওয়া 'মাধব রাও নারায়ণের' বাল্য দশায় তিনি একাকী স্বীয় অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশলে সুবিস্তৃত পেশওয়ে রাজ্য যেরূপে পালন ও রক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারক্ষমতা, নব নব কৌশলোদ্ভাবিনী শক্তি, তাঁহার সুবিস্তৃত প্রভাব ও কার্য্যসাধনোদ্দেশে আবিষ্কৃত উপায়সমষ্টি দেখিয়া তৎকালে সমগ্র ভারত চমকিত হইয়াছিল (Grant Duff)। তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, দূরদর্শিতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও বুদ্ধিকৌশলে, স্বার্থলুব্ধ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সমস্ত নরপতিগণের পরস্পর বিবাদে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভগ্নপ্রায়, মহারাষ্ট্র রাজ্যকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (Asiatic Annual Register)। এই সকল কারণে তাঁহার সমকালীন ইয়ুরোপীয় নীতিজ্ঞগণ তাঁহাকে "মহারাষ্ট্রীয় ম্যাকিবেল" (The Mahratha Machiovel) নামে * অভিহিত করিতেন (Grant Duff)।

খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দে নানা ফড়্‌নবীসের মৃত্যু হয়। গ্রাণ্ট ডফ বলেন, "He died on the 13th March. "And with him" Says Colonel Palmer, "has deported all the wisdom and moderation of the Maratha Government." Nana Furnavees was cirtainly a great Statesman. * * * He is entitled to the high praise of having acted with the feelings and sincerity of a patriot. He honourably advised Baju Rao to such measures as he believed advantagious, unmindful of any consequences. In private-life he was a man of strict veracity, humane, frugal and charitable. His whole time was regulated with the strictest orders and the business personaly transacted by him almost exceeds credibility." ভাবার্থ এই যে,—নানা ফড়্‌নবীস যথার্থই এক জন সুবিজ্ঞ রাজনৈতিক ছিলেন। এই স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু, মিতব্যয়ী ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের সময়-নিরূপিত ছিল। তিনি সমস্ত দিনে একাকী এত কাজ করিতেন যে, তাহা বলিলে কাহারও সহজে তাহাতে বিশ্বাসও হইবে না। কর্ণেল পামার বলেন, নানার পরলোকপ্রাপ্তির সহিত মহারাষ্ট্র রাজ্যের দূরদর্শিতা ও সাম্যনীতি অন্তর্হিত হইয়াছে।" (This, when রাম শাস্ত্রী was ন্যায়াধীশ and নানা ফড়্‌নবীস minister and regent, was confessedly the period when Maratha Government was in highest perfection)"—Elphinstone's Report. অর্থাৎ, নানা ফড়্‌নবীসের মন্ত্রিত্বাধীনে মহারাষ্ট্র রাজ্য

* ম্যাকিবেল ইটালীর এক জন বিখ্যাত মন্ত্রী ও কূটনীতিজ্ঞ। ইহাঁকে ইটালীর চাণক্য

উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। "The death of Balajee Pundit, (নানা ফড়্নবীস) whose upright principles and honourable views and whose zeal for the welfare and prosperity both of the dominions of his own immidiate superiors and of other powers were so justly celibrated, occasions extreme greif and concern." ইহা লর্ড ওয়েলেস্‌লীর মত।

এই "পুণ্যশ্লোক" মহাপুরুষের স্বহস্তলিখিত "আত্মচরিত" কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ-সম্পাদকের বহু চেষ্টায় ও যত্নে সংগৃহীত হইয়া, সর্ব্বপ্রথম কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ পত্রে প্রকাশিত হয়। এই আত্মচরিত অন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই আত্মচরিতে নানা ফড়নবীস স্বীয় চরিত্রের দোষসমূহও যেরূপ সরলভাবে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ববিষয়ে আর সংশয় থাকে না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর, এবং বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান কিরূপ ছিল, এই আত্মচরিতে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই আত্মচরিত তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমরা ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। শত বৎসর পূর্ব্বে রচনাপ্রণালী ও মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রথা কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য, আমরা যতদূর সম্ভব, ইহার অবিকল অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবং মূলে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলি অধিকাংশ স্থলেই অবিকৃত রাখিয়াছি। সুতরাং অনুবাদের ভাষা যে সর্ব্বত্র মনোরম হইয়াছে, এ কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি না। তথাপি মূলের ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য পাদ টীকা সুন্নিবেশিত ও অনুবাদমধ্যে স্থানে স্থানে মূলাতিরিক্ত শব্দ বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করিয়াছি। অশ্লীল-শব্দপূর্ণ বাক্যাবলীর ভাবানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে "ইতিহাস-সমালোচন" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে মহারাষ্ট্রীয় বখর প্রভৃতি গদ্যময় ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালীর যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই আত্মচরিতের ভাষাও অধিকাংশ স্থলে সেই সকল দোষযুক্ত। এতদ্ব্যতীত নাম সর্ব্বনামের মধ্যে লিঙ্গবিপর্য্যাস, শব্দবিশেষের পুনরুক্তি, ক্রিয়াপদযোজনায় অমনোযোগিতা প্রভৃতি দোষও স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, মূল রচনায় বিরাম চিহ্নাদি ও পরিচ্ছেদ বিভাগ না থাকায়, স্থলবিশেষে অর্থবোধের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটে।

প্রথম প্যারাগ্রাফদ্বয় অতি জটিল বৈদান্তিক কথায় পরিপূর্ণ। ভাষা এরূপ ব্যাকরণদুষ্ট যে, সর্ব্বত্র অর্থোদ্ধার করিতে পারি নাই। তথাপি যথাসাধ্য অবিকল অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম দুইটি প্যারা ভূমিকাস্বরূপ। তৃতীয় প্যারা হইতেই প্রকৃত "আত্মচরিত-কথন" আরম্ভ হইয়াছে। উহা পাঠকদিগের নিকট সুখপাঠ্য ও মনোরম বোধ হইতে পারে।

নানার আত্মচরিতকথন।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন।

শ্রীসাম্বসদাশিবায় নমঃ। সেই সাম্বসদাশিব কিরূপ? না, সত্ত্বস্বরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রকাশ, অবস্থাত্রয়-সাক্ষী; যাঁহাকে জাগ্রৎকালে 'বিশ্ব', স্বপ্নকালে 'তৈজস' ও সুষুপ্তিকালে 'প্রাজ্ঞ' বলে। যিনি একই আত্মা, উপাধিভেদে নানারূপে ভাসমান। পা নাই, কিন্তু চলিতে পারেন; হাত নাই, কিন্তু গ্রহণ করেন; কান নাই, কিন্তু শুনিতে পান। (তিনি যে) সর্ব্বান্তর্য্যামী (ও) ব্যাপক,

ভূমিকা,—
আত্মার স্বরূপ।

বসিয়া থাকে ; তাহার (অপরের মনোভাব ?) ইহার (ইঙ্গিতজ্ঞের) আত্মায় প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই কথা (মনোভাব ?) সে (ইঙ্গিতজ্ঞ) গ্রহণ করে (বুঝিতে পারে)। (আত্মার) ব্যাপকতা ব্যতীত ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে ?

এইরূপ আত্মা আপনাতেই তাহাকে (আপনাকে) বিস্মৃত হইয়া আনন্দ স্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখের মধ্যস্থিত সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা করেন। ইহাই সেই আত্মার মায়া।

জীবোৎপত্তি প্রকরণ।

(আত্মাকেই) সত্য বলিতে পারা যায় না ; অসত্য বলিতে পারা যায় না। যিনি অনির্ব্বচনীয়স্বরূপা, সত্বরজস্তমোগুণময়ী, তাঁহা হইতে অহঙ্কার (মহত্তত্ব), (ও) আকাশ, বায়ু, তেজঃ, উদক, পৃথ্বী এই পঞ্চ মহাভূত (সমুৎপন্ন)। মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ ; তদবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য তিনিই জীব। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-মহাভূত কর্তৃক তদংশরূপে লিঙ্গশরীরদ্বারা জীবের সুখদুঃখাদি প্রাপ্তি (ঘটে)। "ভোগায়তনং শরীরং ;" ভোগের স্থান শরীর। সেই শরীর নিন্দ্য স্থান ও অতি ঘৃণিত, অস্পৃষ্ট পদার্থ হইতে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। (তার পর) গর্ভাশয়েই যদি (সেই জীব) বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সব ফুরাইল, কিন্তু যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে গর্ভমধ্যে নানা প্রকার কৃমিকীটাদির উপদ্রব ও জঠরস্থ অগ্নির দাহ প্রভৃতি যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় ; যথা-সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হয় না। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া (অবশেষে) প্রসব বায়ুর দ্বারা বহুকষ্টে জন্ম হইলে জাতাশৌচ প্রাপ্ত হয়। তার পর রোগাদিযন্ত্রণা স্বয়ংই মূকের ন্যায় সহ্য করিতে হয়। ষড়্ভাব বিকার,—অস্তি, জায়তে; বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।

এই ষড়্ভাববৎ বিকারযুক্ত দেহী আমি বাল্যকালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলাম। * কিন্তু পূর্ব্ব (জন্মের) সংস্কারবশতঃ দেব-পূজার প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ (ছিল); এই জন্য মাতা

বাল্য স্বভাব।

প্রহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কার দৃঢ় (এই নিমিত্ত দেবপূজায় অনুরাগ কিছুতেই হ্রাস হইল না)। † বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতা মাতা তাড়না করিতেন, তজ্জন্য বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ মনে অতিশয় (বিষাদ জন্মিয়া) তাঁহাদেরও অনিষ্ট চিন্তা করিতাম।

দশম বর্ষ বয়সে (আমার) বিবাহ হয়। ‡ নানাপ্রকার বিপদে পতিত হইলেও (ভগবান্) রক্ষা করিলেন। পরে, ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রমের পর, মনে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উদিত

চরিত্র-দোষ ও পিতৃবিয়োগ।

হইতে লাগিল। এই কারণে ও কিঞ্চিৎ অসৎ সংসর্গে পড়িয়া অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থকরণে প্রবৃত্ত হইলাম। মধ্যে (১৪ বৎসর বয়সের সময়) একবার ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। অবস্থা অতিশয় সঙ্কটা-

---

* নানা ফড়্নবীস (প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দ্দন ভানু) ১৬৬৩ শকাব্দের (১৭৪১ খৃঃ) মাঘী কৃষ্ণচতুর্থী শুক্রবার রাত্রি (১১ দণ্ড ১০ পল) কালে জন্মগ্রহণ করেন।

† কথকতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই মৃন্ময়ী দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তৎপূজনাদিতেই নানা ফড়নবীস অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই কারণে বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না।

‡ তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোদা বাই। ১৭০৬ শকাব্দে (১৭৮৪ খৃঃ) আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় প্রতিপদ দিবসে নানা ফড়নবীসের এক পুত্র জন্মে। কিন্তু সে শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। এতৎব্যতীত নানার দুইটি কন্যাও হইয়াছিল; তাহারাও অল্প বয়সেই মারা

পন্ন হইয়াছিল ; দুই দিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতেও গোবিন্দের (ভগবানের) কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলাম। পরে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।* ঈশ্বর (আমার দ্বারা) তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক (কার্য্যাদি) সম্পন্ন করাইলেন। তাহাতে এক বার পাপদৃষ্টি হইয়াছিল। এটি আমার অপরাধ হইয়াছে। বৃথা পাশব-বৃত্তির চরিতার্থতায় পাপ (সঞ্চয়) ও শরীর নাশ হয়, ইহা বুঝিতে লাগিলাম। তখন (পাপচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া (করিতে ?) দৃঢ়সংকল্প করিলাম। কিন্তু তথাপি রিপুর প্রবলতা হেতু পাপচিন্তা মনে উদিত হইত।

(পিতার মৃত্যুর অল্পকাল) পরে পরম্পরাগত সেবাধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য † বিবেচনায়, ও শ্রীমন্ত (পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও) আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন বলিয়া (তাঁহার সমভিব্যাহারে) কর্ণাটক প্রদেশে শ্রীরঙ্গপট্টন পর্য্যন্ত গমন করিলাম ‡। পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের জন্য এ সময় আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। গৃহে ফিরিয়া আসিলে পর উহা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু পাপচিন্তা নিঃশেষরূপে দূর হয় না। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'পিতামহ (বালাজী মহাদেব ভানু) সাত্বিক, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও দেব ব্রাহ্মণে দৃঢ় ভক্তিযুক্ত ছিলেন ; গর্হিত কার্য্য কখনও করিতেন না। তবে আমার মন কিঞ্চিৎ পাপ-

ইন্দ্রিয়দমন-চেষ্টা।

পথে কেন ধাবিত হয় ?' মনে পড়িল, মাতামহপক্ষীয়গণ অতিশয় ব্যভিচারী ছিলেন। ইহা (আমার এই পাপ বাসনা) সেই সংস্কারের ফল। চিত্তকে স্থির করিতে চেষ্টা করি, তথাপি উহা স্থির হয় না। অতএব সংস্কারই বলবত্তর। পরে "অতিরুদ্র" করিবার জন্য "টোকেঁ" নামক গ্রামে গমন করিলাম §। তথায় নিয়মিত রূপে দেবতার্চ্চনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীর অসুস্থ, তজ্জন্য চিত্তে এরূপ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল যে, পরস্ত্রীর বিষয় চিন্তাও করিতাম না,—দর্শন ত দূরের কথা!

---

* পিতার নাম জনার্দ্দন বল্লাল ভানু। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে শূলরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

† নানা ফড়নবীসের পিতা ও পিতামহ উভয়েই পেশওয়াগণের অধীনে মহারাষ্ট্ররাজ্যের ফড়নবীসের কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই, খৃঃ ১৭৫৬ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী সোমবারে, তিনি ফড়নবীসের পদ প্রাপ্ত হন।

‡ পেশওয়া ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সচরাচর 'শ্রীমন্ত' নামে অভিহিত হইতেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমন্ত বালাজী বাজীরাও কর্ণাটকের বিরুদ্ধে যে অভিযান করেন, নানা ফড়নবীস সেই অভিযানে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

§ নানার জীবন চরিত-লেখক বলেন যে, সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনায় চিত্ত নিমগ্ন থাকিলে, পাপচিন্তা মন হইতে বিদূরিত হইতে পারে, এই আশায়, নানা ফড়নবীস পুণা পরিত্যাগ করিয়া গোদাবরীতীরস্থিত "কায়গাঁও টোকেঁ" নামক তীর্থক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক তথায় দেবসমীপে "অতিরুদ্র" পুরশ্চরণ (অর্থাৎ রুদ্রাধ্যায় নামক বেদাংশ যথানিয়মে ১৪৬৪১ বার আবৃত্তিকরণ) করিলেন। মেজর ম্যাক্‌ডোনল্ড্ স্বপ্রণীত "নানা ফড়নবীসের জীবনী" গ্রন্থে বলেন,—এই সময়ে নানা ফড়নবীসের এক পুত্র জন্মিয়া অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্রশোকজনিত বিষাদ দূরীভূত করিবার জন্য 'নানা' অতিরুদ্র করিয়াছিলেন। কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ডোনল্ডের এই উক্তির পোষকে কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বরং একটি বখরে লিখিত আছে যে, ১৭০৬ শকাব্দের আশ্বিন মাসে নানার পুত্র হয়। অর্থাৎ, ম্যাকডোনল্ড যে সময়ের কথা বলিতেছেন তাহার ২৫ বৎসর পরে নানা ফড়নবীসের

ভাউ সাহেবের সহিত হিন্দুস্থানে (আর্য্যাবর্ত্তে) গমন করিয়া স্বর্গঙ্গা ত্রিপথ (গামিনী) ভাগিরথীর (জলে) স্নান (ও) 'ত্রিস্থলী-যাত্রা' (অর্থাৎ কাশী, প্রয়াগ ও গয়া এই তীর্থত্রয়ে অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদি সম্পন্ন) করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া মাতা ও স্ত্রী সহ (তাঁহার সঙ্গে) গমন করিলাম *। সে সময় চিত্তে অতিশয় বৈরাগ্য (ছিল)। কারণ, শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ। এজন্য চিত্ত এতদুর বৈরাগ্যশীল হইয়াছিল যে, (সর্ব্বদা) কেবল ভগবানের পূজা ও ধ্যান করিতাম। শীতোষ্ণাদিজনিত কষ্ট ছিল; কিন্তু মনে (অশান্তি ?) ছিল না। জননীর প্রতি ভক্তিযুক্ত হইতে লাগিলাম। পরে মহাগঙ্গা নর্ম্মদায় স্নান করিয়া একাগ্রচিত্তে (ভগবানের) ধ্যান করিলাম। সেই দিন হইতে উত্তরোত্তর (মন) বৈরাগ্যযুক্ত ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইতে লাগিল।

হিন্দুস্থানে গমন।

ভাউ (সাহেব) আমায় বিশেষ স্নেহ করিতেন। [হিন্দুস্থানের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় (আমার)] অতিশয় আমাশয়ের পীড়া হইল; উঠিবার শক্তি নাই; অতিসারের আধিক্য ও শরীর গ্লানিযুক্ত (হইল)। সে সময় (সৈন্যগণ) কুচ (করিয়া অগ্রসর) হইলেও শ্রীমন্ত [(ভাউ সাহেব) আমার জন্য] মোকাম- (অবস্থান) করিতেন। সে সময়ে ঈশ্বর (আমায়) আরোগ্য করিলেন। পরে 'দরমজিল' † (অগ্রসর হইয়া) চর্ম্মণ্বতীতীরে গমন করিলাম। সেখানে গ্রহণ সংঘটিত হয়। প্রত্যহ স্নান দানাদি করিয়া আত্মাকে পবিত্র করত ধ্যান করিয়া কালাতিপাত করিতাম।

অসুস্থতা।

পরে সূর্য্যতনয়া যমুনার তীরবর্ত্তী গো-ঘাটের ‡ নিকট গমন করিলাম। সেখানে স্নান আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া, দুই দিন পরে মুক্তিপুর মথুরাক্ষেত্রে গমন করিলাম। তথায় ক্ষৌর-প্রায়শ্চিত্ত-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া, যেথানে ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম রাধাকৃষ্ণ বিবিধ লীলা করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে গমন করিলাম। তথায় কালিয়াদহে (কালীয়-দহে) কদম্ব-বৃক্ষ, যাহার উপর বসিয়া ভগবান (গোপীগণের) বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, তাহার শাখাসমূহ অদ্যাপি যমুনাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার তলায় গিয়া স্নান ও তর্পণ করতঃ গোপীচন্দনের তিলক ও তুলসীর মালা ধারণ করিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে বৃন্দাবনে ভগবানের অটলবিহারী, কুঞ্জবিহারী, বালাবিহারী, রাধাকিশোর ও গোবিন্দজী প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে কুঞ্জবিহারী মধ্যাহ্নকালে দোলায় নিদ্রিত (থাকিতেন), দ্বার বন্ধ (থাকিত) দোলার রজ্জু বাহির হইতে (লোকেরা) টানিত। সেই রজ্জু স্বহস্তে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের আন্দোলন-লীলা অর্থাৎ (ভগবানকে) আন্দোলিত করিলাম। তথা হইতে 'শৃঙ্গার-বট'—যেথানে ভগবান্ রাধাকে শৃঙ্গার (ভূষিত) করিয়াছিলেন, তথায় গিয়া বটবৃক্ষ দর্শন করিয়া, পরে 'বংশীবট'—অর্থাৎ যেথানে ভগবান্ মুরলী বাদন করিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া বটের দর্শন করিলাম। তথা হইতে 'সেবাবন'

বৃন্দাবনবর্ণন।

---

* খৃঃ ১৭৬০ অব্দে পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওএর ভ্রাতা সদা শিবরাও ভাউ (সংক্ষেপে ভাউ সাহেব) যখন আহম্মদশাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে পাণিপথ অভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময় (অর্থাৎ চৈত্রমাসে) নানা ফড়নবীস গঙ্গাস্নান ও তীর্থদর্শন মানসে তাঁহার সহিত হিন্দুস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

† "দর" অর্থে প্রতি; "মজিল"—এক দিনে যত ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করা যায়, তাহাকে "মজিল" বলে।

‡ প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে এই ঘাটে

(ও) কুঞ্জবন প্রভৃতি স্থান (দেখিতে গমন করিলাম)। সেই কুঞ্জ এরূপ যে, দেখিলে মনে হয়,—

কুঞ্জ-বর্ণন।

যেন ভগবান্ (এখনও সেখানে) লীলা করিতেছেন। (সেখানকার) সকল বৃক্ষগুলিই ছত্রাকার, খর্ব্ব, ভূমিস্থ (ভূমিস্পর্শী ?) পল্লব(-যুক্ত) কণ্টক বৃক্ষেও কিন্তু কণ্টক নাই। ইহা (কুঞ্জবন) দর্শনে আনন্দময় হইয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার 'পদারবিন্দসম্বন্ধীয় রেণুরজঃকণা' মস্তকে ধারণ করিবার জন্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, সেই বালরূপী ভগবান্ যে যমুনাতীরে বালুকা মধ্যে লীলা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে, গমনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া তত্রস্থ বালুকা মস্তকে গ্রহণ করিলাম। সেখান হইতে "জ্ঞানগুদড়ী" নামক স্থানে গমন করিলাম। (দেখিলাম) বড় বড় সাধু, মোহান্ত ও বৈরাগী সন্ধ্যাকালের (শেষ) ছয় ঘটিকা দিবসের সময় তথায় আগমন করতঃ উপবেশন পূর্ব্বক 'ভগবৎপরায়ণ' হইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছেন; (কেহ কেহ) ভগবৎ কথা ও নামগান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চারি দণ্ড (কিয়ৎকাল) চিত্তে অতিশয় শান্তি

বৃন্দাবনে মানসিক অবস্থা।

জন্মিল। অনন্তর ধীরসমীর কালিন্দীতীরে গমনপূর্ব্বক সায়ংকালীন আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্ সাম্ব সদাশিবের ধ্যান করতঃ (বাসায়) আগমন করিলাম। এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হইল। বহু জন্মের পুণ্য যে, এরূপ বৃন্দাবন দেখিতে পাইলাম। সেই হেতু ভগবানের মূর্ত্তি ও ভগবদ্ভক্তগণের দর্শনে নেত্র পবিত্র হইল। পদব্রজে ভ্রমণ হেতু পাদদ্বয়ের সার্থকতা হইল। হস্তের দ্বারা নমস্কার করায় হস্ত পবিত্র হইল। মুখে "নাম স্মরণ" (হরিনাম গান) করায় মুখ পবিত্র হইল। কর্ণদ্বয় ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া পবিত্রতা লাভ করিল।

সাধু দর্শন।

স্নানের দ্বারা সর্ব্বশরীর পবিত্র হইল। বৃন্দাবনে বৈরাগীগণ একাগ্রচিত্তে ধ্যানস্থ হইয়া কুঞ্জতলে স্থানে স্থানে বসিয়া আছেন; কেহ পর্ণ ভক্ষণ করিয়া, কেহ জলপ্রাশন মাত্র করিয়া, কেহ দুগ্ধ সেবন করিয়া, কেহ বা যে কেহ সিদ্ধান্ন প্রদান করুক, তাহাই ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করিতেছেন। এইরূপ মহাপুরুষগণের দর্শন

মন্ত্র গ্রহণ।

করিয়া সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করিলাম। তন্মধ্যে জনৈক বৈরাগী কৃপা করিয়া ভগবৎনামের একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন; (এবং বলিলেন) যে, ইহা নিয়মিতরূপে জপ করিও। স্বয়ং ভগবানই উহা বলিয়া দিলেন, এরূপ মানিয়া, সকলকে যথাশক্তি দান করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

পরে দিল্লীতে গমন করিলাম। সেখানে শ্রীমন্তের (ভাউ সাহেবের) আদেশ ক্রমে পৃথ্বীপতির * দর্শন গ্রহণ করিলাম। তিনি (আমার সহিত) "অত্যন্ত কৃপাযুক্ত ভাষণ" করিয়া "আশীর্ব্বাদ" (?) দিয়া স্বকীয় পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন; তাহা গ্রহণ করিলাম।

দিল্লী গমন।

(পৃথ্বীপতির) এই কৃপাকে ভগবানের কৃপার অন্তর্বর্ত্তী জানিয়া (মনে) কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর শ্রীমন্তের লস্করে (ছাউনীতে) শ্রীমন্তের সমীপে আসিলাম। উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় ভূমিকম্প হইল। 'পরন্তু' (তখন মনে মনে ভগবানের ধ্যান) স্মরণ করিলাম। যাহাতে পাপ নাই,—এরূপ চিত্র প্রভৃতি পদার্থও দিল্লীতে গ্রহণ (ক্রয়) করিলাম (এবং সে গুলি) দেখিলাম।"

পরে উত্তর দিকের যবন (আহম্মদ শাহ আব্দালী) শত্রুতা করিয়া পৌনে লক্ষ (৭৫ সহস্র) সৈন্য সহ যমুনার অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যমুনা ভরপুর চলিতেছিল

আহম্মদ শাহ।

বলিয়া (কিছু দিনের জন্য) উভয় পক্ষেই স্তব্ধতা ছিল। পরে শ্রীমন্ত শৌর্য্যসহকারে "কুঞ্জরপুরা" অধিকার করিলেন। আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম। ঈশ্বর (আমায়) রক্ষা করিলেন। ইতিমধ্যে (১৭৬০ অঃ ২৫ অক্টোবর)

* পৃথ্বীপতি—মির্জ্জা জওয়ান বক্ত বাদশাহ। ভাউ সাহেব দিল্লী জয় করিয়া ইঁহাকে

যবন [যমুনার] এ পারে আসিল। শ্রীমন্ত সৈন্য সহ তাহার সম্মুখীন হইলেন। (উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল।

আমি ত তখন ছেলে মানুষ, শ্রীমন্তের বুদ্ধিতে মহান্ বুদ্ধি [?]। কিন্তু তথাপি তদ্দ্বারা ভাবী কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটিল। "বলবন্তরাও" আমার মাতুল ও "নানা পুরন্দরে" প্রভৃতি আত্মীয়গণ [এ সময়ে] অনাত্মীয় হইলেন। "শাহানওয়াজ খানী" ও 'ভবানীশঙ্কর' প্রভৃতি যাঁহারা আনাত্মীয় ছিলেন, তাঁহারা আত্মীয় হইলেন। তাঁহাদের কথায় (শ্রীমন্তের) দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্য আমাদের (মহারাষ্ট্রীয়) যুদ্ধরীতি পরিত্যাগ করিয়া যবনগণের রীতি অবলম্বন করিলেন। (মধ্যে মধ্যে) উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটিল। শত্রুগণের গোলাসমূহ প্রত্যহ আমাদের বস্ত্রকুটীরের নিকট দিয়া যাইত। (তদ্দর্শনে) জননী ও সহধর্ম্মিণী, "(পরিণামে) আমাদের কি গতি হইবে?" ভাবিয়া ভয়-ভীত হইতেন। সেই সেই সময়ে আমি জননীকে মিনতি করিয়া বলিতাম, "আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, (এ সময়ে) একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি (আপনার) লক্ষ্য থাকুক্।"

পরাজয়ের কারণ।

জননীর সান্ত্বনা।

আমার মাতুল যুদ্ধে ছিলেন; তিনি পতিত হইলেন। সেই দিনই সমস্ত (শত্রুপক্ষীয় ?) সৈন্য বিনষ্ট হইত; কিন্তু রাত্রি হইল বলিয়া রহিল। সেই দুই মাসে অনেক মনুষ্য ও পশু মরিল। অন্নের মহার্ঘতা; দুর্গন্ধ ও একই স্থলে। এই রূপ কষ্ট দেখিলাম। পরে মাতুলের স্ত্রী পতির সহগমন করিলেন। জননীর অতিশয় কষ্ট হইল। যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে; তদ্বিষয়ে সন্দেহ করাই অনুচিত। ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অতঃপর, পরদিবস প্রাতে শেষ মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবে, এজন্য পূর্ব্ব দিবসে এই-রূপ পরামর্শ হইল যে, "যদি আমাদের পরাজয় হয়, তাহা হইলে যেন শ্রীমন্তের ও আমাদের রমণীগণ শত্রুহস্তে পতিত না হয়েন, এজন্য স্বয়ংই (তাঁহাদিগের) প্রাণনাশ করাইতে হয়।" "নিজে ত আর বাঁচিতেছি না"—এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, শ্রীমন্ত ইহারও (অর্থাৎ রমণীগণ যাহাতে শত্রুহস্তে পতিত না হয়, তাহার) বন্দোবস্ত করিলেন।

রমণীগণের রক্ষা।

"পরদিবস, (সৈন্যগণ) সজ্জিত হইলে, প্রাতে দুই ঘটিকার সময় যুদ্ধের গোলা গুলি (চলিতে) আরম্ভ হইল। শ্রীমন্ত অতিশয় বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যবান্, শূর ও কৃতকর্ম্মা; দোষের মধ্যে কেবল কিছু বেশী অহংকার। কিন্তু সৈন্যসজ্জাদির খুব বন্দো-বস্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে, নিশানের নিকটস্থিত বন্দোবস্ত এক পাশে পড়িয়া থাকিয়া, মুখ্য স্থানেই শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি কিঞ্চিৎ ঈশ্বর স্মরণ করিয়া শ্রীমন্তের নিকটেই ছিলাম। ইতিমধ্যে বিশ্বাসরাওর (বুকে) এক গুলি লাগিল, (তিনি) পতিত হইলেন। তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে (হাওদার মধ্যে) স্থাপন করিয়া শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়াই রহিলেন। এমন সময়, পাঠান পদাতিগণ (সবেগে আমাদের সৈন্য মধ্যে) প্রবেশ করিল। (উভয় পক্ষে) কাটাকাটি হইতে লাগিল। (তখন) বাম ভাগের রণ-বাদ্যকরগণের অধিপতি ও বড় বড় সর্দ্দারগণ পূর্ব্বেই পলায়ন করি-লেন। হোলকর, শিন্দে (সিন্দিয়া) প্রভৃতি দক্ষিণ পার্শ্বের বীর-বৃন্দও নিশান সহ (যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া) বাহির হইলেন। দুই তিন শত পদাতি মাত্রই অবশিষ্ট রহিল। শ্রীমন্তকেও আর দেখিতে পাই না। তখন ঈশ্বর বুদ্ধি দিলেন। (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে "বাপুজীপন্ত" রণস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলাম যে, "এরূপ সময়ে শ্রীমন্তকে পরিত্যাগ করিয়া

যুদ্ধারম্ভ।

ছত্রভঙ্গ।

নানার কৃতজ্ঞ বুদ্ধি।

করিতে হইল। লক্ষ সৈন্য; তন্মধ্যে বড় বড় সর্দ্দার সেখানে উপস্থিত থাকিয়াও সে সময়ে কেহই শ্রীমন্তের আত্মীয় হইল না। বহুদিবস তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত। (শ্রীমন্ত সকলকে) পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। যতদিন সুদিন ছিল, ততদিন "শ্রীমন্তের কেশে ধাক্কা লাগিলে আমরা প্রাণ দিব" সকলেরই এইরূপ প্রতিজ্ঞা (ছিল)। কিন্তু দৈবঘটনাক্রমে যখন বিপরীত কাল আসিল, তখন কে আর সাথী হয়? সকলেই সুখের সাথী। শ্রীমন্তের অনুগ্রহে সকলেরই ভাগ্যে সমাদরসহকৃত ভোজন, বস্ত্রালঙ্কার ও জাইগীরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু যাঁহার এইরূপ অতুল সম্পত্তি, চরমকালে তাঁহার দেহের কোনও সন্ধানই কেহ পাইল না। (ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?)

অনুতাপ।

"সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। আমি সন্ধ্যাকালে, দুই ঘটিকা দিবস অবশেষ থাকিতে, অশ্বারোহণে পাণিপত গ্রামে আগমন করিলাম। সে দেশের পথ ঘাট আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরমেশ্বরের কৃপায় পথপ্রদর্শনের জন্য "রামাজী পন্ত" সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"অশ্ব ও বস্ত্রাদি দূরে ফেলিয়া দাও।" তাঁহার উপদেশ-অনুসারে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া বসিয়া রহিলাম। রাত্রি সমাগতা হইলে পর (সেখান হইতে) চলিলাম। এক ক্রোশের মধ্যে ৩।৪ বার টুপীওয়ালাগণ (পশ্চাদ্ধাবনকারী পাঠানগণ) আসিয়া গায়ে হাত দিয়া (আমাদের কাছে কি আছে না আছে) পরীক্ষা করিয়া দেখিল। (তাহারা) প্রতিবার আমাদের সঙ্গের দশ বিশ জনকে কাটিয়া ফেলিত। তার মধ্যে আমি বাঁচিয়া গেলাম। ইহা ঈশ্বরের কৃপা। পরন্তু 'বাপুজী পন্ত' ও 'রামাজী পন্ত'ও বাঁচিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে দশ বার ক্রোশ পশ্চিমে গেলাম। ইতিমধ্যে (আবার) শত্রুগণ আসিয়া রামাজী পন্ত ও বাপুজী পন্ত প্রভৃতিকে অতিশয় আহত করিল। তাঁহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আমি একাকী বাঁচিলাম ও তৃণক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঈশ্বর তৃণের দ্বারা আমায় রক্ষা করিলেন। ঈশ্বর শত্রুগণকে মোহাবৃত করিলেন। তাহারা সকলের প্রাণনাশ করিল, কিন্তু আমি নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমাকে বিনাশ করিল না, এবং তৃণগুলি দীর্ঘ (না?) থাকা সত্ত্বেও (আমাকে) তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল। তাহারা চলিয়া গেলে, পুনরায় চলিতে লাগিলাম। দুই ক্রোশ যাইতে না যাইতে, পশ্চাতে অপর এক দল (শত্রু-সৈন্য) দৃষ্ট হইল। তখন পুনর্ব্বার তৃণের মধ্যে গিয়া (লুকাইয়া) বসিলাম। ইতিমধ্যে তাহারা নিকটে আসিয়া আমাকে টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সে সময়, ঈশ্বর তাহাদিগেরই মধ্যস্থিত এক জন বৃদ্ধের মনে প্রবেশ করিলেন। সে বলিল,—"আর কি জন্য ইহাকে মারিতেছ?" তাহা শুনিয়া সকলে চলিয়া গেল।

পলায়ন।

দুর্গতি।

ঈশ্বরের দয়া।

প্রাণ-সংকট।

পাণিপতে অবস্থানকালে, আমার শক্তি অতিশয় ক্ষীণ ও আমবিকারাদি বিকারযুক্ত ছিল। শরীর দুর্ব্বল, অন্নে অরুচি; কখনও রৌদ্র দেখি নাই, পদব্রজে ভ্রমণের অভ্যাসও ছিল না। এরূপ অবস্থায় দয়াসমুদ্র সাম্ব সদাশিবের কৃপায় অন্ন জল ব্যতিরেকে ১৬।১৭ ক্রোশ চলিয়া আসিলাম। তৃতীয় প্রহরের সময় ক্ষুধা বোধ হইল। (পথে) কতকগুলি কুলের পাতা দেখিতে পাইলাম; চাখিয়া দেখিলাম, মুখে দিতে পারিলাম না। সেইরূপ অবস্থাতেই সন্ধ্যাকালে এক গ্রামের নিকটে গিয়া উপনীত হইলাম। এমন সময় এক জন বৈরাগী "পীঠ" আনিয়া দিলেন। তাহার

পথকষ্ট।

"ভাকর" (মোটা রুটি) করিয়া খাইলাম। উহা অমৃতের মত মিষ্ট বোধ হইল। তার পর ঘুমাইলাম।

"প্রাতঃকালে 'গঙ্গাসহস্রনাম' পাঠ ও ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে এক গ্রামের মধ্যে গমন করিলাম। সেখানে এক জন 'সাওকার' (বণিক) ছিল। সে আমাকে স্বগৃহে লইয়া গেল। (সেখানে) চাবুক সওয়ারগণের (অশ্ব-শিক্ষকগণের) অন্যতম যশোবন্তরাওএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক জন ব্রাহ্মণ ছিল, তাঁহার দ্বারা পাক নিষ্পত্তি করাইয়া ভোজন করিলাম। ইতিমধ্যে জনরব উঠিল যে, শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহীগণ গ্রামে আগমন করিয়াছে। তৎশ্রবণে সাওকার বলিল, "আমি আপনাকে একটি গাড়ী করিয়া দিয়া 'জয়নগরে' পৌঁছাইয়া দিতেছি।" (তদনুসারে) গাড়ীতে বসিয়া যাইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া মনে সন্দেহ জন্মিল যে, "এ লোকটা (সাওকার) আমাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।" চিত্তে এইরূপ সংশয় উদিত হওয়ায় গাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলাম। সঙ্গে দুই তিন জন ব্রাহ্মণ ও দুই জন মারাঠা ছিল। এই প্রকারে দশ বার ক্রোশ গমন করিলাম। এইরূপে সাত দিবস পদব্রজে চলিয়াছিলাম। ঈশ্বর প্রত্যহ ভোজনসামগ্রী যুটাইয়া দিতেন। তাহাতেই সহযাত্রীগণ সহ নির্ব্বিঘ্নে ভোজনাদি ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়া, "রেওড়ী" মোকাম পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলাম। সেই সময়ে, আমাদের লস্করের পলাতকগণ সেই পথে গমন করিতেছিল। সেই গ্রামে "বালেরাও" (বালোরাও?) উপাধিধারী চারি ভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহারা (লস্করের পলাতকগণের মুখে) আমার নাম শুনিয়া (তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিতেন যে, "তিনি নানা ফড়নবীস কেমন লোক? তাঁহার চেহারা কেমন?" (এইরূপে) তাঁহারা আমার চিহ্ন লক্ষণাদি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন। "(নানা ফড়নবীস) পশ্চাতে আসিতেছেন," শুনিয়া প্রত্যহ আমার জন্য মার্গপ্রতীক্ষা করিতেন। আমরা যখন আসিলাম, তখন তাঁহারা "রেওড়ী" গ্রামের বহির্ভাগেই আমাকে চিনিলেন। এবং আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই নাম বলিব না। কিন্তু তাঁহারা বলপূর্ব্বক আমাকে "নানা ফড়নবীস" বলিয়া সাব্যস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় কোনওরূপ অসরলতা দৃষ্ট হইল না। আমাদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া ও উপকার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, দেখা গেল। তখন (স্বীয়) নামধাম বলিলাম। তাঁহারা আমার সহযাত্রীগণ সহ আমাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া উত্তম প্রকারে ভোজনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভোজন সমাপন করিলে পর, (আমাদিগকে) বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন।

বণিক-প্রতারক।

বালেরাও।

অনন্তর, রামজী দাস জোশী নামক এক জন মাতব্বর লোক (অর্থাৎ বড়লোক) রেওড়ীতে থাকিতেন; তিনি সংবাদ পাইয়া আমাদিগকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। সাত দিন আহার্য্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। তার পর, আমাদের ইচ্ছা, "দীগ ভরতপুরে" যাইবার। কিন্তু তিনি বলিলেন, "ভাল সঙ্গ দেখিয়া, গাড়ী করিয়া (আপনাদিগকে তথায়) পৌঁছাইয়া দিব।" তৎপরে একটি বিবাহের বরযাত্র বাহির হইল। (রামজীদাস জোশী) সেই সঙ্গে গাড়ী করিয়া দিয়া আমাদিগকে বিদায় করিলেন। (এবং পথে খাবার জন্য "পেড়া" প্রভৃতি সুমিষ্ট খাদ্য আমাদের সঙ্গে দিলেন। আমরা বাহির হইলাম। পথিমধ্যে "কৃষ্ণং ভট বৈদ্য" (কৃষ্ণ ভট বৈদ্য) আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বিরোজী বারাওকর আপনার স্ত্রীকে বহুযত্নসহকারে লইয়া আসিয়াছেন;

রামজীদাসের আতিথ্য।

স্ত্রীর সন্ধান।

তিনি 'জিগনী'তে নারোপন্ত গোখলের (নারায়ণপন্ত গোখলে) বাটীতে আছেন।" সেখানে সেই ভদ্রলোকটি (নারোপন্ত) বস্ত্র পাত্রাদি সমস্ত সামগ্রীর বন্দোবস্ত করিলেন। (পরে) আমরা তথায় গেলে পর, (তিনি) আমাদিগকে পায়সান্ন ভোজন করাইলেন। তখন (মনে) আনন্দ হইল। পরে স্ত্রীর জন্য অপর একটি গাড়ী করিয়া তথা হইতে (সস্ত্রীক) যাত্রা করিলাম।

মিলন।

ক্রমে দীগ্‌ভরতপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম। 'পুরুষোত্তম মহাদেব' (?) পাণিপত হইতে (ফিরিয়া) আসিয়াছিলেন। তিনি সেখানে (ভরতপুরে) 'ওয়ানবলের' (Wanwaley) গুমস্তার বাসায় ছিলেন। আমাদের আগমনসংবাদ পাইবামাত্র তিনি (আমাদিগকে) স্বীয় বাসায় লইয়া গেলেন। তথায় স্ত্রী সহ ন্যূনাধিক এক মাস ছিলাম। (সেখানে অবস্থানকালে) খুব ক্ষুধা হইত। তিনি (পুরুষোত্তম মহাদেব) বস্ত্রাদি সামগ্রী ও খাদ্য দ্রব্যাদির বেশ ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে থাকিয়া জননীর অনেক অনুসন্ধান করিলাম। পরন্তু, ঘরের এক জন চাকর (তাঁহার) সঙ্গে ছিল, সে বলিল যে, "তিনি ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া যাওয়ায় অত্যন্ত আঘাত লাগিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" অনুসন্ধান করিয়া ইহাই জানিতে পারিলাম।

জননীর সংবাদ।

পরে, ঢওলপুর (ধোলপুর) হইয়া 'গোওয়াহেলরী'তে (গোওয়ালিয়রে) যেখানে (ভাউ সাহেবের স্ত্রী) পার্ব্বতী বাই, নানা পুরন্দরে, ও মহ্লারজী হোলকর (মহ্লার রাও হোলকর) প্রভৃতি সকলে, ঘোড়া, পালকী ও সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহ পলাইয়া আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিলাম। মনে বড় ইচ্ছা ছিল, শ্রীকাশীতে গিয়া সেখানেই সদা সর্ব্বকাল বাস করিব। প্রপঞ্চের বিষয়মাত্রই যে দুঃখের কারণ, ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। পরন্তু দেহ-প্রারব্ধ বলবান্। গোওয়াহেলরীতে আসিলে, সকলেই (কাশী যাইতে) নিষেধ করিতে লাগিলেন। "একবার দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়; জননীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে হয়। কাশী গেলে পর এ সব আর কিরূপে ঘটিবে? পাণিপতগমনের পরিণাম ত এই হইল; এখন কাশীতে গিয়া আবার কি ঘটে, বলা যায় না।" ইত্যাকার চিন্তা মনে উদিত হওয়ায়, অবশিষ্ট সৈন্যসামন্তগণের সঙ্গে দেশে (ফিরিয়া) আসিতে লাগিলাম।

গোওয়ালিয়রে আগমন।

কাশীবাসের সঙ্কল্প।

শ্রীমন্ত নানা সাহেব (বালাজী বাজীরাও) পাণিপতের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, গুরুজীর নিকট পুনঃপুনঃ আমার স্মরণ করিতেন। "তাহার (নানা ফড়নবীসের) শরীর দুর্ব্বল; কিরূপে তাহার নির্ব্বাহ হইবে?" ইহাই তাঁহার ভাবনা। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় ও তাঁহার (শ্রীমন্তের) আশীর্ব্বাদে মহা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। পরে, বর্হাণপুরে শ্রীমন্ত নানা সাহেবের দর্শন হইল। দেখিলাম, তাঁহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে। মেজাজ অতিশয় খিট্‌খিটে হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে অনেকেই (তাঁহার নিকট) অপমানিত হইতেন। কিন্তু আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সস্নেহে আমার সহিত সম্ভাষণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত বলিলাম। তিন চারি দিন (তাঁহার) সঙ্গে থাকিলাম।

পেশওয়ের স্নেহ।

(এই সময়ে) শ্রীমন্ত গোপিকা বাঈ ও নারায়ণ রাওর বসন্ত রোগ হইল; এজন্য (গোপিকা বাঈ) তৎসহ (নারায়ণরাওর সহিত) নর্ম্মদাতীরে (গিয়া) থাকিলেন। পরস্পর উভয়ের মধ্যে (শ্রীমন্ত নানা সাহেব ও গোপিকা বাঈর মধ্যে?) মনোমালিন্যও জন্মিয়াছে জানিতে পারিলাম। যাহা ঘটা উচিত নহে, কালবৈপরীত্যবশতঃ তাহাও ঘটিল। অনন্তর, 'শ্রীমন্তের এরূপ কোপন

টোকেঁ যাত্রা।

স্বভাব, তাঁহার নিকটে থাকিলে কখন কি ঘটিতে কি ঘটে,' ইহা ভাবিয়া, শ্রীমন্তের নিকট "টোকেঁ" গ্রামে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। "যাও" বলিয়া অনুমতি দিলেন।

শ্রীমন্তের অনুগ্রহ।

টোকেঁ গ্রামে গিয়া থাকিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে শ্রীমন্তও সেখানে আসিলেন। পুনরায় তাঁহার দর্শন করিলাম। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় খিট্‌খিটে থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার নিকট একটি শালগ্রাম শিলা চাহিলাম। তিনি বহু কৃপা করিয়া আদেশ করিলেন যে, "ক্ষেত্র (?) হইতে যেটি ইচ্ছা হয়, সেইটি লও।" আমি সীতারামচন্দ্রের মূর্ত্তি গ্রহণ করিলাম।

সেখানে অবস্থানকালে এক দিবস "প্রদোষ" (শিবব্রত বিশেষ) আসিল। সেদিন শ্রীমন্ত বড় রাও সাহেবের (অর্থাৎ ৺বাজীরাও বল্লাল পেশওয়ের) (বার্ষিক) শ্রাদ্ধোপলক্ষে (শ্রীমন্ত

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ।

নানা সাহেব) আমায় ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি নিবেদন জানাইলাম যে, "অদ্য আমার প্রদোষব্রত।" তথাপি "[আপনি ভোজন করিতে] আসিবেন" এইরূপ আদেশ হইল। পরে শ্রীমন্ত যখন দেবদর্শনের জন্য

আপত্তি।

(মন্দিরে?) যাইতেছিলেন, তখন গুরুজীর দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলাম। তখনও আদেশ হইল যে, "অদ্য রাও সাহেবের শ্রাদ্ধ হইবে; এ নিমিত্ত অবশ্য ভোজন করিতে আসিবেন।" শ্রীমন্তের আদেশ অনুসারে গমন করিলাম।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা।

শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের ভোজনাদি পরিসমাপ্ত হইলে, স্বয়ং শ্রীমন্ত ভোজন করিতে বসিলেন। একপার্শ্বে শ্রীমন্ত মাধব রাও ও অপর পার্শ্বে আমাকে বসাইলেন। দ্বিতীয়া পত্নীর (রাধাবাঈর) হস্তে পরিবেশন করাইলেন। পরিবেশনের প্রথা তাঁহাকে শিখাইলেন। প্রত্যুত জননীর দ্বারা সন্তানকে পরিবেশন করাইলেন।

অনন্তর, শ্রীমন্তের নিকট নিবেদন করিলাম যে, কিছুদিন গঙ্গাতীরে (গোদাবরী তীরে) বাস করিয়া চিত্তকে স্থির করিতে মানস করিয়াছি।" এই প্রার্থনা মতে (আমার) কিছুদিন গঙ্গাতীরে থাকিবার আদেশ হইল।

শ্রীমন্ত কুচ করিয়া পুণায় গমন করিলেন। তখনও তাঁহার শরীর ক্ষীণই ছিল; "শ্রীমন্তের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী; এ কারণে শীঘ্র আসিবেন;" (সহসা) এই মর্ম্মের কয়েকটি পত্র

শ্রীমন্তের অন্তিমকাল।

আসিল। 'তাঁহারই অন্নে শরীর প্রতিপালিত, অতএব এ সময়ে তাঁহার নিকটে থাকা উচিত', এই ভাবিয়া পুণায় আসিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে "পারণের" নামক স্থানের নিকট আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীমন্ত কৈলাসবাস করিয়াছেন। শ্রীমন্ত দাদা সাহেবের কয়েকটি পত্র আসিল যে, "অবশ্য আসিবেন।" তদনুসারে পুণায় আসিলাম। শ্রীমন্ত (নানা সাহেব) 'দেব-দেবেশ্বর' সন্নিধে কৈলাসবাসী হইলেন শুনিয়া মনে কষ্ট হইল।

পরে, দাদাও (দাদাসাহেবও) আমার প্রতি কৃপা ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর, (দাদাসাহেব) শ্রীমন্ত রাজশ্রী মাধবরাও সাহেবকে "পেশওয়াইর বস্ত্র" দেওয়াইবার

সেতারায় গমন।

জন্য সাতরায় (সেতারায়) লইয়া গেলেন। (সেখানে গিয়া), "রাজদ্বারে (ফড়নবীসের) বস্ত্র (পরিচ্ছদ) লইবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলুন;" বলিয়া (দাদাসাহেব) অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি মিনতি করিয়া বলিলাম যে, "আমাদের যাইবার আবশ্যকতা কি? আপনি আমাদের প্রভু।" এইরূপ বলিয়া আমি আর সাতারায় রাজদরবারে গেলাম না।

ইহার পর শ্রীমন্ত (মাধবরাও) সাতারাধিপতির অনুমতি লইয়া পুণায় আসিবার জন্য

যাত্রা করিলেন। আমি সঙ্গেই ছিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, এক জন "গারদী" (শিক্ষিত পদাতিসৈনিক) সকলের সমক্ষে, বলপূর্ব্বক ধান্যক্ষেত্রস্থিত কোনও এক কুণবী-(কৃষক)-জাতীয়া রমণীর দেহের উপর গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক এক বল্লমের আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিল। তখন কামুকের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিলাম। অতঃপর শ্রীমন্ত (মাধবরাও) নারী নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে গমন করিলেন। আমরা আগামী কল্য নদী পার হইবার মানসে, সেদিন "শিহরোল" নামক গ্রামে থাকিয়া গেলাম। (পরদিন) নদীতে বান্ পড়িয়া (নদীর জল অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া) ছিল বলিয়া (আমরা) নৌকায় আরোহণ করিলাম। নৌকা, মধ্যধারার সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র, প্রবল স্রোতে পতিত হইল। তখন মাঝিরা বলিল, "আর আমাদের উপায় নাই।" সম্মুখে অনতিদূরে একটি শৈল দেখা গেল। তাহাতে আঘাত লাগিলে নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আমাদিগেরও জীবনের শেষ হইবে, ভাবিয়া, ঈশ্বর-স্মরণ করিতে লাগিলাম। এমন সময়, দু'জন লোক নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িয়া নৌকা টানিয়া বাহির করিল। ক্ষীরাব্ধি-শয়ন মহাবিষ্ণু (এ যাত্রা এইরূপে) রক্ষা করিলেন। পরে, পুণায় আসিলাম। সে সময়, শ্রীমন্ত (মাধব রাও) অনুগ্রহ করিয়া, কাজকর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।"

কামুকের দুর্দ্দশা।

নদীগর্ভে প্রাণসঙ্কট।

নানা ফড়নবীসের আত্ম-চরিত-কথন এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রাকৃত সৃষ্টি।

এক কাল ছিল, যখন কিছুই ছিল না; যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা অনুভবগোচর বা অনুমানগম্য, তাহার কিছুই ছিল না; কেবল ছিলেন এক জন, যিনি অনুভবগোচর বা অনুমানগম্য নহেন; অন্ততঃ মানবজাতির অধিকাংশের পক্ষে নহেন; তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক, অমনি সব হইল; যাহা কিছু দেখা যায় বা দেখা যাইবে, বা দেখা যাইবার সম্ভব, সবই অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল। এইরূপ একটা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে; তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনা বা বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে। সুস্থ মনুষ্যের আলোচ্য বটে কি না—সে কথা স্বতন্ত্র।

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি ইত্যাদি; ক্রমে আকাশ, আকাশাৎ বায়ু এইরূপ, অথবা এই জাতীয় অপরবিধ সৃষ্টিপ্রণালীর বর্ণনা আছে, যাহা উন্নত মনুষ্যত্বের পরিণত চিন্তার ফল, যাহাকে দার্শনিক সৃষ্টি অভিধান দেওয়া যায়,—তাহা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লে-

প্রাকৃত সৃষ্টি এই প্রবন্ধের আলোচ্য। সৃষ্টি শব্দের অপপ্রয়োগ হইতেছে কি না, ঠিক বলা যায় না। যে ঘটনা কবে আরম্ভ হইয়াছে জানি না, কবে শেষ হইবে তাহার ঠিকানা নাই, যাহা চলিতেছে; মনুষ্যদৃষ্টি অতীত অতিক্রম করিয়া যতদূরে পৌছিতে পারে বা পৌছিতে সাহস করে, এবং সুদূর অতীতের তামসী কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তর দিয়া না দেখিয়াও দেখে বা দেখিয়াও দেখে না, সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত যে ঘটনা বোধ করি সমান ভাবে চলিতেছে; সেই ঘটনাকে সৃষ্টি বলিলে যদি বিশেষ ভাষাগত অপরাধ না হয়, তবে সৃষ্টি বলিতে পারা যায়। আমি এইক্ষণে আমার সম্মুখে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ একটা মহা ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত, কি কারণে জানি না, ইহার পরিসর ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, ইহার পরিধি ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। ইহার পরিসরের সীমা কোথায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, ইহার জটিলতারও অন্ত কোথায় তাহাও নিরূপিত হয় না। তথাপি এই দুর্ভেদ্য জটিলতার গ্রন্থি কতক উন্মোচন করিয়া শৃঙ্খলের পরম্পরা সূত্র কতক আবিষ্কার করিতে না পারিলে জীবনযাত্রা চলে না। তাই যেরূপে হউক, একটা শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিতে মন স্বতই ধায়। এই শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নিমিত্ত, এই গ্রন্থি উন্মোচনের নিমিত্ত, মনুষ্য জাতির অবলম্বিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতির নাম বৈজ্ঞানিক রীতি। মনুষ্যমাত্রই কতক না কতক পরিমাণে এই বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। তাই জীবনযাত্রা চলিতেছে; এবং মোটের উপর জীবনযাত্রার সফলতা ধরিয়া অবলম্বিত রীতির বৈজ্ঞানিকতা পরিমিত হইতে পারে।

যাহাই হউক, মানুষের মন এই শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে চায়, এবং শৃঙ্খলার পরম্পরা ও সূত্র ধরিয়া অতীত কালের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক স্থানে গিয়া পরাহত হইতে বাধ্য হয়। সেইখানে জগতের আদি কল্পনা করে ও তৎপর হইতে সৃষ্টি ব্যাখ্যান করিতে চায়। সেই আদিতে কেমন ছিল, তার পর কেমন হইল, তার পর কেমন হইল, এইরূপে চলিয়া এখন যেরূপ আছে, তাহাতে পৌছিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা পূর্ব্বেও হইয়াছিল, এখনও হইতেছে, ও পরেও হইবে। চেষ্টার বৈজ্ঞানিকতার ক্রম আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা এখনকার দৃষ্টিতে প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতির সহিত ঠিক সঙ্গত হয় না। আবার এখন যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা আর কিছু দিন পরে হয় ত

চেষ্টা স্বাভাবিক, সঙ্গত ও স্বাস্থ্যের পরিচায়ক, এবং ইহার আলোচনাতেও লাভ আছে।

ফলে বহুদিন হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রাকৃত সৃষ্টির বহুবিধ বিবরণ মানুষের বিজ্ঞানেতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই আদিতে কি ছিল? সেই আদি, অর্থাৎ যে আদির পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি চলে না, যেখানে পৌঁছিয়া আমাদের যুক্তিপ্রণালী পরাহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেহ বলিয়াছেন, তখন ছিল জল আর জল। কেহ বলিয়াছেন, আকাশ আর আকাশ; কেহ বলিয়াছেন, আগুন আর আগুন। জল হইতে বা আগুন হইতে বা আকাশ হইতে এইরূপে, এইরূপে, এইরূপে, অধুনা প্রতীয়মান জগৎ বিকশিত হইয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিকেরা কি বলেন, একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। আদিতে কি ছিল? যতদূর অনুমান হয়, জলও নহে, আগুনও নহে, বোধ হয় বায়ু আর বায়ু; হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে ছিল আকাশ আর আকাশ। আজ কাল আধুনিকেরা বায়ু লইয়াই আরম্ভ করেন।

আধুনিকদের প্রথম ইম্যানুয়েল্ ক্যাণ্ট। লুক্রিশিয়স্ বা দিমক্রিটসের কথা আনিবার দরকার নাই; কেন না, এক হিসাবে তাঁহারা আধুনিক বলিয়া গণ্য হয়েন না। ইমানুয়েল্ ক্যাণ্ট এই হিসাবে আধুনিক। ক্যাণ্ট নিউটনের পরবর্ত্তী। এবং নিউটন জগৎ শৃঙ্খলের জটিলতম গ্রন্থির উন্মোচক।

ক্যাণ্ট বলিলেন, আদিতে সূর্য্য ছিল না, পৃথিবী ছিল না, গ্রহ উপগ্রহ ছিল না। সমগ্র জড় বিস্তৃত দেশ ব্যাপিয়া বায়ুর আকারে অবস্থিত ছিল। বায়ুর আকারে, তবে সে বায়ু আমাদের বায়ুর মতও নহে; ইহার অপেক্ষা সহস্রগুণে লঘু। আবার সে বায়ুতে সোণা ছিল, লোহা ছিল, রূপা ছিল, ইত্যাদি। জড় পরমাণুর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ ছিল, তাই বায়ু ক্রমে স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া ছোট বড় পিণ্ডে পরিণত হইয়া সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্যাণ্টের পর উইলিয়ম হর্শেল। হর্শেল বহুসংখ্যক নীহারিকার আবিষ্কর্ত্তা। ছায়াপথ সহজ চোখে কোয়াসার মত দেখাইতে পারে, কিন্তু যন্ত্রযোগে অতিদূরস্থ সংখ্যাতীত নক্ষত্রের সমষ্টি বলিয়াই ধরা পড়ে। কিন্তু নীহারিকা নীহারিকা মাত্র; ধূঁয়া অথবা কোয়াসার মত, উৎকৃষ্ট যন্ত্রের কাছেও তাহার কুজ্ঝটিকাত্ব লোপ পায় না; নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া বোধ হয় না। হর্শেল বলিলেন, ঐ জগৎ নির্ম্মাণের মশলা এখনও কিছু কিছু স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। ঐ কুজ্ঝটিকার মত যে বায়বীয় পদার্থ ঈষদ্দীপ্ত অবস্থায় দেখা যায়, উঁহাই এক-

কালে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া ছিল। কালে জমাট বাঁধিয়া সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ উপ-গ্রহাদির নির্ম্মাণ ঘটিয়াছে? কোনও স্থানে ভাল জমাট বাঁধিয়াছে, কোনও খানে বা বাঁধিতেছে, কোনও খানে বা বাঁধে নাই; বিস্তীর্ণ নভঃপ্রদেশ অনুসন্ধান করিলে সকল অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় সমকালে লাপলাস্। লাপলাস্ বলিলেন, আদিকালে সেই বায়ুরাশি বিশাল আবর্ত্তের মত একটা কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিত। মাধ্যাকর্ষণে আবর্ত্ত ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল; তাহার পরিধি পরিসর ক্রমে কমিতে লাগিল। আবর্ত্তের পরিসর কমিলে আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে বাড়ে, এই একটা নিয়ম সচরাচর দেখা যায়। আবর্ত্তনশীল বায়ুময় পিণ্ডের মেরুদেশ ক্রমে চাপিয়া যায়, ও মধ্যদেশ অর্থাৎ নিরক্ষদেশ ক্রমে স্ফীত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গুরীর আকারে ছাড়িয়া আসে। সেই অঙ্গুরী আবার কালক্রমে ছিন্ন ভিন্ন ঘনীভূত ও পরে একত্রিত হইয়া গ্রহের সৃষ্টি করিয়া মধ্যবর্ত্তী আবর্ত্তনশীল সূর্য্যের চারি দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এইরূপে মধ্যস্থ সূর্য্য ক্রমে ঘনীভূত ও স্বল্পায়তন হইতে থাকে, আর তাহা হইতে একটা একটা অঙ্গুরী ছাড়িয়া এক একটা গ্রহের সৃষ্টি করে। সূর্য্য বা নক্ষত্র হইতে যে পদ্ধতিতে গ্রহের উৎপত্তি হয়, গ্রহ হইতে সেই পদ্ধতিতে ক্রমে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।

এই সেই লাপলাসের উদ্ভাবিত বিখ্যাত নীহারিকাবাদ; ইংরাজিতে নেবুলার থিওরি। এই সৃষ্টি-ব্যাখ্যার ভিতরে যতটুকু কবিত্বরস আছে, কেহ কেহ বলেন, সে পরিমাণে যুক্তিরস নাই। তথাপি এই সৃষ্টিব্যাখ্যার একটা অপূর্ব্ব মোহকর আকর্ষণ আছে; যেখানে সম্পূর্ণ আঁধার ছিল, সেখানে ইহার সাহায্যে আলো পাওয়া গিয়াছে। সৌর জগতের অন্তর্বর্ত্তী গ্রহমাত্রই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ঘুরে কেন? সকলেরই ভ্রমণপথ প্রায় এক সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত কেন? প্রায় সকলেই একই মুখে নিজ নিজ ধ্রুবরেখার উপরে আবর্ত্তন করে কেন? গ্রহগণের মধ্যে যে গুলি বড়, মোটের উপর তাহাদের উপগ্রহের সংখ্যা অধিক, মোটের উপর তাহারা এখনও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত রহিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আছে, যাহা পূর্ব্বে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইত। লাপ্লাসের সৃষ্টিব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সেই সকল প্রহেলিকার সমস্যা কতকটা মীমাংসিত হয়। আবার শনৈশ্বরের অঙ্গুরী, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে এত গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের অবস্থান, এ সকলেরও কতকটা সঙ্গত তাৎপর্য্য পাওয়া যায়।

তথাপি যখন বড় হর্শেলের পুত্র ছোট হর্শেল, প্রচণ্ডশক্তিশালী যন্ত্রপ্রয়োগে পিতার আবিষ্কৃত অনেকগুলি নীহারিকাকে নক্ষত্রপুঞ্জমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, তখন এই মোহকর সৃষ্টিবিবরণের প্রতি পণ্ডিতগণের আস্থা কমিয়া গেল। স্বনামখ্যাত দার্শনিক কম্‌ট্‌, গণিতপ্রয়োগে নীহারিকা হইতে সৌরজগতের সমুদয় খুঁটিনাটী উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গণিতবিৎগণের তীব্র ব্যঙ্গ ও উপহাসের ভাগী হইলেন। সাব্যস্ত হইল, নীহারিকা বায়বীয় পদার্থ নহে, দূরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ মাত্র। কুজ্ঝটিকার মত দেখায়, কেবল দূরে অবস্থান প্রযুক্ত। উহারা জগৎ নির্ম্মাণের মশলা নহে; সুপরিণত সুগঠিত পূর্ণাবয়ব বহুসংখ্য জগতের সমবায় মাত্র।

এই রূপ অবস্থা, এমন সময়ে কির্কফের আবিষ্কৃত আলোক বিশ্লেষণ প্রণালী বৈজ্ঞানিকের হস্তে নূতন, অচিন্তিতপূর্ব্ব, প্রচণ্ড শক্তি আনিয়া দিল। জ্ঞানের ইতিহাসে সেই এক দিন।

বস্তুতই সেই এক দিন। নিউটন শুভ্র সূর্য্যালোকের ভিতর হইতে রক্ত নীল পীত নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়াছিলেন। * কির্কফের আদেশে সেই রক্ত নীল পীত বিবিধ বর্ণের বিচিত্র রশ্মিগুলি কথা কহিতে লাগিল। কে কোথা থাকে, কে কোথা হইতে আসে, কির্কফের আদেশে দ্বিধাহীন চিত্তে, অকপট ভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া ফেলিতে লাগিল। কির্কফের প্রচণ্ড উইল্ ফোর্স্ ছিল, সন্দেহ নাই।

ফলে সেই দিন হইতে রক্ত নীল পীত রশ্মিগুলি আপন আপন কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। কেহ বলিল, আমি থাকি সূর্য্যে; কেহ বলিল, আমি থাকি চূর্ণে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে যেখান হইতে আসিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আরও কত খবর ছিল। ঐ নক্ষত্রটা এই বেগে দূরে যাইতেছে, ঐ নক্ষত্রটা এই বেগে কাছে আসিতেছে, ঐ নক্ষত্রটা এই কারণে জ্বলিয়া উঠিল, ঐখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল, ঐখানে দুইটায় ধাক্কা লাগিল, সূর্য্যমণ্ডলের ঐখানে ঝড় বহিতেছে, ইত্যাদি কত কথাই বলিতে লাগিল।

---

* নিউটনের পূর্ব্বেও শুভ্র সূর্য্যালোক বিশ্লিষ্ট হইয়া রক্তপীতাদি বর্ণের বিকাশ করিত। তবে নিউটন সেই বিশ্লেষণ ঘটনায় যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। নিউটন একবার দৃষ্টিপাত করিলেই প্রকৃতিদেবী তাঁহার গূঢ় রহস্যগুলি আপনা হইতে বলিয়া

প্রকাশ পাইল, সূর্য্য কতকটা জমাট বাঁধিয়াছে, তবে উহার মণ্ডলকে আবরণ করিয়া এখনও বায়ু রহিয়াছে। আর সে বায়ুতে তামা লোহা দস্তা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। যে সকল বস্তু সূর্য্যে আছে, তাহার সবই পৃথিবীতে রহিয়াছে; হইতে পারে, এত বড় প্রকাণ্ড সূর্য্যে এমন দুই চারিটা পদার্থ আছে, যাহা পৃথিবীতে মিলিবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে পার্থিব উপকরণই বর্ত্তমান, পার্থিব মশলাতে সূর্য্য মণ্ডল নির্ম্মিত। সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড তপ্ত ভয়াবহ পৃথিবী। নক্ষত্র গুলাও তাই। সেই সব উপকরণেই নির্ম্মিত। কোনটায় কোন পদার্থ বেশী আছে, কোনটায় হয় ত কম আছে, এই মাত্র; কোনটা একটু বেশী গরম, কোনটা একটু কম গরম, এই পর্য্যন্ত। আর নীহারিকা কি? নীহারিকা বস্তুতঃই নীহারিকামাত্র, তাহাতেও পার্থিব উপকরণই বিদ্যমান; কিন্তু এখনও জমে নাই, এখনও লোহা সীসা দস্তা তামা যাহা কিছু সেখানে আছে, সবই বায়ুর আকারে। কালে জমিয়া যাইবে। কোনটা জমিতেছে, কোনটা নক্ষত্রে প্রায় পরিণত হইয়াছে, কোনটা বা হইবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যাদি।

আজ হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ নাই; কিন্তু তখন হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ উগ্র প্রতিভার তীব্র আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অজ্ঞানের তিমির রাজ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ বলিলেন, সূর্য্যের এই তেজ আইসে কোথা হইতে। বৎসর বৎসর রাশি রাশি তেজের অপচয় হইতেছে, অথচ ভাণ্ডারের যেন ক্ষয় নাই। সামান্য একটা আগুন বজায় রাখিতে কাঠ বা কয়লা চায়, তেল চায়; একটা স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনের জন্য বেগে চকমকি ঠুকিতে হয়। সূর্য্যের এই তাপ ভাণ্ডার সঞ্চয় হইতেছে কোথা হইতে? কাঠ, কয়লা, গন্ধক, উদজান? সমস্ত সূর্য্যমণ্ডলটা ঐ সব দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও এত কাল ধরিয়া এত অপব্যয় সহিত না। সংঘাত? সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের সংঘাতেও এত তাপ জন্মে না। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ এ সব হিসাবে বড়ই নিপুণ ছিলেন। * এক মন ওজনের একটা উল্কাপিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তদেশ হইতে উপনীত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলকে অকস্মাৎ একটা ধাক্কা দিলে দিবাকরের ক্রোধাগ্নি এক ডিগ্রির কত ভগ্নাংশ উদ্দীপিত হইবে, এবং তাহার এই আকস্মিক চাঞ্চল্য টুকু অপনীত হইতেই বা এক সেকেণ্ডের লক্ষভাগের কত ভগ্নাংশ সময় অতীত হইবে, তাহা অকা-

* বলা বাহুল্য, তৎশিষ্যবর্গের প্রসাদে আজ কাল অর্বাচীন বালকেও এইরূপ হিসাব

তরে ও অটলগাম্ভীর্য্যের সহিত হিসাব করা, হেল্‌মহোল্‌টজের অভ্যাস ছিল। তবে সূর্য্যের তাপ জন্মে কিসে? এক মাত্র উপায় আছে। সূর্য্যদেব আপনার বিপুল কলেবর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিতেছেন; সঙ্কুচিত করিতেছেন ও গরম হইতেছেন। তবে দেবতার কোপ অনেক সময়ে শুভ ফল আনয়ন করে। তিনি গরম হইতেছেন; আর সুদূরে আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলে জল পড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিতেছে, ও প্রবন্ধ-লেখকের আক্রমণ নিরীহ পাঠকের উপর হঠবিক্রমে আপতিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে!

ফলে সূর্য্য ক্রমেই কলেবর সঙ্কোচ করিতেছেন; ক্রমেই জমিতেছেন; অদ্যাপি মোটের উপর পৃথিবীর তুলনায় একটু হাল্‌কা আছেন। কিন্তু সঙ্কোচনের একটা সীমা আছে। কুবেরের ভাণ্ডারেরও বোধ করি ক্ষয় আছে; সূর্য্যদেবের তাপের ভাণ্ডারও কালক্রমে নিঃশেষিত হইবে। কত দিনে হইবে, তাহারও মোটামুটি হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। তবে সে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় লেখকের বা পাঠকের কোনও চিন্তা নাই। তৎপূর্ব্বে বহুল পাঠকবংশ বিলুপ্ত হইবে, এবং বহুলতর প্রবন্ধ প্রকটিত হইবে।

সৃষ্টিঘটনা লইয়া কথা। এমন কাল ছিল, সূর্য্যের কলেবর আরও বিশাল ছিল। সম্ভবতঃ, সমগ্র সৌরজগৎটা অথবা আরও বিস্তৃততর প্রদেশ ব্যাপিয়া ছিল। সূর্য্যে এখন যে সোণা রূপা লোহা বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে যে মাণিক মুক্তার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা এক কালে বায়ুর আকারে যথা তথা বিন্যস্ত হইয়া বোধ করি বিশাল বাতাবর্ত্তে বিশাল জগৎ ব্যাপিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। লাপলাসেরও ত এই অনুমান।

সূর্য্য সম্বন্ধে যাহা, অন্যান্য নক্ষত্রগণ সম্বন্ধেও তাহাই। তাহারাও ত ছোট বড় সূর্য্য। সুতরাং আদিতে এখন ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি যতদূর দেখা যাইতেছে, সেই পরিধির অভ্যন্তরে সমগ্র প্রদেশটাই নীহারিকাব্যাপ্ত বা বায়ুব্যাপ্ত ছিল।

নীহারিকা হইতে জগতের উৎপত্তিঘটনা স্থূলতঃ এইরূপ। ইহার উপর আর দুই চারিটা কথা আছে। সম্প্রতি এই কথাগুলা উঠিয়াছে।

প্রতি রাত্রেই আমরা সহজ চোখে দুই চারিটা, যন্ত্রযোগে দু শ পাঁচ শটা নক্ষত্রপাত দেখিতে পাই। বস্তুতঃ উহা নক্ষত্রপাত নহে। নক্ষত্রপাত পৃথিবীর পক্ষে বড় বিভ্রাটব্যাপার, পৃথিবীর অদৃষ্টে তাহার সম্ভাবনাও বিরল।

কল্পনা করিতে পার না। যাহা পৃথিবীতে পড়ে, তাহা নক্ষত্র নহে, তাহা উল্কাপিণ্ড; ক্ষুদ্র পদার্থ, দুই দশ রতি হইতে দু দশ মোণ পর্য্যন্ত। সৃষ্টি-ছাড়া পদার্থে নির্ম্মিত নহে; মোটামুটি লোহা আর মাটি। কখন কাহারও মাথায় পড়িয়াছে কি না, ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না; তবে লোকের নিকটে পড়িয়াছে ও সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদেরই মিউজিয়মে অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড পতনের ও সংগ্রহের দিন তারিখ সমেত সংগৃহীত আছে। বেশীর ভাগই এত ছোট যে, ভূবায়ুতে বেগে প্রবেশ করিয়া বায়ুর আঘাতে তপ্ত হইয়া জ্বলিয়া যায়। ভূমি পর্য্যন্ত পঁহুছে না; অথবা চূর্ণ হইয়া বায়ুতে বহুকাল ধরিয়া ভাসিতে থাকে। কালে অধঃপতিত ও সাগরতলস্থ পর্য্যন্ত হইতে পারে। শুনা যায়, মহাসাগরের গর্ভ হইতেও এই রূপ উল্কাচূর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে।

ফলতঃ, সমগ্র নভঃপ্রদেশে এইরূপ ছোট বড় উল্কাপিণ্ড ছড়ান আছে; পৃথিবী চলিতে চলিতে তাহার কতকগুলি ক্রমে আত্মসাৎ করিতেছে। শূন্য দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ উল্কাপিণ্ডের পাল কোটি কোটি কোটি একত্রে দল বাঁধিয়া পঙ্গপালের মত বিস্তৃত দেশ ছাইয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর সহিত কখন কখন এইরূপ এক একটা উল্কাদলের দেখা সাক্ষাৎ হয়; তখন আর কেবল উল্কাপাত ঘটে না; তখন উল্কাবৃষ্টি ঘটে। যেমন জলবৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি, অথবা কবিগণের পুষ্পবৃষ্টি, সেইরূপ উল্কাবৃষ্টি; দেখিতে অগ্নিবৃষ্টির মত। বাঙ্গলা ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের উল্কাবৃষ্টি অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। এইরূপ উল্কাবৃষ্টি—লক্ষ লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ডের পৃথিবীতে পতন—জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভূবায়ুতে প্রবেশ।

ইহার মধ্যে আর একটি রহস্যের কথা আছে। মাঝে মাঝে ভীমপুচ্ছ উড়াইয়া ধূমকেতু আসিয়া দেখা দেয়। কয়েকটি ধূমকেতুর ভ্রমণপথ নির্দ্দিষ্ট উল্কাদলের ভ্রমণপথের সহিত অভিন্ন। এমন কি, ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পৃথিবী একটি পরিচিত ধূমকেতুর রাস্তা পার হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু ধূমকেতুর সহিত সাক্ষাৎ না হইয়া একদল উল্কার সহিত সাক্ষাৎ হয়। লকিয়ার সাহেব দেখাইয়াছেন, ধূমকেতু যে আলো দেয়, মিউজিয়মের সংগৃহীত উল্কাপিণ্ড জ্বালাইয়াও ঠিক্ সেই আলো বাহির করিতে পারা যায়; এবং কির্কফের পর হইতে আলো কখন মিছা কথা কহে না। সুতরাং, সম্ভবতঃ ধূমকেতু উল্কাপিণ্ডের সমষ্টিমাত্র।

আদিকালে গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত বায়ুর আকারে জগৎ ব্যাপিয়া ছিল এমন কি কথা আছে ?

তখন জগৎ এই সকল উল্কাপিণ্ডে আকীর্ণ ছিল। বায়ুকণা ও উল্কাপিণ্ডে তফাত কি ? বায়ুকণা কিছু ছোট, উল্কাপিণ্ড কিছু বড়। এখন যেমন স্থানে স্থানে উল্কাপিণ্ড দল বাঁধিয়া আছে, আর তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই সমুদ্রে জলচরের মত বায়ুতে ধূলিকণার মত ছড়াইয়া আছে; তখনও উল্কাপিণ্ড সেইরূপ শূন্য-প্রদেশে ছড়াইয়া ছিল। কালে তাহারা একত্রিত হইয়া সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছে।

জর্জ ডারুইন্ দেখাইয়াছেন, সংখ্যাতীত বায়বীয় পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সকল একত্রে ছুটাছুটী করিলে যে সকল ব্যাপার দেখা যায়, সংখ্যাতীত উল্কা-পিণ্ড একত্রে ছুটাছুটী করিলেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। গণনায় উভয় হইতে একরকমই ফল পাওয়া যায়। সুতরাং নীহারিকা বা বায়বীয় পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তি যেমন বুঝান চলে, কোটি কোটি কোটি উল্কার সমবায় হইতেও উহা সেইরূপ বুঝান যাইতে পারে। যুগল নক্ষত্রও স্থানে স্থানে দেখা যায়, দুইটি সূর্য্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উল্কাপিণ্ডের সমবায় হইতে তাহাদেরও উৎপত্তি বেশ বুঝান চলে।

লকইয়ারের হাতে উভয় মতের কতকটা সমন্বয় হইয়াছে। উল্কাপিণ্ড আকাশে ছড়াইয়া আছে; স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া রহিয়া ঘুরিতেছে; গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তাহারাও সেইরূপ অনেকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করি-তেছে; ধূমকেতু এইরূপ উল্কাপিণ্ডের দল; পরস্পর সংঘাতে ধূম বাষ্প বায়ু পর্য্যন্ত উদ্গীরণ করে। সৌরজগতের ভিতর কতকগুলি ধূমকেতু রহিয়াছে; তাহারা সূর্য্যকে ঘুরে। অনেকে সৌরজগতের বাহির হইতে, হয় ত অন্য নক্ষত্রজগৎ হইতে আসিয়া দেখা দেয়, এবং আমাদের সূর্য্যকে একবার ঘুরিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া যায়। কেহ কেহ বাহির হইতে আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহার পর আর বাহিরে যায় না; ইহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। লেবেরিয়ারের অনুমান মত ইংরাজি ১২৬ সালে এইরূপ একটা উল্কা-পাল বাহির হইতে সৌরজগতে প্রবেশ করিয়াছিল; তখন উরেনস্ বা ইন্দ্র গ্রহ তাহার পথের নিকট ছিল। উরেনসের আকর্ষণে তাহার পথ ঘুরিয়া যায়। তদবধি আমাদের সহিত তাহার স্থায়ী আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। সেই অবধি প্রতি

অন্তর নবেম্বরের মাঝামাঝি পৃথিবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে, তখন পৃথিবীতে উল্কাবর্ষণ ঘটিয়া থাকে। পৃথিবী এইরূপে উল্কাখণ্ড ক্রমেই আত্মসাৎ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে। উল্কাপুঞ্জের পরস্পর সংঘর্ষ ও সমবায় হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই সংঘর্ষ অদ্যাপি চলিতেছে। পৃথিবীর নির্ম্মাণ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহেও এইরূপ চলিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল ও বুধ গ্রহের মধ্যে শূন্য ব্যাপিয়া এইরূপ অসংখ্য উল্কাপিণ্ডের অবস্থিতি রহিয়াছে, প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যাহা সামান্যভাবে ঘটিতেছে, সূর্য্যে তাহা প্রচণ্ডভাবে ঘটিতেছে। সূর্য্যের উত্তাপের কিয়দংশ এই সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে এক একটা নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠে, দেখা যায়। এই সেদিনই ১২৯৮ সালের মাঘ মাসে উত্তর নভঃপ্রদেশে অরিগা নামক নক্ষত্রপুঞ্জের অভিমুখে একটা নক্ষত্র হঠাৎ কিছু দিনের জন্য জ্বলিয়া আবার নিভিয়া গিয়াছে। ইহাও হয় ত দুইটা নক্ষত্রের প্রতিঘাতে, অথবা দুইটি উল্কাপুঞ্জের সংঘর্ষে। ঠিক কারণনির্দ্দেশ দুরূহ। তবে চারি দিক্ দেখিয়া বিবেচনা ও অনুমান করিতে হয়। যাহাদিগকে নীহারিকা বলা যায়, তাহাতে বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে সত্য; তাহাদের আলোকেই সে কথা বলিয়া দেয়। কিন্তু তাহারাও বিস্তৃতদেশব্যাপী উল্কাসমষ্টি, কতকটা বড় বড় ধূমকেতুর মত। পিণ্ডগুলা পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ছুটিতেছে, চূর্ণীভূত ও বাষ্পীভূত হইতেছে। কালে জমাট বাঁধিতেছে। জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ নির্ম্মাণ করিতেছে। সমুদয় জ্যোতিষ্কের আকার অবয়ব আলোক বর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের বয়স অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। উল্কাপিণ্ড সকলেরই মশলা। সেই উপাদান হইতে সকলেই নির্ম্মিত হইয়াছে। কেহ এখনও ভ্রূণ, কেহ শিশু, কেহ যুবা, কেহ প্রৌঢ়, কেহ বৃদ্ধ। কেহ এখনও দীপ্তিলাভ করে নাই, কেহ দীপ্তিবিকাশ আরম্ভ করিয়াছে। কেহ পূর্ণ গৌরবে ভাস্বর, কেহ নির্ব্বাণোন্মুখ, কেহ নির্ব্বাপিত। বয়স হিসাবে লকিয়ারের প্রণীত জ্যোতিষ্কগণের শ্রেণীবিভাগ কতকটা এইরূপ।

১ম। সংখ্যাতীত উল্কাপিণ্ডের দল, কোটি কোটি কোটি ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। মশলার স্তূপ। জগতের ভ্রূণ। কঠিন শীতল দীপ্তিহীন পিণ্ডের পরস্পরের সংঘর্ষে দীপ্তিময় বায়ু বাষ্প প্রভৃতির উদ্গম। নাম নীহারিকা। আকারের স্থিরতা নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়বের নির্দ্দেশ নাই; দূর হইতে

২য়। কতকটা জমাট বাঁধিয়াছে; সংঘর্ষ, ঠোকাঠুকি চলিতেছে; ফলে উষ্ণতা বাড়িতেছে। শিশু জগৎ। আকারে নক্ষত্রের মত; আরক্ত বর্ণ।

৩য়। জমিয়া ঘনীভূত হইয়া তপ্ত উষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় তরল বিশাল পিণ্ডে পরিণত; অভ্যন্তরে তরল পিণ্ড, উপরে শীতলতর বাষ্পের আবরণ; সঙ্কোচনশীল, কিন্তু সঙ্কোচনে উষ্ণতা বর্দ্ধমান। সঙ্কোচনে ঘনীভবনে তাপ জন্মিতেছে ও বাড়িতেছে, ও তাপ বিকীরণ করিতেছে, বিলাইতেছে। আয় অধিক ব্যয় কম; মোটের উপর ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতেছে। দেখিতে কতকটা আমাদের সূর্য্যের মত। জগতের কিশোর বয়স; নূতন স্ফূর্ত্তি চাঞ্চল্য তারল্য।

৪র্থ। উষ্ণতার চরম পরিণতি; অভ্যন্তরের জ্বলন্ত তপ্ত পিণ্ডের আলোক শীতলতর আবরণ বায়ুস্তর ভেদ করিয়া ফুটিয়া আসিতেছে। দীপ্তির পরাকাষ্ঠা, মাহাত্ম্যে অতুল। জগতের পূর্ণ যৌবন।

৫ম। যৌবন প্রৌঢ়ত্বে পরিণত। সঙ্কোচন চলিতেছে; কিন্তু ব্যয় আর কুলায় না। উষ্ণতার ক্রমিক হ্রাস। দেখিতে প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর মত, তবে সেখানে গৌরব বর্দ্ধমান, এখানে গৌরব হ্রাসের মুখে। আমাদের সূর্য্য সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৬ষ্ঠ। নির্ব্বাণোন্মুখ, ঘনীভূত, কঠিন, শীতল; দীপ্তি দেয় কি দেয় না। বার্দ্ধক্য উপস্থিত, নির্ব্বাণোন্মুখ, সুতরাং দূরবীক্ষণে দেখা যায় বা যায় না।

৭ম। নির্ব্বাপিত, মৃত, শীতল, দীপ্তিহীন, আঁধার বিশাল কঠিন জীবনহীন জড়পিণ্ডে পরিণত। দূরবীক্ষণে দেখা যায় না। গণিতের সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে ধরা দেয়।

চন্দ্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড, যাহারা এককালে সম্ভবতঃ বৃহত্তর সূর্য্যের অঙ্গীভূত ছিল, তাহার ক্ষুদ্রতার নিমিত্ত বহুকাল হইল এই শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মীরকাশেম।*

বাঙ্গলার মুসলমান অধিকারের শেষ অধ্যায়ের একটি উজ্জ্বল চরিত্র সেই মীরকাশেম। মীরকাশেম বাঙ্গলার শেষ নবাব। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মুরশীদ কুলী স্বীয় প্রতিভাবলে যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, মীরকাশেম সেই বংশের মসনদে বাঙ্গলার শেষ মুসলমান ভূপতি। আলিবর্দ্দির উত্তরাধিকারী সেরাজউদ্দৌলা না হইয়া যদি মীরকাশেম হইতেন, তাহা হইলে পলাশী-কাণ্ডের কি প্রকার পরিণাম ঘটিত, তাহা কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে অনুমান করা যাইতে পারে না। পলাশীর ব্যাপার আদৌ সংঘটিত হইত কি না, এ বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়।

মুরশীদ কুলীখাঁর অদম্য উৎসাহ, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, কার্য্যক্ষেত্রে একাগ্রতা, আলিবর্দ্দির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিণামদর্শিতা ও কার্য্যক্ষমতা, মীরকাশেমের উপাদানে যথেষ্টরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু সেরাজউদ্দৌলার হঠকারিতা ও ক্রোধপ্রবৃত্তি যদি তাহাতে না মিশিত, তাহা হইলে বাঙ্গলায় ইংরাজ-শাসন মীরকাশেমের আমলে সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধমূল হইতে পারিত না; হয় ত যাহা ঘটিয়া গিয়াছে- তাহাও আদৌ ঘটিত না।

মীরজাফর আলস্যের আদর্শচিত্র, কিন্তু মীরকাশেমে কার্য্যশক্তির পূর্ণ বিকাশ। মীরজাফরে যাহা জড়তা, মীরকাশেমে তাহা উদ্যমশীলতা। মীরজাফরে যাহা নীরব রাজশক্তি, মীরকাশেমে তাহা পূর্ণবিকশিত কূটনীতি; মীরজাফরে যাহা তৃপ্তি, মীরকাশেমে তাহা অতৃপ্তি; মীরজাফরে যাহা শান্তিপ্রিয়তা ও বিলাসিতা, মীরকাশেমে তাহা উত্তেজনা ও উদ্যমশীলতা। মীরজাফরকে বিধাতা মাথায় মুকুট পরিয়া গোলামী করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু মীরকাশেম, মসনদে বসিয়া স্বাধীন রাজবুদ্ধিতে সেই মুকুট পরিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইলেও, নিজের বুদ্ধির দোষে উচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন।

---

* যে সমস্ত পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, সকল স্থলে তন্মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে, এই ভয়ে, কেবল গ্রন্থগুলির নামই দেওয়া হইল;--1. Stewart's Bengal. 2. Vansitart's Memoirs. 3. Presididential Armies of India.—Rivett Carnac. 4. History of Bengal Army—Broom. 5. Report of the select commitee, after the battle of Plassy.—Vol. II. 6. Auber's Analysis of the E.I. Company. 7. Administration of E.I. Company.—Kaye. 8. Old days of John Company 2 Vols.

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ জাতি বণিকত্ব হইতে বাঙ্গালীর চক্ষে একটু অধিকতর উচ্চ আদর্শে উপনীত হইলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, নবাব সেরাজ-উদ্দৌলার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নবাব নাই, তাঁহার সেনাবলের কাছে অপরের সেনাবল বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ। কিন্তু পলাশীর রণাভিনয়ের পর, পলাশীবীর ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজজাতি, বাঙ্গলায় সকল শ্রেণীর মনেই বিভীষিকার উৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন।

যদি ক্লাইব না থাকিতেন, কিম্বা থাকিয়াও যদি তিনি পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটানিয়ার উজ্জ্বল গৌরবে কলঙ্কলেপন করিতেন, যদি সেরাজউদ্দৌলা তরলমতি না হইয়া মীরকাশেমের ন্যায় দৃঢ়চেতা ও সূক্ষ্মদর্শী হইতেন, মীরজাফর না হইয়া যদি মীরকাশেম সেরাজের সেনাপতি হইতেন, তাহা হইলে ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ পাঠক অনুমান করুন দেখি, বর্ত্তমান ঘটনাস্রোত কত দূর পিছাইয়া গিয়া দাঁড়াইত।

যাহা হউক, মীরজাফর বাঙ্গলার মসনদে বসিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুদ্রোহিতার শোণিতময় মূল্যে তিনি বাঙ্গলার সিংহাসন কিনিলেন। যাহার নিমক খাইয়া তিনি মীরজাফর আলি খাঁ হইয়াছিলেন, সেই সেরাজ যখন পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে গোপনে শিবিরমধ্যে তাঁহার পদতলে স্বীয় উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া সহায়তার জন্য অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই তরলমতি তরুণবয়স্ক নবাবকে আশা দিয়াও, পরে সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে তিনি যাহা লাভ করিলেন, তাহা মখমলমণ্ডিত, হেমবিজড়িত সুকোমল সিংহাসন নহে; তাহার চারি দিকে পরাধীনতার সুতীক্ষ্ণ কণ্টক। তিনি নবাব হইলেন বটে, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা তিন তিনটা সুবা তাঁহার পদতলস্থ হইল বটে, মুরশীদাবাদের রাজকোষের দ্যুতিময় মণি মাণিক্য ও রাজসংসারের বিলাস তাঁহার সেবায় লাগিল বটে, কিন্তু যতই নির্ব্বোধ হউন না কেন, তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, বাঙ্গলার নবাবী তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

ইংরাজ তখন দেশের প্রকৃত রাজা। ক্লাইব সাহেবের হাতে রাজ্যের রাজশক্তি মীরজাফর কলের পুতুলের ন্যায়, অসাড় মানুষের ন্যায়, কতকগুলা নবাবীর বাজে চিহ্ন লইয়া খেলাধূলাতেই ব্যস্ত রহিলেন। তিনি খাজনা আদায় করেন, তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ প্রজার শোণিত শোষণ করেন, কিন্তু তাহার

যায়। মীরজাফর যেখানে আপনাকে নবাব ভাবিয়া একটু স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে যান, ক্লাইবের শক্তি সেইখানে তাহাতে বাধা দেয়। মীরজাফর এই-রূপে বিড়ম্বিত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যদিও বিধাতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ মানুষ করিয়া সৃজন করেন নাই—তথাপি তিনি মানুষ ত বটেন;—মনুষ্যত্বের যে ক্ষুদ্র অংশটুকু লইয়া তিনি নবাবী করিতেছিলেন, তাহাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, ইংরাজের এত পরাধীন হইয়া কাজ করিলে, দেশের লোকের চক্ষে তাঁহার এত উচ্চ পদ, কেবল দাসত্বাভিনয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বাঙ্গলা হইতে ইংরাজশক্তির উচ্ছেদ করিবার জন্য এক দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফল "বিদেরার" ক্ষুদ্র যুদ্ধ। সাধারণ ইতিহাসে এ কথা বড় একটা প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু "বিদেরার" পরাজয়ের পর, ইতিপূর্ব্বে মীরজাফরের যে অল্প মাত্র স্বাধীনতা ছিল, ইংরাজ তাহাও কাড়িয়া লইলেন।

ক্লাইব ও ফোর্ড, বিদেরার যুদ্ধে মীরজাফরের সংকল্প সমূলে নষ্ট করিলে, তিনি অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে ক্লাইব সাহেব বাঙ্গলা ছাড়িয়া বিলাতে গেলেন। স্বনামখ্যাত অন্ধকূপের হলওয়েল্ সাহেব দিন কতক গবর্ণরী করিলেন। তাঁহার গবর্ণরী করিবার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে বাঙ্গলায় ইংরাজ ও নবাবের যুগ্ম শাসন ক্ষণকালের জন্য ভীষণরূপে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

দিল্লীর সম্রাটগণ আরঙ্গীবের মৃত্যুর পর হইতেই নামমাত্র সম্রাট হইয়া সিংহাসনে বসিতেছিলেন, কিন্তু শাহ আলম, পিতার মৃত্যুর পর, একটু যেন জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। শাহজাদা শাহ আলম্‌ এক দল সৈন্য লইয়া, বাঙ্গালা ও বিহারের কয়েক স্থল দিল্লীর শাসনাধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ণিয়া ও ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানের নবাবেরা তাঁহার রক্তপতাকার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বাদসাহের দলে অনেক লোক জুটিল; শেষে এক দল বর্গী আসিয়া তাহার আরও পুষ্টি করিল। ক্লাইব তখন কলিকাতায় ছিলেন না, কিন্তু কলিয়ার্ড ও নক্স ছিলেন—তাঁহারা বাদসাহ সৈন্যকে দুই এক স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ সালের শীতকালে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, বর্ষার পূর্ব্বে তাহার শেষ হইয়া মিট্‌মাট্ হইয়া গেল।

মীরজাফরের পুত্র মীরণ বজ্রাঘাতে ইহলীলা সম্বরণ না করিলে, হয় তএরূপ

শিক শাসনকর্ত্তারা, বাঙ্গালার নবাবের অধীনস্থ হইলেও, মীরজাফরকে ইংরাজের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি ভাবিয়া, মনে মনে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা যখন শাহজাদার পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তখন মীরণও গোপনে ইংরাজের —এমন কি নবাবেরও—বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। যিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গলার নবাবের প্রধান সেনাপতি, বাদসাহের সহিত তাঁহার চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। তিনিও ত মীরজাফরের পুত্র বটেন! বিশ্বাসঘাতকতার পথে নবাবী করিবার সখটা তাঁহারও না হইবে কেন? কিন্তু ইংরাজ ইহাতে বিভ্রাট দেখিলেন। বিধাতা ইংরাজের পক্ষে অনুকূল;—তাই যেন ২রা জুলাই তারিখে, কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, শিবিরমধ্যেই মীরণ বজ্রাহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। সেরাজউদ্দৌলার নৃশংস হত্যার ফল সেই নিশীথ-নীরব যুদ্ধক্ষেত্রেই ফলিল। মীরজাফরের ন্যায় অসার ব্যক্তির অস্তিত্ব ইংরাজেরা ভুলিয়া গেলেন। মীরণের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে, হলওয়েলের উত্তরাধিকারী হইয়া ভান্‌সিটার্ট কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, ক্লাইব যাহা করিয়া গিয়াছেন—তাহা বজায় রাখিবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এখনও কতকগুলি বাধা বিপত্তি এমনভাবে ধূমায়িত হইতেছে যে, পরে তাহা হইতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারি দিক দেখিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভান্সিটার্ট কর্ণেল কালিয়দ সাহেবকে আনাইলেন। একদিন সেইখানে তাঁহাদের "মন্ত্রণা-সভা" বসিল। হলওয়েল্-প্রমুখ, কালিয়দ প্রস্তাব করিলেন, "মীরজাফরকে মসনদ হইতে নামাইয়া বাদসাহের অধীনে সামান্য সুবাদারি দেওয়া হউক। ইংরাজ, বাদসাহের সহিত পরামর্শক্রমে বাঙ্গলা ও বিহারের দেওয়ানী তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করুন। তাঁহারা রাজ্যের প্রধান রাজস্বসংগ্রাহক হউন, মীরজাফরের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাহা পাওনা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে নবাব তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিভাগ ছাড়িয়া দিন, এবং নবাবের যে সমস্ত অসার সৈন্য আছে, তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া, রাজ্যের রাজকোষ যাহাতে অনর্থক শূন্য না হয়, তাহার চেষ্টা হউক।" বলা বাহুল্য, এই কথা লইয়া সেই কৌন্সিলে মতভেদ উপস্থিত হইল। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অনেকে সম্মতি দিলেন না। যখন ইংরাজ কৌন্সিল এই প্রকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়িল, তখন দৈব মধ্যস্থতা করিয়া, ঘটনা-স্রোত আর এক দিকে ফিরা-

গবর্ণর নবাব-প্রতিনিধিকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রণাগৃহে আনিলেন। এই দূত আর কেহই নহেন, স্বয়ং মীরকাশেম।

মীর মহম্মদ কাশেম আলি খাঁ, বা সকলের পরিচিত মীরকাশেম, নবাব মীরজাফরের জামাতা। মীরণের মৃত্যুর পর তিনিই সকলের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রমাগত ভোগবিলাসে ও নিরাশার মর্ম্মদাহে,ষষ্টি বৎসর অতিক্রম করিয়াই মীরজাফর বার্দ্ধক্যে পড়িয়াছেন। সেই বার্দ্ধক্যে যৌবনের উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির অপরিণামদর্শিতার অনেক জাগ্রত ফল ফলিয়াছে। তখন জীবনই তাঁহার পক্ষে ভার—রাজ্য ত ছার কথা। তাঁহার একমাত্র ভরসা, তাঁহার ঔরসজাত ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক নজুম। মীরকাশেম তাঁহার জামাতা, কিন্তু তিনি সিংহাসনের কেহই নহেন। মীরজাফর যাহাই ভাবুন না কেন, দেশের বড় লোকে—আমীর ওমরাহগণ ও প্রজাসাধারণ, মীরকাশেমের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

১৭৬০ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, মীরকাশেম কলিকাতায় আসেন। ভান্সিটার্ট সাহেব তখন নূতন গবর্ণর হইয়া আসিয়াছেন। ভান্সিটার্ট সাহেবের গবর্ণরী প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্যই যে তিনি অত কষ্টস্বীকার করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ইহা কিছু বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহার অন্তরে এক প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য জাগিতেছিল। বলিতে পারি না, কলিকাতা কৌন্সিলে তাঁহার কোনও প্রতিনিধি ছিল কি না। কেন না, ঠিক উপযুক্ত সময়েই তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া যান।

ইংরাজের সেই দিন মন্ত্রণাসভা বসে। ভান্সিটার্ট সাহেব মীরকাশেমকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন। তিনি তাঁহাকে সেই মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সভায় যে সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তব্য স্থির হইল, তন্মধ্যে মীরজাফরের কথাই অধিক। মীরকাশেম উপযুক্ত অবসর পাইয়া মীরজাফরের শাসনসম্বন্ধে অনেক কথা তুলিলেন। তিনি বুঝিলেন, কলিকাতা-কৌন্সিলের সভ্যগণ সম্পূর্ণরূপে কেনা বেচার জিনিস। তিনি সময় বুঝিয়া উপযুক্ত দর হাঁকিলেন। ২৭এ সেপ্টেম্বর, তাঁহার সহিত কলিকাতা-কৌন্সিলের এক গুপ্ত সন্ধি-পত্র লেখাপড়া হইয়া গেল। তাহার ধারাগুলির মধ্যে ইহাও অন্তর,—"মীরকাশেম নবাব হইয়া ইংরাজদের বাহুরূপে থাকিবেন; ইংরাজের শত্রু তাঁহার শত্রু হইবে। মীরজাফর, বহুমূল্য সম্পত্তি জাইগীর স্বরূপ পাইয়া তাহার উপস্বত্ব হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। মীরকাশেম আবশ্যক হইলে

তাঁহার রাজ্যরক্ষণার্থে ইংরাজের নিকট সৈন্য সম্বন্ধে সাহায্য পাইবেন। সৈন্য-রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য মীরকাশেম কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর, এই তিন পরগণার উপস্বত্ব দিবেন। কোম্পানীর তখন কিছু চুণের প্রয়োজন; মীরকাশেম, শিলেট হইতে তাঁহাদের চুণ আনয়নের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। মীরজাফর যে সমস্ত মণিমুক্তাদি ইংরাজ কোম্পানীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, মীরকাশেম উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সমুদায় খালাস করিবেন। মোগল বাদসাহের সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করিতে হইলে, মীরকাশেম, কোম্পানীর কৌন্সিলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তৎসম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিবেন।" সন্ধিপত্রের এই সকল কথাই প্রকাশ্যরূপে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইল। *

দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রা মূল্যে বাঙ্গলার সিংহাসন ক্রয় করিয়া, মীরকাশেম অক্টোবর মাসের প্রথম দিবসে মুরশীদাবাদ যাত্রা করেন। দুই দিন অপেক্ষা করিয়া ভান্সিটার্ট সাহেবও মুরশীদাবাদে মীরজাফরকে কৌন্সিলের মন্তব্যের কথা বলিবার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করেন। মীরকাশেম দ্রুতগামী বজরায় গিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তিন দিন আগে; সুতরাং তিনি আগে গিয়া মুরশীদাবাদে পৌঁছিলেন।

ভান্সিটার্টকে সহসা মুরশীদাবাদে দেখিয়া মীরজাফরের চমক ভাঙ্গিল।

---

* এতদ্ব্যতীত গোপনে আর একটি কার্য্য-সম্পন্ন হইয়া গেল। এ কথা সাধারণের চক্ষে অপ্রকাশিত রহিল। কোম্পানীর কৌন্সিলের সভ্যগণের সহিত মীরকাশেমের একটা দেনা পাওনার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। সন্ধিপত্রোক্ত সূত্রগুলি ইহারই পরিণামফল। মীরকাশেম মসনদে বসিয়া,—

ভান্সিটার্ট সাহেবকে	... ...	৫,০০০০০	পাঁচ লক্ষ।
হলওয়েল ,,	... ...	২,৭০০০০	দুই লক্ষ সত্তর হাজার।
সমার ,,	... ...	২,৫০০০০	আড়াই লক্ষ।
মাক্ গোয়ার ,,	... ...	২,৫০০০০	ঐ
কর্ণেল কলিয়ার্ড ,,	... ...	২,০০০০০	দুই লক্ষ।
কলিং স্মিথ ,,	... ...	১,৩৪০০০	এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার।
কাপ্তেন ইয়র্ক ,,	... ...	১,৩৪০০০	ঐ
	মোট	১৭৩৮০০০	সতের লক্ষ আটত্রিশ হাজার।

প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এতদ্ব্যতীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতে হইয়াছিল। কলিকাতা কৌন্সিলের কলিয়ার্ড সাহেবই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তিনি প্রথমে অর্থলোভে মীরকাশেমের সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তার পর কলিয়ার্ড বিলাতে চলিয়া যান; সেখানে Vansitart সাহেব তাঁহাকে ঐ

১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, তিন দিন ধরিয়া ইংরাজ গবর্ণর তাঁহার সহিত মতিঝিলে * সাক্ষাৎ করিলেন। কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে মীরজাফর বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিপদ উপস্থিত। তিনি যথোচিত কাতরতা ও বিনয়ের সহিত ভান্সিটার্টের নিকট সিংহাসন প্রার্থনা করিলেন। ভান্সিটার্টও নবাবের কাতরতা ও শোচনীয় ভাব দেখিয়া এত দূর বিগলিত হইয়া উঠিলেন যে, নবাবকে রাজ্যচ্যুত করা তাঁহার অসম্ভব বোধ হইল।

মীরকাশেম ভান্সিটার্টের সহিত আর একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি পূর্ব্বোল্লিখিত স্বত্ব মত কার্য্য না করেন, তাহা হইলে আমি সন্ধিপত্রোক্ত কড়ার গুলির পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিব। নবাব যে আমাকে মন্ত্রিত্ব দিতে চাহিতেছেন, তাহা কেবল স্তোকবাক্য মাত্র। আমি যতদূর অগ্রসর হইবার, তাহা হইয়াছি। প্রত্যাবর্ত্তন এখন আমার পক্ষে অসাধ্য। ইচ্ছা হয়, আপনি মীরজাফরকে মস্‌নদে রাখিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে আমি আজই মুরশীদাবাদ ত্যাগ করিয়া ইহা অপেক্ষা আরও নিরাপদ স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিব।

ভান্সিটার্ট সাহেব দেখিলেন, মীরজাফরকে বজায় রাখিতে গেলে, তাঁহার নিজের স্বার্থ-সাধনের পথে একটা ভয়ানক অন্তরায় উপস্থিত হয়। তদ্ব্যতীত, যে কোম্পানীর তিনি নিমক-ভোজী, সে কোম্পানীও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ইংরাজ-শাসনের প্রথম আমলে যে সকল ইংরাজ এ দেশে আসিতেন, তাঁহারা মনুষ্যহৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে ইংলিশ চ্যানেলের সীমার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, "স্বার্থপরতা" ও "আত্মসুখ" নামক দুইটি নূতন বস্তু সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তাঁহারা অর্থের জন্য যে সমস্ত দুঃসাহসিক ও পৈশাচিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস চিরদিন তাঁহাদের সেই কলঙ্ককাহিনী ঘোষণ করিবে। ভান্সিটার্টও অবশ্য এই প্রবৃত্তির বহির্ভূত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "মীরজাফর" ও "মীরকাশেমে", আমার ও কোম্পানীর কিছু আসে যায় না। যেই হউক না কেন, "কামদুঘ" হইলেই হইল। শোষণ পীড়ন অত্যাচার অবিচার অভিশাপ যাহাই হউক না কেন, যেখানে "অর্থ" সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা আছে, আমাদের সেই দিকেই টলিতে হইবে।" অবশেষে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মীরকাশেমেরই জয় হইল। ভান্সিটার্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া মীরজাফরকে বলিলেন,

"আপনি কাশেম আলি খাঁকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিন। সহজে না দেন, আমরা বলপ্রয়োগে বাধ্য হইব।"

নবাবের সৈন্যদলে ইংরাজ গোলন্দাজ ছিল। নবাব তাহাদের মাহিনা দিতেন। ইংরাজের হুকুমে সেই ইংরাজ সেনা মীরকাশেমের হস্তগত হইল। তিনি গোলন্দাজ ও কতকগুলি সিপাহী লইয়া মতিঝিল বেষ্টন করিলেন। মীরজাফরকে বিবেচনার জন্য ভান্সিটার্ট ২৪ ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়াছিলেন। ১৮ই কাটিল, ১৯এ আসিল, তখনও বৃদ্ধ নবাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, উনিশের প্রভাতরশ্মির সহিত মীরকাশেমের ও ইংরাজের মিশ্র সেনা তাঁহার প্রাসাদ বাহিরে অস্ত্রের ঝণঝণা তুলিয়াছে, তখন ভাবিলেন, তাঁহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার মনে অতীত তিন বৎসরের চিন্তা, বর্ষার মেঘের ন্যায় একে একে ঘন ঘন উদিত হইতে লাগিল। সেই দিন,—যে দিন তিনি সেরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সেই অকৃতাপরাধ অল্পবয়স্ক নবাবকে পলাশীর শিবিরে অভয় প্রদান করিয়াও, পরে সামান্য সিংহাসনের লোভে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন, সে দিন ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। সে দিনও তিনি এমনি করিয়া ইংরাজ ও দেশীয় সেনা লইয়া, এই মতিঝিলের পার্শ্বে এমনি ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইংরাজ সেনার উজ্জ্বল অস্ত্রও লোহিত বর্ণ কোর্ত্তা, ঠিক এই প্রকারে মতিঝিলের গবাক্ষ পথ দিয়া দেখা গিয়াছিল।

আজ তাঁহার পক্ষে সেই দিন। সেরাজ সেই স্মরণীয় দিনে প্রভাতে প্রফুল্লমুখে যখন যুদ্ধযাত্রায় মতিঝিল হইতে বাহির হইয়া পলাশী অভিমুখে ধাবিত হন, পরে সন্ধ্যার পর এই মতিঝিলের পার্শ্ব দিয়া গোপনে তস্করের ন্যায় ছদ্মবেশে পলায়ন করেন, তখন তাঁহার মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, আজ মীরজাফর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কাল সন্ধ্যার সময় তিনি তিন তিনটা সুবার মালিক ছিলেন; বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সমস্ত প্রজার অধীশ্বর ছিলেন; এই বৈজয়ন্তীতুল্য মুরশীদাবাদের রাজকক্ষের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি পথের ভিখারী, ইংরাজের করতলস্থ। যে ইংরাজ একদিন তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া কত উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহারাই তাঁহার মনে কত উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দিতেছে। কিন্তু সেই

ঘটাইয়া সিংহাসন হইতে তাঁহাকে কবরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আজ কি মীরকাশেম তাঁহার নিজের সেরূপ অবস্থা করিতে পারেন না! যে জাতিদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, আত্মীয়দ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী, তাহার পরিণাম আর কি হইবে? কোথায় সেই তাঁহার প্রিয়তম পুত্র মীরণ, যাহার জন্য তিনি এই সোনার সিংহাসন শত সহস্র শোণিত বিন্দুর উপর স্থাপন করিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহার সেই বিলাস ও ভোগ, যাহার জন্য তিনি নিরীহকে নৃশংস ভাবে বিজাতীয়ের বলিমুখে অর্পণ করিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহার সেই বন্ধুত্বাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ, যাহাদের জন্য তিনি নরকের দ্বার নিজহস্তে খুলিয়া নির্ভয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন? অনুশোচনা, অনুতাপ, আত্মগ্লানি, অপমান, বিষাদ, নিরাশা, উন্মাদবিকার,—মীরজাফরকে একবারে মতিঝিলের দ্যুতিময় সুগন্ধিবাসিত স্বর্ণকক্ষ হইতে নরকের নিম্নতর স্তরে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

মীরজাফর যখন দেখিলেন, আর কোন উপায়ই নাই, তখন অগত্যা সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রাণের ভয়ে, নিরাশার উত্তেজনায়, আশঙ্কায়, ভগ্নমনোরথ হইয়া, তিনি তাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র মুরশীদাবাদ হইতে একেবারে সরিবার সংকল্প করিলেন।

মুরশীদাবাদে থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না দুইটি কারণে। প্রথম কারণ, যে সুখভোগ করিয়া দরিদ্র হয়, তাহার পক্ষে দুঃখ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, সেই ক্ষেত্রে—যেখানে সে একবার সুখে কাটাইয়াছে, সেখানে দুঃখের সহিত যাপন করিতে তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, মুরশীদাবাদে থাকিলে অতীত অনুশোচনায় কেবল যে মনস্তাপ বৃদ্ধি হইবে, এরূপ নয়, তাঁহার অদৃষ্টেও যে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায় পরিণাম নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কলিকাতায় আসাই স্থির করিলেন। যে সুখের বাসা তিনি নিজের হাতে গড়িয়াছিলেন, আজ নিজ হস্তে তাহা ভাঙ্গিয়া, চিরকালের জন্য মুরশীদাবাদ ত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজসেনা তাঁহার সেই হেয় জীবনের রক্ষার জন্য সঙ্গীন খুলিয়া তাঁহাকে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিয়াছিল। * ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

---

* কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জন্য কলিকাতায় দুইটি বাড়ী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় চিৎপুর রোডের উপর ঐ দুইটি বাড়ী শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে

সহযোগী সাহিত্য।

রাজনীতি।

চীন ও জাপান।

চীন ও জাপানের যুদ্ধে য়ুরোপের কিছু চিন্তার বিষয় অবশ্যই আছে। কারণ জনরব, রুসভল্লুক নাকি কোরিয়ার প্রতি কিছু লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, আবার কোনও রুসিয়ান সংবাদপত্রও মধ্যে একটা স্বার্থপূর্ণ প্রস্তাবও নাকি তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখনও পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সহানুভূতি চীনের সহিত; "রিভিউ অফ রিভিউস্" সম্পাদক তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তবে "উদীয়মান রবির দেশ" জাপানের ইংলণ্ডে কতকগুলি বন্ধু আছেন; সার এডুইন আর্ণোল্ড তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি "নিউ রিভিউ" পত্রের মারফৎ ইংলণ্ডের সাধারণ মতের বিচারালয়ে জাপানের হইয়া আরজী পেশ্ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্ম দিতেছি।

তিনি বলিতেছেন,—এত দিন পরে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে; এই যুদ্ধ কোনও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সূচিত করিতেছে না এবং যুদ্ধারম্ভের সময় জাপান তাহার সেনাবল ও নৌবল সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের উপযোগী বলিয়াও মনে করে নাই। তবে জাপান সংগ্রামসাগরে সন্তরণপর না হইলে, বিশৃঙ্খল অবস্থায় কোরিয়া প্রথমে চীনের ও তৎপরে ষড়যন্ত্রপরায়ণ রুসিয়ার হস্তগত হইত। জাপানের দোষ কি? জাতীয় ভাবে ধরিতে গেলে ভূগোল জাপান ও কোরিয়ার অদৃষ্ট অবিচ্ছিন্নভাবে একত্র বন্ধন করিয়াছে। স্বত্ব হিসাবে ধরিতে গেলে কোরিয়ায় যে জাপানের অধিকার অন্ততঃ চীনের সমান, তাহার রাজনৈতিক প্রমাণ যথেষ্ট আছে; নৈতিক হিসাবে ধরিতে গেলে জাপানই কোরিয়ায় শৃঙ্খলাস্থাপনের ও ন্যায়রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছে। এই অবস্থায় ইংলণ্ড যাহা করিতেন, জাপানও তাহাই করিয়াছে। জাপান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক; সে সভ্যতা রক্ষারই চেষ্টা করিয়াছে।

জাপানের দোষ নাই।

[illegible] কবিজনোচিত কল্পনাবলে বলিতেছেন যে, চীন ও রুসিয়াই এখন সভ্যতার বিপদ। ইংরাজের রুসাতঙ্ক নূতন নহে। তবে চীনাতঙ্ক আবার মজ্জাগত হইয়া না যায়। [illegible]হার পর তিনি বলিতেছেন, যে কণফুচ নীতিশিক্ষকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ, তাঁহারই বিধানে চীন সমাজ পরিচালিত। তিনি ঘোর সুযোগান্বেষী। এই কঠোর চাইনীস হইতে আশঙ্কা আছে। কনফুচের ধর্ম্মমতের দুই একটি বিধানের বলে, চাইনীসরা আজও বিদেশ গমন করে না, এবং দূর দেশ হইতে চাইনীসের মৃতদেহ তাহার স্বদেশে আনয়ন করা তাহার আত্মীয়দিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই বিধানের ভিন্ন অর্থ করা দুরূহ নহে। সেইরূপ ভিন্ন অর্থ করা হইলেই বন্যার জলের মত সভ্য জগতে চাইনীসরা ছড়াইয়া পড়িবে। এবং সেই পরিশ্রমশীল, বীর, সাহসী, মিতব্যয়ী জাতি তখন সভ্য জগতে ব্যবসায় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইবে।

চীন হইতে আশঙ্কা আছে।

হইয়া পড়িবে। তখন প্রশান্ত মহাসাগরের ইংলণ্ড জাপানের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন সকল জাতির প্রার্থনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"নটিকাস্"।

প্রসিদ্ধ নৌবল-সমালোচক "নটিকাস্," উক্ত পত্রিকায় চীন ও জাপানের নৌবলের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বাস্তবিক ধরিতে গেলে কোরিয়ায় নৌবলের অস্তিত্বই নাই। বিশ্বাসযোগ্য অধ্যক্ষগণ কর্তৃক শৃঙ্খলার সহিত চালিত হইলে চীনের নৌবল জাপানের নৌবলের সহিত সমান হইতে পারে। জাপানের নৌবল যথাসম্ভব পরাক্রমশীল; তিনি একজন জার্ম্মানের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—অষ্ট্রেলিয়ায় ও আমেরিকায় ইংরাজ জাতির ভবিষ্যৎ যেরূপ, এসিয়ায় জাপানের ভবিষ্যৎও সেইরূপ হইবে। তিনি বলিতেছেন যে, যদি অন্য কোনও দেশ মধ্যবর্ত্তী না হয়েন, তবে জাপানের নৌবল শীঘ্রই চীনের নৌবলকে পরাভূত ও দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

হেনরি নরম্যান।

সুলেখক মিষ্টার হেনরি নরম্যান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশ সম্বন্ধে যত জানেন, অল্প সংবাদপত্রলেখকই তত অবগত আছেন। তিনিও এ সম্বন্ধে "কন্‌টেম্পোরারী রিভিউ" পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি জাপানের পাকা পৃষ্ঠপোষক। তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন যে, জাপান ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও আলোক ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক; জাপানের রাজনীতি সভ্যদেশোচিত য়ুরোপীয় ছাঁচে গড়া; তাহার আইনাদিও যথাসম্ভব উত্তম; জাপানে ন্যায়বিচার হয়; জাপানে অপরাধীর শাস্তি দয়ালুজনোচিত এবং জাপানের সমাজ ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সংস্কার ইংলণ্ডের সম্পত্তি। ও দিকে চীন অন্ধকার এবং বর্ব্বরতার পৃষ্ঠপোষক; হাস্যোদ্দীপক কুসংস্কার চীনের বিজ্ঞান; তাহার আইন বর্ব্বরোচিত; সেখানে অপরাধীর শাস্তি ভীষণ; পাপ তাহার রাজনীতি এবং সে অচলস্থির। বর্ব্বরতার সহায় ভিন্ন কে চীনের উন্নতি কামনা করে?

রক্ষণশীল চীন আজও এই পরিবর্ত্তনের তরঙ্গাঘাত উপেক্ষা করিয়া, স্থিরোন্নত শৈলের মত প্রাচীন সভ্যতার শান্ত বক্ষে দণ্ডায়মান; বোধ হয় কেবল চীনই এই প্রবল পরিবর্ত্তনপ্রবাহকে আপনার আচার ও ব্যবহারের সুগঠিত প্রাচীর অতিক্রম করিতে দেয় নাই। কোন্ সভ্যতা অধিক মঙ্গলপ্রদ সে সম্বন্ধে সকলের মত এক নহে। তবে শান্তি যে সংগ্রাম অপেক্ষা প্রার্থনীয়, তাহা বোধ হয় রক্তান্বেষী পিশাচ ভিন্ন আর সকলেই স্বীকার করিবেন; সেই শান্তিই এখন প্রার্থনীয়।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

কোরিয়া।

কোরিয়া।

চীন ও জাপানের মধ্যে পড়িয়া কোরিয়া প্রাচ্য মহাদেশে মহা অশান্তির সূচনা করিয়াছে। বহুদিন শান্তির নিস্তব্ধতার মধ্যে সংগ্রামের সংহারসূচক ভেরীনিনাদ শ্রুত হয় নাই, কিন্তু সহসা সেই শান্তির ছায়াস্নিগ্ধ পথে সংগ্রামের দগ্ধকারী কিরণ নিপতিত হইয়াছে। পশুর ন্যায় মানবগণ পরস্পরকে সংহার করিয়া নররক্তে জননী ধরণীর স্নেহময় বক্ষে আপনাদিগের হিংস্র প্রবৃত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। "ফর্টনাইটলী রিভিউ" পত্রে মিষ্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর তাঁহার কোরিয়ায় ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ হইতে আমরা কোরিয়াদেশের বিবরণের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

কোরিয়ানগণ স্বভাবতঃ অলস ও স্ফূর্ত্তিহীন; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কোনমতেই বোকা নহে। লেখক কোরিয়ায় এমন অনেক লোক দেখিয়াছেন, তাহারা যে কোনও সভ্য দেশে বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। একবার ইচ্ছা করিলে তাহারা যে সকল জিনিসের কথা কখনও শ্রবণ করে নাই, তাহাও সহজে বুঝিতে ও শিখিতে পারে। তাহারা সহজেই ভাষা শিক্ষা করিতে পারে। চীনা বা জাপানীদিগের অপেক্ষা তাহারা বিজাতীয় ভাষা অনেক ভাল উচ্চারণ করিতে পারে।

অধিবাসীগণ।

কোরিয়ার রমণীদিগের ব্যবহার মুগ্ধকর, এবং তাঁহাদের অনেকে রূপলাবণ্যসম্পন্না সুন্দরী। তবে সেই সকল সুন্দরীসন্দর্শন সহজে সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কারণ তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনী এবং রাস্তায় বাহির হইতে হইলে শ্বেত বা সবুজ ঘোমটায় বদন আবৃত করিয়া বাহির হয়েন। তাঁহাদিগের বেশ ভূষার একটু বিশেষরূপ বর্ণনা আবশ্যক। তাঁহারা খুব ঢিলা পায়জামা ব্যবহার করেন; মোজাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোজা পাজামায় বাঁধা হয়। উপরে একটি সার্ট—কোমরের উপরে তাহা বাঁধা থাকে—তাহার উপর একটা শ্বেত, লোহিত বা সবুজ জ্যাকেট; কিন্তু তাহা এতই খাটো যে, তাহাতে বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বই অনাবৃত থাকে। ইহাই আশ্চর্য্য, কারণ কোরিয়ায় বেশ শীত পড়ে।

রমণী।

সিয়োল (কিক্কিতাও) কোরিয়ার রাজধানী। সমস্ত কোরিয়ার মধ্যে কেবল সেখানেই বিস্তৃত রাস্তা দৃষ্ট হয়। যে রাস্তা সহরের মধ্য দিয়া রাজার প্রাসাদে গিয়াছে, সেটি অপরিমিত চওড়া। সেটি এতই চওড়া যে, সেই রাস্তার মধ্যে দুই সারি খোড়ো ঘরে দোকান বসে; কাজেই একটি রাস্তা তিনটি রাস্তায় পরিণত হয়। রাজা যে দিন নগরের বাহিরে পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধি দর্শন করিতে বা চীনের রাজদূতের সহিত দেখা করিতে প্রাসাদ হইতে বাহির হয়েন, সে দিন সেই সমস্ত ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। প্রাসাদটি সুন্দর—সেখানে একটি হ্রদমধ্যে স্থাপিত গৃহে গ্রীষ্মকালে রাজা বিশ্রামকাল যাপন করেন। রাজা যেদিন প্রাসাদের বাহিরে গমন করেন, সে দিন সাজসজ্জার আর অন্ত থাকে না। পথপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সৈনিকগণ দণ্ডায়মান হয়।

রাজধানী।

বর্ম্মপরিহিত বর্ষাধারী সৈন্যদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন দর্শক কোনও অতীত যুগের স্বপ্ন দেখিতেছেন—সৈন্যদিগের মস্তকে বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ টুপি—তাহা হইতে লোহিতবর্ণ থোপা স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আবার বর্ষাকালে সেই টুপির সহিত ছাতা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অশ্বারূঢ় সৈন্যগণ আজও সেই প্রাচীন পরিচ্ছদ পরিধান করে; পদাতিকগণ দেশীয় ও য়ুরোপীয় মিলাইয়া একরূপ বেশ পরিধান করে, তাহা বেশ হাস্যোদ্দীপক। পদাতিকগণ সকল প্রকার বন্দুকই ব্যবহার করে—অতিপ্রাচীন হইতে হাল-ফেসানের সকল প্রকার বন্দুকই তাহাদের ব্যবহার্য্য। সহরের মধ্যস্থলে একটি পর্ব্বত; তাহার উপরে একটি সাঙ্কেতিক গৃহ আছে—সেখান হইতে আলোক জ্বালিয়া ঐরূপ অন্যান্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। এই সহজ উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যেই টেলিগ্রাফের মত রাজ্যের সকল অংশে সংবাদ প্রেরিত হয়। তবে ইহাতে এই অসুবিধা যে, রাত্রিকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে সংবাদ প্রেরণের সুবিধা নাই।

সৈন্য।

সিয়োল, চিমালপো বন্দর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। জাপানীরা ইহাকে জিন্‌সেন ও চীনারা জিঙচেয়াঙ্ বলে। চিমালপোকে কোরিয়ার বন্দর বলা সঙ্গত কি না সন্দেহ, কারণ ইহা কোরিয়াও অবস্থিত বটে; কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই জাপানী ও চাইনীস্। শস্যের ব্যবসায়ের দুই দেশ-

চিমাল পো।

ডাকঘরের ভার জাপান ও টেলিগ্রাফের ভার চীন বিভাগ করিয়া লইয়াছে। কোরিয়ার সমস্ত সহর প্রাচীরে বেষ্টিত। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সহরের দ্বার মুক্ত থাকে।

কোরিয়া লইয়া জাপান ও চীনের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইলেই য়ুরোপ ও এসিয়ার মঙ্গল।

বিবিধ।

নেপোলিয়ন ও প্রেম।

আগষ্ট মাসের ফরাসী সাময়িক সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "Revue de Paris" পত্রে প্রকাশিত নেপোলিয়নের প্রেম সম্বন্ধে সংস্কার। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন ইহা লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি লেফটেনাণ্ট মাত্র। প্রসিদ্ধ মিষ্টার মেসন বলেন যে, এই প্রবন্ধ জাল নহে এবং যাঁহার সহিত কথোপকথনছলে এই মত ব্যক্ত হইয়াছিল, তিনি সে সময় নেপোলিয়নের একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কথোপকথন এইরূপ হইয়াছিল ঃ—

বন্ধু। প্রেম কি?

নেপোলিয়ন। আমি প্রেমের সংজ্ঞা চাহিতেছি না। আমি আপনি একবার প্রেমে পড়িয়াছিলাম; এবং সে সময়ের স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে সমুজ্জ্বল; কাজেই আমি, প্রেমের সংজ্ঞা চাহি না; এরূপ সংজ্ঞা, অর্থ পরিষ্কার না করিয়া বরং জটিল করে। আমি মানবহৃদয়ে প্রেমপ্রবৃত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রেম-প্রবৃত্তি মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকর, এবং ব্যক্তিগত সুখের বিনাশক। প্রেম কেবল মন্দে পূর্ণ এবং মানবহৃদয় হইতে এই প্রবৃত্তি দূরীভূত করিলে মঙ্গলময় বিধাতা মানব জাতির প্রভূত উপকার করিবেন।

বন্ধু। প্রেম ভিন্ন আমার পক্ষে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

নেপোলিয়ন। অমন ক্রোধপূর্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়ো না। তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, এই কোমল প্রবৃত্তির দাস হইয়া অবধি তুমি লোকের সহিত মিশিতে চাহ না কেন? তুমি তোমার কার্য্য, স্বজন এবং বন্ধুদিগকে অবহেলা করিতেছ কেন? তুমি সারা-দিন একাকী ভ্রমণ কর আর তোমার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাতের সময়ের জন্য অস্থির ভাবে অপেক্ষা কর। যদি এখন সহসা তোমাকে তোমার স্বদেশরক্ষার্থ যাইতে আদেশ করা হয়, তবে তুমি কি করিবে? তুমি এখন কোনও কর্ম্মের নও। অন্যের ব্যবহার যাহার উপর সম্পূর্ণভাবে প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছে, অন্যের জীবন আর কি তাহার [illegible] করা যায়? যাহার আপনার কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, কোনও রাজনৈতিক গোপনীয় সংবাদ কি তাহাকে বলা সম্ভব? যে প্রবৃত্তি মানবকে এমন পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, আমি সে প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করি। একটি দৃষ্টি, একবার করস্পর্শ, একটি চুম্বন—তাহার সহিত তুলনায় তোমার স্বদেশ, তোমার বন্ধুবর্গ কিছুই নহে? এখন তোমার বয়স কুড়ি বৎসর, তুমি হয় তোমার কার্য্য পরিত্যাগ কর, নয় উপযুক্ত দেশবাসীর মত কার্য্য কর। যদি তুমি শেষোক্ত পথ অবলম্বন কর, তবে তোমাকে দেশের জন্য সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, কাজের লোক হইতে হইবে, এবং দেশের আবশ্যক হইলে অন্যান্য কার্য্যও করিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার পুরস্কার কত প্রভূত হইবে। সময় তোমার জন্য স্থির হইবে, কারণ তোমার বার্দ্ধক্য তোমার স্বজাতীয়দিগের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে বেষ্টিত রহিবে। কিন্তু এখন তুমি রমণীর দাস মাত্র।

বন্ধু। তুমি কখন প্রেমে পড় নাই।

প্রেম ধর্ম্মপথে লইয়া যায়? প্রেমপ্রবৃত্তিই ত ধর্ম্মপথে প্রতিপদে বিষম বিঘ্ন। সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের পর হইতে তুমি কি প্রেমের আনন্দ ভিন্ন অন্য আনন্দের কথা ভাবিয়াছ? প্রেম তোমাকে ভাল বা মন্দ যে দিকে লইবে, তুমি সেই দিকে যাইবে; কারণ প্রেম ও তুমি এখন এক। যত দিন তোমার মনের ভাব এইরূপ থাকিবে, তত দিন তুমি কেবল প্রেম কর্ত্তৃক চালিত হইবে। কিন্তু এ কথা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, রাজ্যের জন্য কার্য্য করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

ইহার পর নেপোলিয়ানের প্রেমসম্বন্ধে সংস্কার এইরূপ কঠোর ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার বন্ধুর মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে যে, তিনি কখন প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রকৃত প্রেম নিতান্ত সুলভ নহে—সত্যই "পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন।" প্রেমই মর জগতে অমর জগতের আস্বাদন। যদি সেই প্রেমের উপর তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত হইত। তাহা হইলে হয় ত আমরা নেপোলিয়নকে আর এক রকম দেখিতে পাইতাম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। চতুর্থ বর্ষ; প্রথম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সাধনার" সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পাদক পরিবর্ত্তনের জন্য, "সাধনার" বিশেষ কোনও সুলক্ষণ হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। তবে দেখা যাইতেছে,—নূতন সম্পাদক সমালোচনার বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় দুইটি সমালোচনা প্রবন্ধ ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র "গ্রন্থসমালোচনা" আছে। বর্ত্তমান সম্পাদক, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন শক্তিশালী সুকবি; তাঁহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি, সৌন্দর্য্যদৃষ্টি, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাহিত্যে অনুরাগ ও বঙ্গ সাহিত্যে প্রভূত প্রতিষ্ঠা, আছে। তিনি যদি কর্ত্তব্যবোধে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং অবাধে ও অসঙ্কোচে সেই ব্রত পালন করেন, তাহা হইলে, বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর হয়। তাঁহার সকল সমালোচনা সাধারণের মনোনুগত ও প্রীতিপ্রদ হইবে, এমন আশা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় এক জন ক্ষমতাশালী লেখকের লেখনী সমালোচনায় নিযুক্ত থাকিলে যে প্রভূত উপকারের আশা আছে, তাহা রোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। নূতন সম্পাদক, লেখকগণের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন। এবারকার "সাধনার" সর্ব্বপ্রথমে একটি কবিতা,—"সাধনা"। কবিতাটির ভাষা ও ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই লেখককে চিনিতে পারিবেন,—অতএব এ আত্ম-গোপনপ্রথা অনাবশ্যক মনে করি। কবিতাটি ভাল হয় নাই;—লেখক যেন পুনর্ব্বার তাঁহার শৈশব-সঙ্গীত স্মরণ করিয়াছেন। মোটের উপর, কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "প্রায়শ্চিত্ত" একটি ক্ষুদ্র গল্প। এই গল্পের প্রথমাংশ যেরূপ মনোহর, উপসংহার সেরূপ হয় নাই। তথাপি, গল্পটি মিষ্ট ও পাঠযোগ্য হইয়াছে। "পঞ্জিকার ভ্রম" একটি জ্যোতিষ-বিষয়ক প্রবন্ধ। "সুবিচারের অধিকার" একটি সাময়িক প্রবন্ধ। আশা করি, প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন। কেন না, লেখক এই প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। "বোম্বায়ের রাজপথ" প্রবন্ধে লেখক বেশ একখানি ছবি আঁকিয়াছেন। "কাব্যের তাৎপর্য্য" প্রবন্ধে, সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা, বিতর্ক আছে। "কেরাণী" একটি হাস্যরসপূর্ণ সুমিষ্ট কবিতা।

এ ধরণের রচনা, এ দেশে নূতন। মানুষ দিনরাত বড় বড় ভাব ও চিন্তার বোঝা বহিয়া বেড়াইতে পারে না। মাঝে মাঝে, মনের বিশ্রাম এবং অনায়াস প্রসাদও আবশ্যক। "কেরাণী"র মুখ্য উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সুমিষ্ট ও সুপথ্য হাস্যরসের অবতারণা; "কেরাণীর" কবি,—সে বিষয়ে সফল হইয়াছেন। আমরা "কেরাণীর" কাহিনী পড়িতে পড়িতে হাসিয়া বাঁচিয়াছি,—বাঙ্গলা মাসিক পড়িতে বসিয়া বহুদিন এমন সৌভাগ্য উপভোগ করা হয় নাই। "কেরাণীর" লেখক সাহিত্য-সেবীদের প্রিয় বয়স্য হইবেন। "ফুলজানি" ও "আর্য্যগাথা," দুই খানি গ্রন্থের দুইটি স্বতন্ত্র সমালোচনা। সমালোচনার সমালোচনা, এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিপ্রেত নহে। এই সংখ্যায়, "বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভ" ও "স্বরলিপি"ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপির গানটির বিষয়—"ভারত-জাগানো";—কিন্তু নব্যবঙ্গের কবিগণের উৎকট উচ্ছ্বাসের কল্যাণে, ইতি-পূর্ব্বেই এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট "অরুচি" জন্মিয়াছে। বর্ত্তমান গানেও রুচিপরিবর্ত্তনের আশা দেখিলাম না।

ভারতী। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বাবিলোনীয় জ্যোতিষীগণ" মন্দ নহে। লেখক যদি আরও সাবধানে ভাষার জটিলতা দোষ পরিহার করেন ত ভাল হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "গল্প ত অল্প—" একটি রহস্যপূর্ণ নক্সা। রচনাটি বেশ পরিপাটী হইয়াছে। "চক্র" এবারও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ" একটি চিন্তাপূর্ণ উপাদেয় সন্দর্ভ; এবার দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক 'বাবু-ভীতি'-চিকিৎসকের "বাবু-ভীতি বা বাবুফোবিয়া" রহস্যরচনা—তেমন সফল বলিয়া বোধ হইল না। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামীর "কবি কীর্ত্তিবাস" একটি সমালোচনা। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "পার্শি সম্প্রদায়" একটি সংকলিত প্রবন্ধ। ইহাতে বিশেষ নূতন কথা কিছু দেখিলাম না। "আলোচনায়" শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 'নিছনি' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করিতেছেন। "উদ্ভিজাণু—ব্যাকটিরিয়া" শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এরূপ প্রবন্ধ বর্ত্তমান সময়ের অত্যন্ত উপযোগী। এই উপলক্ষে একটি কথা বলা আবশ্যক;—বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক, এক্ষণে সেরূপ হইতেছে না। এই সময়ে এ দোষের পরিহার না করিলে, বাঙ্গলা ভাষার বৈজ্ঞানিক শাখা ভবিষ্যতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আশা করি, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকগণ, এ বিষয়ে আরও অবহিত হইবেন। "শকুন্তলা" শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটি প্রশংসাযোগ্য নহে। মিষ্ট কথা ও সাধারণ 'মিল'। কবিতাটিতে আর কিছু পদার্থ নাই। "কেমনে বুঝিবে?" ও "মালা" আর দুইটি কবিতা। এ দুটি সম্বন্ধেও ঐ কথা। "কার্লো" শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন"—হিমালয়ভ্রমণের বিবরণ। কত দিনে শেষ হইবে?

প্রাচীন রাজধানী
পুণ্ড্র (পাঁড়ুয়া) এবং গৌড়
নগর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশের
অবস্থানসূচক মোটামুটি নক্সা।
জেলা পূর্ণিয়া
জেলা দিনাজপুর
বরেন্দ্রভূমি (বরীন্দ)
জেলা সাঁওতাল পরগণা
জেলা মুর্শিদাবাদ
জেলা রাজসাহী
হায়াৎপুর
গঙ্গা
মহানন্দা নদী
ব্রাহ্মণডাঙ্গা
পালখুন দিঘী
পুণ্ড্র
শ্রীরগঞ্জ
রাঙ্গামাটী
কালিন্দী নদী
মানিকচক
বল্লালসেনের রাজবাটী
মালদহ
মোরগ্রাম
মাধাইপুর
ইংরেজবাজার
সাগর দিঘী
রাজমহল
ভোলাহাট
গৌড়
মরা গঙ্গা
ভাগীরথী
কানসাট
শিবগঞ্জ
দিনাজপুর যাইবার পথ
গোদাগাড়ী
পদ্মা নদী
রামপুর বোয়ালিয়া
ভগবানগোলা
জঙ্গীপুর

"লক্ষ্মণাবতী।"

প্রাচীন-বঙ্গের সমাধিস্থান যদি কাহারও দেখিবার সাধ থাকে, তবে তাঁহাকে মালদহ জেলায় আসিতে হইবে।

যে ভূখণ্ডের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গলা, আমরা বঙ্গশব্দে সেই ভূভাগকেই বুঝি। সেই ভূখণ্ডের "বঙ্গ" এই নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কালিদাসের পূর্ব্বে কোনও গ্রন্থে বঙ্গ এই নাম দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কালিদাসের সময়ে বঙ্গের পূর্ব্বাংশের নাম ছিল সুহ্মদেশ। বোধ হয়, এই সুহ্মদেশ হইতে পরবর্ত্তী "সুহ্মতট" বা "সমতট" শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। "পুণ্ড্র-দেশ" এই নাম বঙ্গ অপেক্ষাও প্রাচীন; কেন না, ঐতরেয়ব্রাহ্মণেও পুণ্ড্রের নাম শুনা যায়। কীকট বা মগধের পশ্চিমাংশে আধুনিক ভোজপুর নামক প্রদেশে বিশ্বামিত্র ঋষির বাসস্থান ছিল, ইহা কিম্বদন্তী, রামায়ণের বর্ণনা ও ঋগ্বেদ মিলাইয়া দেখিলে জানা যায়। বিশ্বামিত্রের কোনও কোনও পুত্র পিতৃদ্রোহ অপরাধে স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া পুণ্ড্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এই ইতিহাস ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই। তাহাতে পুণ্ড্র যে অতি প্রাচীন রাজ্য, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। মহাভারতে এবং মনুসংহিতাতে পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে।

এই প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের যাহাতে সুবোধ হইতে পারে, তজ্জন্য ইহার শেষভাগে একটি মানচিত্র প্রদত্ত হইল। * এই মানচিত্রে গঙ্গা ও মহানন্দা-

* ১৮৯২ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসের ৬ই হইতে ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত অমৃতি নামক স্থানে শিবিরে অবস্থানকালে এই নক্সা অঙ্কিত হইয়াছিল। ইংরেজবাজার হইতে রাজমহলের পথে ইংরেজবাজারের পশ্চিমে ৬ মাইল দূরে সোনাতলা নামে গ্রাম; এই গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অমৃতি। সোনাতলার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একটি জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমিখণ্ড, উত্তর দক্ষিণে লম্বাভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই ভূমিখণ্ডের উপর দিয়াই রাজমহল যাইবার পথ। সোনাতলার নিকটে এই ভূমিখণ্ডের নাম "সোনাতলার কাঠাল"। অনেক প্রাচীন কৃষকের মুখে শুনিলাম যে, এই "কাঠাল" পূর্ব্বে গৌড়নগরের অন্তর্গত ছিল, এবং ইহার পশ্চিম অংশে বরাবর নদী ছিল। কাঠাল বরাবর উত্তর দিকে কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরাংশের কাঠালকে "পিছলীর কাঠাল" বলিয়া স্থানীয় লোকে বর্ণনা করিল। এই কাঠালের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কালিন্দীতটে [illegible]ঙ্গারামপুর নামক স্থানে প্রাচীন গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান। স্থানীয় অনেক পুরাতন লোকের বিশ্বাস, এবং তাহারা তাহাদের পিতা পিতামহ হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, পিছলীর কাঠালে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী ছিল। আমি এই কাঠালের

নদীর বর্ত্তমান সঙ্গমস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। মহানন্দানদীকে বঙ্গের পশ্চিম সীমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আজিও মহানন্দার পশ্চিমাংশের গ্রামবাসীরা পূর্ব্বপারের গ্রামবাসীদিগকে বাঙ্গাল এবং তাহাদের দেশকে বাঙ্গলা বলে। মহানন্দার পূর্ব্বভাগে অধিকাংশই বাঙ্গলাভাষী কোচ, পলী

মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, ইহার প্রায় সকল স্থানেই মৃত্তিকার মধ্যে রাশি রাশি ইষ্টক নিখাত। "সোনাতলা কাঠালের" পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়াইলে, চড়া পড়িয়া বুজিয়া যাওয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছি বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কাঠালের নীচেই "দিয়ারা"। অমৃতির উত্তর-পূর্ব্বে কানাইপুর গ্রাম, তাহারই পূর্ব্বাংশে কাঠালের যে স্থান গোপীনাথপুর নামে অভিহিত, তথায় আমি একটি লম্বা খাত দেখিলাম। শুনিলাম, এই খাত দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ লম্বা এবং কালিন্দীতে গিয়া পড়িয়াছে। গোপীনাথপুরে কাঠালের মধ্যেই অপর প্রান্ত শেষ হইয়াছে। এই খাতের পার্শ্বেই ইষ্টকপরিপূর্ণ ভূমি।

কানাইপুরের ধঁতু মণ্ডল নামক নাগরজাতীয় ৭২ বৎসর বয়স্ক এক প্রাচীন কৃষক গল্প করিল যে, একদা কতকগুলা ডাকাইতে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী লুণ্ঠনের জন্য গোপীনাথপুর হইতে সুরঙ্গ কাটিতে আরম্ভ করে; কিন্তু ঠিক রাজবাটীতে সুরঙ্গ তুলিতে না পারিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া কালিন্দী-তীরে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। ডাকাইতেরা এইরূপে বিফলমনোরথ হইল। সেই সুরঙ্গ এখানে খাতের আকারে বর্ত্তমান। ধঁতু আপনার বৃদ্ধপিতামহ, যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বৃদ্ধাবস্থায়—যখন ধঁতুর বয়স ১২ বৎসর—তখন মরিয়াছে, তাহার নিকটে এবং আরও অনেক প্রাচীনের মুখে এই সুরঙ্গ কাটার গল্প শুনিয়াছে।

ফলতঃ, এই খাত বর্ত্তমান মালদহ নগরের সর্ব্বরী নামক পল্লীর উভয় পার্শ্বে যে লম্বা ক্যানালের মত খাত দেখা যায়, তাহার সদৃশ। এই খাতের মাটিতে ইষ্টক নির্ম্মাণ হইত, এবং খাতের পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণীর পায়খানা সকল ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বৎসর বৎসর কালিন্দীজলে সেই মল ধৌত হইত।

গোপীনাথপুরের কাঠালের মধ্যে এক স্থানে একটি প্রস্তরস্তম্ভ এবং তাহার নিকটে মুসলমানদের কবরের চিহ্ন বর্ত্তমান। এই স্থানকে "পীর নগরীর" স্থান কহে। নগরী, বা নেগোরী নামক মুসলমানপীর, কোন এক সময়ে এই স্থানে ছিলেন।

কালিন্দী হইতে মহদিপুর পর্য্যন্ত বরাবর কাঠালের উপর দিয়া ফুটপাথ আছে। বন্যার জলে এই কাঠাল কোন কালেই নিমগ্ন হয় না। বর্ষায় যখন চারিদিকের ভূমি জলমগ্ন হইয়া যায়, তখনও এই কাঠাল দিয়া মহদিপুর পর্য্যন্ত বরাবর হাঁটিয়া যাওয়া যায়।

এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান কোন কোন স্থানে আবাদ হইতেছে ও হইয়াছে; কিন্তু লোকে ইহার মধ্যে বাস করে না। ইহার হাওয়া ভাল নয় ব'লে। ফলতঃ সকলেই বলে, এক সময়ে বড় বড় লোক এখানে বাস ছিল, এবং ইহা সহর ছিল। ধঁতু কহিল, "হুজুর। এ সব

রাজবংশী ও মুসলমান জাতির বাস। কিন্তু পশ্চিমপার হইতে ভাষা বিগড়াইয়াছে দেখা যায়। এ পারেও যে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত নাই তাহা নহে, কিন্তু সাধারণ নাগর, চাঁইমণ্ডল, ধানুক, গণেশ ইত্যাদি উপাধিধারী লোকেরা খোট্টাই-মিশ্রিত বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করে। এই সকল লোকের যাহা চলিত ভাষা, তাহা অধিক পরিমাণে মৈথিলী-মিশ্রিত। এই ভাগের বাঙ্গলা স্কুলেও, বিশেষতঃ উত্তর বিভাগে, ছেলেরা যখন বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়ে, তখন তাহাদের উচ্চারণ বিকৃত বোধ হয়। তাহাদের মাতৃভাষা কি অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাহা মৈথিলীর অপভ্রংশ। এই জন্য মহানন্দা নদীকেই বাঙ্গলার সীমা বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

এই নদী দার্জিলিঙ্গ জেলার হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ী জেলার পশ্চিমভাগ দিয়া পূর্ণিয়া জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং তথা হইতে বক্রভাবে মালদহ জেলার কিয়দ্দূর উত্তরাংশে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে উত্তর দক্ষিণে মালদহ জেলাকে প্রায় মাঝামাঝি দ্বিখণ্ড করিয়া অবশেষে রাজসাহী জেলার সীমায় গোদাগাড়ী নামক স্থানে পদ্মায় মিশিয়াছে।

কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে গঙ্গার গতি এক্ষণকার সময়ের মত ছিল না—অতিশয় বিভিন্ন ছিল। এক্ষণে দেখা যায়, মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে পূর্ণিয়ার সীমার নিকট হায়াতপুর নামক গঞ্জের সন্নিকট পর্য্যন্ত গঙ্গানদী পূর্ব্ববাহিনী থাকিয়া ঐখানে দক্ষিণ দিকে বক্র হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই হায়াতপুরের সন্নিকটে হয় ত মূল গঙ্গাস্রোত, না হয় গঙ্গার একটি প্রবল শাখা পূর্ব্বমুখেই প্রবাহিত থাকিয়া, এক্ষণে যেখানে পীরগঞ্জ নামক গ্রাম অবস্থিত, তথায় মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই পীরগঞ্জের অতি নিকটে, মহানন্দার পূর্ব্বপারে, প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের চিহ্ন দেখা যায়। এই স্থানে পালখনদিঘী বা রায়থাঁদিঘী নামক একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। ইহা উত্তর দক্ষিণে লম্বা, তাহাতে হিন্দুর খাত বলিয়া সহজেই বুঝা যায়। ইহার দক্ষিণ তীরে কনকচম্পার জঙ্গল মধ্যে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। পুণ্ড্রনগর এক্ষণে "পাঁড়ুয়ার কাঠাল" অর্থাৎ পাঁড়ুয়ার জঙ্গল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাষা কথায় পুণ্ড্র শব্দ পাঁড়ুয়া এই আকার ধারণ করিয়াছে। গঙ্গা ও মহানন্দার প্রাচীন সঙ্গমস্থানে অবস্থিত থাকায়, এই পুণ্ড্রনগর এক সময়ে অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছিল। পুণ্ড্রনগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রদেশ

পুণ্ড্রক বলিয়া উল্লিখিত হইত। এক্ষণে পুণ্ড্র শব্দ ভাষায়—"পুঁড়া" হইয়াছে। এবং পুঁড়ারা একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মালদহ জেলায় পুঁড়া-জাতির লোকের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় নয় সহস্র।

আমি কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিয়াছি,—কোথায় দেখিয়াছি, তাহা ঠিক মনে পড়িতেছে না,—(হয় ত আমাদের পাঠকদের মধ্যেও কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন) যে, পুণ্ড্রের "চন্দেল" এই এক নামান্তর ছিল। বাঙ্গলা দেশের যে সকল অধিবাসী এক্ষণে "পোদ" বা "চণ্ডাল" বলিয়া উল্লিখিত হয়, ইহারাও পুণ্ড্র বা চন্দেলজাতীয় বলিয়াই আমার বোধ হয়। পুঁড়া ও পোদ এক জাতি বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু আচারব্যবহার, ভাষা ও আকৃতিতেও পূর্ব্ব বাঙ্গলার চণ্ডালের সহিত পোদজাতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখি। আমার বোধ হয়, আমাদের সংস্কৃতভাষী পণ্ডিতমহাশয়েরা "চন্দেল" এই দেশীয় নামকে সংস্কৃত "চণ্ডাল" বলিয়া গোল বাধাইয়াছেন। চণ্ডালেরা আপনাদিগকে ভুলিয়াও চণ্ডাল বলে না; তাহারা আপনাদের প্রাচীন প্রভুত্ব স্মরণ করিয়া শূদ্রজাতির সকল লোকের মধ্যে আপনাদের উৎকর্ষ খ্যাপন জন্য আপনাদিগকে "নমশূদ্র" বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসে।—ফলতঃ, পুণ্ড্রনগরের দক্ষিণে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে আজিও একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম চাঁদলাই পরগণা। এই পরগণার কিয়দংশ ভূমি রাজসাহী ও দিনাজপুরের মধ্যে পড়ে। আমি দেখি নাই, কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, চাঁদলাই পরগণার মধ্যে চাঁদলাই নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; তথায় প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সম্ভবতঃ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নামান্তর যে চন্দেলদেশ, তাহারই কিয়দংশ আজিও চাঁদলাই পরগণা বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

পুণ্ড্রনগর হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত ভাগীরথীতীরে পুণ্ড্র বা চন্দেলজাতির (আধুনিক পুঁড়া, পোদ ও চন্দেলজাতির) আধিপত্য ছিল। মালদহ হইতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ পরগণা পর্য্যন্ত ভাগীরথীতীরে এই জাতির লোক আজিও সমধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

গঙ্গার সহিত সাগরসঙ্গমে পুণ্ড্রদের শাসিত ভূখণ্ড শেষ হইলেই, তাহার অপর পারে মেদিনীপুর জেলার কাঁথী মহকুমায় উড্রদের শাসিত ভূখণ্ডের আরম্ভ। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ "পুণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়া" ইত্যাদি যে শ্লোক তৎকালীন আর্য্য উপনিবেশের সীমা নির্দ্দেশ করে, তাহাতেও পুণ্ড্র ও উড্র রাজ্য পাশাপাশি থাকা শুনা যায়।

এই প্রাচীন ও বিস্তীর্ণ পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রনগরী এক্ষণে পাঁড়ুয়ার কাঠালে পরিণত। গৌড়ে পালবংশীয় রাজাদের প্রাদুর্ভাব হইলে,—পুণ্ড্রবর্দ্ধন পালেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

কালবশে গঙ্গাস্রোত পীরগঞ্জে মহানন্দার সহিত না মিলিয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া সরিয়া এক্ষণে মালদহ নগরের নিম্নে আসিয়া মিলিয়াছে। প্রাচীন গঙ্গা-স্রোত এক্ষণে পুথুরিয়া নদী নামে আখ্যাত। স্থানে স্থানে প্রাচীন গঙ্গাগর্ভ এই প্রদেশে জলাভূমি বা বিল অর্থাৎ হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে যে গঙ্গাস্রোত মালদহ নগরের নিম্নে মহানন্দার সহিত মিলিত, তাহার স্থানীয় নাম কালিন্দী। ইহাকে কেহ কেহ কালিন্দীগঙ্গাও বলে। গঙ্গা এইরূপে সরিয়া আসিলে, এক্ষণে কালিন্দীর একপারে যেখানে পিছলীর কাঠাল ও গঙ্গারামপুরের কাঠাল, ও অপর পারে শৌলপুর গ্রাম,—এইখানে পালবংশীয় রাজাদের আমলে একটি নূতন নগরের পত্তন হয়, এবং তাহা "গৌড়" * এই নামে বিখ্যাত হয়। প্রাচীন পুণ্ড্রে বাণিজ্য ও গতায়াতের অসু-বিধা, কিম্বা উক্ত নগর নদী সরিয়া গেলে অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ায়, বোধ হয়, এই নূতন রাজধানীর উৎপত্তি হইয়াছিল।

গৌড়নগর বলিলে এক্ষণে ইংরাজবাজার নগরের তিন মাইল দক্ষিণে আরম্ভ করিয়া বহুদূরব্যাপী গড়বেষ্টিত যে ভূভাগে রাশি রাশি পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয়ের ভিটাবাড়ীর এবং মসজীদ ও রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, সচরাচর লোকে তাহাকেই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু এই গৌড়কে "মুসলমান গৌড়" বলা উচিত। পালবংশের ও সেনবংশের আমলে গৌড়নামে যে রাজধানী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তাহা ইহার উত্তরে কালিন্দীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, কালিন্দীর সন্নিকটে পিছলী গঙ্গারাম-

---

* অতি পুর্ব্বকালে অযোধ্যার একাংশকে গৌড়দেশ বলিত। পাণিনিসূত্রে যে গৌড়দেশের উল্লেখ আছে, তাহা আমার বোধ হয় এই গৌড়। গৌড়দেশীয় রাজারা কালে পূর্ব্বাভিমুখে রাজ্যবিস্তার করিলে, অযোধ্যা হইতে বাঙ্গলার সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তরতীরস্থ সমগ্র ভূভাগই গৌড়দেশ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ভূভাগে একদা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গৌড়রাজ্য থাকায়, তাহারা পঞ্চগৌড় ও তাহাদের রাজারা পঞ্চগৌড়াধিপ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। পালবংশের প্রথম রাজারা এই সমগ্র গৌড়েরই রাজা ছিলেন, কিন্তু শেষাশেষি পাল রাজারা বেহারের কিয়দংশ ও বাঙ্গলা দেশমাত্র দখল করিতেন। বোধ হয়, এই সময়েই মালদহের গৌড়ের উৎপত্তি।

পুরে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী ছিল। পরে প্রমাণান্তরের দ্বারা এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিব। ফলতঃ, এক্ষণে ইংরাজবাজার নগরের দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড গড় দৃষ্ট হয়, এটি পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধায়ীদের বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। এই গড়ের একপ্রান্ত মহানন্দার পশ্চিমতীরে গিলাবাড়ী নামক গ্রামে শেষ হইয়াছে। তথা হইতে ইংরাজবাজারের সংলগ্ন মহেশপুর গ্রামে এই গড় আসিয়াছে। এই স্থানে কোথাও ইহাকে শিকারতলীর গড়, কোথাও বা চাঁদমুনির গড় বলে। পরে মালদহের জেলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিক হইয়া পূর্ব্বমুখে গড়টি সিঙ্গতলা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এইখানে গৌড়রোড্ গড় ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর, হাথিমারি ও বাঘবাড়ী গ্রাম দিয়া যেখানে এই গড় চলিয়া গিয়াছে, তথায় গড়ের সংলগ্ন রাজা বল্লালসেনের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ পরিদর্শিত হয়। তাহার পর গড়টি বরাবর সোনাতলার কাঠালের উপর দিয়া, প্রাচীনকালে ঐ কাঠালের পূর্ব্বাংশে যথায় গঙ্গাস্রোত ছিল, তথায় গিয়া মিলিয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে, মহানন্দা হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত এই গড়টি বিস্তৃত ছিল। গড়ের দক্ষিণাংশে ও সোনাতলা কাঠালের পূর্ব্বাংশে ভূমি জলা-ময়; বর্ষাকালে ইহা একবারে জলমগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু সোনাতলা কাঠাল উচ্চস্থান, উহা ডুবে না।

এই গড়টিই পালরাজধানী হিন্দুগৌড়ের দক্ষিণ সীমার গড়। পূর্ব্বে মহানন্দা নদী, উত্তরে কালিন্দী নদী, পশ্চিমে মূল গঙ্গাস্রোত, দক্ষিণে এই গড়, এই চতুঃসীমার মধ্যেই হিন্দুগৌড় অবস্থিত ছিল, স্পষ্ট বিবেচনা হয়। তবে কালিন্দীর অপর পারেও গৌড়নগরের কিয়দংশ অবস্থিত ছিল।

পালবংশের ধ্বংস হইলে এবং সেনবংশ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিলে, এই ভূভাগের মধ্যেই বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী থাকার কথা, আজিও লোকের স্মৃতিতে জাগরূক আছে। বল্লালসেনের রাজবাটী হইতে পশ্চিমে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটি জাঙ্গাল ছিল, তাহা আজিও বিদ্যমান। যে গড়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহারাজা লক্ষ্মণসেন ইহার দক্ষিণে উচ্চভূমির উপর গঙ্গাতীরে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন।—এবং তাহাকেও গড়-বেষ্টিত করেন। এই গড়ের পশ্চিমোত্তর ভাগে এক স্থানে রাজবাটী নির্ম্মিত হয়, এবং পুরদ্বারে নগররক্ষিণী চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। দুর্গের যে স্থানে পুরদ্বার ছিল, তাহা আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার নাম "দ্বারবাসিনী" তোরণ। দ্বারবাসিনী চণ্ডীর মূর্ত্তি মুসলমানেরা বিনষ্ট করিয়াছে, কিন্তু যেখানে চণ্ডী

ছিলেন, তথায় এক্ষণে একটা লাক্ষানির্ম্মিত দেবতার মুণ্ড লাগান আছে। উহাই আজিও চণ্ডী বলিয়া পূজিত হইতেছে, এবং তাহার সম্মুখে বলিদান হয়। নূতন নগরের দক্ষিণপ্রান্তে মহারাজা লক্ষ্মণসেন এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইতে আরম্ভ করেন; কিন্তু ইহা সমাপ্ত না হইতে হইতেই তিনি বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী কর্তৃক পাশ্চাত্য বঙ্গ হইতে তাড়িত হয়েন। মুসলমানেরা এই দীর্ঘিকা খনন শেষ করেন। ইহার নাম "সাগরদিঘী"; ইহা উত্তরদক্ষিণে লম্বা দীর্ঘে ১৬০০ গজ, প্রস্থে তাহার অর্দ্ধেক ও কিছু বেশী। ইহার পাড় মধ্যে ইষ্টক-নির্ম্মিত, উপরে মৃত্তিকাচ্ছাদিত। ইহার চারি পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের জঙ্গল—জল আজিও ঢল ঢল করিতেছে! এত বড় ও এত সুন্দর জলাশয় বাঙ্গালার আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ।

গৌড়নগরকে আয়তনে এইরূপে বাড়াইয়া ও তথায় নূতন নূতন ইষ্টাপূর্ত্তের কার্য্য আরম্ভ করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণসেন স্বনামে এই নগরকে বিখ্যাত করিবার অভিলাষে, ইহার "লক্ষ্মণাবতী" এই নূতন নামকরণ করেন।

ইহারই কিছুকাল পরে, ১১২৪ শকে (১২০২ খ্রীষ্টাব্দে) তুরস্কেরা অর্থাৎ বখতিয়ার খিল্‌জীর সৈন্যদল—যাহারা তৎকালে এদেশে তুরস্ক বলিয়া বিখ্যাত ছিল—তাহারা গৌড়রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর ভাগ অধিকার করিল। লক্ষ্মণ যখন নবদ্বীপ হইতে বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিলেন, তখন বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী মহম্মদ শিরান নামক আপনার একজন সেনাপতিকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং ভোটরাজ্য জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দিনাজপুর জেলায় পূর্ণভবা নদীর তীরে দেবকোট নামে যে একটি নগর ছিল, এইখানেই বখ্‌তিয়ার আপন স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভোট হইতে পলাইয়া আসার পর আলিমর্দ্দান নামক জনৈক মুসলমান নায়কের হস্তে এই দেবকোটেই নিহত হয়েন। ফলতঃ দেখা যায়, মুসলমানদের বঙ্গাধিকারের অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মণাবতী মুসলমান রাজধানীতে পরিণত হয় নাই। বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মুসলমান স্কন্ধাবার কিছুকাল দেবকোটেই ছিল। পরে হিসামুদ্দীন আবজ নামক বখতিয়ারের জনৈক সেনাপতি বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানদের "জয়স্কন্ধাবার"—অর্থাৎ রাজধানী—লক্ষ্মণাবতীতে আনয়ন করেন। হিসামুদ্দীন আবজ্ ইতিহাসে গিয়াসুদ্দীন নামেই বিশেষ পরিচিত।

Stewart সাহেব বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে,—

"After the flight of the Raja (অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন) Bukhtyar gave up the city (নবদ্বীপ) to be plundered by his troops, reserving for himself only the Elephants and public stores. He then proceeded without opposition to Luknowty, and *Established the ancient City of Gaur as the capital of his dominions.* As necessary part of this ceremony, he destroyed a number of Hindu temples and with their materials created mosques, Colleges, Caravan Series on their ruins"—p 28.

এই বিষয়ের Italic অংশ ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। তিনি লক্ষণাবতী অধিকার করিয়া লক্ষণের চণ্ডী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি বিনাশ করেন ও নগর লুট-পাট করেন সত্য, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত যেখানে মুসলমান সৈন্যের বিজয়-স্কন্ধাবার, তাহাই তাহাদের রাজধানী বলিয়া গণ্য হইত। দেবকোটে এই জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হওয়ায়, তাহাই তৎকালে বাঙ্গালার রাজধানী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

Stewart সাহেবের বিবরণ অনুসারে, ১২১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর কাল, গিয়াসুদ্দীনের রাজত্ব। ইহারই প্রথম ভাগে লক্ষ্মণাবতী মুসলমান-শাসিত বঙ্গের রাজধানীতে পরিণত হয়, দেখা যায়।

উক্ত সাহেব লিখিয়াছেন;—"বাঙ্গলার রাজসিংহাসনের জন্য নির্ব্বাচিত হইলে তিনি গিয়াসুদ্দীন উপাধি ধারণ করিলেন, এবং লখনৌতি নগরে তিনি আপন বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এই নগরের অভ্যুদয় ও সৌষ্ঠব সাধ-নের জন্য তিনি বিস্তর প্রয়াস এবং অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি একটি জমকাল গোছের মসজীদ, একটি বিদ্যালয় এবং একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ভূমি জলা-ময় থাকায়, তিনি এক দিকে বীরভূম-স্থিত নগর পর্য্যন্ত, অপর দিকে দেবকোট পর্য্যন্ত, দশ দিনের পথ পুতিবিধির সৌকর্য্যার্থে জাঙ্গাল প্রস্তুত করেন। তাহাতে বর্ষাকালে যে স্থান অতি দুর্গম ছিল, তথায় যাতায়াতের পক্ষে লোকের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল।"

গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর ১৬ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৪৩—৪৪ খৃষ্টাব্দে, তবকতনাসিরী নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থের লেখক মিন্‌হাজ উদ্দীন জেবরজানি সাহেব লক্ষ্মণাবতী নগরে আগমন করেন। তিনি আপন গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন;—"এই গ্রন্থের লেখক হিজিরার ৬৪১ অব্দে লক্ষ্মণাবতী নগরে উপস্থিত হয়েন, এবং ঐ রাজা (হিসামুদ্দীন আবজ্) যে সকল ধর্ম্মকার্য্যসম্পর্কীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা পরিদর্শন করেন। লক্ষ্মণাবতী দুই শাখায়

অংশের নাম "ডাল"; এবং লক্ষ্মণাবতীর যে অংশ সহর, তাহা ঐ তীরে। লক্ষ্মণাবতী হইতে নগর পর্য্যন্ত এক দিকে এবং দেবকোট পর্য্যন্ত অপর দিকে, দশ দিনের পথ ব্যাপিয়া একটি জাঙ্গাল আছে। বর্ষাকালে এই জাঙ্গাল দেশকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করে; এই জাঙ্গাল যদি না থাকিত, তবে স্থানীয় অট্টালিকা সকল নৌকা ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে দেখিতে যাইবার উপায় থাকিত না;—তাঁহার সময় হইতে জাঙ্গাল নির্ম্মিত হইবায়, পথটি সকলের সুগম হইয়াছে।" মিন্‌হাজের এই বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হয়েন। কেন না, সচরাচর যাহা গৌড় বলিয়া বিদিত, অর্থাৎ মুসলমান গৌড়,—তাহা গঙ্গার দুই তীরে কোনও কালেই অবস্থিত ছিল না। উহা ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে ছিল। মিন্‌হাজের লক্ষ্মণাবতীর সহর-অংশ যদি মুসলমান গৌড় বলিয়া ধরা যায়, তবে উহা গঙ্গার পশ্চিম তীরে হয় না। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, মিন্‌হাজ কালিন্দীকেই গঙ্গা বলিয়া লিখিয়াছেন। গঙ্গারামপুর কাঠালের নিকটে কালিন্দী বক্রভাবে উত্তর-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। পিছলী গঙ্গারামপুর নদীর পশ্চিমে,—শৌলপুর নদীর পূর্ব্বে—এই দুই গ্রামই তৎকালের লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ছিল। তবে লক্ষ্মণাবতীর প্রধান ভাগই নদীর পশ্চিম তীরে ছিল। শৌলপুর হইতে গিয়াসুদ্দীনের জাঙ্গাল পীরগঞ্জ অভিমুখে প্রসারিত ছিল। আজিও তাহার চিহ্ন জাজ্বল্যমান; আমি চক্ষে দেখিয়াছি। এই জাঙ্গাল এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাহা দিয়া আর লোক চলে না। ফলতঃ শৌলপুর হইতে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে পীরগঞ্জ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বমুখে কালিন্দীর ধারে ধারে মালদহ নগর পর্য্যন্ত, দুইটি জাঙ্গালের চিহ্ন বর্ত্তমান। প্রথমটিই মিন্‌হাজের উল্লিখিত জাঙ্গাল বোধ হয়। পীরগঞ্জের অপর পারেই প্রাচীন পুণ্ড্র নগর। তথা হইতে উক্ত জাঙ্গাল বরাবর পূর্ব্বমুখে টাঙ্গন নদীর তীরে রাণীগঞ্জ নামক স্থানে গিয়াছে। রাণীগঞ্জে একটি দুর্গ ছিল। ইহার অপর পারেও জাঙ্গালের চিহ্ন এক্ষণে অনেক দূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। ইহাকে স্থানীয় লোকে ডোখলার বাঁধ বলিয়া থাকে। ইহা মালদহ জেলা অতিক্রম করিয়া দিনাজপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহা দেবকোটে গিয়া শেষ হইয়াছিল।

অপরদিকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বীরভূম জেলার নগর পর্য্যন্ত যে জাঙ্গালের কথা মিন্‌হাজ বলেন, তাহার চিহ্নও অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। সোণাতলা কাঠালের মধ্য দিয়া প্রাচীন গঙ্গার তীরে তীরে এই জাঙ্গাল দক্ষিণ দিকে প্রধাবিত ছিল।

সোণাতলা কাঠালের মধ্যে ইহা এখনও বর্ত্তমান। ধোবড়া গ্রাম পর্য্যন্ত ইহার চিহ্ন দেখা যায়।

ইহাতে দেখা যায় যে, মিনহাজ কালিন্দীতটে বসিয়াই আপন বিবরণ লিখিয়াছেন। এবং তথনকার লক্ষ্মণাবর্তী কালিন্দীর তীরে শৌলপুর ও পিছলী গঙ্গারামপুর হইতে সাগরদিঘী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল মাত্র। সাগরদিঘীর দক্ষিণে যে নূতন নগর নির্ম্মিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী কালের।

১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে হাজি ইলায়াস্ সুলতান সামসুদ্দীন উপাধিধারণপূর্ব্বক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন; বিপন্ন হইয়া সামসুদ্দীন স্বয়ং একডালায় * এবং তাঁহার পুত্র পুণ্ড্রে (পাঁড়ুয়ায়) রাজ্যরক্ষার্থ সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। এই সময়ে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী হইতে আবার উঠিয়া গেল এবং সাম্‌সুদ্দীনের সময় হইতে রাজা কংস বা রাজা গণেশের সময় পর্য্যন্ত, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় আর একবার জ্যোতিতে স্ফীত হইল। সামসুদ্দীনের পুত্র সুলতান সেকেন্দর সাহ, বিখ্যাত আদিনা মসজীদের নির্ম্মাণকর্ত্তা।

বাঙ্গালার ইতিহাসে রাজা কংস বা রাজা গণেশের মত আশ্চর্য্য ব্যক্তি অতি বিরল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ইতিহাস একবারেই অপরিজ্ঞাত বলিলেও বলা যায়। যত দূর জানা যায়, তাহাতে তিনি দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের রাজত্বকালে বিদ্রোহী হইয়া উক্ত রাজাকে যুদ্ধে নিহত করেন, এবং স্বয়ং রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি খৃষ্টাব্দ ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এবং পুণ্ড্রনগরের উন্নতিকল্পে অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। Stewart বলেন :—During the reign of Raja Kanis, the city of Pandua was much extended and celebrated in the East, and the temples of idolatry again raised their heads. কিন্তু গণেশের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যদুসেন, জেলালুদ্দীন উপাধিধারণপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। জেলালুদ্দীন পুণ্ড্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আবার গৌড়েই রাজধানী স্থাপিত করিলেন।

১৪০৯ খৃষ্টাব্দে জেলালুদ্দীনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র আহম্মদ সাহ ১৪২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি অপুত্রক হইয়া কালগ্রাসে পতিত

---

* কেহ কেহ বলেন, একডালা পূর্ব্ববঙ্গে; কেহ কেহ বলেন ইহা দিনাজপুরে।

হয়েন, এবং তাঁহার পর হাজি ইলায়সের বংশ পুনর্ব্বার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। এই পুনঃস্থাপিত বংশের প্রথম রাজার নাম নাসীরসাহ; তিনি দীর্ঘ-কাল (১৪২৬ হইতে ১৪৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) নির্ব্বিবাদে রাজত্ব উপভোগ করেন,—এবং তাঁহারই রাজত্বকালে মুসলমান গৌড়ের চারিদিকের গড় নির্ম্মিত হয়।

রাজা গণেশের পুত্র জেলালুদ্দীনকেই অন্তিম গৌড় বা মুসলমান রাজধানী গৌড়ের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এই নূতন নগর সাগরদিঘীর দক্ষিণে অবস্থিত। Stewart বলেন :—Jelal-ud-din removed again the seat of Government from Pandua to Gour, and expended large sums of money in improving that city. The mosque, baths, reservior, and caravanserai, distinguished by the name Jellally were all constructed by him.—P. 61. প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, প্রাচীন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর দক্ষিণে যে উপনগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, মহারাজ যদুসেন ওরফে সুলতান জেলালুদ্দীন, তথায় এক নূতন "গৌড়" নগর নির্ম্মাণ করিলেন। নূতন রাজবাটী নির্ম্মিত হইলেই তাহার চারি দিকে নূতন সহর সমুত্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভাগীরথীতীরে যথায় মুসলমান রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, ঐখানেই জেলালুদ্দীন আপন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ইহার চারিদিকে এক গুলজার সহর সমুত্থিত হইল। এবং নাসীর সাহার সময়ে তাহা গড়-বেষ্টিত হইল।

সে কালের মলমূত্রদূরীকরণপ্রণালী ভাল ছিল না, এবং জলশোধন করিয়া পান করিবারও রীতি ছিল না। সুতরাং প্রশস্ত নদীতীর ভিন্ন প্রকাণ্ড নগর স্থায়ী হইবার উপায়ান্তর ছিল না। নদীর জলে ময়লা ধৌত হইয়া যাইত, নদীর স্রোতের জলে স্নান ও পান নির্ব্বাহ হইত। নদীর অবস্থান-পরিবর্ত্তন হইলেই, এই স্বাভাবিক সুবিধার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে নগর সকল সরিয়া যাইত। যতদিন পুণ্ড্রের নিকট গঙ্গা ছিল, ততদিন পুণ্ড্রনগরী অভ্যুদয়সম্পন্ন ছিল। গঙ্গা যখন সরিয়া আসিলেন, তখন পালরাজদের সময়ে কালিন্দীতীরে নূতন গৌড়নগর সমুত্থিত হইল। আবার গঙ্গা যেমন সরিয়া সরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে যাইতে লাগিলেন, তেমনি নগরও সরিয়া সরিয়া সেইদিকে গেল। লক্ষ্মণ সেনের সময় পর্য্যন্ত বল্লাল সেনের রাজবাটীসংলগ্ন বাঘবাড়ীর গড় (যাহা মহানন্দা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ) গৌড়ের দক্ষিণ সীমা ছিল। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ইহার দক্ষিণে নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহাই পূর্ব্বের গৌড়ের সহিত 'লক্ষ্মণাবতী' নামে

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই সময়ের পরও গঙ্গার পশ্চিমদক্ষিণে অপসরণক্রিয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। পুরাতন সহর গলিজ ও ময়লা হইলেই, তখনকার রাজারা সরিয়া সরিয়া রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতেন। এই নিয়ম অনুসারেই রাজধানীর এত পরিবর্ত্তন হইত। অবশেষে এই নিয়ম-অনুসারেই যদু সেনের নূতন গৌড় নগর রামকেলী গ্রামের নিকটে গঙ্গাতীরে নির্ম্মিত হয়। ইহাকেই সর্ব্বসাধারণ পাঠকে গৌড় বলিয়া জানে, এবং এই স্থানেই হুসেন সাহের রাজ্যকালে রূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চৈতন্যের আগমন হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকে লক্ষ্মণাবতী কোথায় ছিল, তাহা আজিও ভুলে নাই। সেই স্থান এক্ষণে অধিকাংশ অরণ্য, তথায় লোকের বসতি নাই।

আমি মালদহ জেলাকে প্রাচীন বাঙ্গালার সমাধিস্থান বলিয়াছি; ইহাকে এক অর্থে মুসলমান বাঙ্গালারও সমাধি বলা চলে। নবাব সেরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২১ জুন তারিখে পলাসীর সংগ্রামে হারিলেন। যুদ্ধস্থান হইতে তিনি ভগবানগোলায় পলাইয়া আসিলেন। তৎকালে মীরজাফরের এক সেনাপতি রাজমহলে অবস্থিতি করিতেছিলেন; গঙ্গাপথে গেলে পাছে তাঁহার হস্তে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে হতভাগ্য নবাব নৌকায় করিয়া মহানন্দা নদীতে প্রবেশ করিলেন। এই নদী উজানে বাহিয়া তিনি গুপ্তবেশে মালদহ নগরের নিকট কালিন্দীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং বখতিয়ার খিলজী একদা যে লক্ষ্মণাবতী লুটপাট করিয়াছিলেন, কালিন্দী বাহিয়া তিনি তাহারই মধ্য দিয়া, রতুয়া থানার নিকট বড়াল নামক গ্রামে পৌঁছিলেন। এই গ্রামে দানাসাহা নামক এক মুসলমান ফকীর বাস করিত। সে নবাবকে চিনিতে পারিয়া, অর্থলোভেই হউক, অথবা প্রতিহিংসাপ্রণোদিত হইয়াই হউক, (কেন না, কেহ কেহ বলেন যে, মুরসিদাবাদে সিরাজুদ্দৌলার আদেশে ইহার কর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল) তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। যেস্থানে সিরাজুদ্দৌলা ধৃত হইলেন, ঐ স্থান কালিন্দীতীরবর্ত্তী; উহা তদবধি "সুবামার" নামে বিখ্যাত। স্থানীয় লোকে তাহাকে "শুওরমারা" নাম দিয়াছে। হায় বিধাতঃ! মূর্খের জিহ্বাতে তুমি সুবা সিরাজুদ্দৌলাকে শূকরে পরিণত করিয়াছ!! বাঙ্গালাদেশে মুসলমান রাজত্বসূর্য্যও যাহা লক্ষ্মণাবতীতেই উদিত হইয়াছিল,—তাহা সিরাজুদ্দৌলার বন্ধনদশায় এই রূপে লক্ষ্মণাবতীর অদূরেই অস্তমিত হইল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, মৎপ্রকাশিত ধর্ম্মপালের নূতন তাম্রশাসনের তাৎপর্য্য সমালোচনা করিয়াছেন। আমার সহিত কোনও কোনও স্থানে তাঁহার মতভেদ হইয়াছে।

প্রথমতঃ, আমি যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহার শুদ্ধিবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আমি যে পাঠ দিয়াছি, তাহার সহিত তাম্রশাসনের একটি লিথো বা ফটো-জিংকোগ্রাফ্ প্রদত্ত হয় নাই। তাম্রশাসনখানি সম্প্রতি পণ্ডিতগণের দেখিবার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটিতে স্থাপিত হইয়াছে। সিংহ মহাশয় তথায় গেলে আসল জিনিষ দেখিতে পাইবেন। সোসাইটির ১৮৯৪ সালের ১নং জর্ণালেও উহার একটি ফটো দেখিতে পাইবেন। আমার পাঠে দুই এক স্থানে অশুদ্ধি থাকা সম্ভব; সিংহ মহাশয় তাহা যদি দেখাইয়া দেন, পরম বাধিত হইব।

তাহার পর শাসনখানি দেবোত্তরের সনন্দ, না ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ, এ বিষয়ে সিংহ মহাশয়ের সন্দেহ জন্মিয়াছে। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রশ্ন এই যে,—শাসনের নারায়ণভট্টারক, এক জন মনুষ্য, না কোনও দেবপ্রতিমা?

শাসনে লিখিত আছে :—

মতমস্তু ভবতাং।

মহাসামন্তাধিপতিশ্রীনারায়ণবর্ম্মণা দূতকযুবরাজশ্রীত্রিভুবনপালমুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ যথাস্মাভির্ম্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলং কারিতন্তত্র প্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নুন্ননারায়ণভট্টারকায় তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদমূলসমেতায় পূজোপস্থানাদিকর্ম্মণে চতুরো গ্রামান্ তত্রত্যহট্টিকাতলবাটকসমেতান্ দদাতু দেব ইতি। ততোহস্মাভিস্তদীয়বিজ্ঞপ্ত্যা এতে উপরিলিখিতকাশ্চত্বারো গ্রামাস্তলবাটকহট্টিকাসমেতাঃ স্বসীমাপর্য্যন্তাঃ সোদ্দেশাঃ সদশাপচারাঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যাঃ। পরিহৃতসর্ব্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং তথৈব প্রতিষ্ঠাপিতাঃ।

সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ :—

"তোমরা অবগত হও। মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক দূতস্বরূপ যুবরাজ ত্রিভুবনপালের মুখে আমরা (ধর্ম্মপাল) এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছি যে, আমা (নারায়ণ বর্ম্মা) কর্ত্তৃক মাতা পিতা ও নিজের পুণ্য বৃদ্ধির জন্য শুভস্থলীতে একটি দেবকুল (দেউল) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাতে স্থাপিত ভগবান নুন্ননারায়ণ ভট্টারক (দেবতা) কে তাঁহার প্রতিপালক (পরিচর্য্যা-কারক) লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ও দেবপূজক প্রভৃতি পরিচারকের

সহিত পূজা ও উপস্থানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য তথাকার হাট বাট খাল ইত্যাদির সহিত চারিখানা গ্রাম মহারাজ দান করুন। সেই হেতু আমার (ধর্ম্মপাল) দ্বারা তাঁহার (নারায়ণ বর্ম্মার) বিজ্ঞাপন অনুসারে উপরে লিখিত স্বসীমান্তর্গত চারিখানা গ্রাম হাট বাট খাল ইত্যাদি ও সর্ব্বপ্রকার ভূমির অবস্থান পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের গ্রহণীয় কর প্রভৃতি রহিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন পরিহার পূর্ব্বক চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ে সেইরূপ প্রদত্ত হইল।"

ইহার পর সিংহ মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—

"ইহা দ্বারা তাম্রশাসনের মর্ম্ম আমরা এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি নারায়ণবর্ম্মা শুভস্থলী নামক স্থানে এক দেবকুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "নুন্ননারায়ণ" নামক এক (বিষ্ণু) দেবতা স্থাপন করেন। তিনি সেই দেবতার সেবা পূজা প্রভৃতি নির্ব্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য, লাটদেশীয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত সামন্ত নরপতি নারায়ণবর্ম্মা যুবরাজ ত্রিভুবনপালের দ্বারা দেবতার সেবা পূজার ব্যয় এবং পূজক প্রভৃতির জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চারিখানি গ্রাম নিষ্কর প্রদান করিবার কারণ—ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ, অন্যান্য তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সামন্ত নরপতিবর্গের এইরূপ নিষ্কর ভূমি প্রদানের অধিকার ছিল না, এজন্য নারায়ণ বর্ম্মা ধর্ম্মপালের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল নারায়ণবর্ম্মার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।"

এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আমি এ পর্য্যন্ত "নুন্ননারায়ণ" নামক কোনও দেবতার নাম শুনি নাই। আমি বিবেচনা করি, "ভগবন্নুন্ন" এই সমস্ত পদটি "নারায়ণভট্টারকের" বিশেষণ।

"ভগবন্নুন্ন" শব্দের তাৎপর্য্যপরিগ্রহের পূর্ব্বে, লাহিড়ী-বংশাবলীতে ভট্টনারায়ণের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক। তথায় লিখিত আছে,—

"গুক্ষোৎফুল্লাস্যপদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী
মানী কোদণ্ডপাণিঃ পবনগতিহয়ঃ কৌঙ্কিকোষ্ণীষমৌলিঃ।
কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈর্ভট্টনারায়ণোঽয়ং॥
রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখসুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞী বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেঽসৌ দ্বিজন্মনাং।
আদিস্তুতো জয়মণির্ভট্টো জজ্ঞে তু নন্দনঃ॥" ইত্যাদি।

এই প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, ভট্টনারায়ণ ধর্ম্মপালের সময়ে এদেশে আগমন করেন। ইহাতে ভট্টনারায়ণপুত্র আদিগাঞী ওঝাকে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক গ্রামদানের কথা আছে, যদিও ভট্টনারায়নকে কোনও গ্রামদানের কথা নাই

বটে, কিন্তু তাহার কারণ এই উপলব্ধি হয় যে, ভট্টনারায়ণের বিস্তীর্ণ বংশাবলীর মধ্যে একটি বংশের, অর্থাৎ লাহিড়ী বংশের বিবরণমাত্র এ স্থলে লিখিত হইয়াছে। উক্ত বংশের আদিপুরুষ আদিগাঞী ওঝাকে যে গ্রাম দান করা হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ কেবল তজ্জন্য এ স্থলে লিখিত হইয়াছে।

সিংহ মহাশয় ভট্টনারায়ণকে ধর্ম্মপালের সমকালীন ব্যক্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।—এখন দেখা যায়, ভট্টনারায়ণ একজন অতিশয় ধার্ম্মিক, দেবতুল্য, বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কবিতায় তাঁহাকে "সাক্ষাৎনারায়ণশ্রীঃ—বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তি যে তাম্রশাসনে বিশেষ সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

এক্ষণে "ভগবন্নুন্ন" শব্দের অর্থ কি, দেখা যাউক। নুদ-প্রেরণে—এই ধাতু হইতে "নুন্ন" অর্থাৎ প্রেরিত এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। চুদ্ ধাতুর অর্থও এইরূপ। ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীমন্ত্র স্মরণ করিলে, এই ভগবন্নুন্ন শব্দের অর্থ পাওয়া যাইবে।—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।" যে ভগবান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির নোদনকর্ত্তা, তাঁহার পরম জ্যোতিঃকে ধ্যান করার নাম গায়ত্রীজপ। মন্ত্রে যে সবিতা শব্দ আছে, ভাষ্যকার সায়ণ তাহার অর্থ করেন,—"সর্ব্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য"। অর্থাৎ যে ঈশ্বর মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রেরণ করেন—তাঁহার নাম সবিতা—বা প্রেরক দেবতা। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ঈশ্বরের সেই নোদনা বা প্রেরণা অঙ্গীকার করিলে, "ভগবন্নুন্ন"-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়েন। ভগবন্নুন্ন অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরিত, অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে পরমনিষ্ঠাবান্।

আমি দেখাইয়াছি যে, ভট্টারক শব্দের আভিধানিক অর্থমালার মধ্যে "তপোধন ব্রাহ্মণ" একটি অর্থ। এই শব্দ রাজার প্রতি, দেবতার প্রতি, এবং তপোধন ব্রাহ্মণের প্রতি তুল্য প্রযুজ্য। সিংহ মহাশয় বলেন, অভিধানে যাহা হউক, ব্যবহারে দেবতা ও রাজা ভিন্ন ভট্টারক অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু তিনিও এক ফুট-নোটে আবার স্বীকার করিয়াছেন যে, কয়েকজন জৈন গুরুর নামের সহিত "ভট্টারক" ও "ভট্টারকমুনি" শব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। অতএব সিংহ মহাশয় আপনার আপত্তির উত্তর আপনিই দিয়াছেন।

তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে "ক"-এর ব্যবহার কিছু বেশী। "দূত" স্থানে "দূতক", "হট্ট" স্থানে "হট্টিকা", "বাট" স্থানে "বাটক", "লিখিত" স্থানে "লিখিতক", এইরূপ শব্দপ্রয়োগ

কেবল উদ্ধৃত অংশমধ্যেই দেখা যায়। সমুদায় শাসনে আরো অনেক উদাহরণ দেখা যাইবে। এই সম্প্রসারণপ্রণালী অনুসারেই "ভট্ট"-শব্দের পরিবর্ত্তে সমানার্থক "ভট্টারক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।

"ভগবন্নন্নরায়ণভট্টায়" শুনিতেও কিছু মুড়া মুড়া বোধ হয় বলিয়া, লেখক "ভট্টায়" স্থানে "ভট্টারকায়" লিখিয়াছেন বোধ হয়।

"তত্রপ্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নন্নরায়ণভট্টারকায়" স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত শব্দের অর্থ, আমি বুঝিয়াছি এই যে, যাঁহাকে বাস করান হইয়াছে। কোন দূর দেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিকে কোনও স্থানে ভূমি-আদিদানের আশা দিয়া বসবাস করাইলে, তাঁহাকে "তত্রপ্রতিষ্ঠাপিত" বলা যায়। এ স্থলে প্রণিধানের যোগ্য কয়েকটি কথা আছে। নারায়ণবর্ম্মা এই বিজ্ঞাপন পাঠাইবার পূর্ব্বেই রাজার কোনও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই দেবকুল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দেবকুলে অবশ্য কোনও দেবতা ছিল, কিন্তু তাহার এ স্থলে কোনও উল্লেখ নাই। দেবকুলের জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা নারায়ণবর্ম্মা স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যদি কোনও মন্দির বা তত্রত্য দেবতার জন্য বা দেবার্চ্চনার জন্য ভূমির প্রার্থনা আবশ্যক হইত, তবে মন্দিরনির্ম্মাণের পূর্ব্বেই, এবং তৎপ্রতিপালক দ্বিজ দেবার্চ্চকদিগকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বেই, ভূমির প্রার্থনা করা সম্ভব হইত। কিন্তু এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞাপনের সময়ে মন্দিরনির্ম্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং তথায় প্রতিপালক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অন্য কারণে ভূমির প্রার্থনাই অধিক সম্ভবপর।

লাটদেশ ও লাঢ় বা রাঢ় দেশ অভিন্ন কি না, তাহা এ স্থলে মীমাংসার বিশেষ আবশ্যক নাই। দেখা যায়, নারায়ণ বর্ম্মা দেবকুল নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় লাটদেশীয় কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও দেবার্চ্চক প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা মান্য ব্যক্তি ছিলেন, তাই সম্ভ্রমসূচক "পাদমূল" শব্দ তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। পিতাকে সংস্কৃতে সম্ভ্রম-সূচক "তাতপাদাঃ", রাজাকে "দেবপাদাঃ", গুরুকে "আচার্য্যপাদাঃ" বলা রীতি। সেই রীতি-অনুসারে এখানে উক্ত মান্য ব্যক্তিরা "তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদাঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তৎপ্রতিপালক অর্থাৎ সেই দেবকুলের প্রতিপালক বা রক্ষক ও কার্য্যনির্ব্বাহক। তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদানাং যৎ মূলং তত্র সমেতানি সমাগতায় ইত্যর্থঃ। বিদেশ হইতে অপরিচিত কোনও ব্রাহ্মণ আসিলে প্রথমে কোনও দেবমন্দিরেই তাঁহার আশ্রয় বা আতিথ্যগ্রহণ সম্ভব। ভট্ট-

নারায়ণ কোলাঞ্চ হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া শুভস্থলীতে নারায়ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দেউলের রক্ষক ব্রাহ্মণদের নিকট অতিথিস্বরূপ উপস্থিত হয়েন। ইহাই আমার বিবেচনায় তৎপ্রতিপালক 'লাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদমূলসমেতায়' শব্দের অর্থ। নারায়ণবর্ম্মা যখন কান্যকুব্জদেশীয় ভট্টনারায়ণের ন্যায় এক জন বিশিষ্ট বেদবেদান্তবিশারদ সুকবি পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহাকেও আপনার নির্ম্মিত দেবকুলের পূজা ও উপস্থান-কার্য্যে ব্রতী করিতে অভিলাষী হইলেন। এবং তাঁহাকে বিশিষ্টগুণবান জানিয়া, যুবরাজ ত্রিভুবনপালকে বলিয়া, রাজার নিকট হইতে চারিখানি গ্রামের সনন্দ বাহির করিয়া দিলেন। আমি এই অর্থই বুঝিয়াছি। কৈলাস বাবু এই অর্থে কি দোষ দর্শন করেন, জানিলে বাধিত হইব।

কৈলাস বাবুর সংশয় এই যে, যদি এক জন ব্রাহ্মণকে ইহা ভূমিদানের সনন্দ হয়, তবে তাঁহার পিতা, পিতামহাদি ও গোত্রপ্রবরের নাম উল্লেখ নাই কেন?

কৈলাস বাবুকে দেখাইতে হইবে যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ, বা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে, বৌদ্ধ নরপতিরা ব্রাহ্মণদিগকে যে ব্রহ্মোত্তর দান করিতেন, তাহার সনন্দে সম্প্রদানের পিতা পিতামহাদির নামোল্লেখ করিবার রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। যতক্ষণ তিনি এই কথা প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার সংশয় অমূলক বোধ হয়।

দলিলের খশড়া সকল দেশে সকল সময়ে যে সমান হইবে, ইহা আশা করা যায় না। গোলমাল বাধিলেই বাঁধাবাঁধির আধিক্য দেখা যায়। যেখানে এক নামের অনেক লোক থাকা সম্ভব, তথায় তাহাদের বংশাবলী গোত্র প্রবরাদির কীর্ত্তন আবশ্যক হয়। কিন্তু ভট্টনারায়ণের মত বিখ্যাত গ্রন্থকার ব্যক্তির পক্ষে তাহা হয় ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পুণ্ড্রদেশে তখন ব্রাহ্মণ-সংখ্যা অতি কম। বিশেষ, তাম্রশাসনের যেখানে ভট্টনারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা সুপারিশ মাত্র। তথায় তাঁহার গোত্র প্রবরাদির উল্লেখেরও বিশেষ আবশ্যকতা নাই। আমার নির্ম্মিত দেবকুলে ভট্টনারায়ণ নামে এক "ভগবন্মন্য" ব্যক্তি সমাগত হইয়াছেন, মহারাজ তাঁহাকে চারিখানি গ্রাম দিউন, ইহা নারায়ণবর্ম্মার বিজ্ঞাপন। ধর্ম্মপাল সেই বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠে কেবল "তথাস্তু" বলিয়া তাহা মঞ্জুর করিলেন মাত্র। এ আর তেমন শ্রৌতস্মার্ত্ত বিধি অনুযায়িক স্নান করিয়া কুশহস্তে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করা

নয়। একজন বেদপন্থী ক্ষত্রিয়ের অনুরোধে, একজন "পরম সৌগত" রাজা 'আচ্ছা দিলাম' বলিয়া এক সনন্দ প্রেরণ করিলেন মাত্র। এখানে গোত্র প্রবরের অনুল্লেখ জন্য সম্প্রদান যে মনুষ্য নহেন, ইহা সংশয় করিবার কোনও কারণ দেখি না।

তাম্রশাসনের নারায়ণভট্টারক সম্বন্ধে আমি যে অর্থ বুঝিয়াছি, তাহা উপরে বিবৃত হইল। এবং তৎসম্বন্ধে সিংহ মহাশয়ের অভিপ্রায় কি, তাহাও জানিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি ভারতীয় পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় গবেষণা গঙ্গার চড়ার মত। এক স্থানে আজি চড়া পড়িতেছে, কাল আবার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে ভ্রমপ্রমাদ মার্জনাযোগ্য। হইতে পারে, আমি অর্থ বুঝিতে ভুলিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। তাম্রশাসনখানিতে এদেশীয় ইতিহাসের অনেক কথা পরিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে ভূরি পরিমাণে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতের মনোযোগ-আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

ফার্মেণ্টেশন।

পচন-শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জৈবিক পদার্থের পচনও এক প্রকার ফার্মেণ্টেশন। হয় ত আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ফার্মেণ্টেশন জিনিসটা কি, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। তাঁহাদের গোচরার্থ আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে একটু সুবিস্তৃত আলোচনা করিব।

বলা বাহুল্য, ফার্মেণ্টেশন ইংরাজী শব্দ। ইহার প্রতিবাক্য চলিত বাঙ্গলা ভাষায় নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও, উহার অর্থ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোনও দুরূহত্ব অনুভব করিতে হয় না। আমরা যখন ব্যতিরেকী (abstract) ফার্মেণ্টেশন পদটি পরিহার করিয়া ফার্মেণ্টেশনের একটি স্থূল দৃষ্টান্ত লইয়া দেখি, তখন অতি সহজেই উহার অর্থ বোধগম্য করিতে পারি। পাঠক! নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন, সুমিষ্ট খেজুর রস বা তাল রস অধিকক্ষণ বাহিরে পড়িয়া থাকিলে ক্রমশঃ বিস্বাদ হইয়া যায়, এবং উহার উপরে এক প্রকার শুভ্র ফেণা জন্মে। রস-পাত্র অল্পপরিসর হইলে, ফেণা জমিয়া জমিয়া পাত্র ছাপিয়া উঠে। উক্ত সুমিষ্ট রসের এইরূপ

ণ্টেশন বলে। চলিত গ্রাম্য বাঙ্গলায় মিষ্ট রসের এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্তিকে 'গাঁজিয়া উঠা' কহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ফার্মেণ্টেশন প্রকৃতপক্ষে এইরূপ গাঁজিয়া উঠা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাচীনকালে ফার্মেণ্টেশনের এইরূপ একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে ফার্মেণ্টেশন অনেক বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেন না, এক্ষণে এমন অনেক প্রকারের প্রক্রিয়াকে ফার্মেণ্টেশন বলা হয়, যেখানে গাঁজিয়া উঠা, বা ফেণা জন্মান, এ সব কিছুই হয় না। সুতরাং কেবল গাঁজিয়া উঠা বা ফেণা জন্মানই ফার্মেণ্টেশন পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। তবে যে আমরা খেজুর বা তাল রসের গাঁজিবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ফার্মেণ্টেশনের অর্থ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলাম, সে এইজন্য যে, অতি পুরাকাল হইতেই নানাবিধ মাদক পানীয়ের প্রস্তুতপ্রণালী পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে চলিত থাকায়, সাধারণ লোকের মধ্যে উহা এক সচরাচর গোচরীভূত দৃশ্য; আর আদৌ গাঁজিয়া উঠা বা ফেণা জন্মানর সহিতই ফার্মেণ্টেশন শব্দের বিশেষ যোগ। যে লাটিন ধাতু হইতে ইংরাজী ফার্মেণ্টেশন শব্দের উৎপত্তি, তাহার অর্থ,—অত্যুষ্ণ হইয়া ফোটা (To boil) কৃত্রিম উত্তাপ বা অগ্নির সহিত কোনও সংস্পর্শ নাই, অথচ যাহা পচিয়া সুরা হয়,—তাহা আপনাআপনিই যেন ফুটিতে থাকে। এই সময়ে উত্তাপ নির্গত হয়, আর দ্ব্যম্লঙ্গারক বাষ্প বহির্গত হয়। দ্ব্যম্লঙ্গারক বাষ্পের উদ্গমন হেতু ফেণার উৎপত্তি হয়। প্রাচীনকালে এইরূপ প্রক্রিয়াকে ফার্মেণ্টেশন বলা হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফার্মেণ্টেশন এখন অনেক বিস্তীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। কেবল উত্তাপনির্গমন, বা ফোটা, আর দ্ব্যম্লঙ্গারক বাষ্পের উদ্ভাবনেই ফার্মেণ্টেশন শব্দ বদ্ধ নহে। বলিতে গেলে, ফার্মেণ্টেশন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া। জীবদেহস্থ নানাবিধ রস ও অন্যান্য পদার্থ (জৈব শব্দ যে আমরা উদ্ভিদ ও জন্তুর সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহার করি, পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া তাহা মনে রাখিবেন।) কতকগুলি জৈবিক পদার্থের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনপ্রণালীকে সংক্ষেপে ফার্মেণ্টেশন বলা যাইতে পারে। আর যে জৈবিক পদার্থের মধ্যবর্ত্তিতার দ্বারা এবম্বিধ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বা বিশ্লেষণ সাধিত হয়, তাহাকে 'ফার্মেণ্ট' বলে।

ফার্মেণ্ট দ্বিবিধ ;—জৈবিক (Organised), আর জীবশরীরসঞ্জাত (Or-

ganic); শেষোক্ত প্রকারকে রাসায়নিকও বলা যাইতে পারে। জৈবিক ও রাসায়নিক ফার্মেণ্টদিগের মধ্যে জৈবিক ফার্মেণ্টের কার্য্য-ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত। সমুদয় ভূ-পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জৈবিক ফার্মেণ্ট অহর্নিশি নানাবিধ ফার্মেণ্টেশন উৎপন্ন করিয়া, প্রকৃতিভাণ্ডারের সাম্য রক্ষা করিতেছে। ইহাদের বিষয় আমরা পরে বলিব। রাসায়নিক ফার্মেণ্ট জীবশরীরের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া, তন্মধ্যে নানাবিধ হিতকর ফার্মেণ্টেশন সাধন করিয়া জীবদেহের পরিপোষণের সহায়তা করে। টায়ালিন (Ptyaline), পেপসিন (Pepsin), ট্রিপসিন (Trypsin), ডায়াষ্টেজ (Diastase) প্রভৃতি কয়েকটি, জীবশরীরসঞ্জাত ফার্মেণ্টের উদাহরণ। টায়ালিন আমাদের লালার সহিত মিশ্রিত থাকে। ইহার সাহায্যে ভুক্ত পদার্থের শ্বেতসারাংশ (Starchy matter) শর্করারূপে পরিণত হয়। পেপসিন আমাদের পাকস্থলীতে থাকিয়া মাংস বা ডিম্বের যবক্ষারজানসংঘটিত পদার্থকে জীর্ণ করিয়া দেয়। ট্রিপসিনও ঐরূপ পরিপাকক্রিয়ার সহায়তা করে। ডায়াষ্টেজ ঔদ্ভিদিক বীজ। যেমন গোধূম, ধান্য, অন্য শস্য। নিহিত শ্বেতসারাংশকে শর্করারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া অঙ্কুরবিকাশের সাহায্য করে।

জৈবিক ফার্মেণ্ট নানা প্রকার। ইহা অতি ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক পদার্থ। অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাদিগকে জীবাণু বলা হয়। ইহারা অশেষ প্রকারের; অসংখ্য অসংখ্য জীবাণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে। অন্যান্য জীবের ন্যায় ইহাদের জন্ম, বংশবর্দ্ধন ও মৃত্যু হয়। যবক্ষারজান ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা তন্মধ্যে ফার্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে, তন্মধ্যে কোনও প্রকারে পতিত হইয়া আপনাদের আহার অন্বেষণ করে, এবং উপযুক্ত আহারসামগ্রী পাইলে অচিরে (প্রত্যেক ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে এক এক বংশের উৎপত্তি হয়) আপনাদের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করে। কিন্তু এই খাদ্যসংগ্রহকালেই ইহারা উক্ত পদার্থের মধ্যে এক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। সেই পরিবর্ত্তন-প্রণালীকে ফার্মেণ্টেশন বলে।

রাসায়নিক ফার্মেণ্টকৃত ফার্মেণ্টেশন ছাড়িয়া দিলে, জৈবিক ফার্মেণ্ট-জনিত ফার্মেণ্টেশন তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা,—

১। য়্যালকোহলিক বা সুরাসার-ঘটিত ফার্মেণ্টেশন।
২। রোগোৎপাদন-সম্বন্ধীয় ফার্মেণ্টেশন।
৩। পচনমূলক ফার্মেণ্টেশন।

১। য়্যালাকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশন। যে ফার্ম্মেণ্টেশনের ফলস্বরূপ সুরা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম য়্যালকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশন। কিন্তু সুরা ব্যতীত অন্য কয়েকটি ফার্ম্মেণ্টেশনও য়্যালকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশনের অন্তর্ভূত। আমরা ইহাদের বিষয় পরে বলিতেছি। প্রধানতঃ য়্যালকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশনে শর্করা রূপান্তরিত হইয়া সুরাসাররূপে পরিণত হয়। মিষ্ট ফল মূল হইতে জাত শর্করা, অথবা ধান্য, গোধূম, যব প্রভৃতি শস্যে নিহিত শ্বেতসারাংশ হইতে যে শর্করা জন্মে, সেই শর্করা জৈবিক ফার্ম্মেণ্টের সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া, সুরাসার প্রস্তুত হয়। এই নিমিত্ত সচরাচর সুরা প্রস্তুত করিবার জন্য মিষ্ট ফল যেমন দ্রাক্ষা, অথবা শ্বেতসারবিশিষ্ট নানা শস্য যেমন যব, ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। জৈবিক ফার্ম্মেণ্ট অর্থাৎ জীবাণু, শর্করামিশ্রিত রসের মধ্য হইতে আপনাদের আহারীয় যবক্ষারজান পদার্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া, উহার মধ্যে এক রাসায়নিক বিশ্লেষণ আনয়ন করে। সেই বিশ্লেষণের ফলই সুরাসার বা য়্যালকোহল।

সুরাসার ফার্ম্মেণ্টবীজ আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে অবলম্বিত থাকে। যদি কোনও প্রকারে একটি বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই বীজ স্বীয় বংশবর্দ্ধন দ্বারা সত্বর তন্মধ্যে ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে। সুরাসার ফার্ম্মেণ্টের কথিত ইংরাজী নাম ঈষ্ট (yeast), বৈজ্ঞানিক নাম সাকারোমাইসিটিজ সোরভিজিই (Saccharomycetis Cervisiae)। সুরাসার প্রস্তুত করিবার জন্য যে ঈষ্ট ব্যবহার করিতে হয়, ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদিত ছিল। কিন্তু অতি অল্পদিন হইল, ঈষ্টের ও সুরাসারপ্রস্তুতপ্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ঈষ্টের বিশুদ্ধতার উপর উৎকৃষ্ট সুরার প্রস্তুতকরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই তথ্য জানিবার পর হইতেই অমিশ্র ও বিশুদ্ধ ঈষ্ট নির্ব্বাচন করিবার জন্য জার্ম্মানির নানা লাবরেটরিতে অণুবীক্ষণযন্ত্র লইয়া কত লোক নিযুক্ত থাকে। এমন কি, এক্ষণে জার্ম্মানির কোনও কোনও অঞ্চলে বিশুদ্ধ ও অমিশ্র ঈষ্টের এক বিস্তৃত ও লাভজনক ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার বিশুদ্ধ ঈষ্ট-বীজ তথা হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বোধ হয়, পাঠকেরা জানেন, সুরাসার ও সুরা, একই পদার্থ নহে। যে পদার্থকে ফার্ম্মেণ্টযুক্ত করিয়া সুরা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পদার্থকে তাহার ফার্ম্মেণ্টেশন হইয়া যাইবার পর, চুয়াইয়া লইলে যাহা পাওয়া যায়, তাহার

নাম সুরাসার। বিশুদ্ধ সুরাসারে জলীয়াংশ থাকে না। কিন্তু চুয়াইবার সময় যে জলীয় অংশ সুরাসারের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা বড় সহজে নিষ্কাশিত করা যায় না। বার বার চুয়াইয়া এবং অন্য উপায় দ্বারা ইহা হইতে জলীয়াংশ-বিযুক্ত করিয়া লইয়া, বিশুদ্ধ সুরাসার সংগ্রহ করিতে হয়। এই সুরাসারের সহিত জল ও অন্যান্য স্বাদু ও সুগন্ধ পদার্থ মিশাইলে যে পানীয় হয়, তাহা-কেই সুরা বলে। অনেক সময়ে স্বতন্ত্র করিয়া জল মিশ্রাইয়া সুরা প্রস্তুত করিতে হয় না। যে পদার্থ ফার্মেণ্টেশন উৎপন্ন করা হয়, তাহারই জলীয় অংশ উক্ত ফার্মেণ্টেশন-জাত সুরাসারের সহিত মিশ্রিত থাকে, এবং তাহাই মদিরা-রূপে ব্যবহৃত হয়। মদিরানিহিত সুরাসারই উত্তেজক এবং ইহারই জন্য সুরার মাদকতা শক্তি। নানাবিধ মদিরায় সুরাসারের পরিমাণের অল্লাধিক্য থাকে বলিয়াই, উহাদের মাদকতাশক্তির তারতম্য হইয়া থাকে।

তাল বা খেজুর রসের মধ্যেও ঈষ্টই ফার্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে। কেহ ঈষ্ট-বীজ রোপণ না করিলেও, আমরা দেখি, উক্ত সুমিষ্ট রস ক্ষণকাল বাহিরে থাকিলে আপনা-আপনিই বিকৃত হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, বায়ুমধ্যে ঈষ্ট অবলম্বিত থাকে। সুতরাং উক্ত রসমধ্যে উহাদের নিপতিত হইবার সম্ভাবনা। ঈষ্টবীজ কোনও মতে রসমধ্যে পড়িলেই, আপনার খাদ্য সংগ্রহ করিতে করিতে রসকেও বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। তাহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, সেই রসে নিহিত শর্করা-অংশ সুরাসাররূপে পরিণত হয়। বিকৃত তাল বা খেজুর রসের মদিরার ন্যায় মত্ততাদায়ী শক্তি, উহাতে উৎপন্ন সুরাসারেরই জন্য। আমাদের এ দেশে সুরাপ্রস্তুতকারীরা ঈষ্টের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে। তাহারা জানে যে, গুড় বা তালরস আপনি পচিয়াই মাদকরূপে পরিণত হয়। ফলতঃ, এ পৃথিবীতে জীবাণু অর্থাৎ উদ্ভিদগণের সাহায্য ব্যতীত কোনও প্রকারেই পচন-কার্য্যই সাধিত হইবার নয়।

সুরা ভিন্ন সির্কা ও দধিপ্রস্তুতপ্রণালী, য়্যালকোহল ফার্মেণ্টেশনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সির্কা মূলতঃ এক প্রকার অম্লাক্ত পদার্থ। রাসায়নিক ভাষায় এই পদার্থকে য়্যাসেটিক য়্যাসিড কহে। সুরার য়্যালকোহল অংশের সহিত অতিরিক্ত অম্লজন বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগ হইলেই, য়্যাসেটিক য়্যাসিড প্রস্তুত হয়। সুরা পচিয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অন্ততঃ সুরাব্যবসায়ীরা তাহা বিশেষরূপ জানে। কেন না, তাহারা ইহাতে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সেই বিকৃত সুরার অন্যতর নাম যে

সির্কা বা ভিনিগার, তাহা বোধ হয় পাঠকদিগের সকলের নিকট পরিচিত নহে। সুরাসহ বিশুদ্ধ সুরাসার ও জল ব্যতীত নানাপ্রকার স্বাদুকর ও গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থও সুরা সহ মিশ্রিত হইয়াযায়। সির্কা-ফার্মেণ্ট, সুরা-সংশ্লিষ্ট এই যবক্ষারজান পদার্থ সংগ্রহ করিবার সময় বায়ু হইতে অম্লজন বাষ্প লইয়া সুরাসারের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশাইয়া দেয়। তজ্জন্যই সুরা অম্লাক্ত হয়। ইহাকেই সুরা পচিয়া যাওয়া বলে। অম্লাক্ত সুরাই ভিনিগার বা সির্কা। এ দেশে ইক্ষুরস পচাইয়া সির্কা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইক্ষুরসনির্ম্মিত শর্করা প্রথমে য়্যালকোহল হয়, পরে ঐ য়্যালকোহল হইতে সির্কা ফার্মেণ্টের সাহায্যে সির্কা হয়। সির্কা-ফার্মেণ্ট ঈষ্টের ন্যায় বায়ুসহ মিশ্রিত থাকে। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় মাইকোডার্ম্মা য়্যাসেটি (Mycoderma Aceti) কহে। ইহার অত্যাচার হইতে মদিরা রক্ষা করিবার জন্য, ব্যবসায়ীদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, বায়ু-অবলম্বিত সির্কা ফার্মেণ্ট অনায়াসেই মদিরাকে বিকৃত করিতে পারে। এই জীবাণুরা অতিশয় ক্ষুদ্র, এবং বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; কোনও মতে মদিরাপাত্রমধ্যে একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই শীঘ্র উহা নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য ব্যবসায়ীরা কেবল সচ্ছিদ্র কাক দিয়া বোতলের মুখপথ বন্ধ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ধাতব পদার্থের পাতলা পাত দ্বারা উহাকে আবার আবৃত করিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও ক্ষুদ্র জীবাণুর অনিষ্টসাধনের সকল পথ বন্ধ করা হয় না। হয় ত, দ্রাক্ষাফল হইতে রস নিংড়াইবার সময় সেই রসের সহিত কোনও প্রকার সির্কা-জীবাণু মিশ্রিত হইয়াছে, অথবা কাচপাত্রমধ্যে সুরা পুরিবার সময় বায়ুর সহিত কোনও একটি সির্কা-বীজ সুরাপাত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, —এইরূপে পরম্পর একটি বা দুটি বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অনায়াসেই শীঘ্র সমুদয় সুরা বিকৃত করিয়া দিতে পারে। সম্প্রতি এইরূপ নানাবিধ সম্ভাব্য অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য, বোতলপূর্ণ মদিরা একবার এক মিনিট কালের জন্য ফুটন্ত জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া লওয়া হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপে সির্কা-বীজ মরিয়া যায়। সুতরাং যদি একবার মদিরাপাত্রকে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে মদিরা বিকৃত হইবার সমস্ত ভাবী আশঙ্কা দূর হইয়া যায়।

দধি-ফার্মেণ্ট দুগ্ধনিহিত শর্করাকে রূপান্তরিত করিয়া, একপ্রকার অম্লাক্ত

পদার্থ উৎপন্ন করে। এই অম্লাক্ত পদার্থকে রাসায়নিক ভাষায় ল্যাক্‌টিক য়্যাসিড বলে। দুগ্ধের সহিত জল, শর্করা, যবক্ষার-জান সংঘটিত পদার্থ (ইহাকে ইংরাজীতে কেসিন বলে) আর তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। ইহা ব্যতীত, ক্যালসিয়ম, ফস্‌ফেট প্রভৃতি Salts থাকে। উত্তপ্ত দুগ্ধের সহিত যখন একটু দধি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই দধির সহিত উত্তপ্ত দুগ্ধে দধি-বীজ বা ল্যাক্‌টিক ফার্মেণ্ট উপ্ত হয়। ল্যাক্‌টিক ফার্মেণ্ট দুগ্ধের শর্করা অংশকে আক্রমণ করিয়া ল্যাক্‌টিক য়্যাসিডরূপে পরিণত করে। ইহাতে দুগ্ধনিহিত কেসিন অংশ কতক পরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া জমাট বাঁধে। তাহাতেই দধি জমাট দেখায়। দধির সহিত দুগ্ধের অন্য সকল উপাদানই বিদ্যমান থাকে। কেবল থাকে না শর্করা। শর্করা রূপান্তরিত হইয়া ল্যাক্‌টিক্ য়্যাসিড হইয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ল্যাক্‌টিক্ য়্যাসিডের বিদ্যমানতার জন্যই দধির অম্ল আস্বাদন হয়।

দুগ্ধের তৈলাক্ত অংশ বা মাখমেও এক প্রকার ফার্মেণ্টেশন্ হয়। ইহার ফল বিউটিরিক্ য়্যাসিডের উৎপত্তি। বিউটিরিক্ ফার্মেণ্টও এক প্রকার জীবাণু। সুতরাং ইহাও এক জৈবিক ফার্মেণ্ট।

২। রোগোৎপাদনসম্বন্ধীয় ফার্ম্মেণ্টেশন। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, জীব-শরীরের নানা দুশ্চিকিৎস্য ও সংক্রামক রোগের মূল কারণ এক প্রকার জীবাণু। জীবাণু বলিলে, অনেকের মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের কথা হয় ত উদিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল রোগোৎপাদক জীবাণুরা কীট নহে। ইহারা জন্তুশ্রেণীভুক্তই নহে। এই জীবাণুগণ সম্পূর্ণরূপেই উদ্ভিদ, এই জন্য ইহাদিগকে এবং প্রস্তাবোল্লিখিত অন্য সকল প্রকার জৈবিক ফার্মেণ্টকে উদ্ভিজ্জাণু বলাই ভাল। এই উদ্ভিজ্জাণুরা জীবদেহে কোনও মতে প্রবিষ্ট হইলে, তন্মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহাই দেহস্থ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগোৎপত্তি করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জাণুগণ যে প্রণালীতে জীবদেহস্থ রস বিশ্লেষণ করিয়া রোগমূলক বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে, তাহাকে ফার্ম্মেণ্টেশন বলে। কিন্তু এই ফার্ম্মেণ্টেশন-ক্রিয়ার চরম ফল রোগোৎপাদন; এই নিমিত্ত ইহাকে রোগোৎপাদনসম্বন্ধীয় ফার্ম্মেণ্টেশন বলা হইয়া থাকে।

পীতজ্বর, টাইফইড জ্বর, সূতিকা-জ্বর, বসন্ত, যক্ষ্মা, ইরিসিপেলাস, ডিপ্-থিরিয়া, বিসূচিকা, ধনুষ্টঙ্কার, প্রভৃতি নানা অনারোগ্য ও মারাত্মক ব্যাধি, এবং খুব সম্ভব, জলাতঙ্ক রোগ পর্য্যন্ত উদ্ভিজ্জাণুকৃত ফার্ম্মেণ্টেশন ক্রিয়ার

আছে। ইহারা রোগীর থুতু, গয়ের, শোণিত, পূয, মল, মূত্র, প্রশ্বাস প্রভৃতির সহিত বাহির হয়। কোনও সুস্থদেহ জন্তু যদি কোনওরূপে এই সকল উদ্ভিজ্জাণুর কোনও একটি বীজ দেহস্থ করে, সেই বীজ অচিরে বংশবর্দ্ধন করিয়া, সেই সুস্থ দেহের শোণিতের মধ্যে ফার্ম্মেণ্টেশন দ্বারা এক বিশেষ রোগ উৎপন্ন করিয়া তাহার জীবনসংশয় করিতে পারে। অনেকেই জানেন, পূর্ব্বোল্লিখিত রোগগুলির অনেকের কোনও আরোগ্যকারী ঔষধ নাই। চিকিৎসাবিজ্ঞান ঐ সকল কাল-ব্যাধির গতিরোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঐ সকল রোগাক্রান্ত কত সহস্র জন্তু অকালে কালের কবলে কবলিত হয়। এক সুখের বিষয় এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান ঐ সমুদয় মারাত্মক ব্যাধির মূল কারণ অবগত হইতে পারিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, একদিন বিজ্ঞানই ঐ সকল ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায়বিধান করিবেন। আমরা জানি, ইহারি মধ্যে দুই চারিটি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক ও ব্যাধিনিবারক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণুদিগের অস্তিত্ব ও মারাত্মক কার্য্য পরিজ্ঞাত হইবার পর হইতে আমরা অনেক প্রকারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তুরপনেয় অনিষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। পূর্ব্বে দেহের কোনও স্থান ক্ষত হইলে তথায় উদ্ভিজ্জাণুরা আশ্রয় লইয়া সময়ে সমস্ত দেহের শোণিতকে বিষাক্ত করিয়া জীবন বিনষ্ট করিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এই সকল অনিষ্টকারী উদ্ভিজ্জাণুর কার্য্যরোধ করিবার জন্য নানা উপায়ে উহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলি। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা অনেক অল্প হয়। বর্ত্তমান অস্ত্রচিকিৎসার Anti-septic প্রণালীর কৃতকার্য্যতার একমাত্র কারণ এই যে, উহাতে ক্ষত স্থানে 'Germ' প্রবেশ করিতে পারে না। জারম্ এই ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জাণু বই আর কিছুই নহে। কার্ব্বলিক, য়্যাসিড্, আইওডাইন্ প্রভৃতি আরক ব্যবহার দ্বারা সকল Germ বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয়। এই জন্য ক্ষত-স্থান পচিতে পায় না, অর্থাৎ সেখানে উদ্ভিজ্জাণুরা ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করিতে পায় না। তাই দেহস্থ শোণিতের বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পচন-প্রতিরোধী Anti-septic প্রণালী অবলম্বিত হইয়া অবধি,—অস্ত্র-চিকিৎসকেরা সাহস করিয়া নানাপ্রকার কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা কত রোগীর রোগনাশ ও জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অনেক কথা বলিয়াছি। এখানে স্বতন্ত্র করিয়া আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, মৃত পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য, কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু, তন্মধ্যে ও তদুপরি এক প্রকার ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে। তাহারই ফলে যৌগিক জীবদেহ সকল রূঢ় পদার্থে বিশ্লিষ্ট হয়। অবশ্য, উদ্ভিজ্জাণুই নিঃস্বার্থভাবে অথবা জ্ঞাতসারে ইহা সম্পন্ন করে না। উহারা আপনাদিগের আহারীয় সংগ্রহ করিতে গিয়াই নিতান্ত গৌণভাবে মৃত পদার্থকে রূঢ় পদার্থে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ বিশ্লিষ্ট করার জন্য প্রকৃতির কত মহদুপকার সাধিত হয়, পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের 'পচন' প্রবন্ধ একবার দেখিলে, সমুদয় জানিতে পারিবেন।

ফার্ম্মেণ্টেশন মতবাদ সম্বন্ধেও মূল কথা উক্ত প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। পুনরুক্তিভয়ে আমরা এ স্থলে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। কেবল বোধ হয় এই টুকু বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমানের উদ্ভিজ্জাণু মতবাদ, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাণু দ্বারাই যে নানা প্রকার ফার্ম্মেণ্টেশন কার্য্য সাধিত হয়, তাহা সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। তিনি নানা পরীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বপ্রচলিত লীবিগ মতবাদের খণ্ডন করিয়া, স্বীয় Germ theoryর নিত্যতা ও সত্যতা সপ্রমাণ করেন। সেই অবধি পাষ্টর-প্রবর্ত্তিত—জীবাণু অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাণু মতবাদ যে সকল প্রকার ফার্ম্মেণ্টেশনের যথার্থ ব্যাখ্যা, ইহা সর্ব্বদেশীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী মধ্যে স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

কেরোসিনের উৎপত্তি।

কেরোসিনের উৎপত্তি লইয়া বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে অনেক দিন অবধি নানা আন্দোলন চলিতেছে। গৃহকার্য্য ও কলকারখানাদিতে এই আকরিক তৈলের বহুল প্রচলন হওয়াতে, ইহার প্রকৃত উৎপত্তি-কারণের নিরূপণ বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন,—কেরোসিন অপরিষ্কৃত অবস্থায় ভূগর্ভের অতি নিম্ন স্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমেরিকা ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশে ইহার অনেক আকর আছে; ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া পরিষ্কৃত করিলেই, ইহা ব্যবহারোপযোগী হয়। কেরোসিনের ভাণ্ডার, পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় ক্ষয়শীল ও সীমাবদ্ধ কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে, অনেকে বিশেষ সচেষ্ট আছেন। বাস্তবিকই যদি ইহা পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় ক্ষয়শীল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে কেরোসিনের ক্রমিক ক্ষয়ের সহিত যে একটি মহান ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূত্রপাত হইবে,

তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ কাল য়ুরোপ ও আমেরিকায় অনেক কল কেরোসিন ও আকরিক বাষ্প * দ্বারা চালিত হইতেছে,—কাজেই দুষ্প্রাপ্য হইলে উপযুক্ত দাহ্যাভাবে কলকারখানা সম্পূর্ণ অচল হইবে ভাবিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। শৈশবে ঠাকুরমার নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম, সহরের দুর্গন্ধময় ময়লা হইতে, সাহেবেরা নানা কৌশলে কেরোসিন প্রস্তুত করেন। পাকা পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহুব্যয়ে ময়লা স্থানান্তরিত করিবার অন্য কোনও পার্থিব কারণ ঠাহরাইতে না পারিয়া, সেই সময়ে ঠাকুরমার কথাটা বড়ই সত্য মনে করিতাম। ইহার ফলে কেরোসিনের পবিত্রতার উপর একটা ঘোর সন্দেহ বহুকাল হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া মনে হয়, আজ কাল নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে কেরোসিনের উৎপত্তি ও ইহার ভাণ্ডারের অবশ্যম্ভাবী শূন্যতা লইয়া যে প্রকার মহা আন্দোলন চলিতেছে,—ঠাকুরমার আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তটি অন্ততঃ আংশিক সত্য হইলেও, অনেকগুলি লোকে সুস্থচিত্তে কালযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই, উদ্ভিদাদি জৈবিক পদার্থের ধ্বংসাবশেষ হইতে কেরোসিনের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং কাযেই দূর ভবিষ্যতে ইহাও যে পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত কেহ সন্দেহ করেন নাই। মেণ্ডেলিফ (Mendeleef) নামক জনৈক বিখ্যাত রুষীয় বৈজ্ঞানিক, সম্প্রতি কেরোসিনের উৎপত্তির একটি অভিনব মতবাদ প্রচার করিয়া, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক মেণ্ডেলিফ বলেন, যে সকল পণ্ডিতগণ উদ্ভিজ্জাত জৈবিক পদার্থ হইতে কেরোসিনের উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত, এবং তাঁহাদের মতবাদও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। কেরোসিনের সহিত পাথুরিয়া কয়লার কেবলমাত্র রাসায়নিক সাদৃশ্য দেখিয়া, উভয়ই একজাতীয় পদার্থ ও ইহাদের উৎপত্তিপ্রকরণও এক বলিয়া উপসংহার করা, কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। য়ুরোপের প্রধান প্রধান কেরোসিন ক্ষেত্রগুলি পরীক্ষা করিলে, তৈলের আকর প্রায়ই ভূপৃষ্ঠের তৃতীয় যুগের (Reptilian Age) স্তরমধ্যবর্ত্তী দেখা গিয়া থাকে; এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ভিজ্জ-যুগের (Carboniferous Age) স্তরসমূহে যথেষ্ট উত্তাপ ও চাপ সহযোগে, প্রোথিত উদ্ভিজ্জকঙ্কাল সকল কেরোসিনে পরিণত হয়, এবং পরে ক্রমিক পরিবর্ত্তন দ্বারা, ইহা ঊর্দ্ধতন স্তরে নীত হইয়া থাকে। মেণ্ডেলিফের মতে এই প্রাচীন মতবাদ আমূল ভ্রমপূর্ণ। তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকার তৈলক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছেন, অধিকাংশ স্থানে উদ্ভিজ্জ-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী (Devonian Age) সময়ের স্তরাবলিতে বহুল কেরোসিন দৃষ্ট হইয়া থাকে; এ সকল স্থানে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে ঊর্দ্ধতন উদ্ভিজ্জযুগের তৈল উৎপন্ন হইয়া, পরে কঠিন প্রস্তরাবরণ ও দুর্ভেদ্য স্তরের মধ্য দিয়া, ইহা যে নিম্নে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব; কাযেই প্রাচীন সিদ্ধান্তীগণের কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মেণ্ডেলিফের মতে কেরোসিনের উৎপত্তির সহিত জৈবিক পদার্থ মাত্রেরই কোনও সম্বন্ধ নাই। এই তৈল ভূমধ্যস্থ ধাতব পদার্থ দ্বারা নৈসর্গিক উপায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন, ভূগর্ভের অনেক স্থানই, আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে, লৌহ ও লৌহমিশ্র পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে; মেণ্ডেলিফ বলেন, ভূগর্ভনিহিত এই

* ইহা কেরোসিনের প্রকারভেদ মাত্র; কেরোসিনের আকরে স্বাভাবিক বাষ্পাবস্থায় ইহা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

লৌহ ও অঙ্গারযুক্ত লৌহ (Carbides) কেরোসিন উৎপন্ন হয়। ভূগর্ভের অতি নিম্নস্তরস্থ উত্তপ্ত অঙ্গারযুক্ত লৌহে কোন প্রকারে জলসংযোগ হইলে, কতক জল বিশ্লিষ্ট হইয়া লৌহস্থ অঙ্গারের সহিত মিলিয়া, কেরোসিন উৎপন্ন করে। এই নিম্ন স্তরে তাপাধিক্য প্রযুক্ত ইহা বাষ্পাকারে থাকে, পরে জলীয় বাষ্প সংমিশ্রিত হইয়া, আয়তন ও চাপের বৃদ্ধি প্রযুক্ত উপরের স্তরাভিমুখে প্রবাহিত হয়; তথায় শীতল স্তরের সংস্পর্শে ক্রমে তরল পদার্থে পরিণত হইয়া, সেখানেই ইহা, কেরোসিন রূপে সঞ্চিত হইতে থাকে।

রুষিয়ান্ আচার্য্যের এই নবপ্রচারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেকে বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছেন। লৌহ ও অঙ্গার ভূগর্ভে এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত আছে যে, কোটী বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কেরোসিন উৎপন্ন হইলেও, পৃথিবীর ভাণ্ডারের অত্যল্প ক্ষয় অনুভবযোগ্য হইবে না; কাযেই, ভবিষ্যতে কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের যে একটা মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহা অপনীত হইবে, এবং পৃথিবী কয়লা ও কেরোসিন শূন্য হইলে, ইহাদের স্থানপরিপূরক একটি নূতন দাহ্য পদার্থ আবিষ্কার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণের যে একটি মহা ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারও বোধ হয় অনেকটা লাঘব হইবে। মেণ্ডেলিফ্ আরো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—একস্থান হইতে কেরোসিন উত্তোলিত হইলে, শূন্য স্থানের পূরণার্থে তৎক্ষণাৎ স্বতঃই নূতন তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। সাহেবের এই শেষ কথা দ্বারা কেরোসিন ক্ষেত্রের সত্ত্বাধিকারীগণ আকর অক্ষয় থাকিবে ভাবিয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। এখন তৈলের এই নূতন সিদ্ধান্তটি প্রাচীনমতবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের তর্কের সম্মুখে অটল থাকিয়া, মেণ্ডেলিফের আশ্বাসবাণী সফল করিলে, সকল দিকেই মঙ্গল।

মক্ষিকার দৌত্যকার্য্য।

কাব্যে, বিরহ-বিধুরা নায়িকা কর্ত্তৃক প্রণয়ীর উদ্দেশে ভ্রমর ও মক্ষিকাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবার বিবরণ অনেক দেখা যায়। এ ত গেল প্রাণীর কথা, মলয়ানিল ও মেঘাদি জড়কেও দূতপদে নিয়োগ করিবার উদাহরণ, কাব্যে বড় দুষ্প্রাপ্য নয়। কবির চিত্র, প্রায়ই প্রত্যক্ষ স্বভাবের নিখুঁৎ ছবি হয় না, হইলেও ইহার সৌন্দর্য্য থাকে না; এজন্য প্রায়ই ইহা, অলঙ্কারের একটি সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত থাকে; পাঠক, কবির নানা প্রলাপোক্তি ত্যাগ করিয়া, সারটুকু গ্রহণ করেন। কিন্তু আজ কাল কবির প্রলাপও সত্য হইতে চলিল,—পাঠক-পাঠিকাগণ বার্ত্তাবহ কপোতের কথা শুনিয়া থাকিবেন, ইহার বিবরণ জানিলে দময়ন্তীর বার্ত্তাবহ হংসের কথায় কবিকল্পনাসৃষ্ট বা প্রণয়িনীর বিকৃত মস্তিষ্কজ উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারিবেন না। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ মেঘদূতের পুনরভিনয়সংবাদ আজও আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। যাহা হউক, কপোতের সাহায্যে বার্ত্তাবহন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে দেখিয়া, টেনাক্ (Teynac) নামক জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, মধুমক্ষিকা দ্বারা দূরদেশে সংবাদপ্রেরণের চেষ্টা করিতেছেন, এবং এই অদ্ভুত প্রয়াসে আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

অনেকেই জানেন, মধুমক্ষিকাগণ মধুসংগ্রহার্থে দূরবর্ত্তী বনে অবিশ্রান্ত বিচরণ করে, এবং যথাসময়ে সায়াহ্নে স্বীয় চক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে; কোন প্রকারে বিনষ্ট বা ছিন্নপক্ষ না হইলে, দূরগমনে ইহাদের পথভ্রান্তি হয় না। মক্ষিকার এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া, এক নূতন উপায়ে ইহাদিগকে মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী করিবার কথা, সহসা টেনাকের মনে উদিত হইয়াছিল। মক্ষিকার উক্ত ক্ষমতার সীমা কত দূর, তাহা স্থির করিবার জন্য, সাহেবটি

একটি ক্ষুদ্র থলিয়া মক্ষিকাপূর্ণ করিয়া, পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও একটিরও পথভ্রান্তি হয় নাই, সকল গুলিই ঘণ্টায় সাত-মাইল বেগে উড়িয়া নির্দ্দিষ্ট চক্রে উপস্থিত হইয়াছিল। টেনাক্ ইহা দেখিয়া, কপোতের ন্যায় মক্ষিকাকে পৃথক্ ভাবে বার্ত্তাবহন শিক্ষা দেওয়া বা বিশেষ জাতি অনুসারে ইহাদের নির্ব্বাচন করিবার কোনও আবশ্যক হইবে না, বিবেচনা করিয়াছিলেন। এবং অল্পায়াসে শীঘ্রই ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঁহার এক বন্ধুর সমীপে যথেচ্ছ সংবাদাদিপ্রেরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

টেনাকের অবলম্বিত উপায়টি অতি সহজ। প্রথমতঃ, কতকগুলি সবলপক্ষ সুস্থ মক্ষিকা সংগ্রহ করিয়া যথেচ্ছ বহির্গমন ও প্রবেশোপযোগী ছিদ্রযুক্ত একটি খোপে যথেষ্ট আহারাদি দিয়া, ইহাদিগকে কিছু দিন আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এই উপায়ে আবাসস্থানের সহিত তাহাদের বিশেষ পরিচয় হইলে, এই পালিত মক্ষিকাগুলির মধ্যে, কয়েকটিকে একটি লৌহজালে আবৃত ক্ষুদ্র বাক্সে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহার বন্ধুর নিকট ডাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাক্স হস্তগত হইলে, টেনাকের উপদেশানুসারে, তিনি প্রথমতঃ বন্ধনমুক্ত করিয়া ইহাদের সম্মুখে এক পাত্র মধু রাখিতেন, ক্ষুধার্ত্ত মক্ষিকাগণ নিকটে আহার পাইয়া ইতস্ততঃ উড়িবার চেষ্টা না করিয়া মধুপানে নিযুক্ত হইত। তিনিও এই অবসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে, ঈপ্সিত সংবাদ লিখিয়া, শিরিশ দিয়া, এ গুলি তাহাদের পক্ষের সন্ধিস্থলে সতর্কতার সহিত লিপ্ত করিয়া দিতেন। মক্ষিকাগণ মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, ইতস্ততঃ উড়িয়া পরিচিত আবাস না পাইয়া, দ্রুত-পক্ষে তদনুসন্ধানে বহির্গত হইত, এবং অল্পকালের মধ্যে প্রেরকের নিকট তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত আবাসে উপস্থিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট ছিদ্র দ্বারা আশ্রয়গ্রহণের চেষ্টা করিত। কিন্তু উক্ত ছিদ্র সকল এককালীন একটি মাত্র মক্ষিকাশরীর প্রবেশের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করায়, পক্ষ আকুঞ্চিত করিয়াও ইহারা গাত্রলিপ্ত পত্র সহ কোটরপ্রবিষ্ট হইতে পারিত না, এবং প্রবেশচেষ্টা হইতেও বিরত হইত না। ইহা দ্বারা কাগজখণ্ড বার বার ছিদ্রমুখে ঠেকিয়া শরীরচ্যুত হইয়া কোটরসম্মুখে পড়িয়া থাকিত,—মক্ষিকাপ্রেরক যে কোনও সময়ে আসিয়া তাহা পাঠ করিতে পারিতেন। টেনাকের বন্ধুরও এই প্রকার এক দল মক্ষিকা ছিল, বন্ধুপ্রেরিত বাক্স শূন্য হইলে, তিনি আবার ইহা স্বপালিত মক্ষিকায় পূর্ণ করিয়া, টেনাকের নিকট প্রেরণ করিয়া সংবাদ আনয়ন করিতেন। এই প্রকারে বন্ধুদ্বয় অনেক দিন অবধি সংবাদের আদান প্রদান করিয়াছিলেন। টেনাক্ আজও এ বিষয়ের পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। দশ বারো মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গেলে, মক্ষিকাগণের পথভ্রান্তি হয় দেখিয়া, বিশেষ কোনও শিক্ষা বা বংশোন্নতি দ্বারা, দূরতর প্রদেশে সংবাদপ্রেরণ সম্ভবপর কি না, এখন তাহারই পরীক্ষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ডাক বসাইয়া মক্ষিকার সাহায্যে শীঘ্র সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যুদ্ধাদিকালে যখন মক্ষিকাদির দৌত্যকার্য্য বিশেষ আবশ্যক, সেই সময়ে পথিমধ্যে মক্ষিকাবাসাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা, সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, এই শেষ সংকল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঘ্রাণশক্তি।

প্রাণিমাত্রেই অল্পাধিক ঘ্রাণশক্তির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একজাতীয় জীবের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট গন্ধ সমভাবে অনুভূত হয় না। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার প্রভাব বড়ই জটিল ও শৃঙ্খলাহীন বলিয়া বোধ হয়। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে গন্ধ এক ব্যক্তির প্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, ব্যক্তিভেদে তাহাই বিরক্তি-উৎপাদক হইয়া পড়ে। অনেকে পলাণ্ডুর গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু আবার কেহ কেহ সেই পলাণ্ডুযুক্ত ব্যঞ্জন অতি উপাদেয়

বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, জগদ্বিখ্যাত গেটে আপেল ফলের ঘ্রাণ অসহনীয় বিবেচনা করিতেন; আবার শিলার তাহা বড় প্রীতিকর বলিয়া আদর করিতেন। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, ঘ্রাণোত্তেজক স্নায়ুমণ্ডলীর প্রকৃতিভেদে, একই গন্ধের এই প্রকার ভিন্ন ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। এতদ্ব্যতীত, ঘ্রাণের আরো অনেক কার্য্য আছে; ইহার অনেক গুলিই আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কিন্তু অনাবশ্যক বোধে মনঃসংযোগ করি না। সম্প্রতি ডাক্তার রিচার্ডসন্ নানা ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, জীবশরীরের উপর ঘ্রাণের কার্য্য সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।* ইহাতে কয়েকটি নূতন কথারও সমাবেশ আছে। ইঁহার মতে, ঘ্রাণশক্তির সহিত স্মৃতিশক্তির একটি বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে; সাহেবের এক বন্ধুর কথা দ্বারা এবং আরো অনেক বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়া, লেখক ইহার সত্যতা বেশ প্রমাণ করিয়াছেন। রিচার্ডসনের উল্লিখিত বন্ধুটি অতি শৈশবে গাড়ি উল্‌টাইয়া বিশেষ আহত হইয়াছিলেন; উক্ত দুর্ঘটনাস্থলে একটি দুর্গন্ধময় গোময়স্তূপ ছিল, এই গোময় ঘটনাক্রমে বালকের বস্ত্রে সংলগ্ন হওয়ায়, ইহার দুর্গন্ধে তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর, উহা বাল্যঘটনার সামান্য স্মৃতিমাত্রও লোকটির মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উক্ত ঘটনার পঞ্চাশ বৎসর পরে, এক দিবস একটি গ্রাম্যপথে গোময়ের দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, তাঁহার মনে পূর্ব্বকার গোময়-স্তূপের কথা সহসা উদিত হইয়াছিল। স্মৃতি ও ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে আরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,—কোনও দুর্গন্ধবিশিষ্ট পদার্থের স্মরণ করিলে, তাহার ঘ্রাণ যেন স্বতঃই নাসারন্ধ্রে উপস্থিত হইয়া, বমনোদ্বেগ উৎপাদন করে,—রিচার্ডসনের মতে, ইহাও উক্ত শক্তিদ্বয়ের ঘনিষ্ঠতার ফল। মনুষ্য অপেক্ষা ইতর প্রাণীর মধ্যে এই বিষয়ের আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; ইহারা ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে, বা মনুষ্য অবলম্বিত অন্য কোনও উপায়ে, কোনও অতীত ঘটনা স্মৃতি পথে আনিতে পারে না, ঘ্রাণ দ্বারাই ইহারা স্মৃতিরক্ষণে সমর্থ হয়। শিকারী কুকুরদিগের ঘ্রাণই প্রধান বল, ঘ্রাণ না পাইলে ইহারা শিকারের আকৃতি প্রকৃতি বা আক্রমণ কৌশলাদির বিষয় কিছুই মনে করিতে পারে না। আর এক জাতীয় কুকুরের মধ্যে, ঘ্রাণশক্তির আরো অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও পদার্থ ইহাদের সম্মুখে ধরিয়া, কোনও গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রাখিলে, যে পর্য্যন্ত পদার্থটির গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পায়, তাহার কথা ইহারা কিছুতেই ভুলে না, এবং শিক্ষিত কুকুর হইলে অনায়াসে পদার্থটি খুঁজিয়া বাহির করিতেও পারে; কিন্তু কোনও উপায়ে ইহার প্রকৃত গন্ধ বিলুপ্ত করিলে, গন্ধের সহিত পদার্থের স্মৃতিও এককালীন লোপ প্রাপ্ত হয়, এমন কি সম্মুখে থাকিলেও জানিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক গন্ধের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে; রিচার্ডসন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কতকগুলি গন্ধ আঘ্রাণ করিলে সহজে নিদ্রাবেশ হয়, আবার কতকগুলি দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় গলিত জীব শরীরের পূতি গন্ধ আঘ্রাণ করিলে নানা ভয়ানক স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

---

* Dr. B. W. Richardson in the *Asclapiad*.

মীরকাশেম।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মীরকাশেম এক্ষণে তাঁহার উচ্চাভিলাষের চরম সীমায় উঠিলেন। যে আশা তাঁহাকে বাঙ্গালার মসনদের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার প্রলোভনে তিনি মহা-দুঃসাহসিকতায় নির্ভর করিয়া অসম্ভবও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই আশা এক্ষণে অন্য মূর্ত্তিতে তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। তিনি বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় অধিপতি হইলেন বটে, কিন্তু শূন্য রাজকোষ, কাজ কর্ম্মে ও হিসাবপত্রে বিশৃঙ্খলা, কর্ম্মচারীদিগের অনুরাগ ও বিরাগ, নানাবিষয়ে তাঁহার মনে ঘোর চিন্তা আনিয়া দিল।

ইংরাজ কোম্পানীকে সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী যে সমস্ত টাকা দিতে হইয়াছে, তাহাতে রাজকোষ একেবারে শূন্য; এমন কি, কপর্দ্দক পর্য্যন্তও নাই। মীরজাফরের আমলে শৃঙ্খলা বলিয়া একটা পদার্থ ছিল না; বিশেষতঃ, সেরাজের সিংহাসনচ্যুতির পর হইতে রাজকোষ ক্রমাগত লুণ্ঠিত ও শোষিত হইয়াছে। যে অর্থের বিনিময়ে তিনি বাঙ্গালার সিংহাসন কিনিলেন, সেই অর্থের অভাবই এক্ষণে তাঁহার মসনদ কণ্টকময় করিয়া তুলিল।

তার পর, তাঁহার নিজের সেনাদিগের বেতন দিতে হইবে। তাহারা অনেক দিন ধরিয়া মাহিয়ানা পায় নাই, ক্রমে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দিল্লীর বাদসাহের গতিরোধ করিবার জন্য তিনি পাটনায় একদল ইংরাজ সৈন্য রাখিয়াছিলেন; তাহাদেরও বেতন বাকি। ইংরাজ কোম্পানীকে যে টাকা ধার দিতে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহারও অন্ততঃ অর্দ্ধেক দেওয়া চাই। এত গোলযোগের ও অর্থাভাবের মধ্যে পড়িয়াও, মীরকাশেম সাহস, দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইলেন না।

অন্য নবাব হইলে প্রজাপীড়ন করিয়া অতি সহজেই রাজকোষের শূন্য অংশ পূর্ণ করিয়া লইতেন। কিন্তু মীরকাশেম প্রজাপীড়ক নহেন; বিধাতা সে উপাদান তাঁহার মধ্যে এক তিলও রাখেন নাই। তিনি অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

মীরজাফরের আমল—লুটের ও বিশৃঙ্খলার আমল। তাঁহার আমলে অনেক বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্ম করিয়া লুঠতরাজে পেট মোটা করিয়া ঐশ্বর্য্যের

সুখভোগ করিতেছিলেন। মীরকাশেম তাঁহাদের হিসাবপত্র তলব করিয়া, নিকাশের মুখে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইলেন। রাজস্ববিভাগে আদায় পত্র ও হিসাব রক্ষা সম্বন্ধে কঠোর নিয়মের প্রচলন করিয়া, নিজে সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। অতিশীঘ্রই ইহার ফল ফলিল। তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই নিজের ও ইংরাজ সেনাদের বেতন শোধ করিয়া দিয়া, কলিকাতায় কোম্পানীকে প্রতিশ্রুত অর্থের অর্দ্ধকাংশ পাঠাইয়া দিলেন।

বাদসাহের গতিরোধ করিবার জন্য পাটনায় যে মিশ্র সেনাদল রক্ষিত হইয়াছিল, মীরকাশেম নিজে তাহাদের অধিনায়কত্ব করিয়া, বাদসাহের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করিলেন। জয়শ্রী তাঁহাকেই উপযুক্তপাত্র ভাবিয়া তাঁহার গলদেশে মাঙ্গলিক জয়মাল্য নিক্ষেপ করিলেন। বাদসাহ সন্ধি করিয়া, মীরকাশেমকে তিন প্রদেশের সুবাদারি দিয়া, দিল্লীতে চলিয়া গেলেন।

সেনাদলের মধ্যে যে একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান এবং রাজপদো-চিত ক্ষমতা ও বাহুবল বৃদ্ধি করিতে গেলে যে তাহাদের সংশোধন বিশেষ আবশ্যক, বাদসাহের সহিত পাটনার যুদ্ধকালে, মীরকাশেম এ বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেনাদলের মধ্যে একটি মহা ত্রুটি এই যে, তাহারা নবাবের বেতনভোগী হইলেও, ইংরাজ সেনানায়কেরা তাহাদের পরিচালন ও শিক্ষার ভার লইয়া আসিতেছেন। মীরকাশেম সমস্ত সেনাকে নূতন উপায়ে সুশিক্ষিত করিয়া, নিজের হস্তে তাহাদের পরিচালন ও সন্নি-বেশক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মীরকাশেম, মীরজাফর নহেন। ইংরাজ তাঁহাকে সিংহাসন দিয়াছে, বেশ কথা। কিন্তু কেন দিয়াছে? তাঁহার রাজকোষের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কি নহে? ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কি একটা ধারা-বাহিক ও চিরস্থায়ী সম্বন্ধ থাকিয়া যায়? তাঁহার বাড়ী ঘর, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার প্রজা, তিনি রাজস্বের মালিক, শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ প্রকৃতি-পুঞ্জ তাঁহার মুখ চাহিয়া অত্যাচার অবিচারের বিচার প্রার্থনা করিতেছে। ইংরাজ কে যে, তাঁহাকে এই সমস্ত অধিকার হইতে দূরে রাখিয়া নিজের হাতে ক্ষমতা লইবার চেষ্টা করে?

রাজ্য তাঁহার, রাজস্ব-আদায়ের ভার তাঁহার, প্রজা তাঁহার, তাহাদের পালন ও দোষগুণের বিচারক্ষমতা তাঁহার। কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা ন্যায়ানুসারে রাজ্যাধিপতির। ইহা ত আবহমান কাল হইতে

প্রচলিত প্রথা ; তবে কেন ইংরাজ তাঁহার রাজ্যসম্বন্ধীয় ব্যাপারে, তাহাদের কোনও স্বত্ব বা দাবি দাওয়া ও অধিকার না থাকা সত্বেও, মুরশীদাবাদ হইতে অনেক দূরে থাকিয়াও হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা পায় !

দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ তখনও শুষিতেছে। অত বড় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরটা সমস্ত বাঙ্গালা দেশের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া, একবারে দেশটাকে উজাড় করিয়া গিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়াছে, তাহাদেরও বলসঞ্চয় করিতে অনেক সময় লাগিবে। ইংরাজ ও ভূতপূর্ব্ব নবাবের কর্ম্মচারিগণ, ডবল গবর্মেণ্টের সমস্যার মধ্যে পেষণ করিয়া, মীরজাফরের আমলে, প্রজাকে অস্থিকঙ্কালসার করিয়া তুলিয়াছেন। প্রজা না থাকিলে, তাহাদের রক্ষা করিতে না পারিলে, তাহাদিগকে বলসঞ্চয় করিবার অবসর না দিলে, তিনি কাহাদের বলে রাজমুকুট পরিবেন ? মীরকাশেম, প্রজারক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

মীরজাফর তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু কাশেম আলি তাহাদের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা কৌন্সিলের কর্ম্মচারীরা এই সময়ে আবার বড় বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। * পূর্ব্বে নবাবের সময়ে তাঁহারা ও তাঁহাদের অধীনস্থ ইংরাজেরা বাণিজ্যাদি কার্য্যে যে সমস্ত অন্যায্য স্বত্ব ভোগ ও দাবি দাওয়া করিয়া আসিয়াছেন, এখনও সেইরূপই করিতে লাগিলেন। অর্থসঞ্চয় তাঁহাদের মূলমন্ত্র। রাজা প্রজা, ন্যায় অন্যায়, বিচার অবিচার, তাঁহারা কিছুরই ধার ধারেন না। উচ্চপদের সহায়তায়, তাঁহারা রাজ্যের চিরপ্রতিষ্ঠিত মঙ্গলকর নিয়মগুলির মস্তকে যথেচ্ছ পদাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সীমা অতিক্রম করিল। সে গুলি কি, তাহা আমরা ক্রমশঃ বুঝাইতেছি।

---

* কোন নিরপেক্ষ-ইংরেজ লেখক এই সময়ের অবস্থা বর্ণনোদ্দেশে মীরকাশেমকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—He (Mir Kasem) had full reason to do so for the annals of no nation contain records of conduct more unworthy, more mean, more disgraceful than that which characterised the English Government of Calcutta during the three years which followed the removal of Merzaffer. That conduct is attributable to one cause, the basest and meanest of all *the desire for personal gain* by any means and at any cost. It was the same longing which has animated the robbers of the Northern clime, the pirate of the Southern sea, which has stimulated the individual to robbery even to murder. In point of morality the members of the governing digne of Calcutta from 1761 to 1763 Mr. Vansittart and Mr. W. Hastings excepted were not a whit better than the perpetrators of such deeds.

মীরকাশেম, মসনদে বসিবার পূর্ব্বে, কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণের সহিত অর্থ সম্বন্ধে যে একটা চুক্তি করেন, পরিশেষে তাহা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিয়া দিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে পূর্ব্ব সদস্যেরা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইলেন। তাঁহাদের স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত হইল। নবনিযুক্ত সদস্যগণ এতদূর অর্থগৃধ্নু ও স্বার্থপর যে, কৌন্সিলে বসিয়াই তাঁহারা উদরপূর্ত্তির উপায় দেখিতে লাগিলেন। পীড়নটা নবাবের উপরই চলিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন, তাঁহারা তখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ব্রিটানিয়ার হিমানী-সিক্ত শীতল সমীরণ উপভোগ করিতেছেন। থাকিবার মধ্যে একমাত্র Vancitart সাহেব। তিনি একক; যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন, অন্যান্য সদস্যেরা সমবেত শক্তির সাহায্যে তাহাতে বাধা দেন। সুতরাং অতিশীঘ্র মীরকাশেমের সহিত সংঘর্ষণ ঘটিবার জোগাড় হইয়া উঠিল।

মোগল বাদসাহের সহিত সন্ধি হইবার পরই কাশেম আলি খাঁ পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণকে পদচ্যুত করেন। একপক্ষে রামনারায়ণ ইংরাজের গোঁড়া, অপর পক্ষে নবাব নিজে ইংরাজবিদ্বেষী। রামনারায়ণ কেবল উৎকোচ ও অত্যাচারে ধনসঞ্চয় করিয়াই বর্দ্ধিতপ্রতাপ হইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার নবাবকে উপেক্ষা করিতেও তাঁহার সাহস হইয়াছিল। মীরকাশেম সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদ অতি নিকটে, তিনি ইংরাজের নিকট হইতে দূরে থাকিবার বাসনা করিয়া মুঙ্গেরে নিজ রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। মুঙ্গের গঙ্গার উপকূলে, বড় রম্য স্থান, রাজধানীর বড় উপযুক্ত; তাহার উপর মুঙ্গেরে একটি সুন্দর দুর্গ ছিল। মীরকাশেম, মুঙ্গেরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত দুর্গের সংস্কার আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের সহিত কড়ার মত সমস্ত দেনা পাওনা পরিশোধ করিয়া দিয়া, তিনি রাজস্ববৃদ্ধিতে মনোযোগ দিলেন। ইহার যথেষ্ট ফলও ফলিল। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব আয়ব্যয়ের তালিকায় ব্যয়ের ভাগ কম হইয়া শূন্য রাজকোষ অনেকাংশে পরিপূর্ণ হইল।

তাহার পর, মীরকাশেমের উৎক্রোশদৃষ্টি সেনাদলের উপর আকৃষ্ট হইল। সিংহাসনে বসিবার পর তিনি যে কয়েকটি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেনাগণ কি কি বিষয়ে ইংরাজ ও মোগল সেনা অপেক্ষা হীন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজের ন্যায় ইউরোপীয় জাতির ক্ষমতায় বাধা দিতে হইলে, সৈন্যগণকে ইউরোপীয় মতে শিক্ষিত করা চাই। কিন্তু সেরূপ শিক্ষা-

দাতা পাওয়া বড় দুষ্কর। কোনও শিক্ষিত ইংরাজসৈনিকই তাঁহার চাকরী গ্রহণ করিবেন না, ইহাও স্থির নিশ্চয়। সৌভাগ্যক্রমে অন্য ইউরোপীয় জাতিভুক্ত দুই জন বৈদেশিক তাঁহার চাকরী গ্রহণ করিল। এক জন Alsatian Reinhard ও অপর জন Gregory Markar. প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইউরোপে সমরু, ও দ্বিতীয় সাধারণের নিকট গুরগণ খাঁ বলিয়া পরিচিত।

সমরু ফরাসি,- মার্কার আরমিনিয়ান। ইংরাজ নয় বলিয়াই মীরকাশেম তাঁহাদের পাইলেন। দুইজনেই উপযুক্ত লোক। যে কাযের জন্য নবাব লোক খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা সেই কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মীরকাশেম, উভয়েরই প্রচুর বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

১৭৬২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বরের পূর্ব্বে, এই দুই জন বৈদেশিকের শিক্ষাধীনে, বাঙ্গলার নবাব ২৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ইউরোপীয় প্রথামত সুশিক্ষিত করিলেন। এক দল শিক্ষিত কার্য্যক্ষম গোলন্দাজ সেনাও এই সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী হইল। কামান ও গোলাগুলি ঢালাই করিবার জন্য নবাব কারখানা খুলিয়াছিলেন। তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কামান প্রস্তুত হইতে লাগিল। মীরকাশেম নিয়মিতরূপে এই সৈন্যদলের বেতনপ্রদান, উপযুক্তরূপে শ্রেণীনির্দ্দেশ করিয়া পদবিভাগ ও কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারদান করিতেন। নিজ চক্ষে, নিজ অধিনায়কত্বে পরিচালন করিয়া, দুই জন বৈদেশিকের সহায়তায়, মীরকাশেম যে সৈন্যদল সংগঠিত করিলেন, তাহাতে কলিকাতা কৌন্সিল বুঝিলেন, মীরকাশেম মীরজাফর বা সেরাজউদ্দৌলা নহেন;—অসাড়, জড় প্রকৃতির পরিবর্ত্তে এক কার্য্যকরী তীব্র শক্তি মুঙ্গেরে বসিয়া তিন সুবার শাসনশক্তি পরিচালিত করিতেছেন। ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এইখানে একটু পিছাইয়া গিয়া আমরা বিশ্বনাথের অনুসরণ করিব।

রণ্‌পা সাহায্যে বিশ্বনাথ সচরাচর সুদক্ষ অশ্বারোহীর মত অতি স্বল্প সময়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিত। শোনা যায়, ডাকাইত-সঙ্কুল প্রদেশে এখনও সেই

দ্রুতযানের চলন সম্পূর্ণ নিবারিত হয় নাই। নহিলে সিপাহী সাহেবেরা রোঁদে বাহির হইলে যে "দাগী বদ্‌মাস্‌কে" গৃহে হাজির পাইয়া থাকেন, সেই আবার তিন চারি ঘণ্টার অবসরে দশ ক্রোশ দূরে ডাকাইতি করিয়া প্রাতে আপন শয়নকক্ষে দিব্য ভালমানুষটীর মত নিদ্রা দেয়, এ রহস্যের অর্থ কি? ফলতঃ, কদন্নভোজী, নামমাত্র মৎস্যাহারী বাগ্দী, বা গৌড় গোয়ালা জাতীয় জওয়ানেরা এখনও যে সুশাসিত বাঙ্গালার বুকে বসিয়া অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকে, এর একটা নৈসর্গিক কারণ আছেই আছে।

ঘোরান্ধকারে, আন্দাজে মাঠের সোজা পথ ধরিয়া, বিশ্বনাথ চূর্ণী নদীর গতি অনুসরণ করিয়া চলিল। সেই ভরা ভাদ্রের জলে ভরা ধান্য ক্ষেত্রে এবং পঙ্কিল "আইল্" পথের পার্শ্বদেশ হইতে অবিশ্রান্ত ঝিল্লিরব উঠিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আকাশে মেঘের সঞ্চার ছিল না। মাঝে মাঝে প্রান্তরে ইতস্ততঃ সঞ্চিত বর্ষাজলে, নক্ষত্রসনাথ নভোমণ্ডল ছায়া হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছিল। ক্বচিৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত জলের করুণ কল্লোল ধ্বনিত হইতেছিল। কোথাও গ্রামপ্রান্তে নিবিড় বটচ্ছায়ার ছেদশূন্য অন্ধকার মধ্যে পেচক-দম্পতি বিকট চীৎকার করিতেছিল। নিশীথের এই রুদ্র গাম্ভীর্য্য যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে বাস্তবিক অনন্তের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়াছে।

অবলীলাক্রমে বিশ্বনাথ এইরূপ ভয়ানক দৃশ্যাবলী পশ্চাতে রাখিয়া স্থির-লক্ষ্য শ্যেনপক্ষীর মত দ্রুত ধাবিত হইতেছিল। ক্রমে কূলে কূলে প্লাবিত চূর্ণীর খরপ্রবাহশব্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বুঝিল, বৈদ্যনাথের আশ্রয়-স্থান অদূরে। এমন সময়ে সহসা মাথার উপরে উড্ডীয়মান টিট্টিভ পক্ষী নিনাদ করিয়া উঠিল। সে রব উদাসীনের দূরাগত সঙ্গীতবৎ বিশ্বনাথের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া বিশ্বনাথ মনশ্চক্ষে প্রথম জীবনের একমাত্র পরাজয়-দিন অঙ্কিত দেখিতে পাইল। চন্দ্রকরপ্রফুল্ল ভৈরবনদী-সৈকতে দণ্ডায়মান বিক্রমসিংহের দীর্ঘ মূর্ত্তি বহুদিন পরে সহসা চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিল না, এই ঘটনায় হৃদয় তাহার কম্পিত হইল কেন? ইচ্ছা ছিল, তীরে একটু অপেক্ষা করিয়া "আস্তানার" সংবাদ লইবে, কিন্তু তাহাতে আর প্রবৃত্তি হইল না। অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে বিশ্বনাথ নদীবক্ষ লক্ষ্য করিতে করিতে চলিল। কোথাও কিছু নাই—নৌকার চিহ্নমাত্র নাই। শেষে বিশ্বনাথ গোবরডাঙ্গার হাটে আসিয়া পৌঁছিল।

রাত্রি গভীর হইয়াছিল—দ্বিপ্রহরের আর বড় দেরি ছিল না। দোকান

পাট সব বন্ধ—কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কেবল ভগবান মদকের দোকানের ঝাঁপ তখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। ক্ষীণ প্রদীপালোক সম্মুখে অর্দ্ধ-শয়ানাবস্থায় সে মধুরকণ্ঠে কীর্ত্তনের সুরে গাইতেছিল,—

পাপ এত মনোহর করে কেন গড়ে ছিলে।
বিষবল্লরী কেন আপাতরম্য কুসুম-ভূষণে সাজাইলে।
এত স্বচ্ছ যদি পাপ-পথ কেন হৃদয়ে বল না দিলে।
এই অসম দ্বন্দ্বে, জীববৃন্দে, পরীক্ষা কর কি ছলে।

নিঃশব্দে রনপা রাখিয়া বিশ্বনাথ দোকানে প্রবেশ করিল। কিন্তু দীপ-ছায়ায় ধরা পড়িল। ভগবান শয়ন বন্ধ করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি বাবা, এই মাত্তর এলে না কি?" বিশ্বনাথ বিস্মিত হইয়া সুধাইল—"আমি আস্‌ব, তুমি জান্‌লে কেমন করে বাবা?" ভগবান হাসিল। "সংসারে এখন ভাবি কেবল হরিনামে, আর বিশে বাগ্‌দীর রূপ। আগে থাক্‌তে মন জান্‌তে পার্‌বে, এ আর বেশী কথা কি বাপু?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান তখন বিশ্বনাথের পরিচর্য্যায় রত হইল। তাহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইল, এবং সম্মুখে প্রচুর মিষ্টান্ন ও ঘটীতে জল রাখিয়া দিল। বিশ্বনাথ বলিল, "ও সব এখন থাক্। আমি তোমার এখানে এসেছি কেবল একটা খবরের জন্য। নইলে আমার এখন এক তিল দেরি করার সময় নেই। এক খানা সওয়ারী নৌকো এই নদীতে ভেটেল মুখে গেছে, তার কোন খবর রাখ কি না? ব'দে ব্যাটার হালচাল কিছু বল্‌তে পার কি না?"

ভগবান বলিল, "বাপু উপস্থিত ত্যাগ কর্‌তে নেই। আগে একটু জলযোগ করে নাও, সব খবর দিব এক্ষুনি। কিন্তু জল একটু না খেলে নয়।" তখন ভগবান স্বহস্তরচিত বিবিধ মিষ্টান্ন বিশ্বনাথকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইল। অনিচ্ছায় বিশ্বনাথ গুরুতর আহার করিল,—কেন না, হাত তুলিতে উদ্যত হইলেই ভগবান কুটুম্বিনীর মত কখন পরিহাস, কখনো স্নেহপূর্ণ শপথ, বা গালির উৎস খুলিয়া দিতেছিল।

জলযোগের পর ভগবান আবার তামাক সাজিতে বসিয়া গেল। বিশ্বনাথ একটু কুপিত হইয়া বলিল, "ভগবান, এতক্ষণ যে ঘোড়ার মতন ছুটে এলাম, সেটা কি কেবল তোমার নেমন্তন্ন খেতে? যখন তুমি বাপু বৈষ্ণবের ভেক্

ধরে থাক্‌তে, তখন তোমার কিছু আক্কেল ছিল। আসল বৈষ্ণব হবার যোগাড় করে তুমি একেবারে বয়ে যেতে বসেছো। ডাকাতি করতে আসিনি, সে ভয় করো না। তা হ'লে তোমার ফাঁদে পা দিতাম না।"

ভগবান বিশ্বনাথের হাতে কলিকা দিয়া বলিল,—"যে জন্যে তুমি এসেছ, তা আমি জানি; খানিকটে মন জানতে পারে, খানিকটে জেনে নিতে হয়। বদের লোক তোমার কাছে গেল, সে খবর যখন পেলুম, তখনই বুঝলুম, বাপধন আমার যদি ঠিকানায় থাকেন, তবে একবার দেখা দিতে আসবেনই আসবেন। তা না হলে বাপু এই চাষার হাটে তুই হঠাৎ এসে মেঠাই, জেলাপি, রসগোল্লা টাট্‌কা টাট্‌কা খেলি কেমন করে? এত বুদ্ধি ধরিস, এটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লিনে বাপু! হাজার হোক্ জেতে বাগ্দী তার কত হবে বল?"

বিশ্বনাথ হাসিল। "তুই বাপু জেতের বড়াই নিয়েই গেলি। তবু যদি এই বাগ্দীর ছেলে না হতিস্! কিন্তু আজ গানটা বড় গাচ্ছিলি সরেস। আসল কথাটা বলে ফ্যাল শীগ্‌গির, যদি কোন বিলি ব্যবস্থা করে থাকিস্ ত বল— আমি তা হলে নড়িনে। তোর গান শুনে রাত কাটাই।"

তখন ভগবান যাহা জানিত, বলিল। শুনিয়া বিশ্বনাথ কহিল, "বিক্রম সিংহের আশ্রয়ে বামুনের মেয়েটিকে পাঠিয়ে তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়েচো, আমিও তেমনি হতে পারতাম। কিন্তু তবু মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌চে। তোমার মুখে সিংহ মহাশয়ের নাম শুনে আমার গায়ে বাপু কাঁটা দিয়েছিল।" বিশ্বনাথ পথিমধ্যে টিট্টিভ পক্ষীর রব শুনিয়া যে ভাবে বিচলিত হইয়াছিল, সে গল্প করিল। তখন বিক্রমসিংহের কোন অমঙ্গলসূচনায় উভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, বিশ্বনাথ আবার বলিল, "এর পর আর দেরি করা ভাল হয় না। বদে ব্যাটার ত কাণ্ডজ্ঞান নেই, দরকার বুঝ্‌লে বুড়ো মানুষটোকে অপমান ত কর্‌বেই, মেরে ফেল্‌তেও আটক নেই। তুই বাপু আমার সঙ্গে চল্। পথে তোর গানটা শুন্‌তে শুন্‌তে ফির্‌ব। কবে শিখ্‌লি, কই সেদিন ত এটা গাস্‌নি? চল্। পাঁচ কোশ্ রাস্তা বই ত নয়—লহমায় যাব, লহমায় আস্‌ব! তোর রন্‌পা জোড়া বার্ কর্।"

ভগবান। "আমাকে আর এ সবে জড়াস্ কেন বাপু! ও পথে আর নয়। তোর অনুরোধে দোকানের ঠাট্ করে এমন জায়গায় আছি, যেখানে কথা কইবার একটা লোক পাইনে। নূতন গান সেদিন শিখেছি, একটি রাহী বাবাজীর কাছে। নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে হবে। এখনও

সুরটো ঠিক কায়দা হয় নি! তোকে বাপু কতবার মিনতি করচি, তুই নবদ্বীপে আমায় থাক্‌তে নাই দিলি, ওপারে স্বরূপগঞ্জে তোর আড্ডার কাছাকাছিই না হয় রাখ্। এত লোককে এত দয়া করিস্, বুড়ো বাপের এ অনুরোধ টুকু রাখ্‌তে পারিস্‌নে!"

বিশ্বনাথ দোকানের চারি দিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল—শেষের কথা কটা শুনিয়া একমুখ হাসিল। বলিল, "আচ্ছা তাই হবে! কোম্পানি যে রকম বাদে লেগেছে, আমাকেও শীগ্‌গির্ সেই জায়গায় যেতে হবে দেখ্‌চি! এখন বাপু বাজে কথা রাখ্। তোর রণ্‌পা জোড়া কই?—দেখ্‌চিনে যে! লক্ষ্মী বাপ্ আমার চল্, লহমায় যাব, লহমায় আস্‌ব।"

ভগবান্। তোর রণ্‌পা ফন্‌পা আমি কি আর কিছু রেখেছি বিশু—তুই একলা যা! ফিরে এসে গান শুনিস্। আমি জেগেই থাক্‌ব। মেয়েটা যদি জেগে ওঠে, তাকে থামাবে কে? তুই একলা যা বিশু!"

বিশু তাহা শুনিল না। ত্রস্তহস্তে দা লইয়া আপনার সুদীর্ঘ রণ্‌পার * প্রথমার্দ্ধ কাটিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে দুইজোড়া রণ্‌পা প্রস্তুত হইল। তখন বিশ্বনাথ ভগবানকে টানিয়া এক জোড়ায় দাঁড় করাইল। নিজে তাহার দোকানের ঝাঁপ বাঁধিয়া স্বয়ং আর এক জোড়ায় লাফাইয়া উঠিল। তার পর দুই জনে পাশাপাশি বন্য ঘোটকযুগলের মত তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই সন্নিহিত রণ্‌পা-শব্দ আসন্ন শত্রুর তূর্য্যনিনাদবৎ বৈদ্যনাথের কর্ণে ধ্বনিত হইল। সকলের আগে সে বুঝিল, আগন্তুক আর কেহ নহে—বিশ্বনাথ স্বয়ং। বুঝিল, সে অবস্থায় দলপতির সম্মুখে পড়িলে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। মুহূর্ত্তে মনঃস্থির করিয়া বৈদ্যনাথ হাঁকিল—"গুড়াও"। ‡ তখন সেই ক্ষুদ্র দস্যুসেনা নিমেষে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সড়কীতে যে গুরুতর আহত হইয়াছিল, তাহার গতিশক্তি ছিল না। স্বহস্তে বৈদ্যনাথ সেই আহত

---

* রণ্‌পার নীচে এবং উপরে অনেক স্থানেই পা রাখিবার স্থান থাকে। অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব গতিতে যাইবার জন্য ডাকাতেরা নীচের দিক্‌টা ব্যবহার করে। অত্যন্ত দ্রুত গমনের জন্য উপরে পা রাখিবার দরকার হয়।

‡ অর্থাৎ, গুটাও বা জাল উঠাও। সর্দ্দারের এই সঙ্কেতবাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র ডাকোইত দলে, যে যে অবস্থায় থাক্, পলায়ন করে।

মুমূর্ষুর শিরশ্ছেদ করিল, এবং এক জনকে আদেশ করিল, ছিন্নমুণ্ড আমূল তরবারি বিদ্ধ করিয়া লয়। নিজে সরলার সেই বেতের ক্ষুদ্র পেটরাটি উঠাইয়া লইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা রণ্‌পার শব্দের বিপরীত দিকে ঘোরান্ধকার মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

অনতি পরেই বিশ্বনাথ ভগবান সঙ্গে ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ হইল। বিক্রম-সিংহের গৃহসম্মুখে দস্যুদের নিক্ষিপ্ত মশালের ভগ্নাংশ সকল তখনও অল্পবিস্তর আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা সজাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সাহস করিয়া ঘটনাস্থলে আসিতে পারিতেছে না। সদ্যোশ্ছিন্নশির কবন্ধ-মূর্ত্তি রুধিরাপ্লুত হইয়া পথিমধ্যে ভয়ানক দেখাইতেছিল। প্রথমতঃ উভয়ের আশঙ্কা হইয়াছিল, হয় ত স্বয়ং বিক্রম সিং দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সবিশেষ জানিবার জন্য উভয়ে সেই মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিল। দেখিল, যোদ্ধৃবেশে বৃদ্ধ বিক্রম সিং অঙ্গন মধ্যে পড়িয়া আছেন। মুক্তকুন্তলা বিধবা আপন অঙ্কে মস্তক রাখিয়া সযত্নে তাহাতে জলসেক করিতেছেন। আর পার্শ্বে বসিয়া কিশোরী বালিকা চোকের জল মুছিতে মুছিতে অঞ্চল দোলাইয়া তাঁহাকে বায়ু বীজন করিতেছে, এবং তাঁহার পরিহিত চর্ম্মবন্ধন শিথিল করিতে প্রয়াস পাইতেছে—কিন্তু পারিতেছে না।

ত্রস্তহস্তে বিশ্বনাথ সেই ভূপতিত বীরের দীর্ঘ দেহ চর্ম্মচ্যুত করিয়া ফেলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রম সিং একেবারে অজ্ঞান হন নাই। অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় সকল কথা শুনিতে বুঝিতে পারিতেছিলেন। প্রায় চারি দণ্ডের শুশ্রূষার পর তাঁহার দৌর্ব্বল্য কিছু পরিমাণে দূর হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি বিশ্বনাথের দিকে চাহিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "বুড়া বিক্রমের শীকার খেলা দেখ্‌তে এসেছ বুঝি? সেই রাতের কথা মনে পড়ে বিশ্বনাথ? ওঃ, সে কতদিন হলো—কই তুমি ত কিছু বদলাও নি, ঠিক্ তেমনি আছ! আমার কিন্তু সে বল আর নেই। ছয়টা ডাকাত আজ আমায় হারিয়ে দিয়ে গেল।"

বিশ্বনাথ বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনি আমার গুরু, আপনাকে কে জয় কর্‌তে পারে? কই আপনার গায়ে ত আঁচড়ও লাগেনি। কিন্তু তারা সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েচে।"

বিক্রম স্মিতমুখে কহিলেন, "আমায় তারা মূর্চ্ছিত করে গেছে বটে, কিন্তু

কাপুরুষগুলো আমার এই বালিকা কন্যার তরওয়ালের কাছে দাঁড়াতে পারেনি বিশ্বনাথ! সেই আহ্লাদে আজ আমি নিজের অপমান ভুলে গেছি। আর আমার সেই ভৈরবীমূর্ত্তি তোমরা দেখতে পেতে ত আমার আনন্দ বুঝ্‌তে!" মীরা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল!

* * * * * * * *

বিক্রমসিংহের মুখে বিশ্বনাথ পলায়নপর ডাকাইদের সকল কথা শুনিল। তাঁহার মূর্চ্ছার অবসরে যাহা ঘটিয়াছিল, মীরা তাহা বিবৃত করিল। বিশ্বনাথ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, ইচ্ছা তখনই বৈদ্যনাথের অনুসরণ করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে। এবং সে জন্য বিক্রমের কাছে বিদায় ভিক্ষা করিল।

ভগবান বলিল,—"বিশু! কোম্পানিবাহাদুর তোমার নামে হুলিয়া করেচে। এ সময়ে তোমার বাপু রাগ একটু সামলাতে হয়। বদে তোমার হাটি হদ্দ সব জানে। এখন একটু বুঝে সুজে কাজ করো। কি বলেন সিংহী মশায়?"

বিক্রম সিং এই পরামর্শ অনুমোদন করিয়া কহিলেন—"বিশ্বনাথ, বদের দলের খেলোয়াড় দেখে আজ আমার মনে হয়েচে, বাঙ্গালী লড়ায়ে পটু নয় বলে যে বদনাম আছে, সেটা ডাহা মিছে কথা। তোমার দলে তেমন খেলোয়াড় কত আছে জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়, ইচ্ছা করলে তুমি কোম্পানীকেও একদিন হাত দেখাতে পার। কিন্তু তোমার দলে অধর্ম্ম ঢুকেচে। বদের আজকের ব্যবহার তার প্রমাণ। নারায়ণ তোমার প্রতি বিরূপ না হলে আর এমনটি ঘটে না। কোম্পানীর হুলিয়ার কথা শুনে তোমার জন্য আমার ভাবনা হলো।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, "জন্ম হলেই মরণ আছে, তাতে আমার ভয় নেই। ভাবনা কেবল এক বুড়ো মার জন্যে। তা মা কালীর যদি সেই ইচ্ছে, আমার তাতে হাত কি সিংহী মশায়। তবে কুকুর বিড়ালের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা, সে আমার কর্ম্ম নয়। আশীর্ব্বাদ করুন, বিশে যেন মানুষের মতন মরতে পারে।"

এই কথার পর বিশ্বনাথ সরলার কথা পাড়িল। বৈদ্যনাথ সরলার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে শুনিয়া বিশ্বনাথের বড় কষ্ট হইতেছিল। সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, ইচ্ছা, সরলাকে দিয়া যায়। কিন্তু স্পষ্ট বলিতে সাহস হইতেছিল না। ভগবান বিশুকে যেমন চিনিত, এমন আর কেহ নহে। সরলা মীরার কাছে নিকটেই

বসিয়া ছিল। হাসিয়া ভগবান তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা, আজ আমার মা হয়ে তোমার এই বিপদ গেল। বিশু তোমার আর একটি ছেলে। তার ইচ্ছে, বদে তোমার যা নিয়ে গেল, তার কতক ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তার পর চাই কি, সবই পাওয়া যেতে পারে। পথে তোমার খরচপত্রের দরকার। ডাকাত ছেলের প্রণামী কিছু নিতে দোষ কি মা?"

সরলা কথা কহিল না, কিন্তু মীরার কানে কানে অসম্মতি জানাইল। মীরা সে কথা বলিলে বিক্রম কহিলেন, "খরচ যা পড়ে, আমি দেব। এর পরে পাঠিয়ে দিস্ মা!" ইহাতেও সরলা সম্মত হইল না। অস্ফুট অশ্রাব্য স্বরে মীরাকে বলিল, "দিদি! আমার ছেলেদের বল, এখন এই এক বস্ত্রেই আমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ভাল!" বিশ্বনাথ প্রশংসমান চক্ষে এ কথা শুনিল। বস্ত্রমধ্য হইতে এক লৌহাঙ্গুরীয় বাহির করিয়া বলিল, "মা, এ একটা লোহার আংটী, এ নিতে তোমার কি আপত্তি? যদি কখন বিপদে পড়, এই পাঠিয়ে ছেলেকে মনে করো!"

তার পর বিশ্বনাথ ভগবান সহ বিদায় হইয়া গেল। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

কলুঙ্গার যুদ্ধ।

(শেষ)

২৪ এ নভেম্বর দিল্লী হইতে Battering train আসিয়া উপস্থিত হইল, কালবিলম্ব না করিয়া তাহার পর দিনই ইংরাজ সৈন্য পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। দুর্গ হইতে ৬ শত হস্ত দূরে একটী সমতল স্থানে কামান সংস্থাপন করিয়া শত্রুদুর্গের দিকে ক্রমাগত গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ২৬এ দেখা গেল যে, দুর্গের সেই অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন দুর্গ-আক্রমণের আদেশ প্রদত্ত হইল। এবারেও উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল, উভয়ই নির্ভীক এবং শিক্ষিত; একদলের চেষ্টা এই অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিকে বিদ্ধস্ত ও তাহাদের গিরিদুর্গ সমভূমি করিতে হইবে; অপরের চেষ্টা, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে। এই যুদ্ধে এই দিনও তিন চারি জন ইংরাজ সেনানায়ক কর্ম্মে প্রাণত্যাগ করিলেন; অনেক কষ্টে এবং বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য হত আহত হওয়ার পর, ইংরেজ সৈন্যের এক অংশ দুর্গতলে উপস্থিত হইল।

কিন্তু দুর্গের যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। গিরি-গুহা-দ্বারে গুহাসীন সিংহ অবস্থান করিলে, সেই গুহায় প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, গুর্খাবীরগণের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত এই ভগ্নস্থান দিয়া দুর্গ-প্রবেশও ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে তদ্রূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সকল গুর্খাবীরের সহিত ইংরেজগণের অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। গুর্খা অসভ্য হউক, কিন্তু তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতা অল্প নহে; ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়িতে লাগিল, প্রতিবারই দশ পনের জন ইংরেজ সৈন্য হত বা আহত হইয়া পড়িতে লাগিল; এবং শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল, এই ভয়ানক স্থানে অগ্রসর হওয়া সহজ নহে, বৃথা প্রাণদানে অস্বীকার করিয়া তাহারা হটিয়া আসিল; মুষ্টিমেয় পার্ব্বত্য গুর্খা একবার নয়—দুই দুই বার শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যকে বিমুখ করিল। ইংরেজের অব্যর্থ-সন্ধান অসভ্য গুর্খার বল ও সাহসের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া গেল; ভারতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটে নাই, এবং যাহা ঘটিয়াছে, ইতিহাস-প্রণেতৃগণ তাহারও বড় উল্লেখ করেন না। মানুষ চিত্রকর, তাই সিংহ মানবহস্তে পরাভূতরূপে চিত্রিত হয়, ইহা কোনও বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় লেখকের উক্তি;—কিন্তু চিরকালই কি এ নিয়ম থাকিবে? ইহাতে মনুষের বল এবং কৌশল প্রমাণিত হউক, কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় কি না সন্দেহ।

যুদ্ধ-পিপাসা প্রশমিত হইল না, দুর্গজয়ের আশাও ইংরেজগণ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। দুর্গ আক্রমণের জন্য আবার আয়োজন চলিতে লাগিল। ৫৩ সংখ্যক সৈন্যদল পূর্ব্বে দুইবার অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু এবার তাহারা ক্লান্ত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল, তাহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে চাহে না, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীক ভাবে প্রাণত্যাগ করিতেও তাহারা প্রস্তুত, কিন্তু তাহারা বৃথা অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে।

তিন দিন পরে সমস্ত ইংরেজ সৈন্য একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল; সমস্ত ইংরেজ সৈন্যের প্রতিহিংসা, ক্রোধ এবং তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অগ্নির ন্যায় তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য, তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হইল। ক্রমাগত গোলাবর্ষণে দুর্গের পাঁচ ছয়টি স্থান ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মুষ্টিমেয় দুর্গবাসীগণের দ্বারা দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বীর বলভদ্র দেখিলেন, আর দুর্গ রক্ষা করা যায় না, এখনি ইংরেজ সৈন্য ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদের উপর আসিয়া পড়িবে; যদি মরিতে হয়, তবে বীরের মত মরাই বিধেয়।

ইংরেজ যোদ্ধাগণকে তাহাদের ভুজবীর্য্য দেখাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, বীর বলভদ্র হতাবশিষ্ট সত্তর জন সহচর সমভিব্যাহারে, দুর্গ ত্যাগ করিল। সেই সত্তর জন বীর নিষ্কাসিত অসি হস্তে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া ইংরেজ সৈন্য-রেখার অভ্যন্তর দিয়া আপনাদের অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। বলভদ্র সিংহের পার্ব্বত্য দুর্গে পানীয় জলের কোনও প্রকার বন্দোবস্ত ছিল না। এক নালাপানি-স্প্রিং নিকটে অন্য কোনও নির্ঝরও ছিল না; কিন্তু নালাপাণিতে ইংরেজ সৈন্যের ছাউনি, সেখান হইতে জল আনিয়া তাহা পান করা অসম্ভব। উষ্ণপ্রধান প্রদেশ হইলে হয় ত তাহারা এক দিনও সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু হিমালয়ের ক্রোড়ে শৈত্যের মধ্যে পিপাসার প্রাবল্য অধিক নহে। গুর্খা সৈন্য দল কয়েক দিন জল পান না করিয়াও অতিবাহিত করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধে তাহারা ক্রমেই ক্লান্ত হইতে লাগিল, পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে অধৈর্য্য করিয়া তুলিল, আহারসামগ্রী ফুরাইয়া আসিল, এবং ইংরেজ সৈন্যের অক্লান্ত আক্রমণে তাহাদের বল ক্ষীণতর হইতেছিল। ইহার উপর দুর্গপ্রাচীর ভুগ্ন হইল, সুতরাং এখন দুর্গত্যাগ ভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? তাই তাহারা জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে ইংরেজ সৈন্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল।

নালাপাণি তাহাদের লক্ষ্যস্থান হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য কোনক্রমেই তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিল না, ইংরেজ সৈন্য-রেখা বিদীর্ণ করিলে, কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু সেই বীর-গুর্খাগণ হিমাচলের প্রিয় সন্তান; তাহারা যে পথে যেরূপ অক্লেশে অথচ দ্রুত-গতিতে চলিয়া গেল, শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগের অনুসরণে কোনও ক্রমেই সফলকাম হইল না। তাহারা প্রাণ ভরিয়া নালাপাণির নির্ম্মল জল পান করিল, এই জল দুর্গ মধ্যে পাইলে তাহাদিগকে এই অবস্থায় কখন এখানে আসিতে হইত না। যে সকল সৈন্য পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা রণজিৎ সিংহের সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল।

বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য, বলভদ্র সিংহের পরিত্যক্ত কলুঙ্গাদুর্গে প্রবেশ করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল, দুর্গমধ্যে হত ও আহতের সংখ্যা পঞ্চাশ জনের অধিক হইবে না। এত সামান্যসংখ্যক সহচরের সহায়তায়, বলভদ্র সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যকে এতদিন বিফলপ্রযত্ন করিয়াছিলেন, পানীয় জলের অভাব না হইলে দুর্গরক্ষায় তাহারা কৃতকার্য্য হইত না, কে বলিবে?

দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে কোনও গৃহাদি ছিল না। উন্মুক্ত শূন্য আকাশ তাহাদের চন্দ্রাতপ এবং বিশাল শালবৃক্ষ তাহাদের পর্ণকুটীরের অভাব বিদূরিত করিতেছিল। হিমমণ্ডিত, মুক্ত গিরির অন্তরালে বসিয়া একটি স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। স্বাধীনতার প্রিয় সন্তানবর্গের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া, ইংরেজ সৈন্যগণ লোলুপ দৃষ্টিতে ইহার দিকে চাহিয়াছিলেন। অন্যান্য দুর্গের ন্যায় ইহারও একটা মোহকর আকর্ষণ ছিল, কিন্তু দুর্গবাসীগণের দুর্গত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহিনীশক্তিও যেন বিদূরিত হইল। দেখিল, দুর্গে ধনসম্পত্তির নাম মাত্র নাই। আহারদ্রব্য যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়া আছে, হত ও আহতগণে দুর্গ পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধে তিষ্ঠান কঠিন।

ইংরেজগণ কলুঙ্গাদুর্গ সমভূমি করিয়া ফেলিল, এবং একটি বীরজাতি যেখানে এক দিন স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল, সে কথাটা যেন পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিবার জন্যই প্রকৃতি লতাপল্লবে এই পাষাণময় গিরি-অন্তরাল আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কলুঙ্গাযুদ্ধ, সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কোনও ঐতিহাসিক কর্তৃক উজ্জ্বল-ভাষায় বর্ণিত না হইলেও, উদার ইংরেজ লেখক এ বিষয়ে কৃপণতা করেন নাই। দেরাদূনের ইতিহাস-লেখক R. C. Williams B. A., C. S. এই যুদ্ধের উল্লেখকালে নির্ভীক বীর বলভদ্রের প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, "such was the conclusion of the defence of Kalunga a feat of arms worthy of the best of chivalry, conducted with a heroism almost sufficient to palliate the disgrace of our own reserves."

জিলেস্পাই সাহেবের মৃতদেহ মিরটে সমাহিত করা হইয়াছিল, সেখানে আজিও তাঁহার সমাধিস্তম্ভ আছে। সুদৃশ্য মার্ব্বেল স্তম্ভ এখনও নিম্নলিখিত কথা কয়টি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতের স্তব্ধ প্রান্তে অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে :—

Vellore Cornellis Palinbang, Sir R. R. Gillespie, D. Joejocarta,—*31st October 1814,—Kalunga.*

আর, As a tribute of respect for our gallent Adversary Bulbhudder."—দেরাদূনের জঙ্গলে রিচপানা নদীর তীরে নির্জ্জন প্রদেশে সেই ক্ষুদ্র মনুমেণ্ট। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা বীর প্রতিদ্বন্দীর প্রতি প্রদর্শিত প্রকাশ্য সম্মান, এবং যতই সামান্য হউক, বীর ইংরাজ জাতি বীরের সম্মান রক্ষা করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

এই যুদ্ধের সময় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। কারণ ইহা দ্বারা গুর্খা জাতির চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের মনে পরিস্ফুটরূপে উদিত হইতে পারে; যে গুণ প্রাচীন হিন্দু বীরগণের মধ্যে অসাধারণ ছিল না, ভারতে রাজস্থানের ইতিহাস এবং প্রতীচ্য ভূমণ্ডলে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে যে গুণ প্রায় প্রত্যেক বীরের জীবনে পরিব্যক্ত হইয়াছিল, এই অসভ্য গুর্খা জাতির মধ্যেও সেই গুণের অভাব ছিল না;—তাহা বিশ্বস্ততা এবং স্বজাতিপ্রেম।

দ্বিতীয় বার আক্রমণের সময় হঠাৎ একজন গুরখা সৈনিক পুরুষ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ইংরাজ সৈন্যের রেখা অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল; সে বামহস্তে তাহার মুখ আবৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তের সঙ্কেতে তাহার প্রতি গুলি বর্ষণ নিষেধ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, বিস্মিত ইংরাজ সৈন্য সেই মুহূর্ত্তেই গোলা বর্ষণ বন্ধ করিয়া, তাহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য কুতুহলীভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই গুরখা সৈন্য ইংরাজ সৈন্যশ্রেণীতে উপস্থিত হইলে দেখা গেল, ইংরাজ-নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহার নীচের দন্তপাটী ভাঙ্গিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং ওষ্ঠদ্বয়েরও অভাব হইয়াছে। মৃত্যুভয়ে তাহার কাতরতা ছিল না, কিন্তু অকর্ম্মণ্য ভাবে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করা মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক কষ্টকর মনে করিয়া, সে চিকিৎসার জন্য ইংরেজ ডাক্তারের নিকট আসিয়াছিল; ইংরেজ সেনানায়ক তরবারীর এক আঘাতে সেই দন্তহীন যন্ত্রণাটাকে ইহলোকের পরপ্রান্তে প্রেরণ না করিয়া চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছু দিন চিকিৎসার পর সে আরোগ্য লাভ করিল। তখন তাহাকে ইংরাজ সেনাদলে কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। কারণ ইংরেজ সেনাপতির বিশ্বাস হইয়াছিল, এত দিন সেবা শুশ্রূষায় তাহার বীর হৃদয় যে পরিমাণে অধিকার করা হইয়াছে, তাহাতে সেই বিশ্বাসী গুরখা সৈনিক পুরুষ ইংরাজের একজন অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে বিনয়ের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, এবং পুনর্ব্বার ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যদলে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। যদিও সেই অসভ্য পরিস্ফুট ভাবে কোনও কথা বলে নাই, তথাপি সে সংক্ষেপে এমন একটি ভাব প্রকাশ করিয়াছিল যে, যতদিন জান বাঁচিবে, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যই তাহার বন্দুক ও খুক্রী ধরিবে, এবং স্বদে-

শের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে বীরের ন্যায় পতন ভিন্ন তাহার অন্য উচ্চাশা নাই। তাহার পুণ্যকথা শুনিয়া ঐ গানটী আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল ঃ—

"তোমারই তরে মা সঁপিনু বীণা, তোমারই তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারই তরে এ আঁখি বরষিবে, তোমারই তরে মা গাহিব গান।"

শ্রীজলধর সেন।

মুসলমান কবির বাঙ্গলা কাব্য।

১০০ বৎসর হইল, সৈয়দ আলাওল নামক জনৈক মুসলমান, রোসাঙ্গের (?) রাজা মাগন ঠাকুরের আদেশে, "পদ্মাবতী" নামক বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর যেমন পরাগুল খাঁর আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, শ্রীকরনন্দী যেরূপ ছুটি খাঁর আদেশে অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, সৈয়দ আলাওল সেইরূপ মাগন ঠাকুরের আদেশে পদ্মাবতী প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই দুই প্রকার উদ্যমে গুণের পার্থক্য আছে। হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ করিবেন, ইহাতে তাঁহার একটা গৌরব কি?—গৌরব উৎসাহদাতা মুসলমানের; প্রশংসা, মুসলমান প্রভুর উদারতার। যদি গ্রন্থের কোনও স্থলে কবিত্বের বিকাশ থাকে, কবি তজ্জন্যই যশের দাবী করিতে পারেন, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু মুসলমান, হিন্দুর উপাখ্যান রচনা করিতে চেষ্টিত, আশ্রয়দাতা হিন্দু হউন না কেন, এ স্থলে কবির প্রাপ্যই অধিক, আশ্রয়দাতার প্রাপ্য অল্প। তাই সৈয়দ আলাওলের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। যদি এই উদ্যম সফল হইয়া থাকে, তবে প্রশংসার ষোল আনাই কবির। যাঁহারা মীর মসরফ্ হুসেনের 'বিষাদ-সিন্ধুর' উল্লেখ করিয়াই মুসলমানের বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃতিত্বের গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিবেন, 'পদ্মাবতীর উপাখ্যানের' নিকট 'বিষাদ-সিন্ধু' যেন পদ্মের নিকট কিংশুক,—অতি অকিঞ্চিৎকর। মুসলমানরচিত পুস্তক বলিয়া 'পদ্মাবতী' অতিরিক্ত আদরের প্রত্যাশী নহে; এই পুস্তক বঙ্গীয় যে কোনও প্রাচীন কবির রচনার নিকট দাঁড়াইয়া গুণের গৌরব করিতে পারে।

পদ্মাবতী, মুসলমান কবির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইহার কৃতিত্ব শুধু কল্পনা-জাত নহে। ইহা সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি আহরণ করিয়া ধনী; সংস্কৃত

কাব্যের উৎকৃষ্ট ভাবরাশি দ্বারা এই পুস্তক সরস ও সুগ্রন্থিত। কবি যে সব স্থলে পিঙ্গলাচার্য্যের অষ্টমহাগণের * তত্ত্ব বুঝাইতেছেন; কিম্বা তত্ত্ব, বিতত্ত্ব, সুচিরাদি পঞ্চ শব্দের লক্ষণ; খণ্ডিতা, বাসকশয্যা, কলহান্তরিতাদি অষ্ট নায়িকার ভেদ; ষড়ঋতুর বিশেষ বিশেষ ভাব; বিরহের দশ অবস্থার সূক্ষ্ম বিচার এবং জ্যোতিষের গূঢ়তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন; সে সব স্থলের সম্পূর্ণ অর্থ করিতে আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরাও একটুকু গোলে পড়িয়া যান। তাঁহার বর্ণনাগুলি সংস্কৃতের প্রভায় প্রভাময়; হিন্দুর আচার ব্যবহার, বিবাহ, কবি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সে সব পড়িলে, তিনি যে এই সমাজের বাহিরের একজন, এ কথা একবারও মনে হয় না। আমরা যাহা জানি না, আমাদেরই এমন অনেক কথা মুসলমান কবি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই উদার সহানুভূতি সত্বেও, তিনি মুসলমানদিগের অপ্রিয় হইবার কোনও কারণ দেন নাই। পুস্তকের প্রারম্ভে সম্পূর্ণ মুসলমানী ভাবে তিনি ঈশ্বর ও মহম্মদের স্তুতি করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্তুতি হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল,—

"আপনা প্রচার হেতু স্থজিলে জীবন,
নিজ ভয় দর্শাইতে স্থজিল মরণ।
মিষ্ট রস স্থজিলেক কৃপা অনুরোধ,
তিক্ত, কটু কসা স্থজি জানাইল ক্রোধ।
পুষ্পে জন্মাইল মধু গুপ্ত আকার,
মক্ষিকা স্থজিয়া কৈল তাহার প্রচার।"

এই কাব্যে কবিত্বের অভাব নাই। নীলোজ্জ্বল তরুরাজি নীলাকাশে অলক্ষিতে মিশিয়া যায়, এই কাব্যের উজ্জ্বল কবিতারাশিও স্থলে স্থলে দর্শনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সেই সব রচনা আধুনিক ভাবুকের ভাবনার ন্যায় সরস ও গাঢ়। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে, বিশেষতঃ চট্টগ্রাম হইতে, আমরা তাহা আশা করি নাই। যথা,—

"কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভরপুর,
দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর।
নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা,
দূরেতে নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা।
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ,
নিকটে থাকিয়া ভেকে না জানায় রস॥ †

* লঘু গুরু জানিলে গুণের ভেদ পায়,
তেকারণে লঘু গুরু জানিতে জুয়ায়।
হ্রস্ব ইকার হ্রস্ব উকার, অ' কার সকল,—
এই তিন লঘু আর গুরু যে সকল।
কবিতার চরণের প্রথম তিনাক্ষর,
বিচারিবা কেবা লঘু কেবা গুরুতর।
তিন গুরু হৈলে তারে বলিবে মগণ;
নিধি স্থির বন্ধ প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ।
আদ্যে লঘু দুই গুরু অন্তে হয় যার,
তাহারে মগণ বলি বুঝিবে বিচার।
মধ্যে লঘু দুই দিগে দুই গুরু হয়,
সেই সে রগণ হয় জানিও নিশ্চয়॥

† সাধারণ-পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির অর্থ দিতেছি। "কবি স্বীয় শক্তি দ্বারা নিকটের বস্তু দূরে ফেলিয়া, পাঠককে দূরের আলেখ্যে মুগ্ধ করিতে পারেন

সৈয়দ আলাওলের বাড়ী ফতেয়াবাদ * পরগণায় জালালপুরে,—তিনি কোন দুর্ঘটনায় পড়িয়া রোসাঙ্গায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। এবং মাগন ঠাকুরের আদেশে পদ্মাবতীকাব্যের রচনায় প্রবৃত্ত হন। পদ্মাবতী উপাখ্যানটি, চিতোরের পদ্মিনীর বৃত্তান্ত। আলাউদ্দীন চিতোরের রূপসী রাণীকে হস্তগত করিতে ইচ্ছুক হইয়া যে যুদ্ধানল বা কামানল জ্বালিয়াছিলেন, ইহা তাহারই ইতিহাস। কিন্তু কবি ঠিক ইতিহাসের অনুসরণ করেন নাই। তিনি চিতোর-রাজ ভীমসেনকে রত্নসেন নামে অভিহিত করিয়াছেন, সংগ্রামে চিতোর-রাজের জয় ও আলাউদ্দীনের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু কাব্য এবং ইতিহাস দুই স্বতন্ত্র জিনিষ। ইহারা পরস্পরের ঋণ গ্রহণ না করিলে, পাঠক কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন না। ইতিহাস সম্বন্ধে যে ভ্রমের উল্লেখ করিলাম, তাহা ছাড়া কবি শুকমুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হরপার্ব্বতীকে কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট আনিয়াছেন। এ সবও কলেজের বালকের নিকট অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেই সব বালক হ্যামলেটের ভূত ও ম্যাকবেথের পেত্নীর বৃত্তান্ত মহাহ্লাদসহকারে পাঠ করিয়া থাকে। তবে দু এক স্থলে কবির কল্পনা লাগামশূন্য ঘোড়ার মত দৌড়াইয়াছে। বিরহিণী রাজকুমারী স্বামীর নিকট স্বীয় দুঃখের বার্ত্তা জানাইতে একটি পক্ষীকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কবি বিরহিণীর দুঃখ বুঝাইবেন :—

"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল,
সেই দুঃখে জলদ শ্যামলবর্ণ হৈল।
স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর,
অদ্যাবধি শ্যামল তহি ভেল শশধর।
উড়িতে নারিল পাখা শূন্যের উপর,
উল্কাপাত হেন বলে তারে নর।
সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন
জলনিধি হৈল তহি পূর্ণিত লবণ।"

এবং তাহাই নিকটবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ; নিকটের বস্তুও সময় সময় অতি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে, এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে যাহা কলি, এক সেকেণ্ড গতে তাহা ফুল,—কলি এবং পুষ্প অতি নিকট, অথচ একবার পুষ্প হইলে পর তাহার আর ফিরিয়া কলি হইবার উপায় নাই। তাই নিকটবর্ত্তী হইয়াও পুষ্প এবং কলি বহুদূরবর্ত্তী। এইরূপে আবার দূরবর্ত্তী সামগ্রীও সময় সময় অতি নিকটবর্ত্তী হয়। মধুমধ্যে পিপীলিকা স্বগণ হইতে বহুদূরে পতিত, অথচ তাহার হৃদয় যাহা চায়, তাহা লাভ করিয়া দূরই তাহার নিকট হইয়াছে; বনে বাস করিলেও জলস্থ কমলই ভ্রমরের অতি নিকট (প্রিয়) জলে বাস করিয়াও ভেকের নিকট কমল বহুদূরবর্ত্তী।—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* আধুনিক ফরিদপুর।—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ

এখন বিরহিণীর কত দুঃখ, দেখুন দেখি!

পদ্মাবতীর পুঁথি এখন যে আকারে আছে, তাহাতে ইহা মৃত্তিকার মূল্যেও বিকাইবার কথা নয়। এই পুস্তক আলাওল কবি পার্শী অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা কেতাব পার্শী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। এই পার্শী অক্ষরকে বাঙ্গালা করিয়াছেন, চট্টগ্রামবাসী হামিদুল্লা নামক মুসলমান। বাঙ্গালাভাষায় ইঁহার প্রথর পাণ্ডিত্য। সহজ পুস্তক হইলেও ইঁহার হস্তে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ও শব্দ-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হইত। সুতরাং আলাওল কবির বড় বড় সংস্কৃত শব্দ,—যথা বিধুন্তুদ, ছুছুন্দরী যে হামিদুল্লার হস্তে নিতান্ত বিকৃতরূপ ধারণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? হামিদুল্লা এই পুস্তকের কাপি-রাইট খরিদ করিয়া, "সন ১৮৪৭ সালের বিশ আইন অনুসারে রেজেষ্টরি" করিয়াছেন; সুতরাং অন্য কেহ যে শীঘ্র এই পুস্তকখানির উদ্ধার করিবেন, তাহার পথ নাই। আলাওল কবি এই কাব্যে অনেক নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সেই-সব ছন্দোবদ্ধ কবিতা পার্শী অক্ষর হইতে বাঙ্গালায় আনিতে যাইয়া হামিদুল্লা সব গুলিরই তন্তুচ্ছেদ করিয়াছেন। এক ছত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপর ছত্রে জোড়া লাগিয়া বিকট আকৃতি ধারণ করিয়াছে। আমি দুই জন কাব্যতীর্থ-উপাধিধারী পণ্ডিতের সাহায্যে চেষ্টা করিয়াও সেই তন্তুগুলি ঠিক গুটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

এখন আমরা আলাওল কবির রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-মণ্ডলীকে উপহার দিব।

পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা।

(বয়ঃসন্ধি।)

"আড় আঁখি বঙ্ক দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়,
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়।
সম্বরয় গীম হরে কটির বসন,
চঞ্চল হইল আঁখি ধৈরয গমন।
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়,
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়।
অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে,
আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে।
নানা পরিমল অঙ্গে করিয়া লেপন,
সহজে ত্যজিল অলি পুষ্পের কানন।
চন্দনের বৃক্ষ তনুপৃষ্ঠে নাগ বেণী,
শেষে আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্রমণি।
কামধনু জিনিল ঈষৎ ভুরুভঙ্গে,
কটাক্ষে হরয় প্রাণ নয়ন কুরঙ্গে।
শুক চঞ্চু নাসিকা কমলমুখ চাহে,
পদ্মিনীর মুখ দেখি জগ-মন মোহে।
অভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি,
না জানি পরশে কোন্ ভাগ্যবন্ত অলি।
নবীন বয়সী যত রসের সখিনী,
কমল নিকটে যেন শোভে কুমুদিনী॥"

পদ্মিনী যখন স্নান করিতে যান, তখন,—

"সরোবর লোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ দরশন হেতু করয় লহরী॥"

ষড়ঋতু বর্ণনা হইতে,—

"নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন,
রৌদ্রত্রাসে রহে ছায়া চরণে শরণ।
চন্দন চম্পক মাল্য মলয় পবন,
সতত দম্পতি পাশে ব্যাপৃত মদন।
শীতল গম্ভীর ছায়া সতীপতি সঙ্গে,
করয় বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে।"

বর্ষাকালে,—

ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়,
দদ্দুরী শিখিনীরব আত মনে ভায়।
স্বামিসঙ্গে নানারঙ্গে নিশি বসি জাগে,
চমকিলে বিদ্যুৎ, চমকি কণ্ঠে লাগে।
বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া,
ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া।"

দিল্লীশ্বরের দ্বারাধ্যক্ষের রূপবর্ণনা হইতে,—

হাবেসি পুরুষ এক সাহার সেবায়,
বক্র ভুরু ক্রোধমুখ থাকয় সদায়।
উপরের ওষ্ঠ তার নাসিকা উপর,
চিবুক ঢাকিছে পুষ্ট লম্বিত অধর।
কোটর নয়ন যুগ্ম ঘোরে অবিরত,
বিকট সে আস্যে হাস্য নহি কদাচিত।
বক্রকেশ গোপ দাঁড়ি পিঙ্গল বরণ,
শ্যাম অঙ্গে লোমাবলী ভল্লুকলক্ষণ।
নারীকে না বলে প্রিয়া সদায় কিলায়,
ভিক্ষুক দ্বারেতে গেলে দণ্ড লয়ে ধায়।

আলাওল কবির রচনা অনেক স্থলে বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতার ন্যায় সরস ও মসৃণ। ইহারা উঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যথা,—

ফুটিল কবরী কুহু মাঝ,
তারকামণ্ডলে জলদ সাজ।
শশিকলা প্রায় সিন্দূর ভালে,
বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে।
সুন্দরী কামিনী কাম-বিমোহে,
খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে।
মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে,
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বাণ তরঙ্গে।
নাসা খগপতি নহে সমতুল,
সুরঙ্গ অধর বাঁধুলী ফুল।
দশন মুকুতা বিজলি হাসি,
অমিয়া বরিষে আঁধার নাশি।
উরজ কঠিন হেম কটোর,
হেরি মুনি-মন বিভোর।
হরি কটি কুম্ভ কটি নিতম্ব,
রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব।
কবি আলাওলে মধু গায়,
মাগন আরতি রহুক সদায়।

স্থলবিশেষে জয়দেবকে মনে পড়ে। জয়দেবেরই কথা, জয়দেবেরই ছন্দ,—কেবল ভাষাটি সংস্কৃত নহে, বাঙ্গালা; কবি হিন্দু নহেন, মুসলমান;—

"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে,
বর বালা দুই ইন্দু, শ্রবে যেন সুধাবিন্দু।
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধুহাসে,
প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত
হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত ত্রাসে,
মলয়া সমীর, সুসৌরভ সুশীতল।
বিলোলিত পতি অতি রস ভাষে,
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল দ্রুম।
মুকুলিত চূতলতা কোরক জলে,
যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত।
রঙ্গ মল্লিকা মালতি মালে॥

এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে কোন হিন্দু কবি এইরূপ রচনা করিলে তাহা আদরের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত। মুসলমান কবি এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন, ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সংস্কৃতের ছন্দ, শব্দ ও রসের লক্ষণ, কবি উৎকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। ইহা ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি আচার্য্যের ন্যায় পঞ্জিকা দেখিতে পারিতেন। রত্নসেন সিংহল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, সেই উপলক্ষে কবি পঞ্জিকা-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন :—

শুক্র রবি পঞ্চমীতে গমন কঠিন,
গুরুবারে সিদ্ধি নহে গমন দক্ষিণ।
সোম শনি পূর্ব্বেতে না যায় কদাচন,
উত্তরে মঙ্গল বুধে অশুভ লক্ষণ।
অবশ্য যাইব যদি নাহিক এড়ান,
তাহার ঔষধ কহি শুন বুদ্ধিমান।
শুক্রে পশ্চিমে যাইতে মুখে দিবে রাই,
বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিবে গুয়া খাই।
উত্তরেতে মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিবে,
দর্পণ দেখিয়া সোমে পূর্ব্বেতে চলিবে।
বায়ু ভক্ষি শনিবারে পূর্ব্বে চলো সুখে,
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বূল দিবে মুখে।
বুধবারে উত্তরে খাইয়া যাবে দধি,
বিচারি কহিল সপ্তবারের ঔষধি।

ইহার পরে যোগিনীচক্রের ব্যাপার ; এটি বড় বৃহৎ পালা। কিছু নমুনা দিতেছি,—

এবে চক্র যোগিনীর কথা শুন সার,
ত্রিস অষ্টদিকে যোগী ফেরে বারে বার।
এক নব ষড়দশ চতুর্ব্বিংশ দিন,
পুরব দক্ষিণ দিকে যোগিনীর চিন।
অষ্টাদশ সপ্তবিংশ তিন একাদশে,
সুনিশ্চিত যোগিনী দক্ষিণদিকে বেশে।

অনেক স্থলেরই কবিত্ব সুন্দর,—আর একটি স্থান উঠাইব।

পদ্মিনীর গোরা ও বাদলের নিকট গমন।

"সখীর বচনে বালা ত্বরিত গমনে,
পদব্রজে গেলো গোরা বদলের স্থানে।
কোন কালে কন্যা নাহি হাটে পদগতি,
পথে পথে রুধিরে তিতিল বসুমতী।
যত সখিগণ দেখি বুকে হানে ঘা,
স্বামী শোকে যার সতী না নিরখে পা।
কতক্ষণে গেল যদি বাদল মন্দিরে,
শত শত নারী আসি নিলেক কন্যারে।
দুই ভাই দেখি অতি কম্পিত তরাসে,
অশ্বত্থের পত্র যেন প্রবল বাতাসে।
পদরেণু ঝাড়িলেন কেশ খসাইয়া,
দুই দিকে বীজে দুই চামর লইয়া।
বসিতে আসন দিল, না বসিল রাণী ;
মুখে না নিঃসরে বাণী চক্ষে ঝরে পানি।
ভক্তিভাবে শান্তাইয়া পুছে দুইজন,
অনুচিত কার্য্য আজি কিসের কারণ।
কি কারণে উল্‌টা বহিল গঙ্গাপানি,
সেবকের গৃহেতে আসিলা ঠাকুরাণী।
দ্বারে আসি দাসী যদি ডাকিত আমারে,
মস্তক হাঁটিয়া যাইত ঈশ্বরীর দ্বারে।"

এই পুস্তক নানা স্থানেই কবিত্ববিন্দুপাতে উজ্জ্বল ; কুড়াইয়া কত দেখাইব! পাঠক স্বীয় কৌতূহলনিবারণের জন্য নিজে পড়িবেন। কিন্তু একটি কথা, প্রাচীন জিনিষের রস আস্বাদ করিতে ধৈর্য্য ও ক্ষমা, এই দুই বৃত্তি চাই।

'পদ্মাবতী' প্রথম শ্রেণীর কাব্য না হইলেও, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই। অনুবাদ গ্রন্থগুলি ব্যতীত কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের পরে আলাওল কবি দাঁড়াইতে পারেন। ইনি ঘনরাম অপেক্ষা নানা বিষয়েই প্রশংসনীয়। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের যে স্থান, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে আলাওল কবির পদ্মাবতীরও সেই স্থান প্রাপ্য। এক বিষয়ে পদ্মাবতী বিশেষ আদরের যোগ্য। ছন্দ প্রভৃতি নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের পর্য্যালোচনা ও সংস্কৃতের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ইহার মত খুব অল্পসংখ্যক গ্রন্থেই আছে! মুসলমান লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

অনেক মুসলমান লেখকই বঙ্গ ভাষায় পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তাহাতে এত আরবী ও পার্শী শব্দের ছড়াছড়ি যে, তাহা আমাদের একরূপ অভক্ষ্য। এই পদ্মাবতীর উপাখ্যানের টাইটেল-পেজে প্রিণ্টার আবদুর রাউফ যে ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই দেখুন না কেন ?

"আমি অধীন আবদুর রাউফ জানাবে সবার। ভুল চুকের দাবী ভাই কেহ না করিবে।
আদাব ও ছালাম মোর হাজার হাজার॥ খোদার তরফ হেতে রেহাই করিবে॥
কম্পজ কেরেট আর ইংরেজে তামাম। তার পর দিবে দোওা মিলিয়া সবাই।
সমাপ্ত করিবে পুঁথি জানিবে এছলাম॥ আল্লা তালা হাসরেতে যেন করেন রেহাই॥"

এই বিকৃত ভাষাক্ষেত্রে এরূপ কাব্য পাইব বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যসেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া সহিষ্ণুতাকে মনের ধর্ম্ম করিয়াছি। যাহা পাই. তাহা ধরিয়া সমগ্র পাঠ করিতেছি। ভরসা কেবল "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দে'খ তাই, মিলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

বাং ৯২৭ সালে, মীরমহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান, হিন্দুস্থানী ভাষায় পদ্মাবতীর পুঁথি রচনা করেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া, আলাওল বঙ্গভাষায় এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পরন্তু আরোও জানা যাইতেছে যে, দৌলত কাজি নামক জনৈক মুসলমান লস্কর উজির আসরফের আজ্ঞায়, হিন্দুদের বিষয় লইয়া "চন্দ্রানী" নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তক কোথায় গিয়াছে, কে বলিবে? মীরমহম্মদের হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত পদ্মাবতী উপাখ্যানই বা কোথায় গেল? এসিয়াটীক সোসাইটি এই পুস্তক গুলির উদ্ধার করিলে, একটি ভাল কাজ হয়।

আলাওল কবি পদ্মাবতী উপাখ্যান ছাড়া "ভেলুয়া সুন্দরী" নামক বঙ্গভাষায় এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহা আমার নিকট আছে ও পড়িবার জিনিষ বটে।

এই সব বিবরণ ও কাব্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমান ভাই ভাই ছিলেন ও আছেন, এবং থাকাই স্বাভাবিক। দুষ্ট রাজনীতি ভ্রাতৃবিরোধ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমাদের সমবেত হইয়া সেই চেষ্টার প্রতিরোধ করা উচিত।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

পদ্মাবতী সম্বন্ধে মন্তব্য।

কবি সৈয়দ আলাওল কৃত "পদ্মাবতী" কাব্য দীনেশ বাবু আমাকে দেখিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে গ্রন্থের কোন কোন অংশ আমি পাঠ করিয়াছি। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য। কবি যে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদ্রিত গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় একটি সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়। প্রকাশক শ্রীযুক্ত হামিদুল্লা মহাশয় শ্লোকটিকে জবাই করিয়াছেন। আমরা কয়েক জন পণ্ডিত বন্ধুর সাহায্যে তাহারা সংশোধন করিয়া, এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

মূর্খাণাং প্রতিমা দেবাঃ বিপ্রদেবো হুতাশনঃ।
যোগিনাং প্রমথা দেবাঃ দেবদেবো নিরঞ্জনঃ॥

দীনেশ বাবু মাগন ঠাকুরকে রোসাঙ্গের রাজা লিখিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয়, রসাঙ্গ রাজ্যের প্রকৃত পরিচয় তিনি অবগত নহেন। কারণ, প্রবন্ধের প্রারম্ভে "রোসাঙ্গের" পর প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীগণ প্রাচীনকালে আরাকাণকে রসাঙ্গ বলিত। আমরা বাল্যকালে প্রাচীনদিগের নিকট "রসাঙ্গ" নামটি শ্রবণ করিয়াছি। তদনন্তর ভারতপুরাতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া, কর্ণেল উইলফোর্ডের নিকট ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হই। এই দেশের বাঙ্গালা নাম রসাঙ্গ বা রসাং, এবং মগী নাম রাক্ষিয়াং (সংস্কৃত রক্ষপুর) ইয়োরোপীয়গণ সেই রাক্ষিয়াং হইতে "আরাকান" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি আলাওল বাঙ্গালী, এ জন্য তিনি রসাঙ্গের মগরাজকে বাঙ্গালী হিন্দু রাজর্ষির ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকগণ শ্রবণ করুন,—

মণ্ডের "ম"কার আর ভাগ্যের "গ"কার,
শুভযোগ নক্ষত্র (হইতে) আনিল "নকার"।
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে,
রাখিলেও মহাজনে অতি মনশুভে।
আর এক [illegible] পণ্ডিত সকল,
কাব্য ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল।

পিঙ্গলের মধ্যে অষ্টমহাগণ মূল,
তাহাতে "মগন" আদ্য বুঝ কবিকুল।
নিধি স্থির [illegible]প্রাপ্তি মগন ভিতর,
মগন মাগন এক আকার অন্তর॥
আকার সংযোগে নাম হইল মাগন,
অনেক মঙ্গল ফল পাইতে কারণ।

কাব্যপ্রকাশক শ্রীযুক্ত হামিদুল্লা যদি "তওয়ারিখে হামিদী" নামক চট্টগ্রামের ইতিহাস-প্রণেতা হন, তাহা হইলে তিনি পারসিভাষায় জনৈক সুপণ্ডিত ব্যক্তি। আরবি পারশি ভাষায় সুপণ্ডিত মৃত মহাত্মা ব্লাকমান সাহেব "হুসেনি" বংশের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া "তওয়ারিখে হামিদী" হইতে অনেক স্থল অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার "তওয়ারিখে হামিদী" একখানি উপাদেয় ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় হামিদুল্লা মহাশয়ের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, এ জন্য আলাওল কবির সোনার "পদ্মাবতী" তাঁহার হস্তে পড়িয়া মাটীতে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজনীতি।

মালাবারের বিবাহ-প্রথা।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পশ্চিমাংশে মালাবার প্রদেশ অবস্থিত। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণদিগকে 'নাম্বুদিরি' বলে। ইহাঁরা প্রায়শঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই চলিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রদেশবাসী নেয়ার ও অপরাপর হিন্দুজাতির মধ্যে 'মরুমক্কাতায়ম্' (Marumakhatayam) অর্থাৎ ভাগিনেয়াধিকার নামক স্ত্রীস্বত্বমূলক এক বিচিত্র উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত। সম্প্রতি ইহাদের বিবাহপ্রথার সংস্কার মানসে এক আইনের প্রস্তাব ভারত গবর্মেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয়ের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। প্রস্তাবিত বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার নিমিত্ত, বিগত সেপ্টেম্বর মাসের কলিকাতা রিবিউ পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে মালাবার প্রদেশীয় এই নেয়ার জাতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকার।

নেয়ার জাতি 'তরওয়াদ্' নামক একান্নবর্ত্তী পরিবারসমূহে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিবার এক একজন স্ত্রী ও তাহার সন্তান সন্ততি লইয়া গঠিত। তরওয়াদের সম্পত্তিতে ইহাদের সকলেরই সমান অধিকার। তবে পরিবারের মধ্যে যে পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, পারিবারিক সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে তাহারই কর্ত্তৃত্বাধীন। তরওয়াদভুক্ত বালকবালিকাদিগের ইনিই একমাত্র অভিভাবক। এইরূপ অভিভাবকদিগকে মালাবার প্রদেশে 'কর্ণবান' বলে। এক এক জন কর্ণবানের অধীনে বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষকে একত্র অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু পরিবারভুক্ত কোনও পুরুষের ঔরসজাত পুত্র বা কন্যাগণ উহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগকে মাতার সহিত মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া সেই পরিবারস্থ কর্ণবানের অধীন হইতে হয়। পুত্রকন্যাদিগের পিতৃধনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে, নেয়ারদিগের মধ্যে আইনসঙ্গত কোনও বিবাহপ্রথার অস্তিত্ব না থাকাতে, সন্তানগণের পিতৃনিরূপণ করা প্রায়শঃ অতি সুকঠিন; কিন্তু মাতৃনিরূপণে সেরূপ কোনও বিঘ্ন নাই। সম্প্রতি ইহার কতকটা পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। নয়ারগণ অনে-

নেয়ার জাতি।

কেই একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের একান্ত ইচ্ছা যে, ইহাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে ইহাদের স্ত্রী বা কন্যাদিগেরই অধিকার সংস্থাপিত হয়। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গবর্মেণ্টের কোনও কোনও কর্ম্মচারী নেয়ারদিগের উত্তরাধিকার আইনের সংস্কারার্থ গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যে কমিসন নিযুক্ত হন, তাঁহারাও এই কথার সমর্থন করেন। কমিসনের পরামর্শানুসারে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপকসভায় এক পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইলে, মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট উহা বিধিবদ্ধ করিতে সম্মত হইয়া গবর্ণর জেনারলের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ভারত গবর্মেণ্ট হঠাৎ কোনও হুকুম না দিয়া, এক বৃহত্তর কমিসনের হস্তে উহার ভারার্পণ করেন। উক্ত কমিসন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আপনাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এখন ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় কি করেন, বলা যায় না।

আইন সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কালিকটের জামরিন্, ব্রাহ্মণবংশীয়েরা ও দেশাচারবদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই প্রথা নেয়ারধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম সমুদ্রগর্ভ হইতে মালাবার প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মণ অনুচরদিগের মধ্যে উহার বিভাগ করিয়া দেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিভাগ নিবারণার্থ তিনি জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি এই নিয়ম করেন যে, জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্যতীত আর কেহই ব্রাহ্মণপত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে না। এমন কি, তাহাদের ধর্ম্মানুমত বিবাহই একবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু যিনি ভগবানের অবতার, তিনি যে মানুষের পশুপ্রবৃত্তির খবর লইয়া তাহার কোনও বন্দোবস্ত করিবেন না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। উদারহৃদয় অবতার এক উদার হুকুম জাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অপরাপর সন্তানেরা, ছাগ মেষ বৃষ প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া রমণীমণ্ডলীর মধ্যে যথেচ্ছ বিহার বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। আর পাছে নারীজাতিসুলভ লজ্জা ও সতীত্ব ভাব কালে বিকশিত হইয়া এই প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে, সেই ভয়ে দূরদর্শী শাস্ত্রকার একটা অতিরিক্ত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার পুঁথীর মধ্যে বসাইয়া দিয়াছেন।—মূল শ্লোকটি পাই নাই, এ জন্য দুঃখিত। সুতরাং দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অনুবাদের ঘোলে পাঠক মহাশয়ের সাধ মিটাইতে বাধ্য হইলাম।

"আমার অধিকৃত এই দেশে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি রাজপরিবারের ভিতরেও, যেখানে যত স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য আছে, তাহারা যেন কেহ কখনও সতীত্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন না করে। ব্রাহ্মণপত্নীর পক্ষে নিয়ম স্বতন্ত্র; তাহাদিগকে কায়মনোবাক্যে পাতিব্রত্য রক্ষা করিতে হইবে। নিম্নজাতীয় সম্বন্ধে সতীত্বের কোনও নিয়ম নাই। আমি এই সত্য সংস্থাপন করিলাম।"

এইরূপে ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া স্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায়স্বরূপে জীবনধারণ করিতে হইতেছে। ইহাদের পরিণয় সংস্কার বা সতীত্বের বিধান নাই; সুতরাং ইহাদের সন্তানগণের পিতৃনিরূপণ অসম্ভব। তাই মাতুলাধিকার-প্রথার উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবাহ না হউক, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে, 'তালী-বন্ধন' নামক একটা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে; তালী একটা কণ্ঠাভরণ মাত্র। কোনও কোনও স্থলে কাজটা ব্রাহ্মণ-যুবকের দ্বারা সম্পন্ন হয়; কোথাও বা সমজাতীয় পুরুষের সাহায্য প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ এই উৎসবকে রীতিমত বিবাহ-উৎসবের ন্যায় অবলোকন করে। উভয় পক্ষের ঠিকুজী মিলাইয়া বরকন্যা নির্ব্বাচিত হইলে পর, সৌভাগ্যশালী বর মহাশয় কৃপাণ হস্তে সদল বলে যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে কন্যাযাত্রীদিগের সহিত

সম্মিলিত হন। তার পর বিবাহসভা[illegible] নীত কন্যার পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া তাহার গলদেশে তালী বন্ধন করিয়া দেন। এই সময়ে কন্যাকে একটি তীর ও একখানি দর্পণ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অতঃপর সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, পতিপত্নী অস্পৃ[illegible]য়ের ন্যায় এক গৃহে তিন দিবস যাপন করিবেন। চতুর্থ দিবসে পু[illegible]রিণী বা নদীর জলে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন, কন্যার তরওয়াদের গৃহদ্বার রুদ্ধ। তখন উহা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবেন। আর উভয়ে এক পাত্রে আহার করিয়া, একখানি ব[illegible] দ্বিখণ্ডিত করিবার ছলে, পরস্পরের সম্পর্কটা চিরদিনের নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন। ইহার পর নেয়ার যুবতী যে কোনও যুবকের সহিত যথেচ্ছরূপে সম্মিলিত হইতে পারেন। তাহাতে কি মানুষ, কি দেবতা, কাহারও কোনও আপত্তি নাই।

সম্মিলনে স্বাধীনতা।

এই বিচিত্র প্রথা যে কেবল নিম্নশ্রেণীস্থ নেয়ারগণের মধ্যেই নিবদ্ধ, এমন নহে। মালাবার ও কোচিন প্র[illegible]শের উচ্চতর রাজবংশসমূহেও ইহার সম্পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজপুত্র ও রাজসভাসদ সকলেই ব্রাহ্মণের ঔরসজাত। 'নাম্বুদিরি'-দিগের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপন এত অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত যে, অধিকাংশ রাজপরিবার ইহাদিগকে আপনাপন আলয়ে রাখিয়া চিরদিন প্রতিপালন করিয়া থাকেন। প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি ভক্তির আধিক্য বশতঃ, ইহাদের মধ্যে সামাজিক বিবাহ বন্ধন এখন পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বিচিত্র প্রথার বিস্তৃতি।

কিন্তু প্রকৃতি দেবী কোনও প্রকার অত্যাচার চিরদিন নীরবে সহ্য করিতে পারেন না। উন্মার্গপ্রবৃত্তের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। এই নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণেরাই ইহার দৃষ্টান্ত। ইহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, কি বাহিক কি মানসিক, সর্ব্ব প্রকার উন্নতির পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ি[illegible]। আজীবন আলস্য ও অনাচার বশতঃ ইহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান কুপ্রথার সংস্কার না হইলে, ইহাদের বিলোপ অনিবার্য্য। প্রস্তাবিত আইনের বিরোধী এক জন দেশীয় জজ বলিয়াছেন,—

"The Nambudiri keeper himself very often takes a pride in seeing the woman excelling in her love intrigues, and not unfrequently he makes a trade of her accomplishment."

ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক মার্জ্জনা করিবেন; আমরা ইহার অনুবাদ দিতে পারিলাম না। ইহা শিথিল দাম্পত্যবন্ধনের চরমাবস্থা। পক্ষান্তরে, নাম্বুদিরি সুন্দরীগণকে অতি সাবধানে মুসলমা[illegible]চিত সন্দেহের সহিত সর্ব্বদা অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। কারণ, এ[illegible]মাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহাধিকার নিবন্ধন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাগ্যে বর জুটিয়া উঠে না।

আজকাল অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রকার না এক প্রকারের বিবাহপ্রথা ক্রমশঃ প্রবেশলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক স্থলে দাম্পত্যবন্ধনকে আজীবনস্থায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে। "অপরাপর দেশে পিতৃগণ নিজ নিজ সন্তানকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, মালাবার-বাসীরা আপনাপন ভাগিনেয়দিগকে সেই চক্ষে দর্শন করে,"—এ কথা এখন আর সকল স্থলে তেমন খাটে না। কেহ কেহ বলেন, বিচারালয়সমূহে এই সকল বিবাহপ্রথার বিধিবদ্ধ স্বীকৃত হইলে আর নূতন আইন করিবার প্রয়োজন হয় না। রিবিউর লেখক এই মতের বিরোধী। তিনি আইনের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্ত[illegible]দান করিয়াছেন;—

বিভ্রাট।

(১) গবর্মেণ্ট-নিয়োজিত কমিসনের অধিকাংশ সভ্য বলিয়াছেন যে, এই সকল বিবাহ-বন্ধন আইন আদালতে টিকিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা।

(২) যাঁহারা ধর্ম্মের দিক হইতে ইহাতে আপত্তি করেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত, যে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম।

(৩) কর্ণবানদিগের হস্তে তরওয়াদ-সমূহের ক্রমশঃ ধনক্ষয় ও অবনতি হইয়া আসিতেছে। কর্ণবানেরা যে অপন স্ত্রীপুত্রের ভাবনা না ভাবিয়া নিঃস্বার্থভাবে তরওয়াদের উন্নতি চেষ্টা করিবে, ইহা নিতান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জীব জগতে আপনাপন স্ত্রী পরিবারের প্রতি স্নেহই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। সুতরাং, তরওয়াদভুক্ত স্ত্রীপুরুষদিগের সত্বরক্ষার্থ আইন প্রয়োজন।

(৪) শ্রমলব্ধ ধনে ব্যক্তিগত অধিকার না থাকায়, নেয়ারেরা নিতান্ত অলস ও অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে। তরওয়াদের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। কারণ, যে বস্তু সকলেরই, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাহারও নহে;—ভাগের মা গঙ্গা পায় না। অপরাপর জাতির সহিত সংঘর্ষে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural Selection) নিয়মানুসারে, ইহাদের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আইন পরিবর্ত্তনে বিলম্ব করিলে আর রক্ষা নাই।

(৫) তরওয়াদভুক্ত রমণীকুলের দুর্দ্দশার সীমা নাই। কর্ণবানের হুকুমমত তাহাদিগকে অনেক সময় স্বামিত্যাগ ও নূতন স্বামী গ্রহণ করিতে হয়। তার উপর সতীনের জ্বালা ত সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। তাহাদের শিক্ষার কোনও উপায় নাই। কর্ণবান এ বিষয়ে উদাসীন, বালকদিগের বিদ্যালাভে অর্থলাভের সম্ভাবনা; বালিকাদিগের শিক্ষায় কেবল অর্থহানি।

উপসংহার।

আইনের বলে কোনও জাতি ও সমাজকে উন্নত ও সংস্কৃত করিবার বিজাতীয় রাজার অধিকার আছে কি না, সমাজতত্ত্বদর্শী শাসননীতিজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমরা কেবল, মানুষ যে আদৌ পশুমাত্র ছিল, এবং এখনও অনেক স্থলে রহিয়াছে, তজ্জন্য পাঠক-বন্ধুবর্গের সমক্ষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিদায় লইলাম।

সাহিত্য।

সেকস্‌পীয়র ও রেসিন।

মধ্যে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ফরাসী লেখক পলভারলেন বলিয়াছেন যে, সেকস্‌পীয়রের গ্রন্থ অপেক্ষা রেসিনের গ্রন্থ উৎকৃষ্ট। দুই জন এইরূপ গ্রন্থকারের তুলনায় সমালোচনা করিয়া সহসা একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সহজ নহে, সেই জন্য কথাটার প্রকাশ জন্য আত্মসমর্থনার্থ লেখককে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে।—তাহাতে তিনি প্রথমেই বলিতেছেন যে, তিনি অসুস্থ এবং নিকটে কোন পুস্তক নাই বলিয়া, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রকৃত হৃদয়ের কথা। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এইরূপ সমপ্রতিভাসম্পন্ন দুই জন লেখকের মধ্যে এক জনকে তিনি সাহিত্যশিল্পী হিসাবে উচ্চতর স্থান দিতে সক্ষম নহেন। আমরা "কটনাইটলি রিভিউ" হইতে তাঁহার প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

এক জন ফরাসীর পক্ষে রেসিনকে অসীম প্রশংসা করায় কিছুই আশ্চর্য্য নাই। বিশেষ রেসিনের আকুলতা এবং আবেগ অন্য কোন গ্রন্থকারের নাই বলিয়াই বোধ হয়। সেকস্‌পীয়রের প্রশংসা সম্যকভাবে ব্যক্ত করাই লেখকের পক্ষে অসম্ভব; তবে সেকস্‌পীয়রে বুদ্ধির

প্রতিভা।

গাম্ভীর্য্য অর্থাৎ মানসিক বিকাশই অধিক দৃষ্ট হয়। রমণীচরিত্রবিশ্লেষণে রেসিন সেকস্‌পীয়র অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই।—তিনি রমণীচরিত্রের অনেক জটিল, দৃষ্টির অগোচর অংশের উপরেও উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেকস্‌পীয়রের স্বর্গীয় প্রতিভা কেবল

আদর্শভাবে রমণীচরিত্র লইয়াই ব্যাপৃত,—লেডী ম্যাকবেথ দুরাকাঙ্ক্ষা, ডেস্‌ডিমোনা সরল-প্রাণা-রমণী এবং ওফিলিয়া একটি মাধুরীর স্বপ্ন। রেসিনের রমণী-চিত্র ইহা হইতে ভিন্ন; তাহাতে বিশ্লেষণক্ষমতা অধিক প্রকাশ পায়। রেসিন স্ত্রীচিত্র আপনার হস্তে রাখেন, আর সেক্‌স্পীয়র মনে রাখেন। রেসিনের হৃদয়ে রমণীর স্থান অধিক—মোলেয়ার ভিন্ন আর কেহ রমণীচরিত্র এমন বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। সেকস্‌পীয়র এবং রেসিন, এতদুভ-য়ের মধ্যে কাহার প্রতিভা অধিক, সে বিষয়ে তর্কের শেষ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সেকস্‌পীয়র।

সেকস্‌পীয়র জীবনটি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন, স্বাধীন জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে অনেক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সে গুলি সবই জানিতেন। তিনি ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন এভনে শীকার চুরি কলঙ্কে কলঙ্কিত এবং তাহার পর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; কাজেই তাঁহার প্রতিভা অভিজ্ঞতার ফল। প্রতিভা এবং পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার ভাগ্যে প্রভূত ধন-লাভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন (৫২ বৎসর)। এবং পরিশেষে তিনি আপনার অসংযত জীবনের মধ্যে আপনার গাম্ভীর্য্য এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাইয়াছিলেন। সেকস্‌পীয়রে সকলই আতিশয্যময়—তাঁহার সনেট গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং তাঁহার উপাসক হুগোও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আপনাতে এবং অন্যে জীবনপ্রিয়তা তাঁহার বিশেষত্ব—তাহাতেও সেই আতিশয্য-প্রিয়তা দৃষ্ট হয়। এ কথা অস্বীকার করিয়া ফল নাই যে, সেকস্‌পীয়রে স্থানে স্থানে সেই আতিশয্যপ্রিয়তার অন্যায় ব্যবহার এবং অপব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

সেক্‌স্পীয়রে একটা কোমলতা এবং পরিচ্ছন্নতা আছে, যাহা তাঁহার নিজস্ব। একমাত্র "As You Like it" পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। তাঁহার জীবনের প্রথমাঙ্ক অসংযত আতিশয্যময়—রচনাতেও সেই ছায়া নিপতিত। কিন্তু সে সময়কার রচনায় আতিশয্য ফেসান ছিল, এবং সেকস্‌পীয়রের অসাধারণ প্রতিভাবলে তাহা কখনই বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায় না। গম্ভীর বা সাধারণ, যে ভাবেই রচিত হয়, তাহা পুনরুক্ত হয় না—ভিন্নরূপে দর্শন দেয় মাত্র। কখন তাহা কূলপ্লাবী প্রবল প্রবাহ, কখন বা কলগীতিময় সূর্য্যকিরণ-উদ্ভাষিণী স্রোতস্বতী; রূপ ভিন্ন ভিন্ন।

রেসিন।

হুগো বলিয়াছেন, রেসিন স্বর্গীয় অমানুষী কিছু। সেকস্‌পীয়রে বিরক্তিকর একঘেয়েমি নাই, রেসিনে আছে কি? তাঁহার রচনায় এই বৈচিত্র্যহীনতা আছে বলিলে সেই মহাকবির প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার রচনায় একটা স্থির প্রণালী, সৌন্দর্য্য এবং একই প্রকার খাঁটি সরল ভাষা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা কখনও বিরক্তিকর একঘেয়ে নহে। রচনাপ্রণালী লইয়া অবশ্যই রেসিনকে কিছু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সেকস্‌পীয়রের খুঁটিনাটি দর্শন কখনই বিরক্তিকর নহে, তাঁহার একঘেয়ে ভাব পাঠককে আশ্চর্য্য করে এবং দর্শন, কিম্বদন্তী বা উপাখ্যান যেরূপ আনন্দদায়ক, তাহাও সেই-রূপ। সেকস্‌পীয়রের নাটকের গল্পাংশের একটা বিশেষ মূল্য আছে, এবং তিনি তাহা আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। আর প্রথম নেপোলিয়ান রেসিনের বিয়োগান্ত নাটক সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন যে, সেগুলি ফরাসী সাহিত্যে একটা চরম সীমার দৃষ্টান্ত। আবেগ এইখানে সর্ব্বা-পেক্ষা সমধিকভাবে দৃষ্ট হয়। ইহাতে কিম্বদন্তী প্রভৃতির প্রয়োজনাভাব।

রেসিনের রচনাপ্রণালী ঠিক তাঁহার উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে, রেসিনের ভাষা, একটুও ঘুরে ফিরে না, ঠিক কার্য্যস্থানে উপনীত হয়, ইহাতে রচনা একটু নীরস হইয়া আসে। কিন্তু রেসিনের ভাষা ও শব্দবিন্যাসমাধুর্য্য ফরাসী

তাহাতে সে ক্রটী যথেষ্ট সংশোধিত হইয়াছে। দুই শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে সেই কঠোর আদর্শ হইতে রচিত রেসিনের গ্রন্থ হইতে যে আজও সাহিত্যে শত আনন্দ উপভোগ করা যায়, সে জন্য বোধ হয়, অন্য সকল ফরাসী নাটককার অপেক্ষা ফরাসীদিগের কৃতজ্ঞতার ঋণ রেসিনের নিকট অধিক। রেসিনের রচনার রমণীয় গাম্ভীর্য্য তাঁহার বিশেষত্ব। সেক্‌স্‌পীয়র সর্ব্বদা এই গাম্ভীর্য্যের অনুসরণে সক্ষম নহেন—স্থানে স্থানে আবশ্যক সময়ে তাঁহার মনোরমা প্রতিভা তাঁহাকে সেই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাটকে শেষভাগ ভিন্ন এই গাম্ভীর্য্য দৃষ্ট হয় না। তাই বলিয়াছি, ইহা রেসিনের বিশেষত্ব। রেসিন কেবলমাত্র নাটককার নহেন—তিনি এবং হুগো, এই দুই জনই ফরাসী গীতিকবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হাস্যরসে সেক্‌সপীয়রের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক, এ কথা স্বীকার করিতে হয়। যখন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তিনি হাস্যরসের পূর্ণ অবতার; ইংরাজী এবং ফরাসী, উভয় ধরণের রসিকাতেই তাঁহার অসীম অসাধারণ অধিকার দৃষ্ট হয়। রেসিনও হাস্যরসে অনভিজ্ঞ নহেন। তিনিও স্থানে স্থানে ইহা তীব্রভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু হাস্যরসের পূর্ণবিকাশে সেক্‌সপীয়র তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখন এই দুই গ্রন্থকারের শিক্ষাপ্রণালী ও তত্তৎ জীবনে তাহার প্রভাব আলোচনা করিব।

হাস্যরস।

রেসিন রাজকর্ম্মচারীর পুত্র, তাঁহার সুশিক্ষালাভের সুবিধা ছিল, এবং আর্থিক অবস্থাও মন্দ ছিল না। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে কঠোর পবিত্রভাবে প্রতিপালিত এবং মহানগরী প্যারীসে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং রাজপারিষদ হইয়া সেই সময়েই সাহিত্যসেবাজনিত [illegible] জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ দিকে সেক্‌সপীয়র শীকার চৌরবৃত্তির অপবাদে কলঙ্কিত, তিনি নাট্যশালার সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং কসাইয়ের সন্তান বলিয়া নাকি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে গোহত্যা গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন!!

শিক্ষা।

সেক্‌স্‌পীয়র ভদ্রসমাজে শিক্ষিত হয়েন নাই, তিনি যোগেযাগে পড়িতে পারিতেন, এবং কষ্টেসৃষ্টে লিখিতে পারিতেন। তিনি উপকথা প্রভৃতিই কেবল প্রথম বয়সে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং পাঠ করিয়া শিক্ষা অপেক্ষা শুনিয়া শিক্ষাই তাঁহার অধিক হইয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় যৎসামান্য এবং তাহাও অনুবাদের সাহায্যে, পক্ষান্তরে রেসিন একবার একখানি গ্রীক উপন্যাস মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাজেই সেক্‌স্‌পীয়র সমাজের সর্ব্বনিম্ন সোপান হইতে, সর্ব্বত্র হইতে হাস্যরস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং আপনার বিশেষ কৌশলের সহিত সে গুলি ব্যক্ত করিতেন। রেসিনের হাস্যে একটা ভদ্রোচিত সংযম এবং শুচিতা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। উভয়ের জীবন ও রচনার তুলনা করিলে সহজেই মনে হয় যে, উভয়ের প্রতিভার গতি কতকটা একদিকেই ছিল, এবং উভয়ের শিক্ষা ও সংসর্গই প্রতিভার উপর চিরস্থায়ী প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিল। ফরাসী, ইংরাজী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি সকল য়ুরোপীয় ভাষায়, এই দুই জনের সম্বন্ধেই যথেষ্ট মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। ভলটেয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া এত সমালোচক এত কথা বলিয়াছেন যে, আর বড় কিছু অব্যক্ত আছে বলিয়া মনে হয় না।

জীবনে যাহাই হউক, মরণের পর সেক্‌স্‌পীয়রের যশের যেরূপ পূর্ণগ্রাস হইয়াছিল,—সাহিত্যাকাশে বোধ হয় কোনও কবির যশের ভাগ্যে সেরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই। তিনি রঙ্গোপজীবী এবং কতকটা ভাঁড়-গোছের বলিয়া [illegible] ছিলেন, এখন তাঁহার জীবনচরিতকারগণ তাঁহার স্বভাবকে নীতির আলোকে [illegible] করিয়া বিশ্লেষণ করিলেন যে, তন্মধ্যে সত্যসত্যই মৃত প্রতিভার

জীবনে ও মরণে।

প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। বর্ত্তমান সময়ে এডগার এলেন পোকে লইয়া কতকটা সেইরূপ হইয়াছে। তাহার পর, পিউরিটান প্রবৃত্তি-পরায়ণ কঠোর 'কমন্ ওয়েলথের' কালে সুকুমার শিল্পের অবস্থা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; 'কমন্ ওয়েলথের' পরও তিনি অপ্রানিত রহিলেন, অথচ কত হীন, তুচ্ছ আনন্দান্ত ও বিষাদান্ত পুস্তক যশোলাভ করিতে লাগিল। তাহার পর, শেষ জর্জের রাজত্বকালে বায়রণ, সেলী, কিট্‌স্‌, মুর প্রভৃতির চেষ্টায়, আবার সেক্সপীয়রের ভাগ্যে উপযুক্ত যশোলাভ ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক, সেক্সপীয়রের প্রতি সম্মান সহসা ফিরিয়া আসে নাই; তাঁহার নাটক অভিনয়ের সময় গ্যারিক তাহা নিজে সংশোধন করিয়া লইতেন, এবং সময় সময় একেবারে এক আধটি দৃশ্যই বাদ দিতেন। ফরাসীতে সেক্সপীয়রের অনুবাদে চরিত্র সকলের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। লেটুরনুরের অনুবাদে সত্য সত্য ভাল অনুবাদ করিবার চেষ্টা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভলটেয়ার বলিয়াছেন যে, অনুবাদকের মানসিক শক্তির অভাব এবং সেক্সপীয়র "মদ্যপায়ী বর্ব্বর"। ডুমা, মরিস, হুগো প্রভৃতির উৎকৃষ্ট অনুবাদ সকল প্রকাশিত হইবার পরে, ফরাসী সাহিত্যে সেক্সপীয়রের প্রকৃত সম্মান লাভ হইয়াছিল। এখন ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত, এবং তাঁহার রচনার অনুকরণে রচিত বা তাঁহার রচনার প্রভাব হইতে সমুৎপন্ন গ্রন্থ, প্রতি বৎসর ফরাসী সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

রেসিনের কথা স্বতন্ত্র—জীবিত অবস্থাতেই তাঁহার রচনাপ্রকাশের সফলতা বুঝা গিয়াছিল, এবং তিনি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার রচনার আদর করিত; রমণীরাও তাঁহার রচনার প্রশংসা করিতেন। কৃতজ্ঞ ভক্তিময় প্রিয়জনের মধ্যে, সম্মানিত অপমান (!) তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এবং মনে হয় যে, তাঁহার মরণের সময়ই তাঁহার প্রকৃত জয়ের সময়—বিপক্ষের সমালোচনা তাঁহার বহুব্যাপ্ত বিপুল যশকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পরে এই দুই শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া তিনি অতুলনীয় যশোভোগ করিতেছেন; ফ্রান্সের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংলণ্ডে তাঁহার যশ অপ্রত্যাশিত অধিক, অসীম; জার্ম্মেনিতে গেটে, শিলার প্রভৃতি তাঁহার রচনা অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এক জন অপরিণতবয়স্ক লেখক তাঁহার গৌরবহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি আপনার ধৃষ্টতা বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান লেখকগণ, সাহিত্যসমালোচকগণ, শিল্পসমালোচকগণ এবং কবিগণ, একবাক্যে রেসিনের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার গৌরব কালস্রোতকে তুচ্ছ করিয়া এত বিপ্লব পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ মহিমায় প্রজ্বলিত। রেসিনের জন্মস্থানে বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্যারীনগরী রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া বড়ই ব্যস্ত; সেখানে Theatre Francaisএ ভিন্ন রেসিনের প্রতিমূর্ত্তি নাই। এ ত্রুটি সংশোধিত হওয়া প্রার্থনীয়, পূর্ব্বে লিস্‌টার-উদ্যানের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল, সেখানে সেই বিশুষ্ক তৃণভূমি এবং মূর্ত্তিহীন অশ্বের প্রতিকৃতি, কেবলমাত্র হাস্যোদ্দীপক ছিল; কিন্তু বহুকাল পরে ইংলণ্ড সেখানে একটি মনোরম উদ্যান রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপযুক্ততম পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। ইংলণ্ড বিদেশীয় মহাত্মাদিগের সম্মান করিতে কখন কুণ্ঠিত নহে; তবে রেসিনের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন না করায় তাহাকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু প্যারীর এত অপবাদ সত্ত্বেও, সেখানে সেক্সপীয়রের একটি প্রতিমূর্ত্তি ও [illegible] নামে একটি রাস্তা আছে—প্যারীর প্রশংসা করিতে হয়।

[illegible] সম্রাটের ও তাঁহা[illegible] চরিত্রে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তিনি সংগ্রামপ্রিয় [illegible]লেন না, পরন্তু সংগ্রাম তিনি অ[illegible]রের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, নরশো[illegible]তে তাঁহার রাজত্বকাল কলঙ্কিত না হয়, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বিংশতি লক্ষ সশস্ত্র সেনা[illegible] অধীশ্বর আলেকজান্দা[illegible]র সাম্রাজ্যে তিনি কখন অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনেন নাই। তিনি ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসবান্ ছিলেন, সৃষ্টির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহস্যভেদে তিনি বলি[illegible]ন, "ঈশ্বর ভালই জানেন। আমার প্রক্ষে আজ যদি সব শেষ হয়, তাহাতেও দুঃখের কারণ নাই।" একবার এক হত্যাকারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। [illegible]মন করি[illegible] হউক, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব।" যদি তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপর কিছু লেখি[illegible] আবশ্যক হয়, তবে এইটুকু লিখিলেই যথেষ্ট হইবে।

[illegible]টের পারিবারিক জীবন অতিশয় সুখময় ছিল, তাঁহার পত্নীপ্রেম, সন্তানস্নেহ অসাধারণ। অতিরিক্ত সন্ত[illegible] বাৎসল্যই তাঁহার শেষ পীড়ার কারণ। পুত্র জর্জের শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। একদিন শিকারে জর্জ একটা পাখী গুলি করেন, তৃণমণ্ডিত ভূমির উপর গতপ্রাণ বিহঙ্গম ঘুরিয়া আসিয়া পড়িল; রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন না যে, সেখানে জলাভূমি চোরামাটী পূর্ণ, পক্ষী আনিতে গিয়া তিনি সেই মৃত্তিকাভ্যন্তরে ডুবিতে লাগিলেন। চীৎকার শব্দে আসিয়া পিতা দেখিলেন, পুত্র আগ্রীব [illegible]নিমজ্জিত; দৈত্যের মত বলীয়ান পিতা পুত্রকে তুলিলেন, কিন্তু উভ[illegible] তখন জলসিক্ত। পিতা[illegible] প্রাসাদে আসিলেন—পুত্রের জ্বর ও পিতার সর্দ্দিবোধ হইল। [illegible]লার বৃহৎ প্রাসাদে এক [illegible] পুত্রের শয্যাগৃহ ও মধ্যভাগে পিতার শয্যাগৃহ। রাত্রিতে পিতা পুত্র[illegible] দেখি[illegible] যাইতে চাহিলেন—সাম্রাজ্ঞী বলিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাব[illegible]। পত্নীকে অসন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, সম্রাট শয়ন করিয়া নিদ্রার ভান করিলে[illegible] পত্নী চলিয়া গেলে, তিনি সেই শয়নপরিচ্ছদে পুত্রকে দেখিতে গেলেন। ফলে হইল যে, [illegible]ত্রকে উ[illegible]ার করিতে যাইয়া যে সর্দ্দি হইয়াছিল, তাহা গুরুতর হইয়া উঠিল, এবং তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

পীড়া।

মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে, সম্রাট ইংলণ্ডের সমরসজ্জা হ্রাস করিবার প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুরোপে এখন সমর নাই, অথচ সমরসজ্জারও বিরাম নাই। এই সশস্ত্র স্থিরতা বড় ভীষণ; এই যে প্রত্যেক দেশে ক্রমাগত বারুদের স্তূপ প্রস্তুত হইতেছে, কবে এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িবে, আর ভীষণ উৎক্ষেপে লোককোলাহলময় মহাদেশ মহাশ্মশানে প[illegible]ত হইবে। যুরোপের শান্তিরক্ষক আলেকজান্দার বলিয়াছিলেন যে, এখন প্রাচ্য ভূখণ্ডে সমর চলিতেছে, ইহার পরে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইবে। কিন্তু অসীম ক্ষমতা[illegible]লে মরণ রাজনৈতিক কর্ণধারকে চিরশান্তি দিয়াছে। এখন নূতন সম্রাট ইচ্ছাসত্ত্বেও সহজে একা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

আলেকজান্দারের নিকট যুরোপের কৃতজ্ঞতার ঋণ সহজশোধ্য নহে। সে দিন তাঁহার অসুস্থতার সময় মন্ত্রীবর লর্ড রোজবেরি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা উপলব্ধ হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, সকলেরই চিন্তার বিষয়। এখন আলেকজান্দারের অতীতকালে রুষিয়ার সহিত অনেক বিষয়ে গুরুতর মতভেদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের নিকট যুরোপের কৃতজ্ঞতার ঋণ অসাধারণ। রুষিয়ার [illegible] ছাড়িয়া বিদেশীয় [illegible] দেখিলে সম্রাটের জীবনের উপান্ত কেবল সত্য ও শান্তি। তিনি সিজার বা নেপোলিয়ন [illegible]হেন সত্য, কিন্তু যদি সংগ্রাম ও শান্তি সমতুল্য হয়, [illegible] ইতিহাসে তাঁহার স্থান সিজার বা নেপোলিয়নের নিম্নে নহে। তিনি যুরোপের শান্তিরক্ষা করিয়াছেন,

ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞতা।

তিনি কখনও অসত্য ও প্রতারণা ক্ষমা করিতেন না। বিগত ১৪ বৎসর যে য়ুরোপে শান্তি আছে, তাহা অনেকটা তাঁহারই প্রাসাদাৎ। তাঁহার মৃত্যু হইলে, জগতের শান্তির আধার সর্ব্বপ্রধান স্থিরতা যাইবে।

য়ুরোপের শান্তিরক্ষক আলেকজান্দার অনন্ত শান্তির রাজ্যে গমন করিয়াছেন, এখন য়ুরোপ ও এসিয়া নূতনের রাজ্যে আসিয়া পড়িল। নব সম্রাটের সম্বন্ধে বড় কিছু জানা যায় নাই। তবে তিনি নাকি বল অপেক্ষা দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং শুনা যায় যে, নৈতিক চরিত্র ও শারীরিক বলের পক্ষে অনিষ্টকর অভ্যাসও তাঁহার ছিল। বাল্যকালে তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক ছিলেন, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস কতকটা দ্বিতীয় নিকোলাসের মত। বাল্যকালে এক দিন বাইবেল পড়িতে পড়িতে বালক নিকোলাস ধর্ম্মপ্রচারক যীশু শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে খৃষ্ট অত্যাচরিত হইয়াছিলেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন; শিক্ষক রাজপুত্রকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন খৃষ্ট যদি যেরুজালেমের ন্যায় রুসিয়ার রাজপথে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তবে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইতেন।

নব সম্রাট।

নব সম্রাট অল্প দিন হইল, ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি এসিয়া-পরিভ্রমণের সময় এদেশেও আসিয়াছিলেন; কিন্তু রুসিয়ার রাজপরিবার সমস্ত সাধারণ লোকের মধ্যে থাকিয়াও এত দূরে থাকেন যে, তাঁহার ভ্রমণের সঙ্গীরা তাহার পর আর তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন নাই। এখন জগতের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে রাজকুমারী এলিকসের উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি সম্রাটের উপর যেরূপ প্রভাব সংস্থাপন করিতে পারিবেন ফল সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা।

ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে যে সখ্যভাব দৃষ্ট হইতেছে, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, এবং নব সম্রাট পিতার ন্যায় য়ুরোপের শান্তি রক্ষা করুন। যেন শান্তিচ্ছায়াস্নিগ্ধ য়ুরোপে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সংগ্রামের সংহারক ভেরীনিনাদ শ্রুত না হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—পৌষ। "বিচারক" একটি গল্প। এই গল্পটির রচনাপ্রণালী ও বলিবার ভঙ্গী অতি চমৎকার। ক্ষীরোদা একজন হতভাগিনী; বিধবা; যৌবনের প্রারম্ভে এক যুবকের প্রলোভনে পড়িয়া গৃহত্যাগ করে। "অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন অন্ন জুটিবার জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল। * * * যে দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্ব্ব রাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—বাড়ী ভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, তিন বৎসরের শিশুপুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই—* * তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিল। এই সময় এক জন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া 'ক্ষীরো' 'ক্ষীরো' শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল,—রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল। ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া

...টের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য ...তে ভগ্নকাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ক্ষীরোদা সেই রুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া ...।" তার পর প্রতিবেশীরা শব্দ শুনিয়াকূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল,—এবং ...কে যখন তুলিল তখন তিন বৎসরের শিশুটি ঐহিক যাতনার অতীত হইয়া গিয়াছে। ...রোদা হাসপাতালে গিয়া আরোগ্য লাভ করিল,—এবং যথাবিধি বিচারালয়ে সমর্পিত হইল। জজ মোহিতমোহন দত্ত। ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ...সীর হুকুম হইল। উকিলেরা ক্ষীরোদার পক্ষে দয়া ভিক্ষা করিলেন,—কিন্তু মোহিত বাবু "তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।" এই স্থলে লেখক,—মোহিত বাবুর পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণিত করিয়া, কেন তিনি দয়া করিতে পারিলেন না—তাহার কারণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সংক্ষেপে, মোহিত বাবু যৌবনে চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই,—তৎসুত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। কুলত্যাগিনীর কঠোর শাস্তি না হইলে "সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না"—এই প্রকার তাঁহার মনের ভাব। মোহিত বাবু যৌবনে একটি বালবিধবাকে গৃহত্যাগ করাইয়া পরিশেষে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, লেখক এই স্থলে বিস্তৃত ভাবে সেই ঘটনাটির বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক,—বিচারক মোহিত বাবু ক্ষীরোদার দণ্ডবিধান করিবার পর এক দিন জেল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন,—তথায় দেখেন, "ক্ষীরোদা ...র সহিত ভারী ঝগড়া বাধাইয়াছে।" জজ বাবুকে দেখিয়া ক্ষীরোদা বলিয়া উঠিল,—"...গো জজ বাবু, দোহাই তোমার, উহাকে বল আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়!" জজ মোহিত বাবু প্রহরীর নিকট হইতে আংটি চাহিয়া লইলেন—"তিনি হটাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন এমনই চমকিয়া উঠিলেন। আংটির একদিকে হস্তির দাঁতের উপর তেলের রঙ্গে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে, এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র। তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলাজ শঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। মোহিত আর একবার সোনার আংটিটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।" পাঠকবর্গকে আর বলিয়া দিতে হইবে না,—এইখানেই গল্পটির সমাপ্তি। একটি ছোট গল্প হলেও,—এই আখ্যানবস্তুকে লেখক একটি বড় উপন্যাসে পরিণত করিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র আকারে এই গল্পের সকল উদ্দেশ্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, পূর্ণবিকশিত হইবার অবসর পায় নাই,—ক্ষুদ্র গল্পের প্রয়োজনে ও আয়তনে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনাই ছিল না। যেখানে লেখক মোহিতমোহনের সঙ্গে একটি বিধবা কুলবালার গৃহত্যাগের বর্ণনা করিতেছেন,—গল্পটির উপসংহারভাগের সহিত সেই স্থলটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; অথচ লেখক তাহা অবান্তরভাবে নিজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন মাত্র।—কেবল নিজের কথায় তাহার একটা বিবরণ না দিয়া,—ঘটনাটিকে স্বতন্ত্র প্রাধান্য দিয়া, ঘটনার কালে রাখিয়া, আর একটু বিশেষ... দিলে,—গল্পের পরবর্ত্তী অংশ আরো উজ্জ্বল হইত, মনে করি। লেখক পাপপুঞ্জ... ক্ষীরোদাকে সংগ্রহ করিয়াছেন বটে,—কিন্তু পাপের আনুষঙ্গিক ঘৃণাজনক ব... বর্জ্জন... তাহাকে এমন সাবধানে পাঠকবর্গের সম্মুখে আনিয়াছেন যে, ক্ষীরো... ...। তাহার ...রতর নিরাশা,—তাহার দারুণ অবসাদ, তাহার প্রাণে... ...সহানুভূতির উদ্রেক করে,—কিন্তু পাপ অনেক দূরে থাকে। এই গল্পে ...সংযম ও সুরুচিপ্রিয়তার নিদর্শন আছে, তাহা বাস্তবিকই ... ... করিবার জন্য যাঁহারা ...

গন্ধময় প্রেতদেহের চিত্র দেখান,—তাঁহারা বীভৎস রসের সঞ্চার করেন মাত্র। উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কণ্টক পড়ে,—পরন্তু কুরুচির চিত্রে অভীষ্ট আদর্শ আবৃত হইয়া যায়। ক্ষারোদার জীবনের বাস্তব ফটো তুলিয়াছেন,—কিন্তু তাহার ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাঠককে করেন নাই। যাঁহারা বাস্তবচিত্রাঙ্কনের ছলে দেশে কুরুচির বীজ বপন করেন,—তাঁ "বিচারক" গল্পে, বাস্তবের সংযত ও সুসঙ্গত চিত্ররচনার দৃষ্টান্ত পাইবেন। পরিশেষে কথা,—বর্ত্তমান সময়ে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ানের সংখ্যা অতি অল্প,—এবং বাঙ্গালী পাঠ 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' দিতে প্রায় কখনও কুণ্ঠিত নহেন। এ অবস্থায়, মোহিতমোহ ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান না করিলেই ভাল ছিল। "আগ্রা" এক জন ফরাসী ভ্রমণকারীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে অনুবাদিত। "নূতন অবতার" একটি রহস্যরচনা। এতখানি পরিশ্রমের উদ্দেশ্য যদি কোন বিন্দুমাত্র হাস্যরসের অবতারণা মনে করা যায়, তাহা হইলে রচনাইটি সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য ও সুন্দর হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক অনেকগুলি বাঙ্গালা শব্দের মহারাষ্ট্র প্রতিবাক্য সঙ্কলিত করিয়াছেন। তাহাদের সম্যক আলোচনা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। "সঙ্গীতের গঠনরীতি" প্রবন্ধে লেখক বর্ত্তমান বঙ্গসঙ্গীতের প্রণালীবিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। "সঞ্জীবচন্দ্র" একটি সমালোচনা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সঞ্জীবনী সুধা" নামক পুস্তকখানির প্রথমে সঞ্জীবের প্রতিভার যে সমালোচনা করিয়াছেন, "সাধনার" লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেক স্থলে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে মান্যবর চন্দ্রনাথ বাবু কি বলেন, দেখা যাউক। প্রবন্ধের মধ্যে এই অংশই বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

ভারতী।—অগ্রহায়ণ। এবারকার ভারতীর বড় দুরবস্থা। দশটি প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের "উদ্ভিজ্জাণু—ব্যাক্টিরিয়া" ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বিশ্ব" এই দুইটি মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সমীরণ।—অগ্রহায়ণ। "নক্সা—জরীর জুতা" এবারকার সমীরণে প্রকাশিত হইয়াছে।—কিন্তু যিনি "নক্সা" আঁকিয়াছিলেন,—তিনি আর ইহলোকে নাই। আমাদের পরম সুহৃৎ ক্ষেত্রনাথ গুপ্ত,—সম্প্রতি, জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেই সমবেদনাপূর্ণ, উদার হৃদয় সেই সরল প্রফুল্ল প্রকৃতি,—সেই স্বাধীন তেজস্বী ভাব, যে একবার অনুভব করিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। ক্ষেত্রনাথ সাহিত্যসংসারেও নিতান্ত অপরিচিত নহেন,—"সমীরণের" পাঠকেরা তাঁহার সাহিত্যশক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। এই "জরীর জুতা" নক্সায় "গৌরী" গল্পে, ক্ষেত্রনাথের সাহিত্যশক্তির পরিচয় আছে। এই শক্তি পরিণত হইলে,—হায় আমরা আশা করিয়াছিলাম,—বাঙ্গালাভাষা উপকৃত হইবে। ক্ষেত্রনাথের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ছিল,—ভাষায় বৈচিত্র্য ছিল, সর্ব্বোপরি, তাঁহার হৃদয় ছিল, এবং সহৃদয়তা ও [illegible] তাঁহার রচনা অনুপ্রাণিত করিত। কিন্তু হায় কাল! কে জানিত, তুমি এত [illegible] ক্ষেত্রনাথকে অপহরণ করিবে। আশা ও উৎসাহের অংশভাগী সহৃদয় বন্ধুর বিয়োগ, [illegible]। সাধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প,—এবং ক্ষেত্রনাথের সংক্ষিপ্ত কিন্তু [illegible]হিতা-জীবন,—যাহার সহিত পাঠকগণের সম্পর্ক,—তাহার সম্যক [illegible] [illegible] তাঁহার আত্মা নির্বৃতি [illegible] করুক,—ভগবান তাহার [illegible] [illegible]দিন।